উপন্যাস সমগ্র

হুমায়ূন আহমেদ

দ্বাদশ খণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর কাহিনীর নাট্যরূপায়ণের বিমুগ্ধ দর্শক। কোন ক্ষমতায় এভাবে সকলকে কাছে টানেন হুমায়ূন আহমেদ? চিত্রল গতিময় সহজ ভাষাবিন্যাস। অভাবনীয় ঘটনা বিশ্বাসযোগ্যভাবে ঘটানোর মনোহারী কৌশল। কল্পনা হার মেনে যায় এমন অকল্পনীয় বিদ্যুন্নিভ সংলাপ। এবং তাঁর কাহিনীতে ছড়ানো জীবন কখনোই আমাদের চেনা মধ্যবিত্ত সমাজসত্যের বাইরে ছোটাছুটি করে না। মধ্যবিত্ত-জীবনের আশা নিরাশা অনিশ্চিতি এবং দোলাচলপ্রবণ মূল্যবোধ, তাঁর সামান্য লাভ ও সামান্য ক্ষতির বন্ধনে আততিময় অস্তিত্ব। হুমায়ূন আহমেদের যে-কোনো উপন্যাস ধারণ করে আছে তাঁর সৃজনীসত্তার মনন-কল্পনার এ-সকল উপাদান। সাধারণ মানুষের কাতর জীবন চূর্ণকণায় ছড়িয়ে থাকে তাঁর লেখায়।

প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' যখন বেরোয়, তখন প্রথিতযশা অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ লিখেছিলেন, "হুমায়ূন আহমেদ বয়সে তরুণ, মনে প্রাচীন দ্রষ্টা, মেজাজে জীবনরসিক, স্বভাবে রূপদর্শী, যোগ্যতায় দক্ষ রূপকার। ভবিষ্যতে তিনি বিশিষ্ট জীবনশিল্পী হবেন–এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করব।" এ-ভাবেই যাত্রা শুরু হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদের। তারপর ক্রমাগত পথচলার প্রবাহে তিনি উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পবিজ্ঞান, রম্যরচনা এবং শিশুকিশোর গ্রন্থ-সমূহ উপহার দিয়ে চলেছেন এ-দেশের পাঠকসমাজকে। পণ্ডিত সমালোচক ও হৃদয়বান গল্পপ্রেমিক উভয়েরই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করে চলেছেন। একই সঙ্গে অতিপ্রজ অথচ শিল্পরুচিময় লেখক তাঁর মতো আর কেউ এই মুহূর্তে আছেন কি না সন্দেহ। প্রতি বৎসর অব্যাহত গতিতে তাঁর ফসলের ডালা ভরে উঠছে।

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থার আনন্দ ও গর্ব যে, হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসসমগ্র বিভিন্ন খণ্ডে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করার দায়িত্ব সে নিতে পেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোকচিত্র : মাসুদ আখন্দ

বাংলা কথাসাহিত্যে জীবিত কিংবদন্তি হুমায়ূন আহমেদের [জ. ১৯৪৮) 'নন্দিত নরকে' উপন্যাস দিয়ে লেখালেখির জগতে যাত্রা শুরু, যা মূলত ছিল তাঁর জয়যাত্রা।
যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিমার কেমিস্ট্রিতে গবেষণা করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু সবই ছেড়েছেন সৃজনশীলতায় অধিকতর মনোনিবেশের জন্য।
তাঁর সৃজনশীলতার ভাণ্ডার এখন বহুমুখী। লেখালেখির সঙ্গে চলছে টিভি নাটক ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, গান লেখা এবং সবশেষে যোগ হয়েছে ছবি আঁকা।
দেশে ও বিদেশে তিনি সমানভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত। পেয়েছেন দেশের সর্বোচ্চ সম্মান 'একুশে পদক'। বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে অপেক্ষাকৃত নবীন বয়সে। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁর জীবন ও সাহিত্য কর্মভিত্তিক ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র একাধিক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত, মুক্তিযুদ্ধ-উপজীব্য চলচ্চিত্র 'শ্যামল ছায়া' অস্কার চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত।
মুক্তবুদ্ধির সপক্ষে অনশন করেছেন, জাতীয় প্রয়োজনে ও সংকটে এখনো কলম ধরেন, উদ্বুদ্ধ করেন জনগণকে।

সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গ্রন্থজগতের পরিসংখ্যান বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করছে। অনতিতরুণ এই কথাশিল্পীর পাঠকমনোরঞ্জনের ক্ষমতা ইতোমধ্যেই প্রায় কিংবদন্তিতুল্য।
কিশোরবয়সী থেকে বৃদ্ধ, স্বল্পশিক্ষিত থেকে বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত—সকলেই তাঁর উপন্যাসের পাঠক, অথবা

►

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাসসমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপন্যাস সমগ্র
১২

হুমায়ূন আহমেদ

প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১১

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০'র পক্ষে
এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-8794-04-3

UPANYASH SAMAGRA (A Collection of Novels) vol-XII by Humayun Ahmed
Published by PROTIK. 38/2ka Banglabazar (1st floor) Dhaka-1100
First Edition February 2011 Price Taka 425.00 Only.

একমাত্র পরিবেশক অবসর প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

যোগাযোগ
ফোন ৭১১৫৩৮৬, ৭১২৫৫৩৩
e-mail protikbooks@yahoo.com, abosorprokashoni@yahoo.com, protik77@aitlbd.net
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বাদশ খণ্ডের সূচি

হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম / ১
তন্দ্রাবিলাস / ৭৭
মেঘ বলেছে যাব যাব / ১৩৩
হিমুর দ্বিতীয় প্রহর / ৩২১
রুমালী / ৪০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম

১

আজকের দিনটা এত সুন্দর কেন?

সকালবেলা জানালা খুলে আমি হতভম্ব। এ কী! আকাশ এত নীল? আকাশের তো এত নীল হবার কথা না। ভূমধ্যসাগরীয় আকাশ হলেও একটা কথা ছিল। এ হচ্ছে খাঁটি বঙ্গদেশীয় আকাশ, বেশিরভাগ সময় ঘোলা থাকার কথা। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জানালার ওপাশে একটা কাক এসে বসল। কী আশ্চর্য! কাকটাকেও তো সুন্দর লাগছে। কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে হাঁটছে। কলেজে ভর্তি হবার পরদিন যে ভঙ্গিতে কিশোরী মেয়েরা হাঁটে অবিকল সেই—"বড় হয়ে গেছি" ভঙ্গি। আমি মুগ্ধ হয়ে কাকটাকে দেখলাম। কাকের চোখ এত কালো হয়? কবি-সাহিত্যিকরা কি এই কারণেই বলেন কাকচক্ষু জল? আচ্ছা, আজ সব সুন্দর সুন্দর জিনিস চোখে পড়ছে কেন? আজকের তারিখটা কত? দিন-তারিখের হিসাব রাখি না, কাজেই তারিখ কত বলতে পারছি না। একটা খবরের কাগজ কিনে তারিখটা দেখতে হবে। মনে হচ্ছে আজ একটা বিশেষ দিন। আজকের দিনটার কিছু একটা হয়েছে। এই দিনে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে। পৃথিবী তার রূপের দরজা আজকের দিনটার জন্যে খুলে দেবে। কাজেই আজ সকাল থেকে জীবনানন্দ দাশ মার্কা হাঁটা দিতে হবে—"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" মার্কা হাঁটা। আমি ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামলাম। নষ্ট করার মতো সময় নেই। কাকটা বিস্মিত গলায় ডাকল—কা কা। আমার ব্যস্ততা মনে হয় তার ভালো লাগছে না। পাখিরা নিজেরা খুব ব্যস্ত থাকে কিন্তু অন্যদের ব্যস্ততা পছন্দ করে না।

মাথার উপর ঝাঁজালো রোদ, লু হাওয়ার মতো গরম হাওয়া বইছে। গায়ের হলুদ পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে একাকার। পাঞ্জাবি থেকে ঘামের বিকট গন্ধে নিজেরই নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসছে, তারপরেও আজকের দিনটার সৌন্দর্যে আমি অভিভূত। হঠাৎ কোনো বড় সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে স্নায়ু অবশ হয়ে আসে। সকাল থেকেই আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আছে। এখন তা আরো বাড়ল, আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। সৌন্দর্যের কথাটা চিৎকার করে সবাইকে জানাতে ইচ্ছা করছে। মাইক ভাড়া করে রিকশা নিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে পারলে চমৎকার হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে ঢাকা নগরবাসী। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ ৯ই চৈত্র, ১৪০২ সাল। দয়া করে লক্ষ করুন। আজ অপূর্ব একটি দিন। হে ঢাকা নগরবাসী। হ্যালো হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর। আজ ৯ই চৈত্র ১৪০২ সাল...

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি রাস্তার ঠিক মাঝখানে। বিজয় সরণির বিশাল রাস্তা—মাঝখানে দাঁড়ালে কোনো অসুবিধা হয় না। রিকশা গাড়ি সব পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। তারপরেও লক্ষ করলাম কিছু কিছু গাড়ির ড্রাইভার বিরক্ত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, বিড়বিড় করছে—নির্ঘাত গালাগালি। গাড়ির মানুষেরা মনে করে পাকা রাস্তা বানানো হয়েছে শুধুই তাদের জন্যে। পথচারীরা হাঁটবে ঘাসের উপর দিয়ে, পাকা রাস্তায় পা ফেলবে না।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার বেশ চমৎকার লাগছে। নিজেকে ট্রাফিক পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে পাজেরো টাইপ দামি কোনো গাড়ি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলি---দেখি লাইসেন্সটা! ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র আছে? ফিটনেস সার্টিফিকেট? এক্সহস্ট দিয়ে ভকভক করে কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। নামুন গাড়ি থেকে।

আজকের দিনটা এমন যে মনের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হল। একটা পাজেরো গাড়ি আমার গা ঘেঁষে হুড়মুড় করে থামল। লম্বাটে চেহারার এক ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, হ্যালো ব্রাদার, সামনে কি কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে?

আমি বললাম, কী গণ্ডগোল?

'গাড়ি ভাঙাভাঙি হচ্ছে নাকি?'

'জি না।'

পাজেরো হুস করে বের হয়ে গেল। পাজেরো হচ্ছে রাজপথের রাজা। এরা বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। কেমন গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে। দেখতে ভালো লাগে। মনে হয় "আহা, এরা কী সুখেই না আছে!" পরজন্মে মানুষের যদি গাড়ি হয়ে জন্মানোর সুযোগ থাকত—আমি পাজেরো হয়ে জন্মাতাম।

পাজেরোর ভদ্রলোক গাড়ি ভাঙাভাঙি হচ্ছে কিনা কেন জানতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি না। আজ হরতাল, অসহযোগ এইসব কিছু নেই। দুদিনের ছাড় পাওয়া গেছে। তৃতীয় দিন থেকে আবার শুরু হবে। আজ আনন্দময় একটা দিন। হরতালের বিপরীত শব্দ কি 'আনন্দতাল?' সরকার এবং বিরোধী দল সবাই মিলে একটা বিশেষ দিনকে আনন্দতাল ঘোষণা দিলে চমৎকার হত। সকাল-সন্ধ্যা আনন্দতাল। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব খুলে যাবে—সবাই সবার গাড়ি নিয়ে হর্ন বাজাতে বাজাতে রাস্তায় নামবে। রাস্তার মোড়ে পুলিশ এবং বিডিআর থাকবে না। থাকবে তাদের ব্যান্ডপার্টি। এরা সারাক্ষণ ব্যান্ড বাজাবে। তাদের দিকে পেট্রোল বোমার বদলে গোলাপের তোড়া ছুড়ে দেয়া হবে...

'হিমু ভাই না?'

আমি চমকে তাকালাম। গাঢ় মেরুন রঙের একটা গাড়ি আমার পাশে থেমেছে। গাড়ির চালকের সিটে যে বসে আছে তাকে দেখাচ্ছে পদ্মিনী গোত্রের কোনো তরুণীর মতো। কুইন অব সেবা, হার রয়েল হাইনেস বিলকিস হয়তো আঠার-উনিশ বছর বয়সে এই মেয়ের মতোই ছিল। কিং সোলায়মান বিলকিসকে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আমারও অভিভূত হওয়া উচিত। অভিভূত হতে পারছি না—কারণ মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। চেনা চেনাও মনে হচ্ছে না। এ কে?

'হিমু ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'এখনো পারছি না, তবে চিনে ফেলব।'

'আমি মারিয়া!'

AMARBOI.COM

'ও আচ্ছা, মারিয়া। কেমন আছেন?'

'আপনি চিনতে পারেননি। চিনতে পারলে আপনি করে বলতেন না।'

'ও চিনেছি—তুই? এত বড় হয়েছিস! আশ্চর্য! যাকে বলে পারফেক্ট লেডি। ঠোঁটে লিপস্টিকফিপস্টিক দিয়ে তো দেখি বেড়াছেড়া করে ফেলেছিস।'

'আপনি এখনো চেনেননি। চিনলে তুই তুই করে বলতেন না। তুই বলার মতো ঘনিষ্ঠতা আপনার সঙ্গে আমার ছিল না।'

'ছিল না বলেই যে ভবিষ্যতেও হবে না তা তো না। ভবিষ্যতে হবে ভেবে তুই বললাম।'

'আপনি রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী করছেন?'

'কিছু করছি না।'

'অবশ্যই কিছু করছেন। দূর থেকে মনে হল হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। পাগলটাগল হয়ে যাননি তো? শুনেছি পাগলরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয়, ট্রাফিক কন্ট্রোল করে।'

'এখনো পাগল হইনি। তবে মনে হচ্ছে শিগগিরই হব। তুই নিজেও গাড়ি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছিস। লোকে তোকেও মহিলাপাগল ভাবছে।'

'তুই তুই করবেন না। কেউ তুই তুই করলে আমার ভালো লাগে না। আপনি কি আসলেই আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'না।'

'কেউ আমাকে চিনতে না পারলেও আমার ভালো লাগে না। যাই হোক, সামনে কি গণ্ডগোল হচ্ছে? গাড়িটাড়ি ভাঙা হচ্ছে?'

'না। পাজেরোর মালিকরা অতি সাবধানী হয়। গণ্ডগোলের ত্রিসীমানায় তারা থাকে না। পাজেরো যখন গিয়েছে তখন তোমার গাড়িও যেতে পারবে।'

'গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই বলে আপনি এরকম কথা বলতে পারলেন। আমার গাড়িটা পাজেরোর চেয়ে অনেক দামি। এটা একটা রেসিং কার।'

'চড়তে কি খুব আরাম?'

'চড়তে চান?'

'হুঁ চাই।'

'তা হলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়ির পেছনের দিকে উঠতে যাচ্ছিলাম—অবাক হয়ে দেখলাম, এই গাড়ির দুটা মাত্র সিট। হাত-পা এলিয়ে পিছনের সিটে বসার কোনো উপায় নেই। বসতে হবে ড্রাইভারের পাশে। মারিয়া বলল, সিটবেল্ট বাঁধুন।

আমি বললাম, সিটবেল্ট বাঁধতে পারব না। দড়ি দিয়ে বাঁধাছাদা হয়ে গাড়িতে বসতে ইচ্ছা করে না। গাড়িতে যাব আরাম করে। আমি কি গরু-ছাগল যে আমাকে বেঁধে রাখতে হবে?

'কথা বাড়াবেন না হিমু ভাই, সিটবেল্ট বাঁধুন। আমি খুব দ্রুত গাড়ি চালাই। অ্যাক্সিডেন্ট হলে সর্বনাশ।'

'এইরকম গিজগিজ ভিড়ে তুমি দ্রুত গাড়ি চালাবে কী করে?'

'শহরের ভেতরে ভিড়—বাইরে তো ভিড় না। আমি ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়েতে চলে যাব। দু শ কিলোমিটার স্পিড দিয়ে গাড়িটা কেমন পরীক্ষা করব। কেনার পর থেকে আমি গাড়ির স্পিড পরীক্ষা করতে পারিনি।'

আমি শুকনো গলায় বললাম, ও আচ্ছা।

মারিয়া গাড়ি চালানোয় খুব ওস্তাদ আমার এরকম মনে হচ্ছে না। হুটহাট করে ব্রেক কষছে। সাজগোজের দিকে যে মেয়ের এত নজর অন্যদিকে তার নজর কম থাকার কথা। পরনে লালপাড় হালকা রঙের শাড়ি। (শাড়ি পরে গাড়ি চালাচ্ছে কী করে? এক্সিলেটরে চাপ না পড়ে

শাড়িতে পা বেঁধে যাবার কথা।) গলায় লাল রঙের পাথরের লকেট। সবচে বড় পাথরটা পায়রার ডিমের সাইজ। কী পাথর এটা?

পাথরের নাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মারিয়া এমনভাবে ব্রেক কষল যে উইন্ড শিল্ডে আমার মাথা লেগে গেল। মারিয়া বলল, সিটবেল্ট থাকায় বেঁচে গেলেন। সিটবেল্ট বাঁধা না থাকলে মাথার ঘিলু বেরিয়ে যেত।

'মারিয়া!'

'জি।'

'তুমি কত স্পিডে গাড়ি চালাবে বললে?'

'দু শ কিলোমিটার—এক শ পঁচিশ মাইল পার আওয়ার।'

'আমার এখন মনে পড়ল—আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। খুব জরুরি একটা কাজ আছে জিপিওতে। আসগর নামে এক লোক আছে—জিপিওর সামনে বসে থাকে, লোকজনদের চিঠি লিখে দেয়। সে খবর পাঠিয়েছে তার সঙ্গে যেন দেখা করি। আমার খুব বন্ধুমানুষ।'

'আমি দু শ কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাব এটা শুনেই আপনি আসলে আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছেন।'

'খানিকটা তাই। ভয় পাওয়াটা তো দোষের না—তোমার মতো একজন আনাড়ি ড্রাইভার যদি দু শ কিলোমিটার স্পিড দেয়, তা হলে আমার ধারণা গাড়ি রাস্তা ছেড়ে আকাশে উঠে যাবে।'

মারিয়া বলল, সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা না।

'আমাকে নামিয়ে দাও। আসগর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা না করলেই না।'

'আপনাকে আমি নামিয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এই অপরাধের শাস্তি হিসেবেই আমি নামাব না।'

'যদি চিনে ফেলতে পারি তা হলে নামিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ, নামিয়ে দেব।'

'তোমার মার নাম কী?'

'মার নাম, বাবার নাম কারোর নামই বলব না। মা-বাবাকে দিয়ে আমাকে চিনলে হবে না। আপনি আমাকে দিয়ে ওদের চিনবেন।'

'তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কবে হয়েছিল?'

'পাঁচ বছর আগে।'

'এখন তোমার বয়স কত?'

'কুড়ি।'

'পাঁচ বছর আগে বয়স ছিল পনের।'

'অঙ্কশাস্ত্র তাই বলে।'

'এই জন্যেই চিনতে পারছি না। পনের বছরের কিশোরী পাঁচ বছরে অনেকখানি বদলে যায়। শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার ব্যাপারটা এর মধ্যেই ঘটে।'

'ফর ইওর ইনফরমেশন, আমি কখনোই শুয়োপোকা ছিলাম না। জন্ম থেকেই আমি প্রজাপতি।'

'তোমাদের বাসাটা কোথায়?'

'তাও বলব না।'

'তোমাদের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম?'

'একসময় যেতেন। গত পাঁচ বছরে যাননি।'

'কেন যেতাম?'

'আমার একসময় ধারণা ছিল আমাকে দেখার জন্যে যেতেন। এখন সেই ভুল ভেঙেছে।'

'ও, তুমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে—মরিয়ম।'

'মরিয়ম না, মারিয়া। আপনি মরিয়ম ডাকতেন, রাগে গা জ্বলে যেত। এখনো জ্বলে যাচ্ছে।'

খ্যাচ করে শব্দ হল। গাড়ি রাস্তার উপর থেমে গেল। মরিয়ম বলল, নেমে যান। আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, কাজেই পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নামিয়ে দিচ্ছি।

'না, নামাতে হবে না, শুরুতে তোমাকে যতটা আনাড়ি ড্রাইভার মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না।'

'লং ড্রাইভের সঙ্গী হিসেবে আপনাকে আমার মনে ধরছে না। ঘামের গন্ধে আমার দম আটকে আসছে।'

'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'ভালো না। বেশিদিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনার কোনো ঠিকানা আমাদের জানা নেই বলে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি।'

'ঠিকানা দিচ্ছি, ঠিকানা লিখে রাখ।'

'কোনো দরকার নেই। আপনি কখনো এক ঠিকানায় বেশি দিন থাকেন না। আমাকে ঠিকানা দিয়েই আপনি বাসা বদল করে ফেলবেন।'

'তা হলে তোমাদের টেলিফোন নাম্বারটা দাও। আমি টেলিফোনে খোঁজ নেব।'

'টেলিফোন নাম্বার আপনাকে দিয়েছি। নাম্বার যেন ভুলে না যান সেই ব্যবস্থাও আমি করেছিলাম—একটু চিন্তা করলেই নাম্বার মনে পড়বে। আরেকটা কথা, আমার ধারণা, আপনি প্রথম দেখাতেই আমাকে চিনেছিলেন। তারপরও না চেনার ভান করেছেন। আপনি একটা অন্যায় করেছেন। বলুন সরি।'

'সরি।'

'কিশোরী বয়সে গভীর আবেগ নিয়ে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আপনি চিঠির জবাব দেননি।'

'সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা চিঠি। পাঠোদ্ধার করতে পারিনি।'

'আবারো একটা মিথ্যা কথা বললেন। পাঠোদ্ধার আপনি ঠিকই করেছিলেন। পাঠোদ্ধার করেই আপনি গেছেন ঘাবড়ে। আর আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসেননি।'

'তা না, নানান ঝামেলা গেল—আমার দূর সম্পর্কের এক বোন মারা গেল...কিডনি ফেইলিওর।'

'হিমু ভাই, আপনি কি সবসময় মিথ্যা কথা বলেন?'

'তা বলি।'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি আমার কুড়ি বছর জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলিনি।'

'কষ্ট করে আর পাঁচ বছর যদি মিথ্যা না বলে থাকতে পার তা হলে মহিলা-মহাপুরুষ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই ২৫ বছর মিথ্যা না বলে থাকতে পারেন।'

মারিয়া শুকনো গলায় বলল, মহাপুরুষ বিষয়ক এই তথ্য জানতাম না। শিখে রাখলাম।

আমি বললাম, আবার ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলাও মহাপুরুষদের লক্ষণ। সাধারণ মানুষ কখনো ক্রমাগত মিথ্যা বলতে পারে না—এটাও শিখে রাখ।

'হিমু ভাই, আমি যাচ্ছি—'

মারিয়া গাড়ি নিয়ে হুস করে বের হয়ে গেল। মাথায় এখন আর রোদ লাগছে না। অল্প সময়ের ভেতরে কোত্থেকে মেঘ এসে জমা হওয়া শুরু হয়েছে। আমি আকাশের মেঘের দিকে তাকালাম—আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম রাস্তায়। ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা। রিকশা চলছে—গাড়ি খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুই আপোষহীন নেত্রীর চাপে পড়ে বেচারা গাড়িগুলি পড়েছে বিপদে। যেখানে-সেখানে গাড়ি ভাঙা হচ্ছে। এখনো বোধহয় কোথাও শুরু হয়েছে। এইসব খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাবধানী গাড়ি-মালিকরা তাঁদের গাড়ি দ্রুত সরিয়ে ফেলেন। আমি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম বোমার আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা। পাওয়া যাচ্ছে না। সময়টা এমন যে বোমার আওয়াজ পাওয়া না গেলে অস্বস্তি লাগে। মনে হয়—ব্যাপারটা কী? সমস্যা কি গুরুতর? বোমার আওয়াজ পাওয়া গেলে মনে হয়—সব ঠিক আছে। সমস্যা তেমন গুরুতর না।

আমি হাঁটতে হাঁটতে জিপিওর দিকে যাচ্ছি। মারিয়ার কথা এই মুহূর্তে আর ভাবছি না। মস্তিষ্কের যে অংশে মারিয়ার স্মৃতি জমা করা ওই অংশের সুইচ অফ করে দিয়েছি। এখন ভাবছি আসগর সাহেবের কথা। ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। আজ এই চমৎকার দিনে দেখা করে আসা যাক। ওনার সঙ্গে দেখা করার সমস্যা একটাই। ফেরার সময় উনি নিচু গলায় বলবেন—রাতের বেলা গরিবখানায় চারটা ডাল-ভাত খেয়ে যান।

কিছু কিছু নিমন্ত্রণ এমনভাবে করা হয় যে 'না' করা যায় না।

রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে পরপর দুটা পুলিশের জিপ চলে গেল। তার পেছনে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এক অ্যাম্বুলেন্স। বোঝাই যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে কোনো রোগী নেই। পেছনের সিটে কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে গল্প করছেন। একজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে ধোঁয়া ছাড়ছেন। অথচ অ্যাম্বুলেন্সে সাইরেন যেভাবে বাজছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। হাসপাতালে পৌছানোর আগেই ভালো-মন্দ কিছু ঘটে যাবে।

'ভাই সাহেব, শুনুন।'

অপরিচিত গোলগাল মুখের এক লোক গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছেন।

আমি অ্যাম্বুলেন্সের দিক থেকে চোখ সরিয়ে গোলগাল মুখের এই ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। উনি বাজার করে ফিরছেন। বাজারের ব্যাগের ভেতর থেকে লাউয়ের মাথা বের হয়ে আছে। চৈত্র মাসে লাউ খেতে কেমন কে জানে।

'হ্যালো ব্রাদার!'

'আমাকে বলছেন?'

'জি। একটা গুজব শুনলাম, শহরে আর্মি নেমেছে—সত্যি নাকি?'

'জানি না।'

'খুবই অথেন্টিক গুজব। আর্মি নেমেছে—হেভি পিটুন শুরু করেছে।'

'যাকে পাচ্ছে তাকেই পিটাচ্ছে?'

'প্রায় সেরকমই।'

লাউ-হাতে ভদ্রলোককে খুবই আনন্দিত মনে হল। আর্মি যাকে পাচ্ছে তাকে পিটাচ্ছে এতে এত আনন্দিত হবার কী আছে কে জানে। ভদ্রলোক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, গর্ত থেকে সাপ টেনে বের করলে সাপ কি ছেড়ে দেবে?

আমি বললাম, আর্মিকে সাপ বলছেন আর্মি জানতে পারলে আপনার লাউ নিয়ে যাবে। এবং আপনাকেও হেভি পিটুন দেবে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমি বুঝতে পারছি ভদ্রলোক এখন মনে মনে নিজেকেই গালি দিচ্ছেন—"কেন গায়ে পড়ে আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম!"

হাতে ঘড়ি নেই—অনুমান তিনটা থেকে সাড়ে তিনটায় জিপিওতে ঢুকলাম। মূল গেট তালাবন্ধ। দেয়াল টপকে ঢুকতে হল। বাইরে সিরিয়াস গণ্ডগোল। চলন্ত বাসে আগুন-বোমা ছোড়া হয়েছে। বাসের ভেতরটা ঝলসে গেছে। পুলিশ, বিডিআর চলে এসেছে। টিয়ার গ্যাস

মারা হচ্ছে। রাস্তায় কিছু কাপড়ের দোকান ছিল। সেগুলি লুট হচ্ছে। ভদ্র-টাইপের লোকজনদের দেখা যাচ্ছে চার-পাঁচটা শার্ট বগলে নিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত চলে যাচ্ছে। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে হয়তো বলবে—'খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। আন্দোলনে একটা লাভ হয়েছে—চাল-ডালের দাম বাড়লেও গার্মেন্টসের কাপড়চোপড় জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। চারটা শার্ট দাম পড়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ভাবা যায়?'

চূড়ান্ত রকম গণ্ডগোলের ভেতরও আসগর সাহেবকে পাওয়া গেল নির্বিকার অবস্থায়। তিনি টুল-বাক্স নিয়ে বসে আছেন। টুল-বাক্সের গায়ে লেখা—

আলী আসগর
পত্রলেখক।
পোস্ট কার্ড ১ টাকা
খাম ২ টাকা
রেজিস্ট্রি ৫ টাকা
পার্সেল ২৫ টাকা (দেশী)
পার্সেল ৫০ টাকা (বিদেশী)।

আসগর সাহেবের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ। দেখে মনে হয় কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে জীবনযাপন করেন। চিঠি লেখা তেমন কোনো শ্রমের কাজ না, তারপরেও ভদ্রলোকের চেহারায় পরিশ্রমের এমন প্রবল চাপের কারণ কী—কে বলবে। আসগর সাহেব একজনকে চিঠি লিখে দিচ্ছেন। আমি আসগর সাহেবের পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি একবার তাকালেন—আবার চিঠি লেখা শুরু করলেন। ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তার মতো। দেখতেও ভালো লাগে। আমার চিঠি লেখার কেউ থাকলে ওনাকে দিয়ে লেখাতাম। কে জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে পরিচয় হলে মারিয়ার চিঠির জবাব হয়তো দিতাম। তাঁকে দিয়েই লেখাতাম—প্রিয় মারিয়া, তোমার সাংকেতিক ভাষায় লেখা চিঠির মর্ম উদ্ধার করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। ... কী সর্বনাশ! মারিয়ার কথা ভাবা শুরু করেছি। সুইচ অফ করা ছিল—কখন আবার অন হল? ব্রেইন কি অটো সিস্টেমে চলে গেছে? আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলালাম। যে চিঠি লেখাচ্ছে তার দিকে তাকালাম।

যে চিঠি লেখাচ্ছে তাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। খালি পা। লুঙ্গি পরা। গায়ে নীল রঙের একটা গেঞ্জি। বেচারার হয়তো জ্বর এসেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেভাবে সে গড়গড় করে চিঠির বিষয়বস্তু বলে যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সে দীর্ঘদিন ধরে অন্যকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে।

> প্রিয় ফাতেমা,
>
> দোয়াগো। পর সমাচার এই যে, আমি আল্লাহপাকের অসীম রহমতে মঙ্গলমতো আছি। তোমাদের জন্যে সর্বদা বিশেষ চিন্তাযুক্ত থাকি...

আসগর সাহেব চিঠি লেখা বন্ধ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাইসাব, রাতে আমার সাথে চারটা খানা খান।

আমি বললাম, আজ না খেলে হয় না?

'কাজকর্ম থাকলে রাত করে আসেন। কোনো অসুবিধা নাই। আজ বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের বাজার করব, আপনাকে নিয়ে চারটা ভালো-মন্দ খাব। অনেক দিন ভালো-মন্দ খাই না।'

'জি আচ্ছা।'

'এখন কি একটু চা খাবেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খেতে পারি এক কাপ চা।'

আসগর সাহেব হাত উঁচিয়ে চা-ওয়ালাকে চা দিতে ইশারা করে আবার চিঠি লেখায় মন দিলেন। আমি চা খেয়ে জিপিওর বাইরে এসেই পুলিশের হাতে ধরা খেলাম।

পুলিশের হাতে ধরা খাওয়ার ব্যাপারে সব সময় খানিকটা নাটকীয়তা থাকে—এখানে তেমন নাটকীয়তা ছিল না। রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বাসপোড়া দেখছি। বাসের সবকটা জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—পট পট পট পট শব্দ হচ্ছে। কেউ আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে না, বা বাসের চারদিকে ছোটাছুটিও করছে না। আমি অপেক্ষা করছি কখন ধোঁয়া বের হওয়া শেষ হয়ে সত্যিকার আগুন জ্বলবে। মোটামুটি রকমের আগুন জ্বললে সেই আগুনে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে রওনা হওয়া যেতে পারে। বাসপোড়া আগুনে সিগারেট ধরানো একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হবার কথা। আমি সিগারেট হাতে অপেক্ষা করছি।

এমন সময় শার্ট-প্যান্ট পরা এক লোক এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। ভদ্র চেহারা, কথাবার্তাও ভদ্র। আমাকে বললেন, আপনার ব্যাগে কী?

আমার কাঁধে চটের ব্যাগ। সেই ব্যাগে কয়েকটা টাকা এবং কিছু খুচরা পয়সা। আমার পাঞ্জাবির কোনো পকেট নেই। জরুরি জিনিসপত্রের জন্যে পুরোনো আমলের কবিদের মতো কাঁধে ব্যাগ ঝুলাতে হয়।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, ব্যাগ খালি।

ভদ্রলোক এবার গলার স্বর কঠিন করে বললেন, খালি কেন? মাল ডেলিভারি দিয়ে ফেলেছেন?

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কোন মালের কথা বলছেন?'

'ব্যাগে জর্দার কৌটা ছিল না?'

'জি না, আমি তো পান খাই না।'

ভদ্রলোক বললেন, আসুন আমার সঙ্গে আপনার পান খাওয়ার ব্যবস্থা করছি। বলেই খপ করে আমার হাত ধরলেন। এর নাম বজ্র আঁটুনি। হাতের দুটা হাড়—রেডিও এবং আলনা মটমট করতে লাগল। যে কোনো সময় ভেঙে যাবার কথা। এই ভদ্রলোক হাত ধরার ট্রেনিং কোথায় নিয়েছেন? সারদা পুলিশ একাডেমিতে?

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। নতুন পরিস্থিতির কারণে দিনের সৌন্দর্য কি কমে গেছে? দেখলাম, কমেনি। চারদিক এখনো অপূর্ব লাগছে। দিনের শেষের রোদে নগরী ঝলমল করছে। রোদের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। তেজি চনমনে গন্ধ। আমি অনেক দিন পর রোদের গন্ধ পেলাম। যে পুলিশ অফিসার আমার হাত ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন তাঁকেও ক্ষমা করে দিলাম। এমন সুন্দর দিনে কারো ওপর রাগ রাখতে নেই।

২

'আপনার নাম কী?'

আমি ইতস্তত করছি, নাম বলব কি বলব না ভাবছি। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমরা সাধারণত খুব আগ্রহের সঙ্গে নাম বলি। জিজ্ঞেস না করলেও বলি। হয়তো বাসে করে যাচ্ছি—পাশে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। দু-একটা টুকটাক কথার পরই হাসিমুখে বলি, ভাই সাহেব, আমার নাম হচ্ছে এই...আপনার নামটা?

মানুষ তার এক জীবনে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি শোনে তা হচ্ছে তার নিজের নাম। যতবারই শোনে ততবারই তার ভালো লাগে। পৃথিবীর মধুরতম শব্দ হচ্ছে নিজের নাম। পৃথিবীর দ্বিতীয় মধুরতম শব্দ খুব সম্ভব "ভালবাসি"।

'কী ব্যাপার, নাম বলছেন না কেন? প্রশ্ন কানে যাচ্ছে না?'

'স্যার যাচ্ছে।'

'তা হলে জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

আমি খুকখুক করে কাশলাম। অস্পষ্ট ধরনের কাশি। নার্ভাসনেস কাটানোর জন্যে এজাতীয় কাশি পৃথিবীর আদিমানব বাবা আদমও আড়চোখে বিবি হাওয়ার দিকে তাকিয়ে কেশেছিলেন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারটা—এই সাড়ে সাত ঘণ্টা আমি রমনা থানার এক বেঞ্চে বসে ছিলাম। আমি একা না, আমার সঙ্গে আরো লোকজন ছিল। তারাও আমার মতো ধরা খেয়েছে। এক এক করে তারা ওসি সাহেবের সঙ্গে ইন্টারভ্যু দিয়েছে। কেউ ছাড়া পেয়েছে, কেউ হাজতে ঢুকে গেছে। আমার ভাগ্যে কী ঘটবে বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমি বসে আছি ওসি সাহেবের সামনে। জেরা করতে করতে ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে কিছুটা ক্লান্ত। ঘন ঘন হাই তুলছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষদের হাই তোলার দৃশ্য অতি কুৎসিত। দেখতে ভালো লাগে না। এরা সব সময় স্মার্ট হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসবেন—ভদ্রলোক বসেছেন বাঁকা হয়ে। বসার ভঙ্গি দেখে মনে হয় গত সপ্তাহে পাইলসের অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের ঘা শুকায়নি। ওসি সাহেবের চেহারায় রসকষ নেই, মিশরের মমির মতো শুকনো মুখ। সেই মুখও খানিকটা কুঁচকে আছে। মনে হচ্ছে পাইলস ছাড়াও ওসি সাহেবের তলপেটে ক্রনিক ব্যথা আছে। এখন সেই ব্যথা হচ্ছে। তিনি ব্যথা সামাল দিতে গিয়ে মুখ কুঁচকে আছেন। খাকি পোশাক না পরে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলে তাঁকে কেমন লাগত তাই ভাবছি। ঠিক বুঝতে পারছি না। কোনো এক ঈদের দিনে এসে উনাকে দেখে যেতে হবে। সুযোগ-সুবিধা থাকলে কোলাকুলিও করব। পুলিশের সঙ্গে কোলাকুলির সৌভাগ্য এখনো হয়নি।

'বলুন, নাম বলুন। মুখ সেলাই করে বসে থাকবেন না।'

আমি আবারো কাশলাম। খাকি পোশাক পরা কাউকে আসল নাম বলতে নেই। তাদের বলতে হয় নকল নাম। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে ভুলভাল ঠিকানা দিতে হয়। বাসা যদি হয় মালিবাগ তা হলে বলতে হয় তল্লাবাগ। হিমু নামের বদলে তাঁকে ঝিমু বললে কেমন হয়? অনেকক্ষণ ঝিম ধরে আছি, কাজেই ঝিমু। সবচে ভালো হয় শত্রু-টাইপ কারোর নাম-ঠিকানা দিয়ে দেয়া। তেমন কারো নাম মনে পড়ছে না।

নাম শোনার জন্যে ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এবার তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হল। খাকি পোশাক পরা মানুষের ধৈর্য কম থাকে। উনি তাও মোটামুটি ভালোই ধৈর্য দেখিয়েছেন।

'নাম বলছেন না কেন? নাম বলতে অসুবিধা আছে?'

'জি না স্যার।'

'অসুবিধা না থাকলে বলুন—ঝেড়ে কাশুন।'

আমি ঝেড়ে কাশলাম, বললাম—হিমু।

'আপনার নাম হিমু?'

'ইয়েস স্যার।'

'আগে-পিছে কিছু আছে, না শুধুই হিমু?'

'শুধুই হিমু। বাবা হিমালয় নাম রাখতে চেয়েছিলেন, শর্ট করে হিমু রেখেছেন।'

'শর্ট যখন করলেনই আরো শর্ট করলেন না কেন? শুধু "হি" রেখে দিতেন।'

'কেন যে "হি" রাখলেন না আমি তো স্যার বলতে পারছি না। উনি কাছে-ধারে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম।'

'উনি কোথায়?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কোথায়। খুব সম্ভব সাতটা দোজখের যে কোনো একটায় তাঁর স্থান হয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওসি সাহেবের কুঁচকানো মুখ আরো কুঁচকে গেল। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষকে কখনো রাগাতে নেই।

'আপনার ধারণা আপনার বাবা দোজখে আছেন?'

'জি স্যার। ভয়ঙ্কর পাপী মানুষ ছিলেন। দোজখ-নসিব হবারই কথা। উনি ঠাণ্ডা মাথায় আমার মাকে খুন করেছিলেন। ৩০২ ধারায় কেইস হবার কথা। হয়নি। আমার তখন বয়স ছিল অল্প। তা ছাড়া বাবাকে অত্যন্ত পছন্দ করতাম।'

'আপনার ঠিকানা কী? স্থায়ী ঠিকানা।'

'স্যার, আমার স্থায়ী ঠিকানা হল পৃথিবী। দ্যা প্ল্যানেট আর্থ।'

ওসি সাহেব সেক্রেটারিয়েট টেবিলের মতো একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। তাঁর মুখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। মনে হয় তলপেটের ক্রনিক ব্যথাটা তাঁর হঠাৎ বেড়ে গেছে। তিনি থমথমে গলায় বললেন, ত্যাঁদড়ামি করছ? রোলারের এক ডলা খেলে ত্যাঁদড়ামি বের হয়ে যাবে। রোলার চেন?

'জি স্যার, চিনি।'

'আমার মনে হয় ভালো করে চেন না।'

পুলিশের লোকেরা যেমন অতি দ্রুত তুমি থেকে আপনি-তে চলে যেতে পারে তেমনি অতি দ্রুতই আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই-এ নেমে যেতে পারে। এই বেশ খাতির করে সিগারেট দিচ্ছে, লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ মুখ গম্ভীর করে তুমি শুরু করল, তারপরই গালে প্রচণ্ড থাবড়া দিয়ে শুরু করল তুই। তখন চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া গতি নেই।

আমি শঙ্কিত বোধ করছি। ওসি সাহেব হঠাৎ করে আপনি থেকে তুমি-তে চলে এসেছেন—লক্ষণ শুভ নয়। গালে থাবড়া পড়বে কিনা কে জানে। আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

'তোমার স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে পৃথিবী। দ্যা প্ল্যানেট আর্থ?'

'ইয়েস স্যার।'

'বোমা কীভাবে বানায় তুই জানিস?'

আমি আঁতকে উঠলাম—তুমি থেকে তুই-এ ডিমোশন হয়েছে। লক্ষণ খুব খারাপ। চার নম্বর বিপদ সঙ্কেত। ঘূর্ণিঝড় কাছেই কোথাও তৈরি হয়ে গেছে। এইদিকে চলে আসতে পারে। সমুদ্রগামী সকল নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হচ্ছে।

'কী, কথা আটকে গেছে যে? বোমা বানাবার পদ্ধতি জানিস? বোমা বানাতে কী কী লাগে?'

'নির্ভর করছে কী ধরনের বোমা বানাবেন তার ওপর। অ্যাটম বোমা বানাতে লাগে ক্রিটিকাল মাসের সমপরিমাণ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ। ফ্রি নিউট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হয়...'

'জর্দার কৌটা কীভাবে বানায়?'

'জর্দার কৌটা টাইপ বোমা বানাতে লাগে—পটাশিয়াম ক্লোরেট, সালফার, কার্বন এবং কিছু পটাশিয়াম নাইট্রেট। ক্ষেত্রবিশেষে ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যবহার না করলেই ভালো। ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করলে আপনাআপনি বোমা ফেটে যাবার আশঙ্কা থাকে। মনে করুন, আপনি জর্দার কৌটা পকেটে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ সম্পূর্ণ বিনা কারণে পকেটের বোমা ফেটে যাবে। ভয় পেয়ে আপনি দৌড়ে থানায় এসে দেখবেন, আপনার একটা পা উড়ে চলে গেছে। প্রচণ্ড টেনশানের জন্যে আপনি এক পায়েই দৌড়ে চলে এসেছেন। বুঝতে পারেননি?'

ওসি সাহেব হুঙ্কার দিলেন, রসিকতা করবি না ত্যাঁদড়ের বাচ্চা, লেবু কচলে যেমন রস বের করে—মানুষ কচলেও আমরা রস বের করি।

এইটুকু বলেই তিনি পেছন দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় ডাকলেন, আকবর, আকবর!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকবর কে, কে জানে? আমি ঝিম ধরে আকবরের জন্যে অপেক্ষা করছি। সাধারণত রাজা-বাদশার নাম বয়-বাবুর্চির মধ্যে বেশি দেখা যায়। চাকর-বাকর, বয়-বাবুর্চিদের নামের সত্তর ভাগ জুড়ে আছে—আকবর, শাহজাহান, জাহাঙ্গীর, সিরাজ।

আমার অনুমান সত্যি হল। আকবর বাদশা বের হয়ে এলেন। তার বয়স বার-তের। পরনে হাফপ্যান্ট। গায়ে হলুদ গেঞ্জি। আকবর বাদশা সম্ভবত ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম এখনো কাটেনি। ওসি সাহেব হুঙ্কার দিলেন, হেলে পড়ে যাচ্ছিস কেন? সোজা হয়ে দাঁড়া।

আকবর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিটপিট করে চারদিক দেখতে লাগল। ওসি সাহেব বললেন, চা বানিয়ে আন। হিমু সাহেবকে ফাস ক্লাস করে এককাপ চা বানিয়ে খাওয়া।

আকবর মাথা অনেকখানি হেলিয়ে সায় দিল। কয়েকবার চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে বিকট হাই তুলল। সে যেভাবে হেলতে দুলতে যাচ্ছে তাতে মনে হয় পথেই ঘুমিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

ওসি সাহেব আমার দিকে ফিরলেন। তিনিও অবিকল আকবরের মতো হাই তুলতে তুলতে বললেন, হিমু সাহেব, আপনি চা খান। চা খেয়ে ফুটেন। ফুটেন শব্দের মানে জানেন তো?

'জানি স্যার। ফুটেন হচ্ছে পগারপার হওয়া।'

'দ্যাটস রাইট। চা খেয়ে পগারপার হন। আর ত্যাঁদড়ামি করবেন না।'

'জি আচ্ছা, স্যার।'

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। ওসি সাহেব আপনি থেকে তুমি-তে নেমে আবার আপনি-তে ফিরে গেছেন। চা-টা খাওয়াচ্ছেন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। এত বোঝাবুঝির কিছু নেই। চা খেয়ে দ্রুত বিদেয় হয়ে যাওয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই জগতের অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা বোঝার চেষ্টা খুব বেশি করতে নেই। জগৎ চলছে, সূর্য উঠছে-ডুবছে, পূর্ণিমা-অমাবস্যা হচ্ছে, তেমনি অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাও ঘটছে। ঘটতে থাকুক না। সব বোঝার দরকার কী? বরফ জলে ভাসে। বরফও পানি, জলও পানি। তারপরেও একজন আরেকজনের উপর দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়ানোটা ইন্টারেস্টিং। তার পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা তেমন ইন্টারেস্টিং না।

মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে কিন্তু কোনো বাতাস লাগছে না। থানার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা। এক কোনায় টেবিলে ঝুঁকে বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বেশ নির্বিকার ভঙ্গি। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে। এই যে ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার এত কথা হল, তিনি একবারও ফিরে তাকাননি। থানার বাইরের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চি পাতা। সেখানে কয়েকজন পুলিশ বসে আছে। তাদের গল্পগুজব, হাসাহাসি কানে আসছে। থানার লকারে মুসল্লি-টাইপ কোনো ক্রিমিন্যালকে রাখা হয়েছে। সে বেশ উচ্চৈঃস্বরে নানান দোয়া-দরুদ পড়ছে। তার গলা বেশ মিষ্টি।

আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি এবং "ত্যাঁদড়" শব্দের মানে কী তা ভেবে বের করার চেষ্টা করছি। ত্যাঁদড়ের বাচ্চা বলে গালি যেহেতু প্রচলিত, কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে ত্যাঁদড় কোনো একটা প্রাণীর নাম। বাঁদর জাতীয় প্রাণী কি? বাঁদর যেমন বাঁদরামি করে, ত্যাঁদড় করে ত্যাঁদড়ামি। ওসি সাহেবকে ত্যাঁদড় শব্দের মানে কি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে? উনি রেগে গিয়ে আবার আপনি থেকে তুই-এ নেমে যাবেন না তো? এই রিস্ক নেয়া কি ঠিক হবে? ঠিক হবে না। তারচে বরং বাংলা ভালো জানে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়া যাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তিনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। মারিয়ার তা-ই ধারণা।

আকবর বাদশা চা নিয়ে এসেছে। যেসব জায়গার নামের শেষে স্টেশন যুক্ত থাকে সে সব জায়গার চা কুৎসিত হয়—যেমন বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, পুলিশ স্টেশন। অদ্ভুত কাণ্ড—আকবর বাদশার চা হয়েছে অসাধারণ। এক চুমুক দিয়ে মনে হল—গত পাঁচ বছরে এত ভালো চা খাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নি। কড়া লিকারে পরিমাণমতো দুধ দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। চিনি যতটুকু দরকার তারচে সামান্য বেশি দেয়া হয়েছে। মনে হয় এই 'বেশি'র দরকার ছিল। গন্ধটাও কী সুন্দর! চায়ে যে আলাদা গন্ধ থাকে তা শুধু রূপাদের বাড়িতে গেলে বোঝা যায়। তবে রূপাদের বাড়ির চায়ে লিকার থাকে না। খেলে মনে হয় পীর সাহেবের পানিপড়া খাচ্ছি। আমি আকবর বাদশাহর চায়ে গভীর আগ্রহে চুমুক দিচ্ছি। আকবর বাদশা আমার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত হাই তুলে যাচ্ছে। সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেন বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় চা শেষ হবার পর কাপ হাতে নিয়ে বিদেয় হবে। যদিও এমন কোনো মূল্যবান চায়ের কাপ না। বদখত ধরনের কাপ। খানিকটা ফাটা। ফাটা কাপে চা খেলে আয়ু কমে—খুব সুন্দর কাপে চা খেলে নিশ্চয়ই আয়ু বাড়ে। রূপাদের বাড়িতে চা খেয়ে আয়ু বাড়াতে হবে। ওদের বাড়িতেই পৃথিবীর সবচে সুন্দর কাপে চা দেয়া হয়।

ওসি সাহেব বললেন, চা-টা কেমন লাগল?

আমি বললাম, স্যার ভালো।

'কেমন ভালো?'

'খুব ভালো। অসাধারণ। জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো।'

'কোন কবিতা?'

আমি গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলাম

> এইসব ভালো লাগে   জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
> আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখে, আমার বিমর্ষ ম্লান
> চুল—
> এই নিয়ে খেলা করে জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল
> পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে,

AMARBOI.COM

ওসি সাহেব বললেন, আরেক কাপ খাবেন?

'জি না।'

'কবিতার মতো চা যখন—গোটা পাঁচ-ছয় কাপ খান।'

'পরের কাপটা হয়তো ভালো হবে না। আমার ধারণা চা এখানে ভালো হয় না। আজ হঠাৎ করে হয়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর পড়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটি বলে, এক লক্ষ কাপ চা যদি বানানো হয় তা হলে এক লক্ষ কাপ চায়ের ভেতর এক কাপ চা হবে অসাধারণ।'

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সায়েন্স কপচাবি না। সায়েন্স গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, জি আচ্ছা, স্যার।

'এখন বল্, তোদের বোমা বানাবার কারখানাটা কোথায়? সাঙ্গপাঙ্গদের নাম বল্। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝেড়ে কাশবি, নয়তো ঠেলার চোটে চা যে খেয়েছিস, সেই চা নাক-মুখ দিয়ে বের হবে। শুরু কর্।'

কী সর্বনাশের কথা—আমার ব্রহ্মতালু শুকিয়ে ওঠার উপক্রম হল। এ কী সমস্যায় পড়া গেল! ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, নিজ থেকে কথা বলতে চাইলে ভালো কথা, নয়তো রোলারের গুঁতা দিয়ে সব বের করব। নাভির এক ইঞ্চি উপরে একটা গুঁতা দিলে আর কিছু দেখতে হবে না। গত জন্মের কথাও বের হয়ে আসবে।

আমি শুকনো গলায় বললাম, স্যার, একটা টেলিফোন করতে পারি?

ওসি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, কাকে টেলিফোন করবি? কোনো মন্ত্রীকে? পুলিশের আইজিকে? আর্মির কোনো জেনারেলকে? টেলিফোন এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান—

তোকে অ্যারেস্ট করার জন্য ধমক খেতে খেতে আমার অবস্থা কাহিল হবে—বদলি করে দেবে চিটাগাং হিলট্র্যাক্টে? শান্তিবাহিনীর বোমা খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে থাকব?

'স্যার, আমি খুবই লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রায় শিম্পাঞ্জীদের কাছাকাছি। হাইয়ার লেভেলের কাউকে চিনি না।'

'তা হলে কাকে টেলিফোন করতে চাচ্ছিস?'

'এমন কাউকে টেলিফোন করব যে আমার চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেবে—'

'ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট?'

'জি।'

'তোর টেলিফোনের পর হোম মিনিস্টার আমাকে ধমকাধমকি করবে না?'

'জি না, স্যার। সম্ভাবনা হচ্ছে, একটা মেয়ে খুব মিষ্টি গলায় আপনাকে আমার সম্পর্কে দু-একটা ভালো কথা বলবে।'

'মেয়েটি কে? প্রেমিকা?'

'জি না—আমি লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রেম করার যোগ্যতা আমার নেই। প্রেম অতি উচ্চস্তরের ব্যাপার।'

'তোর যোগ্যতা কী?'

'আমার একমাত্র যোগ্যতা আমি হাঁটতে পারি। কেউ চাইলে ছায়ার মতো পাশে থাকি। আমি হচ্ছি স্যার ছায়া-সঙ্গী।'

ওসি সাহেব গম্ভীর মুখে টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। থানার ঘড়িতে রাত একটা বাজে। কাকে টেলিফোন করব বুঝতে পারছি না। রূপাকে করা যায়। এত রাতে টেলিফোন করলে রূপা ধরবে না। রূপার বাবা ধরবেন এবং আমার নাম শুনেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখবেন। ফুপুর বাসায় করা যায়। ফুপু টেলিফোন ধরবেন। ঘুম-ঘুম স্বরে বলবেন, কে, হিমু? কী ব্যাপার?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করার পর তিনি হাই তুলতে তুলতে বলবেন, তোকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এটা তো নতুন কিছু না। প্রায়ই ধরে। রাতদুপুরে টেলিফোন করে বিরক্ত করছিস কেন?

এই দুইজন ছাড়া আর কাউকে টেলিফোন করা সম্ভব না, কারণ আর কারো টেলিফোন নাম্বার আমি জানি না। মারিয়াকে করব? এমনিতেও ওর খোঁজ নেয়া দরকার। দু শ কিলোমিটার স্পিডে চলার পর কী হল? পৌঁছতে পেরেছে তো ঢাকায়? পথে কোনো বোমা-টোমা খায়নি? মারিয়ার টেলিফোন নাম্বারটা মনে করতে হবে। পাঁচ বছর আগে একটা পদ্ধতি শিখিয়েছিল। এসোসিয়েশন অব আইডিয়া পদ্ধতি। নাম্বারটা হচ্ছে প্রথমে আট তারপর আমি, তুমি, আমি, তুমি, আমরা। আমি হচ্ছে ১, তুমি হচ্ছে ২, আমরা হচ্ছে ৩; তা হলে নাম্বারটা হল ৮ ১২ ১২ ৩.

ডায়াল করতেই ওপাশ থেকে মারিয়া ধরল। আমি খুশি খুশি গলায় বললাম, কেমন আছিস?

মারিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, কেমন আছিস মানে? আপনি কে? হু আর ইউ?

'আমি হিমু।'

'রাত একটার সময় টেলিফোন করেছেন কেন?'

'খোঁজ নেবার জন্যে—তোর দু শ কিলোমিটার স্পিডে ভ্রমণ কেমন হল?

'রাত একটার সময় সেটা টেলিফোন করে জানতে হবে?'

'তোর টেলিফোন নাম্বারটা মনে আছে কিনা সেটাও ট্রাই করলাম। এক কাজে দু কাজ।'

'এখনো তুই তুই করছেন?'

'আচ্ছা, আর করব না।'

'কোত্থেকে টেলিফোন করছেন?'

'রমনা থানা থেকে। পুলিশের ধারণা আমি বোমা-টোমা বানাই। ধরে নিয়ে এসেছে। এখন জেরা করছে।'

'ধোলাই দিয়েছে?'

'এখনো দেয়নি। মনে হয় দেবে। তুই কি একটা কাজ করতে পারবি? ওসি সাহেবকে মিষ্টি গলায় বলবি যে বোমা-টোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি অতি সাধারণ, অতি নিরীহ হিমু। একটুর জন্যে মহাপুরুষ হতে গিয়ে হতে পারিনি।'

'আপনি তো সারা জীবন নানান ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছেন—পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া তো ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা। বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?'

'এক জায়গায় একটা দাওয়াত ছিল। বলেছিলাম রাত করে যাব। ভদ্রলোক না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।'

'ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বারটা দিন। টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি আপনি পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। আসতে পারবেন না।'

'তোর কি ধারণা বাংলাদেশের সবার ঘরেই টেলিফোন আছে?'

'হিমু ভাই, আপনি এখনো কিন্তু তুই তুই করছেন। কেন করছেন তাও আমি জানি। মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনি আনন্দ পান। কখনো তুমি, কখনো তুই বলে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। এক সময় আমি নিতান্তই একটা কিশোরী ছিলাম। বিভ্রান্ত হয়েছি। বিভ্রান্ত হবার স্টেজ আমি পার হয়ে এসেছি। অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। রাখি?'

'আচ্ছা—তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে কী করছিলি?

'গান শুনছিলাম।'

'কার গান?'

'নীল ডায়মন্ড। গানের কথা শুনতে চান?'

'বল্।'

"What a beautiful noise
coming out from the street
got a beautiful sound
its got a beautiful beat
its a beautiful noise."

'কথা তো শুনলেন। এখন তা হলে রাখি?'

'আচ্ছা।'

খট শব্দ করে মারিয়া টেলিফোন রেখে দিল।

ওসি সাহেব বললেন, টেলিফোনে কোনো মন্ত্রী-মিনিস্টার পাওয়া গেল?

'জি না।'

'আপনার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবে এমন কাউকেও পাওয়া গেল না?'

ওসি সাহেব আবার তুই থেকে আপনি-তে চলে এসেছেন। জোয়ার-ভাটার খেলা চলছে। খেলার শেষটা কী কে জানে। ওসি সাহেব বললেন, কী, কথা বলুন, সুপারিশের লোক পাওয়া গেল না?

'একজনকে পেয়েছিলাম, সে সুপারিশ করতে রাজি হল না।'

'খুবই দুঃসংবাদ।'

'জি, দুঃসংবাদ।'

'আমাদের থানার রেকর্ড অফিসার বলল, আপনাকে এর আগেও কয়েকবার ধরা হয়েছে।'

'উনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিশাচর প্রকৃতির মানুষ তো—রাতে হাঁটি। রাতে যারা হাঁটে পুলিশ তাদের পছন্দ করে না। পুলিশের ধারণা রাতে হাঁটার অধিকার শুধু তাদেরই আছে।'

'বিটের কনস্টেবলরা বলছিল আপনার নাকি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। সত্যি আছে নাকি?'

'নেই স্যার। হাঁটার ক্ষমতা ছাড়া আমার অন্য কোনো ক্ষমতা নেই।'

'রোলারের দুই গুঁতা জায়গামতো পড়লে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বের হয়ে যায়।'

'যথার্থ বলেছেন স্যার।'

'আপনার প্রতি আমি সামান্য মমতা অনুভব করছি। কেন বলুন তো?'

'আমার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই—থাকলে সেই ক্ষমতা অ্যাপ্লাই করে আমার মতো অভাজনের প্রতি আপনার মমতার কারণ বলে দিতে পারতাম।'

'আপনার প্রতি মমতা বোধ করছি, কারণ আমার জানামতে আপনি হচ্ছেন থানায় ধরে আনা প্রথম ব্যক্তি, যার পক্ষে কথা বলার জন্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ এমন এক দেশ, যে দেশে পুলিশের হাতে কেউ ধরা পড়লেই, মন্ত্রী-মিনিস্টার, সেক্রেটারি, মিলিটারি জেনারেলের একটা সাড়া পড়ে যায়। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে থাকে। শুনুন হিমু সাহেব, চলে যান। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।'

'থ্যাংক য়্যু স্যার।'

'যাবেন কীভাবে? গাড়ি-রিকশা সবই তো বন্ধ।'

'হেঁটে হেঁটে চলে যাব। কোনো সমস্যা নেই।'

'আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। পুলিশের জিপ দিচ্ছি, আপনি যেখানে যেতে চান নামিয়ে দেবে। যাবেন কোথায়?'

'কাওরান বাজার। আসগর নামের এক ভদ্রলোকের বাসায় আমার দাওয়াত।'

'যান, দাওয়াত খেয়ে আসুন।'

আমি পুলিশের জিপে উঠে বসলাম। সেন্ট্রি পুলিশ আমাকে তালেবর সাইজের কেউ ভেবে স্যালুট দিয়ে বসল। রোলারের গুঁতার বদলে স্যালুট। বড়ই রহস্যময় দুনিয়া!

AMARBOI.COM

৩

পুলিশের গাড়ি আমাকে কাওরান বাজার নামিয়ে দিয়ে গেল। ড্রাইভারের গায়েও খাকি পোশাক। সে বেশ আদবের সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে নামতে সাহায্য করল। তারপরই এক স্যালুট। আমি অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকালাম—কেউ দেখে ফেলছে না তো? পুলিশ আদবের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামাচ্ছে, স্যালুট দিচ্ছে—খুবই সন্দেহজনক। রাত প্রায় দুটা—কারো জেগে থাকার কথা না। আন্দোলনের সময় সারা দিন লোকজন ব্যস্ত থাকে। টেনশানঘটিত ব্যস্ততা। রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকার খবর শোনার পর সবার মধ্যে খানিকটা ঝিম ঝিম ভাব চলে আসে। আন্দোলনের খবর যত ভয়াবহই হোক, সবাই খুব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে চলে যায়। দেশে কোনো আন্দোলন চলছে কিনা তা বোঝার উপায় হল রাত বারটার পর পথে বের হওয়া। যদি দেখা যায় সব খা খা করছে, তা হলে বুঝতে হবে কোনো আন্দোলন চলছে। পানের দোকানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভিড় জমে থাকলেও আন্দোলন হচ্ছে ধরে নেওয়া যায়। বিবিসি-র দিকে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে লোকজন কান পেতে থাকে। আমার নিজের ধারণা, কোনো এক এপ্রিল-ফুলের রাতে বিবিসি যদি মজা করে বলে—বাংলাদেশে সরকার পতন হয়েছে, তা হলে সরকারের পতন হয়ে যাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাড়ি ছেড়ে অতি দ্রুত কোনো

আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবেন। কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করবে না। বাংলাদেশ টিভি থেকে বলা হবে—বিবিসির খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতায় কে আছেন তা তাঁরা বলেননি বলে এই বিষয়ে আমরাও কিছু বলতে পারছি না।

আমার চারপাশে কেউ ছিল না। একটা কুকুর ছিল, সে পুলিশের গাড়ি দেখে দ্রুত ডাস্টবিনের আড়ালে চলে গেল। যতক্ষণ গাড়ি থেমে রইল ততক্ষণ আর তাকে দেখা গেল না। গাড়ি চলে যাবার পরই সে মাথা বের করে আমাকে দেখল। আমি বললাম, এই আয়। সে কিছু সন্দেহ কিছু শঙ্কা নিয়ে বের হয়ে এল। লেজ নাড়ছে না—এর অর্থ হচ্ছে আমার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারছে না। পুলিশের গাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায় তার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষেও সম্ভব না। কুকুরের সঙ্গে আমি কিছু কথাবার্তা চালালাম।

'কী রে, তোর খবর কী? রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে?'

(কুকুর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। ভাবছে।)

'তুই কি এই দিকেরই? রাতে ঘুমাস কোথায়?'

(এখন লেজ একটু নড়ল।)

'আমি গলির ভেতর ঢুকব। একা ভয় ভয় লাগছে। তুই আমাকে একটু এগিয়ে দে।'

(লেজ ভালোমতো নড়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে সে গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে।)

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিস কেন? তোর পায়ে কী হয়েছে?'

(প্রবল লেজ নাড়ার সঙ্গে এইবার সে কুঁই কুঁই করল। অর্থাৎ পায়ে কী সমস্যা সেটা বলল। কুকুরের ভাষা জানা নেই বলে বুঝতে পারলাম না।)

মনে হয় তার পায়ে কেউ গরম ভাতের মাড় ঢেলে দিয়েছে। গরম মাড় কিংবা গরম পানি কুকুরের গায়ে ফেলে আমরা বড় আনন্দ পাই। ব্যথা-যন্ত্রণায় সে ছটফট করে—দেখে আমাদের বড়ই ভালো লাগে। মানুষ হিসেবে সমগ্র পশুজগতে আমরা শ্রেষ্ঠ, সেটা আবারো প্রমাণিত হয়।

আমার ধারণা, নিম্নশ্রেণীর পশু বলে আমরা যাদের আলাদা করছি, তাদের আলাদা করা ঠিক হচ্ছে না। মানুষ হিসেবে আমরা এমন কিছু এগিয়ে নেই। আমাদের বুদ্ধি বেশি বলে আমরা অহঙ্কার করি—ওদের যে বুদ্ধি কম সেটা কে বলল? "আমাদের লজিক আছে, ওদের নেই?"—এটাও কি নিতান্তই একটা বাজে কথা না? আমরা কি কখনো ওদের মাথার ভেতর ঢুকতে পেরেছি যে বলব—ওদের লজিক নেই? "আমাদের ভাষা আছে, ওদের নেই?"—আরেকটি নিতান্তই হাস্যকর কথা। ওদের ভাষা অবশ্যই আছে। একটা কুকুর অন্য একটা কুকুরের সাথে নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে। আমরা যখন শুনি তখন মনে হয় শুধুই ঘেউ ঘেউ করছে। দুজন চাইনিজ কিংবা জাপানিজকে যখন কথা বলতে শুনি তখন মনে হয় এরা কিছুই বলছে না, শুধু 'চেং বেং' টাইপ শব্দ করছে। ওদের চেং বেং-এর সঙ্গে ঘেউ ঘেউ-এর তফাতটা কোথায়?

পশুদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, চিন্তাশক্তি আছে। সব জেনেও এদের আমরা অস্বীকার করি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে। অস্বীকার না করলে এদের হত্যা করে আমরা খেতে পারতাম না। আমাদের লজ্জা করত।

খোঁড়া কুকুরটা আমার আগে আগে যাচ্ছে। মনে হয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সে আগেও আমাকে এ অঞ্চলে আসতে দেখেছে। সে মনে করে রেখেছে। সে জানে আমি কোথায় যাব, তাই আগে আগে নিয়ে যাচ্ছে। নয়তো পেছনে পেছনে আসত। পথে আরো কয়েকটা কুকুর পাওয়া গেল। তারা ঘেউ ঘেউ করে ওঠার আগেই আমার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করল। হয়তো বলল, "ঝামেলা করিস না, আমার চেনা লোক"।

তারাও ঝামেলা করল না। মাথা উঁচু করে আমাকে দেখে আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমার কুকুরটা আমার দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে কয়েকবার ঘেউ ঘেউ করল। এর অর্থ সম্ভবত—"রাতদুপুরে এভাবে হাঁটাহাঁটি করবে না। দেশের অবস্থা ভালো না। আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। বড় আফসোস! সরকার আর বিরোধী দলে কবে যে মিটমাট হবে!"

আমি কুকুরের পেছনে পেছনে আসগর সাহেব যে গলিতে থাকেন সেই গলি বের করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা জটিল। শাখা নদীর উপশাখা থাকে—সেই উপশাখা থেকেও শাখা বের হয়, যাকে বলা চলে উপ-উপশাখা। আসগর সাহেবের গলিও তেমনি উপ-উপগলি। ঢাকা শহরের সবচে সরু এবং সবচে দীর্ঘ গলি। শুধু যে দীর্ঘ গলি তা না, সবচে দীর্ঘ ডাস্টবিনও। গলির দুপাশের বাসিন্দারা তাদের যাবতীয় আবর্জনা কষ্ট করে দূরে নিয়ে ফেলে না, গলিতেই ঢেলে দেয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তাতে কিছু মনে করে না। সম্ভবত তাদের খাতায় গলিটির নাম নেই। নাম না থাকাটাও আশ্চর্যের কিছু না। কারণ গলিটার আসলেই কোনো নাম নেই। কোনো একদিন এই গলিতে বিখ্যাত কেউ জন্মাবে, তখন হয়তো নাম হবে। কুখ্যাতদের গলির নাম হলে অবিশ্যি এখনই এই গলির নাম রাখা যায়—"কানা কুদ্দুস লেন"। কানা কুদ্দুস কাওরান বাজার এলাকার ত্রাস। মানুষ-খুনকে সে মোটামুটি একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার মোটামুটি ভাব আছে। দিনের বেলা সে বেঙ্গল মোটর নামে মোটর পার্টসের দোকানে বসে থাকে। সে অতি বিনয়ী, আচার-ব্যবহার বড়ই মধুর। দেখা হলেই সে আমাকে প্রায় জোর করে চা, মোগলাই পরোটা খাওয়ায়।

গলিটা আমার খুব প্রিয়, কারণ এই গলিতে রিকশা ঢুকতে পারে না। এখানে সব সময়ই হরতাল। শিশুরা প্রায়ই ইটের স্টাম্প বানিয়ে ক্রিকেট খেলে। এখানে এলেই আমি আগ্রহ নিয়ে তাদের খেলা দেখি। একবার আমি তাদের আম্পায়ার হিসেবেও কাজ করেছি। পক্ষপাতদুষ্ট আম্পায়ারিং-এ একটা রেকর্ড সেবার করেছিলাম। বোল্ড আউট হয়ে গেছে, ইটের স্টাম্প বলের ধাক্কায় উড়ে চলে গেছে। আমি তাকিয়ে দেখি শিশু ব্যাটস্‌ম্যান ব্যাট হাতে কাঁদো কাঁদো চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। আমি তখন অবলীলায় কঠিন মুখে বলেছি—নো বল হয়েছে, আউট হয় নি। শিশু ব্যাটস্‌ম্যানের চোখে গভীর আনন্দ। ফিল্ডাররা চেঁচামেচি করছে। আমি দিয়েছি ধমক—তোমরা বেশি জান? আমি ঢাকা লীগের আম্পায়ার। আমার চোখের সামনে নো বল করে পার হয়ে যাবে, তা হবে না। স্টার্ট দ্য গেম। নো হাংকি পাংকি।

এরা আমার হুকুম মেনে নিয়েছে। বয়স্ক একজন মানুষ তাদের খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েছে—এতেই তারা আনন্দিত। বয়স্ক মানুষদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে হয়। শিশুরা জানে বয়স্ক মানুষরা ভুল করে, জেনেশুনে ভুল করে। শিশুরাই শুধু জেনেশুনে কোনো ভুল করে না।

আসগর সাহেবকে তাঁর বাসায় পাওয়া গেল না। দরজায় মোটা তালা ঝুলছে। এরকম হবার কথা না। আসগর সাহেব রুটিন-বাঁধা জীবনযাপন করেন। ন টার আগেই জিপিওতে চলে যান। ফেরেন সন্ধ্যায়। রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া শেষ করেন। ঘর থেকে বের হন না। গত আঠার বছরে এই রুটিনের ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর নিজের কোনো সংসার নেই। জীবনের একটা পর্যায়ে হয়তো বিয়ে করে সংসার করার কথা ভেবেছেন। এখন ভাবেন না। ভাবার কথাও না। এখন হয়তো মৃত্যুর কথা ভাবেন। একদিন মৃত্যু হবে, যেহেতু সৎ জীবনযাপন করেছেন, সেহেতু মৃত্যুর পর বেহেশত-নসিব হবেন। সেখানে সুখের সংসার পাতবেন। এই জীবনে যা করা হয়নি, পরের জীবনে তা করা হবে।

ভদ্রলোক যে অতি সৎভাবে জীবনযাপন করেছেন তা সত্যি। চিঠি লিখে সামান্য যা রোজগার করেছেন—তার সিংহভাগ দেশে পাঠিয়েছেন। একবেলা খাওয়া অভ্যাস করেছেন। এতে নাকি স্বাস্থ্য ভালো থাকে। স্বাস্থ্য ভালো থাকুক বা না থাকুক, খরচ অবশ্যই বাঁচে। তিনি খরচ বাঁচিয়েছেন। খরচ বাঁচিয়েছেন বলেই ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা করাতে পেরেছেন। তারা আজ প্রতিষ্ঠিত।

এক ভাই সরকারি ডাক্তার। কুড়িগ্রাম সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার। অন্য ভাই এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছোট ভাইরা এখন বড় ভাইয়ের পেশা নিয়ে লজ্জা বোধ করে। তাদের খুব ইচ্ছা বড়ভাই দেশের বাড়িতে গিয়ে স্থায়ী হোন। দেশের বাড়ি ভাইরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলে ঠিকঠাক করেছে। পুকুর কাটিয়ে মাছ ছেড়েছে। জমিজমাও কিছু কেনা হয়েছে। আসগর সাহেব নিজেও চান গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে। তাঁর বয়স হয়েছে—শরীর নষ্ট হয়েছে, খুবই ক্লান্ত বোধ করেন। বড় ধরনের অসুখবিসুখও হয়েছে হয়তো। ডাক্তার দেখান না বলে অসুখ ধরা পড়েনি। শরীরের এই অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে থাকাটা আসগর সাহেবের জন্যে আনন্দের ব্যাপার হবার কথা। ভাইবোনরা তাঁকে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রদ্ধা করে। এই মানুষটি তাদের বড় করার জন্যে বিয়েটিয়ে কিছু করেননি—সারা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, এই সত্য তারা সব সময় স্বীকার করে।

আলি আসগর দেশে যেতে পারছেন না। বিচিত্র এক ঝামেলায় তিনি ফেঁসে গেছেন। ঝামেলাটা হয়েছে সাত বৎসর আগে। দিন-তারিখ মনে নেই তবে বৃহস্পতিবার ছিল এটা তাঁর মনে আছে। তিনি তাঁর নিজের জায়গায় টুলবক্স নিয়ে বসে আছেন, লুঙ্গি ও ফতুয়া পরা এক লোক এসে সামনে উবু হয়ে বসল। সে কিছু টাকা মনিঅর্ডার করতে চায়। টাকার পরিমাণ সাত হাজার এক টাকা। লোকটি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, অনেক কষ্ট কইরা ট্যাকাগুলান জমাইছি ভাইসাব—পরিবাররে পাঠামু। ট্যাকা কেমনে পাঠায় জানি না। আপনে ব্যবস্থা কইরা দেন। আপনের পায়ে ধরি।

বলে সত্যি সত্যি সে তাঁর পা চেপে ধরল। আসগর সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, করেন কী, করেন কী!

'গরিব মানুষ ভাইসাব, টেকাগুলান সম্বল। বড় কষ্ট কইরা জমাইছি, কেমনে পাঠামু জানি না।'

'আপনার নাম কী?'

'মনসুর।'

'মনসুর, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোনো সমস্যা না। ঠিকমতো নাম-ঠিকানা বলেন। কার নামে পাঠাবেন?'

'পরিবারের নামে।'

'পরিবারের নাম কী?'

'জহুরা খাতুন।'

'গ্রাম, পোস্টাপিস সব বলেন...। আচ্ছা দাঁড়ান, মনিঅর্ডার ফরম আগে নিয়ে আসি।'

মনিঅর্ডার ফরম আনতে গিয়ে দেখা গেল বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। সব বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবারের আগে মনিঅর্ডার করা যাবে না। আসগর সাহেব বললেন, ভাই, আপনি শনিবার সকাল দশটার মধ্যে চলে আসবেন। আমি মনিঅর্ডার করে দেব। কোনো টাকা লাগবে না। বিনা টাকায় করব। চা খাবেন? চা খান।

লোকটা চা খেল। তার মনে হয় কিছু সমস্যা আছে। চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ কাঁদল। চলে যাবার সময় আসগর সাহেবকে অবাক করে দিয়ে বলল, ভাইজান, ট্যাকাগুলান সাথে নিয়া যাব না। আমার অসুবিধা আছে। আপনের কাছে থাউক। আমি শনিবারে আসমু।

আসগর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার কাছে টাকা রেখে যাবেন? এতগুলো টাকা?

লোকটা আগের মতো অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে বলল, জি ভাইজান। কোনো উপায় নাই। গরিবের বহুত কষ্টের ট্যাকা। আপনের হাতে দিয়া গেলাম ভাইজান—আমি শনিবারে আসমু।

লোকটি আর আসেনি। আসগর সাহেব সাত বৎসর টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। লোকটা আসছে না বলে তিনি দায়মুক্ত হয়ে দেশের বাড়িতে যেতে পারছেন না। সম্পূর্ণ অকারণে তিনি অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের নিজেদের তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তারা নিজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অদ্ভুত সব সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। নিজেকে কিছুতেই অন্যের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে না। হাজার চেষ্টা করেও না।

আসগর সাহেবের ঘর দোতলায়। একতলায় দর্জির একটা দোকান—দর্জির নাম বদরুল মিয়া। বদরুল মিয়া পরিবার নিয়ে দোতলায় থাকেন। তিনি তাঁর একটা ঘর সাবলেট দিয়েছেন আলি আসগরকে। রাত আড়াইটা বাজে—এই সময়ে বদরুল মিয়াকে ডেকে তুলে আসগর সাহেব সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। বদরুল মিয়া অবিশ্যি এমনিতে খুব মাইডিয়ার ধরনের লোক। বয়স পঞ্চাশের ওপরে। ছোটখাটো হাসিখুশি মানুষ। মাথায় টুপি পরে হাসিমুখে অনবরত ঘটাং ঘটাং করে পা-মেশিন চালান। বদরুল মিয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি মেয়েদের ব্লাউজ ছাড়া অন্য কিছু বানাতে পারেন না। কিংবা পারলেও বানান না। ব্লাউজ মনে হয় তিনি ভালো বানান। তাঁর দোকানে মেয়েদের ভিড় লেগেই থাকে। মেয়েরাও তাঁকে খুব পছন্দ করে। তাঁকে বদরুল চাচা না ডেকে 'নূর চাচা' ডাকে। কারণ বদরুল মিয়ার চেহারা দেখতে অনেকটা অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের মতো।

আমি বদরুল মিয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম—নূর চাচা আছেন নাকি? সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বদরুল মিয়া বের হয়ে এলেন। মনে হয় জেগেই ছিলেন। গভীর রাতে ডেকে তোলার জন্যে তাঁকে মোটেই বিরক্ত মনে হল না। বরং মনে হল তিনি আমাকে দেখে গভীর আনন্দ পেয়েছেন। মেয়েদের ব্লাউজের কারিগররা হয়তো আনন্দময় ভুবনে বাস করেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, ব্যাপার কী হিমু ভাই?

'আসগর সাহেবের খোঁজে এসেছিলাম ঘর তালাবন্ধ। খবর জানেন কিছু?'

'জি না, কিছুই জানি না। আজ দোকান বন্ধ করেছি বারটার সময়। তখনো দেখি আসেন নাই। এ রকম কখনো হয় না। উনি সন্ধ্যার সময় চলে আসেন। আমি নিজেও চিন্তাযুক্ত। দেশের অবস্থা ভালো না। আবার দিয়েছে হরতাল।'

'বারটার সময় দোকান বন্ধ করেছেন, আপনার কাজের চাপ মনে হয় খুব বেশি।'

বদরুল মিয়া আনন্দে হেসে ফেলে বললেন, সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। ব্যবসা মাশাল্লাহ ভালো হচ্ছে। আন্দোলনটান্দোলনের সময় মেয়েছেলেরা কাপড় বেশি বানায়।

'কাপড় না, ব্লাউজ মনে হয় বেশি বানায়।'

বদরুল মিয়া আবারো মিষ্টি করে হাসলেন। আমি বললাম, আচ্ছা নূর চাচা, আপনার এই অঞ্চলের সব মেয়েদের বুকের মাপ আপনি জানেন, তাই না?

'এইটা জানতেই হয়—মাপ লাগে।'

'এই অঞ্চলের সবচে বিশালবক্ষা তরুণীর নাম কী?'

বদরুল মিয়া আবারো বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিছু বললেন না। গলা খাঁকারি দিয়ে হাসি বন্ধ করলেন। আমি বললাম, প্রফেশনাল এথিক্স। নাম বলবেন না। খুব ভালো। নূর চাচা, যাই?

'আসগর ভাইকে কিছু বলতে হবে?'

'জি না, কিছু বলতে হবে না।'

'একটু সাবধানে যাবেন হিমু ভাই। সময় খারাপ—গত রাত তিনটার দিকে একটা মার্ডার হয়েছে। কানা কুদ্দুসের কাজ। মাথা কেটে নিয়ে গেছে। শুধু বডি ফেলে গেছে।'

'কানা কুদ্দুস আমাকে বোধহয় মার্ডার করবে না। যাই, কেমন? এত রাতে ঘুম ভাঙালাম—কিছু মনে করবেন না।'

'জি না, এটা কোনো ব্যাপার না। জেগেই ছিলাম, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলাম। সময় তো ভাই হয়ে এসেছে—আল্লাহ্‌পাকের সামনে দাঁড়াব—কী বলব এই নিয়ে চিন্তাযুক্ত থাকি। তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে ওনার দরবারে কান্নাকাটি করি।'

গলিতে নেমে দেখি, কুকুরটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সে আমাকে নিয়ে এসেছে, কাজেই নিয়ে যাবার দায়িত্বও বোধ করছে। আমি কুকুরটাকে বললাম, চল যাই। যার খোঁজে এসেছিলাম তাকে পাওয়া গেল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। আমি হাঁটছি, সে আসছে আমার পেছনে পেছনে—তার সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে। বার বার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হচ্ছে।

'আসগর সাহেবের জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে, কী করি বল তো?'

(কুকুরটা মাথা নাড়ল। আমার চিন্তা মনে হয় তাকেও স্পর্শ করেছে।)

'আমার কী ধারণা জানিস? আমার ধারণা তিনিও আমার মতো পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। জিরো পয়েন্ট জায়গাটা হচ্ছে গণ্ডগোলের আখড়া। বের হয়েছে আর পুলিশ ধরেছে। নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের গুঁতা খেয়ে পুলিশ হাজতে হাত-পা এলিয়ে মনে হয় পড়ে আছেন। তোর কী মনে হয়?'

(ঘেউ ঘেউ উ উ উ। কুকুরের ভাষায় এই শব্দের কী মানে কে বলবে!)

'আমার ইনটুইশান বলছে রমনা থানায় গেলে আসগর সাহেবের খোঁজ পাব। তবে যেতে ভয় লাগছে। প্রথমবার ভাগ্যগুণে ছাড়া পেয়েছি, আবার পাব কিনা কে জানে। অন্যের ব্যাপারে আমার ইনটুইশান কাজ করে। নিজের ব্যাপারে কাজ করে না। এই হচ্ছে সমস্যা—বুঝলি?'

কুকুরটা আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি তার গায়ে হাত দিয়ে আদর করলাম। বললাম, আজ যাই, পরে একদিন তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসব। কাবাব হাউজের ভালো কাবাব। শিককাবাব আর নান রুটি। তুই ভালো থাকিস। খোঁড়া পা নিয়ে এত হাঁটাহাঁটি করিস না। পা-টার রেস্ট দরকার।

আমি রওনা দিয়েছি রমনা থানার দিকে। কুকুরটা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে যতক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণই সে দাঁড়িয়ে থাকবে।

যেতে যেতে মারিয়ার কথা কি ভাবব? অফ করা সুইচ অন করে দেব? একটা ইন্টারেস্টিং চিঠি মেয়েটা লিখেছিল। সাঙ্কেতিক ভাষার চিঠি। কিছুতেই তার অর্থ বের করতে পারি না। দিনের পর দিন কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে বসে থাকি। শেষে এমন হল অক্ষরগুলি মাথায় গেঁথে গেল। মস্তিষ্কের নিউরোন একটা স্পেশাল ফাইল খুলে সেই ফাইলে চিঠি জমা করে রাখল। ফাইল খুলে চিঠিটা কি দেখব? দেখা যেতে পারে।

EFBS IJNV WIBJ,
TPNFUIJOH WFSZ TUSBOHF IBT
IBQQFOE UP NF. J BN JO
MPWF XJUI ZPV. QMFBTF IPME
NF JO ZPVS BSNT.
NBSJB

এই সাঙ্কেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করে আমার ফুপাতো ভাই বাদল। তার সময় লাগে তিন মিনিটের মতো। ওই প্রসঙ্গে ভাবতে ইচ্ছা করছে না। আমি মাথার সবকটা সুইচ অফ করে দিলাম।

প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। দুপুরে কি কিছু খেয়েছি? না, দুপুরে খাওয়া হয়নি। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা আমার এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। টাকাপয়সার খুব সমস্যা যাচ্ছে। বড় ফুপা (বাদলের বাবা) আগে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দিতেন। এই শর্তে দিতেন যে, আমি বাদলের সঙ্গে দেখা করব না। আমার প্রচণ্ড রকম দূষিত সম্মোহনী ক্ষমতা থেকে বাদল রক্ষা পাবে। আমি শর্ত মেনে দূরে দূরে আছি। মাস শেষে ফুপার অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসি। গত দুমাস হল ফুপা টাকা দেয়া বন্ধ করেছেন। শেষবার টাকা আনতে গেলাম, ফুপা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, তুমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছ, কাজটা কি ভালো হচ্ছে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই দেশের শতকরা ত্রিশ ভাগ লোক ভিক্ষা করে জীবনযাপন করছে। কাজেই আমি খারাপ কিছু দেখছি না।

'তোমার শরীর ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, পড়াশোনা করেছ—তুমি যদি ভিক্ষা করে বেড়াও, সেটা দেশের জন্য খারাপ।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে মানথ্‌লি অ্যালাউন্স দেবেন না।'

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন—কয়েক মাস তোমাকে টাকা দিয়েছি ওমনি তোমার ধারণা হয়ে গেছে টাকাটা তোমার প্রাপ্য? এটা তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, টাকা কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। একজন মাটি-কাটা শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি কেটে কত পায় জান? মাত্র সত্তর টাকা। তুমি কি মাটি কাটছ?

'জি না।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কী? চা দিতে বলেন। চা খেয়ে বিদেয় হয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, চা খাও। চা খেয়ে বিদেয় হও।'

'বাদলের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় না। ও আছে কেমন? ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব। কখন গেলে ওকে পাওয়া যায়?'

ফুপা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। আমি তার দুই দফা হাসিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

'হিমু!'

'জি ফুপা।'

'আমার বাড়িতে আসার ব্যাপারে তোমার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এখন তুলে নেয়া হল—তুমি যখন ইচ্ছা আসতে পার।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, বাদল কি দেশে নেই?

ফুপা আবারো তাঁর বিখ্যাত হাসি হেসে বললেন—না। তাকে দেশের বাইরে পড়তে পাঠিয়েছি। তোমার হাত থেকে ওকে বাঁচানোর একটাই পথ ছিল।

'ভালো করেছেন।'

'ভালো করেছি তো বটেই। এখন চা খাও—চা খেয়ে পথেপথে ঘুরে বেড়াও।'

'চায়ের সঙ্গে হালকা স্ন্যাকস কি পাওয়া যাবে ফুপা?'

'নো স্ন্যাকস। চা যে খেতে দিচ্ছি—এটাই কি যথেষ্ট না?'

'যথেষ্ট তো বটেই।'

আমি ফুপার অফিস থেকে চা খেয়ে চলে এসেছি। আমার বাঁধা রোজগার বন্ধ। তাতে খুব যে ঘাবড়ে গেছি তা না। বাংলাদেশ ভিক্ষাবৃত্তির দেশ। এই দেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এখানে ভিক্ষা করে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হবার কথা না। এখন অবিশ্যি কঠিন বলে মনে হচ্ছে। খিদেয় অস্থির বোধ করছি।

ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে মারিয়াদের বাড়িতে উপস্থিত হলে তারা সকালের নাশতা অবশ্যই খাওয়াবে। ইংলিশ ব্রেকফাস্ট—প্রথমে আধা গ্লাস কমলার রস। খিদেটাকে চনমনে করার জন্যে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ কমলার রসের কোনো তুলনা নেই। তারপর কী? তারপর অনেক কিছু আছে। সব টেবিলে সাজানো। যা ইচ্ছা তুলে নাও।

১। **পাউরুটির স্লাইস**

(পাশেই মাখনের বাটিতে মাখন। মাখন-কাটা ছুরি। মারমালেডের বোতল। অনেকে পাউরুটির স্লাইসে পুরু করে মাখন দিয়ে, তার উপর হালকা মারমালেড ছড়িয়ে দেন।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। **ডিম সিদ্ধ**

(হাফ বয়েল্ড্। ডিম সিদ্ধের সঙ্গে আছে গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ। ডিম ভাঙতেই ভেতর থেকে গরম ভাপ উঠবে—হলদে কুসুম গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে—তখন তার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে গোলমরিচ ও লবণ।)

৩। **গোশত ভাজা**

(ইংরেজি নামটা যেন কী? সসেজ? ফ্রায়েড সসেজ? আগুন-গরম সসেজ। খাবার নিয়ম হল একটুকরা গোশত ভাজা, এক চুমুক ব্ল্যাক কফি...তাড়াহুড়া কিছু নেই। ফাঁকে ফাঁকে খবরের কাগজ পড়া যেতে পারে। সব পড়ার দরকার নেই, শুধু হেড লাইন...)

আচ্ছা, এইসব কী? আমি কি পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছি? আমি না একজন মহাপুরুষ টাইপ মানুষ? খাদ্যের মতো অতি স্থূল একটা ব্যাপার আমাকে অভিভূত করে রাখবে, তা কী করে হয়?

৪

'হিরোস ওয়েলকাম' বলে একটি বাক্য আছে। মহান বীর যুদ্ধ জয়ের পর দেশে ফিরলে যা হয়—আনন্দ-উল্লাস, আতশবাজি পোড়ানো, গণসঙ্গীত। থানায় পা দেয়ামাত্র হিরোস ওয়েলকাম বাক্যটি আমার মাথায় এল। আমাকে নিয়ে হইচই পড়ে গেল। সেন্ট্রির সেপাই একটা বিকট চিৎকার দিল—"আরে হিমু ভাইয়া!" আমি গেলাম হকচকিয়ে। থানার সবাই ছুটে এলেন। সেকেন্ড অফিসার একগাল হেসে বললেন, "স্যার, কেমন আছেন?" ওসি সাহেব আমাকে হাত ধরে বসাতে বসাতে বললেন, ভাই সাহেব, আরাম করে বসুন তো। আপনি আমাদের যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন। কাওরান বাজারে যেখানে আপনাকে নামিয়ে দিয়েছে সেখানে দু বার জিপ পাঠিয়েছি আপনার খোঁজে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, ব্যাপার কী?

'ব্যাপারটা যে কী সে তো আপনি বলবেন। আপনি যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তা তো বুঝি নি। মানুষের কপালে তো লেখা থাকে না সে কে। লেখা থাকলে পুলিশের জন্যে ভালো হত। কপালের লেখা দেখে হাজতে ঢুকাতাম, লেখা দেখে চা-কফি খাইয়ে স্যালুট করে বাসায় পৌঁছে দিতাম।'

'ভাই, আমি অতি নগণ্য এক হিমু।'

'আপনি নগণ্য হলে আমাদের এই অবস্থা!'

'কী অবস্থা?'

'একেবারে বেড়াছেড়া অবস্থা। দাঁড়ান সব বলছি। ভাই সাহেব, চা খাবেন—ওই আকবর, হিমু ভাইয়ারে চা দে। তারপর ভাইসাহেব শোনেন কী ব্যাপার। আপনাকে তো ছেড়ে দিলাম, তারপরই মারিয়া নামের একটি মেয়ে টেলিফোন করল—আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি যতই বলি ছেড়ে দিয়েছি ততই চেপে ধরে। আমার কথা বিশ্বাস করে না, রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম, তারপর শুরু হল গজব।'

'কী গজব?'

'একের পর এক টেলিফোন আসা শুরু হল, ডিআইজি, এআইজি, সবশেষে আইজি সাহেব নিজে। আমি স্যারদের বললাম—আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। তাঁরা বিশ্বাস করলেন। তারপর টেলিফোন করলেন হোম মিনিস্টার। রাত তখন তিনটা দশ। মন্ত্রীরা তো সহজে কিছু বোঝেন

না। যতই বলি, স্যার, ওনাকে ছেড়ে দিয়েছি—মন্ত্রী বলেন, দেখি লাইনে দিন, কথা বলি। আরে, যাকে ছেড়ে দিয়েছি তাকে লাইনে দেব কীভাবে? আমি কি জাদুকর জুয়েল আইচ?'

উনি বললেন, হিমু সাহেবকে যেখান থেকে পারেন খুঁজে আনেন।

'আমার কলজে গেল শুকিয়ে। হার্টে ড্রপ বিট শুরু হল। এখন আপনাকে দেখে কলিজায় পানি এসেছে। হার্টও নরমাল হয়েছে। ভাইয়া, আপনি যে এমন তালেবর ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারিনি। নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। পায়ের ধুলাও কিছু দিয়ে দেবেন, বোতলে ভরে থানার ফাইল ক্যাবিনেটে রেখে দেব। এখন হিমু ভাইয়া, আপনি টেলিফোনটা হাতে নিন। যাঁদের নাম বললাম এক এক করে তাঁদের সবাইকে টেলিফোন করে জানান যে আপনি আছেন। আপনার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়ে ওঁদের শান্ত করুন। ওনারা বড়ই অশান্ত।'

'এঁদের কাউকেই আমি চিনি না।'

'আপনি এঁদের চেনেন না আর এঁরা আমার জান পানি করে দেবে, তা তো হবে না ভাইয়া। নাচতে নেমেছেন, এখন আর ঘোমটা দিতে পারবেন না। আপনি মারিয়াকে টেলিফোন করুন। তার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে অন্যদের টেলিফোনে ধরুন।'

আকবর চা নিয়ে এসেছে। ওসি সাহেব আকবরের কাছ থেকে চায়ের কাপ নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। আকবরের দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হারামজাদা, এক কাপ চা আনতে এতক্ষণ লাগে?' বলেই আচমকা এক চড় বসালেন। আকবর উল্টে পড়ে গেল। আবার স্বাভাবিকভাবে উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

ওসি সাহেব টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাম্বার বলুন আমি ডায়াল করে দিচ্ছি। ডায়াল করতে আপনার কষ্ট হবে। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না।

'নাম্বার হচ্ছে আট-আমি-তুমি-আমি-তুমি-আমরা। এর মানে ৮ ১২ ১২৩।'

'ভাই, আপনার কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না। আপনি নিজেই টেলিফোন করুন। বুঝলেন হিমু ভাইয়া, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যতদিন পুলিশে চাকরি করব ততদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে ধরব না। মার্ডার কেইসের আসামি হলেও না।'

মারিয়া জেগেই ছিল। আমি তাকে জানালাম যে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি ছাড়া পেয়েছি এবং ভালো আছি।

মারিয়া বলল, আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি কে বলল? আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না। অকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মেয়ে আমি না। বাবা দুশ্চিন্তা করছেন। আমার কাছ থেকে আপনার গ্রেফতারের কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তারপর শুরু করলেন টেলিফোন।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন। টেলিফোন রাখি?'

'তুই রেগে আছিস কেন?'

'আপনাকে অসংখ্যবার বলেছি—তুই তুই করবেন না।'

'আচ্ছা, করব না। তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?'

'হিমু ভাই, আপনি অকারণে কথা বলছেন?'

'তোমার বাবা কি জেগে আছেন?'

'হ্যাঁ, জেগে আছেন। বাবা রাতে ঘুমাতে পারেন না। আপনি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'না।'

'বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত, আপনি তাঁর সঙ্গে সামান্য কথা বলতেও আগ্রহী না?'

'মরিয়ম, ব্যাপারটা হল কী...'

'মরিয়ম বলছেন কেন? আমার নাম কি মরিয়ম...?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'ভুল তো হয়েছেই। আপনি একের পর এক ভুল করবেন—তারপর সেই ভুলটা শুদ্ধ হিসেবে দেখাবার একবার চেষ্টা করবেন। সেটা কি ঠিক?'

'কী ভুল করলাম?'

'যখন আপনাকে আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয়েছিল তখন আপনি ঠিক করলেন—আমাদের বাসায় আর আসবেন না। বাবা আপনাকে এত পছন্দ করেন—তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। আপনার কথা বলেন—কিন্তু আপনার খোঁজ নেই। যাতে আমরা আপনার খোঁজ না পাই তার জন্যে আগের ঠিকানা পর্যন্ত পাল্টে ফেললেন।'

'মারিয়া, তোমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠিকানা পাল্টাইনি। আমার অভ্যাস হচ্ছে দু দিন পরপর জায়গা বদল করা। মানুষ গাছের মতো, এক জায়গায় কিছু দিন থাকলেই শিকড় গজিয়ে যায়। আমি চাই না আমার শিকড় গজাক।'

'হিমু ভাই, হাত জোড় করে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার সঙ্গে ফিলসফি করার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাদের বাসায় আসা বন্ধ করেছিলেন, কারণ আমি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল কম। পনের বছর। পনের বছরের একটি কিশোরী তো ভুল করবেই। মেয়েরা তাদের জীবনের সবচে বড় ভুলগুলি অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে করে, আমিও করেছি।

'ভুল বলছ কেন? তখন যা করেছিলে হয়তো ঠিকই করেছিলে। এখন ভুল মনে হচ্ছে। আমি জানতাম একদিন তোমার এরকম মনে হবে...'

'জানতেন বলেই আমার চিঠির জবাব দেননি?'

'মারিয়া, তোমাকে বলেছি—চিঠির পাঠোদ্ধার আমি করতে পারিনি।'

'আবার মিথ্যা বলছেন?'

'পুরোপুরি মিথ্যা না। পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যা। আমি আবার এক শ ভাগ মিথ্যা বলতে পারি না। সব সময় মিথ্যার সঙ্গে সত্যি মিশিয়ে দি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিথ্যা কতটুকু আর সত্যি কতটুকু?'

'আমি পাঠোদ্ধার করতে পারিনি এটা সত্যি, তবে বাদল পেরেছে।'

'বাদল কে?'

'আমার ফুপাতো ভাই। আমার মহাভক্ত। আমার শিষ্য বলা যেতে পারে।'

'আপনি আমার চিঠি দুনিয়ার সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছেন?

'সবাই না, শুধু বাদলকে দিয়েছিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বের করে ফেলল—তখন আর চিঠিটা পড়তে আমার ইচ্ছা করল না। কাজেই অর্থ বের করার পরেও আমি চিঠি পড়িনি।'

'আপনি চিঠি পড়েননি?'

'না।'

'কী লিখেছিলাম জানতে আগ্রহ হয়নি?'

'আগ্রহ চাপা দিয়েছি।'

'কেন?'

'কারণটা হল...।'

'থাক, কারণ শুনতে চাই না।'

মারিয়া হঠাৎ করে বলল, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি টেলিফোন রাখলাম। ভালো কথা, আপনার ঠিকানা বলুন। লিখে নেই। আর শুনুন, মা আপনাকে হাত দেখাতে চান। একদিন এসে মার হাতটা দেখে দিন।

আমি ঠিকানা বললাম। সে টেলিফোন রাখল। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি হাসলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা

করার কোনো কারণ নেই। ভালো কথা, আপনাদের হাজতে আলি আসগর বলে কি কেউ আছে? বেচারার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

ওসি সাহেব সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু ভাইয়াকে হাজতে নিয়ে যান। উনি নিজে দেখুন। আসগর-ফাসগর যাকেই পান নিয়ে বাড়ি চলে যান।

আসগর সাহেব হাজতে ছিলেন। মনে হল নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের গুঁতা খেয়েছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আমি তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এলাম।

পুলিশের জিপ থাকলে এবারও হয়তো জিপে করে আমাদের পৌঁছাতো। জিপ ছিল না। সকাল হয়ে আসছে। পিকেটাররা বের হবে। আগামী দিনের হরতাল জম্পেশ করে করা হবে। পুলিশের ব্যস্ততা সীমাহীন।

আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আসগর সাহেব হাঁটতে পারছেন না। আমি বললাম, রোলারের গুঁতা খেয়েছেন? আসগর সাহেব কিছু বললেন না। বলবেন না, তাও জানি। কিছু মানুষ আছে অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে যায়, কিন্তু নিজের সমস্যা আড়াল করে রাখে।

'হিমু ভাই!'

'জি!'

'একটু বসব।'

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

আমি তাঁকে সাবধানে ফুটপাতের উপর বসালাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বমি করলেন। রক্তবমি।

'আসগর সাহেব!'

'জি!'

'আপনার অবস্থা তো মনে হয় সুবিধার না।'

'জি।'

'চলুন আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাসায় গিয়ে লাভ নেই।'

'নেবেন কীভাবে? উঠে দাঁড়াতে পারছি না।'

'একটা কিছু ব্যবস্থা হবেই। ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আসুন বসে থাকি। নাকি শোবেন?'

'জি আচ্ছা।'

আমি তাঁকে ফুটপাতে শুইয়ে দিলাম। মাথার নিচে ইট জাতীয় কিছু দিতে পারলে ভালো হত। ইট দেখছি না।

'হিমু ভাই!'

'জি।'

'রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিতে এত ভালবাসে কী জন্যে? তাঁরা রাজনীতি করেন—আমরা কষ্ট পাই। এর কারণ কী?'

'রাজনীতি হল রাজাদের ব্যাপার—বোধহয় এ জন্যেই। রাজনীতি বাদ দিয়ে তাঁরা যখন জননীতি করবেন তখন আর আমাদের কষ্ট হবে না।'

'এরকম কি কখনো হবে?'

'বুঝতে পারছি না। হবার তো কথা। মেঘের আড়ালে সূর্য থাকে।'

'সূর্য কি আছে?'

'সূর্য নিশ্চয়ই আছে। মেঘ সরে গেলেই দেখা যাবে।'

'মেঘ যদি অনেক বেশি সময় থাকে তা হলে কিন্তু এক সময় সূর্য ডুবে যায়। তখন মেঘ কেটে গেলেও সূর্যকে আর পাওয়া যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শঙ্কিত বোধ করছি। ভয়াবহ ধরনের অসুস্থ মানুষেরা হঠাৎ দার্শনিক হয়ে ওঠে। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হয়। অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশন ঘটিত সমস্যা দেখা দিতে থাকে। উচ্চস্তরের ফিলসফি আসলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন ঘাটতিজনিত সমস্যা। আসগর সাহেবকে দ্রুত হাসপাতালে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। রিকশা, ভ্যানগাড়ি কিছুই দেখছি না।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল। মাটি-কাটা কুলি একজন পাওয়া গেল। সে কাঁধে করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

আসগর সাহেব মানুষের কাঁধে চড়তে লজ্জা পাচ্ছেন। আমি বললাম, লজ্জার কিছু নেই। হাসিমুখে কাঁধে চেপে বসুন। চিরকালই মানুষ মানুষের কাঁধে চেপেছে। একটা ঘোড়া আরেকটা ঘোড়াকে কাঁধে নিয়ে চলে না। মানুষ চলে। সৃষ্টির সেরা জীবদের কাণ্ডকারখানাও সেরা।

৫

গল্প-উপন্যাসে পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটা প্রায় পাওয়া যায়। যারা ভোরবেলা পাখির ডাক শোনেন না তাঁদের কাছে 'পাখি-ডাকা ভোরের' রোমান্টিক আবেদন আছে। লেখকরা কিন্তু পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন—তাঁরা পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটায় পাখির নাম বলেন না। ভোরবেলা যে পাখি ডাকে তার নাম কাক। 'কাক-ডাকা ভোর' লিখলে ভোরবেলার দৃশ্যটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যেত।

কাকের কা কা শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। খুব একটা খারাপ লাগল তা না। কা কা শব্দ যত কর্কশই হোক, শব্দটা আসছে পাখির গলা থেকেই। প্রকৃতি অসুন্দর কিছু সৃষ্টি করে না—কাকের মধ্যেও সুন্দর কিছু নিশ্চয়ই আছে। সেই সুন্দরটা বের করতে হবে—এই ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে নামলাম। তারপরই মনে হল—এত ভোরে বিছানা থেকে শুধু শুধু কেন নামছি? আমার সামনে কোনো পরীক্ষা নেই যে হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসতে হবে। ভোরে ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে ছুটতে হবে না। চলছে অসহযোগের ছুটি। শুধু একবার ঢাকা মেডিকেলে যেতে হবে। আসগর সাহেবের খোঁজ নিতে হবে। খোঁজ না নিলেও চলবে। আমার তো কিছু করার নেই? আমি কোনো চিকিৎসক না। আমি অতি সাধারণ হিমু। কাজেই আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। চৈত্র মাসের শুরুর ভোরবেলাগুলিতে হিম হিম ভাব থাকে। হাত-পা গুটিয়ে পাতলা চাদরে শরীর ঢেকে রাখলে মন্দ লাগে না।

অনেকে ভোর হওয়া দেখার জন্যে রাত কাটার আগেই জেগে ওঠেন। তাঁদের ধারণা, রাত কেটে ভোর হওয়া একটা অসাধারণ দৃশ্য। সেই দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা। তাঁদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার কাছে মনে হয় সব দৃশ্যই অসাধারণ। এই যে পাতলা একটা কাঁথা গায়ে মাথা ঢেকে শুয়ে আছি এই দৃশ্যেরই কি তুলনা আছে? কাঁথার ছেঁড়া ফুটো দিয়ে আলো আসছে। একটা মশাও সেই ফুটো দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে। বেচারা খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে—কী করবে বুঝতে পারছে না। সূর্য উঠে যাবার পর মশাদের রক্ত খাবার নিয়ম নেই? সূর্য উঠে গেছে। বেচারার বুকে রক্তের তৃষ্ণা। চোখের সামনে খালি গায়ের এক লোক শুয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই তার গায়ের রক্ত খাওয়া যায়—কিন্তু দিনের আলোয় রক্ত খাওয়াটা কি ঠিক হবে? সে মহা চিন্তিত হয়ে হিমু নামক মানুষটার কানের কাছে ভনভন করছে। মনে হচ্ছে অনুমতি প্রার্থনা করছে। মশাদের ভাষায় বলছে—স্যার, আপনার শরীর থেকে এক ফোঁটার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রক্ত কি খেতে পারি? আপনারা মুমূর্ষু রোগীর জন্যে রক্ত দান করেন, ওদের প্রাণ রক্ষা করেন। আমাদের প্রাণও তো প্রাণ—। ক্ষুদ্র হলেও প্রাণ। সেই প্রাণ রক্ষা করতে সামান্য

রক্ত দিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন স্যার? কবি বলেছেন—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

এইসব দৃশ্যও কি অসাধারণ না? তারপরেও আমরা আলাদা করে কিছু মুহূর্ত চিহ্নিত করি। এদের নাম দেই অসাধারণ মুহূর্ত। সাংবাদিকরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন—আপনাদের জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কী? বিখ্যাত ব্যক্তিরা আবার ইনিয়ে বিনিয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা বলেন (বেশিরভাগই বানোয়াট)।

সমগ্র জীবনটাই কি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পড়ে না? এই যে মশাটা কানের কাছে ভন ভন করতে করতে উড়ছে, আবহ সঙ্গীত হিসেবে ভেসে আসছে কাকদের কা কা—এই ঘটনাও কি স্মরণীয় না? আমি হাই তুলতে তুলতে মশাটাকে বললাম—খা ব্যাটা, রক্ত খা। আমি কিছু বলব না। ভরপেট রক্ত খেয়ে ঘুমাতে যা—আমাকেও ঘুমাতে দে।

মশার সঙ্গে কথোপকথন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ল। সূর্য-ওঠা সকালে কে আসবে আমার কাছে? মশাটার কথা বলা এবং বোঝার ক্ষমতা থাকলে বলতাম—যা ব্যাটা, দেখে আয় কে এসেছে। দেখে এসে আমাকে কানে কানে বলে যা। যেহেতু মশাদের সেই ক্ষমতা নেই সেহেতু আমাকে উঠতে হল। দরজা খুলতে হল। দরজা ধরে যে দাঁড়িয়ে আছে তার নাম মারিয়া। এই ভোরবেলায় কালো সানগ্লাসে তার চোখ ঢাকা। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। চকলেট রঙের সিল্কের শাড়িতে কালো রঙের ফুল ফুটে আছে। কানে পাথর বসানো দুল—খুব সম্ভব চুনি। লাল রঙ ঝিকমিক করে চলছে। এরকম রূপবতী একজন তরুণীর সামনে আমি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যে কোনো সময় কাঁথা গা থেকে পিছলে নেমে আসবে বলে এক হাতে কাঁথা সামলাতে হচ্ছে, অন্য হাতে লুঙ্গি। তাড়াহুড়া করে বিছানা থেকে নেমেছি বলে লুঙ্গির গিঁট ভালোমতো দেয়া হয়নি। লুঙ্গি খুলে নিচে নেমে এলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে। আধুনিক ছোটগল্প। গল্পের শিরোনাম—নাঙ্গুবাবা ও রূপবতী মারিয়া।

আমি নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললাম, মরিয়ম, তোমার খবর কী? ভোরবেলায় চোখে সানগ্লাস! চোখ উঠেছে?

'না, চোখ ওঠে নি। আপনার খবর কী?'

'খবর ভালো। এত সকালে এলে কীভাবে? হেঁটে?'

'যতটা সকাল আপনি ভাবছেন এখন তত সকাল না। সাড়ে দশটা বাজে।'

'বল কী!'

'হ্যাঁ।'

'এসেছ কী করে? গাড়িটাড়ি তো চলছে না।'

'রিকশায় এসেছি।'

'গুড।'

'ভিখিরিদের এই কাঁথা কোথায় পেয়েছেন?'

'আমার স্থাবর সম্পত্তি বলতে এই কাঁথা, বিছানা এবং মশারি।'

'কাঁথা জড়িয়ে আছেন কেন?'

'খালি গা তো, এই জন্যে কাঁথা জড়িয়ে আছি।'

'আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?'

'না।'

'আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।'

'বলে ফেল।'

'পরশু রাতে যখন টেলিফোনে কথা হল তখনই আমার বলা উচিত ছিল। বলতে পারিনি। বলতে না পারার যন্ত্রণায় সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। এখন বলব। বলে চলে যাব।'

'চা খাবে? চা খাওয়াতে পারি।'

'এরকম নোংরা জায়গায় বসে আমি চা খাব না।'

'জায়গাটা আমি বদলে ফেলতে পারি।'

'কীভাবে বদলাবেন?'

'চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিন্তা করতে হবে—তুই বসে আছিস ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে। শান্ত একটা নদী। তুই যে জায়গায় বসে আছিস সে জায়গাটা হচ্ছে বটগাছের একটা গুড়ি। নদীর ঠিক উপরে বটগাছ হয় না—তবু ধরা যাক, হয়েছে। গাছে পাখি ডাকছে।'

মারিয়া শীতল গলায় বলল, তুই তুই করছেন কেন?

'মনের ভুলে তুই তুই করছি। আর হবে না। তোর সঙ্গে আমার যখন পরিচয় তখন তুই তুই করতাম তো—তাই।'

'আপনি কখনোই আমার সঙ্গে তুই তুই করেননি। আপনার সঙ্গে আমার কখনো তেমন করে কথাও হয়নি। আপনি কথা বলতেন মার সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। আমি শুনতাম।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা বলবেন না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।'

'স্মৃতিশক্তি খুব ভালো তা বলা কি ঠিক হচ্ছে? যা বলতে এসেছিস তা বলতে ভুলে গেছিস।'

'ভুলিনি, চলে যাবার আগ মুহূর্তে বলব।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি তুই কিছুক্ষণ আছিস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তা হলে হাত-মুখ ধুয়ে আসি আর চট করে চা নিয়ে আসি। দুজনে বেশ মজা করে ময়ূরাক্ষীর তীরে বসে চা খাওয়া হবে।'

'যান, চা নিয়ে আসুন।'

'দু মিনিটের জন্যে তুই কি চোখ বন্ধ করবি?'

'কেন?'

'আমি কাঁথাটা ফেলে দিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিতাম।'

'আপনার সেই বিখ্যাত হলুদ পাঞ্জাবি?'

'হ্যাঁ।'

'চোখ বন্ধ করতে হবে না। রাস্তা-ঘাটে প্রচুর খালি গায়ের লোক আমি দেখি। এতে কিছু যায় আসে না। ভালো কথা, আপনি কি তুই তুই চালিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম, লুঙ্গি বদলে পায়জামা পরলাম। আমার তোশকের নিচে কুড়ি টাকার একটা নোট থাকার কথা। বদুর চায়ের দোকান আগে বাকি দিত—এখন দিচ্ছে না। চা আনতে হলে নগদ পয়সা লাগবে। আমরা সম্ভবত অতি দ্রুত 'ফেল কড়ি মাখ তেলে'র জগতে প্রবেশ করছি। কিছুদিন আগেও বেশিরভাগ দোকানে বাঁধানো ফ্রেমে লেখা থাকত—"বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না"। সেই সব দোকানে বাকি চাওয়া হত। দোকানের মালিকরা লজ্জা পেতেন না। এখন সেই লেখাও নেই, বাকির সিস্টেমও নেই। তোশকের নিচে কিছু পাওয়া গেল না। বদুর কাছ থেকে চা আসার ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গেল।

মরিয়ম খাটের কাছে গেল। খাটে বসার ইচ্ছা বোধহয় ছিল। খাটের নোংরা চাদর, তেল-চিটচিটে বালিশ মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি। চলে গেল ঘরের কোণে রাখা টেবিলে। সে বসল টেবিলে পা ঝুলিয়ে। আমি শঙ্কিত বোধ করলাম। টেবিলটা নড়বড়ে—তিনটা মাত্র পা। চার নম্বর পায়ের অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে টেবিলটাকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে। মরিয়ম টেবিলে বসে যেভাবে নড়াচড়া করছে তাতে ব্যালেন্স গণ্ডগোল করে যে কোনো মুহূর্তে কিছু

একটা ঘটে যেতে পারে। মরিয়ম পা দোলাতে দোলাতে বলল, আপনার এই ঘর কখনো ঝাট দেয়া হয় না?

'একেবারেই যে হয় না তা না। মাঝে মাঝে হয়।'

'তোশকের নিচে কী খুঁজছেন?'

'টাকা। পাচ্ছি না। হাপিস হয়ে গেছে। তুই কি দশটা টাকা ধার দিবি?'

'না। আমি ধার দেই না। আপনার বিছানার উপর যে জিনিসটা ঝুলছে তার নাম কি মশারি?'

'হুঁ।'

'সারা মশারি জুড়েই তো বিশাল ফুটা—কী আশ্চর্য কাণ্ড!'

'তুই আমার মশারি দেখে রাগ করছিস—মশারা খুব আনন্দিত হয়। মশারি যখন খাটাই মশারা হেসে ফেলে।'

'মশাদের হাসি আপনি দেখেছেন?'

'না দেখলেও অনুমান করতে পারি। তুই কি চোখ থেকে কালো চশমাটা নামাবি? অসহ্য লাগছে।'

'অসহ্য লাগছে কেন?'

'আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমাদের একজন টিচার ছিলেন—সরোয়ার স্যার। ইংরেজি পড়াতেন। খুব ভালো পড়াতেন। হঠাৎ একদিন শুনি স্যার অন্ধ হয়ে গেছেন। মাস দু-এক পর স্যার স্কুলে এলেন। তাঁর চোখে কালো সানগ্লাস। অন্ধ হবার পরও স্যার পড়াতেন। দপ্তরি হাত ধরে ধরে তাঁকে ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিত। চেয়ারে বসে বসে তিনি পড়াতেন। চোখে থাকত সানগ্লাস। স্যারকে মনে হত পাথরের মূর্তি। এরপর থেকে সানগ্লাস পরা কাউকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

মরিয়ম সানগ্লাস খুলে ফেলল। আমি বললাম, তোর চোখ অসম্ভব সুন্দর। কালো চশমায় এরকম সুন্দর চোখ ঢেকে রাখা খুব অন্যায়। আর কখনো চোখে সানগ্লাস দিবি না।

'আমি রোদ সহ্য করতে পারি না। চোখ জ্বালা করে।'

'জ্বালা করলে করুক। তোর চোখ থাকবে খোলা, সুন্দর চোখ সবাই দেখবে। সৌন্দর্য সবার জন্যে।'

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার বুকও খুব সুন্দর। তাই বলে সবাইকে বুক দেখিয়ে বেড়াব?

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মেয়েটা বলে কী? এই সময়ের মেয়েরা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যত সহজে যত অবলীলায় মরিয়ম এই কথাগুলি বলল, আজ থেকে দশ বছর আগে কি কোনো তরুণী এ জাতীয় কথা বলতে পারত?

মরিয়ম বলল, হিমু ভাই, আপনি মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন?

'কিছুটা ঘাবড়ে গেছি তো বটেই।'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি এরচে অনেক ভয়ঙ্কর কথা বলি। আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না।'

'তুই এমন ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে পা দুলাবি না। টেবিলের অবস্থা সুবিধার না।'

আমি বাথরুমের দিকে রওনা হলাম। আমাদের এই নিউ আইডিয়াল মেসে মোট আঠার জন বোর্ডার—একটাই বাথরুম। সকালের দিকে বাথরুম খালি পাওয়া ঈদের আগে আন্তনগর ট্রেনের টিকেট পাওয়ার মতো। খালি পেলেও সমস্যা—ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরপরই দরজায় টোকা পড়বে—'ব্রাদার, একটু কুইক করবেন।'

আজ বাথরুম খালি ছিল। হাত-মুখ ধোয়া হল, দাড়ি শেভ করা হল না, দাঁত মাজা হল না। রেজার এবং ব্রাশ ঘর থেকে নিয়ে বের হওয়া হয়নি। পকেটে চিরুনি থাকলে ভালো হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায় চিরুনি বুলিয়ে ভদ্রস্থ হওয়া যেত। বেঁটে মানুষরা লম্বা কাউকে দেখলে বুক টান করে লম্বা হবার চেষ্টা করে। ফিটফাট পোশাকের কাউকে দেখলে নিজেও একটু ফিটফাট হতে চায়—ব্যাপারটা এরকম।

মরিয়মের জরুরি কথা জানা গেল—সে এসেছে আমাকে হাত দেখাতে। হাত দেখার আমি কিছুই জানি না। যাঁরা দেখেন তাঁরাও জানেন না। মানুষের ভবিষ্যৎ বলার জন্যে হাত দেখা জানা জরুরি নয়। মন খুশি-করা জাতীয় কিছু কথা গুছিয়ে বলতে পারলেই হল। সব ভালো ভালো কথা বলতে হবে। দু-একটা রেখা নিয়ে এমন ভাব করতে হবে যে, রেখার অর্থ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। অন্তত একবার ভালো কোনো চিহ্ন দেখে লাফিয়ে উঠতে হবে। বিস্মিত গলায় বলতে হবে—কী আশ্চর্য, হাতে দেখি ত্রিশূল চিহ্ন। এক লক্ষ হাত দেখলে একটা এমন চিহ্ন পাওয়া যায়।

মানুষ সহজে প্রতারিত হয় এরকম কথাগুলির একটি হচ্ছে—"আপনি বড়ই অভিমানী, নিজের কষ্ট প্রকাশ করেন না, লুকিয়ে রাখেন।"

যে সামান্য মাথাব্যথাতে অস্থির হয়ে বাড়ির সবাইকে জ্বালাতন করে সেও এই কথায় আবেগে অভিভূত হয়ে বলবে—ঠিক ধরেছেন। আমার মনের তীব্র কষ্টও আমার অতি নিকটজন জানে না। ভাই, আপনি হাত তো অসাধারণ দেখেন।

আমি মরিয়মের হাত ধরে ঝিম মেরে বসে আছি। এরকম ভাব দেখাচ্ছি যেন গভীর সমুদ্রে পড়েছি—হাতের রেখার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। মরিয়ম বিরক্তির সঙ্গে বলল, কী হয়েছে?

আমি বললাম, হাত দেখা তো কোনো সহজ বিদ্যা না। অতি জটিল। চিন্তা-ভাবনার সময়টা দিতে হবে না?

মরিয়ম বলল, আমার হেড লাইন মাউন্ট অব লুনার দিকে বেঁকে গেছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ক্রস। এর মানে কী?

আমি বললাম—এর মানে অসাধারণ।

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, অসাধারণ?

'অবশ্যই অসাধারণ। তোর মাথা খুব পরিষ্কার। চন্দ্রের শুভ প্রভাবে তুই প্রভাবিত। চন্দ্র তোকে আগলে রাখছে পাখির মতো। মুরগি যেমন তার বাচ্চাকে আগলে রাখে, চন্দ্র তোকে অবিকল সেভাবে আগলে রাখছে। ক্রস যেটা আছে—সেটা আরো শুভ একটা ব্যাপার। ক্রস হচ্ছে—তারকা। তারকা চিহ্নের কারণে সর্ববিষয়ে সাফল্য।

মরিয়ম তার হাত টেনে নিয়ে মুখ কালো করে বলল, আপনি তো হাত দেখার কিছুই জানেন না। হেড লাইন যদি মাউন্ট অব লুনার দিকে বেঁকে যায়, এবং যদি সেখানে স্টার থাকে তা হলে ভয়াবহ ব্যাপার। এটা সুইসাইডের চিহ্ন।

'কে বলেছে?'

'কাউন্ট লুইস হ্যামন বলেছেন।'

'তিনি আবার কে?'

'তাঁর নিক নেম কিরো। কিরোর নামও শোনেননি—সমানে মানুষের হাত দেখে বেড়াচ্ছেন। এত ভাওতাবাজি শিখেছেন কোথায়?'

বদুমিয়ার অ্যাসিসটেন্ট চা নিয়ে ঢুকেছে। কোকের বোতল ভরতি এক বোতল চা। সঙ্গে দুটা খালি কাপ। সে বোতল এবং কাপ নামিয়ে চলে গেল। মরিয়ম শীতল গলায় বলল, এই নোংরা চা আমি মরে গেলেও খাব না। আপনি খান। আপনাকে হাতও দেখতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।

'তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ চলে যাব। আপনার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। বক বক করে শুধু শুধু সময় নষ্ট করলাম। আপনি প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড।'

মরিয়ম উঠে দাঁড়াল। চোখে সানগ্লাস পরল। বোঝাই যাচ্ছে সে আহত হয়েছে।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'হাত দেখাবার জন্যে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসিনি। হাত আমি নিজে খুব ভালোই দেখতে পারি। আমি অন্য একটা কারণে এসেছিলাম। কারণটা জানতে চান?'

'চাই।'

'ওই দিন আপনাকে দেখে শকের মতো লাগল। হতভম্ব হয়ে ভেবেছি কী করে আপনার মতো মানুষকে আমি আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটা লিখলাম। এত বড় ভুল কী করে করলাম?'

'ভুলটা কত বড় তা ভালোমতো জানার জন্যে আবার এসেছিস?'

'হ্যাঁ। আমার চিঠিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই। থাক, মাথা চুলকাতে হবে না। আপনি কোনো একসময় বাবাকে গিয়ে দেখে আসবেন। তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করেন সেটা তো আপনি জানেন? জানেন না?'

'জানি। যাব, একবার গিয়ে দেখে আসব। চল্ তোকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'আপনাকে আসতে হবে না। আপনি না এলেই আমি খুশি হব। আপনি বরং কোকের বোতলের চা শেষ করে কাঁথা গায়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

মরিয়ম গটগট করে চলে গেল। আমি কোকের বোতলের চা সবটা শেষ করলাম। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। চায়ে আফিং-টাফিং দেয় কিনা কে জানে। শুনেছি ঢাকার অনেক চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে সামান্য আফিং মেশায়। এতে চায়ের বিক্রি ভালো হয়। মনে হয় বদুও তাই করে। পুরো এক বোতল চা খাওয়ায় ঝিমুনির মতো লাগছে। দ্বিতীয় দফা ঘুমের জন্যে আমি বিছানায় উঠে পড়লাম। বিছানায় ওঠামাত্র হাই উঠল। হাই-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল—শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে—শরীর তাই জানান দিচ্ছে। আর অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে—আমার ঘুম পাচ্ছে। এই মুহূর্তে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে।

অনেকেই আছে একবার ঘুম ছুটে গেলে আর ঘুমাতে পারে না। আমার সেই সমস্যা নেই। যে কোনো সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারি। মহাপুরুষদের ইচ্ছা-মৃত্যুর ক্ষমতা থাকে, আমার আছে ইচ্ছা-ঘুমের ক্ষমতা। যে কোনো সময় যে কোনো পরিস্থিতিতে ইচ্ছে করলেই ঘুমিয়ে পড়া—এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার নয়। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি, আমার আরেকটা ক্ষমতা আছে—ইচ্ছা-স্বপ্নের ক্ষমতা। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখতে পারি। যেমন ধরা যাক সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে—বিছানায় গা এলিয়ে কল্পনায় সমুদ্রকে দেখতে হবে। কল্পনা করতে করতে ঘুম এসে যাবে। তখন আসবে স্বপ্নের সমুদ্র। তবে কল্পনার সমুদ্রের সঙ্গে স্বপ্নের সমুদ্রের আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য থাকবে।

সমুদ্র কল্পনা করতে করতে পাশ ফিরলাম। ঘুম আসি-আসি করছে। অনেক দিন স্বপ্নে সমুদ্র দেখা হয় না। আজ দেখা হবে ভেবে খানিকটা উৎফুল্লও বোধ করছি—আবার একটু ভয়-ভয়ও লাগছে। আমার ইচ্ছা-স্বপ্নগুলি কেন জানি শেষের দিকে খানিকটা ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে। শুরু হয় বেশ সহজভাবেই—শেষ হয় ভয়ঙ্করভাবে। কে বলবে এর মানে কী? একজন কাউকে যদি পাওয়া যেত যে সব প্রশ্নের উত্তর জানে, তা হলে চমৎকার হত। ছুটে যাওয়া যেত তাঁর কাছে। এরকম কেউ নেই—বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের কাছে খুঁজি। নিজে যে প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না সেই প্রশ্নগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দেই। ডাস্টবিনের মরা বিড়াল, পচাগলা খাবার, মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সঙ্গে প্রশ্নগুলিও পড়ে থাকে। আমরা ভাবি প্রশ্নগুলিও একসময় পচে যাবে—মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে। কে জানে নেয় কিনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি পাশ ফিরলাম। ঘুম আর স্বপ্ন দুটাই একসঙ্গে এসেছে।

আমার স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমি স্বপ্ন দেখার সময় বুঝতে পারি যে স্বপ্ন দেখছি। এবং মাঝেমধ্যে স্বপ্ন বদলে ফেলতেও পারি। যেমন ধরা যাক, খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখছি—অনেক উঁচু থেকে সাঁইসাঁই করে নিচে পড়ে যাচ্ছি। শরীর কাঁপছে। তখন হুট করে স্বপ্নটা বদলে অন্য স্বপ্ন করে ফেলি। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাখ্যাও করতে পারি—স্বপ্নটা কেন দেখছি।

আজ দেখলাম মরিয়মের বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে। (তাঁকে দেখা খুব স্বাভাবিক। একটুক্ষণ আগেই মরিয়মের সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল।) মরিয়ম তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি অন্ধ। এটা কেন দেখলাম বুঝতে পারছি না। আসাদুল্লাহ সাহেব অন্ধ না। আসাদুল্লাহ সাহেবকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হল। তখন তাঁর মুখটা হয়ে গেল পত্রলেখক আসগর সাহেবের মতো (এটা কেন হল বোঝা গেল না। স্বপ্ন অতি দ্রুত জটিল হয়ে যায়। খুব জটিল হলে স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যায়—তখন আর তার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করেছে।)

মরিয়ম তার বাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল (যদিও ভদ্রলোককে এখন দেখাচ্ছে পুরোপুরি আসগর সাহেবের মতো)। মরিয়ম বলল, আমার বাবা পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। যার যা প্রশ্ন আছে, করুন। আমাদের হাতে সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। যে কোনো সময় রমনা থানার ওসি চলে আসবেন। তিনি আসার আগেই প্রশ্ন করতে হবে। কুইক, কুইক। কে প্রথম প্রশ্ন করবেন? কে, কে?

আমি বুঝতে পারছি। স্বপ্ন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সে এখন চলবে তার নিজস্ব অদ্ভুত নিয়মে। আমি তারপরেও হাল ছেড়ে দিলাম না, হাত উঠালাম।

মরিয়ম বলল, আপনি প্রশ্ন করবেন?

'জি।'

'আপনার নাম এবং পরিচয় দিন।'

'আমার নাম হিমু। আমি একজন মহাপুরুষ।'

'আপনার প্রশ্ন কী বলুন। আমার বাবা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

'মহাপুরুষ হবার প্রথম শর্ত কী?'

আসাদুল্লাহ সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মহাপুরুষ হবার শর্ত বলা শুরু করেছেন। তাঁর গলার স্বর ভারী এবং গম্ভীর। খানিকটা প্রতিধ্বনি হচ্ছে। মনে হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতর থেকে কথা বলছেন—

একেক যুগের মহাপুরুষরা একেক রকম হন। মহাপুরুষদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। হজরত মুসা আলাইহেস সালামের সময় যুগটা ছিল জাদুবিদ্যার। বড় বড় জাদুকর তাঁদের অদ্ভুত সব জাদু দেখিয়ে বেড়াতেন। কাজেই সেই যুগে মহাপুরুষ পাঠানো হল জাদুকর হিসেবে। হজরত মুসার ছিল অসাধারণ জাদু-ক্ষমতা। তাঁর হাতের লাঠি ফেলে দিলে সাপ হয়ে যেত। সে সাপ অন্য জাদুকরদের সাপ খেয়ে ফেলত।

হজরত ইউসুফের সময়টা ছিল সৌন্দর্যের। তখন রূপের খুব কদর ছিল। হজরত ইউসুফকে পাঠানো হল অসম্ভব রূপবান মানুষ হিসেবে।

হজরত ঈসা আলাইহেস সালামের যুগ ছিল চিকিৎসার। নানান ধরনের অষুধপত্র তখন বের হল। কাজেই হজরত ঈসাকে পাঠানো হল অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে। তিনি অন্ধত্ব সারাতে পারতেন। বোবাকে কথা বলার ক্ষমতা দিতে পারতেন।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ভণ্ডামির। কাজেই এই যুগে মহাপুরুষকে অবশ্যই ভণ্ড হতে হবে।

হাততালি পড়ছে। হাততালির শব্দে মাথা ধরে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি স্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগছে না। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙছে না।

৬

ফুপা টেলিগ্রামের ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন—

Emergency come sharp.

চিঠি নিয়ে এসেছে তাঁর অফিসের পিওন। সে যাচ্ছে না, চিঠি হাতে দিয়ে চোখ-মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, কী ব্যাপার?

সে শুকনা গলায় বলল, বকশিশ।

'বকশিশ কিসের? তুমি ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ। তোমাকে যে ধরে মার লাগাচ্ছি না এই যথেষ্ট। ভালো খবর আনলে বকশিশ পেতে। খুবই খারাপ সংবাদ।'

'রিকশা ভাড়া দেন। যামু ক্যামনে?'

'পায়দল চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাবে। তা ছাড়া রিকশা ভাড়া দিলেও লাভ হবে না—আজ রিকশা চলছে না। ভয়াবহ হরতাল।'

'রিকশা টুকটাক চলতাছে।'

'টুকটাক যেসব রিকশা চলছে তাতে চললে বোমা খাবে। জেনেশুনে কাউকে কি বোমা খাওয়ানো যায়? তুমি কোন্ দল কর?

'কোনো দল করি না।'

'বল কী! আওয়ামী লীগ, বিএনপি কোনোটা না?'

'জে না।'

'ভোট কাকে দাও?'

'ভোট দেই না।'

'তুমি তা হলে দেখি নির্দলীয় সরকারের লোক। এরকম তো সচরাচর পাওয়া যায় না। নাম কী তোমার?'

'মোহাম্মদ আবদুল গফুর।'

'গফুর সাহেব, রিকশা ভাড়া তোমাকে দিচ্ছি। আমার কাছে একটা পয়সা নেই। ধার করে এনে দিতে হবে। ভাড়া কত?'

'কুড়ি টাকা।'

'বল কী! এখান থেকে মতিঝিল কুড়ি টাকা?'

'হরতালের টাইমে রিকশা ভাড়া ডাবল।'

'তা তো বটেই। দাঁড়াও, আমি টাকা যোগাড় করে আনি। তবে একটা কথা বলি—কুড়ি টাকা পকেটে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে। রিকশায় উঠলেই বোমা খাবে।'

গফুর রাগী রাগী চোখে তাকাল। আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললাম, আমি আসলে একজন মহাপুরুষ। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই। এই জন্যে সাবধান করে দিচ্ছি।

'জে আচ্ছা।'

মোহাম্মদ আবদুল গফুর মুখ বেজার করে বসে রইল। আমি মেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করলাম। মেস ম্যানেজারের মুখ বেজার হয়ে গেল। মোহাম্মদ আবদুল গফুরের মুখে হাসি ফুটল। এখন এই মেস ম্যানেজার তার বেজার ভাব অন্যজনের ওপর ঢেলে দেবে। সে আবার আরেকজনকে দেবে। বেজার ভাব চেইন রিঅ্যাকশনের মতো চলতে থাকবে। আনন্দ চেইন রিঅ্যাকশনে প্রবাহিত করা যায় না—নিরানন্দ করা যায়।

ফুপার চিঠি হাতে ঝিম ধরে খানিকক্ষণ বসে কাটালাম। ঘটনা কী আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাদল কি দেশে? ছুটি কাটাতে এসে বড় ধরনের কোনো ঝামেলা বাঁধিয়েছে। এইটুকু অনুমান করা যায়। বাদল উদ্ভট কিছু করছে, কেউ তাকে সামলাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছে না। ওঝা হিসেবে আমার ডাক পড়েছে। আমি মন্ত্র পড়লেই কাজ দেবে, কারণ বাদলের কাছে আমি হচ্ছি ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। আমি যদি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলি, এই ব্যাটা সূর্য, দীর্ঘদিন তো পূর্ব দিকে উঠলি—এবার একটু পশ্চিম দিকে ওঠ্‌। পূর্ব দিকে তোর উদয় দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে—তা হলে সূর্য তৎক্ষণাৎ আমার কথা শুনে পশ্চিম দিকে উঠবে।

বাদল শুধু যে বুদ্ধিমান ছেলে তা না, বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। মারিয়ার সাঙ্কেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করতে তার তিন মিনিট লেগেছে। এই ছেলে আমার সম্পর্কে এমন ধারণা করে কী করে আমি জানি না। আমি যদি হিমু-ধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্মপ্রচার শুরু করি তা হলে অবশ্যই সে হবে আমার প্রথম শিষ্য। এবং এই ধর্মপ্রচারের জন্যে সে হবে প্রথম শহিদ। বাদল ছাড়াও কিছু শিষ্য পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। আসগর সাহেব শিষ্য হবেন। ধর্মে মুগ্ধ হয়ে হবেন তা না—ভদ্রলোক শিষ্য হবেন আমাকে খুশি করার জন্যে। কোনো রকম কারণ ছাড়া তিনি আমার প্রতি অন্ধ একটা টান অনুভব করেন। আসগর সাহেব ছাড়া আর কেউ কি শিষ্য হবে? কানা কুদ্দুস কি হবে? সম্ভাবনা আছে। সেও আমাকে পছন্দ করে। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানুষ মারতে কেমন লাগে কুদ্দুস?

সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, ভালো-মন্দ কোনো রকম লাগে না।

'বটি দিয়ে লাউ কাটতে যেমন লাগে তেমন 'কচ' একটা শব্দ?'

'ঠিক সেই রকম না, ভাইজান। মরণের সময় মানুষ চিল্লা-ফাল্লা কইরা বড় ত্যক্ত করে। লাউ তো আর চিল্লা-ফাল্লা করে না।'

'তা তো বটেই। চিল্লা-ফাল্লার জন্যে খারাপ লাগে?'

'জি না, খারাপ লাগে না। চিল্লা-ফাল্লাটা করবই। মৃত্যু বলে কথা। মৃত্যু কোনো সহজ ব্যাপার না। ঠিক বললাম না?'

'অবশ্যই ঠিক।'

কুদ্দুস মিয়া উদাস ভঙ্গিতে বলল, আফনেরে কেউ ডিসটার্ব করলে নাম-ঠিকানা দিয়েন।

'নাম-ঠিকানা দিলে কী করবে? 'কচ' ট্রিটমেন্ট? কচ করে লাউ-এর মতো কেটে ফেলবে?'

'সেইটা আমার বিষয়, আমি দেখব। আফনের কাম নাম-ঠিকানা দেওন।'

'আচ্ছা, মনে থাকল।'

'আরেকটা ঠিকানা দিতেছি—ধরেন কোনো বিপদে পড়ছেন। পুলিশ আফনেরে খুঁজতেছে। আশ্রয় দরকার। দানাপানি দরকার—এই ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া বলবেন, আমার নাম হিমু। ব্যবস্থা হবে। আমি এডভান্স আফনের কথা বইল্যা রাখছি। বলছি হিমু ভাই আমার ওস্তাদ।'

' "আমি হিমু" এই কথাটা কাকে বলতে হবে?'

'দরজায় তিনটা টোকা দিয়া একটু থামবেন আবার তিনটা টোকা দেবেন, আবার থামবেন, আবার তিন টোকা...এই হইল সিগনাল—তখন যে দরজা খুলব তারে বলবেন।'

'দরজা কে খুলবে?'

'আমার মেয়ে-মানুষ দরজা খুলব। নাম জয়গুন। চেহারা বড় বেশি বিউটি। মনে হবে সিনেমার নায়িকা।'

'খুব মোটাগাটা?'

'গিয়া একবার দেইখ্যা আইসেন—এমন সুন্দর, দেখলে মনে হয় গলা টিপ্যা মাইরা ফেলি।'

'গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে কেন?'

'এইসব মেয়েছেলে সবের সাথেই রঙঢঙ করে। আফনে একটা বিশিষ্ট ভদ্রলোক—বিপদে পইড়া তার এইখানে আশ্রয় নিছেন। তা হারামি মেয়েছেলে করব কী জানেন? আফনের সাথে দুনিয়ার গফ করব। কাপড়চোপড় থাকব আউলা। ইচ্ছা কইরা আউলা। ব্লাউজ যেটা পরব তার দুইটা বোতাম নাই। বোতাম ছিল—ইচ্ছা কইরা ছিঁড়ছে। এমন হারামি মেয়ে।'

নতুন হিমু-ধর্মে কুদ্দুসের সেই হারামি মেয়েটা কি ঢুকবে? তার সঙ্গে এখনো পরিচয় হয়নি। একদিন পরিচয় করে আসতে হবে। একটা ধর্ম শুরু করলে সেখানে রূপবতী মহিলা (যাদের ব্লাউজের দুটা বোতাম ইচ্ছা করে ছেঁড়া) না থাকলে অন্যরা আকৃষ্ট হবে না।

মারিয়াকে কি পাওয়া যাবে?

মনে হয় না। মারিয়া টাইপ মেয়েদের কখনোই আসলে পাওয়া যায় না। আবার ভুল করলাম—কোনো মেয়েকেই আসলে পাওয়া যায় না। তারা অভিনয় করে সঙ্গে আছে এই পর্যন্তই। অভিনয় শুধু যে অতি প্রিয়জনদের সঙ্গে করে তা না, নিজের সঙ্গেও করে। নিজেরা সেটা বুঝতে পারে না।

আমি ফুপার বাসার দিকে রওনা হলাম এমন সময়ে যেন দুপুরে ঠিক খাবার সময় উপস্থিত হতে পারি। দু মাস খরচ দেয়া হয়নি বলে মেসে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। দু বেলা খাবার জন্যে নিত্যনতুন ফন্দিফিকির বের করতে হচ্ছে। দুপুরের খাবারটা ফুপার ওখানে সেরে রাতে যাব মেডিকেল কলেজে আসগর সাহেবকে দেখতে। আসগর সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি কিছুই খেতে পারেন না। তাঁকে দেয়া হাসপাতালের খাবারটা খেয়ে নিলে রাত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। খুব বেশি সমস্যা হলে কানা কুদ্দুসের মেয়েছেলে দুটা বোতামবিহীন নায়িকা জয়গুন তো আছেই।

আজ বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। ফুপাদের বাসায় গিয়ে দেখি সবাই টেবিলে খেতে বসেছে। সবার সঙ্গে ফুপাও আছেন। তাঁর মুখ সব সময় গম্ভীর থাকে। আজ আরো গম্ভীর। তাঁর চিঠি পেয়েই আমি এসেছি, তারপরেও তিনি এমন ভঙ্গি করলেন যেন আমাকে দেখে তাঁর ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে।

শুধু বাদল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। বিকট চিৎকার দিল, আরে হিমু দা, তুমি! তুমি কোত্থেকে?

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে আকাশ থেকে নেমে এসেছে। খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিস কেন? বোস।

বাদল বসল না। ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে রইল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম—তারপর, সব খবর ভালো? মনে হচ্ছে তুই ছুটিতে দেশে এসে আটকা পড়েছিস?

'হ্যাঁ, হিমু দা।'

'সবাই এমন চুপচাপ কেন?'

কেউ কিছু বলল না, শুধু বাদল বলল, এত দিন পর তোমাকে দেখছি—কী যে ভালো লাগছে! তুমি হাত ধুয়ে খেতে বস। মা, হিমু দাকে প্লেট দাও। আর একটা ডিম ভেজে দাও। হিমু দা ডিমভাজা খুব পছন্দ করে। ফার্মের ডিম না মা, দেশী মুরগির ডিম।

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, খামাকা কথা বলবি না বাদল। কথা বলে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিস। ভাত খা। ঘরে পাঁচ-ছ পদ তরকারি, এর মধ্যে আবার ডিম ভাজতে হবে? কাজের লোক নেই, কিচ্ছু নেই।

বাদল বলল, আমি ভেজে নিয়ে আসছি। হিমু দা, তুমি হাত ধুয়ে টেবিলে বস।

আমি হাত ধুয়ে টেবিলে বসলাম। বাদল তার মা-বাবার অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে সত্যি সত্যি ডিম ভাজতে গেল।

কাপে ডিম ফেটছে। চামচের শব্দ আসছে।

আমি টেবিলে বসতে বসতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের সমস্যাটা কী? আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছেন, বাদলের জন্যেই তো দিয়েছেন। কী করছে সে? চিকিৎসা করতে হলে রোগটা ভালোমতো জানা দরকার।

ফুপা বললেন, হারামজাদা দেশদরদী হয়েছে। অসহযোগের কারণে দেশ ধ্বংস হচ্ছে এই চিন্তায় হারামজাদার মাথা শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। সে অনেক চিন্তাভাবনা করে সমস্যা থেকে বাঁচার বুদ্ধি বের করেছে।

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, এটা তো ভালো। দেশের সব চিন্তাশীল মানুষই এই সময় দেশ ঠিক করার পদ্ধতি নিয়ে ভাবছেন। মানব বন্ধনফন্ধন কী সব যেন করছেন। হাত ধরাধরি করে শুকনা মুখে দাঁড়িয়ে থাকা। বাদলের পদ্ধতিটা কী?

ফুপা বললেন, গাধার পদ্ধতি তো গাধার মতোই।

'কী রকম সেটা? রাজপথে চার পায়ে হামাগুড়ি দেবে? হামাগুড়ি দিতে দিতে সচিবালয়ের দিকে যাবে?'

'সেটা করলেও তো ভালো ছিল—গাধাটা ঠিক করেছে জিরো পয়েন্টে গিয়ে রাজনীতিবিদদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বেকুবটা দু শ তেত্রিশ টাকা দিয়ে এক টিন কেরোসিন কিনে এনেছে। তার ঘরে সাজানো আছে। তুই এখন এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যা।'

'কেরোসিন কেনা হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে।'

'দেখি কী করা যায়।'

আমি খাওয়া শুরু করলাম। বাদল ডিম ভেজে হাসিমুখে উপস্থিত হল। আমি বললাম, কী রে, তুই নাকি গায়ে আগুন দিচ্ছিস?

বাদল উজ্জ্বল মুখে বলল, হ্যাঁ, হিমু দা। আইডিয়াটা পেয়েছি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে। আত্মাহুতি। পত্রপত্রিকায় নিউজটা ছাপা হলে রাজনীতিবিদরা একটা ধাক্কা খাবেন। দুই নেত্রীই বুঝবেন—পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে। তাঁরা তখন আলোচনায় বসবেন।

ফুপা তিক্ত গলায় বললেন, দুই নেত্রীর বোঝার হলে আগেই বুঝত। এই পর্যন্ত তো মানুষ কম মরেনি। তুই তো প্রথম না!

আমি বললাম, এইখানে আপনি একটা ভুল করছেন ফুপা। বাদল প্রথম তো বটেই। এমনিতেই মানুষ মরছে পুলিশের গুলিতে, বোমাবাজিতে কিন্তু আত্মাহুতি তো এখনো হয়নি। বাদলই হল প্রথম। পত্রিকায় ঠিকমতো জানিয়ে দিলে এরা ফটোগ্রাফার নিয়ে থাকবে। সিএনএন-কে খবর দিলে ক্যামেরা চলে আসবে। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা সবাই নিউজ কাভার করবে। এতে একটা চাপ তৈরি হবে তো বটেই।

ফুপা-ফুপু দুজনেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁদের হতভম্ব দৃষ্টি উপেক্ষা করে বাদলকে বললাম, বাদল, তোর আইডিয়া আমার পছন্দ হয়েছে।

'সত্যি পছন্দ হয়েছে, হিমু দা?'

'অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। দেশমাতৃকার জন্যে জীবনদান সহজ ব্যাপার তো না। তবে শোন, কেরোসিন ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আগুন দিবি। কেরোসিন হচ্ছে ভলাটাইল উদ্বায়ী। সঙ্গে সঙ্গে আগুন না দিলে উড়ে চলে যাবে—আগুন আর ধরবে না। আর একটা ব্যাপার বলা দরকার—শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আগুন ধরালে লাভ হবে না। লোকজন থাবাটাবা দিয়ে নিভিয়ে ফেলবে। তুই আলুপোড়া হনুমান হয়ে যাবি কিন্তু মরবি না। তোকে যা করতে হবে তা হল কেরোসিন ঢালার আগে দুটা গেঞ্জি, দুটা শার্ট পরতে হবে।'

বাদল কৃতজ্ঞ গলায় বলল, থ্যাংক য়্যু হিমু দা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তো বিরাট ঝামেলায় পড়তাম।

'এখন বল আত্মাহুতির তারিখ কবে ঠিক করেছিস?'

'আমি কিছু ঠিক করিনি। তুমি বলে দাও। তুমি যেদিন বলবে সেদিন।'

'দেরি করা ঠিক হবে না। তুই দেরি করলি আর দেশ অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে গেল, আর্মি এসে ক্ষমতা নিয়ে নিল—এটা কি ঠিক হবে?'

'না, ঠিক হবে না। হিমু দা, আগামী কাল বা পরশু?'

ফুপা-ফুপু দুজনেই খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফুপু যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন সেই দৃষ্টির নিক নেম হল অগ্নিদৃষ্টি। দু শ তেত্রিশ টাকা দামের কেরোসিন টিনের সবটুকু আগুন এখন তাঁর দুই চোখে। আমি তাঁর অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর গলায় বাদলকে বললাম, যা করার দু-একদিনের মধ্যেই করতে হবে। হাতে আমাদের সময় অল্প। এর মধ্যেই তোর নিজের কাজ সব গুছিয়ে ফেলতে হবে।

'আমার আবার কাজ কী?'

'আত্মীয়স্বজন সবার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া। পা ছুঁয়ে সালাম করা। সবার দোয়া নেয়া। এসএসসি পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েরা যা করে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দোয়া ভিক্ষা।'

'এইসব ফরমালিটিজ আমার ভালো লাগে না হিমু দা।'

'ভালো না লাগলেও করতে হবে। আত্মীয়স্বজনদের একটা সাধআহ্লাদ তো আছে। তোর চিন্তার কারণ নেই। আমি সঙ্গে যাব।'

'তুমি সঙ্গে গেলে যাব।'

আমি ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের জন্যে অ্যাডভান্স কুলখানি করলে কেমন হয় ফুপা? সবাইকে খবর দিয়ে একটা কুলখানি করে ফেললাম। ওনলি ওয়ান আইটেম—কাচ্চি বিরিয়ানি। বাদল নিজে উপস্থিত থেকে সবাইকে খাওয়াল। নিজের কুলখানি নিজে খাওয়াও একটা আনন্দের ব্যাপার।

ফুপা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ভয়ঙ্কর কিছু করে ফেলবেন কিনা কে জানে। কই মাছের ঝোলের বাটি আমার দিকে ছুড়ে ফেললে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি বাটি নিজের দিকে টেনে নিলাম।

বিকেলে বাদলকে নিয়েই বের হলাম। দু-একজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালে আসগর সাহেবকে দেখতে যাব। বাদলকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বড় কিছু করতে পারার আনন্দে সে ঝলমল করছে।

'বাদল!'

'জি।'

'তোর কাছে টাকা আছে?'

'এক শ বিয়াল্লিশ টাকা আছে।'

'তা হলে চল আমাকে শিককাবাব আর নানরুটি কিনে দে।'

'কেন?'

'একজনকে শিককাবাব আর নানরুটির দাওয়াত দিয়েছি। টাকার অভাবে কিনতে পারছি না।'

'কাকে দাওয়াত দিয়েছ?'

'একটা কুকুরকে। কাওরান বাজারে থাকে। পা খোঁড়া। আমার সঙ্গে খুব খাতির।'

অন্য কেউ হলে আমার কথায় বিস্মিত হত। বাদল হল না। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এদের সঙ্গে আমার ভাব তো থাকবেই। আমি তো সাধারণ কেউ না।

'হিমু দা!'

'বল।'

'তোমার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। তুমি এটা নিয়ে নিও। মরে গেলে তুমি পাবে না।'

'আমার কী আছে তোর কাছে?'

'ওই যে পাঁচ বছর আগে একটা সাঙ্কেতিক চিঠি দিয়েছিলে। মারিয়া নামের একটা মেয়ে তোমাকে লিখেছিল।'

'ওই চিঠি এখনো রেখে দিয়েছিস?'

'কী আশ্চর্য! তোমার একটা জিনিস তুমি আমার কাছে দিয়েছ আর আমি সেটা ফেলে দেব? তুমি আমাকে কী ভাব?'

'সাঙ্কেতিক চিঠি তুই এত চট করে ধরে ফেললি কী করে বল তো? এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না।'

বাদল আনন্দিত গলায় বলল, খুব সোজা। আমি তোমাকে বললাম, যে চিঠি দিয়েছে তার নাম কী? তুমি বললে—মারিয়া। কাজেই চিঠির শেষে তার নাম থাকবে। চিঠির শেষে লেখা ছিল NBSJB. (অর্থাৎ M-এর জায়গায় মেয়েটা লিখেছে N, A-র জায়গায় লিখেছে B, যেখানে R হবার কথা সেখানে লিখেছে S) মেয়েটা করেছে কী জান—যে অক্ষরটা লেখার কথা সেটা না লিখে তার পরেরটা লিখেছে। এখন বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

'চিঠিতে সে কী লিখেছিল তুমি জানতে চাওনি। বলব কী লিখেছে?'

'না। বাদল, একটা কথা শোন, তোর এত বুদ্ধি কিন্তু তুই একটা সহজ জিনিস বুঝতে পারছিস না।'

'সহজ জিনিসটা কী?'

'আজ থাক, আরেকদিন বলব।'

AMARBOI.COM

শিককাবাব এবং নানরুটি কিনে এনেছি। কুকুরটাকে পাওয়া গেছে। সে আমাকে দেখেই ছুটে এসেছে। বাদলের দিকে প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম—তোর খাবার এনেছি, তুই আরাম করে খা। এ হচ্ছে বাদল। অসাধারণ বুদ্ধিমান একটা ছেলে।

কুকুরটা বাদলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে দুবার ঘেউঘেউ করে খেতে শুরু করল।

আমি বললাম, মাংসটা আগে খা। নানরুটি খেয়ে পেট ভরালে পরে আর মাংস খেতে পারবি না।

কুকুরটা নানরুটি ফেলে মাংস খাওয়া শুরু করল। বাদল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, ও কি তোমার কথা বোঝে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমার ধারণা নিম্নশ্রেণীর পশুপাখি মানুষের কথা বোঝে। অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী মানুষই শুধু একে অন্যের কথা বোঝে না। বেগম খালেদা জিয়া কী বলছেন তা শেখ হাসিনা বুঝতে পারছেন না। আবার শেখ হাসিনা কী বলছেন তা বেগম খালেদা জিয়া বুঝতে পারছেন না। আমরা দেশের মানুষ কী বলছি সেটা আবার তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁরা কী বলছেন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার না।

বাদল বলল, কেন?

আমি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম, এই প্রশ্নের জবাব আমি জানি না। আসাদুল্লাহ সাহেব হয়তো জানেন।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে?'

'যে মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখেছিল তার বাবা। আসাদুল্লাহ সাহেব পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

কুকুরটা খেয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একবার খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে লেজ নাড়ল। যেন বলল—এত খাবার তোমাকে কে আনতে বলেছে? আমি সামান্য

পথের নেড়ি কুকুর। আমাকে এতটা মমতা দেখানো কি ঠিক হচ্ছে? আমাদের পশু জগতের নিয়ম খুব কঠিন। ভালবাসা ফেরত দিতে হয়। মানুষ হয়ে তোমরা বেঁচে গেছ। তোমাদের ভালবাসা ফেরত দিতে হয় না।

আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল, কথা হল না। তাঁকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। চলে আসছি, দরজার কাছের বেড থেকে একজন ক্ষীণস্বরে ডাকল—ভাই সাহেব!

আমি ফিরলাম।

'আমারে চিনছেন ভাই সাহেব?'

'না।'

'আমি মোহাম্মদ আব্দুল গফুর। আপনের কাছে চিঠি নিয়ে গেছিলাম। কুড়ি টাকা বকশিশ দিলেন।'

'খবর কী গফুর সাহেব?'

'খবর ভালো না ভাই সাহেব। বোমা খাইছি। রিকশা কইরা ফিরতেছিলাম। বোমা মারছে।'

'রিকশায় উঠতে নিষেধ করেছিলাম...'

'কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।'

'তা তো বটেই।'

'ঠ্যাং একটা কাইট্যা বাদ দিছে ভাই সাহেব।'

'একটা তো আছে। সেটাই কম কী? নাই মামার চেয়ে কানা মামা।'

'ভাই সাহেব, আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন ভাই সাহেব।'

'দেখি সময় পেলে করব। একেবারেই সময় পাচ্ছি না। হাঁটাহাঁটি খুব বেশি হচ্ছে। গফুর সাহেব, যাই?'

গফুর তাকিয়ে আছে। গফুরের বিছানায় যে মহিলা বসে আছেন তিনি বোধহয় গফুরের কন্যা। অসুস্থ বাবার পাশে কন্যার বসে থাকার দৃশ্যের চেয়ে মধুর দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম—"মা যাই?"

মেয়েটি চমকে উঠল। আমি তাকে মা ডাকব এটা বোধহয় সে ভাবেনি।

৭

মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বলাকা সিনেমা হলের সামনের পুরোনো বইয়ের দোকানে। আমি দূর থেকে লক্ষ করলাম এক ভদ্রলোক পুরোনো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে চামড়ার বাঁধানো মোটা একটা বই। তিনি খুবই অসহায় ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাচ্ছেন। যেন জনতার ভেতর কাউকে খুঁজছেন। ভদ্রলোকের পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। ফটোসেনসিটিভ গ্লাস বলেই দুপুরের কড়া রোদে সানগ্লাসের মতো কালো হয়ে ভদ্রলোকের চোখ ঢেকে দিয়েছে। আমি ভদ্রলোকের দিকে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হতভম্ব হবার প্রধান কারণ, এমন সুপুরুষ আমি অনেক দিন দেখিনি। সুন্দর পুরুষদের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। থাকলে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই এই ভদ্রলোককে পাঠানো যেত। চন্দ্রের কলঙ্কের মতো যাবতীয় সৌন্দর্যে খুঁত থাকে—আমি ভদ্রলোকের খুঁতটা কী বের করার জন্যে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে চমকে দিয়ে বললাম, কেমন আছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরিচিত কেউ কেমন আছেন বললে আমরা জবাব দেই না। হয় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকি, কিংবা বলি, আপনাকে চিনতে পারছি না। এই ভদ্রলোক তা করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললেন, জি ভালো।

কাছে এসেও ভদ্রলোকের চেহারায় খুঁত ধরতে পারা গেল না। পঞ্চাশের মতো বয়স। মাথাভরতি চুল। চুলে পাক ধরেছে—মাথার আধাআধি চুল পাকা। এই পাকা চুলেই তাঁকে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে—কুচকুচে কালো হলে তাঁকে মানাত না।

অসম্ভব রূপবতীদের বেলাতেও আমি এই ব্যাপারটা দেখেছি। তারা যখন যেভাবে থাকে—সেভাবেই তাদের ভালো লাগে। কপালে টিপ পরলে মনে হয়—আহ্, টিপটা কী সুন্দর লাগছে! টিপ না থাকলে মনে হয়—ভাগ্যিস, এই মেয়ে অন্য মেয়েগুলির মতো কপালে টিপ দেয়নি। টিপ দিলে তাকে একেবারেই মানাত না।

আমার ধারণা হল—ভদ্রলোকের চোখে হয়তো কোনো সমস্যা আছে। হয়তো চোখ ট্যারা, কিংবা একটা চোখ নষ্ট। সেখানে পাথরের চোখ লাগানো। ফটোসেনসিটিভ সানগ্লাস চোখ থেকে না খোলা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। কাজেই আমাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু সময় থাকতে হবে। এই সময়ের ভেতর নিশ্চয়ই তাঁর চোখে ধুলাবালি পড়বে। চোখ পরিষ্কার করার জন্যে চশমা খুলবেন। যদি দেখি ভদ্রলোকের চোখও সম্রাট অশোক-পুত্র কুনালের চোখের মতো অপূর্ব তা হলে আমার অনেক দিনের একটা আশা পূর্ণ হবে। আমি অনেক দিন থেকেই নিখুঁত রূপবান পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিখুঁত রূপবতীর দেখা পেয়েছি—রূপবানের দেখা এখনো পাইনি।

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিচিত মানুষের মতো হাসলাম। তিনিও হাসলেন—তবে ব্যাকুল ভঙ্গিতে চারদিক তাকানো দূর হল না। আমি বললাম, স্যার, কোনো সমস্যা হয়েছে?

তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, একটা সমস্যা অবিশ্যি হয়েছে। ভালো একটা পুরোনো বই পেয়েছি—Holder- এর Interpretation of Conscience. অনেক দিন বইটা খুঁজছিলাম, হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

আমি বললাম, বইটা কিনতে পারছেন না? টাকা শর্ট পড়েছে?

তিনি বললেন, জি। কী করে বুঝলেন?

'ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে। আমার কাছে একশ' এক শ টাকা আছে—এতে কি হবে?'

'এক শ' টাকা হলেই হবে।'

আমি এক শ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক খুব সহজভাবে নিলেন। অপরিচিত একজন মানুষ তাঁকে এক শ টাকা দিচ্ছে এই ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করল না। যেন এটাই স্বাভাবিক। ভদ্রলোক বই খুলে ভেতরের পাতায় আরেকবার চোখ বুলালেন—মনে হচ্ছে দেখে নিলেন মলাটে যে নাম লেখা ভেতরেও সেই নাম কিনা।

বই বগলে নিয়ে ভদ্রলোক এগুচ্ছেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তাঁর চোখ ভালোমতো না দেখে বিদেয় হওয়া যায় না। ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, আপনার নাম কী?

আমি বললাম, আমার নাম হিমালয়।

ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর নাম—হিমালয়। বললেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। হিমালয় নাম শুনে সবাই সামান্য হলেও কৌতূহল নিয়ে আমাকে দেখে, ইনি তাও দেখছেন না। যেন হিমালয় নামের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।

আমরা নিউ মার্কেটের কার পার্কিং এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি সাদা রঙের বড় একটা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভেতরে যাব কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আমার চেয়েও বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার বাড়িতে চলুন, আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। তারপর আমার ড্রাইভার আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে পৌঁছে দেবে।

'অসম্ভব। আমার এখন অনেক কাজ।'

'বেশ, আপনার ঠিকানা বলুন। আমি টাকা পৌঁছে দেব।

'আমার কোনো ঠিকানা নেই।'

'সে কী!'

'স্যার, আপনি বরং আপনার টেলিফোন নাম্বার দিন। আমি টেলিফোন করে একদিন আপনাদের বাসায় চলে যাব।'

'কার্ড দিচ্ছি, কার্ডে ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সবই আছে।'

'কার্ড না দেয়াই ভালো। আমার পাঞ্জাবির কোনো পকেট নেই। কার্ড হাতে নিয়ে ঘুরব, কিছুক্ষণ পর হাত থেকে ফেলে দেব। এরচে টেলিফোন নাম্বার বলুন, আমি মুখস্থ করে রেখে দি। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। একবার যা মুখস্থ করি তা ভুলি না।'

উনি টেলিফোন নাম্বার বললেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে বসলেন। তখনো তাঁর হাতে বইটি ধরা। মনে হচ্ছে বই হাতে নিয়েই গাড়ি চালাবেন। আমি বললাম, স্যার, দয়া করে এক সেকেন্ডের জন্যে আপনি কি চোখ থেকে চশমাটা খুলবেন?

'কেন?'

'ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটাব। অনেকক্ষণ থেকে আমার মনে হচ্ছিল আপনার একটা চোখ পাথরের।'

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এরকম মনে হবার কারণ কী? বলতে বলতে তিনি চোখ থেকে চশমা খুললেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখ দেখলাম।

পৃথিবীতে সবচে সুন্দর চোখ নিয়ে চারজন মানুষ জন্মেছিলেন—মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা, ট্রয় নগরীর হেলেন, অশোকের পুত্র কুনাল এবং ইংরেজ কবি শেলী। আমার মনে হল—এই চারটি নামের সঙ্গে আরেকটি নাম যুক্ত করা যায়। ভদ্রলোকের কী নাম? আমি জানি না—ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। তাঁর টেলিফোন নাম্বারও ইতোমধ্যে ভুলে গেছি। তাতে ক্ষতি নেই—প্রকৃতি তাঁকে কম করে হলেও আরো চারবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। এইসব ব্যাপারে প্রকৃতি খুব উদার—পছন্দের সব মানুষকে প্রকৃতি কমপক্ষে পাঁচবার মুখোমুখি করে দেয়। মুখোমুখি করে মজা দেখে।

কাজেই আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো চেষ্টা আর করলাম না। আমি থাকি আমার মতো—উনি থাকেন ওনার মতো। আমি ঠিক করে রেখেছি—একদিন নিশ্চয়ই আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তখন তাঁর সম্পর্কে জানা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মানুষটা ইন্টারেস্টিং। বই-প্রেমিক। হাতে বইটা পাবার পর আশপাশের সবকিছু ভুলে গেছেন। আমাকে সাধারণ ভদ্রতার ধন্যবাদও দেননি। আমি নিশ্চিত, আবার যখন দেখা হবে তখন দেবেন।

পরের বছর চৈত্র মাসের কথা (আমার জীবনের বড় বড় ঘটনা চৈত্র মাসে ঘটে। কে বলবে রহস্যটা কী?) বেলা একটার মতো বাজে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠে গেছে। অনেকক্ষণ হেঁটেছি বলে শরীর ঘামে ভিজে গেছে।পাঞ্জাবির এমন অবস্থা যে দুহাতে চিপে উঠোনের দড়িতে শুকোতে দেয়া যায়। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে বড় মাপের একটা গ্লাস। গ্লাস ভরতি পানি। তার উপর বরফের কুচি। কাচের পানির জগ হাতে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে। গ্লাস শেষ হওয়ামাত্র সে গ্লাস ভরতি করে দেবে। জগ হাতে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু হাত দেখা যাচ্ছে—ধবধবে ফরসা হাত। হাত ভরতি লাল আর সবুজ কাচের চুড়ি। জগে করে পানি ঢালার সময় চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ উঠছে।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। চৈত্র মাসের দুপুরে ঢাকার রাজপথে পানির জগ হাতে চুড়িপরা কোনো হাত থাকে না। আমি হাঁটতে হাঁটতে ভাবছি, কোনোদিন যদি প্রচুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা হয় তা হলে চৈত্র মাসে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় জলসত্র খুলে দেব। সেখানে হাসিখুশি তরুণীরা পথচারীদের বরফ-শীতল পানি খাওয়াবে। ট্যাপের পানি না—ফোটানো পানি। পানিবাহিত জীবাণু যে পানিকে দূষিত করেনি সেই পানি। তরুণীদের গায়ে থাকবে আকাশি রঙের শাড়ি। হাত ভরতি লাল-সবুজ চুড়ি। চুড়ির লাল রঙের সঙ্গে মিলিয়ে ঠোঁটে থাকবে আগুন-রঙা লিপস্টিক। তাদের চোখ কেমন হবে? তাদের চোখ এমন হবে যেন চোখের দিকে তাকালেই মনে হয়—

"প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

প্রচণ্ড রোদের কারণেই বোধহয় মরীচিকা দেখার মতো ব্যাপার ঘটল। আমি চোখের সামনে জলসত্রের মেয়েগুলিকে দেখতে পেলাম। একজন না, চার-পাঁচ জন। সবার হাতেই পানির জগ। হাত ভরতি লাল-সবুজ চুড়ি। আর তখন আমার পেছনে একটা গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে মাথা বের করে জলসত্রের তরুণীদের একজন বলল, এই যে শুনুন। কিছু মনে করবেন না। আপনার নাম কি হিমালয়?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'গাড়িতে উঠে আসুন। আমার নাম—মারিয়া।'

মেয়েটার বয়স তের-চৌদ্দ, কিংবা হয়তো আরো কম। বাচ্চা মেয়েরা হঠাৎ শাড়ি পরলে অন্য এক ধরনের সৌন্দর্য তাদের জড়িয়ে ধরে। এই মেয়েটির বেলায়ও তাই হয়েছে। মেয়েটি জলসত্রের মেয়েদের নিয়মমতো আকাশি রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়িপরা মেয়েদের কখনো তুমি বলতে নেই, তবু আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, কেমন আছ মারিয়া?

'জি, ভালো আছি।'

'তোমার হাতে লাল-সবুজ চুড়ি নেই কেন?'

মারিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল। কিছু বলল না। আমি মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। তাতে কিছু যায় আসে না।

মারিয়া বলল, আপনি কি অসুস্থ?

'না।'

'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ। আপনি তো আমাকে চেনেন না—আমি কে জানতে চাচ্ছেন না কেন?'

'তুমি কে?'

'আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে তাও তো আপনি জানেন না।'

'না। উনি কে?'

'উনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে আপনি একবার এক শ টাকা ধার দিয়েছিলেন। মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় এখনো মনে পড়েনি। আপনি বাবাকে বলেছিলেন—তাঁর একটা চোখ পাথরের—এখন মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা কি এখন তাঁর কাছে যাচ্ছি? তাঁকে ঋণমুক্ত করার পরিকল্পনা?'

'না—তিনি দেশে নেই। বছরে মাত্র তিনমাস তিনি দেশে থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবার দুমাস পরই তিনি চলে যান। এই দুমাস আপনি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে তিনি

খুব আপসেট ছিলেন। তিনি চলে যাবার আগে আপনার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে বলে গিয়েছিলেন যদি আপনাকে আমি বের করতে পারি তা হলে দারুণ একটা উপহার পাব। তারপর থেকে আমি পথে বের হলেই হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে দেখলেই জিজ্ঞেস করি—আপনার নাম কি হিমালয়? ভালো কথা, আপনি আসলে হিমালয় তো?'

'হুঁ—আমিই হিমালয়।'

'প্রমাণ দিতে পারেন?'

'পারি—আপনার বাবা যে বইটা কিনেছিলেন—তার নাম—"Interpretation of Conscience" '

'বাবা বলেছিলেন—আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ। আমার কাছে অবিশ্যি তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'গুলশানের দিকে যাচ্ছি।'

গাড়ির ভেতরে এসি দেয়া—শরীর শীতল হয়ে আসছে। ঘুমঘুম পাচ্ছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি জেগে থাকতে। ঘুম আনার জন্যে মানুষ ভেড়ার পাল গোনে। ঘুম না আসার জন্যে কিছু কি গোনার আছে? ভয়ঙ্কর কোনো প্রাণী গুনতে শুরু করলে ঘুম কেটে যাবার কথা। আমি মাকড়সা গুনতে শুরু করলাম।

একটা মাকড়সা, দুটা মাকড়সা, তিনটা—চারটা, পাঁচটা। সর্বনাশ! পঞ্চমটা আবার ব্লাক উইডো মাকড়সা—কামড়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু।

এত গোনাগুনি করেও লাভ হল না। মারিয়াদের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন আমি গভীর ঘুমে অচেতন। মারিয়া এবং তাদের ড্রাইভার দুজন মিলে ডাকাডাকি করেও আমার ঘুম ভাঙাতে পারছে না।

মারিয়াদের পরিবারের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। মারিয়ার বয়স তখন পনের। সেদিনই সে প্রথম শাড়ি পরে। শাড়ির রঙ বলেছি কি? ও হ্যাঁ, আগে একবার বলেছি। আচ্ছা আবারো বলি, শাড়ির রঙ জলসত্রের মেয়েদের শাড়ির মতো আকাশি নীল।

ঘুম ভেঙে দেখি চোখের সামনে হুলস্থুল ধরনের বাড়ি। প্রথম দর্শনে মনে হল বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। বুকে একটা ছোটখাটো ধাক্কার মতো লাগল। পুরো বাড়ি বোগেনভিলিয়ার গাঢ় লাল রঙে ঢাকা। হঠাৎ ঘুম ভাঙায় ফুলের রঙকে আগুন বলে মনে হচ্ছিল।

মারিয়া বলল, বাড়ির নাম মনে করে রাখুন—চিত্রলেখা। চিত্রলেখা হচ্ছে আকাশের একটা তারার নাম।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

'আজ বাড়িতে কেউ নেই। মা গেছেন রাজশাহী।'

আমি আবারো বললাম, ও আচ্ছা।

'আপনি কি টাকাটা নিয়ে চলে যাবেন, না একটু বসবেন?'

'টাকা নিয়ে চলে যাব।'

'বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না?'

'না।'

'তা হলে এখানে দাঁড়ান।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা আগ্রহ করেই আমাকে এত দূর এনেছে কিন্তু আমাকে বাড়িতে ঢুকানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমি তাতে তেমন অবাক হলাম না। আমি লক্ষ করেছি বেশিরভাগ মানুষই আমাকে বাড়িতে ঢোকাতে চায় না। দরজার ওপাশে রেখে আলাপ করে বিদায় করে দিতে চায়। রাস্তায় রাস্তায় দীর্ঘদিন হাঁটাহাঁটির ফলে আমার চেহারায় হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তা-ভাব চলে এসেছে। রাস্তা–ভাবের লোকজনদের কেউ ঘরে ঢোকাতে চায় না। রাস্তা-ভাবের লোক রাস্তাতেই ভালো। কথায় আছে না—

বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

আমি সম্ভবত রাস্তাতেই সুন্দর।

'হিমালয় সাহেব!'

আমি তাকালাম। বাড়ির ভেতর থেকে মারিয়া ইন্সটিমেটিক ক্যামেরা হাতে বের হয়েছে। বের হতে অনেক সময় নিয়েছে, কারণ সে শাড়ি বদলেছে। এখন পরেছে স্কার্ট। স্কার্ট পরায় একটা লাভ হয়েছে। মেয়েটা যে অসম্ভব রূপবতী তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। শাড়িতে যেমন অপূর্ব লাগছিল স্কার্টেও তেমন লাগছে। দীর্ঘ সময় গেটের বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট মেয়েটাকে দেখে একটু যেন কমল।

'আপনি সূর্যকে সামনে রেখে একটু দাঁড়ান। মুখের উপর সানলাইট পড়ুক। আপনার ছবি তুলব। বাবাকে ছবির একটা কপি পাঠাতে হবে। ছবি দেখলে বাবা বুঝবেন যে, আমি আসল লোকই পেয়েছিলাম।'

'হাসব?'

'হ্যাঁ, হাসতে পারেন।'

'দাঁত বের করে হাসব? না ঠোঁট টিপে?'

'যে ভাবে হাসতে ভালো লাগে সে ভাবেই হাসুন। আর এই নিন টাকা।'

মারিয়া এক শ টাকার দুটা নোট এগিয়ে দিল। দুটাই চকচকে নোট। বড়লোকদের সবই সুন্দর। আমি অল্প যে কজন দারুণ বড়লোক দেখেছি তাদের কারো কাছেই কখনো ময়লা নোট দেখিনি। ময়লা নোটগুলি এরা কি ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে ইস্ত্রি করে ফেলে? নাকি ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?

'আমি আপনার বাবাকে এক শ টাকা দিয়েছিলাম।'

'বাবা বলে দিয়েছেন যদি আপনার দেখা পাই তা হলে যেন দু শ টাকা দেই। কারণ—গ্রন্থ সাহেব বই-এ গুরু নানক বলেছেন—

দু গুনা দত্তার
চৌগুনা জুজার।

দুগুণ নিলে চারগুণ ফেরত দিতে হয়। বাবা সামনের মাসের ১৫ তারিখের পর আসবেন। আপনি তখন এলে বাবা খুব খুশি হবেন। আর বাবার সঙ্গে কথা বললে আপনার নিজেরও ভালো লাগবে।'

'আমার ভালো লাগবে সেটা কী করে বলছেন?'

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বাবার সঙ্গে যে পাঁচ মিনিট কথা বলে সে বারবার ফিরে আসে।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা বলা কি আপনার মুদ্রা দোষ? একটু পরপর আপনি ও আচ্ছা বলছেন।'

'কিছু বলার পাচ্ছি না বলে "ও আচ্ছা" বলছি।'

'বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসবেন তো?'

'আসব।'

'আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে—যে প্রশ্নের জবাব আপনি জানেন না—সেই প্রশ্ন বাবার জন্যে নিয়ে আসতে পারেন। আমার ধারণা, আমার বাবা এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

আমি যথাসম্ভব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম—'ও আচ্ছা'। মারিয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দারোয়ান গেট বন্ধ করে মোটা মোটা দুই তালা লাগিয়ে দিয়ে জেলের সেন্ট্রির

মতো তালা টেনে টেনে পরীক্ষা করতে লাগল। আমি হাতের মুঠোয় দুটা চকচকে নোট নিয়ে চৈত্রের ভয়াবহ রোদে রাস্তায় নামলাম। মারিয়া একবারও বলল না—কোথায় যাবেন বলুন, গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে। বড়লোকদের ঠাণ্ডা গাড়ি মানুষের চরিত্র খারাপ করে দেয়—একবার চড়লে শুধুই চড়তে ইচ্ছা করে। আমি রাস্তায় হাঁটা মানুষ, অল্প কিছু সময় মারিয়াদের গাড়িতে চড়েছি, এতেই হেঁটে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছে না।

আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হল আষাঢ় মাসে। বৃষ্টিতে ভিজে জবজবা হয়ে ওদের বাড়িতে গিয়েছি। দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ভাগ্যক্রমে মারিয়া এসে পড়ল। বড়লোকেরা বোধহয় কিছুতেই বিস্মিত হয় না। কাকভেজা অবস্থায় আমাকে দেখেও একবারও জিজ্ঞেস করল না—ব্যাপার কী? সহজ ভঙ্গিতে সে আমাকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। বিশাল একটা ঘরে ভদ্রলোক খালি গায়ে বিছানায় বসে আছেন। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা। তাঁর চোখ একটা খোলা বইয়ের দিকে। দেখেই বোঝা যায় ভদ্রলোক গভীর মনোযোগে বই পড়ছেন। আমরা দুজন যে ঢুকলাম তিনি বুঝতেও পারলেন না। মারিয়া বলল, বাবা, একটু তাকাবে?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ তাকাব। বলার পরেও তাকালেন না। যে পাতাটা পড়ছিলেন সে পাতাটা পড়া শেষ করে বই উল্টে দিয়ে তারপর তাকালেন। তাকিয়ে হেসে ফেললেন। আমি চমকে গেলাম। মানুষের হাসি এত সুন্দর হয়! তৎক্ষণাৎ মনে হল—ভাগ্যিস, মেয়ে হয়ে জন্মাই নি! মেয়ে হয়ে জন্মালে এই ঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব হত।

'হিমালয় সাহেব না?'

'জি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'জি ভালো।'

'বোস। খাটের উপর বোস।'

'আমি কিন্তু স্যার ভিজে জবজবা।'

'কোনো সমস্যা নেই। বোস। মাথা মুছবে?'

'জি না স্যার। বৃষ্টির পানি আমি গায়ে শুকাই। তোয়ালে দিয়ে বৃষ্টির পানি মুছলে বৃষ্টির অপমান হয়।'

আমি খাটে বসলাম। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন।

'তুমি কেমন আছ হিমালয়?'

'জি ভালো।'

'ওই দিন তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে এসেছিলাম—ধন্যবাদ পর্যন্ত দেইনি। আসলে মাথার মধ্যে সব সময় ছিল কখন বইটা পড়ব। জগতের চারপাশে তখন কী ঘটছিল তা আমার মাথায় ছিল না। ভালো কোনো বই হাতে পেলে আমার এরকম হয়।'

'বইটা কি ভালো ছিল?'

'আমি যতটা ভালো আশা করেছিলাম তারচে ভালো ছিল। এ জাতীয় বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না। পথেঘাটে পাওয়া যায়। আমি একবার পুরোনো খবরের কাগজ কিনে এরকম ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে একটা বই যোগাড় করেছিলাম। বইটার নাম 'Dawn of Intelligence' এইটিন নাইনটি টু-তে প্রকাশিত বই—অথর হচ্ছেন ম্যাক মাস্টার। রয়েল সোসাইটির ফেলো। চামড়া দিয়ে মানুষ বই বাঁধিয়ে রাখে—ওই বইটা ছিল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো।

মারিয়া বলল, বইয়ের কচকচানি শুনতে ভালো লাগছে না বাবা—আমি যাচ্ছি। তোমাদের চা বা কফি কিছু লাগলে বল, আমি পাঠিয়ে দেব।

AMARBOI.COM

আসাদুল্লাহ সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের চা দাও। আর শোন, হিমালয়, তুমি আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাবে। তোমার কি আপত্তি আছে?

'জি না।'

'তোমাকে কি এক সেট শুকনো কাপড় দেব?'

'লাগবে না স্যার। শুকিয়ে যাবে।'

'তোমাকে দেখে এত ভালো লাগছে কেন বুঝতে পারছি না। মারিয়া, তুই বল তো এই ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভালো লাগছে কেন?'

'তোমার ভালো লাগছে কারণ তুমি ধরে নিয়েছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তাকে ধন্যবাদ দিতে পারবে না। সারা জীবন ঋণী হয়ে থাকবে। তুমি ঋণ শোধ করতে পেরেছ, এই জন্যেই ভালো লাগছে।'

'ভেরি গুড—যতই দিন যাচ্ছে তোর বুদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে।'

মারিয়া চা আনতে গেল। আমি আসাদুল্লাহ সাহেবকে বললাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আমি আসলে আপনাকে দেখতে আসিনি, প্রশ্নটা করতে এসেছি।

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কী প্রশ্ন?

'এই জীবজগতে মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী কি আছে যে আত্মহত্যা করতে পারে?'

'আছে। লেমিং বলে এক ধরনের প্রাণী আছে। ইঁদুর গোত্রীয়। স্ত্রী-লেমিংদের বছরে দুটা বাচ্চা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রতি চার বছর পরপর দুটার বদলে এদের বাচ্চা হয় দশটা করে। তখন ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব। এরা তখন করে কী—দল বেঁধে সমুদ্রের দিকে হাঁটা শুরু করে। একসময় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। মিনিটদশেক মনের আনন্দে সমুদ্রের পানিতে সাঁতরায়। তারপর সবাই দল বেঁধে সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করে। মাস সুইসাইড।'

'বলেন কী!'

'নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে মাস সুইসাইডের ব্যাপারটা আছে। সিল মাছ করে, নীল তিমিরা করে, হাতি করে। আবার এককভাবে আত্মহত্যার ব্যাপারও আছে। একক আত্মহত্যার ব্যাপারটা দেখা যায় প্রধানত কুকুরের মধ্যে। প্রভুর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে এরা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে আত্মহত্যা করে। পশুদের আত্মহত্যার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছ কেন?'

'জানতে চাচ্ছি, কারণ—আপনার কন্যার ধারণা আপনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। সত্যি জানেন কি না পরীক্ষা করলাম।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আবারো হাসছেন। আমার আবারো মনে হল, মানুষ এত সুন্দর করে হাসে কীভাবে?

'মারিয়ার এরকম ধারণা অবিশ্যি আছে, যদিও তার মার ধারণা, আমি পৃথিবীর কোনো প্রশ্নেরই জবাব জানি না। ভালো কথা, হিমালয় নামটা ডাকার জন্যে একটু বড় হয়ে গেছে—হিমু ডাকলে কি রাগ করবে?'

'জি না।'

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'ব্যাপারটা কী তোমাকে বলি—আমার হল জাহাজের নাবিকের চাকরি। সিঙ্গাপুরের গোল্ডেন হেড শিপিং করপোরেশনের সঙ্গে আছি। মাসের পর মাস থাকতে হয় সমুদ্রে। প্রচুর অবসর। আমার আছে বই পড়ার নেশা—ক্রমাগত পড়ি। স্মৃতিশক্তি ভালো, যা পড়ি মনে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চট করে জবাব দিতে পারি।'

'এনসাইক্লোপিডিয়া হিউমেনিকা?'

'হা হা হা। তুমি তো মজা করে কথা বল। মোটেই এনসাইক্লোপিডিয়া না। আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দুবার পড়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া মানুষ কেনে সাজিয়ে রাখার জন্যে, পড়ার জন্যে না। আমার হাতে ছিল প্রচুর সময়—সময়টা কাজে লাগিয়েছি। পড়েছি।'

'পড়তে আপনার ভালো লাগে?'

'শুধু ভালো লাগে না, অসাধারণ ভালো লাগে। প্রায়ই কী ভাবি জান? প্রায়ই ভাবি, মৃত্যুর পর আমাকে যদি বেহেশতে পাঠানো হয় তখন কী হবে? সেখানে কি লাইব্রেরি আছে? নানান ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটে দেখেছি। স্বর্গে লাইব্রেরি আছে এরকম কথা কোনো ধর্মগ্রন্থে পাইনি। সুন্দরী হুরদের কথা আছে, খাদ্য-পানীয়ের কথা আছে, ফলমূলের কথা আছে, বাট নো লাইব্রেরি।'

'বেহেশতে আপনি নিজের ভুবন নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারবেন। আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার হাতের কাছেই থাকবে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির মতো প্রকাণ্ড লাইব্রেরি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, নিজের বেহেশত নিজের মতো করা গেলে আমার বেহেশত কী রকম হবে তোমাকে বলি—সুন্দর একটা বিছানা থাকবে, বিছানায় বেশ কয়েকটা বালিশ। চারপাশে আলমিরা ভরতি বই, একদম হাতের কাছে, যেন বিছানা থেকে না নেমেই বই নিতে পারি। কলিংবেল থাকবে—বেল টিপলেই চা আসবে।

'গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে না?'

'ভালো কথা মনে করেছ। অবশ্যই গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে। সফট স্টেরিও মিউজিক সারাক্ষণ হবে। মিউজিক পছন্দ না হলে আপনাআপনি অন্য মিউজিক বাজা শুরু হবে। হাত দিয়ে বোতাম টিপে ক্যাসেট বদলাতে হবে না।'

'সারাক্ষণ ঘরে বন্দি থাকতে ভালো লাগবে?'

'বন্দি বলছ কেন? বই খোলা মানে নতুন একটা জগৎ খুলে দেয়া।'

'তার পরেও আপনার হয়তো আকাশ দেখতে ইচ্ছা করবে।'

'এটাও মন্দ বলনি। হ্যাঁ থাকবে, বিশাল একটা জানালা আমার ঘরে থাকবে। তবে জানালায় মোটা পরদা দেয়া থাকবে। যখন আকাশ দেখতে ইচ্ছে করবে—পরদা সরিয়ে দেব।'

'এই হবে আপনার বেহেশত?'

'হ্যাঁ, এই।'

'আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা এরা আপনার পাশে থাকবে না?'

'থাকলে ভালো। না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

'ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনার বেহেশতে কিছু বাদ পড়ে যায় নি তো?'

'না, সব আছে।'

'খুব প্রিয় কিছু হয়তো বাদ পড়ে গেল।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন এক্ষুনি বেহেশতটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি হাসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, ও, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। ভালো একটা আয়না লাগবে। এক সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় এরকম একটা আয়না। আমার একটা মেয়েলি স্বভাব আছে। আয়নায় নিজেকে দেখতে আমার ভালো লাগে।

'সবারই আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগে।'

আসাদুল্লাহ সাহেব চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি কি জান আয়নায় মানুষ যে ছবিটা দেখে সেটা আসলে ভুল ছবি? উল্টো ছবি। আয়নার ছবিটাকে বলে মিরর ইমেজ। আয়নায় নিজেকে দেখা যায় না—উল্টোমানুষ দেখা যায়।

'এমন একটা আয়না কি বানানো যায় না যেখানে মানুষ যেমন তেমনই দেখা যাবে?'

'সেই চেষ্টা কেউ করেনি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভুরু কুঁচকে ফেললেন। আমি বললাম, এত চিন্তিত হয়ে কী ভাবছেন?

'ভাবছি, বেহেশতের পরিকল্পনায় কিছু বাদ পড়ে গেল কিনা।'

আসাদুল্লাহ সাহেব মৃত্যুর আগেই তাঁর বেহেশত পেয়ে গেছেন। তাঁর চারটা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এক মে মাসে ঢাকা শহরে রিকশা নিয়ে বের হলেন। গাড়িতে চড়লে আকাশ দেখা যায় না। রিকশায় চড়লে আকাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায় বলেই রিকশা নেয়া। আকাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন, একটা টেম্পো এসে রিকশাকে ধাক্কা দিল। এমন কিছু ভয়াবহ ধাক্কা না, তার পরেও তিনি রিকশা থেকে পড়ে গেলেন—মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেল। পেরোপ্লাজিয়া হয়ে গেল। সুষুম্নাকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হল। তাঁর বাকি জীবনটা কাটবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। ডাক্তাররা সেরকমই বলেছেন।

আমি তাঁকে একদিন দেখতে গেলাম। যে ঘরে তিনি আছেন তার ঠিক মাঝখানে বড় একটা বিছানা। বিছানায় পাঁচ-ছটা বালিশ। তিন পাশে আলমিরা ভরতি বই। হাতের কাছে স্টেরিও সিস্টেম। বিছানার মাথার কাছে বড় জানালা। জানালায় ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ড। সবই আছে, শুধু কোনো আয়না চোখে পড়ল না।

আমাকে দেখেই আসাদুল্লাহ সাহেব হাসিমুখে বললেন, খবর কী হিমু সাহেব?

আমি বললাম, জি ভালো।

'তোমার কাজ তো শুনি রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা—হাঁটাহাঁটি ঠিকমতো হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'কী খাবে বল, চা না কফি? একবার বেল টিপলে চা আসবে। দুবার টিপলে কফি। খুব ভালো ব্যবস্থা।'

'কফি খাব।'

আসাদুল্লাহ সাহেব দুবার বেল টিপলেন। আবারো হাসলেন। তাঁর হাসি আগের মতোই সুন্দর। প্রকৃতি তাঁকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে কিন্তু সৌন্দর্য হরণ করেনি। সেদিন বরং হাসিটা আরো বেশি সুন্দর লাগল।

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'জীবিত অবস্থাতেই আমি আমার কল্পনার বেহেশত পেয়ে গেছি। আমার কি উচিত না গড অলমাইটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হওয়া?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কবিতা শুনবে?'

'আপনি শুনাতে চাইলে শুনব।'

'আগে কবিতা ভালো লাগত না। ইদানীং লাগছে—শোন...'

আসাদুল্লাহ সাহেব কবিতা আবৃত্তি করলেন। ভদ্রলোকের সবকিছুই আগের মতো আছে। শুধু গলার স্বরে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। মনে হয় অনেক দূর থেকে কথা বলছেন—

"এখন বাতাস নেই—তবু
শুধু বাতাসের শব্দ হয়
বাতাসের মতো সময়ের।
কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।
কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন
হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বল দেখি কার কবিতা?'

'বলতে পারছি না, আমি কবিতা পড়ি না।'

'কবিতা পড় না?'

'জি না। আমি কিছুই পড়ি না। দু–একটা জটিল কবিতা মুখস্থ করে রাখি মানুষকে ভড়কে দেবার জন্যে। আমার কবিতা-প্রীতি বলতে এইটুকুই।'

কফি চলে এসেছে। গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভালো কফি। আমি কফি খাচ্ছি। আসাদুল্লাহ সাহেব উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর হাতে কফির কাপ। তিনি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে। সেই জানালায় ভারী পরদা। আকাশ দেখার উপায় নেই। আসাদুল্লাহ সাহেবের এখন হয়তো আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে না।

৮

'কেমন আছেন আসগর সাহেব?'

'জি ভালো।'

'কী রকম ভালো?'

আসগর সাহেব হাসলেন। তাঁর হাসি দেখে মনে হল না তিনি ভালো। মৃত্যুর ছায়া যাদের চোখে পড়ে তারা এক বিশেষ ধরনের হাসি হাসে। উনি সেই হাসি হাসছেন।

আমি একবার ময়মনসিংহ সেন্ট্রাল জেলে এক ফাঁসির আসামি দেখতে গিয়েছিলাম। ফাঁসির আসামি কীভাবে হাসে সেটা আমার দেখার শখ। ফাঁসির আসামির নাম হোসেন মোল্লা। তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হল। শুধু যক্ষ্মা রোগীর মতো জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখও অস্থির, একবার এদিকে যাচ্ছে, একবার ওদিকে। বেচারার ফাঁসির দিন-তারিখ জেলার সাহেব ঠিক করতে পারছেন না, কারণ বাংলাদেশে নাকি দুই ভাই আছে যারা বিভিন্ন জেলখানায় ফাঁসি দিয়ে বেড়ায়। তারা ডেট দিতে পারছে না। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে আমি যেদিন গিয়েছি সেদিনই দুই ভাই চলে এসেছে। পরদিন ভোরে হোসেন মোল্লার সময় ধার্য হয়েছে। হোসেন মোল্লা আমাকে শান্ত গলায় বলল, "ভাই সাহেব, এখনো হাতে মেলা সময়। এই ধরেন, আইজ সারা দিন পইরা আছে, তার পরে আছে গোটা একটা রাইত। ঘটনা ঘটনের এখনো মেলা দেরি।" বলেই হোসেন হাসল। সেই হাসি দেখে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিল। প্রেতের হাসি।

আসগর সাহেবের হাসি দেখেও গায়ে কাঁটা দিল। কী ভয়ঙ্কর হাসি! আমি বললাম, ভাই, আপনার কী হয়েছে? ডাক্তার বলছে কী?

'আলসার। সারা জীবন অনিয়ম করেছি—খাওয়াদাওয়া সময়মতো হয় নাই, সেখান থেকে আলসার।'

'পেটে রোলারের গুঁতাও তো খেয়েছিলেন।'

'রোলারের গুঁতা না খেলেও যা হবার হত। সব কপালের লিখন, তাই না হিমু ভাই?'

'তা তো বটেই।'

'দূরে বসে চিকন কলমে একজন কপাল ভরতি লেখা লেখেন। সেই লেখার ওপরে জীবন চলে।'

'হুঁ। মাঝে মাঝে ওনার কলমের কালি শেষ হয়ে যায়, তখন কিছু লেখেন না। মুখে বলে দেন—"যা ব্যাটা নিজের মতো চড়ে খা"—এই বলে নতুন কলম নিয়ে অন্য একজনের কপালে লিখতে বসেন।'

'বড়ই রহস্য এই দুনিয়া!'

'রহস্য তো বটেই—এখন বলুন আপনার চিকিৎসার কী হচ্ছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অপারেশন হবার কথা।'

'হবার কথা, হচ্ছে না কেন?'

'দেশে এমন সমস্যা। ডাক্তাররা ঠিকমতো আসতে পারেন না। অল্প সময়ের জন্যে অপারেশন থিয়েটার খোলে। আমার চেয়েও যারা সিরিয়াস তাদের অপারেশন হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো ভয়-ভীতি নাই হিমু ভাই।'

আমি আবারো বললাম, ও আচ্ছা।

'ভালোমতো মরতে পারাও একটা আনন্দের ব্যাপার।'

'আপনি শিগগিরই মারা যাচ্ছেন?'

'জি।'

'মরে গেলে সাত হাজার টাকাটার কী হবে? ওই লোক যে কোনোদিন চলে আসতে পারে।'

'ও আসবে না।'

'বুঝলেন কী করে আসবে না?'

'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'তার সঙ্গে কথা হয়েছে মানে? সে কি হাসপাতালে এসেছিল?'

'জি।'

'আসগর ভাই, ব্যাপারটা ভালোমতো বুঝিয়ে বলুন তো। আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না।'

আসগর সাহেব মৃদু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। বোঝা যাচ্ছে যা বলছেন—খুব আগ্রহ নিয়ে বলছেন।

'বুঝলেন হিমু ভাই—প্রচণ্ড ব্যথার জন্য রাতে ঘুমাতে পারি না। গত রাতে ডাক্তার সাহেব একটা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। রাত তিনটার দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি খুব পানির পিপাসা। হাতের কাছে টেবিলের উপর একটা পানির জগ আছে। জগে পানি নাই। জেগে আছি—নার্সদের কেউ এদিকে আসলে পানির কথা বলব। কেউ আসছে না। হঠাৎ কে যেন দুবার কাশল। আমার টেবিল উত্তর দিকে—কাশিটা আসল দক্ষিণ দিক থেকে। মাথা ঘুরিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখি—মনসুর।'

'মনসুর কে?'

'যে আমাকে সাত হাজার এক টাকা দিয়ে গিয়েছিল—সে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি গেলাম রেগে। এই লোকটা আমাকে কী যন্ত্রণায় ফেলেছে ভেবে দেখুন দেখি। আমি বললাম—তোমার ব্যাপারটা কী? কোথায় ছিলে তুমি? তুমি কি জান তুমি আমাকে কী যন্ত্রণায় ফেলেছ? মনসুর চুপ করে রইল। মাথাও তোলে না। আমি বললাম, কথা বল না কেন? শেষে সে বলল, ভাইজান, আমি আসব ক্যামনে? আমার মৃত্যু হয়েছে। আপনে যেমন মনঃকষ্টে আছেন আমিও মনঃকষ্টে আছি। এত কষ্টের টাকা পরিবাররে পাঠাইতে পারি নাই।

আমি বললাম, তুমি ঠিকানা বল আমি পাঠিয়ে দিব। টাকার পরিমাণ আরো বেড়েছে। পোস্টাপিসের পাস বইয়ে টাকা রেখে দিয়েছিলাম। বেড়ে ডবলের বেশি হবার কথা। আমি খোঁজ নেই নাই। তুমি ঠিকানাটা বল।

মনসুর আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমি বললাম, কথা বল। চুপ করে আছ কেন? মনসুর বলল—ঠিকানা মনে নাই স্যার। পরিবারের নামও মনে নাই।

—বলেই কান্না শুরু করল। তখন একজন নার্স ঢুকল—তাকিয়ে দেখি মনসুর নাই। আমি নার্সকে বললাম, সিস্টার, পানি খাব। তিনি আমাকে পানি খাইয়ে চলে গেলেন। আমি সারা রাত জেগে থাকলাম মনসুরের জন্যে। তার আর দেখা পেলাম না। এই হচ্ছে হিমু ভাই ঘটনা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এটা কোনো ঘটনা না—এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেছেন।'

'জি না ভাই সাহেব, স্বপ্ন না। স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা। মনসুর আগের মতোই আছে, তার কোনো পরিবর্তন হয় নাই।'

'আসগর ভাই, মনসুর মরে ভূত হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছে? আপনার কথা তার মনে আছে অথচ পরিবারের নাম-ঠিকানা ভুলে গেছে—এট কি হয়? হয় না। এই ধরনের ঘটনা স্বপ্নে ঘটে। আপনাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে—আপনি তার মধ্যে স্বপ্নের মতো দেখেছেন।'

'স্বপ্ন না হিমু ভাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান, স্বপ্ন না।'

'আমার মৃত্যুর পর আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে হিমু ভাই।'

'যা বলবেন করব।'

'কাজগুলি কি বলব?'

'আপনি নিশ্চয়ই দু-একদিনের মধ্যে মারা যাচ্ছেন না। কিছু সময় তো হাতে আছে?'

'কী করে বলব ভাই সাহেব—হায়াত-মউত তো আমাদের হাতে না।'

'কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মৃত্যু আপনার নিজের হাতে। শুনুন আসগর সাহেব, আপনাকে এখন মরলে চলবে না—আমাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে। আপনার মুক্তার মতো হাতের লেখায় আপনি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখবেন।'

'কাকে লিখব?'

'একটা মেয়েকে লিখবেন। তার নাম মারিয়া। খুব দামি কাগজে খুব সুন্দর কালিতে চিঠিটা লিখতে হবে।'

'অবশ্যই লিখব হিমু ভাই। আনন্দের সঙ্গে লিখব।'

'সমস্যা হল কী জানেন? অসহযোগের জন্যে দোকানপাট সব বন্ধ। দামি কাগজ যে কিনব সেই উপায় নেই। কাজেই অসহযোগ না কাটা পর্যন্ত যেভাবে হোক আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা মনে রাখবেন। আমাকে যদি চিঠিটা লিখে না দিয়ে যান তা হলে আমার একটা আফসোস থাকবে।'

'আপনার চিঠি আমি অবশ্যই লিখে দেব হিমু ভাই।'

'তা হলে আজ উঠি।'

'আরেকটু বসেন।'

'অসুস্থ মানুষের পাশে বসে থাকতে ভালো লাগে না।'

আসগর সাহেব নিচু গলায় বললেন, আমার শরীরটা অসুস্থ কিন্তু হিমু ভাই মনটা সুস্থ। আমার মনে কোনো রোগ নাই।

আমি চমকে তাকালাম। মৃত্যু-লক্ষণ বলে একটা ব্যাপার আছে। মৃত্যুর আগে আগে এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মানুষ হঠাৎ করে উচ্চস্তরের দার্শনিক কথাবার্তা বলতে শুরু করে। তাদের চোখের জ্যোতি নিভে যায়। চোখে কোনো প্রাণ থাকে না। শরীরের যে অংশ সবার আগে মারা যায়—তার নাম চোখ।

'হিমু ভাই!'

'জি।'

'ডাক চলাচল কি আছে?'

'কিছুই চলছে না—ডাক চলবে কীভাবে?'

'আমার আত্মীয়স্বজনদের একটু খবর দেয়া দরকার। ওদের দেখার জন্য যে মনটা ব্যস্ত তা না—অসুস্থ ছিলাম এই খবরটা তারা না পেলে মনে কষ্ট পাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডাক চলাচল শুরু হলেই খবর দিয়ে দেব।'

'মানুষ খুব কষ্ট করছে, তাই না হিমু ভাই?'

'বড় বড় নেতারা যদি ভুল করেন তা হলে সাধারণ মানুষ তো কষ্ট করবেই।'

'আমরা যারা ছোট মানুষ আছি হিমু ভাই—আমরাও ভুল করি। মানুষের জন্মই হয়েছে ভুল করার জন্য। তবে হিমু ভাই, ছোট মানুষের ভুল ছোট ছোট। তাতে তার নিজের ক্ষতি, আর কারোর ক্ষতি হয় না। বড় মানুষের ভুলগুলোও বড় বড়। তাদের ভুলে সবার ক্ষতি হয়। আমরা ছোট মানুষরা নিজেদের মঙ্গল চাই। বড় মানুষরাও তাঁদের মঙ্গল চান। কিন্তু হিমু ভাই, তাঁরা ভুলে যান, যেহেতু তাঁরা বড় সেহেতু তাঁদের নিজেদের মঙ্গল দেখলে হবে না। তাঁদের দেখতে হবে সবার মঙ্গল। ঠিক বলেছি?'

'ঠিক বলেছেন। আমাকে এই সব ঠিক কথা বলে লাভ কী? যাঁদের বলা দরকার তাঁদের বললে তো তাঁরা শুনবেন না।'

'একটা কি ব্যবস্থা করা যায় হিমু ভাই—আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দুটা কথা বলব, শেখ হাসিনার সঙ্গে দুটা কথা বলব—এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তো কথা বলা যাবে না। উনি জেলে।'

'কারো সঙ্গেই কথা বলা যাবে না—নেতারা সবাই আসলে জেলে। নিজেদের তৈরি জেলখানায় তাঁরা আটকা পড়ে আছেন। সেই জেলখানা পাহারা দিচ্ছে তাঁদেরই প্রিয় লোকজন। তাঁরা তা জানেন না। তাঁরা মনে করেন তাঁরা স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ...আসগর সাহেব!'

'জি হিমু ভাই।'

'উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনা করে কোনো লাভ নেই। আপনি ঘুমাবার চেষ্টা করেন।'

'জি আচ্ছা। আপনাকে একটা কথা বলব হিমু ভাই, যদি মনে কিছু না করেন।'

'জি না, মনে কিছু করব না।'

'আপনি যে চিঠিটা আমাকে দিয়ে লেখাবেন সেই চিঠির কাগজটা আমি কিনব।'

'সেটা হলে তো খুবই ভালো হয়। আমার হাত একেবারে খালি।'

'বাংলাদেশের সবচে দামি কাগজটা আমি আপনার জন্যে কিনব হিমু ভাই।'

'শুধু কাগজ কিনলে তো হবে না—কলমও লাগবে, কালিও লাগবে। সবচে দামি কাগজে দুটাকা দামের বল পয়েন্টে লিখবেন তা তো হয় না। দামি কাগজে লেখার জন্যে লাগে দামি কলম।'

'খুবই খাঁটি কথা বলেছেন হিমু ভাই—কলম আর কালিও আমি কিনব। আমি যে আপনাকে কী পছন্দ করি আপনি জানেন না হিমু ভাই।'

'জানব না কেন, জানি। ভালবাসা মুখ ফুটে বলতে হয় না। ভালবাসা টের পাওয়া যায়। আজ যাই আসগর সাহেব! দেশ স্বাভাবিক হোক। দোকানপাট খুলুক—আপনাকে সঙ্গে নিয়ে কাগজ-কলম কিনে আনব।'

'অবশ্যই। অবশ্যই।'

'আর ইতোমধ্যে যদি মনসুর এসে আপনাকে বিরক্ত করে তা হলে কষে ধমক লাগাবেন। মানুষ হয়ে ভূতদের হাংকিপাংকি সহ্য করা কোনো কাজের কথা না।'

আজ হরতালের কত দিন চলছে? মনে হচ্ছে সবাই দিন-তারিখের হিসেব রাখা ভুলে গেছে। নগরীর জন্ডিস হয়েছে। নগরী পড়ে আছে ঝিম মেরে। এই রোগের চিকিৎসা নেই—বিশ্রামই একমাত্র চিকিৎসা। নগরী বিশ্রাম নিচ্ছে। আগের হরতালগুলিতে মোটামুটি আনন্দ ছিল। লোকজন ভিডিও ক্যাসেটের দোকান থেকে ক্যাসেট নিয়ে যেত। স্বামীরা দুপুরে স্ত্রীদের সঙ্গে ঘুমানোর সুযোগ পেত। স্ত্রীরা আঁতকে উঠে বলত—এ কী! দিনে-দুপুরে দরজা লাগাচ্ছ কেন? বাড়ি ভরতি ছেলেমেয়ে। স্বামী উদাস গলায় বলত, আজ হরতাল না?

এখনকার অবস্থা সে রকম না, এখন অন্য রকম পরিবেশ। জন্ডিসে আক্রান্ত নগরী রোগ সামলে গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারবে তো—এটাই সবার জিজ্ঞাসা। নাকি নগরীর মৃত্যু হবে? মানুষের মতো নগরীরও মৃত্যু হয়।

আমি হাঁটছি। আমার পাশে পাশে হাঁটছে বাদল। আমি বললাম—দীর্ঘ হরতালের কিছু কিছু উপকারিতা আছে। বল তো কী কী?

'রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না।'

'গুড। হয়েছে—আর কী?'

'পলিউশন কমেছে—গাড়ির ধোঁয়া, কার্বন মনক্সাইড কিচ্ছু নেই।'

'ভেরি গুড।'

'লোকজন বেশি হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে। ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কমছে।'

'হয়েছে—আর কী?'

'আরবদের কাছ থেকে আমাদের পেট্রোল কিনতে হচ্ছে না। কিছু ফরেন কারেন্সি বেঁচে যাচ্ছে।'

'হুঁ।'

'আমরা পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারছি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে।'

'হুঁ।'

'পলিটিক্স নিয়ে সবাই আলোচনা করছি—আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ নিয়ে সবাই ভাবছি।'

'আর কিছু আছে?'

'আর তো কিছু মনে পড়ছে না।'

'আরো অনেক আছে। ভেবে ভেবে সব পয়েন্ট বের কর, তারপর একটা লিফলেট ছাড়ব।'

'তাতে লাভ কী?'

'আছে, লাভ আছে।'

'তোমার ভাবভঙ্গি আমি কিছুই বুঝি না। তুমি কোন দলের লোক বল তো? আওয়ামী লীগ, না বিএনপি?'

'আওয়ামী লীগ যখন খারাপ কিছু করে তখন আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি। আর বিএনপি যখন খারাপ কিছু করে তখন বিএনপির সমর্থক।'

'এর মানে কী?'

'ভালো কাজের সমর্থন সব সময়ই থাকে। খারাপ কাজগুলির সমর্থনের লোক পাওয়া যায় না। আমি সেই লোক। খারাপ কাজের জন্যেও সমর্থন লাগে। কারণ সব খারাপের মধ্যেও কিছু মঙ্গল থাকে।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায় হিমু দা?'

'একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।'

'কে? মারিয়া?'

'উঁহু, তার নাম জয়গুন।'

'জয়গুন কে?'

'তুই চিনবি না—খারাপ ধরনের মেয়ে।'

'ও আচ্ছা।'

বাদল চমকাল না বা বিস্মিত হল না। সে আমার আদর্শ ভক্ত। দলপতির কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছু বলবে না। বিস্মিত হবে না, চমকাবে না। অন্ধের মতো অনুসরণ করবে। একদল মানুষ কি শুধু অনুসরণ করার জন্যেই জন্মায়?

AMARBOI.COM

প্রথম তিনটা টোকা, তারপর একটা, তারপর আবার তিনটা। এরকম করতে থাকলে জয়গুন নামের অতি রূপবতী এক তরুণীর এসে দরজা খুলে দেবার কথা। যার শাড়ি থাকবে এলোমেলো। যার ব্লাউজের দুটা বোতাম নেই—।

বেশ কয়েকবার মোর্স কোডের ভঙ্গিতে তিন এক তিন এক শব্দ করার পর দরজা সামান্য খুলল। সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না দরজা কে খুলেছে। কানা কুদ্দুস বলে দিয়েছিল, দরজা খুলবে জয়গুন। সেই ভরসাতে আন্দাজের ওপর বললাম—কেমন আছ জয়গুন?

ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এল—আপনে কে?

'আমার নাম হিমু।'

দরজা খুলে গেল। আমার সামনে জয়গুন দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর শাড়ি মোটেও এলোমেলো নয়। তার ব্লাউজের বোতামও ঠিক আছে। খুব রূপবতী মেয়ে দেখব বলে এসেছিলাম, দুধে আলতা রঙের একজনকে দেখছি—তাকে রূপবতী বলার কোনো কারণ নেই। দাঁত উঁচু। যথেষ্ট মোটা। থপথপ করে হাঁটছে। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কুদ্দুসের কাছে জয়গুন হল—হেলেন অব ট্রয়। জয়গুন মধুর গলায় বলল, ও আল্লা, ভিতরে আসেন।

'আমি সঙ্গে করে আমার এক ফুপাতো ভাইকে নিয়ে এসেছি। ওর নাম বাদল।'

'অবশ্যই আনবেন। ছোট ভাই, আস।'

জয়গুন হাত ধরে বাদলকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাদল সঙ্কুচিত হয়ে রইল। আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে জয়গুনের ঘর দেখছি। সাজানো-গোছানো ঘর। রঙিন টিভি আছে। ভিসিআর আছে। এই মুহূর্তে ভিসিআর-এ হিন্দি ছবি চলছে।

জয়গুন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, সময় কাটে না, এই জন্যে রোজ তিনটা-চাইরটা কইরা ছবি দেখি। আপনেরা আরাম কইরা বসেন। এসি ছাড়ি?

'এসি আছে?'

'জি আছে।'

'ঠাণ্ডা বাতাসে শইল্যে বাত হয়, এই জন্যে এসি ছাড়ি না। ফ্যান দিয়া কাম সারি।'

'আমাদের জন্যে এসি ছাড়বে—এতে তোমার আবার বাত হবে না তো।'

'কী যে কন হিমু ভাইজান! অল্প সময়ে আর কী বাত হইব।'

অল্প সময় তো না—আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। এসেছি যখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ভিসিআর-এ একটা ছবি দেখে যাই। অনেক দিন হিন্দি ছবি দেখা হয় না। তোমার অসুবিধা হবে?'

'কী যে কন ভাইজান! আফনে সারা জীবন থাকলেও অসুবিধা নাই।'

'তুমি একা থাক?'

'হ, একাই থাকি।'

'রান্নাবান্না কে করে?'

'কেউ করে না। হোটেল থাইক্যা খাওন আসে। কাজকামের লোক রাখন আমার পুষায় না। খালি ভ্যান ভ্যান করে। আমার হোটেলের সাথে কনটাক।'

'ভালো ব্যবস্থা তো।'

'কপি' খাইবেন?—কপি বানানির জিনিস আছে।'

'হ্যাঁ, 'কপি' খাওয়া যায়।'

জয়গুন অতি ব্যস্ততার সঙ্গে 'কপি' আনতে গেল। আমি জয়গুনের বিছানায় পা তুলে উঠে বসতে বসতে বললাম—বাদল আয়, কোলবালিশে হেলান দিয়ে আরাম করে বোস। একটা হিন্দি ছবি দেখি। দুদিন পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে মরে যাবি—হিন্দি ছবি দেখে মনটা ঠিকঠাক কর।

'তুমি কি সত্যি সত্যি ছবি দেখবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই।'

'এই মেয়েটাকে তুমি চেন কীভাবে?'

'আমি চিনি না—কানা কুদ্দুস চেনে।'

'কানা কুদ্দুস কে?'

ভয়াবহ খুনী। মানুষ মারা তার কাছে কোনো ব্যাপারই না। মশা মারার মতোই সহজ।'

'এই ভদ্রমহিলা কি ওনার স্ত্রী?'

'প্রায় সে রকমই। জয়গুন হচ্ছে কানা কুদ্দুসের বনলতা সেন।'

'ভদ্রমহিলা কী সুন্দর দেখেছ হিমু দা?'

'সুন্দর?'

'আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, যতই দেখছি—ততই অবাক হচ্ছি।'

'তোর মনে হচ্ছে না দাঁতগুলি বেশি উঁচু?'

'তোমার দাঁতের দিকে তাকাবার দরকার কী?'

'তাও তো বটে। দাঁতের দিকে তাকাব কেন? হাতি হলে দাঁতের দিকে তাকানোর একটা ব্যাপার চলে আসত। গজদন্ত বিরাট ব্যাপার। মানবদন্ত তেমন কোনো ব্যাপার না। মানবদন্তের জন্ম হয় ডেনটিস্টের তুলে ফেলার জন্যে।'

'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার দরকার আছে?'

'না, দরকার নেই।'

জয়গুন মগে করে 'কপি' নিয়ে এসেছে। এক এক মগে এক এক পোয়া করে চিনি দিয়ে বানানো ঘন এক সিরাপ জাতীয় বস্তু। আমি মুখে দিয়ে বললাম, অপূর্ব! আমি যা করি বাদলও তাই করে। কাজেই বাদলও চোখ বড় বড় করে বলল—অপূর্ব!

জয়গুনের সুন্দর মুখ আনন্দে ভরে গেল। সে বলল, ছবি দেখবেন ভাইজান?

'হ্যাঁ দেখব। ভালো একটা কিছু দাও।'

'পুরোনো ছবি দেখবেন? দিদার আছে—দিলীপ কুমারের ছবি।'

'দিলীপ কুমারের ছবি দেখা যেতে পারে।'

'বেলেক এন্ড হোয়াইট।'

'সাদা-কালোর কোনো অসুবিধা নেই—তারপর জয়গুন, কুদ্দুসের কোনো খবর জান?'

'জি না। মেলা দিন কোনো খোঁজ নাই। বুঝছেন ভাইজান, মানুষটার জন্যে অত অস্থির থাকি—হে বুঝে না। কোন দিন কোন বিপদে পড়ে! বিপদের কি কোনো মা-বাপ আছে? সবকিছুর মা-বাপ আছে। বিপদের মা-বাপ নাই। তারে কে বুঝাইবে কন? আফনেরে খুব মানে। যখন আসে তখনই আফনের কথা কয়। ভাইজান!'

'বল।'

'আফনে তার জন্যে এট্টু দোয়া করবেন ভাইজান।'

'আমার দোয়াতে কোনো লাভ হবে না জয়গুন। সে ভয়ঙ্কর সব পাপ করে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের শাস্তি তো হবেই।'

'মৃত্যুর পরে আল্লাহপাক শাস্তি দিলে দিব। এই দুনিয়ায় শাস্তি হইব এটা কেমন বিচার?'

'এটা হচ্ছে জনতার বিচার। আল্লাহপাক কিছু কিছু শাস্তি জনতাকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মানুষ ভুল করে—জনতা ভুল করে না।'

জয়গুন ছবি চালিয়ে দিয়েছে। তার চোখ ভরতি পানি। কানা কুদ্দুসের মতো একটি ভয়াবহ পাপীর জন্যে জয়গুনের মতো একটি রূপবতী মেয়ে চোখের পানি ফেলছে—কোনো মানে হয়? হয় নিশ্চয়ই—সেই মানে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ছবি চলছে। আমি, বাদল এবং জয়গুন ছবি দেখছি। জয়গুন ছবি দেখছে গভীর আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে। আশ্চর্য! বাদলও তাই করছে।

শামসাদ বেগমের কিন্নর কণ্ঠের গান শুরু হল—'বাচপানকে দিন ভুলানা দেনা।'

বাদলের চোখে পানি। দুদিন পর গায়ে আগুন লেগে যার মরার কথা সে ছবি দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—কোনো মানে হয়?

'বাদল!'

'জি।'

'তোর গায়ে কেরোসিন ঢালার ব্যাপারটা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার। আর দেরি করা যায় না।'

'কেন?'

'দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সব স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। যা করার তার আগেই করতে হবে।'

'দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে কে বলল?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই।'

বাদল কিছু বলল না। আমার কথা সে শুনতে পায়নি। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন দিলীপ কুমারের কর্মকাণ্ডে নিবেদিত। আমি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যেতে পারে। হিন্দি আমি বুঝি না। ছবির কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাদল এবং জয়গুনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে—ছবি দেখার জন্যে হলেও হিন্দি শেখার দরকার ছিল। আমি শুনেছি হিন্দি খুব নাকি মিষ্টি ভাষা। আমার মনে হয় না। লেডিস টয়লেটের হিন্দি হচ্ছে—"দেবীও কি হাগন কুঠি" অর্থাৎ "দেবীদের হাগাঘর"। যে ভাষায় মেয়েদের বাথরুমের এত কুৎসিত নাম সেই ভাষা মিষ্টি হবার কোনো কারণ নেই। আমি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

AMARBOI.COM

৯

অনেক দিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি খুব চিন্তিত মুখে আমার বিছানায় বসে আছেন। গায়ে খদ্দরের চাদর। হাত দুটা কোলের উপরে ফেলে রাখা। চোখে চশমা। চশমার মোটা কাচের ভেতর থেকে তাঁর জ্বলজ্বলে চোখ দেখা যাচ্ছে। আমি বাবাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

বাবা বললেন, কেমন আছিস হিমু?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খুব ভালো আছি বাবা।

বাবা নিচু গলায় বললেন, তুই তো সব গণ্ডগোল করে ফেলেছিস। এত শখ ছিল তুই মহাপুরুষ হবি। এত ট্রেনিং দিলাম...

'ট্রেনিং দিয়ে কি আর মহাপুরুষ হওয়া যায় বাবা?'

'ট্রেনিং দিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারলে মহাপুরুষ হওয়া যাবে না কেন? অবশ্যই যায়। ট্রেনিং ঠিকমতো দিতে পারলে...'

'তা হলে মনে হয় তোমার ট্রেনিঙে গণ্ডগোল ছিল।'

'উঁহু, ট্রেনিঙে কোনো গণ্ডগোল নেই। তুই নিয়মকানুন মানছিস না। মহাপুরুষের প্রথম শর্ত হল—কোনো ব্যক্তিবিশেষের ওপর মায়া করবি না। মায়া হবে সর্বজনীন। মায়াটাকে ছড়িয়ে দিবি।'

'তাই তো করছি।'

'মোটেই তা করছিস না। তুই জড়িয়ে পড়ছিস। মারিয়াটা কে?'

'মারিয়া হচ্ছে মরিয়ম।'

'তুই এই মেয়ের সঙ্গে এমন জড়ালি কেন?'

'জড়াইনি তো বাবা। আমি ওর সাঙ্কেতিক চিঠির জবাব পর্যন্ত দেইনি। ও চিঠি দেবার পর ওর বাসায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।'

'এটাই কি প্রমাণ করে না তুই জড়িয়ে পড়েছিস? মেয়েটার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিস।'

'তুমি কি তার বাসায় যেতে বলছ?'

'অবশ্যই যাবি।'

'কিন্তু বাবা, একটা ব্যাপার কী জান? আমার ধারণা, এই যে স্বপ্নটা দেখছি এটা আসলে দেখছি আমার অবচেতন মনের কারণে। আমার অবচেতন মন চাচ্ছে আমি মারিয়ার সঙ্গে দেখা করি। সেই চাওয়াটা প্রবল হয়েছে বলেই সে তোমাকে তৈরি করে স্বপ্নে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তুমি আমাকে মারিয়ার বাসায় যেতে বলছ। তুমি আমার অবচেতন মনেরই একটা ছায়া। এর বেশি কিছু না।'

'তা হতে পারে।'

'আমার অবচেতন মন যা চাচ্ছে, তাই তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে।'

'হুঁ। যুক্তির কথা।'

'মহাপুরুষরা কি যুক্তিবাদী হন বাবা?'

'তাঁদের ভেতর যুক্তি থাকে কিন্তু তাঁরা যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হন না।'

'কেন?'

'কারণ যুক্তি শেষ কথা না। শেষ কথা হচ্ছে চেতনা, Conscience.'

'চেতনা কি যুক্তির বাইরে?'

'যুক্তি চেতনার একটা অংশ কিন্তু খুব ক্ষুদ্র অংশ। ভালো কথা, মারিয়া মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দর। আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।'

'চুল কি কোঁকড়ানো, না প্লেইন?'

'চুল কোঁকড়ানো।'

'তোর মার চুলও ছিল কোঁকড়ানো। সে অবিশ্যি দেখতে শ্যামলা ছিল। যাই হোক, মারিয়া মেয়েটা লম্বা কেমন?'

'গজ ফিতা দিয়ে তো মাপিনি তবে লম্বা আছে।'

'মুখের শেপ কেমন? গোল না লম্বাটে?'

'লম্বাটে।'

'চোখ কেমন?'

'চোখ খুব সুন্দর।'

'চোখ কি খুব ভালো করে লক্ষ করেছিস? একটা মানুষের ভেতরটা দেখা যায় চোখের দিকে তাকিয়ে। তুই কি চোখ খুব ভালো করে লক্ষ করেছিস?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা হিমু শোন—মেয়েটার ডান চোখ কি বাঁ চোখের চেয়ে সামান্য বড়?'

'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?'

'তোর মার চোখ এইরকম ছিল। আমি যখন তাকে ব্যাপারটা বললাম—সে তো কেঁদে-কেটে অস্থির। আমাকে বলে কী, কাজল দিতে গিয়ে এরকম দেখাচ্ছে। একটা চোখে কাজল বেশি পড়েছে—একটায় কম পড়েছে।'

'মা চোখে কাজল দিত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। শ্যামলা মেয়েরা যখন চোখে কাজল দেয় তখন অপূর্ব লাগে।'

'বাবা!'

'হুঁ?'

'এই যে মারিয়া সম্পর্কে তুমি জানতে চাচ্ছ, কেন?'

'তোর মার সঙ্গে মেয়েটার মিল আছে কি না তা জানার জন্যে।'

'বাবা শোন, তুমি এত সব জানতে চাচ্ছ কারণ মেয়েটার বিষয়ে আমার নিজের কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমার অবচেতন মন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে।'

'হতে পারে।'

'হতে পারে না। এটাই হল ঘটনা। তুমি আমার নিজের তৈরি স্বপ্ন ছাড়া কিছু না।'

'পুরো জগতটাই তো স্বপ্ন রে বোকা।'

'তুমি সেই স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন। আমি এখন আর স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছি না। আরাম করে ঘুমাতে চাচ্ছি।'

'চলে যেতে বলছিস?'

'হ্যাঁ, চলে যাও।'

'তুই ঘুমা, আমি পাশে বসে থাকি।'

'কোনো দরকার নেই বাবা। তুমি বিদেয় হও।'

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বিষণ্ন মুখে চলে গেলেন। তার পরপরই আমার ঘুম ভাঙল। মনটা একটু খারাপই হল। বাবা আরো কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থাকলে তেমন কোনো ক্ষতি হত না।

আমার বাবা তাঁর পুত্রের জন্যে কিছু উপদেশবাণী রেখে গিয়েছিলেন। ব্রাউন প্যাকেটে মোড়া সেইসব উপদেশবাণীর উপর লেখা আছে কত বয়সে পড়তে হবে। আঠার বছর হবার পর যে উপদেশবাণী পড়তে বলেছিলেন—তা হল।

AMARBOI.COM

হিমালয়

তুমি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছ। আমার অভিনন্দন। অষ্টাদশ বর্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এই বয়সে নারী ও পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ফল শুভ যেমন হয়—মাঝে মাঝে অশুভও হয়।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে আজ আমি তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল বলিতে চাই। মন দিয়া পাঠ কর। তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের সমগ্র বিষয়টাই পুরাপুরি জৈবিক। ইহা পশু-ধর্ম। এই আকর্ষণের ব্যাপারটিকে আমরা নানানভাবে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রেম নিয়া কবি, সাহিত্যিক মাতামাতি করিয়াছেন। চিত্রকররা প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি অংকন করিয়াছেন। গীতিকাররা গান রচনা করিয়াছেন। গায়করা সেই গান নানান ভঙ্গিমায় গাহিয়াছেন।

প্রিয় পুত্র, প্রেম বলিয়া জগতে কিছু নাই। ইহা শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ প্রকৃতি তৈরি করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার সৃষ্টি বজায় থাকে। নর-নারীর মিলনে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে। প্রকৃতির সৃষ্টি বজায় থাকিবে।

একই আকর্ষণ প্রকৃতি তাঁহার সমস্ত জীবজগতে তৈরি করিয়াছেন। আশ্বিন মাসে কুকুরীর শরীর দুই দিনের জন্য উত্তপ্ত হয়। সে তখন

কুকুরের সঙ্গের জন্যে প্রায় উন্মত্ত আচরণ করে। ইহাকে কি আমরা প্রেম বলিব?

প্রিয় পুত্র, মানুষ ভান করিতে জানে, পশু জানে না—এই একটি বিষয় ছাড়া মানুষের সঙ্গে পশুর কোনো তফাত নাই। যদি কখনো কোনো তরুণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ কর, তখন অবশ্যই তুমি সেই আকর্ষণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবে। দেখিবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তুচ্ছ শরীর। যেহেতু শরীর নশ্বর সেহেতু প্রেমও নশ্বর।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে অনেকদূর যাইতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইও। প্রকৃতি তোমার সহায় হউক—এই শুভ কামনা।

আমার বাবা কি আসলেই অপ্রকৃতিস্থ? কাদের আমরা প্রকৃতিস্থ বলব? যাদের চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক পথে চলে তাদের। যারা একটু অন্যভাবে চিন্তা করে তাদের আমরা আলাদা করে ফেলি। তা কি ঠিক? আমার বাবা তাঁর পুত্রকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছার কথা শোনামাত্রই আমরা তাঁকে উন্মাদ হিসেবে আলাদা করে ফেলেছি। কোনো বাবা যদি বলেন, আমি আমার ছেলেকে বড় ডাক্তার বানাব তখন আমরা হাসি না, কারণ তিনি চেনা পথে হাঁটছেন। আমার বাবা তাঁর সমগ্র জীবনে হেঁটেছেন অচেনা পথে। আমি সেই পথ কখনো অস্বীকার করিনি।

স্বপ্ন আমাকে কাবু করে ফেলেছে। সকালবেলাতেই বিষণ্ন বোধ করছি। বিষণ্নতা কাটানোর জন্যে কী করা যায়? মন আরো বিষণ্ন হয় এমন কিছু করা। যেমন রূপার সঙ্গে কথা বলা। অনেক দিন তার সঙ্গে কথা হয় না।

মন এখন বিষণ্ন, রূপার সঙ্গে কথা বলার পর মন নতুন করে বিষণ্ন হবে। পুরোনো বিষণ্নতা এবং নতুন বিষণ্নতায় কাটাকাটি হয়ে আমি স্বাভাবিক হব। তারপর যাব আসগর সাহবের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর কী? চিত্রলেখা নামের ওই বাড়িতে কি যাব? দেখে আসব মারিয়াকে?

অনেকবার টেলিফোন করলাম রূপাদের বাসায়। টেলিফোন যাচ্ছে, রূপাই টেলিফোন ধরছে, কিন্তু সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যাচ্ছে। প্রকৃতি চাচ্ছে না আমি রূপার সঙ্গে কথা বলি।

www.amarboi.com

১০

রুপার বাড়িতে আজ উৎসব।

বাদল তার কেরোসিন টিন ব্যবহার করতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস হয়েছে। খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেছেন। দুই দলের মর্যাদা বহাল আছে। দু দলই দাবি করছে তারা জিতেছে। দু দলই বিজয় মিছিল বের করেছে। সব খেলায় একজন জয়ী হন, অন্যজন পরাজিত হন। রাজনীতির খেলাতেই শুধুমাত্র দুটি দল একসঙ্গে জয়ী হতে পারে অথবা একসঙ্গে পরাজিত হয়। রাজনীতির খেলা বড়ই মজাদার খেলা। এই খেলায় অংশগ্রহণ তেমন আনন্দের না, দূর থেকে দেখার আনন্দ আছে।

আমি গভীর আনন্দ নিয়ে খেলাটা দেখছি। শেষের দিকে খেলাটায় উৎসব ভাব এসে গেছে। ঢাকার মেয়র হানিফ সাহেব করেছেন জনতার মঞ্চ। সেখানে বক্তৃতার সঙ্গে 'গান-বাজনা' চলছে।

খালেদা জিয়া তৈরি করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চ। সেখানে গান-বাজনা একটু কম, কারণ বেশিরভাগ শিল্পীই জনতার মঞ্চে। তাঁরা গান-বাজনার অভাব বক্তৃতায় পুষিয়ে দেবার চেষ্টা

করছেন। গণতন্ত্র মঞ্চ একটু বেকায়দা অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে। তেমন জমছে না। উদ্যোক্তারা একটু যেন বিমর্ষ।

দুটি মঞ্চ থেকেই দাবি করা হচ্ছে—আমরা ভারত বিরোধী। ভারত বিরোধিতা আমাদের রাজনীতির একটা চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে আসছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতার জন্যে তাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল, এই কারণে কি আমরা কোনো হীনমন্যতায় ভুগছি?

শুধুমাত্র হীনমন্যতায় ভুগলেই এইসব জটিলতা দেখা দেয়। এই হীনমন্যতা কাটানোর প্রধান উপায় জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। সবাই মিলে সেই চেষ্টাটা কি করা যায় না?

আমাদের সারা দেশে অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ আছে—যেসব ভারতীয় সৈন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন তাঁদের জন্যে আমরা কিন্তু কোনো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিনি। কেন করিনি? করলে কি জাতি হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাব?

আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা নিয়ে কত চমৎকার সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখলেন—সেখানে কোথাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানের কোনো উল্লেখ নেই। উল্লেখ করলে ভারতীয় দালাল আখ্যা পাবার আশঙ্কা। বাংলাদেশে এই রিস্ক নেয়া যায় না। অন্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওঁরা প্রাণ দিয়েছেন। এঁদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর কাছে অন্য দেশের স্বাধীনতা কোনো ব্যাপার না। স্বামীহারা স্ত্রী, পিতাহারা সন্তানদের অশ্রুর মূল্য আমরা দেব না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ?

বাংলাদেশের আদর্শ নাগরিক কী করবে? ভারতীয় কাপড় পরবে। ভারতীয় বই পড়বে, ভারতীয় ছবি দেখবে। ভারতীয় গান শুনবে, ছেলে-মেয়েদের পড়াতে পাঠাবে ভারতীয় স্কুল-কলেজে। চিকিৎসার জন্যে যাবে বোম্বাই, ভ্যালোর এবং ভারতীয় গরু খেতে খেতে চোখ-মুখ কুঁচকে বলবে—শালার ইন্ডিয়া! দেশটাকে শেষ করে দিল! দেশটাকে ভারতের খপ্পর থেকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বিজবিজ করে বললেন, বুঝলি হিমু, দেশটাকে ভারতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এটা হচ্ছে রাইট টাইম।

আমি বললাম, অবশ্যই।

'ইন্ডিয়ান দালাল দেশে যে কটা আছে, সব কটাকে জুতাপেটা করা দরকার।'

আমি বললাম, অবশ্যই।

'দালালদের নিয়ে মিছিল করতে হবে। সবার গলায় থাকবে জুতার মালা।'

'এত জুতা পাবেন কোথায়?'

'জুতা পাওয়া যাবে। জুতা কোনো সমস্যা না।'

'অবশ্যই।'

ফুপা অল্প সময়ে যে পরিমাণ মদ্যপান করেছেন তা তাঁর জন্যে বিপজ্জনক। তাঁর আশপাশে যারা আছে তাদের জন্যেও বিপজ্জনক। এই অবস্থায় ফুপার প্রতিটি কথায় 'অবশ্যই' বলা ছাড়া উপায় নেই।

আমরা বসেছি ছাদে। বাদল আগুনে আত্মাহুতি দিচ্ছে না এই আনন্দ সেলিব্রেট করা হচ্ছে। ফুপা মদ্যপানের অনুমতি পেয়েছেন। ফুপু কঠিন গলায় বলে দিয়েছেন—শুধু দুই পেগ খাবে। এর বেশি এক ফোঁটাও না। খবরদার! হিমু, তোর ওপর দায়িত্ব, তুই চোখে চোখে রাখবি।

আমি চোখে চোখে রাখার পরেও—ফুপার এখন সপ্তম পেগ যাচ্ছে। তাঁর কথাবার্তা সবই এলোমেলো। একটু হিক্কার মতোও উঠছে। বমিপর্ব শুরু হতে বেশি দেরি হবে না।

'হিমু!'

'জি ফুপা।'

'দেশটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে হিমু।'
'অবশ্যই।'
'দেশমাতৃকা অনেক বড় ব্যাপার।'
'জি, ঠিকই বলেছেন। দেশপিতৃকা হলে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।'
'দেশপিতৃকা আবার কী?'
'ফাদারল্যান্ডের বাংলা অনুবাদ করলাম।'
'ফাদারল্যান্ড কেন বলছিস? জন্মভূমি হল জননী। জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী।'
'ফুপা, আর মদ্যপান করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'
'খুব ঠিক হচ্ছে। তোর চেখে দেখার ইচ্ছা থাকলে চেখে দেখ। আমি কিছুই মনে করব না। এইসব ব্যাপারে আমি খুবই লিবারেল।'
'আমার ইচ্ছা করছে না ফুপা।'
'ইচ্ছা না করলে থাক। খেতে হয় নিজের রুচিতে, পরতে হয় অন্যের রুচিতে। ঠিক না?'
'অবশ্যই ঠিক।'
'বুঝলি হিমু, দেশ নিয়ে নতুন করে এখন চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। ভারতের আগ্রাসন বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।'
'আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জাতীয় পরিষদে আইন পাস করতে হবে যে, কেউ তাদের ছেলেমেয়েদের ভারতে পড়তে পাঠাতে পারবে না, কারণ ভারতীয়রা আমাদের সন্তানদের ব্রেইন ওয়াশ করে দিচ্ছে, তাই না ফুপা?'
ফুপা মদের গ্লাস মুখের কাছে নিয়েও নামিয়ে নিলেন। কঠিন কোনো কথা বলতে গিয়েও বললেন না—কারণ তিনি তাঁর পুত্র বাদলকে ভর্তি করেছেন দার্জিলিং-এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে।
'হিমু!'
'জি ফুপা।'
'রাজনীতি বাদ দিয়ে চল অন্য কিছু নিয়ে আলাপ করি।'
'জি আচ্ছা। কী নিয়ে আলাপ করতে চান? আবহাওয়া নিয়ে কথা বলবেন?'
'না—।'
'সাহিত্য নিয়ে কথা বলবেন ফুপা? গল্প-উপন্যাস?'
'আরে ধ্যুৎ, সাহিত্য! সাহিত্যের লোকগুলিও বদ। এরা আরো বেশি বদ।'
'তা হলে কী নিয়ে কথা বলা যায়? একটা কোনো টপিক বের করুন।'
ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে টপিক চিন্তা করতে লাগলেন। আমি ছাদে শুয়ে পড়লাম। আকাশে নাকি নতুন কী একটা ধূমকেতু এসেছে—'হায়াকুতাকা', বেচারাকে দেখা যায় কি না। নয় হাজার বছর আগে সে একবার পৃথিবীকে দেখতে এসেছিল। এখন আবার দেখছে। আবারো আসবে নয় হাজার বছর পর। নয় হাজার বছর পর বাংলাদেশকে সে কেমন দেখবে কে জানে।
ধূমকেতু খুঁজে পাচ্ছি না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিচেই তার থাকার কথা। উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল পাওয়া গেল। এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে জ্বলজ্বল করছে সপ্তর্ষি।
ফুপা জড়ানো গলায় বললেন, কী খুঁজছিস হিমু?
'হায়াকুতাকা'কে খুঁজছি।'
'সে কে?'
'ধূমকেতু।'
'চাইনিজ ধূমকেতু নাকি? হায়াকুতাকা—নামটা তো মনে হয় চাইনিজ।'
'জাপানিজ নাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও আচ্ছা, জাপানিজ...একটা দেশ কোথায় ছিল, এখন কোথায় উঠে গেছে দেখ... ধূমকেতু-ফেতু সব নিয়ে নিচ্ছে—আমরা কিছুই নিতে পারছি না। বঙ্গোপসাগরে তালপট্টি সেটাও চলে গেল। চলে গেল কি না তুই বল হিমু?'

'জি, চলে গেছে।'

'বেঁচে থেকে তা হলে লাভ কী?

'বেঁচে থাকলে আনন্দ করা যায়। মাঝে-মধ্যে মদ্যপান করা যায়...'

'এতে লিভারের ক্ষতি হয়।'

'তা হয়।'

'পরিমিত খেলে হয় না। পরিমিত খেলে লিভার ভালো থাকে।'

ফুপার কথা আমি এখন আর শুনছি না। আমি ধূমকেতু খুঁজছি। ধূমকেতুও আমার মতোই পরিব্রাজক—সেও শুধুই হেঁটে বেড়ায়...।

১১

'আসগর সাহেব কেমন আছেন?'

আসগর সাহেব চোখ মেলে তাকালেন। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারছেন বলে মনে হল না।

'দেশ তো ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আপনার অপারেশন কবে হবে?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

'ভালো, খুব ভালো।'

'হিমু ভাই!'

'বলুন।'

'আপনার চিঠির জন্যে কাগজ কিনিয়েছি—কলম কিনিয়েছি। রেডিও বন্ড কাগজ, পার্কার কলম।'

'কে কিনে দিল?'

'একজন নার্স আছেন, সোমা নাম। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁকে বলেছিলাম, তিনি কিনেছেন।'

'খুব ভালো হয়েছে। অপারেশন শেষ হোক, তারপর চিঠি লেখালেখি হবে।'

'জি না।'

'জি না মানে?'

'আমি বাঁচব না হিমু ভাই, যা লেখার আজই লিখতে হবে।'

'আপনার যে অবস্থা আপনি লিখবেন কীভাবে? আপনি তো কথাই বলতে পারছেন না।'

আসগর সাহেব যন্ত্রের মতো বললেন, যা লেখার আজই লিখতে হবে।

তিনি মনে হল এক শ ভাগ নিশ্চিত, অপারেশনের পরে তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। বিদায়ের ঘণ্টা তিনি মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন।

'হিমু ভাই!'

'বলুন, শুনছি।'

'আপনার জন্যে কিছুই করতে পারি নাই। চিঠিটাও যদি লিখতে না পারি তা হলে মনে কষ্ট নিয়ে মারা যাব।'

'মনে কষ্ট নিয়ে মরার দরকার নেই—নিন, চিঠি লিখুন। কলমে কালি আছে?'

'জি, সব ঠিকঠাক করা আছে। হাতটা কাঁপে হিমু ভাই—লেখা ভালো হবে না। আমাকে একটু উঠিয়ে বসান।'

'উঠে বসার দরকার নেই। শুয়ে শুয়ে লিখতে পারবেন। খুব সহজ চিঠি। একটা তারা আঁকুন, আবার একটু গ্যাপ দিয়ে চারটা তারা, আবার তিনটা। এই রকম—দেখুন আমি লিখে দেখাচ্ছি—

আসগর সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, এইসব কী?

আমি হাসিমুখে বললাম, এটা একটা সাঙ্কেতিক চিঠি। আমি মেয়েটার কাছ থেকে একটা সাঙ্কেতিক চিঠি পেয়েছিলাম। কাজেই সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠির জবাব।

'তারাগুলির অর্থ কী?'

'এর অর্থটা মজার—কেউ ইচ্ছা করলে এর অর্থ করবে I love you. একটা তারা I, চারটা তারা হল Love, তিনটা তারা হল You. আবার কেউ ইচ্ছা করলে অর্থ করতে পারে—I hate you.

আসগর সাহেব কাঁপা কাঁপা হাতে স্টার এঁকে দিলেন। আমি সেই তারকাচিহ্নের চিঠি পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম—আসগর সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে তা হলে আর দেখা হচ্ছে না।

'জি না।'

'মৃত্যু কখন হবে বলে আপনার ধারণা?'

আসগর সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, রাতে একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাব। মরে গেলে তো চলেই গেলেন। বেঁচে থাকলে কথা হবে।

'জি আচ্ছা।'

'আর কিছু কি বলবেন? মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনকে কিছু বলা কিংবা...'

'মনসুরের পরিবারকে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন ভাই সাহেব। মনসুর এসে পরিবারের ঠিকানা দিয়ে গেছে।'

'ঠিকানা কী?'

'কাগজে লিখে রেখেছি—পোস্টাপিসের কিছু কাগজ, পাস বই সব একটা বড় প্যাকেটে ভরে রেখে দিয়েছি। আপনার নামে অথরাইজেশন চিঠিও আছে।'

'ও আচ্ছা, কাজকর্ম গুছিয়ে রেখেছেন?'

'জি—যতদূর পেরেছি।'

'অনেকদূর পেরেছেন বলেই তো মনে হচ্ছে—ফ্যাকরা বাঁধিয়েছে মনসুর—সে যদি ভূত হয়ে সত্যি সত্যি তার পরিবারের ঠিকানা বলে দিয়ে যায় তা হলে বিপদের কথা।'

'কিসের বিপদ হিমু ভাই?'

'তা হলে তো ভূত বিশ্বাস করতে হয়। রাত-বিরাতে হাঁটি, কখন ভূতের খপ্পরে পড়ব!'

'জগৎ বড় রহস্যময় হিমু ভাই।'

'জগৎ মোটেই রহস্যময় না। মানুষের মাথাটা রহস্যময়। যা ঘটে মানুষের মাথার মধ্যে ঘটে। মনসুর এসেছিল আপনার মাথার ভেতর। আমার ধারণা, সে তার পরিবারের ঠিকানা ঠিকই দিয়েছে। আপনার মাথা কীভাবে কীভাবে এই ঠিকানা বের করে ফেলেছে।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না হিমু ভাই।'

'বুঝতে না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমি নিজেও আমার সব কথা বুঝতে পারি না।'

আমি আসগর সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। গফুরের মেয়েটার সঙ্গে দুটা কথা বলার ইচ্ছা ছিল। মেয়েটাকে দেখলাম না। গফুর তার বিছানায় হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের উপর একটা মাছি ভনভন করছে; সেই মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছেন বয়স্কা এক মহিলা। সম্ভবত গফুরের স্ত্রী। স্বামীকে তিনি নির্বিঘ্নে ঘুমাতে দিতে চান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশা নিয়ে নিলাম। মারিয়ার বাবাকে দেখতে যাব। পাঁচ বছর পর ভদ্রলোককে দেখতে যাচ্ছি। এই পাঁচ বছরে তিনি আমার কথা মনে করেছেন। আমি গ্রেফতার হয়েছি শুনে চিন্তিত হয়ে চারদিকে টেলিফোন করেছেন। আমি তাঁর কথা মনে করিনি। আমি আমার বাবার কঠিন উপদেশ মনে রেখেছি—

> প্রিয় পুত্র,
>
> মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। মায়ায় আবদ্ধ হওয়াই তাহার নিয়তি। তোমাকে আমি মায়ামুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া বড় করিয়াছি। তার পরেও আমার ভয়—একদিন ভয়ঙ্কর কোনো মায়ায় তোমার সমস্ত বোধ, সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইবে। মায়া কূপবিশেষ, সে কূপের গভীরতা মায়ায় যে আবদ্ধ হইবে তাহার মনের গভীরতার ওপর নির্ভরশীল। আমি তোমার মনের গভীরতা সম্পর্কে জানি—কাজেই ভয় পাইতেছি—কখন না তুমি মায়া নামক অর্থহীন কূপে আটকা পড়িয়া যাও। যখনই এইরূপ কোনো সম্ভাবনা দেখিবে তখনই মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবে। মায়া নামক রঙিন কূপে পড়িয়া জীবন কাটানোর জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিও না।...

আমি আমার অপ্রকৃতিস্থ পিতার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিনি। আমি যখনই মায়ার কূপ দেখেছি তখনি দূরে সরে গেছি। দূরে সরার প্রক্রিয়াটি কত যে কঠিন তা কি আমার অপ্রকৃতিস্থ দার্শনিক পিতা জানতেন? মনে হয় জানতেন না। জানলে মায়ামুক্তির কঠিন বিধান রাখতেন না।

আসাদুল্লাহ সাহেব আজ এতদিন পরে আমাকে দেখে কী করবেন? খুব কি উল্লাস প্রকাশ করবেন? না, তা করবেন না। যেসব মানুষ সীমাহীন আবেগ নিয়ে জন্মেছেন তাঁরা কখনো তাঁদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাঁদের আচার-আচরণ রোবটধর্মী। যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন মধ্যম শ্রেণীর আবেগ নিয়ে, তাঁদের আবেগের প্রকাশ অতি তীব্র। এঁরা প্রিয়জনদের দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে হুলস্থুল বাঁধিয়ে দেন।

আমার ধারণা, আসাদুল্লাহ সাহেব আমাকে দেখে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলবেন, তারপর কী খবর হিমু সাহেব?

এই যে দীর্ঘ পাঁচ বছর দেখা হল না সে প্রসঙ্গে একটা কথাও বলবেন না। পুলিশের হাতে কীভাবে ধরা পড়েছি, কীভাবে ছাড়া পেয়েছি সেই প্রসঙ্গেও কোনো কথা হবে না। দেশ নিয়েও কোনো কথা বলবেন না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যথা নেই। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডকে তিনি দেশ ভাবেন না। তাঁর দেশ হচ্ছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি। তিনি নিজেকে অনন্ত নক্ষত্রবীথির নাগরিক মনে করেন। এইসব নাগরিকদের কাছে জাগতিক অনেক কর্মকাণ্ডই তুচ্ছ। বাবা বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই তাঁকে আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। দুজন দু মেরু থেকে কথা শুরু করতেন। সেইসব কথা না জানি শুনতে কত সুন্দর হত!

মারিয়ার মাকে আমি খালা ডাকি। হাসি খালা। মহিলারা চাচির চেয়ে খালা ডাক বেশি পছন্দ করেন। খালা ডাক মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেক কাছের ডাক। খালা ডেকেও আমার তেমন সুবিধা অবিশ্যি হয়নি। ভদ্রমহিলা গোড়া থেকেই আমাকে তীব্র সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তবে আচার-আচরণে কখনো তা প্রকাশ হতে দেননি। বরং বাড়াবাড়ি রকম আন্তরিকতা দেখিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত দেখার প্রতি এই মহিলার খুব দুর্বলতা আছে। আমি বেশ কয়েকবার তাঁর হাত দেখে দিয়েছি। হস্তরেখা-বিশারদ হিসেবে ভদ্রমহিলার কাছে আমার নাম আছে। তিনি অতি আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে তুই তুই করেন। সেই আন্তরিকতার পুরোটাই মেকি। পাঁচ বছর পর এই মহিলাও অবিকল তাঁর স্বামীর মতো আচরণ করবেন। স্বাভাবিক গলায় বলবেন, "কী রে হিমু, তোর খবর কী? দে, হাতটা দেখে দে।" তিনি এ জাতীয় আচরণ করবেন আবেগ চাপা দেবার জন্যে না, আবেগহীনতার জন্যে।

আর মারিয়া? মারিয়া কী করবে? কিছুই বলতে পারছি না। এই মেয়েটি সম্পর্কে আমি কখনোই আগেভাগে কিছু বলতে পারিনি। তার আচার-আচরণে বোঝার কোনো উপায় ছিল না—একদিন সে এসে আমার হাতে এক টুকরা কাগজ ধরিয়ে দেবে—যে কাগজে সাঙ্কেতিক ভাষায় একটা প্রেমপত্র লেখা।

আমি সেদিন আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গল্প করছিলাম। বিষয়বস্তু এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স। আসাদুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন ইউনিভার্সে যতটুকু ভর থাকার কথা, ততটুকু নেই—বিজ্ঞানীরা হিসাব মিলাতে পারছেন না। নিউট্রিনোর যদি কোনো ভর থাকে তবেই হিসাব মেলে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি যা থেকে বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনোকে কিছু ভর দিতে পারেন। নিউট্রিনোর ভর নিয়ে আমাদের দুজনের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। এমন দুশ্চিন্তাযুক্ত জটিল আলোচনার মাঝখানে মারিয়া এসে উপস্থিত। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—বাবা, আমি হিমু ভাইকে পাঁচ মিনিটের জন্য ধার নিতে পারি?

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, অবশ্যই।

মারিয়া বলল, পাঁচ মিনিট পরে আমি তাঁকে ছেড়ে দেব। তুমি যেখানে আলোচনা বন্ধ করেছিলে আবার সেখান থেকে শুরু করবে।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, আচ্ছা।

'তোমরা আজ কী নিয়ে আলাপ করছিলে?'

'নিউট্রিনোর ভর।'

'ও, সেই নিউট্রিনো? তার কোনো গতি করতে পেরেছ?'

'না।'

'চেষ্টা করে যাও বাবা। চেষ্টায় কী না হয়!'

মারিয়া তার বাবার কাঁধে হাত রেখে সুন্দর করে হাসল। আসাদুল্লাহ সাহেব সেই হাসি ফেরত দিলেন না। গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তাঁর মাথায় তখনো নিউট্রিনো। আমি তাঁর হয়ে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

মারিয়া বলল, হিমু ভাই, আপনি আমার ঘরে আসুন।

আমি মারিয়ার ঘরে ঢুকলাম। এই প্রথম তার ঘরে ঢোকা। কিশোরী মেয়েদের ঘর যে রকম হয় সে রকম। র‍্যাক ভর্তি স্টাফড্ অ্যানিমেল। স্টেরিও সিস্টেম, এল পি রেকর্ড সারা ঘরময় ছড়ানো। ড্রেসিং টেবিলে এলোমেলো করে রাখা সাজবার জিনিস। বেশিরভাগ কৌটার মুখ খোলা। কয়েকটা ড্রেস মেঝেতে পড়ে আছে। খাটের পাশে রকিং চেয়ারে গাদা করা গল্পের বই। খাটের নিচে তিনটা চায়ের কাপ। এর মধ্যে একটা কাপে পিঁপড়া উঠেছে। নিশ্চয়ই কয়েকদিনের বাসি কাপ, সরানো হয়নি।

আমি বললাম, তোমার ঘর তো খুব গোছানো।

মারিয়া বলল, আমি আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেই না। মাকেও না, বাবাকেও না। আপনাকে প্রথম ঢুকতে দিলাম। আমার ঘর আমি নিজেই ঠিকঠাক করি। কদিন ধরে মনটন খারাপ বলে ঘর গোছাতে ইচ্ছা করছে না।

'মন খারাপ কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আছে, কারণ আছে। আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন।'

আমি বসলাম। মারিয়া বলল, আমি সাঙ্কেতিক ভাষায় একটা চিঠি লিখেছি।

'কাকে?'

'আপনাকে। আপনি এই চিঠি পড়বেন। এখানে বসেই পড়বেন। সাঙ্কেতিক চিঠি হলেও খুব সহজ সঙ্কেতে লেখা। আমার ধারণা, আপনার বুদ্ধি বেশ ভালো। চিঠির অর্থ আপনি এখানে বসেই বের করতে পারবেন।'

'সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বুদ্ধি খুবই নিম্নমানের। ম্যাট্রিকে অঙ্কে প্রায় ধরা খাচ্ছিলাম। সাঙ্কেতিক চিঠি তো অঙ্কেরই ব্যাপার। এখানেও মনে হয় ধরা খাব।'

মারিয়া তার রকিং চেয়ার আমার সামনে টেনে আনল। চেয়ারের উপর থেকে বই নামিয়ে বসে দোল খেতে লাগল। আমি সাঙ্কেতিক চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। কিছু বুঝলাম না। তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে নিজের মনে দোল খাচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে। সেখানে তার ছোটবেলার একখানা ছবি। আমি বললাম, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

মারিয়া বলল, বুঝতে না পারলে সঙ্গে করে নিয়ে যান। যেদিন বুঝতে পারবেন সেদিন উত্তর লিখে নিয়ে আসবেন।

'আর যদি কোনোদিনই বুঝতে না পারি?'

'কোনোদিন বুঝতে না পারলে আর এ বাড়িতে আসবেন না। এখন উঠুন, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। আপনাকে বাবার কাছে দিয়ে আসি।'

আমি চিঠি হাতে উঠে দাঁড়ালাম।

AMARBOI.COM

১২

মারিয়াদের বাড়ির নাম—চিত্রলেখা।

আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর চিত্রলেখার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

মানুষ তাদের বাড়ির নাম কেন রাখে? তাদের কাছে কি মনে হয় বাড়িগুলিও জীবন্ত? বাড়িদের প্রাণ আছে—তাদেরও অদৃশ্য হৃদপিণ্ড ধক ধক করে?

কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছি। কেউ এসে গেট খুলছে না। দারোয়ান তার খুপড়ি ঘর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছে। আসছে না—কারণ উৎসাহ পাচ্ছে না। ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে কেউ এলে এরা উৎসাহ পায়। ছুটে এসে গেট খুলে স্যালুট দিয়ে দাঁড়ায়। যারা দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আসে তাদের বেলা ভিন্ন নিয়ম। ধীরে-সুস্থে এসে ধমকের গলায় বলবে—কাকে চান? দারোয়ানদের ধমক খেতে ইন্টারেস্টিং লাগে। এরা নানান ভঙ্গিতে ধমক দিতে পারে। কারো ধমকে থাকে শুধুই বিরক্তি, কারো ধমকে রাগ, কারো ধমকে আবার অবহেলা। একজনের ধমকে প্রবল ঘৃণাও পেয়েছিলাম। তার ঘৃণার কারণ স্পষ্ট হয়নি।

আমি আবারো বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার এমন কিছু তাড়া নেই। ঘণ্টাখানিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তাড়া থাকে ভিখিরিদের। তাদের এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে হয়। সময় তাদের কাছে খুবই মূল্যবান। আমার কাছে সময় মূল্যহীন। 'চিত্রলেখা' নামের চমৎকার একতলা এই বাড়িটার সামনে একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাও যা, দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকাও তা। সময় কাটানোর জন্যে কিছু একটা করা দরকার।

বাড়ির নাম নিয়ে ভাবা যেতে পারে। আচ্ছা, মানুষের নামে যেমন পুরুষ-রমণী ভেদাভেদ আছে—বাড়ির নামেও কি তাই আছে? কোনো কোনো বাড়ি হবে পুরুষবাড়ি। কোনো কোনো বাড়ি রমণীবাড়ি। চিত্রলেখা নিশ্চয়ই রমণীবাড়ি। সুগন্ধা, শ্রাবণী, শিউলিও মেয়েবাড়ি। পুরুষবাড়ির কোনো নাম মনে পড়ছে না। এখন থেকে রাস্তায় হাঁটার সময় বাড়ির নাম পড়তে পড়তে যেতে হবে, যদি কোনো পুরুষবাড়ির নাম চোখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা ভালো করে দেখতে হবে।

আমাকে প্রায় ঘণ্টখানিক অপেক্ষা করতে হল—এর মধ্যে দারোয়ান শ্রেণীর একজন গেটের কাছে এসেছিল। গেট খুলতে বলায় সে বলল, যার কাছে চাবি সে ভাত খাচ্ছে। ভাত খাওয়া হলে সে খুলে দেবে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনি কি চাবিটা এনে একটু খুলে দিতে পারেন না? এই কথায় সে বড়ই আহত হল। মনে হল তার সুদীর্ঘ জীবনে সে এমন অপমানসূচক কথা আর শোনেনি। কাজেই আমি বললাম, আচ্ছা থাক, আমি অপেক্ষা করি। আপনার কাছে ছাতা থাকলে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দিন। আমি ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে থাকি, প্রচণ্ড রোদ।

সে এই রসিকতাতেও অপমানিত বোধ করল। বড় মানুষের বাড়ির কাজের মানুষদের মনে অপমানবোধ তীব্র হয়ে থাকে।

'আপনে কার কাছে আসছেন?'

'মারিয়ার কাছে।'

'আপা নাই।'

'না থাকলেও আসবে—আমি অপেক্ষা করব। গেট খুলে দিন।'

'গেট খুলনের নিয়ম নাই।'

আগের দারোয়ানদের কেউ নেই—সব নতুন লোকজন। আগেকার কেউ হলে চিনতে পারত। এত ঝামেলা হত না। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাইসাহেব, আপনার নাম?

'আমার নাম আবদুস সোবহান।'

'সোবহান সাহেব আপনি শুনুন—আমি খুব পাগলা কিসিমের লোক। গেট না খুললে গেটের উপর দিয়ে বেয়ে চলে আসব। আপনার সাহেবের কাছে গিয়ে বলুন—হিমু এসেছে।'

'ও আচ্ছা, আপনে হিমু? আপনের কথা বলা আছে।'

দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে গেট খুলতে লাগল।

আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিশাল ড্রয়িংরুম পার হয়ে খানিকটা খোলামেলা জায়গায় চলে এসেছি। কোনো ফার্নিচার নেই। ঘরময় কার্পেট। এটা ফ্যামিলি রুম। ফ্যামিলির সদস্যরা এই ঘরে গল্প-গুজব করে, টিভি দেখে। যাদের ফ্যামিলি যত ছোট তাদের ফ্যামিলি রুমটা তত বিশাল। মারিয়াদের ড্রয়িংরুম আগের মতোই ছিল, তবে ফ্যামিলি রুমের সাজসজ্জা বদলেছে। প্রকাণ্ড এক পিয়ানো দেখতে পাচ্ছি। পিয়ানো আগে ছিল না। পিয়ানো কে বাজায়? মারিয়া?

ফ্যামিলি রুমে কার্পেটের উপর হাসি খালাকে বসে থাকতে দেখলাম। তিনি তাঁর দুহাত মেলে ধরেছেন। সেই হাতের নখে নেল পলিশ লাগাচ্ছেন সিরিয়াস চেহারার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখে সোনালি চশমা, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। তিনি খুব একটা বাহারি পাঞ্জাবি পরে আছেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিখ্যাত ও ক্ষমতাবানদের কেউ হবেন। এ বাড়িতে বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান ছাড়া অন্য কারো প্রবেশাধিকার নেই। নেল পলিশ লাগানোর ব্যাপারে ভদ্রলোকের মনোযোগ দেখে মনে হচ্ছে কাজটা অত্যন্ত জটিল। হাসি খালাও নড়াচড়া করছেন না। স্থির হয়ে আছেন। হাসি খালা এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু, তোর কী খবর?

'কোনো খবর নেই।'

'মারিয়া বলেছিল তুই আসবি।'

যে ভদ্রলোক নেল পলিশ লাগাচ্ছেন তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, হাসি, নড়াচড়া করবে না। নড়লে আঙুল নড়ে যায়।

আমি বললাম, খালা, হচ্ছে কী?

হাসি খালা বললেন, কী হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। নতুন কায়দায় নেল পলিশ লাগানো হচ্ছে। নখের গোড়ায় কড়া লাল রঙ। আস্তে আস্তে নখের মাথায় এসে রঙ মিলিয়ে যাবে।

'জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে।'

'জটিল তো বটেই। জিনিসটা দাঁড়ায় কেমন সেটা হচ্ছে কথা। এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট।'

ভদ্রলোক আরেকবার বিরক্ত গলায় বললেন—হাসি, প্লিজ।

আমি কিছুক্ষণ নেল পলিশ দেয়া দেখলাম। গাঢ় লাল, হালকা লাল, সাদা—তিন রঙের কৌটা, নেল পলিশ রিমুভার নিয়ে প্রায় হুলস্থুল ব্যাপার হচ্ছে।

হাসি খালা বললেন, জামিল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। এ হচ্ছে হিমু। ভালো নাম এভারেস্ট, কিংবা হিমালয়। মারিয়ার বাবার অনেক আবিষ্কারের এক আবিষ্কার। খুব ভালো হাত দেখতে পারে। হাত দেখে যা বলে তাই হয়।

ভদ্রলোক চোখ-মুখ কুঁচকে ফেললেন। আমি সামনে থেকে সরলে তিনি বাঁচেন এই অবস্থা। আমি বিনয়ী গলায় বললাম, স্যার, ভালো আছেন?

ভদ্রলোক বললেন, ইয়েস, আই অ্যাম ফাইন। থ্যাংক য়্যু।

'আপনার নেল পলিশ দেয়া খুব চমৎকার হচ্ছে, স্যার।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল। হাসি খালা বললেন—তুই যা, মারিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়। আর শোন, চলে যাবার আগে আমার হাত দেখে দিবি। জামিল, তুমি কি হিমুকে দিয়ে হাত দেখাবে?

জামিল নামের ভদ্রলোক নেল পলিশের রঙ মেশানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শীতল গলায় বললেন—এইসব আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি বললাম, আধিভৌতিক বলে সবকিছু উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না, স্যার। অ্যাস্ট্রলজি ছিল আধিভৌতিক ব্যাপার। সেই অ্যাস্ট্রলজি থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক অ্যাস্ট্রনমি। একসময় আলকেমিও ছিল আধিভৌতিক। সেই আলকেমি থেকে আমরা পেয়েছি আধুনিক রসায়নবিদ্যা।

জামিল সাহেব বললেন, মিস্টার এভারেস্ট, এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না। আমি একটা কাজ করছি। যদি কখনো সুযোগ হয় পরে কথা হবে।

'জি আচ্ছা, স্যার।'

আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

এই ঘর আগের মতোই আছে। একটুও বদলায়নি। খাটে শুয়ে থাকা মানুষটা শুধু বদলেছে। ভরাট স্বাস্থ্যের সেই মানুষ নেই। রোগাভোগা একজন মানুষ। মাথাভরতি চুল ছিল, চুল কমে গেছে। চোখের তীব্র জ্যোতিও ম্লান। নিজের তৈরি বেহেশতে জীবনযাপন করতে করতে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, কেমন আছ হিমু?

'ভালো।'

'তোমাকে দেখে আমার ভালো লাগছে।'

'আপনাকে দেখে আমার তেমন ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

'স্বর্গে বাস করা ক্লান্তিকর ব্যাপার হিমু। আমি আসলেই ক্লান্ত। সময় কাটছে না।'

'সময় কাটছে না কেন?'

'কীভাবে সময় কাটাব সেটা বুঝতে পারছি না। এখন বই পড়তে পারি না।'

'বই পড়তে পারেন না?'

'না। বই পড়তে ভালো লাগে না, গান শুনতে ভালো লাগে না, শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। যা ভালো লাগে না, তা করি না। বই পড়ি না, গান শুনি না। কিন্তু শুয়ে থাকতে ভালো না লাগলেও শুয়ে থাকতে হচ্ছে। আই হ্যাভ নো চয়েস। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন হিমু, বোস। আমার বিছানায় বোস।'

আমি বসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব মুখটিপে খানিকক্ষণ মিটমিট করে হাসলেন। কেন হাসলেন ঠিক বোঝা গেল না। হঠাৎ মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন—এখন আমি কী করছি জান?

'জি না, জানি না। আপনি বলুন, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি।'

'আমি যা করছি তা হচ্ছে মানসিক গবেষণা।'

'সেটা কী?'

'মনে মনে গবেষণা। কোনো একটা বিষয় নিয়ে জটিল সব চিন্তা করছি কিন্তু সবই মনে মনে। আমার সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় হল—নারী-পুরুষ সম্পর্ক।

'প্রেম?'

'হ্যাঁ প্রেম। হিমু, তুমি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছ?'

'না।'

'মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'না।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ নিশ্চিত।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, প্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কী বল তো?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো এইসব নিয়ে গবেষণা করছি না। কাজেই বলতে পারছি না। আপনি বরং বলুন গবেষণা করে কী পেয়েছেন।

'শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বুকের নিচে বালিশ দিয়ে একটু উঁচু হলেন। কথা বলা শুরু করলেন শান্ত ভঙ্গিতে এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে।

'হিমু শোন, গবেষণা না—একজন শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা। চিন্তাও ঠিক না—ফ্যান্টাসি। আমার মনে হয় কী জান? সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পাঁচটি অদৃশ্য নীলপদ্ম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। এই নীলপদ্মগুলি হল—প্রেম-ভালবাসা। যেমন ধর তুমি। তোমাকে পাঁচটি নীলপদ্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তুমি কাউকে পাও নি যাকে পদ্ম দিতে ইচ্ছে করেছে। কাজেই তুমি কারোর প্রেমে পড়নি। আবার ধর, একটা সতের বছরের তরুণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল। মেয়েটির তোমাকে এতই ভালো লাগল যে, সে কোনোদিকে না তাকিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তার সবকটি নীলপদ্ম তোমাকে দিয়ে দিল। তুমি পদ্মগুলি নিলে কিন্তু তাকে গ্রহণ করলে না। পরে এই মেয়েটি কিন্তু আর কারো প্রেমে পড়তে পারবে না। সে হয়তো একসময় বিয়ে করবে, তার স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করবে কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রেম তার থাকবে না।'

আমি বললাম, আর আমার কী হবে? আমার নিজের পাঁচটি নীলপদ্ম ছিল, তার সঙ্গে আরো পাঁচটি যুক্ত হয়ে পদ্মের সংখ্যা বেড়ে গেল না?'

'হ্যাঁ, বাড়ল।'
'তা হলে আমি কি ইচ্ছা করলে এখন কাউকে পাঁচটির জায়গায় দশটি পদ্ম দিতে পারি?'
'তা পার না। অন্যের পদ্ম দেয়া যাবে না। তোমাকে যে পাঁচটি দেয়া হয়েছে শুধু সেই পাঁচটি দেয়া যাবে।'
'পাঁচটি কেন বলছেন? পাঁচের চেয়ে বেশি নয় কেন?'
'পাঁচ হচ্ছে একটা ম্যাজিক সংখ্যা। এই জন্যেই বলছি পাঁচ। আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি। বেশিরভাগ ফুলের পাপড়ি থাকে পাঁচটি। পাঁচ হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা তবে পাঁচের ব্যাপারটা আমার কল্পনা, পাঁচের জায়গায় সাতও হতে পারে। আমার হাইপোথেসিস তোমার কাছে কেমন লাগছে?'
'চমৎকার লাগছে।'
'আজকাল আমি দিন-রাত এটা নিয়েই ভাবি। আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, দেয়ার মানুষ পায় না।'
'অনেকে হয়তো দিতেও চায় না।'
'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অনেকে পদ্মগুলি হাতছাড়া করতে চায় না। আবার এমনও হতে পারে, পদ্মগুলি দেয়া হয় ভুল মানুষকে। যাকে দেয়া হল সে পদ্মের মূল্যই বুঝল না। এই হচ্ছে আমার নীলপদ্ম থিওরি। তোমাকে বললাম, তুমি তো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াও, অনেকের সঙ্গে মেশ, আমার থিওরিটা পরীক্ষা করে দেখো।'
'জি আচ্ছা। তবে আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, কিছু কিছু রহস্যময় ব্যাপার সম্পর্কে কোনো থিওরি না দেয়াই ভালো। থিওরি বা হাইপোথেসিস রহস্য নষ্ট করে। থাকুক না কিছু রহস্য। সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডুবে, সকালে ওঠে। কত রহস্যময় একটা ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে এটা হচ্ছে জানার পর আর রহস্য থাকে না।'
'হিমু, তুমি কি জ্ঞানের বিপক্ষে?'
'জি। জ্ঞান এক ধরনের বাধা। এক ধরনের অন্ধকার। কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান সেই বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের দূরত্ব তৈরি করিয়ে দেয়।'
'বুঝতে পারছি না।'
'যেমন ধরুন, আপনার নীলপদ্ম থিওরি। এটা জানার পর থেকে আমার কী হবে জানেন? কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি ভাবব, আচ্ছা, এই মেয়েটিকে কি নীলপদ্ম দেয়া যায়? দেয়া গেলে কটা দেয়া যায়? মেয়েটি তার নিজের নীলপদ্মগুলি কী করেছে? কাউকে দিয়ে ফেলেছে?'
'আমার হাইপোথেসিস তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি এইসব আর কিছুই না, একজন অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত প্রলাপ।'
আসাদুল্লাহ সাহেব হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আমি আসি।
আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, তোমার কি মারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে?
'জি না।'
'মারিয়া বাসাতেই আছে। নিজের ঘরে বসে আছে। ও কারো সঙ্গেই দেখা করে না। কথা বলে না। এমনকি আমার সঙ্গেও না।'
'তাই নাকি?'
'তুমি যাবার আগে অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করে যাবে।'
'কারো সঙ্গেই যখন দেখা করে না—আমার সঙ্গেও করবে না।'
আসাদুল্লাহ সাহেব হাসলেন। পুরোনো দিনের সেই চমৎকার হাসি। আমি চমকে উঠলাম।
'হিমু!'

'জি।'

'আমি আমার নীলপদ্ম থিওরি মারিয়াকে দেখে দেখেই তৈরি করেছি। মারিয়া তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি তোমাকে লেখে। খুব অল্প বয়সে লেখে। কাজেই আমার থিওরি অনুযায়ী তার সবকটা নীলপদ্ম তোমার কাছে।'

'চিঠি লেখার ব্যাপারটি আপনি জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। আমার মেয়ের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল, সে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি আমাকে দেখিয়ে লিখবে। মারিয়া চুক্তি রক্ষা করেছে। আমাকে চিঠিটি দেখিয়েছে, তবে আমি যেন বুঝতে না পারি সে জন্যে ছেলেমানুষি এক সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে।'

'আপনি সেই সাঙ্কেতিক চিঠির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছেন?'

'অবশ্যই। তবে ভান করেছি বুঝতে পারিনি।'

'মারিয়া সেই চিঠি কাকে লিখেছিল তা কি আপনাকে বলেছে?'

'না। তবে আমি অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি খারাপ না। হিমু শোন, আমার মেয়েটা পড়াশোনার জন্যে ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছে। আমি নিজেই জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মনের যে শক্তি মানুষকে চালিত করে আমার মেয়েটার মনের সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে সেই শক্তি ফেরত দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজটা আমি তোমাকে দিয়ে করাতে চাই। এই জন্যেই তোমাকে এত ব্যস্ত হয়ে খুঁজছি।'

'মনের শক্তি জাগানোর কাজটা আপনি করতে পারছেন না কেন?'

'আমার ওপর মেয়েটির যে বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন?'

আসাদুল্লাহ সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—তুমি কি লক্ষ করেছ মারিয়ার মার নখে এক ভদ্রলোক নেল পলিশ লাগাচ্ছেন?

'হ্যাঁ, লক্ষ করেছি।'

'নেল পলিশের এই এক্সপেরিমেন্ট অনেক দিন ধরেই করা হচ্ছে। মারিয়ার মা ওই ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছে। তারা শিগগিরই বিয়ে করবে। আমি সব জেনেও কিছু বলছি না। মারিয়া এতেও আহত হয়েছে। জীবনে সে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে।'

'আমাকে কী করতে বলেন?'

'ওকে জীবনের জটিলতার অংশটার কথা বুঝিয়ে বল। ও তোমার কথা শুনবে কারণ ওর নীলপদ্মগুলি তোমার কাছে।'

১৩

মারিয়া বলল, বসুন।

তার চোখ-মুখ কঠিন, তবু মনে হল সেই কাঠিন্যের আড়ালে চাপা হাসি ঝিকমিক করছে। সে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চাঁপা রঙের শাড়ি। রঙটা এমন যে মনে হচ্ছে ঘরে চাঁপাফুলের গন্ধ পাচ্ছি। গলায় লাল পাথর। চুনি নিশ্চয় না। চুনি এত বড় হয় না।

'রকিং চেয়ারে আরাম করে বসে দোল খেতে খেতে কথা বলুন। বাবা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তাই তো?'

আমি দোল খেতে খেতে বললাম, হ্যাঁ।

'বাবার ধারণা, আমার মন খুব অশান্ত। সেই অশান্ত মন শান্ত করার সোনার কাঠি আপনার কাছে। তাই না?'

'এরকম ধারণা ওনার আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এরকম অদ্ভুত ধারণার কারণ জানেন?'

'না।'

'কারণটা আপনাকে বলি—অ্যাকসিডেন্টের পর বাবা মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আপনি তাঁকে কিছু কথা বলেন। তাতে তাঁর মন শান্ত হয়। সেই থেকেই বাবার ধারণা হয়েছে মন শান্ত করার মতো কথা আপনি বলতে পারেন। ভালো কথা, বাবাকে আপনি কী বলেছিলেন?'

'আমার মনে নেই। উদ্ভট কথাবার্তা তো আমি সব সময়ই বলি। তাঁকেও মনে হয় উদ্ভট কিছুই বলেছিলাম।'

'আমাকেও তা হলে উদ্ভট কিছু বলবেন?'

'তোমাকে উদ্ভট কিছু বলব না। তুমি আমাকে যে চিঠি লিখেছিলে আমি তার জবাব লিখে এনেছি। সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে এনেছি।'

মারিয়া হাত বাড়াল। তার চোখে চাপা কৌতুক ঝকমক করছে। মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে সে খিলখিল করে হেসে ফেলবে। যেন সে অনেক কষ্টে হাসি থামাচ্ছে।

'সাঙ্কেতিক চিঠিটায় কী লেখা পড়তে পারছ?'

'পারছি। এখানে লেখা I hate you.'

'I love you- ও তো হতে পারে।'

'সঙ্কেতের ব্যাখ্যা সবাই তার নিজের মতো করে করে, আমিও তাই করলাম। আপনার আটটা তারার অনেক মানে করা যায়, যেমন—

I want you.

I miss you.

I lost you.

আমি আমার পছন্দমতো একটা বেছে নিলাম।'

'মারিয়া, তোমার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়?'

'যায় না, কিন্তু আপনি খেতে পারেন।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, তুমি কি তোমার বাবার নীলপদ্ম থিওরির কথা জান?

মারিয়া এইবার হেসে ফেলল। কিশোরীর সহজ স্বচ্ছ হাসি। হাসতে হাসতে বলল, আজগুবি থিওরি। আজগুবি এবং হাস্যকর।

'হাস্যকর বলছ কেন?'

'হাস্যকর এই জন্যে বলছি যে, বাবার থিওরি অনুসারে আমার পাঁচটি নীলপদ্ম এখন আপনার কাছে। কিন্তু আমি আপনার প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করছি না। আপনাকে দেখে কোনো রকম আবেগ, রোমাঞ্চ কিছুই হচ্ছে না। বরং কিশোরী বয়সে যে পাগলামিটা করেছিলাম তার জন্যে রাগ লাগছে। বাবার থিওরি ঠিক থাকলে কিশোরী বয়সে পাগলামির জন্যে এখন রাগ লাগত না।'

'এখন পাগলামি মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই মনে হচ্ছে। হিমু ভাই, আমি সেই সময় কী সব পাগলামি করেছি একটু শুনুন। চা খাবেন?'

'না।'

'খান একটু। আমি খাচ্ছি, আমার সঙ্গে খান। বসে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

মারিয়া বের হয়ে গেল। আমি নিজের মনে দোল খেতে লাগলাম। দীর্ঘ পাঁচ বছরে মারিয়ার ঘরের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা ধরার চেষ্টাও করছি। ধরতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে ঘরটা ঠিক আগের মতো আছে, আবার মনে হচ্ছে একেবারেই আগের মতো নেই। সবই বদলে গেছে। মারিয়ার ছোটবেলাকার ছবিটা শুধু আছে। ছবি বদলায় না।

মারিয়া ট্রেতে করে মগভরতি দুমগ চা নিয়ে ঢুকল। কোনো কারণে সে বোধহয় খুব হেসেছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।'

'হিমু ভাই, চা নিন।'

আমি চা নিলাম। মারিয়া হাসতে হাসতে বলল, জামিল চাচার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

'নখ-শিল্পী?'

'হ্যাঁ নখ-শিল্পী। মার নখের শিল্পকর্ম তিনি কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছেন। মা সেই শিল্পকর্ম দেখে বিস্ময়ে অভিভূত।'

'খুব সুন্দর হয়েছে?'

'দেখে মনে হচ্ছে নখে ঘা হয়েছে—রক্ত পড়ছে। মাকে এই কথা বলায় মা খুব রাগ করল। মার রাগ দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। মা যত রাগ করে আমি তত হাসি। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। চায়ে চিনিটিনি সব ঠিক হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'বাবার সঙ্গে মার কীভাবে বিয়ে হয়েছিল সেটা কি আপনি জানেন?'

'না, জানি না। ওই গল্প থাক—তোমার গল্পটা বল। কিশোরী বয়সে কী পাগলামি করলে?'

'আমার গল্পটা বলছি কিন্তু মার গল্পটা না শুনলে আমারটা বুঝতে পারবেন না। মা হচ্ছে বাবার খালাতো বোন। মা যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন তখন বাবার জন্যে মার মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেল। বলা চলে পুরো উন্মাদিনী অবস্থা। বাবা সেই অবস্থাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। মা কিছু ডেসপারেট মুভ নিলেন। তাতেও লাভ হল না। শেষে একদিন বাবকে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখে সিনেমার প্রেমিকাদের মতো একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে ফেললেন। মার জীবন সংশয় হল। এখন মরে তখন মরে অবস্থা। বাবা হাসপাতালে মাকে দেখতে গেলেন। মার অবস্থা দেখে তাঁর করুণা হল। বাবা হাসপাতালেই ঘোষণা করলেন—মেয়েটা যদি বাঁচে তাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। মা বেঁচে গেলেন। তাঁদের বিয়ে হল। গল্পটা কেমন?'

'ইন্টারেস্টিং।'

'ইন্টারেস্টিং না, সিনেমাটিক। ক্লাসিক্যাল লাভ স্টোরি। প্রেমিককে না পেয়ে আত্মহননের চেষ্টা। এখন হিমু ভাই, আসুন, মার ক্ষেত্রে বাবার নীলপদ্ম থিওরি অ্যাপ্লাই করি। থিওরি অনুযায়ী মা তাঁর নীলপদ্মগুলি বাবাকে দিয়েছিলেন—সব কটা দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই যদি হয় তা হলে পড়ন্ত যৌবনে মা জামিল চাচাকে দেয়ার জন্যে নীলপদ্ম পেলেন কোথায়? জামিল চাচা বিবাহিত একজন মানুষ। তাঁর বড় মেয়ে মেডিকেলে পড়ছে। তিনি যখন-তখন এ বাড়িতে আসেন। মার শোবার ঘরে দুজনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। শোবার ঘরের দরজাটা তাঁরা পুরোপুরি বন্ধও করেন না, আবার খোলাও রাখেন না। সামান্য ফাঁক করে রাখেন। মজার ব্যাপার না?'

আমি কিছুই বললাম না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে মারিয়ার হাসি হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'বাবার নীলপদ্ম বিষয়ক হাস্যকর ছেলেমানুষি থিওরির কথা আমাকে বলবেন না।'

'আচ্ছা বলব না।'

'প্রেম নিতান্তই জৈবিক একটা ব্যাপার—নীলপদ্ম বলে একে মহিমান্বিত করার কিছু নেই।'

'তাও স্বীকার করছি।'

'হিমু ভাই, আপনি এখন বিদেয় হোন—আপনার চা আশা করি শেষ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, চা শেষ।'

'আমাকে নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। বাবার কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমি বাইরে পড়তে চলে যাচ্ছি। এখানকার কোনো কিছু নিয়েই আর আমার মাথাব্যথা নেই। বাবার সময় কাটছে না, সেটা তাঁর ব্যাপার। আমি দেখব আমার নিজের জীবন, আমার কেরিয়ার।'

'খুবই ভালো কথা।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মারিয়া বলল, ও আচ্ছা, আরো কয়েক মিনিট বসুন, আপনাকে নিয়ে কী সব পাগলামি করেছি তা বলে নেই। আপনার শোনার শখ ছিল।

আমি বসলাম। মারিয়া আমার দিকে একটু ঝুঁকে এল। দামি কোনো পারফিউম সে গায়ে দিয়েছে। পারফিউমের হালকা সুবাস পাচ্ছি। হালকা হলেও সৌরভ নিজেকে জানান দিচ্ছে কঠিনভাবেই। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। মারিয়ার চুল খোলা। এই খোলা চুল ফ্যানের বাতাসে উড়ছে। কিছু এসে পড়ছে আমার মুখে। ভয়াবহ সুন্দর একটি দৃশ্য।

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'একটা সময়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ঙ্কর কষ্টের কিছু সময় পার করেছি। রাতে ঘুম হত না। রাতের পর রাত জেগে থাকার জন্যেই হয়তো মাথাটা খানিকটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপার হত। অনেকটা হেলুসিনেশনের মতো। মনে করুন পড়তে বসেছি, হঠাৎ মনে হল আপনি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার বইয়ে আপনার ছায়া পড়েছে। তখন বুক ধুকধুক করতে থাকত। চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখতাম—কেউ নেই। আপনাকে তখনই চিঠিটা লিখি। আপনি তার জবাব দেননি। আমাদের বাড়িতে আর আসেনওনি।'

'না এসে ভালোই করেছি। তোমার সাময়িক আবেগ যথাসময়ে কেটে গেছে। তুমি ভুল ধরতে পেরেছ।'

'হ্যাঁ, তা পেরেছি। ওই সময়টা ভয়ঙ্কর কষ্টে কষ্টে গেছে। রোজ ভাবতাম, আজ আপনি আসবেন। আপনি আসেননি। আপনার কোনো ঠিকানা নেই আমাদের কাছে যে আপনাকে খুঁজে বের করব। আমার সে বছর এ লেভেল পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। আমার পরীক্ষা দেয়া হয়নি। প্রথমত, বই নিয়ে বসতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হত আমি পরীক্ষা দিতে যাব আর আপনি এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবেন। আমি রোজ রাতে দরজা বন্ধ করে কাঁদতাম।'

বলতে বলতে মারিয়া হাসল। কিন্তু তার চোখে অনেক দিন আগের কান্নার ছায়া পড়ল। এই ছায়া সে হাসি দিয়ে ঢাকতে পারল না।

আমি বললাম, তারপরেও তুমি বলছ নীলপদ্ম কিছু না—পুরো ব্যাপারটাই জৈবিক?

'হ্যাঁ বলছি। তখন বয়স অল্প ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি। চারপাশে কী ঘটছে তা দেখে শিখছি।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে খুবই দুঃখিত।

'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চিঠি নিয়ে যান। আট তারার চিঠি। এই হাস্যকর চিঠির আমার দরকার নেই।'

আমি চিঠি নিয়ে পকেটে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আসাদুল্লাহ সাহেবের নীলপদ্ম থিওরি ঠিক আছে। এই তরুণী তার সমস্ত নীলপদ্ম হিমু নামের এক ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণার ভেতর বাস করছে। এই যন্ত্রণা, এই কষ্ট থেকে তার মুক্তি নেই। আমি তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে এখন মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অশ্রু গোপন করবার জন্যে মেয়েরা ওই ভঙ্গিটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে।

'মারিয়া!'

'জি।'

'ভালো থেকো।'

'আমি ভালোই থাকব।'

'যাচ্ছি, কেমন?'

'আচ্ছা যান। আমি যদি বলি—আপনি যেতে পারবেন না, আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে—আপনি কি থাকবেন? থাকবেন না। কাজেই যেতে চাচ্ছেন, যান।'

'গেট পর্যন্ত এগিয়ে দাও!'

'না। ও আচ্ছা, আমার হাতটা দেখে দিয়ে যান। আমার ভবিষ্যৎটা কেমন হবে বলে দিয়ে যান।'

মারিয়া তার হাত এগিয়ে দিল। মারিয়ার হাত দেখার জন্যে আমি আবার বসলাম।

'খুব ভালো করে দেখবেন। বানিয়ে বানিয়ে বলবেন না।'

'তোমার খুব সুখের সংসার হবে। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি কন্যার অপূর্ব সংসার। কন্যাটির নাম তুমি রাখবে—চিত্রলেখা।'

মারিয়া খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল—থাক, আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না। বানিয়ে বানিয়ে উদ্ভট কথা! আমি আমার মেয়ের নাম চিত্রলেখা রাখতে যাব কেন? দেশে নামের আকাল পড়েছে যে বাড়ির নামে মেয়ের নাম রাখব? যাই হোক, আমি অবিশ্যি ভবিষ্যৎ জানার জন্য আপনাকে হাত দেখতে দেইনি। আমি আপনার হাত কিছুক্ষণের জন্য ধরতে চাচ্ছিলাম। এমনিতে তো আপনি আমার হাত ধরবেন না। কাজেই অজুহাত তৈরি করলাম। হিমু ভাই, আপনি এখন যান। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, রোদে আপনার বিখ্যাত হাঁটা শুরু করুন।

মারিয়ার গলা ধরে এসেছে। সে আবার মাথা নিচু করে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভেতর এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হল। মনে হল আমার আর হাঁটার প্রয়োজন নেই। মহাপুরুষ না, সাধারণ মানুষ হয়ে মমতাময়ী এই তরুণীটির পাশে এসে বসি। যে নীলপদ্ম হাতে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম, সেই পদ্মগুলি তার হাতে তুলে দেই। তারপরই মনে হল—এ আমি কী করতে যাচ্ছি! আমি হিমু—হিমালয়।

মারিয়া বলেছিল সে গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসবে না। কিন্তু সে এসেছে। গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল মারিয়া চাঁপা রঙের শাড়ি পরে আছে, এখন দেখি শাড়ির রঙ নীল। রোদের আলোয় রঙ বদলে গেল, নাকি প্রকৃতি আমার ভেতর বিভ্রম তৈরি করা শুরু করেছে?

'হিমু ভাই!'

'বল।'

'যাবার আগে আপনি কি বলে যাবেন আপনি কে?'

আমি বললাম, মারিয়া, আমি কেউ না। I am nobody।

আমি আমার এক জীবনে অনেককে এই কথা বলেছি—কখনো আমার গলা ধরে যায়নি, বা চোখ ভিজে ওঠেনি। দুটা ব্যাপারই এই প্রথম ঘটল।

মারিয়া হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রচণ্ড রোদে আমি হাঁটছি। ঘামে গা ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় এসে জামের ভেতর পড়লাম, কার যেন বিজয় মিছিল বের হয়েছে। জাতীয় পার্টির মিছিল। ব্যানারে এরশাদ সাহেবের ছবি আছে। আন্দোলনের শেষে সবাই বিজয় মিছিল করছে, তারাই বা করবে না কেন? এই প্রচণ্ড রোদেও তাদের বিজয়ের আনন্দে ভাটা পড়ছে না। দলের সঙ্গে ভিড়ে যাব কি না ভাবছি। একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। মিছিলের সঙ্গে থাকায় একটা সুবিধা হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে থেকেও একা থাকা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণ হাঁটলাম মিছিলের সঙ্গে। একজন আমার হাতে এরশাদ সাহেবের একটা ছবি ধরিয়ে দিল। এরশাদ সাহেবের আনন্দময় মুখের ছবি। প্রচণ্ড রোদে সেই হাসি ম্লান হচ্ছে না।

মিছিল কাওরান বাজার পার হল। আমরা গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছি—পল্লীবন্ধু এরশাদ।

জিন্দাবাদ!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আমার পা-খোঁড়া কুকুরটা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। কাওরান বাজার তার এলাকা। সে আমাকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে আমার পাশে পাশে চলা শুরু করেছে। তার খোঁড়া পা মনে হচ্ছে পুরোপুরি অচল—এখন আর মাটিতে ফেলতে পারছে না। তিন পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আমি বললাম, তিন পায়ে হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে না তো?

সে বলল, কুঁই কুঁই কুঁই।

কী বলতে চেষ্টা করল কে জানে? কুকুরের ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হত। আমার জানা নেই, তার পরেও আমি তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগুচ্ছি—

'তুই যে আমার সঙ্গে আসছিস আমার খুব ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে খুব একা লাগে, বুঝলি? আমার সঙ্গে কী আছে জানিস? পদ্ম। নীলপদ্ম। পাঁচটা নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরছি। কী অপূর্ব পদ্ম! কাউকে দিতে পারছি না। দেয়া সম্ভব নয়। হিমুরা কাউকে নীলপদ্ম দিতে পারে না।'

চৈত্রের রোদ বাড়ছে। রোদটাকে আমি জোছনা বানানোর চেষ্টা করছি। বানানো খুব সহজ—শুধু ভাবতে হবে—আজ গৃহত্যাগী জোছনা উঠেছে—চারদিকে থইথই করছে জোছনা। ভাবতে ভাবতেই একসময় রোদটাকে জোছনার মতো মনে হতে থাকবে। আজ অনেক চেষ্টা করেও তা পারছি না। ক্লান্তিহীন হাঁটা হেঁটেই যাচ্ছি—হেঁটেই যাচ্ছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তন্দ্রাবিলাস

১

ভোর বেলায় মানুষের মেজাজ মোটামুটি ভাল থাকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হতে থাকে, বিকাল বেলায় মেজাজ সবচে বেশি খারাপ হয়, সন্ধ্যার পর আবার ভাল হতে থাকে। এটাই সাধারণ নিয়ম।

এখন সকাল এগারোটা, মেজাজের সাধারণ সূত্রমতে মিসির আলির মেজাজ ভাল থাকার কথা। কিন্তু মিসির আলির মন এই মুহূর্তে যথেষ্টই খারাপ। তিনি বসার ঘরে বেতের চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকে আছে। তাঁর মেজাজ খারাপের দু'টি কারণের প্রথমটা হল—একটা মাছি। অনেকক্ষণ থেকেই মাছিটা তাঁর গায়ে বসার চেষ্টা করছে। সাধারণ মাছি না—নীল রঙের স্বাস্থ্যবান ডুমো মাছি। আম-কাঁঠালের সময় এই মাছিগুলিকে দেখা যায়। এখন শীতকাল—এই মাছি এল কোত্থেকে? মাছিটা তাঁর গায়েই বারবার বসতে চাচ্ছে কেন? তাঁর সামনে বসে থাকা মেয়েটির গায়ে কেন বসছে না?

মিসির আলির মেজাজ খারাপের দ্বিতীয় কারণ এই মেয়েটি। তাঁর ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে একটা ধমক দেন। যদিও ধমক দেবার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। মেয়েটি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। দেখা করতে আসার অপরাধে কাউকে ধমক দেয়া যায় না। ধমক দেয়ার বদলে মিসির আলি শব্দ করে কাশলেন। প্রচণ্ড শব্দে কাশলে, কিংবা কুৎসিত শব্দে নাক ঝাড়লে মনের রাগ অনেকখানি কমে। মিসির আলির কমল না বরং আরো যেন বাড়ল। মাছিটাও মনে হচ্ছে এই শব্দে উৎসাহ পেয়েছে। এতক্ষণ গায়ে বসতে চাচ্ছিল এখন উড়ে ঠোঁটে বসতে চাচ্ছে। কী যন্ত্রণা!

স্যার, আমার নাম সায়রা বানু। সায়রা বানু নামটা কি আপনার মনে থাকবে?

মিসির আলি বললেন, মনে থাকার প্রয়োজন কি আছে?

অবশ্যই আছে। আমি এত আগ্রহ করে আমার নামটা আপনাকে কেন বলছি, যাতে মনে থাকে সেই জন্যেই তো বলছি।

মিসির আলি রোবটের গলায় বললেন, মানুষের নাম আমার মনে থাকে না।

মেয়েটি তাঁর রোবট গলা অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বলল, আমারটা মনে থাকবে। কারণ একজন বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রীর নাম সায়রা বানু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। এখন তাঁর মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। অর্থহীন কথা শুনতে ভাল লাগছে না। তা ছাড়া শীতও লাগছে। চেয়ারটা টেনে রোদে নিয়ে গেলে হয়। তাতে কিছুক্ষণ আরাম লাগবে তারপর আবার রোদে গা চিড়বিড় করতে থাকবে। শীতকালের এই এক যন্ত্রণা। ছায়া বা রোদ কোনোটাই ভাল লাগে না। মিসির আলি মাছিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাছিটার কারণে নিজেকে এখন কাঁঠাল কাঁঠাল মনে হচ্ছে।

মেয়েটি খানিকটা মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, আপনি দিলীপ কুমার, সায়রা বানু এদের নাম শোনেননি?

দিলীপ কুমারের নাম শুনেছি।

সায়রা বানু হচ্ছে দিলীপ কুমারের বউ। আমার বন্ধুরা অবশ্যি আমাকে সায়রা বানু ডাকে না, তারা ডাকে এস বি। সায়রার এস, বানুর বি–এস বি। এস বি তে আর কি হয় বলুন তো?

বলতে পারছি না।

এস বি হচ্ছে স্পেশাল ব্রাঞ্চ। আমার বন্ধুদের ধারণা আমার চেহারায় একটা স্পাই স্পাই ভাব আছে। এই জন্যেই তারা আমাকে এস বি ডাকে। আচ্ছা আপনারও কি ধারণা আমার চেহারায় স্পাই স্পাই ভাব? ভাল করে একটু আমার দিকে তাকান না। আপনি সারাক্ষণ এদিন ওদিন তাকাচ্ছেন কেন?

মিসির আলি এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন না। মাছিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। মাছিটা এদিক ওদিক করছে বলেই এদিক ওদিক তাকাতে হচ্ছে। আচ্ছা, পৃথিবীতে মোট কত প্রজাতির মাছি আছে?

এই যে শুনুন। তাকান আমার দিকে।

মিসির আলি মেয়েটির দিকে তাকালেন। অতিরিক্ত ফর্সা একটি মেয়ে। বাঙালি মেয়েদের গায়ের রঙের একটা মাত্রা আছে। কোনো মেয়ে যদি সেই মাত্রা অতিক্রম করে যায় তখন আর ভাল লাগে না। তার মধ্যে বিদেশী বিদেশী ভাব চলে আসে। তাকে তখন আর আপন মনে হয় না। সায়রা বানুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাকে পর পর লাগছে। মেয়েটির মাথা ভর্তি চুল। সেই চুলেও লালচে ভাব আছে। অতিরিক্ত ফর্সা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই হয়। তাদের গায়ের রঙের খানিকটা এসে চুলে লেগে যায়। চুল লালচে দেখায়—খানিকটা এসে লাগে চোখে। চোখ তখন আর কালো মনে হয় না। মেয়েটির মুখ লম্বাটে। একটু বোঁচা ধরনের নাক। বোঁচা নাক থাকায় রক্ষা—বোঁচা নাকের কারণেই মেয়েটিকে বাঙালি মনে হচ্ছে। খাড়া নাক হলে মেডিটেরিনিয়ান সমুদ্রের পাশের গ্রিক কন্যা বলে মনে হত। বয়স কত হবে? উনিশ থেকে পঁচিশের ভেতর। মানুষের বয়স চট করে ধরতে পারার কোনো পদ্ধতি থাকলে ভাল হত। গাছের রিং গুনে বয়স বলা যায়। মানুষের তেমন কিছু নেই। মানুষের বয়স তার মনে বলেই বোধ হয়। আচ্ছা, একটা মাছি কত দিন বাঁচে?

স্যার কথা বলছেন না কেন? আমাকে কি স্পাই মেয়ে বলে মনে হচ্ছে?

স্পাই মেয়েদের চেহারা আলাদা হয় বলে আমি জানি না।

একটু আলাদা হয়। স্পাই মেয়েদের মুখ দেখে এদের মনের ভাব বোঝা যায় না। এদের মুখে এক রকম ভাব, মনের ভেতর আরেক রকম।

তোমারও কি তাই?

জি। ও, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি এস বি ছাড়াও আমার আরেকটা নাম আছে। নাম ঠিক না খেতাব। নববর্ষে পাওয়া খেতাব। আমাদের কলেজে পহেলা বৈশাখে খেতাব দেয়া হয়। আমার খেতাবটা হচ্ছে সাদা বাঘিনী। এস বি তে সাদা বাঘিনীও হয়। সাদা বাঘিনী টাইটেল কেন পেয়েছিলাম শুনতে চান? খুবই মজার গল্প।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। তাঁর কিছুই শুনতে ইচ্ছা করছে না। মাথার যন্ত্রণা এবং শীত ভাব দুইই বাড়ছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর দিয়ে শীত ভাবটা কমান যেত। চাদরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুবিখানায় দিয়েছেন। ধোয়া নিশ্চয়ই হয়ে গেছে, স্লিপের অভাবে আনতে পারছেন না। স্লিপটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। কড়া এক কাপ চা খেলেও শীতটা কমত। ঘরে চায়ের পাতা আছে, চিনি, দুধও আছে। গতকালই কিনে এনেছেন। কিন্তু গ্যাসের চুলায় কি একটা সমস্যা হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগুন জ্বলেই হুস করে নিভে যায়। মিস্ত্রি ডাকিয়ে চুলা ঠিক করা দরকার। গ্যাস মিস্ত্রিরা কোথায় থাকে কে জানে?

সায়রা বানু মেয়েটি হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছে, তার কথা তিনি মন দিয়ে শুনছেন না। মাথায় দুশ্চিন্তা নিয়ে অন্য কিছুতে মন বসান বেশ কঠিন। তবে মাছিটা এখন শান্ত হয়েছে। টেবিলের উপর চুপ করে বসে আছে। ডিম পাড়ছে না তো?

আমার সাদা বাঘিনী টাইটেল পাওয়ার ঘটনাটা খুব ইন্টারেস্টিং। শুনলে আপনি খুব মজা পাবেন। বলব?

মিসির আলি কিছুই বললেন না। তিনি খুব ভাল করেই জানেন মেয়েটি তার গল্প বলবেই। তিনি বলতে বললেও বলবে, বলতে না বললেও বলবে।

হয়েছে কি শুনুন—সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার এক বন্ধু, রাকা। রাকা হচ্ছে বোরকাওয়ালী। বোরকা পরে। সউদি বোরকা। বেশ কয়েক টাইপ বোরকা পাওয়া যায় তা কি আপনি জানেন? সউদি বোরকা, পাকিস্তানি বোরকা। সউদি বোরকা ভয়াবহ, শুধু চোখ দু'টো বের হয়ে থাকে। এমনিতে সে অবশ্যি খুব স্টাইলিস্ট। বোরকার নিচে স্লিভলেস ব্লাউজ পরে। যাই হোক, বোরকাওয়ালী রাকা হঠাৎ বলল, সে একটা পেনসিল কিনবে। আমি তাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকলাম পেনসিল কিনতে। স্টেশনারির দোকান তবে তার সঙ্গে কনফেকশনারিও আছে। চা বিক্রি হচ্ছে। কেক বিক্রি হচ্ছে। দোকানটায় বেশ ভিড়। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে এক লোক করল কি বোরকাওয়ালীর গায়ে হাত দিল। গায়ে মানে কোথায় তা আপনাকে বলতে পারব না। আমার লজ্জা লাগবে। বোরকাওয়ালী এমন ভয় পেল যে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে যাচ্ছিল। আমি বোরকাওয়ালীকে ধরে ফেললাম তারপর বদমাশ লোকটার দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি ওর গায়ে হাত দিলেন কেন? ষণ্ডা গণ্ডা টাইপের লোক। লাল চোখ। গরিলাদের মতো লোম ভর্তি হাত। সে এমন ভাব করল যে আমার কথাই শুনতে পায়নি। দোকানদারের দিকে তাকিয়ে হাই তুলতে তুলতে বলল—দেখি একটা লেবু চা। তখন আমি খপ করে তার হাত ধরে ফেললাম। সে ঝটকা দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই আমি তার হাত কামড়ে ধরলাম। যাকে বলে কচ্ছপের কামড়। কচ্ছপের কামড় কি তা নিশ্চয়ই আপনি জানেন। কচ্ছপ একবার কামড়ে ধরলে আর ছাড়ে না। আমিও ছাড়লাম না। আমার মুখ রক্তে ভরে গেল। লোকটা বিকট চিৎকার শুরু করল। ব্যাপার স্যাপার দেখে বোরকাওয়ালী অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। এর পর থেকে আমার টাইটেল হয়েছে সাদা বাঘিনী। গল্প শেষ করে সায়রা বানু খিলখিল করে হাসছে। মিসির আলি মেয়েটির হাসির মাঝখানেই বললেন, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ?

গল্প করার জন্যে এসেছি। বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে গল্প করতে আমার খুব ভাল লাগে।

আমি বিখ্যাত মানুষ?

অবশ্যই বিখ্যাত। আপনাকে নিয়ে কত বই লেখা হয়েছে। আমি অবশ্যি একটা মাত্র বই পড়েছি। ঐ যে সুধাকান্ত বাবুর গল্প। একটা মেয়ে খুন হল আর আপনি কেমন শার্লক হোমসের মতো বের করে ফেললেন— সুধাকান্ত বাবুই খুনটা করেছেন। বই পড়ে মনে হচ্ছিল আপনার খুব বুদ্ধি কিন্তু আপনাকে দেখে সেরকম মনে হচ্ছে না।

আমাকে দেখে কেমন মনে হচ্ছে?

খুব সাধারণ মনে হচ্ছে। আপনার মধ্যে একটা গৃহশিক্ষক গৃহশিক্ষক ব্যাপার আছে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি নিয়মিত বেতন পান না এমন একজন অংকের স্যার। আপনি রোজ ভাবেন আজ বেতনের কথাটা বলবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলতে পারেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা আপনি এমন গম্ভীর মুখে বসে আছেন কেন? মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে মজা তো পাচ্ছেনই না উল্টো বিরক্ত হচ্ছেন। সত্যি করে বলুন, আপনি কি বিরক্ত হচ্ছেন?

কিছুটা হচ্ছি।

মাছিটা তো এখন আর বিরক্ত করছে না। কেমন শান্ত হয়ে টেবিলে বসে আছে। তারপরেও আপনি এত বিরক্ত কেন বলুন তো?

তুমি অকারণে কথা বলছ এই জন্যে বিরক্ত হচ্ছি। অকারণ কথা আমি নিজেও বলতে পারি না, অন্যের অকারণ কথা শুনতেও ভাল লাগে না।

আপনার সঙ্গে কথা বলতে হলে সব সময় একটা কারণ লাগবে? তাহলে তো আপনি খুবই বোরিং একটা মানুষ। এত কারণ আমি পাব কোথায় যে আমি রোজ রোজ আপনার সঙ্গে কথা বলব?

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি রোজ রোজ আমার সঙ্গে কথা বলবে?

হুঁ।

সে কী, কেন?

সায়রা বানু খুব সহজ ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, এক বাড়িতে থাকতে হলে কথা বলতে হবে না?

এক বাড়িতে থাকবে মানে? আমি বুঝতে পারছি না।

আমি আপনার সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকব। ক'দিন এখনো বলতে পারছি না। দু'দিনও হতে পারে আবার দু'মাসও হতে পারে। আবার দু'বছরও হতে পারে। সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনার উপর।

মিসির আলি চেয়ার থেকে পা নামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকালেন। হচ্ছেটা কী? এই যুগের টিনএজার মেয়েদের ভাবভঙ্গি, কাণ্ডকারখানা বোঝা মুশকিল। তারা যে কোনো উদ্ভট কিছু হাসিমুখে করে ফেলতে পারে। মেয়েটি হয়ত অতি তুচ্ছ কারণে রাগ করে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে। কিংবা তাকে ভড়কে দেবার জন্যে গল্প ফেঁদেছে। পরে কলেজে বন্ধুদের কাছে এই গল্প করবে। বন্ধুরা মজা পেয়ে একে অন্যের গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়বে।–ও মাগো, বুড়োটাকে কী বোকা বানিয়েছি! সে বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে আমি থাকতে এসেছি।

মিসির আলি নিজের বিস্ময় গোপন করে সহজভাবে বললেন, তুমি এ বাড়িতে থাকবে?

জি।

বিছানা বালিশ নিয়ে এসেছ?

বিছানা বালিশ আনিনি। আজকাল তো আর বিছানা বালিশ নিয়ে কেউ অন্যের বাড়িতে থাকতে যায় না। শুধু একটা সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ এনেছি। আর একটা পানির বোতল।

সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ কোথায়?

বারান্দায় রেখে এসেছি। শুরুতেই আপনি আমার সুটকেস দেখে ফেললে ঢুকতে দিতেন না। যাই হোক আমি এখন আমার সুটকেস আর হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে আসছি। আচ্ছা, আপনি এমন ভাব করছেন যেন আকাশ থেকে পড়েছেন। আকাশ থেকে পড়ার মতো কিছু হয়নি। বিপদগ্রস্ত একজন তরুণীকে কয়েক দিনের জন্যে আশ্রয় দেয়া এমন কোনো বড় অন্যায় না। আমি নিশ্চিত এরচে অনেক বড় বড় অন্যায় আপনি করেছেন।

তুমি সত্যি সত্যি আমার এখানে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছ?

জি।

মিসির আলি তাকিয়ে রইলেন। এই মুহূর্তে তাঁর ঠিক কী করা উচিত তা মাথায় আসছে না। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে মেয়েটির কাণ্ডকারখানা দেখাই মনে হয় সবচে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মেয়েটি বুদ্ধিমতি। এই পরিস্থিতিতে তিনি কী করবেন বা করতে পারেন সেই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা সে নিশ্চয়ই করেছে। নিজেকে সম্ভাব্য সব রকম পরিস্থিতির জন্যে সে প্রস্তুত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেখেছে। মিসির আলির এমন কিছু করতে হবে যার সম্পর্কে মেয়েটির প্রস্তুতি নেই। সে কেন বাড়ি ছেড়ে এসেছে এই মুহূর্তে তা তাকে জিজ্ঞেস করা যাবে না। কারণ এই প্রশ্নটি স্বাভাবিক এবং সংগত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর মেয়েটি তৈরি করে রেখেছে। তাঁর বিস্মিত হওয়াও ঠিক হবে না। তাঁকে খুব সহজ এবং স্বাভাবিক থাকতে হবে। যেন এমন ঘটনা প্রতি সপ্তাহেই দু'টা একটা করে ঘটছে।

সায়রা বানু সুটকেস, হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকল। মিসির আলি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন সে গুনগুন করে কী একটা গানের সুরও যেন ভাজছে। কত সহজ স্বাভাবিক তার আচরণ।

কেক খাবেন?

কেক?

হুঁ। আমার নিজের বেক করা, ডিমের পরিমাণ বেশি হয়েছে বলে একটু ডিম ডিম গন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে ডিমের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারে না। আমার কাছে অবশ্যি খারাপ লাগে না। দেব আপনাকে এক পিস কেক?

না।

আপনাকে একটু বাজারে যেতে হবে, কয়েকটা জিনিস কিনতে হবে। আমি অতি দ্রুত চলে এসেছি তো কাজেই অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস আনা হয়নি। টুথপেস্ট এনেছি, টুথব্রাশ আনিনি। আমার অভ্যাস হচ্ছে রাতে শোবার সময় কুটকুট করে কয়েকটা লবঙ্গ খাওয়া। লবঙ্গ খেলে শরীরের রক্ত পরিষ্কার থাকে, কখনো হার্টের অসুখ হয় না। সেই লবঙ্গ আনা হয়নি। আপনাকে লবঙ্গ আনতে হবে। পারবেন? আমি আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। আমি সঙ্গে করে অনেক টাকা নিয়ে এসেছি। বলুন তো কত এনেছি।

বলতে পারছি না।

অনুমান করুন। আপনি হচ্ছেন বিখ্যাত মিসির আলি। আপনার অনুমান হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অনুমান। বলুন আমার সঙ্গে কত টাকা আছে?

পাঁচ হাজার টাকা।

হয়নি। আমার সঙ্গে আছে মোট একান্ন হাজার টাকা। পাঁচশ টাকার একটা বান্ডিল এনেছি আর এনেছি দশ টাকার একটা বান্ডিল। সেখান থেকে কিছু খরচ করেছি। বেবিটেক্সি ভাড়া দিয়েছি তিরিশ টাকা। ঠিক এই মুহূর্তে আমার কাছে আছে পঞ্চাশ হাজার নয়শ সত্তর টাকা। আপনাকে টুকটাক বাজারের জন্যে পাঁচশ টাকা দিচ্ছি, যা লাগে খরচ করবেন বাকিটা ফেরত দেবেন। এই নিন।

সায়রা বানু তার কাঁধে ঝুলান কালো ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। মিসির আমি টাকাটা নিলেন। মেয়েটি এক ধরনের খেলা শুরু করেছে। মিসির আলির মনে হল মেয়েটিকে সেই খেলা তার মতোই খেলতে দেয়া উচিত। এই মুহূর্তে এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে খেলা বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি মেয়েটিকে আগ্রহ নিয়ে দেখতে শুরু করেছেন—তার তাকানোর ভঙ্গি, হাঁটার ভঙ্গি, বসার ভঙ্গি। আপাত দৃষ্টিতে এইসব খুবই ছোটখাটো ব্যাপার থেকে অনেক কিছু জানা যায়।

সায়রা বানু চেয়ারে বসতে বসতে বলল, আমার খাওয়া নিয়ে আপনি মোটেই চিন্তা করবেন না। যা খাওয়াবেন আমি তাই খাব। শুধু মাছ ছাড়া। মাছ আমি খেতে পারি না—গন্ধ লাগে। অবশ্যি চিংড়ি মাছ খাই। চিংড়ি মাছ কেন খাই বলুন তো?

বলতে পারছি না।

চিংড়ি মাছ খাই কারণ চিংড়ি মাছ হচ্ছে আসলে এক ধরনের পোকা। পোকা বলেই চিংড়ি মাছে আঁশটে গন্ধ নেই। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি। আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ করে খাই। ইলিশ মাছের ডিম।

মাছের ডিমেরও তো আঁশটে গন্ধ থাকে।

ইলিশ মাছের ডিমে থাকে না। আপনি কেভিয়ার খেয়েছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

কেভিয়ার হচ্ছে পৃথিবীর সবচে দামি খাবার। কালো রঙের মাছের ডিম। স্বাদ কি রকম জানেন?

যেহেতু খাইনি স্বাদ কেমন তা তো জানার কথা না।

স্বাদ কেমন আপনি জানেন। অনেকটা আমাদের শিং মাছের ডিমের মতো। তবে আঁশটে গন্ধ অনেক বেশি। নাক চেপে ধরে আমি একবার খানিকটা খেয়েছিলাম—তারপর বমিটমি করে একাকার।

মিসির আলি পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। সঙ্গে দেয়াশলাই নেই। দেয়াশলাইয়ের খোঁজে রান্নাঘরে যেতে হবে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না। মেয়েটাকে কি বলবেন দেয়াশলাই এনে দিতে? মিসির আলিকে কিছু বলতে হল না। তার আগেই সায়রা বানু বলল, আপনার লাইটার লাগবে?

আছে তোমার কাছে?

আছে। আপনি সিগারেট মুখে দিন আমি ধরিয়ে দিচ্ছি।

মেয়েটা যে ভঙ্গিতে লাইটার ধরাল তাতে মনে হল সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে তার অভ্যাস আছে। সে নিজে সিগারেট খায় না তো? না, খায় না, সিগারেটের ধোঁয়ায় সে নাক কুঁচকাচ্ছে।

এই লাইটারটা আপনি রেখে দিন। লাইটারটা আমি আপনার জন্যে এনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

আর এক প্যাকেট সিগারেটও এনেছি। আপনার একটা বইয়ে পড়েছিলাম একজন কে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। যেদিনই আসতো আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসতো।

মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, একটু আগে বলেছিলে তুমি আমার একটা বইই পড়েছ।

মিথ্যা কথা বলেছিলাম। অনেকগুলি বই পড়েছি। সুধাকান্ত বাবুর উপর লেখা বইটা সবচে ভাল লেগেছে। ঐটা আমি পড়েছি তিনবার। না, তিনবার না। আড়াইবার পড়েছি। দুবার পড়েছি পুরোটা। শেষ বার পড়েছি শুধু শেষের কুড়ি পাতা।

ভাল।

মিথ্যা কথা বললে কি আপনি রেগে যান?

না।

আমাকে কেউ মিথ্যা কথা বললে আমি অবশ্যি খুব রেগে যাই। আর আমার এমনই কপাল যে সবাই শুধু আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে। তবে আপনি বলবেন না সেটা আমি জানি। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যায় আপনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। আপনি কি জানেন যারা সব সময় মিথ্যা কথা বলে তাদের চেহারায় একটা মাই ডিয়ার ভাব থাকে।

তাই না কি?

জি।

যেসব মেয়েকে দেখবেন খুব মায়া মায়া চেহারা, আপনি ধরেই নিতে পারেন তারা প্রচুর মিথ্যা কথা বলে।

এই তথ্য জানতাম না।

আপনি মিসির আলি আর আপনি এই সাধারণ তথ্য জানেন না? অথচ বইয়ে কত আশ্চর্য আশ্চর্য কথা যে আপনার সম্পর্কে লেখা হয়। যেমন কাউকে এক পলক দেখেই আপনি তার সম্পর্কে হড়বড় অনেক কথা বলে দিতে পারেন। আসলেই কি পারেন?

না। পারি না।

আচ্ছা চেষ্টা করে দেখুন না। আমার সম্পর্কে বলুন।

কী বলব?

আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে। এইসব। দেখি আপনার পাওয়ার অব অবজারবেশন।

দেখ সায়রা বানু, আমি পরীক্ষা দেই না।

পরীক্ষা ভাবছেন কেন? ভাবেন একটা খেলা। বলুন আমার সম্পর্কে বলুন।

মিসির আলি হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন। আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করছে। তিনি নিজের উপর একটু বিরক্ত হচ্ছেন কারণ তাঁর টেনশান হচ্ছে। টেনশান হলেই একটা সিগারেট শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। তাঁর শরীর ভাল না। এখন কিছু দিন টেনশান ফ্রি জীবনযাপন করতে চান। অজানা অচেনা একটা মেয়ে হুট করে উপস্থিত হয়ে তাতে বাধা দিচ্ছে।

মেয়েটি আগ্রহ নিয়ে বলল, কী হল, কিছু বলছেন না কেন?

মিসির আলি খানিকটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, তোমার সম্পর্কে আমার প্রথম অবজারভেশন হচ্ছে তোমার নাম সায়রা বানু নয়।

এরকম মনে হবার কারণ কী?

মনে হবার কারণ হচ্ছে—সায়রা বানু যদি তোমার নাম হত তাহলে সায়রা বানু ডাকলে তুমি সহজভাবে রেসপন্স করতে। একটু আগে আমি বললাম, দেখ সায়রা বানু পরীক্ষা আমি দেই না। বাক্যটা আমি একবারে বলিনি। দেখ সায়রা বানু, বলে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করেছি। যখন দেখলাম তুমি হঠাৎ চমকে উঠলে তখনি আমি বাক্যটা শেষ করলাম। তোমার চমকে ওঠার কারণ হচ্ছে সায়রা বানু বলে যে তোমাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তা তুমি শুরুতে বুঝতে পারনি। যখন বুঝতে পেরেছ তখনই চমকে উঠেছ। তোমার নাম কী?

আমার নাম চিত্রা।

তোমার সম্পর্কে আমার দ্বিতীয় অবজারভেশন হচ্ছে তোমাকে দীর্ঘ দিন একটা ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। সেই ঘরের জানালা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। আলোহীন একটা ঘরে দীর্ঘদিন থাকলে গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে হয়ে যায়। তোমার তাই হয়েছে। তুমি আলোর দিকে ঠিক মতো তাকাতেও পারছ না। যতবার তাকাচ্ছ ততবার চোখের মণি ছোট হয়ে আসছে। ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে। আবার জানালা থেকে তুমি চোখ ফিরিয়েও নিতে পারছ না। বারবার বিস্মিত চোখে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছ। কারণ অনেকদিন পরে তুমি জানালায় খোলা আকাশ দেখছ।

আরো কিছু বলবেন?

দীর্ঘদিন ধরে তুমি ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছ। যে কোনো কারণেই হোক তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে হচ্ছে। স্টোরি তৈরি করতে হচ্ছে। মিথ্যা বলাটা তোমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ঠিক বলেছি?

হ্যাঁ।

তোমার হাত বাঁধা ছিল। মণিবন্ধে কালো দাগ পড়ে গেছে।

হুঁ।

তোমার ঘ্রাণ শক্তি অতি প্রবল। তুমি কিছুক্ষণ পরপরই নাক কুঁচকাচ্ছ। এবং তাকাচ্ছ ঘরের দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণ দিক থেকে নর্দমার দুর্গন্ধ আসছে। সেটা এত প্রবল না যে এমনভাবে নাক কুঁচকাতে হবে। এর থেকে মনে হয়—হয় তোমার ঘ্রাণ শক্তি অত্যন্ত প্রবল আর নয়ত তোমাকে অনেক উঁচু কোনো ঘরে আটকে রাখা হয়েছে, ছ'তলা সাত তলায় যেখানে রাস্তার নর্দমার গন্ধ পৌঁছে না।

চিত্রা চুপ করে রইল। সে খুব একটা বিস্মিত হল বলে মনে হল না। মিসির আলি বললেন, এখন বল তোমার ব্যাপারটা কী?

আপনি তো কিছু না জেনেই অনেক কিছু বলতে পারেন। আপনি নিজেই বলুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আমি বলতে পারছি না।

অনুমান করুন। দেখি আপনার অনুমান শক্তি আমার ঘ্রাণ শক্তির মতো কি না।

আমার ধারণা তুমি অসুস্থ। অসুস্থতাটা এমন যে রোগীকে ঘরে আটকে রাখতে হয়। তুমি কোনো ক্রমে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে এসেছ।

আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আমি পাগল তাই আমাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল? না, আমি পাগল না। সুস্থ। ছিটেফোঁটা পাগলামি যা অন্যদের মধ্যে থাকে আমার তাও নেই। তবে আমাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল তা ঠিক। ছাব্বিশ দিন হল ঘরে তালাবদ্ধ। আমাকে সবাই মিলে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখেছে। কারণটাও খুব সাধারণ এবং আপনার মতো বুড়োর কাছে হয়ত বা হাস্যকর। কারণটা বলব?

মিসির আলি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মেয়েটির স্বভাব যা তাতে তিনি যদি বলেন—হ্যাঁ বল—তাহলে সে নিশ্চিত ভাবেই বলবে—না, বলব না। তারচে চুপ করে থাকাই ভাল।

ব্যাপারটা প্রেম ঘটিত। আমি এক ছেলেকে বিয়ে করতে চাই। দরিদ্র ফালতু টাইপের ছেলে। কিছুই করে না। তার প্রেমে পড়ার কারণ নেই। তারপরেও আমি পড়ে গেছি এবং এবং...

এবং কী?

গোপনে বিয়ে করার জন্যে তার সঙ্গে পালিয়েও গিয়েছিলাম। আমাকে ধরে আনা হয়। আমি তো খুব জেদি মেয়ে, কাজেই আমি সবাইকে বলি—আমি আবারো পালিয়ে যাব। তোমাদের কোনো সাধ্য নেই আমাকে ধরে রাখার।

ছেলেটার নাম কী?

ছেলেটার নাম দিয়ে আপনার দরকার কী?

কোনো দরকার নেই। কৌতূহল বলতে পার।

উনার নাম ফরহাদ।

শুধুই ফরহাদ?

ফরহাদ খান।

তারপর?

তারপর আবার কী?

তোমার কাছ থেকে এই কথা শোনার পর তারা তোমাকে তালাবদ্ধ করে রাখল?

তাই তো রাখবে। যে মেয়ে এ জাতীয় কথা বলে তাকে নিশ্চয়ই কেউ কোলে করে ঘুরে বেড়াবে না। ঘুম পাড়ানি গান গাইয়ে ঘুম পাড়াবে না।

আজ তুমি ছাড়া পেয়েছ, আমার কাছে না এসে ঐ ছেলেটির কাছে চলে যাচ্ছ না কেন?

যাব তো বটেই। আপনার কি ধারণা আমি চিরকালের জন্যে আপনার সঙ্গে থাকব?

মিসির আলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চিত্রা তুমি আবারো মিথ্যা কথা বলছ।

বুঝলেন কী করে?

ছেলেটার নাম কি বল জিজ্ঞেস করার পর—থতমত খেয়ে গেলে। চট করে বলতে পারলে না। একটা কোনো নাম ভাবার জন্যে সময় নিলে। তারপর বললে উনার নাম ফরহাদ। উনি বললে—যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তার প্রসঙ্গে উনি বলবে কেন? বলবে ওর নাম ফরহাদ।

তাহলে কি সত্যি কথা শুনতে চান?

আমি এখন সত্যি মিথ্যা কোনো কথাই শুনতে চাই না। তুমি আমার সাহায্য চাচ্ছ। যদি সত্যি চাও আমি তোমাকে সাহায্য করি, তাহলে তোমাকে সত্যি কথা বলতে হবে। তা তুমি পারবে না। মিথ্যা বলাটা তোমার রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ সত্যি বলার পর আবার মিথ্যা শুরু করবে।

তাতে অসুবিধা কী? যেই মুহূর্তে আমি মিথ্যা বলব আপনি ধরে ফেলবেন। আপনার তো সেই ক্ষমতা আছে।

AMARBOI.COM

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—চিত্রা শোন, আমার পক্ষে তোমাকে এ বাড়িতে রাখা সম্ভব না। তোমাকে চলে যেতে হবে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যেতে হবে।

আমার সমস্যা আপনি সমাধান করবেন না?

মানুষের বেশিরভাগ সমস্যাই এরকম যে তা তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। আমার ধারণা তোমার সমস্যার সমাধান তুমিই করতে পারবে।

আমি আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছি বলে কি আপনি রাগ করেছেন?

রাগ করার প্রশ্ন আসছে না। মিথ্যা কথা বলাটাকে সবাই যতবড় অন্যায় মনে করে আমি তা করি না। আমার কাছে মনে হয় মানুষের অনেক অদ্ভুত ক্ষমতার একটি হচ্ছে মিথ্যা বলার ক্ষমতা। কল্পনা শক্তি আছে বলেই সে মিথ্যা বলতে পারে। যে মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না সে সৃষ্টিশীল মানুষ না—রোবট টাইপ মানুষ।

আপনি কি মিথ্যা বলেন?

না, বলি না। মানুষ হিসেবে আমি রোবট টাইপের। শোন চিত্রা, তুমি এখন চলে যাও।

চিত্রা বিস্মিত গলায় বলল, চলে যাব?

হ্যাঁ চলে যাবে।

আপনি আমাকে খুব অপছন্দ করেছেন, তাই না?

আমি তোমাকে অপছন্দ করিনি আবার পছন্দও করিনি।

আমার বিষয়ে আপনার কোনো কৌতূহলও হচ্ছে না।

লোকজনের ধারণা আমার কৌতূহল খুব বেশি, আসলে তা না। আমার কৌতূহল কম। অনেক কম।

নীল রঙের মাছিটার দিকে আপনি যতটা কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছেন আমার দিকে তাও তাকাননি। আমি কি মাছির চেয়েও তুচ্ছ?

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

চিত্রা ক্লান্ত গলায় বলল, আচ্ছা আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আপনি দয়া করে গম্ভীর হয়ে থাকবেন না। যাবার আগে হাসিমুখে থাকুন। আপনার হাসিমুখ দেখে যাই।

মিসির আলি হাসলেন। চিত্রা বলল, বাহ্ আপনার হাসি তো সুন্দর। যারা গম্ভীর ধরনের মানুষ তাদের হাসি খুব সুন্দর হয়। এরা হঠাৎ হঠাৎ হাসে তো এই জন্যে। আর যারা সব সময় হাসিমুখে থাকে তাদের হাসি হয় খুব বিরক্তিকর। তাদের কান্না হয় সুন্দর। আচ্ছা আমি তাহলে এখন উঠি।

চিত্রা উঠে দাঁড়াল। মেয়েটা এত সহজে চলে যেতে রাজি হবে তা মিসির আলি ভাবেননি। তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আচ্ছা শুনুন, আমি আমার ব্যাগগুলি রেখে যাই। ব্যাগ হাতে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় খোঁজার তো কোনো মানে হয় না, তাই না?

বিছানা বালিশ নিয়ে যাওয়াই তো ভাল, সবাই ভাববে এই মেয়ের আসলেই আশ্রয় প্রয়োজন।

আপনি কিন্তু সেরকম ভাবেননি। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। যাই হোক আমি জিনিসপত্র রেখে যাচ্ছি। একসময় এসে নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

আপনি আসলেই রোবটা টাইপ মানুষ। যাই, কেমন?

তুমি কি তোমার বাড়ির টেলিফোন নাম্বারটি দিয়ে যাবে?

কেন? আচ্ছা দিচ্ছি। কাগজে লিখে দিচ্ছি। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন করবেন না। আর যদি করেন আপনি ভয়াবহ বিপদে পড়ে যাবেন। এইবার কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি—কি, বলছি না?

মনে হচ্ছে বলছ।

চিত্রা তার হ্যান্ডব্যাগ থেকে কাগজ নিয়ে টেলিফোন নাম্বার লিখল। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই নিন নাম্বার। আবারো বলছি নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন করবেন না।

নিতান্ত প্রয়োজন বলতে তুমি কী বুঝাচ্ছ?

ধরুন আমি আপনার ঘর থেকে বের হলাম। আর হঠাৎ একটা ট্রাক এসে আমার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল তখন আপনি বাসায় টেলিফোন করে বলবেন—চিত্রা মারা গেছে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

চিত্রা বেশ সহজ ভঙ্গিতেই বের হল। মিসির আলি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি আজ আর ঘর থেকে বের হবেন না। তিনি জানেন ঘণ্টা দু'একের ভেতর চিত্রা ফিরে আসবে, তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে। মেয়েরা তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কোথাও রেখে স্বস্তি পায় না। কাজেই অপেক্ষা করাই ভাল।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার মেয়েটি চলে যাবার পর মিসির আলির একটু মন খারাপ হয়ে গেল। পাখি উড়ে যাবার পর পাখির পালক পড়ে থাকে। মেয়েটা চলে গেছে তার পরেও কিছু যেন রেখে গেছে। সুটকেস এবং হ্যান্ডব্যাগ নয়, অন্য কিছু।

মেয়েটির রেখে যাওয়া ৫০০ টাকার নোটটা পকেটে। টাকাটা ফেরত দিতে ভুলে গেছেন। আশ্চর্য কাণ্ড—মেয়েটি তার কালো ব্যাগও ফেলে গেছে। তার সব টাকা তো ঐ ব্যাগে। বেবিটেক্সি নিয়ে যদি কোথাও যায় ভাড়া দিতে পারবে না।

মিসির আলি অস্বস্তি বোধ করছেন। মেয়েটাকে মাথা থেকে তাড়াতে পারছেন না। মাছিটা এখনো টেবিলে বসে আছে। মারা গেছে নাকি? না, মারা যায়নি। কীট এবং পতঙ্গ জগতের নিয়ম হল মৃত্যুর পর উল্টো হয়ে থাকা। পিঠ থাকবে মাটিতে পা থাকবে শূন্যে। মাছির বেলাতেও নিশ্চয়ই সেই নিয়ম। মিসির আলি তার লাইব্রেরির দিকে এগুলেন—মাছি সম্পর্কে জানার জন্যে কোনো বই কি আছে লাইব্রেরিতে? থাকার তো কথা।

মাছি সম্পর্কে মিসির আলি তেমন কোনো তথ্য জোগাড় করতে পারলেন না। শুধু জানলেন পৃথিবীতে মোট ৮৫,০০০ প্রজাতির মাছি আছে। মৌমাছি যেমন মাছি, ড্রাগন ফ্লাইও মাছি। সবচে ছোট মাছি প্রায় অদৃশ্য আর সবচে বড় মাছি চড়ুই পাখি সাইজের। এদের সবারই দু'জোড়া পাখা থাকে। এক জোড়া তারা ওড়ার কাজে ব্যবহার করে—অন্য জোড়া ভারসাম্য বজায় রাখতে ব্যবহার করে। বেশিরভাগ প্রজাতির মাছিই মানুষের পরম বন্ধু—শুধু হাউস ফ্লাই নয়। এদের প্রধান কাজ অসুখ ছড়ান।

২

চিত্রা দু'ঘণ্টার ভেতর ফিরে আসবে এ ব্যাপারে মিসির আলি নিশ্চিত ছিলেন। নিশ্চিত ব্যাপারগুলি মানুষের জীবনে প্রায় কখনো ঘটে না। চিত্রা দু'ঘণ্টা কেন দশ দিনের মাথাতেও ফিরে এল না। তার হ্যান্ডব্যাগ এবং সুটকেসে ধুলা জমতে লাগল। সে একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিল। টেলিফোন নাম্বার লেখা চিরকুট তিনি ড্রয়ারে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন। অযত্নে অবহেলায় রাখা কাগজপত্র সব সময় পাওয়া যায়। যত্নে রাখা কাগজ কখনো পাওয়া যায় না। মারফির এই সূত্র ভুল প্রমাণিত হল। মিসির আলি ড্রয়ার খুলেই চিরকুটটি পেলেন এবং সেই চিরকুট দেখে তিনি ছোটখাট একটা চমক খেলেন। চিরকুটে টেলিফোন নাম্বার লেখা নেই। শুধু সুন্দর অক্ষরে লেখা Help me!

মিসির আলির একটু মন খারাপ হল। মেয়েটির সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনলেই হত। তিনি এতটা অধৈর্য হলেন কেন? বাড়ি ঘর ছেড়ে নিতান্ত অকারণে এই বয়সের একটা মেয়ে চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসে না। এই বয়সের মেয়েদের মাথায় নানা উদ্ভট ব্যাপার খেলা করে। তারপরেও বাড়ি ঘর ছাড়ার ব্যাপারে তারা খুবই সাবধানী হয়। আশ্রয় মেয়েদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার। প্রকৃতি মেয়েদের সেই ভাবেই তৈরি করেছে। ভবিষ্যতে এরা সন্তানের জন্ম দেবে। সেই জন্যে তাদের নিরাপদ আশ্রয় দরকার। কাজেই "হে মাতৃজাতি তোমরা আশ্রয় কখনো ছাড়বে না—" এই হল ডি এন এ'র অনুশাসন। ডি এন এ অনুশাসনের বাইরে যাবার ক্ষমতা তাদের নেই।

মেয়েটি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের কোনো পথ রাখেনি। পথ রাখলে তিনি বলতেন—হ্যাঁ, আমি এখন তোমার কথা শুনব। সত্যি মিথ্যা সব কথাই শুনব। আগের বারে তোমার কথা শুনতে চাইনি। তোমার হাত থেকে রক্ষা পাবার ব্যাপারটাই আমার মাথায় প্রবলভাবে ছিল। তার জন্যে আমি দুঃখিত।

মেয়েটি তার হ্যান্ডব্যাগ বা সুটকেসে কোনো ঠিকানা কি রেখে গেছে?

সুটকেস খুললে কোনো গল্পের বই কি পাওয়া যাবে যেখানে তার নাম এবং বাড়ির ঠিকানা লেখা? বই পেলেও লাভ হবে না। এখনকার মেয়েরা বই-এ নিজের নাম লিখলেও বাড়ির ঠিকানা লেখে না। বাড়ির ঠিকানা লেখাটাকে গ্রাম্যতা বলে ধরা হয়। ডায়েরি পেলে সবচে ভাল হত। ডায়েরিতে নাম ঠিকানা থাকে। তবে ডায়েরি পাবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। আজকালকার মেয়েদের ডায়েরি লেখার মতো সময় নেই। নিজেদের কথা তারা শুধু গোপন করতে চায়। লিখতে চায় না।

মিসির আলি মেয়েটির সুটকেস খুললেন। কয়েকটা শাড়ি, পলিথিনে মোড়া দু'জোড়া স্যান্ডেল, হেয়ার ড্রায়ার, ট্রাভেলার্স আয়রন, কিছু কসমেটিকস, এক বোতল পানি, সুন্দর একটা চায়ের কাপ। একটা ফুলতোলা বেডশিট।

বই এবং ডায়েরি পাওয়া গেল না। তবে বেডশিটের নিচে এক গাদা কাগজ পাওয়া গেল। দামি ওনিয়ন স্কিন পেপার। কাগজে চিকন নিবের কালির কলমে গুটি গুটি করে ঠাস বুনন লেখা। যত্ন করে কেউ অনেক দিন ধরে লিখেছে। মনে হচ্ছে দীর্ঘ কোনো চিঠি। কাকে লেখা? মিসির আলি ভুরু কুঁচকে সম্বোধন পড়লেন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

জনাব মিসির আলি সাহেব।

চিঠিতে তারিখ নেই। যে লিখছে তার নামও নেই। এর হাতের লেখা এবং চিত্রার হাতের লেখা কি এক? ফিঙ্গার প্রিন্ট এক্সপার্ট ছাড়া বলা যাবে না। চিত্রা ইংরেজিতে লিখেছে হেল্প মি, আর এই দীর্ঘ চিঠি লেখা বাংলায়। ইংরেজি এবং বাংলা হাতের লেখায় মিল-অমিল চট করে চোখে পড়ে না। তার পরেও মিসির আলির মনে হল দীর্ঘ এই চিঠির লেখিকা এবং চিত্রা এক মেয়ে নয়।

মেয়েটি বাইরে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে তার ব্যাগ গোছায়নি। মেয়েরা ব্যাগ গুছানোর সময় অবশ্যই প্রথম নেবে আন্ডার গার্মেন্টস, পেটিকোট, ব্লাউজ, ব্রা, প্যান্টি। এইসব কাপড়ের ব্যাপারে তারা অতিরিক্ত সেনসেটিভ। ব্যাগে আগে এই সব গুছান হবে তারপর অন্য কিছু। কিন্তু মেয়েটি ঘর ছাড়ার জন্যে ব্যাগ গোছায়নি। তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য কি তাকে দীর্ঘ চিঠিটা নাটকীয় ভঙ্গিতে দেয়া?

৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জনাব আপনাকে কেমন ভড়কে দিলাম। সরাসরি চিঠিটা আপনার কাছে দিলে আপনি এত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন না। কাজেই সামান্য নাটক করতে হল। আশা করি আমার এই ছেলেমানুষি নাটকে আপনি বিরক্ত হননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আপনাকে চিনি না। আপনার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি। আপনার সম্পর্কে যা জানি বই পড়ে জানি। বইয়ে লেখকরা সব কিছু ঠিকঠাক লিখতে পারেন না। মূল চরিত্রগুলিকে তারা মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেন। আমি ধরেই নিয়েছি আপনার বেলাতেও তাই হয়েছে। বইয়ের মিসির আলি এবং ব্যক্তি মিসির আলি এক নন। কে জানে আপনি হয়ত বইয়ের মিসির আলির চেয়েও ভাল মানুষ।

আমি আপনার সম্পর্কে মনে মনে একটা ছবি দাঁড় করিয়েছি—আচ্ছা দেখুন তো সেই ছবিটার সঙ্গে কতটুক মেলে। তারও আগে একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেই। আমার ধারণা আপনি এখন ভুরু কুঁচকে ভাবছেন, চিঠির মেয়ে এবং চিত্রা কি এক? ব্যাপারটা আমি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করব। আপাতত আপনি এটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আপনাকে লেখা চিঠিটা মন দিয়ে পড়ুন। এই চিঠি আমি দু' বছর ধরে রাত জেগে লিখেছি। অসংখ্য বার কাটাকুটি করেছি। বানান ঠিক করেছি। যেন চিঠি পড়ে আপনি কখনো বিরক্ত হয়ে না ভাবেন—মেয়েটা এই সহজ বানানও জানে না! আশ্চর্য তো!

ভাল কথা আপনার সম্পর্কে আমার ধারণা কী এখন বলি, দেখুন তো মেলে কি না। আমার ধারণা আপনি হাসিখুশি ধরনের মানুষ। বইয়ে আপনার যে গম্ভীর প্রকৃতির কথা লেখা হয় সেটা ঠিক না। আপনার বিশেষত্বহীন চেহারার কথা লেখা হলেও আমি জানি আপনার চেহারা মোটেও বিশেষত্বহীন নয়। আপনার চোখ ধারালো ও তীব্র। সার্চ লাইটের মতো। তবে সেই ধারালো চোখেও একটা শান্তি শান্তি ভাব আছে। আমার খুব ইচ্ছা কোনো একদিন আপনাকে এসে দেখে যাব। শান্ত ভঙ্গিতে আপনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকব। এক সময় আপনাকে বলব, আমাকে একটা হাসির গল্প বলুন তো। আমার কেন জানি মনে হয় কেউ আপনার কাছে গল্প শুনতে আসে না। সবাই আসে ভয়ংকর সব সমস্যা নিয়ে। দিনের পর দিন এই সব সমস্যা শুনতে কি আপনার ভাল লাগে? মাঝে মাঝে আপনার কি ইচ্ছা করে না সহজ স্বাভাবিক গল্প শুনতে এবং বলতে? যেমন আপনি একটা ভূতের গল্প শুনে ভয় পাবেন। ভুরু কুঁচকে ভাববেন, না-ভূত বলে কিছু নেই।

আমাদের চারপাশের জগতটা সহজ স্বাভাবিক জগৎ, এই জগতে মাঝে মাঝে বিচিত্র এবং ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে। আমার নিজের জীবনেই ঘটে গেল। এবং আমি আপনাকে সেই গল্পই শুনাতে বসেছি। না শুনালেও চলত। কারণ আমি আপনার কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাচ্ছি না। বা আপনাকে বলছি না আপনি আমার সমস্যার সমাধান করে দিন। তারপরেও সব মানুষেরই বোধ হয় ইচ্ছা করে নিজের কথা কাউকে না কাউকে শুনাতে। আমার চারপাশে তেমন কেউ নেই।

এখন আমি আপনার একটা অস্বস্তি দূর করি। চিত্রা নামের যে মেয়েটি আপনার কাছে এসেছিল আমি সেই মেয়ে। কাজেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। চিত্রার সেদিন আপনাকে কেমন লেগেছিল তা আর আপনাকে কোনোদিন জানান হবে না। কারণ চিত্রার সঙ্গে আপনার আর কোনোদিন দেখা হবে না। আপনাকে খানিকটা ধাঁধায় ফেলে চিত্রা বিদেয় নিয়েছে। আমিও বিদায় নেব। আমার দীর্ঘ চিঠি শেষ করার পর আপনি ভাববেন—আচ্ছা, মেয়েটার কি মাথা খারাপ? সে এইসব কী লিখেছে? কেনই বা লিখেছে? দীর্ঘ লেখা পড়তে আপনার যেন ক্লান্তি না লাগে সে জন্যে আমি খুব চেষ্টা করেছি। চেষ্টা কতটুকু সফল হল কে জানে। চ্যাপ্টার দিয়ে দিয়ে লিখলাম। চ্যাপ্টারের প্রথম কয়েক লাইন পড়ে আপনি ঠিক করবেন আপনি পড়বেন কি পড়বেন না। সব চ্যাপ্টার যে পড়তেই হবে তা না।

পরিচয়

নাম চিত্রা (নকল নাম)।

বয়স ২৩ বছর। (যখন লেখা শুরু করেছিলাম তখন বয়স ছিল ২০ বছর তিন মাস)।

উচ্চতা : পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আমার প্রিয় রঙ   চাঁপা।

আমার দেখতে ভাল লাগে   চাঁদ এবং পানি।

পড়াশোনা   এসএসসি পাস করার পর আর পড়াশোনা করতে পারিনি। তবে আমি খুব পড়ুয়া মেয়ে। শত শত বই পড়ে ফেলেছি। শুধু গল্পের বই না। সব ধরনের বই। বাড়িতে আমি যেন পড়তে পারি সে জন্যে আমার একজন শিক্ষক আছেন। দর্শনবিদ্যার শিক্ষক। তবে দর্শন আমার প্রিয় বিষয় নয়।

আমি কেমন মেয়ে? ভাল মেয়ে। খুব ভাল মেয়ে। আপনি নিশ্চয়ই মনে মনে হাসছেন। ভাবছেন এই মেয়েটা এমন ছেলেমানুষি করছে কেন? আমি তো আসলে ছেলেমানুষই। ২৩ বছর তো এমন কোনো বয়স না, তাই না? তবে আমি কিন্তু আসলেই ভাল মেয়ে।

দূর ছাই, লেখার এই ধরনটা আমার ভাল লাগছে না। আমি বরং ধারাবাহিকভাবে শুরু করি। পড়তে পড়তে আমার সম্পর্কে আপনার ধীরে ধীরে একটা ধারণা তৈরি হবে। তখন আর আমাকে বলতে হবে না যে আমি ভাল মেয়ে। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।

খুব অল্প বয়সে রোড অ্যাকসিডেন্টে আমার মা মারা যান। বান্দরবান থেকে একটা জিপে করে আমরা আসছিলাম। আমার বাবা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বাবার পাশে মা বসেছিলেন। মা'র কোলে আমি। হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা ছাগল পড়ল। বাবা সেই ছাগল বাঁচাতে গিয়ে গাড়ি নিয়ে খাদে পড়ে গেলেন। মা তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। আমার এবং বাবার কিছু হল না। বান্দরবানের রাস্তাগুলি খুব নির্জন থাকে। অ্যাকসিডেন্টের অনেক পড়ে লোকজন এসে আমাদের উদ্ধার করল। আমার তখন বয়স মাত্র দেড় বছর। আমার কিচ্ছু মনে নেই।

আমার বাবা পরে আবার বিয়ে করেন। সেই বিয়ে সুখের হয়নি। ছোট মা'র মেজাজ খুব খারাপ ছিল। তিনি অল্পতেই রেগে যেতেন। তাঁর আত্মহত্যার প্রবণতা ছিল। বাবার সঙ্গে রাগারাগি হলেই বলতেন, সুইসাইড করব। শেষ পর্যন্ত মা সুইসাইড করেন। এই নিয়ে খুব ঝামেলা হয়। মা পক্ষের লোকজন মামলা করেন। তারা বলার চেষ্টা করেন মাকে মেরে ফেলা হয়েছে। যাই হোক মালায় প্রমাণিত হয়, মা মানসিক রোগী ছিলেন। ছোট মা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। গায়ের রঙ অবশ্যি শ্যামলা ছিল। কিন্তু তাঁর চেহারা এতই মিষ্টি ছিল—শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করত।

আপনি বুঝতেই পারছেন আমার শৈশবটা সুখের ছিল না। একটা বিরাট বাড়িতে আমি প্রায় একা একাই মানুষ হই। আমাদের বাড়িটা ছিল টু ইউনিট। একতলায় রান্নাঘর, খাবার ঘর, বসার ঘর, স্টাডি আর দোতলায় শুধুই শোবার ঘর আর ফ্যামিলি লাউঞ্জ। কাজের লোকদের দোতলায় ওঠা নিষেধ ছিল। তারা সবাই বাবাকে ভয় পেত বলে দোতলায় উঠত না। আমি স্কুল থেকে ফিরে একা একাই দোতলায় খেলতাম। আমার মতো বাচ্চারা মনে মনে একজন খেলার সাথি তৈরি করে নেয়। তার সঙ্গে খেলে। আমিও তাই করলাম। একজন খেলার সাথি বানিয়ে নিলাম। সেই খেলার সাথি হল আমার মা, আমার ছোট মা। আমার আসল মাকে তো আমি দেখিনি, কাজেই তাঁর সম্পর্কে আমার কোনো মমতা বা ভালবাসা কিছুই ছিল না। ছোট মা আমাকে খুবই আদর করতেন। সেই আদরের একটা ছোট্ট নমুনা দিলেই আপনি বুঝবেন। যেমন মনে করুন তিনি আমাকে ডাকছেন—চিত্রা খেতে এস। চিত্রা বলার আগে তিনি একগাদা আদরের নাম অতি দ্রুত বলে যাবেন। তারপর বলবেন খেতে এস। তাঁর আদরের নামগুলি হল—

ভিটভিটি খিটখিটি,
মিটমিটি ফিটফিটি
ভুনভুন খুনখুন
সুনসুন ঝুনঝুন।
এ্যাং বেঙ ঝেং, টেঙ টেঙ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদরের নাম ছাড়াও তাঁর নিজের কিছু কিছু বিচিত্র ছড়াও ছিল। ননসেন্স রাইমের মতো কোনো অর্থ নেই, কোনো মানে নেই। সেই সব ছড়া তিনি গানের সুরে বলতেন। সব সুর এক রকম। যেমন ধরুন—

ফানিম্যান হাসে তার
রং ঢং হাসি।
জানা কথা যে জানে না
না শুনে সে বাঁশি।

এইসব বিচিত্র ছড়া বলে তিনি খিলখিল করে হাসতেন। আমার খুবই মজা লাগত। মনে হত আহ কী আনন্দময় আমার জীবন।

অতি আদরের একজন মানুষ আমার খেলার সাথি হবে এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজের মনে পুতুল খেলতাম, রান্নাবাটি খেলতাম এবং ক্রমাগত ছোট মায়ের সাথে কথা বলতাম, প্রশ্ন করতাম, ছোট মা উত্তর দিতেন। উত্তর তো আসলে দিতেন না। আমি উত্তরটা কল্পনা করে নিতাম। তখন আমার বয়স সাত। সাত বছরের বাচ্চারা এই ধরনের খেলা খেলে। এটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু একদিন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটল। সে দিন স্কুল ছুটি ছিল। বাবা গেছেন ঢাকার বাইরে। আমি সারা দিন একা একা খেলেছি।

সন্ধ্যাবেলা আমার শরীর খারাপ করল। গা কেঁপে জ্বর এল। আমি চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছি। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। খাট থেকে একটু দূরে আমার পড়ার টেবিল। টেবিলে বাবার এনে দেয়া মোটা একটা ইংরেজি ছবির বই। শুয়ে শুয়ে ছবি দেখতে ইচ্ছা করল। বিছানা থেকে নেমে যে ছবির বইটা আনব সেই ইচ্ছা করছে না। আমি অভ্যাস মতো বললাম, ছোট মা বইটা এনে দাও। কল্পনার খেলার সাথি মাকে এই জাতীয় অনুরোধ আমি প্রায়ই করি। সেই অনুরোধ আমি নিজেই পালন করি। তারপর বলি, থ্যাংক য়্যু ছোট মা। ছোট মা'র হয়ে আমি প্রায়ই বলি, ইউ আর ওয়েল কাম।

সেদিন সন্ধ্যায় অন্য ব্যাপার হল। অবাক হয়ে দেখলাম ছোট মা টেবিলের দিকে যাচ্ছেন। বইটা হাতে নিয়ে বিছানার দিকে ফিরছেন। বইটা আমার দিকে ধরে আছেন। আমি এতই অবাক হয়েছি যে হাত বাড়িয়ে বইটা নিতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। ছোট মা আমার বিছানার পাশে বইটা রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে গেলেন। খোলা দরজাটা হাত দিয়ে ভিড়িয়ে দিয়ে গেলেন। ভয়ে আমার চিৎকার করে ওঠা উচিত ছিল। আমি চিৎকার করলাম না। ভয়ের চেয়ে বিস্ময়বোধই আমার প্রবল ছিল। চোখে ভুল দেখেছি এই জাতীয় চিন্তা আমার একবারও মনে আসেনি। বরং মনে হয়েছে আমি যা দেখছি ঠিকই দেখছি। ছোট মা আমাকে দেখতে এসেছেন। আমার শরীর ভাল না তো এই জন্যে আমাকে দেখতে এসেছেন।

নিঃসঙ্গ শিশুরা তার চার পাশের জগৎ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা নিজেরা দাঁড় করায়। আমিও একটা ব্যাখ্যা দাঁড়া করিয়ে ফেললাম। এই ব্যাখ্যায় অসুস্থ শিশুকে দেখতে মৃত মানুষ ফিরে আসতে পারেন।

যদিও আমি নিজেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালাম তারপরেও আমার মনে হল এই ব্যাখ্যায় কিছু ফাঁকি আছে। ফাঁকির ব্যাপারটা আমি নিজে জানতে চাচ্ছিলাম না। কাজেই মাকে দেখতে পাওয়ার কথাটা কাউকে বললাম না। আমার মনে হল পুরো ব্যাপারটায় একধরনের গোপনীয়তা আছে। কেউ জেনে ফেললে মা রাগ করবেন, তিনি আর আসবেন না।

সেই রাতে আমার জ্বর খুব বাড়ল। মাথায় পানি দেওয়া হল। তাতে কাজ হল না। বাথটাবে বরফ মেশানো ঠাণ্ডা পানিতে আমাকে ডুবিয়ে রাখা হল। ডাক্তার ডাকা হল। চিটাগাং–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ আমার বাবাকে জরুরি খবর পাঠানো হল। আমার খুব ভাল লাগতে লাগলো এই ভেবে যে, যেহেতু আমার শরীর খুব খারাপ করেছে আমার ছোট মা নিশ্চয়ই আবারো আমাকে দেখতে আসবেন। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ছোট মা অবশ্যি এলেন না।

আমার এই ঘটনা শুনে আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি। আপনি ভাবছেন হেলুসিনেশন। একটি নিঃসঙ্গ শিশু তার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্যে নিজের মধ্যে একটি জগৎ সৃষ্টি করেছে। হেলুসিনেশনের জন্ম সেই জগতে। আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা খুব সহজেই সবকিছু ব্যাখ্যা করে ফেলেন। আপনাদের কাছে রহস্য বলে কিছু নেই। আইনস্টাইন যখন বলেন, সৃষ্টি রহস্যময়, সব রহস্যের জট এই মুহূর্তে খোলা সম্ভব না তখন আপনারা বলেন, ব্যাখ্যাতীত বলে কিছু নেই। সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায়। আমার এক জীবনে আমাকে অনেক সাইকো এনালিসিসের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে। আমি এই সব ব্যাপার খুব ভাল জানি। আপনাদের মতো মনোবিদ্যা বিশারদদের দেখলে আমার সত্যিকার অর্থেই হাসি পায়। আপনারা একেকজন কী গম্ভীর ভঙ্গিতে কথা বলেন, যেন পৃথিবীর সবকিছু জেনে বসে আছেন। অল্প বিদ্যা ভয়ংকর হয়। আপনাদের বিদ্যা শুধু যে অল্প তাই না, শূন্য বিদ্যা।

আপনি কি রাগ করছেন?

দয়া করে রাগ করবেন না। আমি জানি আপনি অন্যদের মতো না। আপনি আপনার সীমারেখা জানেন। প্রকৃতি মানুষের চারদিকে একটা গণ্ডি এঁকে দিয়ে বলে দেয়—এর বাইরে তুমি যেতে পারবে না। তোমার অতি উন্নত জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়েও তোমাকে থাকতে হবে এই গণ্ডির ভেতর। এই সত্য আপনার জানা আছে। আপনি গণ্ডির ভেতর থেকেও গণ্ডি অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন। এই খানেই আপনার বাহাদুরি। বড় বড় কথা বলছি? হয়ত বলছি। তবে এগুলি আমার নিজের কথা না। অন্য একজনের কথা। সেই অন্য একজন প্রচুর জ্ঞানের কথা বলেন এবং খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলেন। তিনি যে জ্ঞানের কথা বলছেন তা তখন মনে হয় না। একটু চিন্তা করলেই মনে হয় ওরে বাবারে—এ তো অসম্ভব জ্ঞানের কথা। এই প্রসঙ্গে আমি পরে বলব। তবে আপনি হচ্ছেন মিসির আলি, কে জানে ইতোমধ্যে হয়ত অনেক কিছু বুঝে ফেলেছেন।

আপনি কীভাবে চিন্তাভাবনা করে একটা সমস্যার সমাধানের দিকে এগোন তা আমার জানতে ইচ্ছা করে। চিন্তা শক্তি আমার নিজের খুবই কম। সহজ রহস্যই ধরতে পারি না। আমাদের স্কুলে একবার একজন ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাতে এসেছিলেন। বেচারি খুবই আনাড়ি ধরনের। যে ম্যাজিকই দেখান সবাই ধরে ফেলে। একমাত্র আমিই ধরতে পারি না। তিনি যা দেখান তাতেই আমি মুগ্ধ হই। আপনার সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিও হয়ত ম্যাজিকের মতো। সেই ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, এই এতগুলি পাতা যে পড়লেন এর মধ্যে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি। বলুন তো ইনফরমেশনটা কী? যদি বলতে পারেন তা হলে বুঝব আপনার সত্যি বুদ্ধি আছে। বলতে না পারলে তেত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখুন।

মিসির আলি পড়া বন্ধ করলেন। তেত্রিশ পৃষ্ঠা না দেখে মেয়েটির সম্পর্কে বিশেষ কী বলা হয়েছে বের করার চেষ্টা করলেন। যা বলা হয়েছে তার বাইরে কি কিছু আছে? হ্যাঁ আছে, মেয়েটা তার আসল নাম বলেছে। তার আসল নাম ফারজানা। ফানিম্যান ছড়াটির প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর নিলে ফারজানা নামটা পাওয়া যায়। এমন জটিল কোনো ধাঁধা না। এ ছাড়া আর কিছু কি আছে? আরেকবার পড়তে হবে। তবে যা পড়েছেন তাতে মেয়েটিকে খুঁজে বের করে ফেলার মতো তথ্য আছে। ফারজানা মেয়েটি বোধ হয় তা জানে না। যেমন মেয়েটির বাবার নামে একটি হত্যা মামলা হয়েছিল। সেই মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। আদালতের নথিপত্র ঘাটলেই বের হয়ে পড়বে। ডেড বডির পোস্টমর্টেম হয়েছিল। হাসপাতাল থেকেও সেই সম্পর্কিত কাগজপত্র পাওয়া যাবে। একটু সময় সাপেক্ষ, তবে সহজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই সময়কার পুরানো কাগজ ঘাটলেও অনেক খবর পাওয়া যাওয়ার কথা। 'পাষণ্ড স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন' জাতীয় খবর পাঠক–পাঠিকারা খুব মজা করে পাঠ করেন। পত্রিকাওয়ালারা গুরুত্বের সঙ্গে সেই সব খবর ছাপেন। প্রথম পাতাতেই ছবিসহ খবর আসার কথা। তারপরের কয়েকদিন খবরের ফলো আপ।

অবশ্যি বাংলাদেশে পুরানো কাগজ ঘাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। যে ক'বার তিনি পুরানো কাগজ ঘাটতে গেছেন সে ক'বারই তাঁর মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। বিদেশের মতো ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। সবকিছু কম্পিউটারে ঢুকানো, বোতাম টিপে বের করে নেয়া।

মিসির আলি তাঁর খাতা বের করলেন। কেইস নাম্বার দিয়ে ফারজানার নামে একটা ফাইল খোলা যেতে পারে। খাতার পাতায় ফারজানা নাম লিখতে গিয়ে মিসির আলি ইতস্তত করতে লাগলেন। ফাইল খোলার দরকার আছে কি? এখনো বোঝা যাচ্ছে না, ফারজানার লেখা সব ক'টা পাতা না পড়লে বোঝা যাবেও না। মিসির আলি পেনসিলে গোটা গোটা করে লিখলেন.

নাম ফারজানা

বয়স ২৩

রোগ স্কিজোফ্রেনিয়া ? ? ?

স্কিজোফ্রেনিয়া লিখে তিনবার প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিলেন। ফারজানার লেখা যে ক'টি পাতা এখন পর্যন্ত পড়েছেন তা তিনি আরো তিনবার পড়বেন। তারপর ঠিক করবেন প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলি রাখবেন, কি রাখবেন না। সে যা লিখেছে তা সত্যি কি না তাও দেখার ব্যাপার আছে। সত্যি কথা না লিখলে তথ্যে ভুল থাকবে। প্রথম পাঠে তা ধরা পড়বে না। যত বেশি বার পড়া হবে ততই ধরা পড়তে থাকবে। তার নিজের নামটা সে যেমন কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার থেকে মনে হয় আরো অনেক নাম লেখার ভেতর লুকিয়ে আছে। সেগুলিও খুঁজে বের করতে হবে। তার মায়ের নাম কি চাঁপা? প্রিয় রঙ বলছে চাঁপা। আবার প্রিয় দুটি জিনিস চাঁদ এবং পানির প্রথম অক্ষর নিলেও চাঁপা হচ্ছে। এটা কাকতলীয়ও হতে পারে। যদি কাকতলীয় না হয় তা হলে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে রহস্য করছে কেন? এই রহস্য করার জন্য তাকে প্রচুর সময় দিতে হয়েছে। চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। এটা সে কেন করছে? ব্যাপারটা ছেলেমানুষি তো বটেই। ফাইভ সিক্সে পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা এইসব করতে পারে। ২৩ বছরের একটা মেয়ে তুচ্ছ ধাঁধা তৈরি করার জন্য সময় নষ্ট করবে কেন? ব্যাপার কি এমন যে মেয়েটার কিছু করার নেই। দিনের পর দিন যারা বিছানায় শুয়ে থাকে তারা ক্রসওয়ার্ড পাজল, বা ব্রেইন টিজলার জাতীয় খেলায় আনন্দ পেতে পারে। এমনকি হতে পারে যে মেয়েটিকে দিনের পর দিন শুয়ে থাকতে হচ্ছে। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে হাতে পাতার পর পাতা লেখা কষ্টকর। সে লিখেছে ১০০ পৃষ্ঠা, লিখতে তার সময় লেগেছে ২ বছর। একটা পৃষ্ঠা লিখতে তার গড় পড়তা সময় লেগেছে সাতদিনের কিছু বেশি। লেখাগুলি লেখা হয়েছে কালির কলমে। চিৎ হয়ে শুয়ে কালির কলমে লেখা যায় না। তাকে লিখতে হয়েছে উপুর হয়ে। উপুর হয়ে যে লিখতে পারে সে বিছানায় পড়ে থাকার মতো অসুস্থ না। কাজেই সে শয্যাশায়ী একজন রোগী এই হাইপোথিসিস বাতিল।

মিসির আলি তাঁর খাতায় গুটি গুটি করে লিখলেন—ফারজানা মেয়েটি শারীরিকভাবে সুস্থ।

তিনি আরেকটি কাজও করলেন—ফারজানার একশ পৃষ্ঠার কোন অংশগুলি দিনে লেখা হয়েছে—কোন অংশগুলি রাতে লেখা হয়েছে—তা হলুদ মার্কার দিয়ে আলাদা করলেন। কাজটা জটিল মনে হলেও আসলে সহজ। রাতে আলো কমে যায় বলে রাতের লেখা অক্ষরগুলি সামান্য বড় হয়। এবং লেখা স্পষ্ট করার জন্যে কলমে চাপ দিয়ে লেখা হয়। দিনের লেখা এবং রাতের

লেখা আলাদা করার তেমন কোনো কারণ নেই। তারপরেও করে রাখা—হঠাৎ যদি এর ভেতর থেকে কিছু বের হয়ে আসে। খড়ের গাদায় হারিয়ে যাওয়া সুচও পাওয়া যায় যদি ধৈর্য ধরে প্রতিটি খড়—একটি একটি করে আলাদা করা হয়। মিসির আলি তাঁর অনুসন্ধানে ইনটিউশন যত না ব্যবহার করেন—পরিশ্রম তার চে অনেক বেশি ব্যবহার করেন।

৪

ছোট মা'কে আমি দেখতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম দু'দিন, তিন দিন পরপর হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে দেখা যেত। তারপর রোজ-ই দেখতে পেতাম।

শুরুতে তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলতেন না। আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে চুপচাপ শুনতেন। তারপর কথা বলা শুরু করলেন। কথা বলতেন ফিস ফিস করে। কোথাও কোনো শব্দ হলে দারুণ চমকে উঠতেন।

হয়ত বাতাসে দরজা নড়ে উঠল—সেই শব্দে মা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে চলে গেলেন পর্দার আড়ালে। ছোট মা'র দেখা পাওয়াটা ঠিক স্বাভাবিক ব্যাপার না এটা আমার বোধের ভেতর ছিল। আমি এর বাইরেও কিছু কিছু ব্যাপার লক্ষ করলাম। যেমন ছোট মা কখনো কিছু খান না। আমি কমলা সেধেছি। প্লেট থেকে কেক তুলে দিয়েছি। তিনি কখনো কিছু মুখে দেননি। তিনি যখন আশে পাশে থাকতেন তখন আমি এক ধরনের গন্ধ পেতাম। মিষ্টি গন্ধ, তবে ফুলের গন্ধ না। ওষুধ ওষুধ গন্ধ।

আসল ছোট মা'র সঙ্গে এই মায়ের কিছু অমিলও ছিল। যেমন ছোট মা আমাকে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডাকতেন। ইনি ডাকতেন না। একদিন আমি নিজেই বললাম, তুমি ঐ নামগুলি বল না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কোন নাম? তা থেকে বুঝলাম নামগুলি তিনি জানেন না।

ছোটরাও নিজেদের মতো করে কিছু পরীক্ষা-টরীক্ষা করে। আমিও ছোট মা'কে নিয়ে কিছু পরীক্ষা করলাম—যেমন একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী?

ছোট মা বললেন, জানি না তো।

আমি বললাম, সত্যি জান না?

তিনি বললেন, না। আমার কী নাম?

আমি বললাম, তোমার নাম চাঁপা।

তিনি খুবই অবাক হয়ে বললেন, তাই নাকি? আমার সামান্য খটকা লাগলেও আমি নির্বিকার ছিলাম। একজন খেলার সাথি পেয়েছি, এই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল।

ছোট মা খেলার সঙ্গী হিসেবে চমৎকার ছিলেন। যা বলা হত তাই রোবটের মতো করতেন। কোনো প্রশ্ন করতেন না। মা'দের ভেতর খবরদারির একটা ব্যাপার থাকে। ওনার ভেতর তা ছিল না।

পায়ে মোজা নেই কেন?

ঘর নোংরা করছ কেন?

ঘুমুতে যাচ্ছ না কেন?

এ জাতীয় প্রশ্ন করে তিনি আমাকে কখনো বিব্রত করতেন না। আমার বেশ ক'জন টিচার ছিলেন। পড়ার টিচার, গানের টিচার, নাচের টিচার। তাঁরা যখন আসতেন—নিচ থেকে ইন্টারকমে আমাকে বলা হত। আমি নিচে যাবার জন্যে তৈরি হতাম। মা'কে সেই সময় খুব বিব্রত মনে হত। তিনি যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না কী করবেন। তাঁকে খুব কাঁদতেও দেখতাম। দু'হাতে মুখ ঢেকে খুন খুন করে কাঁদতেন। চোখ দিয়ে তখন অবশ্যি পানি পড়ত না। তাঁর কান্না সব সময় ছিল অশ্রুবিহীন।

মিসির আলি সাহেব, আপনি আমার সামনে নেই বলে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে। হয়ত আপনার মনে অনেক প্রশ্ন উঠে আসছে, কিন্তু আপনি প্রশ্নগুলি করতে পারছেন না। সামনা সামনি থাকলে প্রশ্ন করতে পারতেন। আর আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না—কোনো ডিটেল বাদ পড়ে যাচ্ছে কি না। গুরুত্বহীন মনে করে আমি হয়ত অনেক কিছু লিখছি না—যা আপনার কাছে মোটেই গুরুত্বহীন না। তবু আপনার মনে সম্ভাব্য যে সব প্রশ্ন আসছে বলে আমার ধারণা—আমি তার জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন ওনার গায়ে কী পোশাক থাকত?

উত্তর সাধারণ পোশাক। শাড়ি। যে সব শাড়ি আগে পরতেন সেই সব শাড়ি।

প্রশ্ন উনি কি হঠাৎ উপস্থিত হতেন এবং পরে বাতাসে মিলিয়ে যেতেন?

উত্তর না। কখনো হঠাৎ উদয় হতেন না। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেন। বের হয়ে যাবার সময়ও দরজা খুলে বের হয়ে যেতেন। তাঁর পুরো ব্যাপারটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। তাঁকে আমি কখনো শূন্যে ভাসতে দেখিনি—কিংবা লম্বা একটা হাত বের করে দূর থেকে কিছু আনতে দেখিনি।

প্রশ্ন তুমি নিশ্চিত যে উনি তোমার ছোট মা?

উত্তর : জি নিশ্চিত। তবে আগেই তো বলেছি—আমার চেনা ছোট মা'র সঙ্গে তাঁর কিছু অমিল ছিল—যেমন তিনি পড়তে পারতেন না। অথচ ছোট মা আমাকে রোজ রাতে গল্পের বই পড়ে শুনাতেন। কাজেই আমি একদিন উনাকে গল্পের বই পড়ে শুনাতে বললাম। তিনি লজ্জিত গলায় বললেন যে তিনি বই পড়তে জানেন না। তিনি আমাকে বই পড়া শেখাতে বললেন।

প্রশ্ন তুমি তাঁকে বই পড়া শেখালে?

উত্তর জি। উনি খুব দ্রুত শিখে গেলেন।

প্রশ্ন উনি কি তোমার জন্যে কখনো কোনো উপহার নিয়ে এসেছেন?

উত্তর জি এনেছেন।

প্রশ্ন কী উপহার?

উত্তর সেটা আমি আপনাকে বলব না।

প্রশ্ন তুমি ছাড়া আর কেউ কি ওনাকে দেখেছে?

উত্তর জি না।

প্রশ্ন তাঁকে দিনে বেশি দেখা যেত, না রাতে?

উত্তর দিন রাত কোনো ব্যাপার ছিল না।

প্রশ্ন সব সময়ই কি একই কাপড় পরা থাকতেন?

উত্তর : জি না। একেক সময় একেক কাপড় পরা থাকত।

প্রশ্ন তিনি তোমার গায়ে হাত দিয়ে আদর করতেন?

উত্তর জি করতেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁর কোলে উঠে বসে থাকতাম।

যে সব প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে তার উত্তর দিলাম। অনেক চিন্তা করেও আর কোনো প্রশ্ন পাচ্ছি না। আপনারা যারা সাইকিয়াট্রিস্ট তাঁরা তো রাজ্যের প্রশ্ন করেন। উদ্ভট সব প্রশ্ন। আপনার মাথাতেও নিশ্চয়ই উদ্ভট সব প্রশ্ন আসছে। ও না, ভুল করলাম—আপনি তো আবার অন্যদের মতো না। আপনি প্রশ্ন করেন না। শুধু শুনে যান। একই গল্প বারবার শোনেন। শুনতে শুনতে হঠাৎ এক জায়গায় খটকা লাগে। সেখান থেকে আপনার যাত্রা শুরু হয়। আমার গল্পে কোথাও কি কোনো খটকা লেগেছে? নাকি পুরো গল্পই 'খটকাময়'? পুরো গল্প খটকাময় হলে তো আপনি কাগজগুলি ছুঁড়ে ফেলে বলবেন—আরে দূর দূর।

প্লিজ তা করবেন না। আমার অনেক কিছু বলার আছে। Please Help Me.

আপনি নিশ্চয়ই এখন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাচ্ছেন। ভাবছেন মেয়েটার কী কনট্রাডিকশান—সাহায্য চাচ্ছে, আবার কোনো ঠিকানা দিচ্ছে না। যোগাযোগ করছে না। নিজের পরিচয়ও গোপন করছে। আসল নাম না বলে, বলছে নাম চিত্রা। তাহলে সাহায্যটা করা হবে কীভাবে? আসলে আমি সাহায্য চাই না। কারণ আমি ভালই আছি। আমার বিচিত্র জীবন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলব। আপনি শুনবেন। আমার সমস্যার সমাধান করবেন। তার উপর একটা বই লেখা হবে। সেই বই কিনে আমি পড়ব। আমার এতেই হবে। এর বেশি সাহায্যের আমার প্রয়োজন নেই।

আরেকটা কথা—আপনি আবার ভাবছেন না তো আমার এই গল্প বানোয়াট গল্প? আপনাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে উদ্ভট একটা গল্প ফেঁদেছি? একবার আপনার মাথায় এই ব্যাপারটা ঢুকে গেলে আপনি মনোযোগ দিয়ে আমার লেখা পড়বেন না। এমনো হতে পারে যে কাগজগুলি ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন। আমার প্রধান দায়িত্ব আপনাকে বিশ্বাস করান—আমি যা বলছি, সত্যি বলছি। আমার কাছে যা 'সত্যি' অন্যের কাছে হয়ত নয়। সত্য একেক জনের কাছে একেক রকম। Truth has many faces. তাই না?

আমি যে সত্যি বলছি সেটা কী করে প্রমাণ করব? আমি জানি না। আমি আপনার হৃদয়ের মহত্বের কাছে সমর্পন করছি এবং আশা করছি আমাকে বিশ্বাস করবেন। আজ এই পর্যন্তই লিখলাম। মাথা ধরেছে—এখন আর লিখতে পারছি না। আপনার ঠোঁটে কি এখন মৃদু একটা হাসির রেখা? সাইকিয়াট্রিস্টরা 'মাথা ধরেছে' বাক্যটা শুনলেই নড়েচড়ে বসেন। তাদের ভাবটা হচ্ছে—"এইবার পাওয়া গেছে" মাথায় সমস্যা বলেই মাথা ধরা।

আমেরিকার একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়েছিলাম। আমি যাইনি—আমার বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ কথা বলার পরই গম্ভীর গলায় বললেন, ইয়াং লেডি, তোমার কি প্রায়ই মাথা ধরে?

আমি বললাম—হ্যাঁ।

ভদ্রমহিলার ঠোঁটে আনন্দের হাসি দেখা গেল। ভাবটা হচ্ছে— I got you at last.

তারপর অসংখ্য প্রশ্ন, সবই মাথা ধরা নিয়ে।

কখন মাথা ধরে? রাতে বেশি, না দিনে?

মাথা ধরার সময় কি চোখ জ্বালা করে?

কান লাল হয়ে যায়?

মাথা ধরার তীব্রতা কেমন?

কতক্ষণ থাকে?

তখন কি পানির পিপাসা হয়?

আমি যখন বললাম, ম্যাডাম আমার মাথা ধরাটা খুবই স্বাভাবিক ধরনের। মাঝেমধ্যে মাথা ধরে—প্যারাসিটামল খাই, কিংবা গরম চা খাই। মাথা ধরা সেরে যায়। ভদ্রমহিলা তাতে খুব হতাশ হলেন।

আপনিও কি হতাশ হচ্ছেন?

এমনিতে আমি কিন্তু খুব স্বাভাবিক মানুষ। আমি আমার মৃতা মা'কে দেখতে পেতাম এই অস্বাভাবিকতাটা ছোটবেলায় ছিল—বেশি দিনের জন্যে কিন্তু না। খুব বেশি হলে সাত কিংবা আট মাস। হঠাৎ একদিন সব আগের মতো হয়ে গেল। ছোট মা'র আসা বন্ধ হল। আমি কিছু দিন প্রবল হতাশায় কাটালাম। ছোটদের হতাশা তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। তবে তার স্থায়িত্বও কম হয়। শিশুদের প্রবল শোক এবং প্রবল হতাশা। কাটিয়ে ওঠার সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমিও হতাশা কাটিয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে সব আগের মতো হয়ে গেল। অবশ্যি ছোট মা আসা পুরোপুরি বন্ধ করলেন তাও না। তিন চার মাস পরপর হঠাৎ চলে আসতেন। আমি যখন বলতাম, এতদিন আসনি কেন? তিনি বলতেন—আসার পথ ভুলে যাই। মনে থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জীবনযাপন স্বাভাবিক হলেও আমি বড় হচ্ছিলাম নিঃসঙ্গতায়। আমার চারপাশে কেউ ছিল না। আমার নিঃসঙ্গতা দূর করলেন—নীতু আন্টি। তিনি আমাদের বাড়িতে থাকতে এলেন। আরো পরিষ্কার করে বলি—বাবা তাঁকে বিয়ে করলেন। আচ্ছা আপনি কি বাবার উপর বিরক্ত হচ্ছেন? কেমন মানুষ, একের পর এক বিয়ে করে যাচ্ছে। দয়া করে বিরক্ত হবেন না। আমার বাবা অসাধারণ একজন মানুষ।

এই যা, মাথা ধরা নিয়ে অনেকক্ষণ লিখে ফেললাম। আচ্ছা আপনার কি এখন মাথা ধরেছে? কেন জিজ্ঞেস করলাম জানেন। ধরুন আপনি একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। যার সঙ্গে কথা বলছেন তার প্রচণ্ড মাথায় যন্ত্রণা। কিছুক্ষণ কথা বলার পরই দেখবেন আপনারও মাথা ধরেছে। কোনো কারণ ছাড়াই ধরেছে। এটা বহুল পরীক্ষিত একটা ব্যাপার। আমি অনেকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। আপনিও দেখতে পারেন। এবার আপনাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো কোন প্রাণীর দু'টা লেজ? খুব সহজ! একটু চিন্তা করলেই পেয়ে যাবেন।

মিসির আলি পড়া বন্ধ করলেন। তিনি অনেক ভেবেও বের করতে পারলেন না—কোন প্রাণীর দু'টা লেজ। একবার টিকটিকির কথা মনে হয়েছিল। টিকটিকির একটা লেজ খসে গেলে আরেকটা গজায় সেই অর্থে টিকটিকিকে দুই লেজের প্রাণী কি বলা যায়? না—টিকটিকি হবে না।

উত্তরও কোথাও দেয়া নেই। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হলেই উত্তরটা জানা যাবে। দেখা হবার সম্ভাবনা কতটুকু? এখনো তেমন কোনো সম্ভাবনা তিনি দেখছেন না। কারণ মেয়েটিকে খুঁজে বের করার কোনো চেষ্টা তিনি করছেন না। বয়সের কারণে তাঁর ভেতর এক ধরনের আলস্য কাজ করা শুরু করেছে। আশেপাশের জগৎ সম্পর্কে উৎসাহ কমে যাচ্ছে। লক্ষণ খুব খারাপ।

আত্মার মৃত্যু হলেই এ জাতীয় ঘটনা ঘটে। কোনো কিছুই মনকে আকৃষ্ট করে না। আত্মার মৃত্যু হয়েছে কি হয়নি তা বের করার একটা সহজ পদ্ধতির কথা তিনি জানেন। বৃষ্টি কেটে যাবার পর আকাশে যখন রঙধনু ওঠে সেই রঙধনুর দিকে তাকিয়ে যে চোখ নামিয়ে নেয় এবং দ্বিতীয়বার তাকায় না, তার আত্মার মৃত্যু হয়েছে। আকাশে রঙধনু না উঠলে তিনি তার আত্মার মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারছেন না।

মৃত আত্মাকে জীবনদান করারও কিছু পদ্ধতি আছে। সবচে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে শিশুদের সঙ্গে মেশা। শিশুরা সব সময় তাদের আশেপাশের মানুষদের তাদের আত্মা থেকে খানিকটা ধার দেয়।

সমস্যা হচ্ছে শিশুদের মিসির আলি তেমন পছন্দ করেন না। এদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেই তাঁর ভাল লাগে। শিশুরা সুন্দর—অসম্ভব সুন্দর। যে কোনো বড় সৌন্দর্যকে দেখতে হয় দূর থেকে। যত দূর থেকে দেখা যায় ততই ভাল। "কুৎসিত জিনিস দেখতে হয় কাছ থেকে, সুন্দর জিনিস দূর থেকে।" এটা যেন কার কথা? মিসির আলি মনে করতে পারলেন না। তাঁর স্মৃতিশক্তি কি দুর্বল হতে শুরু করেছে?

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ক তার মেমোরি সেলে জমিয়ে রাখা স্মৃতি ফেলে দিয়ে সেলগুলি খালি করছে। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে মেমোরি সেলে কোনো মেমোরি থাকে না। মস্তিষ্ক সব ফেলে দিয়ে ঘর খালি করে দেয়।

মিসির আলি ঘুমুতে গেলেন রাত দশটায়। ইদানীং তিনি খুব নিয়মকানুন মেনে চলার চেষ্টা করছেন। যেমন রাত দশটা বাজতেই ঘুমুতে যাওয়া। সকালবেলা মর্নিং ওয়াক। ঘড়ি ধরে কাজ করার চেষ্টা। রাত দশটায় ঘুমুতে গেলেও লাভ হচ্ছে না—ঘুম আসতে আসতে তিনটা বেজে যাচ্ছে। দশটা থেকে রাত তিনটা এই পাঁচ ঘণ্টা মস্তিষ্ককে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় রাখা সম্ভব না। মিসির আলি সেই চেষ্টা করেনও না। তিনি শুয়ে শুয়ে ফারজানা মেয়েটিকে নিয়েই ভাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী। সে তা জানে না। অধিকাংশ স্কিজোফ্রেনিয়াকই তা জানে না। তারা ভেবে নেয়—তাদের দেখা জগতই সত্যি জগৎ। অন্যদের জগৎ ভ্রান্তিময়। তাদের একটা যুক্তি অবশ্যই আছে। কালার ব্লাইন্ড একজন মানুষ সবুজ রঙ দেখতে পায় না। তার জগতে সবুজের অস্তিত্ব নেই। সে বলবে পৃথিবীতে সবুজ রঙ নেই। তার কাছে এটাই সত্যি। তার সেই জগৎ মিথ্যা নয়।

মিসির আলি জেগে আছেন—তাঁর মাথায় ফারজানা মেয়েটি নেই। তাঁর মাথার ঘুরছে কোন প্রাণীর লেজের সংখ্যা দুই। তাঁর হঠাৎ মনে হল ফারজানা মেয়েটি ইচ্ছে করে তাঁর মাথায় এই ধাঁধাটি ঢুকিয়ে দিয়েছে। ধাঁধার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত এটা মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকবে। মেয়েটি এই ব্যাপার জানে। স্কিজোফ্রেনিয়াকরা খুব বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তারা নিজেরা বিভ্রান্তির জগতে বাস করে বলেই হয়ত অন্যদের বিভ্রান্তিতে ফেলে আনন্দ পায়। মিসির আলির মাথা দপ দপ করছে। রেলগাড়িতে চড়লে যেমন কিছুক্ষণ পরপর শব্দ হয়—তাঁর মাথার ভিতর ঠিক সে রকম খানিকক্ষণ পরপর প্রশ্ন উঠছে—

কোন প্রাণীর দু'টা লেজ?

কোন প্রাণীর দু'টা লেজ?

৫

এখন বাজছে সকাল ১১টা। কিছুক্ষণ আগে আমি নাস্তা খেয়ে লিখতে বসেছি। সকালের চা এখনো খাওয়া হয়নি। চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। আমার চায়ের কাপের ধোঁয়া দেখতে খুব ভাল লাগে। মিসির আলি সাহেব, আপনার কি চায়ের কাপের ধোঁয়া দেখতে ভাল লাগে? মানুষের ভাললাগাগুলি একরকম হয় না কেন বলুন তো? মানুষকে তো নানাভাবে ভাগ করা হয়। তাদের ভাললাগা, মন্দলাগা নিয়ে তাদের ভাগ করা হয় না কেন? আপনারা সাইকিয়াট্রিস্টরা সে রকম ভাগ করতে পারেন না?

যেমন ধরুন যে সব মানুষ—

ক. চায়ের কাপের ধোঁয়া ভালবাসেন।

খ. বেলি ফুলের গন্ধ ভালবাসেন।

গ. চাঁপা রঙ ভালবাসেন

তাদের মানসিকতা এক ধরনের (আমার মতো)। তাদের চিন্তা ভাবনায় খুব মিল থাকবে।

আচ্ছা আপনি কি আমার জ্ঞানী টাইপ কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছেন?

থাক আর বিরক্ত হতে হবে না। এখন আমি মূল গল্পে ফিরে যাই। এখন যে চ্যাপ্টারটা বলব সেই চ্যাপ্টারের নাম—নীতু আন্টি।

আমি ঘুমুচ্ছিলাম—রাত দশটা-টশটা হবে। আমার ঘরের দরজা খোলা। ছোট মানুষ তো কাজেই দরজা খোলা থাকত। যাতে রাতে-বিরাতে বাবা এসে আমাকে দেখে যেতে পারতেন। এই কাজটা বাবা করতেন—রাতে খুব কম করে হলেও দু'বার এসে দেখে যেতেন। তখন ঘুম ভেঙে গেলেও আমি ঘমিয়ে থাকার ভান করতাম। কারণ কি জানেন? কারণ হচ্ছে আমি যখন জেগে থাকতাম তখন বাবা আমাকে আদর করতেন না। ঘুমন্ত অবস্থাতেই শুধু আদর করতেন। মাথার চুলে বিলি কেটে দিতেন। হাতের আঙুল নিয়ে খেলা করতেন। এমনকি মাঝে মাঝে ঘুম পাড়ানি গানও গাইতেন। যদিও আমি তখন বড় হয়ে গেছি। ঘুম পাড়ানি গান শোনার কাল শেষ হয়েছে। ঘুমন্ত মানুষকে গান শুনানো—খুব মজার ব্যাপার না? আমার বাবা আসলেই বেশ মজার মানুষ। ভালবাসার প্রকাশকে তিনি দুর্বলতা বলে ভাবেন। (আরেকটা ব্যাপারও হতে পারে, বাবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ত আমাকে ভালবাসতেন না। ভালবাসার ভান করতেন। মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে ভান করা যায় না বলেই আমি যখন ঘুমুতাম তখন ভান করতেন।)

নীতু আন্টির মধ্যেও এই ব্যাপার ছিল। ভালবাসার প্রকাশকে তিনিও দুর্বলতা মনে করতেন। তাঁর প্রধান চেষ্টা ছিল কেউ যেন তাঁর দুর্বলতা ধরে না ফেলে। তিনি শুরু থেকেই আমাকে পছন্দ করতেন। কিন্তু তাঁর দুর্বলতা আমি যেন ধরতে না পারি এটা নিয়ে সব সময় অস্থির থাকতেন।

তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখার গল্পটা শুনুন। আমি শুয়ে আছি। ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দেখি কে একজন আমার চুলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম ভাবলাম ছোট মা। তারপরই মনে হল, না ছোট মা না—ইনার গায়ের গন্ধ অন্যরকম। বেলি ফুলের গন্ধের মতো গন্ধ। আমি চোখ মেললাম। তিনি হাত সরিয়ে নিয়ে শুকনো গলায় বললেন, ঘুম ভাঙিয়ে ফেললাম?

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। তিনি আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, "শোন মেয়ে আমি এখন থেকে তোমাদের বাড়িতে থাকব। তোমার বাবার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।" আমি তাকিয়ে রইলাম। কিছু বললাম না। তিনি আগের মতোই শুকনো গলায় বললেন, তুমি তো ইতোমধ্যে দু'জনকে মা ডেকে ফেলছ। আমাকে মা ডাকার দরকার নেই। আমাকে আন্টি ডাকতে পার। অসুবিধা নেই। আমার নাম নীতা। তুমি ইচ্ছে করলে নীতু আন্টিও ডাকতে পার।

জি আচ্ছা।

ঘর এত নোংরা কেন? চারদিকে খেলনা। কাল সকালেই ঘর পরিষ্কার করবে।

জি আচ্ছা।

শোবার ঘরে স্যান্ডেল কেন? স্যান্ডেল থাকবে শোবার ঘরের বাইরে। শোবার ঘরটা থাকবে ঝকঝকে তকতকে, একদানা বালিও সেখানে থাকবে না। বুঝতে পারছ?

জি।

এখন থেকে শোবার আগে চুল বেঁধে শোবে। এতদিন তো চুল বাঁধার কেউ ছিল না। এখন থেকে আমি বেঁধে দেব। আরেকটা কথা শুনে রাখ—আমি কিন্তু আহ্লাদ পছন্দ করি না। আমার সাথে কখনো আহ্লাদী করবে না। না ডাকলে আমাকে এসে বিরক্ত করবে না। মনে থাকবে?

থাকবে।

বাহ্, তোমার চুল তো খুব সুন্দর। সিল্কি চুল।

এই বলে তিনি আমার মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে লাগলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম—ইনি চমৎকার একজন মহিলা। ইনার সঙ্গে সব রকম আহ্লাদ করা যাবে। এবং আহ্লাদ করলেও তিনি রাগ করবেন না। আমি আরো বুঝলাম এই মহিলার ভেতরও অনেক ধরনের আহ্লাদীপনা আছে।

নীতু আন্টি খুব সুন্দর ছিলেন। তাঁর মুখ ছিল গোলাকার। চোখ বড় বড়। তবে বেশিরভাগ সময়ই চোখ ছোট করে ভুরু কুঁচকে তাকাতেন। ভাবটা এরকম যে তিনি খুব বিরক্ত হচ্ছেন।

তিনি বাড়িতে এসেই বাড়ির কিছু নিয়মকানুন পাল্টে দিলেন—যেমন, আগে একতলা থেকে কাজের মানুষরা কেউ দোতলায় আসতে পারত না। এখন থেকে পারবে। শুধু যে পারবে তাই না—একটা কাজের মেয়ে রাখা হল, যার একমাত্র কাজ আমার ঘর সাজিয়ে রাখা এবং রাতে আমার ঘরেই ঘুমানো। তার জন্যে একটা ক্যাম্প খাটের ব্যবস্থা করা হল। সে ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমার শোবার ঘরে সেই ক্যাম্প খাট পাতা হত। কাজের মেয়েটার নাম শরিফা। পনের ষোল বছর বয়স। ভারী শরীর। দেখতে খুব মায়াকাড়া। তার ছিল কথা বলা রোগ। অন্যদের সামনে সে চুপ করে থাকত। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় যখন আমি ছাড়া আর কেউ থাকত না তখন সে শুরু করত গল্প। ভয়ংকর সব গল্প সে অবলীলায় বলত। গল্প শেষ করে সে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুমুতে যেত। বাকি রাতটা আমার ঘুম হত না।

ভয়ংকর গল্পগুলি কি আপনি নিশ্চয়ই জানতে চাচ্ছেন। আপনার ধারণা ভয়ংকর গল্প মানে ভূত প্রেতের গল্প। আসলে তা না। ভয়ংকর গল্প মানে নারী–পুরুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গল্প। আমার কাছে ভয়ংকর লাগত কারণ এই ব্যাপারটা অস্পষ্টভাবে জানতাম। আমার কাছে তা নোংরা, অরুচিকর এবং কুৎসিত মনে হত। আমি শরিফার গল্পের একটা নমুনা দিচ্ছি। আপনি আমার মানসিক অবস্থা ধরার চেষ্টা করছেন বলেই দিচ্ছি। অন্য কাউকে এ ধরনের গল্প আমি কখনো বলব না। আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। শরিফার যে গল্পটি আমি বলছি তা হচ্ছে তার কাছ থেকে শোনা সবচে ভদ্র গল্প। আমি শরিফার ভাষাতেই বলার চেষ্টা করি।

"বুঝছেন আফা—আমরা তো গরিব মানুষ—আমবার গেরামের বাড়িত টাট্টিখানা নাই। টাট্টিখানা বুঝেন আফা? পাইখানারে আমরা কই টাট্টিখানা। উজান দেশে কয় টাট্টি ঘর। তখন সইন্ধা রাইত—আমার ধরছে 'পেসাব'। বাড়ির পিছনে রওনা হইছি হঠাৎ কে জানি আমার মুখ চাইপ্যা ধরছে। চিক্কুর দিমু হেই উপায় নাই। আন্ধাইরে পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না। খালি বুজতাছি দুইটা গুণ্ডা কিসিমের লোক আমারে টাইন্যা লইয়া যাইতাছে। আমি ছাড়া পাওনের জন্যে হাত পাও মুচড়াইতাছি। কোনো লাভ নাই। এরা আমারে নিয়া গেল ইস্কুল ঘরে। এরার মতলবটা তো আফা আমি বুঝতে পারতাছি। আমার কইলজা গেছে শুকাইয়া। এক মনে দোয়া ইউনুস পড়তাছি। এর মধ্যে ওরা আমারে শুয়াইয়া ফেলছে। একজনে টান দিয়া শাড়ি খুইল্যা ফেলছে...

গল্পের বাকি অংশ আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আপনি অনুমান করে নিন। এ জাতীয় গল্প রোজ রাতে আমি শুনতাম। আমার শরীর ঝিম ঝিম করত। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অনুভূতি। যার সঙ্গে আমি পরিচিত না। তখন আমার বয়স—মাত্র তের।

মিসির আলি সাহেব শরিফার গল্প শোনার জন্যে আমি অপেক্ষা করতাম। 'ভয়ংকর' ভাল লাগত। আপনি লক্ষ্য করুন আমি ভাল শব্দের আগে 'ভয়ংকর' বিশেষণ ব্যবহার করেছি।

নীতু আন্টিও আমাকে গল্প বলতেন। সুন্দর সুন্দর সব গল্প। তাঁর কিশোরী বয়সের সব গল্প। একান্নবর্তি পরিবারে মানুষ হয়েছেন। চাচাতো বোন ভাই সব মিলিয়ে বাড়িতে অনেকগুলি মানুষ। সারা দিন কোথাও না কোথাও মজার কিছু হচ্ছে। নীতু আন্টির এক বোন আবার প্লানচেট করা জানত। সে রোজই আত্মা নিয়ে আসত। বিখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মা—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শেক্সপীয়ার, আইনস্টাইন, এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসতেন খুব ঘন ঘন। প্লানচেট করলেই তিনি চলে আসতেন। দু'লাইন, চার লাইনের কবিতা লিখে যেতেন। সে সব কবিতা খুব উচ্চমানের হত না। কে জানে কবিরা হয়ত মৃত্যুর পর তাঁদের কাব্যশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ওনার লেখা একটা কবিতার নুমনা—

"আকাশে মেঘমালা
বাতাসে মধু
নীতু নব সাজে সেজে
নবীনা বধূ"

একবার নীতু আন্টির বিয়ের কথা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ প্লানচেটে এই কবিতা লিখে যান। সেই বিয়ে অবশ্য হয়নি।

আমি নীতু আন্টিকে খুব করে ধরলাম আমাকে প্লানচেট শিখিয়ে দিতে। তিনি শিখিয়ে দিলেন। খুব সহজ, একটা কাগজে এ বি সি ডি লেখা থাকে। একটা বোতামে আঙুল রেখে বসতে হয়। মুখোমুখি দু'জন বসতে হয়। মুখে বলতে হয়—If any good soul passes by, please come. তখন মৃত আত্মা চলে আসেন এবং বোতামে আশ্রয় নেন। এবং বোতাম নড়তে শুরু করে। আত্মাকে প্রশ্ন করলে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেই প্রশ্নের জবাব আসে। এক অক্ষর থেকে আরেক অক্ষরে গিয়ে পুরো বাক্য তৈরি হয়। এ বি সি ডি না লিখে অ, আ, লিখেও হয়। তবে A B C D লেখাই সহজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতু আন্টির কাছ থেকে শিখে আমি খুব আত্মা আনা শুরু করলাম। বেশিরভাগ সময়ই রবীন্দ্রনাথ আসেন। মনে হয় তাঁর অবসরই সবচেয়ে বেশি।

এক রাতে ছোট মা চলে এলেন। সে রাতে বাসায় কেউ ছিল না। বাবা এবং নীতু আন্টি গিয়েছেন বিয়েতে। ফিরতে রাত হবে। শরিফা গিয়েছে দেশের বাড়িতে। তার মামা এসে তাকে নিয়ে গেছে। তার বিয়ের কথা হচ্ছে। বিয়ে হয়ে গেলে সে আর ফিরবে না। একা একা প্লানচেট নিয়ে বসেছি। বোতামে আঙুল রাখতেই বোতাম নড়তে শুরু করল। আমি বললাম, আপনি কি এসেছেন?

বোতাম চলে গেল "Yes" লেখা ঘরে। অর্থাৎ তিনি এসেছেন।

আমি বললাম, আপনি কে?

বোতাম চলে গেল "R" অক্ষরে। অর্থাৎ যিনি এসেছেন তাঁর নামের প্রথম অক্ষর "R" খুব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ আবার এসেছেন। আমি বললাম, আপনার নামের শেষ অক্ষরও কি "R"? বোতাম চলে গেল "Yes" এ। রবীন্দ্রনাথ যে এসেছেন তাতে আর সন্দেহ নেই। আমি বললাম আমার মতো ছোট্ট একটা মেয়ের ডাকে যে আপনি এসেছেন তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এই সব হচ্ছে গৎ বাঁধা কথা। মৃত আত্মাকে সম্মান দেখানোর জন্য এইসব বলতে হয়। তবে শুধু ভাল আত্মাদের বেলায় বলতে হয়। খারাপ আত্মাদের বেলায় কিছু বলতে হয় না। খারাপ আত্মাদের অতি দ্রুত বিদেয় করার ব্যবস্থা করতে হয়।

আমি ধন্যবাদ দেয়া শেষ করার পর এক কাণ্ড হল। দরজার পর্দা সরিয়ে ছোট মা ঘরে ঢুকলেন। অনেক অনেক দিন পর তাঁর দেখা পেলাম। আগে ছোট মা'কে দেখে কখনো ভয় পাইনি—সে রাতে হঠাৎ বুক ধক করে উঠল। ভয় পাবার প্রধান কারণ বাইরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল, আমার ভয় হচ্ছিল—এই বুঝি ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে। আমার ঘরে একটা চার্জার আছে। ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে চার্জার জ্বলে ওঠার কথা। আমার ঘরের চার্জারটা নষ্ট। মাঝে মাঝে ইলেকট্রিসিটি চলে যায় কিন্তু চার্জার জ্বলে না। টেবিলের ড্রয়ারে অবশ্যি মোমবাতি আছে। দেয়াশলাই আছে কি না জানি না। মনে হয় নেই। ভয়ে আমার বুক ধক ধক করছে—আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ছোট মা'র দিকে। তিনি বললেন, ফারজানা কেমন আছ?

এইরে আমার আসল নাম বলে ফেললাম। যাই হোক আমার ধারণা— ইতোমধ্যে আপনি আমার নাম জেনে ফেলেছেন। ভাল কথা, চিত্রাও কিন্তু আমার নাম। আমার আসল মা আমার নাম রেখেছিলেন চিত্রা। মা'র মৃত্যুর পর কেন জানি এই নামটা আর ডাকা হত না। আমার আরো দু'টা ডাক নাম আছে—বিবি, বাবা এই নামে আমাকে ডাকেন। আরেকটা হল—নিশি। বাবা ছাড়া বাকি সবাই আমাকে নিশি নামে ডাকে। বাবা ছাড়া সবাই বলতে আমি স্কুলের বন্ধুদের কথা বলছি।

যে কথা বলছিলাম, ছোট মা বললেন, ফারজানা কেমন আছ?

আমি বললাম, ভাল।

তুমি একা, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

অনেকদিন পর তোমাকে দেখতে এসেছি। তোমার স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। চুল খুব সুন্দর করে কেটেছ। কে কেটে দিয়েছে?

নীতু আন্টি।

তিনি তোমাকে খুব ভালবাসেন?

হুঁ।

তাঁকে কি তুমি আমার কথা বলেছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না।

খুব ভাল করেছ। শরিফাকে আমার কথা বলেছ?

না।

শরিফা মেয়েটা খুব খারাপ তুমি কি তা জান?

না।

মেয়েটা তোমাকে খারাপ করে দিচ্ছে তা কি বুঝতে পারছ? মেয়েটাকে তুমি পছন্দ কর। তাই না?

হ্যাঁ।

তুমি আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছ কেন? তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ?

হ্যাঁ।

ভয় পেও না।

আচ্ছা।

ভূত নামানোর খেলা কেন খেলছ? এইগুলি ভাল না। আর কখনো খেলবে না।

আচ্ছা।

নীতু আন্টিকে তুমি খুব পছন্দ কর?

হ্যাঁ।

তাঁকে আমার কথা কখনো বলবে না।

আচ্ছা।

আমি এখন চলে যাব।

আর আসবেন না?

আসব। শরিফাকে শাস্তি দেবার জন্য আসব। ওকে আমি কঠিন শাস্তি দেব।

একটা ব্যাপার আপনাকে বলি যে ছোট মা আমার কাছে আসতেন এই ছোট মা সে রকম নন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কঠিন, গলার স্বর কঠিন। অথচ আগে যিনি আসতেন—তিনি ছিলেন আলাভোলা ধরনের। তাঁর মধ্যে ছিল অস্বাভাবিক মমতা। তিনি এসেই আমার মাথায় হাত দিতেন—অথচ ইনি দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। একবারো মাথায় হাত দিলেন না বা কাছেও এলেন না।

নিচে গাড়ির শব্দ হল। ছোট মা পর্দা সরিয়ে বের হয়ে গেলেন। নীতু আন্টি তার কিছুক্ষণ পরই ঘরে ঢুকলেন। আমি জানি তিনি এখন কী করবেন—বিয়ে বাড়িতে মজার ঘটনা কী কী ঘটল তা বলবেন। বলতে বলতে হেসে ভেঙে পড়বেন। যে সব ঘটনা বলতে বলতে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়েন সাধারণত সে সব ঘটনা তেমন হাসির হয় না। তবু আমি তাঁকে খুশি করার জন্যে হাসি। আজ অন্যান্য দিনের মতো হল না। ঘরে ঢুকেই তিনি ভুরু কুঁচকে ফেললেন—তাঁর হাসি হাসি মুখ হঠাৎ করে গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি শীতল গলায় বললেন, এই মেয়ে, কেউ কি এসেছিল?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না তো।

ঘরে বিশ্রী গন্ধ কেন?

বিশ্রী গন্ধ?

অবশ্যই বিশ্রী গন্ধ। মনে হচ্ছে নর্দমা থেকে কেউ উঠে এসে ঘরে হাঁটাহাঁটি করেছে।

আমি কথা ঘুরাবার জন্য বললাম, আন্টি বিয়ে বাড়িতে আজ কী হল?

আন্টি বললেন, তোমার ঘরে কোনো কোণায় ইঁদুর মরে নেই তো? মরা মরা গন্ধ পাচ্ছি। তুমি পাচ্ছ না?

না।

দাঁড়াও। ঘর ঝাড় দেবার ব্যবস্থা করি।

নীতু আন্টি উপস্থিত থেকে ঘর ঝাঁট দেওয়ালেন। স্যাভলন পানি দিয়ে মেঝে মুছালেন—তারপরও তাঁর নাকে মরা মরা গন্ধ লেগে রইল। তিনি বাবাকে ডেকে নিয়ে এসে বললেন, তুমি কি কোনো গন্ধ পাচ্ছ?

বাবা বললেন, পাচ্ছি।

কিসের গন্ধ?

স্যাভলনের গন্ধ।

পচা-কটু কোনো গন্ধ পাচ্ছ না?

না তো।

আমি পাচ্ছি।

বাবা হাসতে হাসতে বললেন, তোমার সুপার সেনসেটিভ নাক, তুমি তো পাবেই। আমাদের পূর্ব পুরুষ বানর ছিলেন। তোমার পূর্ব পুরুষ সম্ভবত কুকুর।

রসিকতা করবে না।

নীতু আন্টি চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেলেন। রাতে আমার ঘরে ঘুমুতে এলেন। এটা নতুন কিছু না। তিনি প্রায়ই রাতে আমার ঘরে ঘুমুতেন। না, প্রায়ই বলাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। সপ্তাহে একদিন বলাটা যুক্তিযুক্ত হবে। স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন তিনি গভীর রাত পর্যন্ত গুটুর গুটুর করে গল্প করতেন। আমার জন্য সেই রাতগুলি খুব আনন্দময় হত। শরিফার ভয়ংকর গল্পগুলি শুনতে পেতাম না, তার জন্যে অবশ্যি একটু খারাপ লাগত।

নীতু আন্টি আমার ঘরে ঘুমুতে এসেছেন, আমার এত ভাল লাগল। আন্টি বললেন—আজ শরিফা নেই তো তাই তোমার সঙ্গে ঘুমুতে এসেছি। ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে—একা ঘুমুতে ভয়ও পেতে পার। আজ কিন্তু গল্প হবে না। কাল তোমার স্কুল আছে। আমি বললাম, আন্টি খারাপ গন্ধটা কি এখনো পাচ্ছেন?

হ্যাঁ পাচ্ছি।

আন্টি বাতি নিভিয়ে আমাকে কাছে টেনে শুতে গেলেন। আমি হঠাৎ বললাম, আন্টি আপনাকে একটা কথা বলি—তিনি হাই তুলতে তুলতে বললেন, বল। লম্বা চওড়া কথা না তো? রাত জেগে গল্প শুনতে পারব না। আমার ঘুম পাচ্ছে।

আমি চাপা গলায় বললাম, আন্টি মৃত মানুষ কি আসতে পারে?

তার মানে?

না, কিছু না।

আন্টি বিছানায় উঠে বসলেন। হাত বের করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বললেন, কী বলতে চাও ভাল করে বল। অর্ধেক কথা বলবে, অর্ধেক পেটে রাখবে তা হবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীতু আন্টি কঠিন গলায় বললেন, উঠে বস।

আমি উঠে বসলাম।

এখন বল মৃত মানুষের আসার কথা আসছে কেন? তুমি কি কোনো মৃত মানুষকে আসতে দেখেছ?

হ্যাঁ।

সে কি আজ এসেছিল?

হ্যাঁ।

মৃত মানুষটা কি তোমার মা?

না, আমার ছোট মা।

পুরো ঘটনাটা আমাকে বল। কিছু বাদ দেবে না।

বলতে ইচ্ছা করছে না।

ইচ্ছে না করলেও বল। পুরো ব্যাপারটা আমাকে তুমি তোমার ভালোর জন্যে বলবে।

এটা বললে আমার ভাল হবে না।

তুমি বাচ্চা একটা মেয়ে—কিসে তোমার মঙ্গল, কিসে তোমার অমঙ্গল তা বোঝার ক্ষমতা তোমার হয়নি। বল ব্যাপারটা কী?

আরেক দিন বলব।

আরেক দিন না। আজই বলবে। এখনই বলবে।

আমি বলতে শুরু করলাম। কিছুই বাদ দিলাম না। নীতু আন্টি চুপ করে শুনে গেলেন। কথার মাঝখানে একবারো বললেন না—তুমি এসব কী বলছ!

গল্প বলা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম—আমি কী বলছি না বলছি সবই ছোট মা শুনছেন। তিনি ঘরের ভেতর নেই—কিন্তু কাছেই আছেন। পর্দার ওপাশেই আছেন। পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি যে নিঃশ্বাস ফেলছেন আমি তাও শুনতে পাচ্ছিলাম। গল্প শেষ করার পর নীতু আন্টি বললেন, ঘুমিয়ে পড়। বলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি সারা রাত জেগে রইলাম। এক ফোঁটা ঘুম হল না। শুরু হল আমার রাত জাগার কাল।

ছোটদের উদ্ভট অস্বাভাবিক কথা বড়রা সব সময় হেসে উড়িয়ে দেন। সেটাই স্বাভাবিক। ছোটদের উদ্ভট গল্প গুরুত্বের সঙ্গে কখনো গ্রহণ করা হয় না। গ্রহণ করা হয়ত ঠিকও নয়। আন্টি আমার গল্প কীভাবে গ্রহণ করলেন কিছুদিন আমি তা বুঝতেই পারলাম না। ছোট মা'র প্রসঙ্গ তিনি আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার তুললেন না। যেন কিছু শোনেননি। পুরোপুরি স্বাভাবিক আচার আচরণ। শুধু রাতে আমার সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। তখন অনেক গল্পটল্প হয়—ছোট মা'র প্রসঙ্গ কখনো আসে না।

আপনাকের তো আগেই বলেছি আমার ইনসমনিয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। শেষ রাতের দিকে ঘুম আসত। রাত একটার দিকে বাড়ি পুরোপুরি নিঃশব্দ হয়ে যেত তখন বিচিত্র সব শব্দ শুনতে পেতাম। যেমন খাটের চারপাশে কে যেন হাঁটত। সে কে তা আমার কাছে পরিষ্কার না। ছোট মা হতে পারেন—অন্য কেউও হতে পারে। প্রচণ্ড ভয়ে আমি অস্থির হয়ে থাকতাম। যেহেতু রাতে ঘুম আসত না—দিনটা কাটত ঝিমুনিতে। ক্লাসে বসে আছি, স্যার অংক করাচ্ছেন। আমার তন্দ্রার মতো চলে এল। আধো ঘুম আধো জাগরণে চলে গেলাম। স্যারের দিকে তাকিয়ে থেকেই স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতে শুরু করতাম। এই স্বপ্নগুলি খুব অদ্ভুত। অদ্ভুত এই কারণে যে আমি তন্দ্রায় যে সব স্বপ্ন দেখতাম তার প্রতিটি সত্য হয়েছে। আমি তন্দ্রায় যা দেখতাম তাই ঘটত। তারচেয়ে মজার ব্যাপার, স্বপ্নগুলিকে আমি ইচ্ছামতো বদলাতে পারতাম। তবে আমি যে স্বপ্ন বদলাতেও পারি এটা বুঝতে সময় লেগেছিল। আগে বুঝতে পারলে খুব ভাল হত। আমি বোধ হয় ব্যাপারটা আপনাকে বুঝাতে পারছি না। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই।

ধরুন আমি স্বপ্নে দেখলাম বাবা চেয়ারে বসে লিখছেন। তিনি বসেছেন সিলিং ফ্যানের নিচে, হঠাৎ সিলিং ফ্যানটা খুলে তাঁর মাথায় পড়ে গেল। রক্তে চারদিক ভেসে যাচ্ছে। আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। আমার এই স্বপ্ন দেখা মানে—ব্যাপারটা ঘটবে। আমি তৎক্ষণাৎ ঠিক করলাম—না, ব্যাপারটা এ রকম হবে না। স্বপ্নটা যেভাবেই হোক বদলে দিতে হবে। তখন নতুন স্বপ্নের কথা ভাবলাম। যেমন ধরুন আমি ভাবলাম—বাবা লেখার টেবিলে বসেছেন। কী মনে করে হঠাৎ সিলিং ফ্যানের দিকে তাকালেন। তারপর সরে দাঁড়ালেন—ওমনি ঝপাং শব্দ করে ফ্যান পড়ে গেল। বাবার কিছু হল না। পুরো ব্যাপারটা ভেবে রাখার পর—অবিকল যেমন ভেবে রেখেছি তেমনি স্বপ্ন দেখতাম। আপনি এটাকে কী বলবেন, কোনো ক্ষমতা?

না, আপনি তা বলবেন না। মানুষের যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা থাকতে পারে এইসব আপনি বিশ্বাস করেন না। আপনার কাছে মানুষ যন্ত্রের মতো। একটা ছেলে যদি একটা মেয়েকে ভালবাসে তাহলে আপনি ধরেই নেবেন—ব্যাপারটা আর কিছুই না একজন আরেকজনের প্রতি শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে। শারীরিক আকর্ষণ যেহেতু নোংরা একটা ব্যাপার কাজেই ভালবাসা নামক মিষ্টি একটা শব্দ ব্যবহার করছে। কুইনাইনকে সুগার কোটেড করা হচ্ছে। আমি কি ভুল বললাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভুল বলিনি। আপনি যাই ভাবেন—কিন্তু শুনুন, স্বপ্ন তৈরি করার ক্ষমতা আমার আছে। এবং আমি এখনো পারি। ঘটনা বলি। ঘটনা বললেই আপনি বুঝবেন।

শরিফা তো বাড়ি থেকে চলে গেল। ওর বিয়ে হবার কথা। বিয়ে হলে আর ফিরবে না। আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম ওর বিয়ে হচ্ছে। চ্যাংড়া টাইপের ছেলে। পান খেয়ে দাঁত লাল করে আছে—আর ভ্যাক ভ্যাক করে হাসছে। স্বপ্ন দেখে খুব মেজাজ খারাপ হল। তখন ভাবলাম, বিয়ে হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু বরের সঙ্গে ওর খুব ঝগড়া হয়েছে, ও চলে এসেছে আমাদের বাড়িতে। যেরকম ভাবলাম অবিকল সেরকম স্বপ্ন দেখলাম। হলও তাই। এক সন্ধ্যাবেলা শরিফা উপস্থিত। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিন্তু বর তাকে নিচ্ছে না। বিয়ের সময় কথা হয়েছিল বরকে একটা সাইকেল এবং নগদ পাঁচ হাজার এক টাকা দেয়া হবে। কোনোটাই দেয়া হয়নি বলে তারা কনে উঠিয়ে নেবে না। যেদিন সাইকেল এবং টাকা দেয়া হবে সেদিনই মেয়ে তুলে নেবে। আমি শরিফাকে বললাম, তোমার কি মন খারাপ?

শরিফা বলল, মন খারাপ কইরা লাভ আছে আফা?

তোমাকে যে তুলে নিচ্ছে না তোমার রাগ লাগছে না?

না। সাইকেল আর টেকা দিব বইল্যা দেয় নাই। তারার তো আফা কোনো দোষ নাই। একটা জিনিস দিবেন বলবেন, তারপরে দিবেন না—এইটা কেমন কথা?

তোমার বর পছন্দ হয়েছে?

হু।

তোমার সঙ্গে তোমার বরের কথা হয়েছে?

ওমা, কথা আবার হয় নাই? এক রাইত তার লগে ছিলাম না?

রাতে তোমরা কী করলে?

কওন যাইব না আফা। বড়ই শরমের কথা। লোকটার কোনো লজ্জা নাই। এমন বেহায়া মানুষ জন্মে দেখি নাই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

না, বল আমি শুনব।

অসাম্ভাব কথা আফা। ছিঃ।

তুমি বলবে না?

জীবন থাকতে না।

আমি নিষিদ্ধ কথা শোনার জন্যে ছটফট করছিলাম। এবং আমি জানি শরিফাও নিষিদ্ধ কথাগুলি বলার জন্যে ছটফট করছিল।

দেখলেন তো স্বপ্ন পাল্টে কীভাবে শরিফাকে বাড়িতে নিয়ে এলাম? আপনি বলবেন, কাকতলীয়। মোটেই না। শরিফার বরকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করল, কাজেই একদিন খুব ভাবলাম, শরিফার বর এসেছে। যেমন ভাবলাম, ঠিক সেরকম স্বপ্ন দেখলাম। শরিফার বর চলে এল। নীল রঙের একটা লুঙ্গি। রবারের জুতা। সিল্কের চক্রাবক্রা একটা শার্ট। এসেই বাসার সবাইকে পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলল। এমনকি আমাকেও। শরিফার বরের নাম—সিরাজ মিয়া। সে নারায়ণগঞ্জে একটা লেদ মেশিনের হেল্পার।

আন্টি তাকে খুব বকা দিলেন। কঠিন গলায় বললেন, তুমি পেয়েছ কী? যৌতুক পাওনি বলে বউ ঘরে নেবে না। তুমি কি জান পুলিশে খবর দিলে তোমার পাঁচ বছরের জেল হয়ে যাবে। বাংলাদেশে যৌতুক নিবারণী আইন পাস হয়েছে। দেব পুলিশে খবর?

সিরাজ মিয়া বলল, ইচ্ছা হইলে দেন। আফনেরা বড় লোক। আফনেরা যা বলবেন সেইটাই ন্যায়।

আন্টি আরো রেগে গেলেন। তাঁর ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল এখনই তিনি ধানমণ্ডি থানার ওসিকে খবর দেবেন। আমাকে বললেন, ফারজানা দাও তো টেলিফোনটা। ওসি সাহেবকে আসতে বলি।

আমি টেলিফোন এনে দিলাম। আমার একটু ভয় ভয় করছিল, কিন্তু সিরাজ মিয়া নির্বিকার। তাকে চা আর কেক খেতে দেয়া হয়েছে। সে চায়ে কেক ডুবিয়ে বেশ মজা করে খাচ্ছে।

আন্টি ধানমন্ডি থানার ওসিকে খবর দিলেন না। কাকে যেন টেলিফোন করে বললেন, একটা নতুন সাইকেল কিনে বাসায় নিয়ে আসতে।

সিরাজ মিয়া নির্লজ্জের মতো বলল, আমারে টেকা দেন। আমি দেইখ্যা শুইন্যা কিনব। বাজারে নানা পদের সাইকেল—সব সাইকেল ভাল না।

আন্টি বললেন, তোমাকে দেখে শুনে কিছুই কিনতে হবে না। তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে আস। আমি তোমার সাইকেল আর পাঁচ হাজার এক টাকা দিয়ে দেব। তুমি শরিফাকে নিয়ে যাবে। যদি শুনি এই মেয়ের উপর কোনো অত্যাচার হয়েছে আমি তোমার চামড়া খুলে ফেলব। গরুর চামড়া যেভাবে খোলে ঠিক সেইভাবে খোলা হবে।

সিরাজ মিয়া চা কেক খেয়ে হাসিমুখে চলে গেল। বলে গেল আগামী বুধবার সে তার বাবাকে নিয়ে আসবে। এবং সেদিনই বউ নিয়ে চলে যাবে।

আন্টির এই ব্যাপারটা আমার কী যে ভাল লাগল। আনন্দে আমার চোখে প্রায় পানি এসে গেল। আর শরিফা যে কী খুশি হল। এক্কেবারে পাগলের মতো আচরণ। এই হাসছে। এই কাঁদছে।

বুধবার সকালে শরিফাকে নিয়ে যাবে। আন্টি তার বরের জন্যে শুধু যে সাইকেল আনালেন তা না—একটা নতুন শার্ট কেনালেন। শরিফাকে দিলেন দু'টা শাড়ি—কানের দুল। শরিফা নিজেই দোকান থেকে রুপার নূপুর কিনে এনে পায়ে পরেছে। যখন হাঁটে ঝমঝম শব্দ হয়। খুব হাস্যকর ব্যাপার।

মঙ্গলবার আমাদের স্কুল ছুটি ছিল। বৌদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। আমি দুপুরে শুয়ে আছি— হঠাৎ স্বপ্নে দেখি—ছোট মা এসে আমাকে বলছেন, ফারজানা আমি বলেছিলাম না এই মেয়েটাকে শাস্তি দেব? ও চলে যাচ্ছে—যাবার আগে শাস্তি দিয়ে দেয়া দরকার, তাই না?

আমি চুপ করে রইলাম। ছোট মা বললেন—কথা বলছ না কেন? কী ধরনের শাস্তি দেয়া যায় বল তো। তুমি যেরকম শাস্তির কথা বলবে আমি ঠিক সেরকম শাস্তি দেব।

আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।

না, আমি ক্ষমা করব না। ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওর চোখ দু'টা গেলে দি—কী বল? উলের কাঁটা দিয়ে চোখ গেলে দি?

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তবে খুব চিন্তিত হলাম না। কারণ আমি স্বপ্ন বদলাতে পারি। আমি স্বপ্নটা বদলে ফেলব। কীভাবে বদলাব সেটাও ঠিক করে ফেললাম। বিকেলে গানের টিচার চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে আমি স্বপ্নটা বদলাব। গানের টিচার গেলেন সন্ধ্যাবেলা। আমি আমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই শরিফার গলা শুনতে পেলাম। সে ফিসফিস করে ডাকছে—আফা। ও আফা।

শব্দটা আসছে খাটের নিচ থেকে। আমি নিচু হয়ে দেখি শরিফা হামাগুড়ি দিয়ে খাটের নিচে বসে আছে। কুকুর যেভাবে বসে থাকে ঠিক সেভাবে শরিফা বসে আছে। কুকুরের মতো জিভ বের করে খানিকটা হাঁপাচ্ছেও। তাকে কেমন যেন ভয়ংকর দেখাচ্ছে। আমি বললাম, তুমি এখানে কী করছ? বের হয়ে আস। খাটের নিচ থেকে বের হয়ে আস।

সে বলল, আফাগো আমি বাঁইচ্যা নাই। আমারে মাইরা ফেলছে। ছাদে কাপড় আনতে গেছিলাম আমারে ধাক্কা দিয়া ফেলছে। আমি অনেক দূর চইল্যা যাব। যাওনের আগে আফনেরে শেষ দেখা দেখতে আইছি গো।

এই বলেই সে হামাগুড়ি দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসতে গেল। আমি চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। সবাই ছুটে এলেও তখনই আমার ঘরে ঢুকতে পারল না। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তাদের ঢুকতে হল দরজা ভেঙে।

আমি বলছি সন্ধ্যাবেলার ঘটনা। শরিফা যে সত্যি সত্যি মারা গেছে এই খবর জানা গেল রাত আটটার দিকে। আমাদের বাড়ির পেছনের দেয়ালে পড়ে তার মাথা থেঁতলে গিয়েছিল। কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছে। প্রচণ্ড শক্তিশালী কেউ—কারণ দেয়ালটা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে—ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে এত দূরে ফেলতে অনেক শক্তি দরকার।

আমার মাথা ধরছে। আমি আপাতত লেখা বন্ধ বরলাম।

এই মুহূর্তে আপনি আমার সম্পর্কে কী ভাবছেন বলব?

আমি অন্তর্যামী নই। অন্য একজনের মনের খবর আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি কী ভাবছেন তা আমি বলতে পারব। কারণ আপনার চিন্তার পদ্ধতি আমি জানি।

আপনি আমার লেখা পড়ছেন। যতই পড়ছেন আমার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠছে। ধারণাগুলি করছেন যুক্তির ভেতর দিয়ে। পুরোপুরি অংক কষা হচ্ছে দুই যোগ তিন হচ্ছে পাঁচ, কখনো ছয় বা সাত নয়। এ জাতীয় মানুষের মনের ভাব আঁচ করা মোটেই কঠিন না।

অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাপারে আপনার সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যেই আমি ছোট মা'কে দেখার কথা বলেছি ওমনি আপনি ভুরু কুঁচকেছেন। কঠিন কিছু শব্দ মনে মনে আওড়েছেন, যেমন স্কিজোফ্রেনিক, সাইকোপ্যাথ...তাই না?

শরিফার মৃত্যুর খবর শুনে আপনি খানিকক্ষণ ঝিম মেরে ছিলেন। তারপর সিগারেট ধরালেন। ধূমপায়ী মানুষরা সামান্যতম সমস্যার মুখোমুখি হলেই ফস করে সিগারেট ধরায়। ভাবটা এমন যে নিকোটিনের ধোঁয়া সব সমস্যা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সিগারেট ধরিয়ে মনে মনে বলেছেন—খুনটা কে করেছে? কারণ আপনার কাছে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে কিছু নেই। একটি মেয়ে খুন হয়েছে। ভূত প্রেত তাকে খুন করবে না। মানুষ খুন করবে। সেই মানুষটা কে?

ডিটেকটিভ গল্পে কী থাকে? একটা খুন হয়—আশেপাশের সবাইকে সন্দেহ করা হয়। সবচে কম সন্দেহ যাকে করা হয় দেখা যায় সেই খুন করেছে। গল্প উপন্যাসের ডিটেকটিভদের মতো আপনি যদি খুন রহস্যের সমাধান করতে চান তাহলে প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তি হচ্ছি আমি। এখন আপনি ভাবছেন মেয়েটা যে খুন করল তার মোটিভ কী? একটু চিন্তা করলে আপনি মোটিভও পেয়ে যাবেন। আমি আপনাকে সাহায্য করি?

ক. মেয়েটি মানসিকভাবে অসুস্থ। স্কিজোফ্রেনিক এবং সাইকোপ্যাথ। একজন অসুস্থ মানুষ যে কোনো অপরাধ করতে পারে। অসুস্থতাই তার মোটিভ।

খ. শরিফা মেয়েটি তার স্বামীর কাছে বুধবারে চলে যাবে। সে ছিল ফারজানার সঙ্গিনী। ফারজানা চাচ্ছিল মেয়েটিকে রেখে দিতে। খুন করা হয়েছে সে কারণে। অসুস্থ মেয়েটি ভাবছে শরিফা খুন হয়েছে ঠিকই কিন্তু চলে যায়নি—এই তো সে বাস করছে খাটের নিচে। কুকুরের মতো হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

মিসির আলি সাহেব আপনি কি তাই ভাবছেন? না আপনি তা ভাবছেন না। মানুষের মনের ভেতরে যে আরেকটি মন বাস করে আপনি সেই মন নিয়ে কাজ করেন। যুক্তির ক্ষমতা আপনি যেমন জানেন যুক্তির অসারতাও আপনি জানেন। দুই যোগ তিন পাঁচ হয় এটা আপনি যেমন জানেন ঠিক তেমনি জানেন মাঝে মাঝে সংখ্যাকে যুক্ত করা যায় না। যোগ চিহ্ন কোনো কাজে আসে না। এই তথ্য জানেন বলেই—আমি আমার জীবনের বইটি আপনার সামনে খুলে দিয়েছি। আপনাকে পড়তে দিয়েছি।

আপনি হয়ত ভাবছেন—এতে লাভ কী? মেয়েটির সঙ্গে তো আমার কখনো দেখা হবে না। সে তার ঠিকানা দেয়নি। ঠিকানা দেইনি এটা ঠিক না। ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা এমনভাবে দিয়েছি যেন ইচ্ছা করলেই আপনি বের করতে পারেন আমাদের বাড়িটা কোথায়। ধানমণ্ডি থানার

ওসিকে আন্টি টেলিফোন করতে চাচ্ছেন তা থেকে আপনি কি অনুমান করতে পারছেন না আমাদের বাড়ি ধানমণ্ডিতে? টু ইউনিট বাড়ি এটিও বলেছি। আরো অনেক কিছু বলেছি। থাক এখন টেলিফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি। যদি মনে করেন আমার সঙ্গে কথা বলা দরকার টেলিফোন করবেন। নাম্বারটা হচ্ছে ষষ্ঠ মৌলিক সংখ্যা, পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা, চতুর্থ মৌলিক সংখ্যা, তৃতীয় মৌলিক সংখ্যা। সংখ্যাগুলির আগে আট বসাবেন।

সরাসরি টেলিফোন নাম্বার লিখে দিলে হত। সেটা আপনার মনে থাকত না। এইভাবে বলায় আর কখনো ভুলবেন না।

৮, (ষষ্ঠ মৌলিক সংখ্যা — ১১), (পঞ্চম মৌলিক সংখ্যা — ৭), (চতুর্থ মৌলিক সংখ্যা — ৫), (তৃতীয় মৌলিক সংখ্যা — ৩)

অর্থাৎ আমার টেলিফোন নাম্বার হচ্ছে—

৮১১৭৫৩

আমাদের টেলিফোন নাম্বারটা রহস্যময় না? আমাদের বাসায় তিনটা টেলিফোন আছে। সবচে রহস্যময় নাম্বারটা আপনাকে দিলাম। এই টেলিফোন বাবা আমাকে দিয়েছেন। নাম্বারটা আমি কাউকে দেইনি। কাজেই আমার টেলিফোনে কেউ আমাকে পায় না। অথচ আমি অন্যদের পাই। ব্যাপারটা মজার না? তোমরা আমাকে খুঁজে পাবে না—কিন্তু আমি ইচ্ছা করলেই তোতাদের পেয়ে যাব।

মাঝে মাঝে আমার যখন ইনসমনিয়ার মতো হয়—আমি এলোমেলোভাবে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরাতে থাকি। অচেনা কোনো একটা জায়গায় রিং বেজে ওঠে। সদ্য ঘুম ভাঙা গলায় কেউ একজন ভারি গলায় বলে—কে?

আমি করুণ গলায় বলি, আমার নাম ফারজানা।

কাকে চাই?

কাউকে চাই না। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব, প্লিজ টেলিফোন রেখে দেবেন না। প্লিজ! প্লিজ! এই সময় পুরুষ মানুষরা যে কি অদ্ভুত আচরণ করে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। শতকরা সত্তর ভাগ পুরুষ প্রেম করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পরে। অতি মিষ্টি গলায় উত্তর দিতে থাকে। শতকরা দশ ভাগ কুৎসিত সব কথা বলে। অতি নোংরা, অতি কুৎসিত সব বাক্য। গলার স্বর থেকে মনে হয় মধ্যবয়স্ক পুরুষরা এই নোংরামিগুলি বেশি করেন। এই পুরুষরাই হয়ত স্নেহময় পিতা, প্রেমময় স্বামী। অফিসে আদর্শ অফিসার। কী অদ্ভুত বৈচিত্রের ভেতরেই না আমাদের জীবনটা কাটে।

আমরা সবাই ড. জেকেল এবং মিস্টার হাইড। আপনিও কিন্তু তাই— একদিকে অসম্ভব যুক্তিবাদী মানুষ অন্যদিকে...যুক্তিহীন জগতেও চরম আস্থা আছে এমন একজন। তাই না? খুব ভুল কি বলেছি?

৬

একটি তরুণী মেয়ে বাড়ির ছাদ থেকে পা ফসকে পড়ে গিয়ে মরে গেছে। ঘটনা খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়। বয়স্কা মহিলা পা ফসকে পড়ে গেছেন— বিশ্বাসযোগ্য, অল্প বয়েসী মেয়ে পড়ে গেছে এটিও বিশ্বাসযোগ্য। তরুণী মেয়ের অপঘাতে মৃত্যু মানেই নানান প্রশ্ন। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি কাজের মেয়ে হয়।

আমার বাবাকে নিশ্চয়ই এইসব ঝামেলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছুদিন তাঁকে খুব চিন্তিত দেখেছি। তারপর এক সময় তিনি চিন্তামুক্ত হয়েছেন। বিত্তবানরা খুব সহজেই চিন্তামুক্ত হতে পারেন। তাদের সামান্য অর্থ ব্যয় হয়—এই যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরিফার বাবাকে কিছু টাকা দেয়া হল—কত আমি জানি না। নিশ্চয়ই সে যত আশা করেছিল তারচে বেশি। কারণ সেই বেচারা টাকা হাতে নিয়ে আমাদের সবার মঙ্গল কামনা করে দীর্ঘ মোনাজাত শুরু করল। মোনাজাতের বিষয়বস্তু হচ্ছে—আমাদের মতো ভালমানুষ সে তার জীবনে দেখেনি। আমাদের কাছে তার মেয়ে খুব সুখে ছিল। কপালে সুখ সইল না।

শরিফার স্বামীও বেশ কিছুদিন ঘোরাঘুরি করল। বেচারার দাবি সামান্য। যে সাইকেলটা তার জন্যে কেনা হয়েছিল সেই সাইকেল যেন তাকে দিয়ে দেয়া হয়। সম্ভব হলে পাঁচ হাজার এক টাকা। এই টাকাটা তো আইনত তারই প্রাপ্য—ইত্যাদি।

আন্টি তাকে ভাগিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন—কখনো যেন তাকে গেটের ভেতর ঢুকতে না দেয়া হয়।

সব ঝামেলা মিটে যাবার পর বাবা এক সন্ধ্যায় আমাকে ডাকলেন। বাবার পরিচয় আপনাকে দেয়া হয়নি—এখন দিচ্ছি। তিনি মোটামুটি কঠিন ধরনের মানুষ। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। শান্ত—ধীর, স্থির। তিনি খুব রেগে গেলেও সহজ ভঙ্গিতে কথা বলতে পারেন। পেশায় তিনি পাইলট। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইন্সের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। আমার সব সময় মনে হয়েছে পাইলট না হয়ে বাবা যদি ইউনিভার্সিটির অংকের টিচার হতেন তাঁকে খুব মানাত। বই পড়া তাঁর প্রধান শখ। বেশিরভাগ সময় আমি তাঁর হাতে বই দেখেছি। হাল্কা ধরনের বই না—বেশ সিরিয়াস ধরনের বই।

বাবা তাঁর স্টাডিতে একা বসেছিলেন। তাঁর সামনে একটা বাটিতে খেজুর গুড় টুকরো করা। শীতকালে খেজুর গুড় তাঁর প্রিয় একটা খাবার। প্রায়ই দেখেছি গল্পের বই পড়তে পড়তে তিনি খেজুর গুড়ের টুকরো মুখে দিচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন—মা বস।

আমি তাঁর সামনে বসলাম।

কেমন আছ মা?

আমি বললাম, ভাল।

শরিফা মেয়েটি এইভাবে মারা গেল, নিশ্চয়ই তোমার মন খুব খারাপ?

আমি বললাম, হ্যাঁ মন খারাপ।

বাবা ইতস্তত করে বললেন, তোমাকে কিন্তু কান্নাকাটি করতে দেখিনি। আমার কাছে তোমাকে বেশ স্বাভাবিকই মনে হয়েছে।

আমি বুঝতে পারলাম না বাবা ঠিক কী বলতে চাচ্ছেন। তাঁর কথা বলার মধ্যে জেরা করার ভাবটা প্রবল। যেন আমি কিছু গোপন করার চেষ্টা করছি বাবা তা বের করে ফেলতে চাচ্ছেন।

শরিফা যে সন্ধ্যায় মারা গেল—সেই সন্ধ্যায় তুমি কি ছাদে গিয়েছিলে?

না।

সেদিন ছাদে যাওনি?

না।

আমি যতদূর জানি—ছাদ তোমার খুব প্রিয় জায়গা। বেছে বেছে ঐ দিনই ছাদে যাওনি কেন?

ঐ দিন যেতে ইচ্ছে করেনি।

তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করে চিৎকার করে কাঁদছিলে। দরজা ভেঙে তোমাকে বের করা হয়। তুমি প্রথম যে কথাটি তখন বল তা হচ্ছে শরিফা মারা গেছে। তাই না?

হ্যাঁ।

সে যে মারা গেছে তোমার তো জানার কথা না। কারণ কেউই জানে না। তুমি জানলে কীভাবে?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বাটিটা আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন—নাও গুড় খাও। আমি এক টুকরো গুড় নিয়ে মুখে দিলাম। বাবা শান্ত গলায় বললেন, তুমি রাগ করে, কিংবা নিজের অজান্তে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও নি তো?

না।

অনেক সময় খেলতে গিয়েও এরকম হয়। হয়ত হাসতে হাসতে ধাক্কা দিয়েছ—সে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেছে। তোমার কোনো দোষ ছিল না।

না।

আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

ভাল।

গান কেমন হচ্ছে?

ভাল।

এবারের গানের টিচার কেমন?

ভাল।

গান কি তুলেছ না এখনো সারে গামা করে যাচ্ছ?

একটা গান তুলেছি।

কী গান?

নজরুলগীতি।

গানের লাইনগুলি কী?

পথ চলিতে যদি চকিতে—গাইব?

না থাক। আরেকদিন শুনব।

আমি কি এখন চলে যাব?

আচ্ছা যাও।

আমি উঠে চলে এলাম। বাবা ভুরু কুঁচকে বইয়ের পাতা উল্টাতে লাগলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাস করেননি এটা বোঝা যাচ্ছে। তিনি যে আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন তাও বুঝতে পারছি। খুব অল্প বয়সেই আমি আসলে বেশি বেশি বুঝতে শিখেছিলাম। বেশি বুঝতে পারাটা এক ধরনের দুর্ভাগ্য। যারা কম বুঝতে পারে—এই পৃথিবীতে তারাই সবচে সুখি। বোকা মানুষরা কখনো আত্মহত্যা করে না।

বাবা আমার কথা বিশ্বাস না করলেও আন্টি করলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে নিজে থেকে তাঁকে আমার কিছু বলতে হল না। তিনি আপনাতেই সব বুঝতে পারলেন। ঘটনাটা এরকম—রাতে তিনি আমার সঙ্গে ঘুমুতে এসেছেন (শরিফার মৃত্যুর পর তিনি প্রতি রাতেই আমার সঙ্গে ঘুমুতেন)। বাতি নিভিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে মৃদু গলায় গল্প শুরু করলেন—তাদের গ্রামের বাড়ির গল্প। বাড়ির পেছনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। তিনি পাকা পেয়ারার খোঁজে গাছে উঠেছেন। হঠাৎ দেখলেন গাছের ডাল পেঁচিয়ে একটা সাপ। সাপটার গায়ের রঙ অবিকল পেয়ারা গাছের ডালের মতো। সাপটা তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল না—উল্টো তাঁর দিকে আসতে শুরু করল...।

এই পর্যায়ে আন্টি গল্প থামিয়ে দিলেন। আমি বললাম, কী হয়েছে?

আন্টি বললেন, ফোঁপাচ্ছে কে? আমি ফোঁপানির শব্দ শুনছি। তুমি কী শুনছ?

শব্দ আমিও শুনছিলাম। ফোঁপাচ্ছে শরিফা। খাটের নিচে বসে মাঝে মধ্যেই সে ফোঁপানির মতো শব্দ করে। আমি আন্টির প্রশ্নের জবাব দিলাম না। চুপ করে রইলাম। আন্টি বললেন, মনে হচ্ছে খাটের নিচে কেউ বসে আছে। ফোঁপাচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না?

না।

আমি পরিষ্কার শুনছি—পচা গন্ধও পাচ্ছি? তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

না।

আন্টি উঠে বসলেন। টেবিল ল্যাম্প জ্বালালেন। বিছানা থেকে নেমে তাকালেন খাটের নিচে। আমি তাকিয়ে রইলাম আন্টির মুখের দিকে। আমি দেখলাম ভয়ে এবং আতঙ্কে হঠাৎ আন্টির মুখ ছোট হয়ে গেল। তিনি বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। কী বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না। আন্টি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন। তাঁর ফর্সা গাল হয়েছে টক টকে লাল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আন্টিকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। আন্টি চাপা গলায় বললেন—কে কে?

আম্মা আমি শরিফা।

শরিফা!

জে আম্মা। আমি এইখানে থাকি।

শরিফা।

জে আম্মা। আমি হাঁটা চলা কলতে পারি না—এইখানে থাকি। আমারে বিদায় দিয়েন না আম্মা। আমার যাওনের জায়গা নাই...।

আন্টি উঠে দাঁড়ালেন। টলতে টলতে খাটের কাছে এসে খাটের উঠলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়লেন। আমি বললাম, কী হয়েছে?

আন্টি জড়ান গলায় বললেন, কিছু না। তুমি ঘুমাও।

আমি বললাম, খাটের নিচে কিছু দেখেছেন আন্টি?

তিনি বললেন, না। তুমি ঘুমাও। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। আন্টি সম্ভবত সারা রাতই জেগে রইলেন। পরদিন ভোরে জেগে উঠে দেখি আন্টি হাঁটু মুড়ে বসে আছেন। ঘরে তখনো টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আন্টির চোখ জ্বল জ্বল করছে। এক রাতেই তাঁর চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। আন্টি ক্লান্ত গলায় বললেন, ফারজানা তুমি কি রান্নাঘরে গিয়ে বলে আসবে আমাকে এক কাপ চা দিতে?

আমি বললাম, আন্টি আপনার কি শরীর খারাপ করেছে? তিনি বললেন, না। শরীর ভাল আছে।

আন্টি বিছানায় বসে চা খেলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হল। আমাকে অবশ্যি তিনি কিছুই বললেন না। আমি সহজ স্বাভাবিকভাবেই হাত মুখ ধুয়ে নাস্তা করলাম। স্কুলে চলে গেলাম। আন্টি সারা দিন আমার ঘরেই থাকলেন। ঘর থেকে বেরুলেন না।

বাবা সে সময় দেশে ছিলেন না। বছরে একবার পাইলটদের নতুন করে কী সব শেখায়। রিভিয়্যু হয়। বাবা সেই ট্রেনিং-এ তখন আমস্টারডামে। বাড়িতে আমি আর আন্টি। আন্টি আমার ঘরেই থাকেন। তিনি রাতে একেবারেই ঘুমান না। আমার কিন্তু ঘুম পায়। আগের অনিদ্রা রোগ তখন সেরে গেছে। বিছানায় যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে বাথরুম পেলে কিংবা পানির পিপাসা পেলে ঘুম ভাঙে। আমি দেখি আন্টি মেঝেতে বসে আছেন। তাঁর বসার ভঙ্গি শরিফার বসার ভঙ্গির মতোই। তিনি মৃদু স্বরে শরিফার সঙ্গে কথা বলেন।

শরিফা!

জি আম্মা?

কী করছ?

কিছু করনের নাই আম্মা। বইসা আছি।

এখান থেকে চলে যাও।

কই যামু? যাওনের জায়গা নাই। পথঘাটও চিনি না।

চাও কী তুমি?

কিছু চাই না। কী চামু?

দিনের বেলা তোমাকে দেখি না কেন? দিনে তুমি কোথায় যাও?

জানি না আম্মা। কী হইতেছে আমি কিছুই বুঝি না। দিশা পাই না।

তোমার ক্ষিধা হয়?

জে হয়। জবর ভুখ লাগে—কিন্তু আম্মা খাওন নাই। আমারে কে খাওন দিব?

এখন ক্ষিধে হয়েছে?

জে হয়েছে।

বিস্কুট আছে খাবে? বিস্কুট দেব?

জে না। আফনাগো খাওন আমি খাইতে পারি না।

তুমি কি খুব কষ্টে আছ?

বুঝি না আম্মা। কিচ্ছু বুঝি না। দিশা পাই না।

তুমি যে মারা গেছ তা কি জান?

জে জানি।

কেউ কি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?

জে।

কে ফেলেছে?

ছোট আফা ফেলছে। ছোট মানুষ, বুঝে নাই। তার ওপরে রাগ হইয়েন না আম্মা।

ফারজানা তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে?

জে।

তুমি কি তাকে দেখেছ ধাক্কা দিয়ে ফেলতে?

জে না। পিছন থাইক্যা ধাক্কা দিছে। অন্য কেউও হইতে পারে।

অতি দ্রুত আন্টির শরীর খুব খারাপ করল। তিনি একেবারেই ঘুমুতে পারেন না। গাদা গাদা ঘুমের ওষুধ খান—তারপরেও জেগে থাকেন। সারাক্ষণ নিজের মনে বিড়বিড় করে কথা বলেন। অর্থহীন এলোমেলো সব কথা। হঠাৎ হাসতে শুরু করেন সেই হাসি কিছুতেই থামে না। আবার যখন কাঁদতে থাকেন—সেই কান্নাও চলতে থাকে।

বাবা যখন দেশে ফিরলেন তখন আন্টি পুরোপুরি উম্মাদ। কাউকেই চিনতে পারেন না। আমাকেও না। আন্টির চেহারাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মুখ শুকিয়ে মিসরের মমিদের মতো হয়ে গেছে। দাঁত বের হয়ে এসেছে। সারা শরীরে বিকট গন্ধ। বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। আন্টির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল। চিকিৎসায় কোনো লাভ হল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর পাগলামি বাড়তে থাকল। বাবাকে দেখলেই তিনি ক্ষেপে উঠতেন। একদিন সকালে পাউরুটি কাটার ছুরি নিয়ে তিনি বাবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারত। ভাগ্যক্রমে ঘটেনি—শুধু বাবার পিঠ কেটে রক্তারক্তি হয়ে গেল।

আন্টিকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা হল। আন্টির বাবা এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন। সেখানে থেকে তিনি কিছুটা সুস্থ হলেন। তখন তাঁকে আবার আমাদের এখানে আনা হল। তিনি আবারো অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে তাঁদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হল।

মাঝে মধ্যে আমি ওনাকে দেখতে যেতাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন না। কঠিন চোখে তাকিয়ে থাকতেন। আন্টিদের বাড়ির কেউ চাইত না যে আমি যাই। আমি যাওয়া ছেড়ে দিলাম।

শরিফার প্রসঙ্গে আসি। শরিফার হাত থেকে আমি খুব সহজে মুক্তি পেয়ে যাই। শরিফাকে আমি এক রাতে বলি—শরিফা তোমার কি উচিত না তোমার স্বামীর সঙ্গে গিয়ে থাকা?

শরিফা বলল, জে উচিত।

তুমি তার কাছে চলে যাও।

হে কই থাকে জানি না আফা।

আমি তাকে এনে দেব?

জে আফা।

আমি শরিফার স্বামীকে খবর পাঠালাম সে যেন এসে তার সাইকেল নিয়ে যায়। সন্ধ্যার পর যেন আসে।

সে খুশি মনে সাইকেল নিতে এল। সাইকেলের সঙ্গে সে অন্য কিছুও নিয়ে গেল। মিসির আলি সাহেব—আপনার জন্যে বিস্ময়কর খবর হল— মাসখানেক পরে আমি খবর নিয়ে জানতে পারি শরিফার স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তার আত্মীয়-স্বজনরা তাকে পাবনা মানসিক হাতপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়েছিল। ভর্তি করাতে না পেরে শহরেই তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে।

৭

মিসির আলি সাহেব,

এই সম্বোধন বারবার করতে আমার কুৎসিত লাগছে। নামের শেষে সাহেব আবার কী? নামের শেষে সাহেব লাগালেই মানুষটাকে অনেক দূরের মনে হয়। দূরের মানুষের কাছে কি এমন অন্তরঙ্গ চিঠি লেখা যায়? একবার ভেবেছিলাম 'স্যার' লিখি। তারপর মনে হল—স্যার তো সাহেবের মতোই দূরের ব্যাপার। মিসির আলি চাচা লিখব? না, তাও সম্ভব না। মিসির আলি এমনই এক চরিত্র যাকে চাচা বা মামা ডাকা যায় না। গৃহী কোনো সম্বোধন তাঁকে মানায় না। দেখলেন আপনাকে আমি কত শ্রদ্ধা করি? না দেখেই কোনো মানুষকে এতটা শ্রদ্ধা করা কি ঠিক?

থাকুক তত্ত্ব কথা—নিজের গল্পটা বলে শেষ করি। অনেকদূর তো বলেছি—আপনি কি বুঝতে পারছেন যা বলছি সব সত্যি বলছি? অর্থাৎ আমি যা সত্যি বলে বিশ্বাস করছি তাই বলছি।

যতটুকু পড়েছেন সেখান থেকে কি বুঝতে পারছেন যে বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভাল না।

বাবা আমাকে পছন্দ করেন না।

কেন করেন না, আমি জানি না। আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি। পছন্দ করেন না মানে এই না যে তিনি সারাক্ষণ ধমকাধমকি করেন। এইসব কিছুই না। মাঝে মাঝে গল্প করেন। লেজার ডিস্কে ভাল ছবি আনলে হঠাৎ বলেন, মা এসো ছবি দেখি। জন্মদিনে খুব দামি গিফট দেন। যতবারই বাইরে যান আমার জন্যে কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। তারপরেও আমি বুঝতে পারি বাবা আমাকে তেমন পছন্দ করেন না। মেয়েরা এইসব ব্যাপার খুব সহজে ধরতে পারে। কে তাকে পছন্দ করছে কে করছে না—এই পর্যবেক্ষণ শক্তি মেয়েদের সহজাত। এই বিদ্যা তাকে কখনো শিখতে হয় না। সে জন্মসূত্রে নিয়ে আসে। ঐ যে কবিতা-

"এ বিদ্যা শিখে না নারী আসে আপনাতে"

আন্টি অসুস্থ হয়ে যাবার পর বাবা যেন কেমন কেমন চোখে আমাকে দেখতে লাগলেন। যেন আমিই আন্টিকে অসুস্থ করেছি। আমি যেন ভয়ংকর কোনো মেয়ে—আমার সংস্পর্শে যে আসবে সেই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়বে।

বাবার দুশ্চিন্তার কারণও আছে। ছোট মা অসুস্থ হবার পর আমার ঘরেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন। তিনি ঘুমের ওষুধ খেয়ে আমার বিছানাতে শুয়ে মারা যান। যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর তিনি ঘুমের ওষুধ খান— একটা চিঠি লেখেন। তারপর আমার সঙ্গে ঘুমুতে আসেন। আমি ভোরবেলা জেগে উঠে দেখি তিনি কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন—চোখ আধা খোলা। চোখের সাদা অংশ চকচক করছে। মুখ খানিকটা হাঁ করা। হাত পা হিম হয়ে আছে। আমার তখন খুব কম বয়স।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরেও আমি বুঝলাম তিনি মারা গেছেন। আমি ভয় পেলাম না। চিৎকার দিলাম না। শান্ত ভঙ্গিতেই বিছানা থেকে নামলাম। দরজা ভেতর থেকে ছিটকিনি দেয়া। আমি চেয়ারে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি খুলে বাবার ঘরে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাবাকে বললাম, ছোট মা মারা গেছেন।

বাবা তখন কফি খাচ্ছিলেন। তিনি খুব ভোর বেলা ওঠেন। নিজেই কফি বানিয়ে খান। তিনি মনে হল আমার কথা বুঝতে পারলেন না, কাপ নামিয়ে রেখে বললেন—মা, কী বললে?

আমি আবারো বললাম, ছোট মা মারা গেছেন।

বাবা দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। এক পলক ছোট মা'কে দেখলেন।

তাঁর কপালে হাত রাখলেন। তারপর রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

ছোট মা'র পর শরিফা মারা গেল। সেও থাকত আমার ঘরে। সেও কি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল? আমরা যদি ধরে নেই কেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেনি তাহলে বুঝতে হবে শরিফা নিজেই ছাদ থেকে লাফ দিয়েছে। যে মেয়ে পরদিন স্বামীর কাছে যাবে সে এই কাণ্ড কখন করবে? মানসিকভাবে অসুস্থ হলেই করবে। শরিফাও তাহলে অসুস্থ ছিল।

আন্টির অসুস্থতা তো চোখের সামনে ঘটল। আমার ঘরেই তার শুরু। কাজেই বাবা যদি ভেবে থাকেন প্রতিটি অসুস্থতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে তাহলে বাবাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না।

এক রাতে, খাবার টেবিলে তিনি বললেন—নিশা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। আমি বললাম, বল।

বাবা বললেন, খাবার টেবিলে বলতে চাচ্ছি না, খাওয়া শেষ করে আমার ঘরে আস। দু'জন কথা বলি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তোমার বয়স এখন কত?

আমি বললাম, অক্টোবরে পনেরো হবে।

তাহলে তো তুমি অনেক বড় মেয়ে। তোমার বয়স পনেরো হতে যাচ্ছে তা বুঝতে পারিনি।

আমি হাসলাম। বাবা বললেন, তুমি যে খুব সুন্দর হয়েছ তা কি তুমি জান?

না।

কেউ তোমাকে বলেনি? তোমার বন্ধু বান্ধবরা?

না। আমার কোনো বন্ধুও নেই।

নেই কেন?

কারো সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয় না।

হয় না কেন?

আমি তো জানি না কেন হয় না। মনে হয় আমাকে কেউ পছন্দ করে না।

তোমাকে পছন্দ না করার তো কোনো কারণ নেই।

তুমি নিজেই আমাকে পছন্দ কর না। অন্যদের দোষ দিয়ে কী হবে?

আমি তোমাকে পছন্দ করি না?

না, কর না।

তোমার এই ধারণা হল কেন?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবাও চুপ করে গেলেন। মনে হচ্ছে তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়ে গেছেন। অস্বস্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিস্ময়বোধ। অতি কাছের একজনকে নতুন করে আবিষ্কারের বিস্ময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত দশটার দিকে বাবার ঘরে গেলাম। ইচ্ছে করে খুব সেজেগুজে গেলাম। লাল পাড়ের হাল্কা সবুজ একটা শাড়ি পরলাম। কপালে টিপ দিলাম। আয়নায় নিজেকে দেখে নিজেই চমকে গেলাম—কী সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়ির মেয়ে। কনের ছোট বোন।

বাবা আমার সাজগোজ দেখে আরো ভড়কে গেলেন। বিব্রত গলায় বললেন, মা বোস। তোমাকে তো চেনা যাচ্ছে না।

আমি বসতে বসতে বললাম, তোমার জরুরি কথা শুনতে এসেছি।

বাবা বললেন, এত সেজেছ কেন?

এমনি সাজলাম। মাঝে মাঝে আমার সাজতে ইচ্ছা করে।

আমি আগে কখনো তোমাকে সাজতে দেখিনি।

আমাকে কি সুন্দর লাগছে না বাবা?

অবশ্যই সুন্দর লাগছে। কপালের টিপটা কি নিজেই এঁকেছ?

আমি বললাম, বাবা তুমি নানান কথা বলে সময় নষ্ট করছ। কী বলবে সরাসরি বলে ফেল। অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই।

অস্বস্তি বোধ করার কথা আসছে কেন?

তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুমি অস্বস্তি বোধ করছ। তুমি বরং এক কাজ কর, দুই পেগ হুইস্কি খেয়ে নাও—এতে তোমার ইনহিবিশন কাটবে। যা বলতে চাচ্ছ সরাসরি বলে ফেলতে পারবে।

হুইস্কি খেলে ইনহিবিশন কাটে এই তথ্য জানলে কোথেকে?

গল্পের বই পড়ে। তোমার কাছ থেকে আমার গল্পের বই পড়ার অভ্যাস হয়েছে। আমিও দিন রাত বই পড়ি।

এটা একটা ভাল অভ্যাস।

বাবা, তোমার কথাটা কী?

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ দুম করে বললেন, তোমার ভেতর কিছু রহস্য আছে। রহস্যটা কী?

আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না বাবা। তুমি কোন রহস্যের কথা বলছ? সব মানুষের মধ্যেই তো রহস্য আছে।

বাবা বললেন, সব মানুষের মধ্যে রহস্য আছে ঠিকই। তবে সেই সব রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়। তোমার রহস্য ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি।

আমি এখনো তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। আলমারি খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন।

মিসির আলি সাহেব, আপনাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয়নি। লজ্জা লাগছিল বলেই বলতে পারিনি—আমার বাবা প্রচুর মদ্যপান করেন। এটা তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। আমার ধারণা মা যে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা যান তার কারণ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে বাবা অ্যাকসিডেন্ট করেন। আমি অবশ্যি এসব নিয়ে বাবাকে কখনো কোনো প্রশ্ন করিনি। আরেকটা কথা আপনাকে বলা হয়নি—ছোট মা বাবার কাছ থেকে মদ্যপানের অভ্যাস করেছিলেন। এই অংশটি এতক্ষণ গোপন রাখার জন্যে আপনি দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।

বাবা বললেন, নিশি শোন। নিজের সম্পর্কে তোমার কী ধারণা? তুমি নিজে কি মনে কর তোমার চরিত্রে কোনো অস্বাভাবিকতা আছে?

না।

তুমি নিশ্চিত যে তোমার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই।

আমি নিশ্চিত।

তোমার আশেপাশে যারা থাকে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে কেন?

আমি জানি না। তুমিও তো আমার আশেপাশেই থাক—তুমি তো অস্বাভাবিক আচরণ কর না।

তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করছ কেন?

তর্ক করছি না। তুমি প্রশ্ন করছ আমি তার জবাব দিচ্ছি।

আমি একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে তোমাকে দেখাতে চাই।

বেশ তো, দেখাও।

আগামী সপ্তাহে আমি মেরিল্যান্ডে যাচ্ছি। আমাদের সুপারসনিকের ওপর শর্ট ট্রেনিং হবে। তুমিও চল। সাইকিয়াট্রিস্ট তোমাকে দেখবে।

আচ্ছা।

মা ঠিক করে বল, তোমার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই?

না।

তুমি তোমার ছোট মা'কে মাঝে মাঝে দেখতে পাও এটা কি সত্যি? তোমার আন্টি আমাকে বলেছিল।

হ্যাঁ সত্যি।

তুমি শরিফা মেয়েটিকেও দেখতে পাও।

আগে পেতাম, এখন পাই না।

তোমার কাছে কি মনে হয় না—এই ব্যাপারগুলি অস্বাভাবিক?

না। কারণ শরিফাকে নীতু আন্টিও দেখেছেন।

হ্যাঁ, সে আমাকে বলেছে। শরিফাকে এখন আর তুমি দেখতে পাও না?

না, সে তার স্বামীর কাছে চলে গেছে। তবে আমি চাইলে সে আবার চলে আসবে।

বুঝিয়ে বল।

আমি স্বপ্নে যা দেখি তাই হয়। স্বপ্নে কী দেখতে চাই এটাও আমি ঠিক করতে পারি। কাজেই আমি যদি ভাবি স্বপ্নে দেখছি শরিফা চলে এসেছে তাহলে সে চলে আসবে। এবং তখন তুমি চাইলে তুমিও তাকে দেখতে পাবে।

এ ব্যাপারটাও তোমার কাছে নরমাল মনে হয়? অস্বাভাবিক মনে হয় না?

না, আমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। আমার মনে হয় সব মানুষেরই ইচ্ছাপূরণ ধরনের স্বপ্ন দেখার ক্ষমতা আছে। কী করে সেই স্বপ্নটা দেখতে হয় তা তারা জানে না বলে স্বপ্ন দেখতে পারে না।

নিশি!

জি।

তুমি এক কাজ কর। শরিফা মেয়েটিকে নিয়ে এসো। আমি তাকে দেখতে চাই।

আচ্ছা।

ক'দিন লাগবে তাকে আনতে?

বেশি দিন লাগবে না। স্বপ্নটা দেখতে পেলেই সে চলে আসবে।

যত তাড়াতাড়ি পার তাকে নিয়ে এসো কারণ মেরিল্যান্ড যাবার আগে আমি তাকে দেখতে চাই।

আচ্ছা।

তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

খুব ভাল হচ্ছে।

গান শেখা কেমন হচ্ছে?

গান শেখাও ভাল হচ্ছে।

তোমার গানের স্যারের সঙ্গে ক'দিন আগে কথা হল। তিনি তোমার গানের গলার খুব প্রশংসা করলেন। তোমার নাকি কিন্নর কণ্ঠ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব গানের স্যাররাই তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের গানের গলা সম্পর্কে এ জাতীয় কথা বলে। আমার গানের গলা ভাল না।

আমি তোমার গান একদিন শুনতে চাই।

এখন গাইব?

এখন গাইতে হবে না।

তোমার জরুরি কথা বলা কি শেষ হয়েছে বাবা?

হুঁ।

আমি চলে যাব?

হ্যাঁ যাও।

শরিফা মেয়েটি এলে আমাকে খবর দিও।

আচ্ছা।

আমি আমার ঘরে এসে ঘড়ি দেখলাম, এগারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। আমি রাত সাড়ে এগারোটার সময় আবার বাবার ঘরে গেলাম। তিনি সম্ভবত ক্রমাগতই মদ্যপান করে যাচ্ছেন। তাঁর চোখ খানিকটা লাল। মুখে বিবর্ণ ভাব। এমনিতে তিনি সিগারেট খান না—আজ খুব সিগারেট খাচ্ছেন। ঘর ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে আছে। বাবা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার মা?

আমার ঘরে এসো।

কেন?

শরিফাকে দেখতে চেয়েছিলে—শরিফা এসেছে।

তুমি না ডাকতেই চলে এসেছে?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা বললেন, শরিফা সত্যি এসেছে?

হ্যাঁ।

কী করছে?

আমার খাটের নিচে বসে আছে।

বাবা হাসলেন। অবিশ্বাসী মানুষের হাসি। বাবা বললেন, তুমি কি তার সঙ্গে কথাও বল?

হ্যাঁ বলি।

সে কি আমার সঙ্গে কথা বলবে?

জানি না। বলতেও পারে।

আমার ধারণা সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না। আমি তাকে দেখতেও পাব না। কারণ শরিফা নামের মেয়েটি খাটের নিচে বসে নেই। তোমার মাথার ভেতর একটা ঘর আছে, যে ঘর অবিকল তোমার শোবার ঘরের মতো। সেই ঘরের খাটের নিচে সে বসে আছে। কাজেই তাকে দেখতে পাবার কোনো কারণ নেই। বুঝতে পারছ?

পারছি।

কাজেই মেয়েটিকে দেখতে যাওয়া অর্থহীন।

তুমি যাচ্ছ না?

না।

আমি ফিরে আসছি বাবা পেছন থেকে ডাকলেন—নিশি, দাঁড়াও আসছি। আমি দাঁড়ালাম। বাবার মদ্যপান আজ মনে হয় একটু বেশিই হয়েছে। তিনি সহজভাবে হাঁটতেও পারছেন না। সামান্য টলছেন। আমি বললাম, বাবা তোমার হাত ধরব? তিনি বললেন, না। আই অ্যাম জাস্ট ফাইন।

বাবা আমার ঘরে ঢুকলেন। ঘরে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে—মোটামুটি আলো আছে। বাবা নিচু হয়ে খাটের নিচে তাকালেন। আমি তাকিয়ে রইলাম বাবার দিকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য

করলাম—বাবার শান্ত ভঙ্গি বদলে যাচ্ছে—তাঁর চোখে ভয়ের ছায়া। সেই ছায়া গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। তিনি হতভম্ব চোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন খটের নিচে। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। আমি বললাম, বাবা কিছু দেখতে পাচ্ছ?

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। অদ্ভুত এক ধরনের শব্দ করতে লাগলেন। যেন তাঁর বুকে বাতাস আটকে গেছে তিনি তা বের করতে পারছেন না। খুব যারা বুড়ো মানুষ তারা এ ধরনের শব্দ করে। তবে নিজেরা সেই শব্দ শুনতে পায় না। অন্যরা শুনতে পায়।

আমি বাবাকে হাত ধরে টেনে তুললাম। তাঁকে ধরে ধরে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলাম। তিনি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন—প্রচুর মদ্যপান করেছি। আমার আবার লিমিট পাঁচ পেগ, সেখানে আট পেগ খেয়েছি তো—তাই হেলুসিনেশন হচ্ছে। খাটের নিচে কিছুই ছিল না। কিছুই না। অন্ধকার তো, আলো ছায়াতে মানুষের মতো দেখাচ্ছে। টর্চ লাইট নিয়ে গেলে কিছুই দেখব না।

টর্চ লাইট নিয়ে দেখতে চাও বাবা?

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন—না।

পরের সপ্তাহে আমি বাবার সঙ্গে মেরিল্যান্ড চলে গেলাম। মিসেস জেন ওয়ারেন নামের এক মহিলা সাইকিয়াট্রিস্ট আমার চিকিৎসা শুরু করলেন। মিসেস জেন ওয়ারেন এম ডি-এর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। আমেরিকান বৃদ্ধা মহিলারা খুব সাজ গোজ করেন। ঠোঁটে কড়া করে লিপস্টিক দেন, চুল পার্ম করেন, কানে রঙচঙা প্লাস্টিকের দুল পরেন। হাঁটুর উপর খুব রঙিন—ঝলমলে স্কার্ট পরেন। তাঁদের দেখেই মনে হয় তাঁরা খুব সুখে আছেন।

মিসেস জেন ওয়ারেনও তাঁর ব্যতিক্রম নন। এত নামকরা মানুষ কিন্তু কেমন খুকি সেজে ছটফট করছেন। আহ্লাদী ভঙ্গিতে কথা বলছেন।

সাইকিয়াট্রিস্টদের অনেক ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি। তাঁরা প্রথম যে কাজটি করেন তা হচ্ছে রোগীর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে কথা বলেন। যেন রোগী তাঁর অনেক দিনের চেনা, প্রায় বন্ধু স্থানীয়। মিসেস জেন ওয়ারেন এই কাজটা ভালই করেন। আমাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে যে কথাটা বললেন তা হল— "ও ডিয়ার, তোমাকে আজ এত সুন্দর লাগছে কেন?" ভাবটা এ রকম যেন তিনি আমাকে আগেও দেখেছেন তখন এত সুন্দর লাগেনি। বিদেশীরা গায়ে হাত দিয়ে কথা বলে না—ইনি প্রথমবারেই গায়ে হাত রাখলেন।

তোমার নাম হল নিশি। আমার উচ্চারণ ঠিক হয়েছে?

হয়েছে।

নিশি অর্থ হল Night.

হ্যাঁ।

মুন লিট নাইট?

জানি না।

অফকোর্স মুন লিট নাইট। তোমাকে দেখলেই মনে হচ্ছে তোমার জীবন আলোময়।

থ্যাংক য়্যু।

তোমার বয় ফ্রেন্ডের নাম কী?

আমার কোনো বয় ফ্রেন্ড নেই।

এমন রূপবতী কন্যার বয় ফ্রেন্ড থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। তুমি বলতে চাচ্ছ না? এইসব চলবে না—তোমার বয় ফ্রেন্ডের নাম বল, তার ছবি দেখাও।

ভদ্র মহিলা আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন, আমিও কিন্তু তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি। আমি যে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করছি সেটা মনে হয় তিনি ধরতে পারছেন না। বেশিরভাগ মানুষ নিজেদেরকে অন্যের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। মিসেস জেনও তাই করছেন। আমাকে কিশোরী একটা মেয়ে ভেবে কথা বলছেন, মন জয় করার চেষ্টা করছেন। আমি এমন ভাব করছি

যেন ভদ্র মহিলার কথাবার্তায় অভিভূত। আমি তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। ঠিক যে জবাবগুলি তিনি শুনতে চাচ্ছেন—সেই জবাবগুলিই দিচ্ছি। কোনো মানুষ যখন প্রশ্ন করে তখন সে যে জবাব শুনতে চায় সেই জবাবটা কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে থাকে।

জেন ওয়ারেন বললেন, আচ্ছা নিশি, বাবাকে কি তুমি খুব ভালবাস?

প্রশ্ন করার মধ্যেই কিন্তু যে জবাবটা তিনি শুনতে চাচ্ছেন সেটা আছে। তিনি শুনতে চাচ্ছেন যে বাবাকে আমি মোটেই ভালবাসি না। এই জবাব শুনলে হয়ত তাঁর রোগ ডায়গনোসিসে সুবিধা হয়। কাজেই তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে আমি মাথা নিচু করে বসে রইলাম এবং খুব অনিচ্ছার ভঙ্গিতে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

ভদ্রমহিলা দারুণ খুশি হয়ে গেলেন।

শোন নিশি—ইয়াং লেডি। যদিও তুমি এফারমেটিভ ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছে তারপরেও মনে হয় তুমি সত্যি কথা বলছ না। আমরা বন্ধু, একজন বন্ধু—অন্য বন্ধুকে অবশ্যই সত্যি কথা বলবে তাই না? এখন বল—তুমি কি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস?

আমি হ্যাঁ না কিছুই বললাম না।

ভদ্রমহিলা আমায় আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললেন, তুমি কি বাবাকে পছন্দ কর না?

আমি আবারো চুপ করে রইলাম। ভদ্রমহিলা এবার প্রায় ফিসফিস করে বললেন—তুমি কি তোমার বাবাকে ঘৃণা কর? আচ্ছা ঠিক আছে মুখে বলতে না চাইলে এখানে দু'টা কাগজ আছে একটাতে লেখা Yes এবং একটাতে No, যে কোনো একটা কাগজ তুলে নাও। প্রশ্নটা মন দিয়ে শোন—

তুমি কি তোমার বাবাকে ঘৃণা কর?

আমি Yes লেখা কাগজটা তুললাম। এবং এমন ভাব করলাম যে লজ্জায় দুঃখে আমায় মরে যেতে ইচ্ছা করছে। আমার চোখে পানি চলে এল। আমি এমন ভাব করছি যেন চোখের জল সামলাতে আমার কষ্ট হচ্ছে। এক সময় হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললাম। বিদেশীরা চোখের পানি কম দেখে বলে চোখের পানিকে তারা খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখে। বাঙালি মেয়েরা যে অতি সহজে চোখের পানি নিয়ে আসতে পারে এই তথ্য তারা জানে না। তা ছাড়া আমি যে কত বড় অভিনেত্রী তাও তিনি জানেন না। তিনি ছুটে গিয়ে টিস্যু পেপার নিয়ে এলেন। নিজেই চোখ মুছিয়ে দিলেন। করুণা বিগলিত গলায় বললেন, শোন মেয়ে তোমার লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমেরিকান স্ট্যাটিসটিকস বলছে শতকরা ২৮.৬০ ভাগ আমেরিকান পুত্র-কন্যারা তাদের বাবাকে ঘৃণা করে। তুমি আমাকে যা বলেছ তোমার বাবা তা কোনো দিন জানবেন না। এই বিষয়ে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এখন একটু শান্ত হও। কফি খাবে?

আমি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, খাব।

আমরা কফি খেলাম। ভদ্রমহিলা আনন্দিত গলায় বললেন—আমার ধারণা তোমার সমস্যা আমি ধরতে পারছি। সেই সমস্যার সমাধান করা এখন আর কঠিন হবে না। অবশ্যি তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর। তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

হুঁ।

ভেরি গুড। আমরা দু'জনে মিলে তোমার সমস্যা সমাধান করব। কেমন?

আচ্ছা।

তোমার বাবাকে তুমি কেন ঘৃণা কর?

বাবা মদ খায়।

শুধু মদ্যপান করে বলেই ঘৃণা কর?

মাতাল হয়ে তিনি একদিন গাড়ি চালাচ্ছিলেন তখন অ্যাকসিডেন্ট হয়। সেই অ্যাকসিডেন্টে আমার মা মারা যান।

তোমার বাবা আমাকে তোমার মা'র মৃত্যুর কথা বলেছেন। কিন্তু কীভাবে মারা গেছেন তা বলেননি। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

জেন ওয়ারেন সিগারেট ধরালেন। তিনি বেশ কায়দা করে সিগারেট টানছেন।

নিশি, সিগারেটের ধোঁয়ায় তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?

জি না।

আমি সিগারেট ছাড়ার চেষ্টা করছি পারছি না। যে কোনো ভাল অভ্যাস সামান্য চেষ্টাতেই ছেড়ে দেয়া যায়—খারাপ অভ্যাস হাজার চেষ্টাতেও ছাড়া যায় না। ঠিক না?

ঠিক।

এখন বল, তুমি না কি তোমার মা'কে দেখতে পাও, এটা কি সত্যি?

না সত্যি না।

তাহলে বল এই মিথ্যা কথাটা কেন বলতে?

বাবাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলতাম।

বাবাকে ভয় দেখানোর জন্যে তুমি তাহলে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথাই বলেছ?

জি।

যা বলেছ তোমার বাবা তাই বিশ্বাস করেছেন?

জি।

আচ্ছা, আজকের মতো তোমার সঙ্গে আমার কথা শেষ। কাল আবারো আমরা বসব। কেমন?

জি আচ্ছা।

মেরিল্যান্ডে দেখার মতো সুন্দর সুন্দর জিনিস অনেক আছে। তুমি কি দেখেছ?

জি না।

কাল আমি তোমাকে লিস্ট করে দেব। দেশে যাবার আগে তুমি দেখে যাবে।

আচ্ছা।

তুমি কি জান যে তুমি খুব ভাল মেয়ে?

জানি।

ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে আরো তিন দিন সিটিং দিলেন। আমি তাঁকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করলাম। তাঁকে যা বিশ্বাস করাতে চাইলাম তিনি তাই বিশ্বাস করলেন এবং খুব আনন্দিত হলেন এই ভেবে যে তিনি বিদেশি এক কিশোরী মেয়ের জীবনের সমস্ত জটিলতা দূর করে ফেলেছেন। তার অন্ধকার ঘরে এক হাজার ওয়াটের বাতি জ্বেলে দিয়েছেন।

আমার সম্পর্কে তিনি যা ধারণা করলেন তা হচ্ছে—

১. আমি খুব ভাল একটা মেয়ে, সরল, বুদ্ধি কম, জগতের জটিলতা কিছু জানি না। (খুব ভুল ধারণা।)

২. আমি নিঃসঙ্গ এমটি মেয়ে। আমার সবচে বড় শত্রু আমার নিঃসঙ্গতা। (ভুল ধারণা। আমি নিঃসঙ্গ নই। আমি কখনো একা থাকি না। নিজের বন্ধু-বান্ধব নিজে কল্পনা করে নেই। কল্পনাশক্তিসম্পন্ন মানুষ কখনো নিঃসঙ্গ হতে পারে না।)

৩. আমি খুব ভীতু ধরনের মেয়ে। (আবারো ভুল। আমার মধ্যে আর যাই থাকুক ভয় নেই। যখন আমার সাত আট বৎসর বয়স তখনো রাতে ঘুম না এলে আমি একা একা ছাদে চলে যেতাম।)

৪. বাবাকে আমি অসম্ভব ঘৃণা করি। (খুব ভুল কথা। বাবা চমৎকার মানুষ। আমার ক্ষুদ্র জীবনে যে ক'জন ভাল মানুষ দেখেছি তিনি তাদের একজন।)

আমি ভদ্রমহিলার মাথায় এইসব ভুল ঢুকিয়ে দিয়েছি। তিনি খুশি মনে ভুলগুলি গ্রহণ করেছেন।

মানুষ কী অদ্ভুত দেখেছেন? মানুষ কত সহজেই না 'ভুল'—সত্যি ভেবে গ্রহণ করে।

৮

আমেরিকান মহিলা মনস্তত্ত্ববিদ বাবাকে কী বলেছিলেন আমি জানি না। বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি। তবে অনুমান করতে পারি যে তিনি বাবাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। বাবা দেশে ফিরেই সেই উপদেশ মতো চলতে শুরু করলেন। প্রথমেই আমার শোবার ঘর বদলে দিলেন। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন শোবার ঘর বদলানোর ব্যাপারে আমি খুব আপত্তি করব। নানান ভণিতা করে তিনি বললেন—মা, তোমার এই ঘরটা খুব ছোট। তুমি বড় হয়েছ, তোমার আরো বড় ঘর দরকার। তা ছাড়া আমি ভাবছি তোমাকে একটা কম্পিউটার কিনে দেব...কম্পিউটার টেবিল সেট করার জন্যেও জায়গা লাগবে...

আমি তাঁকে কথা শেষ করতে দিলাম না, তার আগেই বললাম—বাবা আমাকে তুমি একটা বড় ঘর দাও। এই ঘরটা আসলেই ছোট।

তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন, নতুন ঘরে যখন যাচ্ছ তখন এক কাজ করা যাক। নতুন ঘরের জন্যে আলাদা করে ফার্নিচার কেনা যাক।

আমি বললাম, আচ্ছা।

বাবা বললেন, আমার পাশের ঘরটা তুমি নিয়ে নাও। বাবা-মেয়ে পাশাপাশি থাকব, কী বল? ভাল হবে না?

খুব ভাল হবে বাবা।

আমার ঘর বদল হল। নতুন ফার্নিচার এল। যা ভেবেছিলাম তাই হল, পুরানো খাঁট বদলে কেনা হল আধুনিক বক্স খাট। যার নিচে বসার উপায় নেই। সাইকিয়াট্রিস্ট নিশ্চয়ই বাবাকে এই বুদ্ধি দিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি—আমার আগের শোবার ঘরের কোনো ফার্নিচার নেই। সব ফার্নিচার কোথায় যেন পাচার করা হয়ে গেছে। বাবার পাশের ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। নতুন ফার্নিচার। একটা টেবিলে ঝকঝকে কম্পিউটার।

কম্পিউটার কিনে দেবার কথাও হয়ত সাইকিয়াট্রিস্ট বাবাকে বলে দিয়েছিলেন। কম্পিউটারে নানা ধরনের খেলা নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকব। খাটের নিচে কে বসে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাব না।

নতুন ঘরে থাকতে এলাম। বাবা আবার ঘরের দরজায় লাল ফিতা দিয়ে রেখেছেন। ফিতা কেটে ঢুকতে হবে। গৃহ-প্রবেশের মতো ঘর-প্রবেশ অনুষ্ঠান।

বাবা বললেন, এসএসসিতে তুমি খুব ভাল রেজাল্ট করেছ বলে এই কম্পিউটার।

আমি বললাম, থ্যাংক য়্যু।

নতুন যুগের কম্পিউটার—খুব পাওয়ারফুল। টু গিগা বাইট মেমোরি। এই কম্পিউটার দিয়ে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।

অনেক কিছু মানে কী?

কম্পিউটার গ্রাফিকস করা যাবে। এনিমেশন করা যাবে। ইচ্ছে করলে ডিজনীর মতো—"লিটল মারমেইড" জাতীয় কার্টুন ছবিও বানিয়ে ফেলতে পার। তোমার যা বুদ্ধি, ভাল কম্পিউটার পেলে তুমি অনেক কিছু করতে পারবে।

আমার যে খুব বুদ্ধি তা তুমি বুঝলে কী করে?

তোমার রেজাল্ট দেখে বুঝেছি। আমি তো কল্পনাও করিনি তুমি এত ভাল রেজাল্ট করবে।

মিসির আলি সাহেব, প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়েও আমি খুব ভাল রেজাল্ট করি। কেমন ভাল জানেন? সব পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হয়। আমার প্রিয় লেখক কে, প্রিয় গায়ক কে, প্রিয় খেলোয়াড় কে এইসবও ছাপা হয়।

ঐ প্রসঙ্গ থাক। কম্পিউটার প্রসঙ্গে চলে আসি। বাবা শুধু যে আমাকে কম্পিউটার কিনে দিলেন তাই না—আমাকে সবকিছু শেখানোর জন্যে একজন ইন্সট্রাকটার রেখে দিলেন। ইন্সট্রাকটারের নাম—হাসিবুর রহমান। লোকটা লম্বা, রোগা। ইটে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো চেহারা। বয়স এই ধরুন পঁচিশ-ছাব্বিশ। দেখতে ভাল। মেয়েদের মতো টানা টানা চোখ। একটা ভুল কথা বলে ফেললাম। সব মেয়েদের তো আর টানা টানা চোখ থাকে না।

কম্পিউটারের সব বিষয়ে হাসিবুর রহমানের জ্ঞান অসাধারণ। কিন্তু লোকটি হত দরিদ্র। তার থাকার জায়গা পর্যন্ত নেই। রাতে সে ঘুমায় একটা কম্পিউটারের দোকানে। তাকে অতি সামান্য কিছু টাকা সেই দোকান থেকে দেয়া হয়—এতে তার দু'বেলা খাওয়াও বোধহয় হয় না, তবে এতেই সে খুশি। এত অল্পতে কাউকে খুশি হতেও আমি দেখিনি।

বাবা আমাদের বাড়িতে তাকে থাকতে দিলেন। আমাদের গ্যারেজে তিনটা কামরা আছে। একটা দারোয়ানের, একটা ড্রাইভারের। একটা কামরা খালি। সেই খালি কামরাটায় তাকে থাকতে দেয়া হল। সে মহা খুশি। সারা দিন ঘষামাজা করে ঘর সাজাল। আমার কাছে এসে ক্যালেন্ডার চাইল—দেয়ালে সাজাবে।

তার পড়াশোনা সামান্য। এসএসসি সেকেন্ড ডিভিশন। টাকা-পয়সার অভাবে এসএসসি-র বেশি সে পড়তে পারেনি। কম্পিউটারের দোকানে কাজ নিয়েছে। নিজের আগ্রহে কম্পিউটার শিখেছে।

ভদ্রলোককে আমার কয়েকটি কারণে পছন্দ হল। প্রথম কারণ তিনি আমাকে অত্যন্ত সম্মান করেন। আমাকে দেখা মাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। দ্বিতীয় কারণ আমার প্রতিটি কথা তিনি বিশ্বাস করেন।

যেহেতু তিনি আমাকে কম্পিউটার শেখাতে এসেছেন প্রথম দিনই আমি তাকে স্যার ডাকলাম। তিনি খুবই লজ্জা পেয়ে বললেন, ম্যাডাম, আপনি আমাকে স্যার ডাকবেন না। আমার খুবই লজ্জা লাগছে।

আপনাকে তাহলে কী ডাকব?

নাম ধরে ডাকবেন। আমার নাম হাসিব।

আপনাকে হাসিব ডাকব?

জি।

আচ্ছা বেশ তাই ডাকব।

আমি সহজভাবেই তাকে হাসিব ডাকা শুরু করলাম। ভদ্রলোক আমার কম্পিউটারের টিচার হলেও তার সঙ্গে আমার কথাবার্তার ধরন ছিল মুনিব-কন্যা এবং কর্মচারীর মতো। আমার তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না। ওনারও হচ্ছিল না। স্যার ডাকলেই হয়ত অনেক বেশি অসুবিধা হত।

কম্পিউটারের নানান বিষয় আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শিখতে লাগলাম। উনিও খুব আগ্রহ নিয়ে শেখাতে লাগলেন। বুদ্ধিমতি আগ্রহী ছাত্রীকে শেখানোর মধ্যেও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ তার চোখে মুখে ফুটে উঠত। রাত জেগে জেগে তার সঙ্গে আমি 3D STUDIO এবং MICRO MEDIA DIRECTOR এই দু'টি প্রোগ্রাম শিখেছি। একটা সফটওয়ার তৈরি করছি। যে সফটওয়ারে কম্পিউটারের পর্দায় শরিফা এসে উপস্থিত হবে। তাকে প্রশ্ন করলে সে প্রশ্নের জবাব দেবে। সহজ প্রশ্ন কিন্তু অদ্ভুত জবাব। যেমন,

প্রশ্ন আপনার নাম?

উত্তর আমার কোনো নাম নেই, আমি হচ্ছি ছায়াময়ী। ছায়াদের কি নাম থাকে?

প্রশ্ন   আপনার পরিচয় কী?

উত্তর : আমার কোনো পরিচয়ও নেই। পরিচয় মানেই তো ব্যাখ্যা ও বর্ণনা। আমাকে ব্যাখ্যা ও বর্ণনায় ধরা যাবে না।

পর্দায় প্রশ্নের উত্তরগুলি লেখা হবে না। পর্দায় ভাসবে শরিফার বিচিত্র সব ছবি এবং উত্তরগুলি ধাতবকণ্ঠে শোনা যাবে।

হাসিব একদিন জিজ্ঞেস করলেন (খুব ভয়ে ভয়ে। আমাকে যে কোনো প্রশ্নই খুব ভয়ে ভয়ে করেন। ভাবটা এ রকম যেন প্রশ্ন শুনলেই আমি রেগে যাব)—

শরিফা কে?

আমি বললাম শরিফা একটি মৃতা মেয়ে।

ও আচ্ছা।

আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন?

জি করি। করব না কেন?

ভূত দেখেছেন কখনো?

জি না।

আপনি যদি শরিফাকে দেখতে চান আমি তাকে দেখাতে পারি। ওর সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় আছে। আমি বললেই সে আসবে।

জি না দেখতে চাই না। আমি খুব ভীতু।

আমি ডাকলেই শরিফা চলে আসবে আপনি এটা বিশ্বাস করলেন?

বিশ্বাস করব না কেন? আপনি তো আর শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি সেই ধরনের মেয়ে না।

আমি কোন ধরনের মেয়ে?

খুব ভাল মেয়ে।

আপনি কম্পিউটারের মতো আধুনিক জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, আবার ভূতও বিশ্বাস করেন?

জি, ভূত বিশ্বাস করি, জিনও বিশ্বাস করি। কোরান শরীফে জিনের কথা আছে। একটা সূরা আছে—সূরার নাম হল—সূরায়ে জিন।

তাই বুঝি?

জি।

আপনি আমাকে একটা ভূতের গল্প বলুন তো।

ম্যাডাম, আমি ভূতের গল্প জানি না।

কিছু না কিছু নিশ্চয়ই জানেন, মনে করে দেখুন। ছোটবেলায় ভয় পেয়েছিলেন এমন কিছু।

খুব ছোটবেলায় একবার শ্মশান-কোকিলের ডাক শুনেছিলাম।

কিসের ডাক শুনে ছিলেন?

শ্মশান-কোকিল। ভয়ংকর ডাক। কেউ যদি শ্মশান-কোকিলের ডাক শোনে তার নিকট আত্মীয় মারা যায়।

আপনার কি কেউ মারা দিয়েছিল?

আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন।

মৃত্যুর পর তাঁকে কখনো দেখেছেন?

প্রায়ই স্বপ্নে দেখি।

স্বপ্নের কথা বলছি না। জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে কখনো দেখেছেন?

জি না।

শ্মশান-কোকিল পাখিটা দেখতে কেমন?

দেখতে কেমন জানি না ম্যাডাম। শ্মশানের আশেপাশে থাকে। কেউ দেখে না।

আপনাদের গ্রামে শ্মশান আছে?

জি আছে। মহাশ্মশান। খুব বড়।

আমার শ্মশান দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি কি আমাকে আপনাদের গ্রামে নিয়ে যাবেন?

উনি হতভম্ব গলায় বললেন, থাকবেন কোথায়?

কেন আপনাদের গ্রামের বাড়িতে।

অসম্ভব কথা বলছেন ম্যাডাম। আমরা খুবই গরিব। খড়ের চালা ঘর। মাটির দেয়াল।

হাসিব খুবই নার্ভাস হয়ে গেলেন। তার ভাবটা এ রকম যেন এখনই তাকে নিয়ে আমি তাদের গ্রামের বাড়িতে রওনা হচ্ছি। মানুষের সারল্য যে কোন পর্যায়ে যেতে পারে তা তাকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। তবে হাসিব বোকা ছিলেন না। আমাদের ধারণা সরল মানুষ মানেই বোকা মানুষ এই ধারণা সত্যি নয়।

মিসির আলি সাহেব, আপনার কি ধারণা আমি এই মানুষটার প্রেমে পড়েছি?

আমার মনে হয় না। মানুষটাকে আমি করুণা করতাম। প্রেম এবং করুণা এক ব্যাপার নয়। প্রেম সর্বগ্রাসী ব্যাপার। প্রেমের ধর্ম হচ্ছে অগ্নি। আগুন যেমন সব পুড়িয়ে দেয় প্রেমও সব ছাড়খার করে দেয়। হাসিব নামের মানুষটির প্রতি প্রবল করুণা ছাড়া আমি কিছু বোধ করিনি।

তার সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগতো—এই পর্যন্তই। আমি নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে, কারো সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হওয়াটাকে আপনি নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক বলবেন না।

ছোটবেলা থেকেই আমার অনেক খেলনা ছিল। খেলনা নিয়ে খেলতে ভাল লাগত। হাসিবের সঙ্গে আমার ব্যাপারটাও সেরকম। সে ছিল আমার কাছে মজার একটা খেলনার মতো।

তাকে আমি ভয়ংকর ভয়ংকর গল্প বলে ভয় দেখাতাম। শরিফার গল্প। আমার ছোট মা'র গল্প। মানুষটা ভয়ে আতঙ্কে অস্থির হয়ে যেত। দেখে আমার এমন মজা লাগত।

আমি তখন একটা অন্যায় করলাম। খুব বড় ধরনের অন্যায়। একটা নির্দোষ খেলাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবার অন্যায়। আমি তাকে ভয় দেখালাম। কীভাবে ভয় দেখালাম জানেন? শরিফা সেজে ভয় দেখালাম।

তিনি সে রাতে আমাকে কম্পিউটার শেখানো শেষ করে তার ঘরে ঘুমুতে যাবেন, আমি বললাম, আপনি কি ভাত খেয়েছেন?

তিনি বললেন, জি না। ভাত রাঁধব তারপর খাব।

আমি বললাম, এত রাতে ভাত রেঁধে খেতে হবে না। আমি বুয়াকে বলে দিচ্ছি—আপনাকে খাইয়ে দেবে। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে তারপর ঘুমুতে যান।

তিনি সুবোধ বালকের মতো মাথা নাড়লেন।

হাসিব যখন ভাত খাচ্ছিলেন তখন আমি গ্যারেজে তার ঘরে উপস্থিত হলাম। কেউ আমাকে দেখল না। দারোয়ান দু'জনই ছিল গেটে। ড্রাইভার বাইরে। আমি কয়েক সেকেন্ড ভাবলাম তারপর হুট করে তার ঘরে ঢুকে গেলাম। ঠিক করে রাখলাম অনেক রাত পর্যন্ত খাটের নিচে বসে থাকব। তিনি খাওয়া শেষ করে ঘরে ঢুকবেন। দরজা লাগাবেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়বেন। তখন হাসির শব্দ করে তার ঘুম ভাঙাব। ঘুম ভাঙতেই তিনি শব্দ শুনে খাটের নিচে তাকাবেন—আধো আলো আধো অন্ধকারে এলোমেলো চুলে শরিফা বসে আছে...সম্পূর্ণ নগ্ন এক ভয়ংকর তরুণী। তার কাছে কী ভয়ংকরই না লাগবে! ভাবতেও আনন্দ!

৯

কে বলছেন?

আমার নাম মিসির আলি।

স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। কে কথা বলছ— নিশি?

জি।

তুমি ভাল আছ?

জি।

আরো আগেই টেলিফোন করতাম—আমার নিজের টেলিফোন নেই। আমি সাধারণত একটা পরিচিত দোকান থেকে ফোন করি। সেই দোকান গত এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ।

বন্ধ কেন?

জানি না কেন। খোঁজ নেইনি।

একটা দোকান এক সপ্তাহ হল বন্ধ। আর আপনি হলেন বিখ্যাত মিসির আলি। আপনি খোঁজ নেবেন না?

খোঁজ নেয়াটা তেমন জরুরি মনে করিনি।

আমার তো ধারণা ব্যাপারটা খুবই জরুরি। বড় ধরনের কোনো কারণ ছাড়া কেউ এক সপ্তাহ ধরে দোকান বন্ধ রাখে না। আজ কি আপনি সেই দোকান থেকে টেলিফোন করছেন?

হ্যাঁ।

ওরা দোকান বন্ধ রেখেছিল কেন?

দোকানের মালিকের মেয়ের বিয়ে ছিল। তিনি দোকানের সব কর্মচারীদের নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন।

ও আচ্ছা। মেয়ের বিয়েতে আপনাকে দাওয়াত দেয়নি?

না। আমার সঙ্গে তেমন পরিচয় নেই।

কম পরিচয় থাকলেও তো আপনাকে দাওয়াত দেয়ার কথা। আপনি এক বিখ্যাত ব্যক্তি। বিখ্যাত মানুষরা খুব দাওয়াত পায়। সবাই চায় তাদের অনুষ্ঠানে বিখ্যাতরা আসুক।

তুমি যত বিখ্যাত আমাকে ভাবছ আমি তত বিখ্যাত নই।

আপনি কি আমার লেখাটা পড়েছেন?

হ্যাঁ।

পুরোটা পড়েছেন?

না, পুরোটা পড়িনি।

কতদূর পড়েছেন?

তুমি হাসিব সাহেবকে ভয় দেখানোর জন্যে খাটের নিচে বসে রইলে পর্যন্ত।

বাকিটা পড়েন নি কেন?

আমার যতটুকু পড়ার পড়ে নিয়েছি। বাকিটা পড়ার দরকার বোধ করছি না। আমার মনে হচ্ছে সবটা পড়ে ফেললে কনফিউজড হয়ে যাব। আমি কনফিউজড হতে চাচ্ছি না। তোমার লেখার প্রধান লক্ষ্য মানুষকে কনফিউজ করা—বিভ্রান্ত করা।

আপনি একটু ভুল করছেন। এই লেখাগুলি আমি আপনার জন্যে লিখেছি—মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে লিখিনি।

তা ঠিক। হ্যাঁ, আমাকে বিভ্রান্ত করা তোমার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

আমার ধারণা ছিল আপনি পুরো লেখাটা পড়বেন তারপর টেলিফোন করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার সব ধারণা যে সত্যি হবে তা মনে করা কি ঠিক?

সাধারণত আমার সব ধারণাই সত্যি হয়।

শোন নিশি, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কথা তো বলছেন।

এভাবে না। মুখোমুখি বসে কথা বলতে চাই। তোমার পাণ্ডুলিপিও নিশ্চয়ই তুমি ফেরত চাও। চাও না?

চাই।

আমার কাছে তোমার কিছু জিনিসপত্রও আছে। হ্যান্ডব্যাগ সুটকেস। বেশ কিছু টাকা।

ওগুলি আমি নেব না।

টাকা নেবে না?

টাকাটা আপনি রেখে দিন। আপনি রহস্য সমাধানের জন্যে অনেক কর্মকাণ্ড করেন। আপনার টাকার দরকার হয়। যেমন ধরুন আমার ছোট মা'র মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল। কেইস কি দেয়া হয়েছিল? পোস্টমর্টেম রিপোর্ট কী ছিল তা জানার জন্যে আপনি টাকা খরচ করেননি?

করেছি। অতি সামান্যই করেছি।

আচ্ছা একটা কথা—আমাদের বাড়ির ঠিকানা কি আপনি আমার লেখা পড়ে জেনেছেন না আগেই জেনেছেন?

আগেই জেনেছি। থানা থেকে জেনেছি।

আপনি পুরানো পত্রিকা ঘাঁটেননি?

ঘেঁটেছি। আমি নিজে ঘাটিনি—একজনকে ঠিক করেছিলাম সে ঘেঁটেছে। তবে সেখান থেকে বাড়ির ঠিকানা পাইনি।

আপনি যে এইসব কর্মকাণ্ড করবেন তা কিন্তু আমি জানতাম।

তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে।

আপনি কি আন্টির সঙ্গে দেখা করেছেন—নীতু আন্টি। তিনি তো এখন মোটামুটি সুস্থ।

ওনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। উনি দেখা করেননি। শোন নিশি আমি কি এখন আসব?

না, আজ না।

আজ না কেন?

বাবা বাড়িতে আছেন এই জন্যে আজ না। যদিও বাবা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বাবার ধারণা আপনি সাধারণ মানুষ নন। আপনি মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ। আপনার ওপর লেখা বইগুলি বাবাই আমাকে প্রথম পড়তে দেন।

তোমার বাবার সঙ্গে তাহলে তো দেখা করাটা খুবই জরুরি।

জরুরি কেন?

তোমার বাবা যাতে বুঝতে পারেন যে আমি মহাপুরুষ পর্যায়ের কেউ নই—আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ।

আপনি আমার সমস্যার সমাধান করেছেন?

হ্যাঁ।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন, এত আত্মবিশ্বাস থাকা কি ঠিক?

না, ঠিক না। তবে তোমার ক্ষেত্রে আমি ভুল করিনি।

একটা জিনিস শুধু জানতে চাচ্ছি—আমি যে খাটের নিচে শরিফাকে দেখতে পাই এবং এখনো দেখতে পাই তা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

করি।

আপনি কি শরিফাকে দেখতে চান?

না, চাই না। অস্বাভাবিক কিছু আমার দেখতে ভাল লাগে না। আমি স্বাভাবিক মানুষ। আমি আমার চারপাশে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড দেখতেই আগ্রহী।

পৃথিবীতে সব সময়ই কি স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ঘটে?

না, ঘটে না।

আচ্ছা আপনি আসুন।

কখন আসব?

আজই আসুন। রাতে আমার সঙ্গে খাবেন। আমি নিজে আপনার জন্যে রান্না করব।

তুমি রাঁধতে জান?

সহজ রান্নাগুলি জানি। যেমন ডিম ভাজতে পারি। ডাল চচ্চড়ি পারি। ভাত রাঁধতে অবশ্যি পারি না। হয় ভাত নরম জাউ জাউ হয়ে যায় আর নয়ত চালের মতো শক্ত থাকে। আমি আপনাকে গরম গরম ডিম ভেজে দেব। ডিম ভাজা কি আপনার পছন্দের খাবার?

হ্যাঁ খুব পছন্দের খাবার।

আপনি কি আইসক্রিম পছন্দ করেন?

হ্যাঁ করি।

আমিও খুব আইসক্রিম পছন্দ করি। বাবা পরশু হংকং থেকে দু' লিটারের একটা আইসক্রিম এনেছেন। বিমানের ক্যাপ্টেন হবার অনেক সুবিধা। প্লেনের ফ্রিজে করে নিয়ে এসেছেন—এত ভাল আইসক্রিম আমি অনেক দিন খাইনি। কালো রঙের আইসক্রিম। আপনাকে খাওয়াব।

আচ্ছা। আমি কি টেলিফোন রাখব?

জি না, আরেকটু ধরে রাখুন। আচ্ছা শুনুন, এই দীর্ঘ সময় যে টেলিফোন করছেন—দোকানের মালিক বিরক্ত হননি?

না, হননি। দোকানের মালিক আমাকে খুব পছন্দ করেন।

খুব যদি পছন্দ করে তাহলে আপনাকে দাওয়াত করেননি কেন? আসলে আমার খুব রাগ লাগছে। আচ্ছা ভদ্রলোকের যে মেয়েটির বিয়ে হয়েছে তার নাম কী?

নাম তো জানি না।

নাম জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমার ধারণা মেয়েটির নাম লায়লা।

তুমি জান কী করে?

আমি জানি না। আমি অনুমান করছি। আমার অনুমান শক্তি ভাল। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আচ্ছা জিজ্ঞেস করব। তোমার সঙ্গে কথা শেষ হবার পর জিজ্ঞেস করব।

জিজ্ঞেস করতে আবার ভুলে যাবেন না যেন।

না, ভুলব না। এখন টেলিফোন রাখি?

এক মিনিট ধরে রাখুন। কোনো কথা বলতে হবে না শুধু ধরে রাখুন। এক মিনিট পার হবার পর রিসিভার রেখে দেবেন।

আচ্ছা।

এক মিনিট শুধু শুধু টেলিফোন ধরে রাখতে বলছি কেন জানেন?

না।

আচ্ছা থাক জানতে হবে না।

মিসির আলি ঘড়ি ধরে এক মিনিট টেলিফোন রিসিভার কানে রাখলেন তারপর রিসিভার নামালেন। মিতা স্টোরের মালিক ইদ্রিস উদ্দিন হাসিমুখে বললেন—টেলিফোন শেষ হয়েছে?

জি।

আপনার জন্যে চা বানাতে বলেছি। চা খেয়ে যান। চায়ে চিনি খান তো?

জি খাই।

মিসির আলি বললেন, আপনার যে মেয়েটির বিয়ে হল তার নাম কী?

তার নাম আফরোজা বানু। আমরা লায়লা বলে ডাকি। মেয়ের বিয়েতে আপনাকে বলার খুব শখ ছিল। আপনার ঠিকানা জানি না, কার্ড দিতে পারিনি। আপনাকে একদিন বাসায় নিয়ে যাব। মেয়ে এবং মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনাদের দোয়ায় ছেলে ভাল পেয়েছি। অতি ভদ্র। কাস্টমস এ আছে।

যাব একদিন আপনাদের বাসায়। আপনার মেয়ে এবং মেয়ে জামাই দেখে আসব।

১০

বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটের পেছনে খাকি পোশাক পরা দারোয়ান। কিন্তু সব কেমন অন্ধকার। গেটে বাতি জ্বলছে না, পোর্চেও জ্বলছে না। দারোয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে সে অন্ধকার পাহারা দিচ্ছে। বাড়ির সামনে বাগানের মতো আছে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় সেই বাগানকে খুব আগোছালো বাগান বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে এই প্রকাণ্ড বাড়ির জন্যে কোনো মালি নেই। মিসির আলি গাছপালা চেনেন না—বোগেনভিলিয়া চিনতে পারছেন। গাছ ভর্তি ফুল তাও বোঝা যাচ্ছে। অন্ধকারের জন্যে মনে হচ্ছে গাছ ভর্তি কালো ফুল ফুটেছে।

মিসির আলি গেটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। দারোয়ান টুল ছেড়ে উঠে এল। মিসির আলি বললেন, আমার নাম মিসির আলি। আমি নিশির সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

দারোয়ান কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে গেট খুলল। একটা কথাও বলল না। মানুষদের অনেক অদ্ভুত স্বভাবের একটি হচ্ছে অন্ধকারে তারা কম কথা বলে। মানুষ ছাড়া অন্য সব জীবজন্তু অন্ধকারেই সাড়া শব্দ বেশি করে।

নিশি কি আছে?

দারোয়ান হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তার গলার স্বর কেমন—মিসির আলির শোনার আগ্রহ ছিল, কিন্তু সে মনে হয় কথা বলবে না।

বেল টেপা হয়েছে—কেউ সদর দরজা খুলছে না। মিসির আলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে পাঁচটা গোলাপ। ঢাকা শহরে এখন গোলাপ চাষ হচ্ছে। সুন্দর সুন্দর গোলাপ পাওয়া যায়। পঁচিশ টাকায় যে পাঁচটা গোলাপ কিনেছেন সেই গোলাপগুলির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। ফুলের দোকানদার গোলাপের কাঁটা ফেলে দিতে চেয়েছিল—তিনি ফেলতে দেননি। কাঁটা হচ্ছে গোলাপের সৌন্দর্যের একটা অংশ। কাঁটা ছাড়ানো গোলাপকে তাঁর কাছে নগ্ন বলে মনে হয়।

দারোয়ান আরো একবার বেল টিপে তার টুলে গিয়ে বসল। সে মনে হয় আর বেল টিপবে না। বাকি রাতটা টুলে বসে পার করে দেবে।

ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। ঢাকা শহরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় না। এই পোকাটা কি মনের ভুলে এদিকে চলে এসেছে? ঝিঁঝি পোকার ডাক, জোনাকির আলো, শেয়ালের প্রহর যাপন ধ্বনি কিছুই আর শোনা হবে না। সব চলে যাবে। প্রাণের বিবর্তনের মতো হবে শব্দের বিবর্তন।

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চটি পায়ে কে যেন আসছে। নিশি? হতে পারে। বসার ঘরের বাতি জ্বলল। দরজার ফাঁক দিয়ে সেই আলো এসে পড়ল মিসির আলির গায়ে। ক'টা বাজছে দেখার জন্যে মিসির আলি তাঁর পাঞ্জাবির হাতা গুটালেন। হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি নষ্ট বলে ফেলে রেখেছেন। নতুন ঘড়ি কেনা হচ্ছে না। তিনি নিদারুণ অর্থ সংকটে আছেন। পাঁচটা গোলাপ কেনার সময়ও বুকের ভেতর খচখচ করছিল।

আসুন, ভেতরে আসুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজা ধরে নিশি দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির পরনে কালো সিল্কের শাড়ি। সে খুব সেজেছে। কপালে টিপ। চোখে কাজল। গয়নাও পরেছে। গলায় সরু চেইনের লকেট। লকেটের মাথায় লাল একটা পাথর। সেই পাথর আধো অন্ধকারেও কেমন ঝলমল করছে। কী পাথর এটা? জিরকণ? একমাত্র জিরকণই এমন কড়া লাল হয়—এমন দ্যুতিময় হয়।

নিশি তোমার জন্যে কিছু গোলাপ এনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

সাবধানে ধর। কাঁটা সরানো হয়নি।

নিশি ফুল হাতে নিয়ে হাসল। মিসির আলি মনে মনে বললেন—বাহ্ কী সুন্দর মেয়ে। সৃষ্টিকর্তা রূপের কলস মেয়েটির গায়ে ঢেলে দিয়েছেন।

বাবা বাড়িতে নেই। মাত্র বিশ মিনিট আগে চলে গেছেন। জরুরি কল পেয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে। পাইলটদের এই সমস্যা—মজা করে ছুটি কাটাচ্ছে হঠাৎ ইমার্জেন্সি কল। আপনি কি ড্রয়িং রুমে বসবেন না স্টাডিতে বসবেন?

এক জায়গায় বসলেই হল।

আসুন স্টাডিতে বসি। আমাদের ড্রয়িং রুমটা এমন যে কেউ বসে স্বস্তি পায় না। আমি কিন্তু আপনার জন্যে রান্না করেছি। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি আর ডিম ভাজা।

থ্যাংক য়্যু।

ডিম ভাজা এখনো হয়নি। ডিম ফেটে রেখেছি—খেতে বসবেন আর আমি ভেজে দেব।

আচ্ছা।

আপনার যখন ক্ষিধে হবে বলবেন ভাত দিয়ে দেব।

তোমাদের বাড়িতে কি আর লোকজন নেই?

এই মুহূর্তে শুধু আমি আর দারোয়ান ভাই আছি। আমাদের একজন কাজের মেয়ে আছে—কিসমতের মা। তার জল বসন্ত হয়েছে। তাকে ছুটি দিয়েছি। সে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। সে কবে আসবে কে জানে। মনে হয় আসবে না। আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে তারা ছুটিতে গেলে আর ফিরে আসে না।

নিশি মিসির আলিকে স্টাডিতে নিয়ে বসাল। মাঝারি আকৃতির ঘর। হাল্কা সবুজ কার্পেটে মেঝে মোড়া। দু'টো চেয়ার মুখোমুখি বসান। একটা চেয়ারের পাশে অ্যাশট্রে।

আপনি যে ভাবে বসেন, সেই ভাবে আরাম করে বসুন। পা তুলে বসুন আজ আপনি আসুন আমি তা চাচ্ছিলাম না। কেন বলুন তো?

বলতে পারছি না।

আমি আপনাকে খুব ভাল করে খাওয়াতে চাচ্ছিলাম। কাজের মেয়েটি নেই, ভাল কিছু খাওয়াতে পারব না। তবে আমি আপনাকে বাইরের খাবার খাওয়াতে চাচ্ছিলাম না। যা পেরেছি রেঁধেছি।

আমার জন্যে খাবার তেমন জরুরি না। অনেকে খাবার জন্যে বেঁচে থাকেন। আমি বাঁচার জন্যে খাই।

কফি খাবেন?

হ্যাঁ খাব।

বসুন খফি বানিয়ে আনি। কফি খেতে খেতে গল্প করি। আপনার কি গরম লাগছে?

না, গরম লাগবে কেন?

বন্ধ ঘর তো। হাল্কা করে ফ্যান ছেড়ে দি।

দাও।

আপনি পা উঠিয়ে আরাম করে বসুন।

মিসির আলি পা উঠিয়ে বসলেন। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। একটু শীত শীত লাগছে। তাই ভাল। শীতের রাতে শীত না লাগলে ভাল লাগে না।

কফি নিন।
মিসির আলি কফি নিলেন। গন্ধ থেকেই বলে দেয়া যায়—কফি খুব ভাল হয়েছে।
ব্রাজিলের কফি বিনের কফি। আমার বাবার খুব প্রিয়।
কফি ভাল হয়েছে।
আমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা তো বললেন না।
তোমাকে অপূর্ব লাগছে।
আপনি আসবেন এই জন্যেই সন্ধ্যা থেকে সাজ করছি। আপনি যখন বেল টিপলেন তখন আমার টিপ দেয়া শেষ হয়নি। এই জন্যেই দরজা খুলতে দেরি হল। কালো রঙ কি আপনার পছন্দ?
হ্যাঁ পছন্দ। খুব পছন্দ।
আমাকে দেখে কি আপনার শীত শীত লাগছে না?
কেন বল তো?
শীতকালে সিল্কের শাড়ি পরা কাউকে দেখলে শীত শীত লাগে। যে শাড়ি পরে আছে তার শীতটা যে দেখছে তার গায়ে চলে আসে।
তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি ভাল।
আপনার চেয়েও কি ভাল?
মিসির আলি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—আমি যে সবকিছু খুব খুঁটিয়ে দেখি তা কিন্তু না। এই কাজটা লেখকরা করেন। সবকিছু দেখেন ক্যামেরার চোখে। যা দেখছেন তারই ছবি তুলে ফেলছেন।
আপনি কীভাবে দেখেন?
আমি আর দশটা মানুষ যে ভাবে দেখে সে ভাবেই দেখি। দেখতে দেখতে কোনো একটা জায়গায় খটকা লাগে। তখন খটকার অংশটা ভাল করে দেখি। বারবার দেখি।
বুঝিয়ে বলুন।
মনে কর এক টুকরা কাপড় আমাকে দেয়া হল। আমি কাপড়টা দেখব। তার ডিজাইন দেখব, রঙ দেখব, বুনন দেখব। অন্যরা যে ভাবে দেখবে সে ভাবেই দেখব। দেখতে গিয়ে হঠাৎ যদি চোখে পড়ে একটা সুতা ছেঁড়া তখন সকল নজর পড়বে ঐ ছেঁড়া সুতায়। তখন দেখব সুতাটা কোথায় ছিঁড়েছে, কেন ছিঁড়েছে।
আমি যে আপনার কাছে আমার পাণ্ডুলিপি দিলাম সেখানেও কি আপনি ছেঁড়া সুতা পেয়েছেন?
হ্যাঁ।
বলুন শুনি।
নিশি একটু ঝুঁকে এল। তার মুখ ভর্তি হাসি। মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। মিসির আলি বললেন—তার আগে তুমি বল তোমার কি কোনো বোরকা আছে? সউদি বোরকা যেখানে শুধু চোখ বের হয়ে থাকে।
নিশি শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ আছে।
মিসির আলি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—তাহলে বলা যেতে পারে তোমার সমস্যার সমাধান আমি করেছি।
বলুন আপনার সমাধান।
সমাধান বলা ঠিক হবে না। আমি সমস্যা ধরতে পেরেছি। সমাধান তোমার হাতে।
আপনি সমস্যাটা কীভাবে ধরলেন বলুন। গোড়া থেকে বলুন। আপনার সমস্যার মূলে পৌঁছার প্রক্রিয়াটা জানার আমার খুব আগ্রহ। ধরে নিন আমি আপনার একজন ছাত্রী। আপনি আমাকে বুঝাচ্ছেন। আমি আপনার কাছে শিখছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন—তারপর সহজ স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর বলার ভঙ্গিটি আন্তরিক। মনে হচ্ছে তিনি তাঁর ছাত্রীকেই বুঝাচ্ছেন—

নিশি, আমি যা করলাম তা হচ্ছে তোমার লেখা পড়ে গেলাম। খটকার অংশগুলি বের করলাম। যে সব জায়গায় আমার খটকা লাগল সেগুলি হচ্ছে—

ক. তুমি তোমার লেখায় কোথাও তোমার খালা, মামা, চাচা, ফুফুদের কথা আননি। তাঁদের সম্পর্কে কিচ্ছু লেখা নেই।

খ. তোমাদের কোনো কাজের লোকের দোতলায় ওঠার অনুমতি পর্যন্ত নেই অথচ শরিফা নামের কাজের মেয়েকে তোমার ঘরে ঘুমুতে দেয়া হচ্ছে। কেন?

গ. শরিফার স্বামী পাগল হয়ে গেছে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে পাবনা শহরে—এই খবর তুমি জানলে কী করে? তোমার জানার কথা না।

আমি অগ্রসর হয়েছি এই তিনটি 'খটকা' নিয়ে। তুমি যে কাপড় বুনেছ তার সবই ভাল শুধু তিনটা সুতা ছিঁড়ে গেছে। কেন ছিঁড়ল। ছেঁড়া সুতাগুলিকে জোড়া লাগান যায় কীভাবে? এই তিনটি সুতার ভেতর কি কোনো সম্পর্ক আছে? তখন আমার কাছে মনে হল তোমার যদি কোনো বোরকা থাকে—সউদি বোরকা, তাহলে খটকাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি হয়। তিনটি সুতার ভেতর সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।

তোমার কি মনে আছে তোমার বোরকাওয়ালী এক বান্ধবীর গল্প করতে গিয়ে তুমি নানান ধরনের বোরকার কথা বলেছ। মনে আছে?

নিশি বলল, মনে আছে।

বোরকা সম্পর্কে তুমি জান। তুমি হয়ত ব্যবহারও কর। এই তথ্যটা বেশ জরুরি।

মিসির আলি আরেকটি সিগারেট ধরালেন। নিশির মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে সে খুব মজা পাচ্ছে। মিসির আলি বললেন—নিশি, আমি এক কাজ করি। আগে তোমার সমস্যাটা বলি তারপর বরং ব্যাখ্যা করি সমস্যায় কীভাবে পৌঁছেছি।

আপনার যে ভাবে ভাল লাগে সেই ভাবেই বলুন। তবে বোরকা পরে আমি ঢাকা শহরে ঘুরে বেড়াই তা কিন্তু না। শখ করে কিনেছিলাম—একদিনই পরেছি। আচ্ছা, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন বলুন।

মিসির আলি শান্ত গলায় বললেন, তুমি হচ্ছ তোমার বাবা-মা'র পালিতা কন্যা। যে কারণে তোমার নিজের জগৎ ছাড়া বাইরের কারো সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নেই। খালা, মামা, চাচা, ফুফুরা তোমার ভুবনে অনুপস্থিত। তোমার লেখায় তাঁরা কেউ নেই।

তোমার অসম্ভব বুদ্ধি। তুমি খুব সহজেই ব্যাপারটা আঁচ করে ফেল। তোমার নিজের জগৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

তোমার নীতু আন্টি সেই লণ্ডভণ্ড জগৎ ঠিক করতে চান। তিনি হঠাৎ মনে করেন যে তোমার একজন সার্বক্ষণিক সঙ্গি থাকলে ভাল হয়। তিনি সঙ্গি নিয়ে এলেন। সেই শরিফাকে থাকতে দেয়া হল তোমার সঙ্গে। কেন? তোমার নীতু আন্টি ভেবেছিলেন তুমি কারণটা ধরতে পারবে না। তুমি চট করে ধরে ফেলেছ। ভাল কথা, শরিফা মেয়েটিও খুব রূপবতী।

তুমি ধরে ফেললে শরিফা তোমার বোন। হতদরিদ্র এই পরিবার থেকেই একসময় তোমাকে আনা হয়েছিল। শরিফা অবশ্যি কিছু জানল না। মেয়েটির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তুমি তাকে যেতে দিলে না। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। প্রবল অপরাধবোধ তোমাকে গ্রাস করল। তুমি সেই অপরাধবোধের কারণেই বোরকা পরে একদি দেখতে গেলে বোনের স্বামীকে। কিছু একটা তুমি তার সঙ্গে করেছ—সেটা কী আমি জানি না। মনে হয় ভয়ংকর কিছু। বোনের কাছ থেকে শোনা শারীরিক গল্পগুলি তোমাকে প্রভাবিত করতে পারে। তুমি নাটকীয়তা পছন্দ কর। আমার

ধারণা তুমি তার সঙ্গে বড় ধরনের কিছু নাটকীয়তাও করেছ। এই মুহূর্তে আমার যা মনে হচ্ছে তা হল তুমি তোমার বোনের শাড়ি পরে—বোন সেজেই তার কাছে গিয়েছ। এমন কাজ তুমি কর। শরিফা সেজে তুমি হাসিব নামের একজনকে ভয় দেখিয়েছ। যদিও আমার ধারণা ভয় দেখানো তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। তুমি গভীর রাতে তার কাছে উপস্থিত হতে চেয়েছিলে। তাই না?

জানি না।

ভয় পাবার পর হাসিব কী করল?

তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

তুমি কি তার জ্ঞান ফেরা পর্যন্ত সেই ঘরে ছিলে?

না, আমি চলে এসেছিলাম।

জ্ঞান ফেরার পর কী হল?

জানি না কী হল। আমি ঘর থেকে নামিনি। দোতলা থেকে শুনেছি খুব হৈচৈ হচ্ছে। সকাল বেলা হাসিব বাসা ছেড়ে চলে যান।

কাউকে কিছু বলে যায়নি?

বাবাকে বলে গেছেন। আমাকে কিছু বলে যাননি।

তার থেকে কি আমরা ধারণা করতে পারি যে সে বুঝতে পেরেছিল শরিফা নয়, গভীর রাতে তুমি তার ঘরে উপস্থিত হয়েছিলে?

নিশি চুপ করে রইল।

তুমি কি পরে তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছ।

করেছি। পাইনি। যে কম্পিউটারের দোকানে তিনি কাজ করতেন সেখানেও তিনি আর ফিরে যাননি।

তুমি যদি চাও আমি তাকে খুঁজে বের করার একটা চেষ্টা করতে পারি। হারানো মানুষ খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমার নাম আছে। তুমি কি চাও?

না, আমি চাই না। খাটের নিচে যে আমি শরিফাকে দেখতাম সেই সম্পর্কে বলুন। আপনার ধারণাটা কী শুনি।

তুমি যে খাটের নিচে অনেক কিছু দেখতে পাও এইসব সত্যিও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। তোমার মাথার একটা অংশ এখন কাজ করছে না। সেই অংশ নানান ছবি তৈরি করে তোমাকে দেখাচ্ছে। তবে দেখালেও তুমি জান—এইসব মায়া। তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতি একটি মেয়ে। তুমি বুঝতে পারবে না তা না।

আমার ছোট মা, এবং বাবা এরাও কিন্তু শরিফাকে দেখেছেন।

শোন নিশি, আমি তো ওদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি মাথা ঘামাচ্ছি তোমার সমস্যা নিয়ে। তুমি কী দেখছ না দেখছ সেটা নিয়েই বিচার-বিবেচনা হবে। আমার এখন ক্ষিধে লেগেছে, আমাকে খেতে দাও।

নিশি নড়ল না, বসেই রইল।

মিসির আলি বললেন, তোমার জীবনটা কাটছে একটা তন্দ্রার মধ্যে। তুমি যা ভাবছ যা করছ তা আর কিছু না—তন্দ্রাবিলাস। তন্দ্রাবিলাস নামটা খুব সুন্দর মনে হলেও তন্দ্রবিলাসের জগৎটা মোটেই সুন্দর না। ভয়াবহ ধরনের অসুন্দর। এই জগতের সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে এ জগতের বাসিন্দারা মনে করে তাদের জগতটাই সত্যি। যা আসলে সত্যি না। আমি মনে প্রাণে কামনা করি—তন্দ্রাবিলাসের জগৎ থেকে তুমি একদিন বের হয়ে আসবে।

নিশি নড়ে বসল। মিসির আলি বলেন, তুমি কিছু বলবে?

নিশি চাপা গলায় বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

কোথায় যাব?

আমার শোবার ঘরে।

কেন?

শরিফা আমার ঘরে বসে আছে। আপনি তাকে দেখবেন, তার সঙ্গে কথা বলবেন।

আমি দেখতে চাচ্ছি না নিশি। তোমার ভয়ংকর জগতের অংশ আমি হতে চাই না।

আসুন না প্লিজ।

না। শোন নিশি আমি যখন না বলি তখন সেই 'না' কখনো হ্যাঁ হয় না। ঐ প্রসঙ্গ থাক। ভাল কথা, তুমি যে ঐ দিন টেলিফোনে ফট করে বলে দিলে দোকানের মালিকের মেয়ের নাম লায়লা— কীভাবে বললে? আমি অনেক চিন্তা করেও বের করতে পারিনি।

আমি যদি বলি শরিফা আমাকে বলেছে আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

না।

আপনার ক্ষিধে পেয়েছে আসুন খাবার দি।

মিসির আলি খুব তৃপ্তি করে খেলেন। সামান্য খাবার কিন্তু খেতে এত ভাল হয়েছে।

আলু ভর্তার উপর মেয়েটি গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিল। গন্ধে চারদিক ম ম করছে।

আপনাকে কি শুকনো মরিচ ভেজে দেব? একটা বইয়ে পড়েছিলাম ভাজা শুকনো মরিচ আপনার খুব পছন্দ।

দাও।

নিশি মরিচ ভেজে নিয়ে এল। কী যত্ন করেই না মেয়েটি তাঁর প্লেটে খাবার তুলে দিচ্ছে। মিসির আলি হঠাৎ লক্ষ্য করলেন মেয়েটির চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

একবার তাঁর ইচ্ছে হল নিজের হাতে মেয়েটির চোখের জল মুছে দেন—পর মুহূর্তেই মনে হল—না, নিশির চোখের জল মুছিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁর না। তাঁর দায়িত্ব জলের উৎস মুখ খুঁজে বের করা। এই কাজটা তিনি করেছেন। তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়েছে। মেয়েটি যদি তার চোখের জল মুছতে চায় তাহলে তাকেই তা করতে হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘ বলেছে যাব যাব

১

একদল হাঁসের সঙ্গে সে হাঁটছে।

তার মানেটা কী? সে হাঁসদের সঙ্গে হাঁটবে কেন? সে তো হাঁস না। সে মানুষ। তার নাম হাসানুর রহমান। বয়স আটাশ। মোটামুটি সুদর্শন। লাল রঙের শার্ট পরলে তাকে খুব মানায়। সে কেন হাঁসদের সঙ্গে ঘুরছে?

হাঁসের দল জলা জায়গায় নেমে পড়ল। সেও তাদের সঙ্গে নামল। হাঁসরা শামুক গুগলি জাতীয় খাবার খাচ্ছে। সেও খাচ্ছে। কপ কপ করে খাচ্ছে। ঝিনুকের খোল খুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। একটা হাঁস তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। হাঁসটার চোখ মানুষের চোখের মতো বড় বড়। কাজল পরানো। হচ্ছেটা কী? এটা কি কোনো দুঃস্বপ্ন? দুঃস্বপ্ন তো বটেই।

হাসান প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল দুঃস্বপ্নটা থেকে জাগতে। হাঁস না তাকে স্বাভাবিক মানুষ হতে হবে। শামুক খেতে তার অসহ্য লাগছে। দুঃস্বপ্নটা কাটছে না—বরং আরো গাঢ় হচ্ছে। জলা জায়গাটা এখন নদীর মতো হয়ে গেছে। নদীতে প্রবল স্রোত। সে স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে না। স্থির হয়ে ভাসছে—যদিও সে সাঁতার জানে না। ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্ন। স্বপ্নেই মানুষ আকাশে উড়তে পারে, প্রবল স্রোতেও স্থির হয়ে ভাসতে পারে।

আহ্ এই দুঃস্বপ্নের ঘুম ভাঙে না কেন? হাসান পাশ ফিরল। পাশ ফিরতেই সিগারেট লাইটারের খোঁচা লাগল পিঠে। সে চোখ মেলল। ভাগ্যিস পাশ ফিরেছিল। পাশ ফেরার কারণে ঘুম ভাঙল।

স্বপ্নের কর্মকাণ্ডের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না। স্বপ্ন নিয়ে রাগ করারও কোনো মানে হয় না। কিন্তু হাসানের রাগ লাগছে। এমন উদ্ভট স্বপ্ন সে কেন দেখবে?

তার জীবনে উদ্ভট ব্যাপার অবশ্যি মাঝেমধ্যেই ঘটে। ঢাকা শহরে নিশ্চয়ই ঠেলাগাড়ির নিচে কেউ পড়ে নি। সে পড়েছে। মালিবাগ রেলক্রসিঙের কাছে হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা ঠেলাগাড়ি তার গায়ে উঠে গেল। একসময় সে বিস্মিত হয়ে দেখে ঠেলাগাড়ির দুই চাকার মাঝখানে সে প্রায় গিট্টু পাকিয়ে পড়ে আছে। চারপাশে প্রচণ্ড ভিড়। ট্রাফিক জ্যাম লেগে গেছে। পুলিশের সার্জেন্ট বাঁশি বাজাচ্ছে। ঠেলাগাড়ির নিচ থেকে তাকে বের করা মোটেই সহজ হয় নি। গাড়ি বোঝাই লোহার রড। সব রড নামিয়ে লোকজন ধরাধরি করে ঠেলাগাড়ি উঁচু করল, তারপরও সে বেরোতে পারল না। কারণ তার বাঁ পা ভেঙে গেছে। তাকে পুরো এক মাস পায়ে

প্লাস্টার বেঁধে শুয়ে থাকতে হল। তার এম.এ. পরীক্ষা দেয়া হল না। সেই পরীক্ষা এখনো দেয়া হয় নি। আবার কখনো দেয়া হবে—সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

হাসান বিছানায় উঠে বসল। তার ইচ্ছে করছে আগুনগরম এক কাপ চা খেতে। সবার বাড়িতে যদি খানিকটা হোটেল ভাব থাকত তাহলে ভালো হত। খাটের পাশে টেলিফোন। টেলিফোন তুলে গম্ভীর গলায় বলা—হ্যালো রুম সার্ভিস! এক কাপ আগুনগরম চা।

এ বাড়িতে সকালবেলা এক কাপ চা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। নাশতা খাওয়া শেষ হবার পর সবার জন্যে যখন গণ-চা হবে তখনই পাওয়া যাবে। তার আগে না।

রান্নাঘরে দু বার্নারের একটা গ্যাসের চুলা। সকালবেলা গ্যাসের চাপ কমে যায়। একটা চুলা অনেক কষ্টে ধিকি ধিকি করে জ্বলে। সেই চুলায় নাশতা তৈরি হয়। রুটি-ভাজি, কিংবা রুটি-হালুয়া। হাসানের বড় ভাই তারেক ভাত খেয়ে অফিসে যান। তার জন্যে ভাত রান্না হয়। তারেকের দুই পুত্রের স্কুলের টিফিন বানানো হয়। চুলা কখনো খালি থাকে না। এমন পরিস্থিতিতে সকালে বেড-টি চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবার কথা।

কোনো একটা ব্যাপার মাথার ভেতর ঢুকে গেলে সেটা আর বেরোতে চায় না। গ্রামোফোনের কাঁটা রেকর্ডের মতো বাজতেই থাকে। "এক কাপ আগুনগরম চা" এই বাক্য হাসানের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল। হাসান বিছানা থেকে নামল। বাসার সামনের রাস্তা পার হলেই ইস্কান্দর মিয়ার চায়ের দোকান। এক কাপ চা চট করে খেয়ে আসা যায়। সকালবেলার বিরক্তিকর কর্মকাণ্ড, যেমন—দাঁত ব্রাশ, দাড়ি কামানো আপাতত স্থগিত থাকুক।

হাসান লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। লুঙ্গি পরে বাসা থেকে বের হওয়া যাবে না। রীনা ভাবী একগাদা কথা শুনিয়ে দেবে। রীনা ভাবীর প্রেস্টিজজ্ঞান খুব বেশি।

বারান্দায় বের হতেই হাসান রীনার মুখোমুখি হয়ে গেল। রীনার হাতে লাল রঙের প্লাস্টিকের বালতি। বালতিভর্তি কাপড়। এই কাপড়ে সে নিজ হাতে সাবান মাখিয়ে কলতলায় রেখে আসবে। কাজের মানুষের হাতে সাবান ছেড়ে দিলে দুদিনে একটা করে সাবান লাগবে।

রীনা শান্তগলায় বলল, হাসান তুমি আজ অবশ্যই তোমার কোটিপতি বন্ধু রহমানদের বাড়িতে যাবে। তার দাদি খুব অসুস্থ। তিনি তোমাকে দেখতে চান।

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না, অবশ্যই যাবে। রহমান কাল সন্ধ্যাবেলা এসে বলে গেছে। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। রহমানের দাদির ব্যাপারটা কী? উনি প্রায়ই তোমাকে দেখতে চান কেন?'

'জানি না ভাবী।'

'তোমার বন্ধু আজ যে গাড়ি নিয়ে এসেছিল, সেই গাড়ি গলি দিয়ে ঢোকে না। গলির মোড়ে রেখে আসতে হয়েছিল।'

হাসান হাসল, কিছু বলল না। রীনা কলতলার দিকে রওনা হতে গিয়েও হল না। হাসিমুখে বলল, আমি নতুন একটা শাড়ি পরেছি, তুমি তো কিছু বললে না।

'নতুন শাড়ি?'

'হ্যাঁ। ছেলেদের নতুন শার্ট-প্যান্ট আর মেয়েদের নতুন শাড়ি আলাদা ব্যাপার। মেয়েদের নতুন শাড়ি পরা মানে একটা বিশেষ ঘটনা। সেই ঘটনা যখন ঘটে তখন লক্ষ্য করতে হয়।'

'তোমাকে নতুন শাড়িতে খুবই সুন্দর লাগছে ভাবী।'

রীনা এমনিতেই সুন্দর। আজ আরো বেশি সুন্দর লাগছে। ঘুম থেকে উঠেই সে গোসল করেছে। সুন্দর করে সেজেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে। কাজলদানিতে কাজল ছিল না। থাকলে কাজলও দিত।

রীনা বলল, সুন্দর মানুষকে সুন্দর লাগবে না?

'তুমি রাজকন্যা সেজে ধোপানীর মতো কাপড় ধুতে যাচ্ছ এটা মানাচ্ছে না।'

'মালাচন্দন নিয়ে কদমগাছের নিচে বসে থাকলে মানাত তাই না?'

রীনা হাসতে হাসতে কলতলার দিকে চলে গেল। যদিও সে হাসছে কিন্তু তার মনটা খুব খারাপ। আজ একটা বিশেষ উপলক্ষে সে নতুন শাড়ি পরেছে। আজ তাদের বিয়ের ন' বছর পূর্ণ হল। দিনটার কথা তারেকের মনে নেই। সে ভুরু কুঁচকে খবরের কাগজ পড়ছে। রীনা আজকের দিনের ব্যাপারটা কায়দা করে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে—বলেছে, তুমি তো রোজই শার্ট-প্যান্ট পরে অফিসে যাও আজ এক কাজ কর, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে যাও। তোমার জন্যে আজ একটা পাঞ্জাবি কিনেছি। তারেক খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বিরক্ত গলায় বলেছে—অফিস কি শ্বশুরবাড়ি নাকি যে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে চোখে সুরমা দিয়ে যাব? মাঝে মাঝে কী অদ্ভুত কথা যে তুমি বল!

রীনার মুখে কঠিন কিছু কথা এসে গিয়েছিল সে নিজেকে সামলাল। কী দরকার কঠিন কথা বলার? আজ সারাদিন সে মেজাজ খারাপ করবে না। কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। রাতে পোলাও রান্না করবে। হঠাৎ পোলাও কেন জিজ্ঞেস করলে বলবে—বাচ্চারা অনেকদিন থেকেই পোলাওয়ের জন্যে ঘ্যানঘ্যান করছিল, ওদের ঘ্যানঘ্যানানি থামানোর জন্যে পোলাও। মিথ্যা বলা হবে না, তার দুটা বাচ্চাই পোলাওয়ের জন্যে পাগল। রোজই খেতে বসে বলবে—মা পোলাও খাব।

চায়ের স্টলে ঢুকতে গিয়ে হাসান ছোটখাটো একটা ধাক্কার মতো খেল। তার বাবা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার জনাব আশরাফুজ্জামান সাহেব চায়ের স্টলে বসে আছেন। তিনি বেশ আরাম করে পরোটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন। তাঁর সামনে দুটা বাটি—একটায় সবজি, অন্যটায় রসে ডুবানো একটা রসগোল্লা। আশরাফুজ্জামান চোখ মেলে ছেলেকে দেখলেন। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চোখ নামিয়েও নিলেন। মনে হল তাঁর গলায় পরোটা বেজেও গেল। তিনি খুক্ খুক্ করে কাশতে লাগলেন।

বয়সের সঙ্গে মানুষ যে কত দ্রুত বদলায় বাবাকে দেখে হাসান ব্যাপারটা বুঝতে পারছে। এক সময় এই মানুষটার সংসারঅন্ত প্রাণ ছিল—ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার আগে নফল রোজা করতেন। ফাইনাল পরীক্ষার আগে তারা যেন রাত দুটা পর্যন্ত পড়াশোনা করে সে জন্যে নিজে ঘুম ঘুম চোখে পাশে বসে থাকতেন।

সেই মানুষের এখন আর কোনো কিছুতেই আগ্রহ নেই। বড় ছেলের বাসায় তাঁর একটা ঘর আছে তিনি সেখানে বাস করছেন—এই তো যথেষ্ট। ছেলেদের কার চাকরি আছে, কার নেই তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী হবে? পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় হয়ে গেছে, এখন শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবা যায়। ক্ষিধে লাগলে চুপিচুপি চায়ের স্টলে বসে—পরোটা রসগোল্লা দিয়ে নাশতা। মন্দ কী?

আশরাফুজ্জামান বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, কী রে চা খাবি?

হাসান কিছু বলল না। তার উচিত চলে যাওয়া, যাতে তিনি আরাম করে খাওয়াটা শেষ করতে পারেন। কিছু না বলে চলে যেতেও অস্বস্তি লাগছে। আশরাফুজ্জামান বললেন, মর্নিংওয়াক শেষ করে এখন ক্ষিধে লাগল—বাসার নাশতা কখন হয় তার নেই ঠিক—গরম গরম পরোটা আছে খা-না। আমি দাম দিচ্ছি।

হাসান বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে। এ কী অদ্ভুত কথা—"আমি দাম দিচ্ছি"। হাসান বাবার সামনে বসল। একই বাড়িতে দুজন বাস করে, কিন্তু দুজন এখন কত দ্রুত দুদিকে চলে যাচ্ছে। এই দূরত্ব এখন বোধহয় আর দূর হবার নয়।

আশরাফুজ্জামান আনন্দিত গলায় বললেন, পরোটা কী দিয়ে খাবি? মুরগির লটপটি দিয়ে খাবি? বেশ ভালো।

'মুরগির লটপটিটা কী?'

'কলিজা গিলা পাখনা এইসব দিয়ে ঝোলের মতো বানায়। বেশ ভালো।'

'তুমি কি প্রায়ই এখানে নাশতা কর?'

'মাঝে মাঝে খাই। বৃদ্ধ বয়সে রুচি নষ্ট হয়ে যায়। তখন রুচি বদলের জন্যে হোটেল মোটেলের খাবার খাওয়া। রসগোল্লা খাবি?'

'তুমি কি নিয়মিত রসগোল্লাও খাচ্ছ? তোমার ভয়াবহ ডায়াবেটিস.....'

'শেষ সময় এখন আর ডায়াবেটিস নিয়ে ভেবে কী হবে? তোকে একটা রসগোল্লা দিতে বলব?'

'বল।'

'এখানে যে নাশতা করি—বউমা যেন না শোনে। রাগ করবে। মেয়েরা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই রাগ করে। এদের সঙ্গে তর্ক করাও বৃথা। তুই আরেকটা পরোটা নিবি?'

'না।'

নাশতা শেষ করে হাসান বাসায় ফিরল না। বেকার মানুষ একবার ঘর ছেড়ে বেরোলে রাত গভীর না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরতে পারে না। সে রওনা হল রহমানদের বাসার দিকে। রহমানরা থাকে উত্তরায়—সকালবেলা ওইদিকে আরাম করে যাওয়া যায়। বাস ফাঁকা থাকে। জানালার পাশে একটা সিট দখল করে হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া। সমস্যা হচ্ছে—যেতে ইচ্ছা করছে না। না যাবার মতো কোনো অজুহাত যদি থাকত। বাস ড্রাইভার্স এসোসিয়েশন স্ট্রাইক ডেকেছে ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে বন্ধ। রহমানকে বলা যাবে—খুব ইচ্ছা ছিল, বাস নেই, করব কী?

সমস্যা হচ্ছে হাসান মিথ্যা কথা বলতে পারে না। একেবারেই পারে না। দু ধরনের মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না। সবল মনের মানুষ এবং দুর্বল মনের মানুষ। হাসানের ধারণা সে দুর্বল মনের মানুষ। রহমানদের বাড়িতে তার যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু সে জানে শেষ পর্যন্ত সে উপস্থিত হবে। দুর্বল মনের মানুষরা তাই করে।

রহমানের দাদি আম্বিয়া খাতুনের বয়স প্রায় নব্বই। গত পাঁচ বছর প্যারালিসিস হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। চোখে দেখেন না, তবে কান এবং নাক অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আম্বিয়া খাতুন হাসানকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। কেন করেন সেই কারণ খুব স্পষ্ট না। হাসান নিজেও কারণ খুঁজতে যায় নি। স্নেহমমতার পেছনে কারণ খুঁজতে যাওয়ার মধ্যে ছোটলোকামি আছে। হাসান দুর্বল মনের মানুষ হলেও ছোটলোক না।

রহমানের বাবা সেকান্দর আলি পুলিশের সাবইন্সপেক্টর ছিলেন। ঘুস খাবার অপরাধে তাঁর চাকরি চলে যায়। তিনি ব্যবসা শুরু করেন—এবং দেখতে দেখতে ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে যান। উত্তরায় দশ কাঠা প্লটে তিনি যে বাড়ি করেছেন তা দেখলে পুলিশের সব সাবইন্সপেক্টরই ভাববে—ঘুস খাবার অপরাধে কেন আমাদের চাকরি যাচ্ছে না।

টাকা-পয়সার সঙ্গে মানুষের রুচি এবং মানসিকতা বদলায়। সেকান্দর আলি সাহেবের পরিবারের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি ঘটে নি। তারা আগে যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ির সদস্যরা যদি নাভিতে সরিষার তেল দিয়ে রোদে শুয়ে থাকে তাহলে কেমন যেন মানায় না। সেকান্দর আলি সাহেবের পরিবারের সদস্যদের দিকে তাকালে মনে হয় তারা সবাই যেন নীরবে বলছে—দূর ভালো লাগে না, আগে যখন গরিব ছিলাম তখনই ভালো ছিলাম।

হাসান রহমানদের রাজপ্রাসাদে পৌঁছল সকাল এগারটায়। পোজপাজ আগে যা ছিল তার চেয়েও বেড়েছে। পোশাক পরা দুই দারোয়ান—একজনের হাতে ব্যাটন।

রহমান বাসায় ছিল না। সেটা কোনো সমস্যা না। হাসানকে এ বাড়ির সবাই চেনে। সে যে আজ আসবে, এটাও সবাই জানে। সেকান্দর আলি সাহেব বিরক্তমুখে বারান্দার সোফায় বসে আছেন। তাঁর খালি গা। বিশাল ভুঁড়ি উঠানামা করছে। সকালবেলা দেখার মতো কোনো সুন্দর দৃশ্য না। সেকান্দর আলি সাহেব তাকে দেখে বললেন, যাও দেখা দিয়ে আস তোমার জন্যে দম আটকে আছে কি না কে জানে। পরশু থেকে তোমার কথা বলছে। আধাপাগল তো, একবার মাথায় কিছু ঢুকে গেলে আর বের হয় না।

'এখন অবস্থা কী?'

'অবস্থা আর কী, অক্সিজেন চলছে। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। কাল রাত তিনটায় শ্বাস উঠল—আমি ভাবলাম ঘটনা বুঝি ঘটেই যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিয়ে আনালাম। ভোরবেলা আবার দেখি সামলে উঠেছেন। দুঃখ-কষ্টে মানুষ হয়েছেন তো, শক্ত শরীর।'

হাসান কিছু বলল না। সেকান্দর আলি বিরক্ত গলায় বললেন, গত তিন দিন ধরে কাজকর্ম বাদ দিয়ে ঘরে বসে আছি। কোন একটা কাজে যাব—মার দম বের হয়ে যাবে। শেষ সময়ে দেখা হবে না। ঠিক বললাম না?

'জ্বি ঠিক বলেছেন।'

'তুমি যাও দেখা করে আস।'

'উনার জ্ঞান আছে তো?'

'জ্ঞান আছে মানে? টনটনা জ্ঞান। এখনো তার সাথে তুমি কথায় পারবে না। তুমি একটা কথা বললে তোমাকে দশটা কথা শুনিয়ে দেবে।'

আম্বিয়া খাতুন বোধহয় ঘুমোচ্ছিলেন। সাধারণত তাঁর ঘরে পা দেয়ামাত্র তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, কে? আজ একেবারে বিছান পাশে এসে দাঁড়াবার পর বললেন, কে?

হাসান বলল, দাদিমা আমি হাসান।

'তোকে খবর দিয়েছে কখন?'

'কাল সন্ধ্যায়।'

'এখন বাজে কয়টা?'

'এগারটা।'

'কতক্ষণ পর দেখা করতে এলি?'

'সতের ঘণ্টা পর।'

'এত দেরি হল কেন?'

'দাদিমা আমি খবর পেয়েছি আজ সকালে।'

'তোর চাকরি বাকরি এখনো কিছু হয় নি?'

'না।'

'ব্যবসাপাতি করবি?'

'না।'

'না কেন? ব্যবসা কি খারাপ? আমাদের নবীজী কি ব্যবসা করেন নি?'

'আমি তো তাঁর মতো না দাদিমা। সাধারণ মানুষ।'

'সাধারণ মানুষ না। তুই গাধামানুষ।'

'হতে পারে।'

'তোর বন্ধুবান্ধব সব চাকরি বাকরি পেয়ে গেল তুই পেলি না। এটা কেমন কথা!'

'পেয়ে যাব।'

'কবে পাবি? খবরটা তো শুনেও যেতে পারব না যে তোর চাকরি হয়েছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বিছানার পাশে বোস—নাকি রোগীর বিছানায় বসতে ঘেন্না লাগে!'

হাসান বসল। বৃদ্ধা এক হাতে হাসানের হাত ধরলেন, ক্লান্ত গলায় বললেন, ব্যবসাপাতি যদি করতে চাস, বল, আমি সেকান্দরকে বলব। সেকান্দর আমার কথা ফেলবে না। পাপী ছেলে তো এই জন্যেই ফেলবে না। পাপী ছেলেপুলে বেশি মাতৃভক্ত হয়। তাদের মন থাকে দুর্বল। সব সময় মনে করে—'মা' মনে কষ্ট পেলে সর্বনাশ হবে। আসলে হয় না কিছুই। আল্লাহপাক কপালে যা লিখে রেখেছেন তাই হয়। মাকে ভক্তি করলেও হয়, মাকে ভক্তি না করলেও হয়। হাসান!

'জ্বি।'

AMARBOI.COM

'দুপুরে খেয়ে যাবি। ওরা আজ আমার রোগমুক্তির জন্যে ফকির খাওয়াচ্ছে। খিচুড়ি রান্না হয়েছে। দুই পদের খিচুড়ি হয়েছে—ফকির মিসকিনদের জন্যে ইরি চালের খিচুড়ি, আর ঘরের মানুষের খাবারের জন্যে কালিজিরা চালের খিচুড়ি।'

'আমি কোন খিচুড়ি খাব?'

'তুই তো ফকির মিসকিনের মতোই। তুই খাবি ইরি চালের খিচুড়ি। রাগ করলি?'

'জ্বি না।'

'আমি সেকান্দরকে ডেকে বললাম, বাবা দুই পদের খিচুড়ি করলি কোন আন্দাজে? গরিব মানুষকে খাওয়াবি—ভালো কিছু খাওয়া। সে বলল, মা চিকন চালের খিচুড়িতে ওদের পেট ভরে না। এই জন্যেই মোটা চাল। আমি তখন বললাম, খুব ভালো বুদ্ধি করেছিস। শোন বাবা, তুই আজ মোটা চালের খিচুড়ি খাবি। এটা আমার আদেশ। এই শোনার পর থেকে সেকান্দর আলি মুখ শুকনা করে বসে আছে। তার কত বড় ভুঁড়ি হয়েছে দেখেছিস। চার-পাঁচ বালতি চর্বি আছে ওই ভুঁড়ির ভেতর। হি হি হি।'

আম্বিয়া খাতুন শব্দ করে হাসতে লাগলেন। হাসির দমকে নাক থেকে অক্সিজেনের নল ছুটে গেল। নার্স এসে নল লাগিয়ে হাসানকে কঠিন গলায় বলল—রোগীকে শুধু শুধু হাসাবেন না। ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনের রোগী। আপনি এখন যান।

হাসান বের হয়ে এল। আম্বিয়া খাতুন তখনো হাসছেন। মহিলার কি মাথা আউলা হয়ে গেছে? দাঁত নেই মানুষের হাসিতে অশরীরী ভাব থাকে। গা ছমছম করে। হাসানের গা ছমছম করছে।

সেকান্দর আলি বললেন, চলে যাচ্ছ নাকি?

হাসান বলল, জ্বি না।

'মার সঙ্গে দেখা তো হয়েছে। শুধু শুধু বসে থেকে কী করবে, চলে যাও।'

'দাদিমা খেয়ে যেতে বললেন। মোটা চালের খিচুড়ি খেতে বললেন।'

'ও আচ্ছা, তাহলে খেয়ে যাও। দেরি হবে কিন্তু। এখন ফকির মিসকিনদের খাওয়াবে। রান্না হয় নি এখনো। রান্না হবে তার পর। ফকির ব্যাচ শেষ হলে আমাদের খাওয়া। তিনটা বেজে যাবে। থাকবে এতক্ষণ?'

'জ্বি।'

'বেশ থাক। এখন করছ কী?'

'কিছু করছি না।'

'রহমান যে বলল হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে কী কাজ করছ।'

'তেমন কিছু না। যা করছি তাকে চাকরি বলা যায় না।'

'কোনো কাজকেই ছোট করে দেখবে না হাসান। কোনো কাজই ছোট না। শিক্ষিত ছেলেপুলেদের এই এক সমস্যা হয়েছে। চাকরির জাতিভেদ করে ফেলেছে। কাজ হচ্ছে কাজ।'

'জ্বি।'

'তিনটা পর্যন্ত চুপচাপ বসে না থেকে তুমি বরং ঘুরে টুরে এসো। দুটা-আড়াইটা নাগাদ চলে এসো। অসুস্থ মানুষের বাড়িতে বসে থাকাও তো যন্ত্রণা।'

'আমার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না।'

সেকান্দর সাহেব বললেন, তাহলে থাক। লাইব্রেরিঘরে গিয়ে বোস। বইটই পড়। লাইব্রেরিঘরটা নতুন করেছি। কনকর্ডকে দিয়ে ডিজাইন করানো। চার লাখ টাকা নিয়েছে লাইব্রেরি করতে। অল বার্মাটিক। এখন তো আর বই পড়া হয় না। শেষ বয়সে পড়ব এই জন্যে লাইব্রেরি বানানো। যাও দেখ গিয়ে—শেলফ থেকে বই যদি নামাও তাহলে যেখানকার বই সেখানে তুলে রাখবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

চার লাখ টাকা দামের বার্মাটিকের লাইব্রেরি দেখার ব্যাপারে হাসানের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে লাইব্রেরিঘরের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। সামনে খবরের কাগজ আছে কিন্তু পড়তে ইচ্ছা করছে না। বেকার মানুষ খবরের কাগজ পড়তে পারে না—এই তথ্যটা কি কেউ জানে? মনে হয় জানে না। নতুন বেকাররা অবশ্যি পত্রিকা হাতে নেয়, আগ্রহ নিয়ে কর্মখালি বিজ্ঞাপন পড়ে। পুরোনো বেকাররা তাও করে না। সে পুরোনো বেকার।

খবরের কাগজে মজার কিছু কি আছে? বাণী চিরন্তনী, কিংবা শব্দজট, এস ওয়ার্ড পাজল?

চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এই সবের উপর চোখ বোলানো যায়। শব্দজট পাওয়া গেল। শব্দগুলো উলটপালট করে লেখা—মূল শব্দ খুঁজে বের করতে হবে। হাসান অনাগ্রহ নিয়ে শব্দগুলো দেখছে—

কুলাশন্ত
ণত্রারিপ
জ্ঞভিতাঅ

শেষের দুটা পারা গেল—পরিত্রাণ এবং অভিজ্ঞতা। প্রথমটা কী? ধাঁধা-শব্দজট এই ব্যাপারগুলো ভয়াবহ, একবার মাথায় ঢুকে গেলে আর বেরোতে চায় না। মাথায় ঘুরতে থাকে। খুবই অস্বস্তি লাগে। হাসানের মাথায় ঘুরছে কুলাশন্ত, কুলাশন্ত, কুলাশন্ত, কুলাশন্ত। আসল শব্দটা কী? পারমুটেশন কম্বিনেশনে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না—

লাশন্তকু
কুশলান্ত
ন্তশলাকু

কিছুই তো হচ্ছে না। ভাবতে ভাবতে হাসানের মাথা ধরে গেল। সে মাথা ধরা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। আশ্চর্য কাণ্ড ঘুমের মধ্যে আবারো সেই উদ্ভট স্বপ্ন। সেই হাঁসের দলের সঙ্গে সে। এবারের হাঁসগুলো মানুষের মতো কথা বলছে। সর্দিবসা গলায় খ্যাস খ্যাস করে কথা। হাসান তার পাশের হাঁসটাকে জিজ্ঞেস করল—তুমি শব্দজট ছাড়াতে পার?

হাঁসটা বলল, জ্বি স্যার পারি।

'কুলাশন্ত জট ছাড়ালে কী হবে?'

'এটা পারব না। এটা পারব না।'

'তোমাদের মধ্যে কেউ পারবে না?'

'জ্বি না। তবে একজন পারতে পারে—তার খুব বুদ্ধি।'

'সে কে?'

'তার নাম শকুন্তলা।'

'হাঁসের নাম শকুন্তলা?'

'জ্বি। আপনাদের যেমন নাম আছে—আমাদেরও আছে। ওই যে শকুন্তলা। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন।'

'জিজ্ঞেস করতে হবে না। শব্দজট দূর হয়েছে। কুলাশন্ত হল শকুন্তলা।'

হাসানের ঘুম ভাঙল। আশ্চর্য—বেলা পড়ে এসেছে। ঘড়িতে বাজছে চারটা দশ। এত লম্বা ঘুম সে দিল কীভাবে? সে কি অসুস্থ? অসুস্থ মানুষরাই সময়ে-অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে উদ্ভট এবং জটিল স্বপ্ন দেখে।

বাড়িতে কোনো সাড়াশব্দ নেই। ফকির মিসকিনরা কি খিচুড়ি খেয়ে চলে গেছে? তাকে কেউ ডাকে নি। রেডক্রস আঁকা একটা গাড়ি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আম্বিয়া খাতুনকে দেখতে কোনো ডাক্তার বোধহয় এসেছেন। হাসানের পেট চক্কর দিয়ে উঠছে। সে রাস্তার পাশে বসে হড়হড় করে বমি করল।

শরীরটা আসলেই খারাপ করছে। মাথা টলমল করছে। বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। কী হবে বাসায় ফিরে?

'স্যার আপনের কী হইছে?'

খালি একটা রিকশা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। প্রশ্নটা করছে রিকশাওয়ালা। তার গলায় কৌতূহলের চেয়েও মমতা বেশি। একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনে এক শ বার সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে মমতা ও করুণায় আর্দ্র কথা শুনবে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন মানুষ বাড়িয়ে দেবে সাহায্যের হাত। এই রিকশাওয়ালা কি সেই এক শ জনের এক জন?

'স্যার আপনার কী হইছে?'

'কিছু না। হঠাৎ শরীরটা খারাপ করেছে।'

'বাড়িত যান। বাড়িত গিয়া ঘুমান। আহেন রিকশাত উঠেন লইয়া যাই।'

'রিকশা করে যাবার ভাড়া নেই রে ভাই।'

'ভাড়া লাগব না, আহেন।'

হাসানের কাছে রিকশা ভাড়া আছে। রিকশাওয়ালা সেই এক শ জনের এক জন কি না তা পরীক্ষা করার জন্যেই কথাগুলো বলা। মনে হচ্ছে এই রিকশাওয়ালা সেই এক শ জনেরই এক জন।

'স্যার যাইবেন কই?'

হাসান কিছু বলল না। রিকশায় উঠলেই তার মানসিকতা একটু যেন বদলে যায়। নির্দিষ্ট কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। রিকশাওয়ালা তার ইচ্ছেমতো নানান জায়গায় নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে রিকশা থামিয়ে রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে চা খাবে। আনন্দময় মন্থর ভ্রমণ। স্কুলে রচনা আসে—এ জার্নি বাই ট্রেন, এ জার্নি বাই বোট। জার্নি বাই রিকশা রচনাটা আসে না কেন?

'স্যার যাইবেন কই?'

হাসান দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল—চলতে থাক। রিকশাওয়ালা হাসল। তবে কথা বাড়াল না। সে ধীরেসুস্থে প্যাডেল চাপছে। হাসান হুড ধরে চুপচাপ বসে আছে। তার মাথা খানিকটা টালমাটাল করছে। বমি করার পর মুখ ধোয়া হয় নি। সমস্ত শরীরই কেমন অশুচি অশুচি লাগছে। কোনো একটা ফোয়ারার পাশে রিকশা থামিয়ে ফোয়ারার পানিতে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। ফোয়ারাগুলো নাকি কোটি কোটি টাকা খরচ করে বানানো হয়েছে। শহরের সৌন্দর্যবর্ধন করা হচ্ছে। হাসান আকাশের দিকে তাকাল। মেঘে মেঘে আকাশ কালো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের লাইন মনে আসছে—মেঘের পরে মেঘ জমেছে। আচ্ছা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি কখনো রিকশায় চড়েছেন? মনে হয় চড়েন নি। রিকশায় চড়লে সুন্দর একটা বর্ণনা পাওয়া যেত। হাসানের পেট আবার পাক দিচ্ছে। আবারো কি বমি হবে? ঝুম বৃষ্টি নামলে খুব ভালো হত। বৃষ্টিতে নেয়ে ফেলা যেত। কদিন ধরেই রোজ বিকেলে মেঘ করছে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না।

রীনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সকালবেলার নতুন শাড়িটা তার গায়ে নেই। সে পুরোনো একটা শাড়ি পরেছে। বেগুনি এবং গোলাপির মাঝামাঝি রং। নতুন অবস্থায় শাড়িটা পরলে নিজেকে খুব চকচকে লাগত। পুরোনো হয়ে শাড়িটা সুন্দর হয়েছে। এই শাড়ি পরে রীনা দাঁড়িয়ে আছে, কারণ একদিন তারেক বলেছিল—বা! শাড়িটায় তো তোমাকে খুব মানিয়েছে। রীনার ধারণা তারেকের এটা কথার কথা। হঠাৎ কী মনে হয়েছে—বলেছে। শাড়ির দিকে ভালোমতো না তাকিয়েই বলেছে। স্বামীরা স্ত্রীদের খুশি করার জন্যে মাঝে মাঝে এ ধরনের কথা বলে। যে শাড়িটা পরার জন্যে স্বামী খুব সুন্দর বলে সেই শাড়ি পরে পরলে স্বামী ফিরেও তাকায় না।

রাত দশটার মতো বাজে। তারেকের জন্যে অপেক্ষা। অফিস থেকে বিকেলে বাসায় ফিরেছে। এক কাপ চা খেয়ে হাসিমুখে বলেছে—রীনা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, আধঘণ্টার মধ্যে ফিরব। রীনা বলেছে, যাচ্ছ কোথায়? তারেক জবাব দেয় নি। মুখ টিপে হেসেছে। রীনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরেই নিয়েছে—তারেকের শেষ মুহূর্তে বিয়ের দিনের কথাটা মনে পড়েছে। সে যাচ্ছে কিছু একটা কিনতে। পাঁচ–ছ'টা সস্তার মরা মরা গোলাপ কিনবে। বেলিফুলের মালা ভেবে যে মালাটা কিনবে সেটা আসলে রজনীগন্ধা ফুলের মালা। যা ইচ্ছা কিনুক—বিয়ের দিনের কথাটা মনে পড়েছে এই যথেষ্ট।

এখন মনে হচ্ছে তারেক উপহার কিনতে যায় নি। কোনো কলিগের বাসায় গিয়েছে। বিয়ের দিনের কথাটা তার মনেও নেই। আসলে বিয়ের দিনটাকে মেয়েরা যত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ছেলেরা হয়তো ততটা করে না। ঘরে সে আজ পোলাও রান্না করেছে। বাচ্চা দুটার এত শখের পোলাও। ওরা না খেয়েই ঘুমিয়েছে। ব্যাপারটা ঘটেছে রীনার জন্যে। ওরা খেতে চেয়েছে—রীনা বলেছে, বাবা আসুক তারপর খাবে। বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বেচারারা ঘুমিয়ে পড়েছে। এদের ঘুম অসম্ভব গাঢ়। একবার ঘুমোলে আর জাগবে না। তারেকও নিশ্চয়ই খেয়ে আসবে। বিয়ের দিনে যে পোলাও রান্না হয়েছে সেটা কেউ খাবে না।

'ভাবী অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

রীনা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। লায়লা চুপিচুপি কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই মেয়ে কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটতে পারে।

লায়লা বলল, ভাইয়ার জন্যে অপেক্ষা করছ?

'না। গরম লাগছিল, তাই বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। কী অসহ্য গরম পড়েছে দেখেছ? আজ এত মেঘ করেছিল ভাবলাম বৃষ্টি হবে। বৃষ্টিতে ভিজব।'

'খবরদার ভাবী বৃষ্টিতে ভিজবে না, চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে।'

'চামড়া নষ্ট হবে কেন?'

'শহরের বৃষ্টি মানেই হল এসিড রেইন। গাড়ির ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া বৃষ্টির সঙ্গে গায়ে এসে পড়ে চামড়ার বারটা বাজিয়ে দেবে।'

রীনা হাসল। তার এই ননদ শরীরের চামড়া, মাথার চুল, চোখ এইসব ব্যাপারে খুব সাবধান। শরীর ঠিক রাখার নানান কায়দাকানুন সে করে।

'ভাবী চামড়ার সবচে ক্ষতি কিসে হয় তুমি জান?'

'না।'

'সবচে ক্ষতি করে সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে। সূর্যের আলোয় যে মেয়ে সবচে কম আসবে তার চামড়া থাকবে সবচে সুন্দর।'

তারেক আসছে। হেঁটে হেঁটে আসছে। মুখে পান। পানের পিক ফেলল—তার মানে খেয়ে এসেছে। লায়লা বলল, ভাবী ভাইয়া চলে এসেছে।

'তাই তো দেখছি।'

'তুমি ভাইয়াকে বলে আমার জন্য দু শ টাকা নিয়ে রেখো তো ভাবী। আমাদের ক্লাসে পিকনিক হচ্ছে—দু শ টাকা করে চাঁদা। ছেলেরা এক শ আর মেয়েরা দু শ। মেয়েদের হাতে নাকি টাকা বেশি থাকে এই জন্যে চাঁদা বেশি। টাকাটা কাল সকালেই দিতে হবে ভাবী।'

'আচ্ছা আমি টাকা নিয়ে রাখব।'

তারেক হাতমুখ ধুয়ে সরাসরি শোয়ার ঘরে চলে এল। রীনা বলল, ভাত খাবে না?

তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, না।

'খেয়ে এসেছ?'

'হুঁ। আমাদের এক কলিগের মেয়ের আকিকা ছিল। খাসির রেজালা ফেজালা করে হুলস্থূল করেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'রান্নাও হয়েছে ভালো। এমন খাওয়া খেয়েছি যে হাঁসফাঁস লাগছে। লবণ দিয়ে লেবুর শরবত করে দাও তো। পানিটা কুসুম কুসুম গরম করে নিও।'

রীনা রাতে কিছু খেল না। একা একা খেতে ইচ্ছা করে না। বিয়ের দিন উপলক্ষে সে খুব আগ্রহ করে পোলাও রান্না করেছিল। আশ্চর্য, সেই পোলাও কেউ খেল না। লায়লা পোলাও খায় না। হাসানের শরীর খারাপ, সে না খেয়েই শুয়ে পড়েছে। রীনার শ্বশুর গিয়েছেন কল্যাণপুর তাঁর মেয়ের বাসায়। রীনার কান্না পাচ্ছে। এত তুচ্ছ ব্যাপারে কাঁদা ঠিক না। রীনার সমস্যা হচ্ছে বড় বড় দুঃখের ব্যাপারে তার কান্না পায় না। ছোট ছোট ব্যাপারে চোখে পানি চলে আসে।

রীনা ঘুমোতে যাবার আগে হাসানের ঘরে উঁকি দিল। হাসানের ঘরের দরজা খোলা—ঘর অন্ধকার। হাসানের এই অভ্যাস—মাঝে মাঝে দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে।

'হাসান।'

'জ্বি ভাবী।'

'দরজা খোলা রেখে ঘুমোচ্ছ। দরজা লাগাও।'

'ঘুমোচ্ছি না ভাবী। জেগে আছি।'

'শরীরের অবস্থা কী?'

'অবস্থা ভালো। এখন একটু যেন ক্ষিধে ক্ষিধে লাগছে।'

'কিছু খাবে? পোলাও আছে গরম করে দেব?'

'পাগল হয়েছ। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছ কেন ভাবী ভেতরে এস।'

রীনা ঘরে ঢুকল। হাসান টেবিলল্যাম্প জ্বালাল। রীনা খাটের পাশে বসতে বসতে বলল, তুমি ভালো একজন ডাক্তার দেখাও হাসান। দুদিন পরপর তুমি অসুখ বাঁধাচ্ছ।

হাসান দেয়ালে হেলান দিয়ে খাটে বসেছে। অন্ধকারে খালি গায়ে শুয়েছিল—ভাবীকে দেখে পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে, সেই পাঞ্জাবি উল্টো হয়েছে। বুক চলে গেছে পেছনে। হাসান বিব্রত ভঙ্গিতে পাঞ্জাবি দেখতে দেখতে বলল, ভাবী আমার অসুখটা হল মনে। মনটা ঠিক নেই এই জন্যেই শরীর ঠিক থাকছে না।

'মন ঠিক নেই কেন?'

'চাকরি টাকরি পাচ্ছি না—এই জন্যেই মন ঠিক নেই।'

'তুমি না বললে হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিতে একটা কাজ করছ।'

'ওইটা কোনো কাজ না ভাবী। সপ্তাহে একদিন যাই ভদ্রলোকের কথা শুনি। খাতায় নোট করি। ওই প্রসঙ্গ থাক। আচ্ছা ভাবী হাঁস স্বপ্নে দেখলে কী হয়? ইদানীং খুব হাঁস স্বপ্নে দেখছি। ঘুমোলেই দেখি এক ঝাঁক হাঁসের সঙ্গে হাঁটছি, সাঁতার কাটছি।'

রীনা তাকিয়ে আছে। তার খুব মায়া লাগছে। হাসানকে অসহায় দেখাচ্ছে। রীনার যদি চেনাজানা কোনো মন্ত্রী থাকত তাহলে সে হাসানের চাকরির জন্যে মন্ত্রী সাহেবের পা ধরে বসে থাকত।

'ভাবী যাও ঘুমোতে যাও।'

রীনা উঠে দাঁড়াল। হাসান বলল, ভাবী এক সেকেন্ড। তোমার জন্যে সামান্য কিছু উপহার এনেছিলাম। টেবিলের উপর রেখেছি, নিয়ে যাও। আমি গরিব মানুষ—এরচে বেশি কিছু দেবার আমার ক্ষমতা নেই।

রীনা বিস্মিত হয়ে দেখল টেবিলে গোলাপ ফুলের সুন্দর একটা তোড়া। তোড়ায় ন'টা গোলাপ। তাদের বিয়ের ন' বছর আজ পূর্ণ হয়েছে। হাসান বলল, হ্যাপি ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি ভাবী।

রীনা বলল, থ্যাংক য়্যু।

তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। গোলাপগুলো এত সুন্দর! মনে হচ্ছে, এই মাত্র বাগান থেকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে।

হাসানের ঘুম আসছে না। সে এপাশ ওপাশ করছে। কাল বুধবার। হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। উনাকে কি মুখ ফুটে সে বলে ফেলবে—স্যার আমি খুব কষ্টে আছি। আমাকে পার্মানেন্ট একটা চাকরি দিন। আপনার কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না।

হিশামুদ্দিন সাহেবের কথা ভাবতে ভালো লাগছে না। ঘুমোবার আগে সুন্দর কিছু ভাবা দরকার। তিতলীর কথা ভাবা যায়। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কাল্পনিক কথাবার্তাও বলা যায়।

'তিতলী কেমন আছ?'

'ভালো আছি।'

'আজ কী গরম পড়েছে দেখেছ?'

'হুঁ।'

'তুমি কি জান আমি যে ঘরে ঘুমোই সে ঘরে কোনো ফ্যান নেই।'

'জানি না, আমি তো তোমার ঘরে কখনো ঢুকি নি।'

'আমি করি কী জান? ঘরের দরজা–জানালা সব খুলে ঘুমোই। রীনা ভাবী খুব রাগ করে। রীনা ভাবীর ধারণা, দরজা খোলা থাকলেই চোর ঢোকে। চোর ঢুকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমার ঘরে এমন কিছু নেই যে চোর এসে নিয়ে যাবে।'

'অন্য কিছু নিয়ে কথা বল তো। চোর নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'হাঁস নিয়ে কথা বলি? শোন, তিতলী হাঁস স্বপ্নে দেখলে কী হয় তুমি জান? ইদানীং আমি ঘুমোলেই শুধু হাঁস স্বপ্নে দেখছি।'

'কী হাঁস—রাজহাঁস?'

'আরে না। আমি ছোট মানুষ আমার স্বপ্নগুলোও ছোট ছোট—আমি স্বপ্নে দেখি পাতিহাঁস। একটা দুটা না—হাজার হাজার পাতিহাঁস। আমার ধারণা, আমি পাগল–টাগল হয়ে যাচ্ছি।'

তিতলী হাসছে। খিলখিল করে হাসছে। হাসান কল্পনায় একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে কিন্তু তার হাসি এত জীবন্ত। হাসান তিতলীর হাসি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। আশ্চর্য তো!

AMARBOI.COM

২

'গরম লাগছে?'

হাসান বলতে যাচ্ছিল, জ্বি না স্যার। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। গরম লাগছে না বললে বোকার মতো কথা বলা হবে। বোকার মতো কথা সে প্রায়ই বলে কিন্তু এই লোকের সঙ্গে বোকার মতো কথা বলা যাবে না। যা বলার ভেবেচিন্তে বলতে হবে। গরমে সে অস্থির বোধ করছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের কাঁঠালপাকা গরম। হাসান যদি কাঁঠাল হত এর অর্ধেক গরমে পেকে যেত। এখন ভরদুপুর। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে মাটির তল থেকে গরম ভাপ বের হয়। সেই ভাপে পচা ঘাসের গন্ধ থাকে। হাসান গন্ধ পাচ্ছে।

সে বসেছে মাঝারি সাইজের একটা ঘরে। ঘরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিরাট জানালা। জানালায় ভারি পরদা টানা বলে ঘর আবছা অন্ধকার। মেঝেতে কার্পেট বিছানো। কার্পেটের উপর শীতলপাটি। হাসানের ঠিক সামনেই বসেছেন হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের হিশামুদ্দিন সাহেব। গরম তাঁকে মনে হয় তেমন কাবু করতে পারছে না। তিনি বেশ আয়েশ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছেন। খালি গা। পরনে লুঙ্গি। হাসান লক্ষ্য করছে লুঙ্গির গিঁট খুলে গেছে। হিশামুদ্দিন সাহেব ব্যাপারটা জানেন কি না কে জানে। হয়তো জানেন না। যদি না জানেন তাহলে যে কোনো সময় একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কথাবার্তা শেষ করে হিশামুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং লুঙ্গি পা বেয়ে নেমে এল। সর্বনাশ!

হিশামুদ্দিন সাহেব পান চিবোচ্ছেন। তাঁর হাতের কাছে ধবধবে সাদা রুমাল। তিনি মাঝে মাঝে রুমালে ঠোঁট মুছছেন। সাদা রুমালে পানের রসের লাল দাগ ভরে যাচ্ছে। হিশামুদ্দিন সাহেবের বয়স কত? হাসান জানে না। ঠিক অনুমানও করা যাচ্ছে না। কিছু কিছু মানুষের বয়স ধরা যায় না। হাসানের ধারণা হিশামুদ্দিন সাহেবের বয়স চল্লিশও হতে পারে আবার ষাটের

কাছাকাছিও হতে পারে। তবে চল্লিশ হবার সম্ভাবনা কম। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে কেউ কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারে না।

হিশামুদ্দিন ঘরের সিলিঙের দিকে তাকালেন। মাথার উপর সিলিং ফ্যান ঘুরছে। ফুলস্পিডে ঘুরছে না, ধীরেসুস্থে ঘুরছে। গরম বাতাস গায়ে এসে লাগছে। হিশামুদ্দিন সাহেব প্রথম প্রশ্নটি আবারো করলেন—নিচু গলায় বললেন, হাসান তোমার গরম লাগছে?

হাসান লজ্জিত গলায় বলল, জ্বি স্যার।

বলতে গিয়ে কথা খানিকটা আটকেও গেল। যেন গরম লাগাটা ঠিক না। যেন সে একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

হিশামুদ্দিন বললেন, আজকের টেম্পারেচার কিন্তু গতকালের চেয়ে কম। গতকাল ছিল থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ থার্টি ফোর। এক ডিগ্রি কম তারপরেও গরম বেশি লাগছে। কারণটা হিউমিডিটি। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে গরম বেশি লাগে। আজ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। এর মানে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। আমার ধারণা রাত ন'টা-দশটার দিকে বৃষ্টি শুরু হবে।

হাসান চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। তার কাজই হচ্ছে কথা শুনে যাওয়া। আলোচনায় অংশগ্রহণ না করা। কথা শোনার জন্যে সে টাকা পায়। ঘণ্টা হিসেবে রেট। প্রতি ঘণ্টায় ছয় শ টাকা। শুরুতে হাসানের মনে হয়েছিল অনেক টাকা। এখন সে জানে টাকাটা আসলে খুবই কম। হিশামুদ্দিন সাহেব কখনোই তাকে বিশ-পঁচিশ মিনিটের বেশি সময় দেন না। এত সময় তাঁর কোথায়। বিশ-পঁচিশ মিনিটে যা বলেন হাসানকে তা মন দিয়ে শুনতে হয়। তার দায়িত্ব শোনা কথাগুলো গুছিয়ে লেখা। যেন কোনো ভুলভ্রান্তি না হয়। হাসানের ধারণা এই কাজটা একটা টেপরেকর্ডারে খুব ভালো করা যায়। হিশামুদ্দিন সাহেব যা বলার বলবেন। টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করা থাকবে। কথাবার্তা শেষ হবার পর সে ক্যাসেট বাসায় নিয়ে যাবে। ক্যাসেট শুনে শুনে লিখে ফেলবে। কোনোরকম ভুলভ্রান্তি হবে না। হাসান ভয়ে ভয়ে হিশামুদ্দিন সাহেবকে টেপরেকর্ডারের কথাটা বলেছিল। তিনি মন দিয়ে তার কথা শুনেছেন। ভদ্রলোকের এই ব্যাপারটা আছে। কেউ যখন কথা বলে তিনি খুব মন দিয়ে শোনেন। এমনও হয় যে চোখের পলক ফেলেন না। যে কথা বলে সে পলকহীন চোখের দিকে তাকিয়ে খানিকটা ভড়কে যায়।

হাসানের কথা শেষ হওয়া মাত্র হিশামুদ্দিন সাহেব বললেন, যন্ত্রের সঙ্গে কি কথা বলা যায় হাসান? আমি যখন কথা বলি তোমার সঙ্গে কথা বলি একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলি। তাই না?

'জ্বি স্যার।'

'শোনা কথা লিখতে তোমার ভুলভ্রান্তি হচ্ছে হোক না, পরে ঠিক করা যাবে। ঠিক না করলেও অসুবিধা নেই। আমি তো আমার জীবনী লিখে বই করে ছাপাচ্ছি না। আমি আমার ইন্টারেস্টিং জীবনীটা লিখতে চাচ্ছি আমার নিজের জন্যে। যখন কাজকর্ম করার ক্ষমতা থাকবে না—তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে, কিংবা হুইল চেয়ারে বসে বসে পড়ব।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি যাতে তালগোল পাকিয়ে না ফেল এই জন্যেই আমি অল্প অল্প করে বলি।'

হাসান মনে মনে বলেছে—স্যার, আপনি যদি একসঙ্গে অনেকখানি করে বলতেন তাহলে আমার কিছু লাভ হত। দুটা টাকা বেশি পেতাম।

হিশামুদ্দিন সপ্তাহে একদিন হাসানের সঙ্গে বসেন। বুধবার দুপুর। দুটা থেকে তিনটা। এক ঘণ্টা কখনো কথা বলেন না। পনের-বিশ মিনিট পার হবার পরই বলেন—"আজ এই পর্যন্তই।" হাসান ঘর থেকে বের হয়ে নিচে আসে। হিশামুদ্দিন সাহেবের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট রহমতউল্লাহ দাঁত বের করে বলে, কী, কাজ শেষ?

'জ্বি।'

'পঁচিশ মিনিট পার হয়েছে। যাই হোক তিরিশ করে দিচ্ছি। রাউন্ড ফিগার। পেমেন্ট নিয়ে যান।'

'থাক জমুক। পরে একসঙ্গে নেব।'

'ওরে সর্বনাশ, তা হবে না। স্যারের নির্দেশ আছে সব পেমেন্ট আপটুডেট থাকবে। আসুন ভাই খাতায় সই করে টাকা নিন।'

হাসানকে শুকনো মুখে খাতায় সই করে টাকা নিতে হয়। মাঝে মাঝে ভাবে বলবে—আমাকে চাকরি দেবার সময় বলা হয়েছিল বুধবারে এক ঘণ্টা করে সিটিং হবে। এক ঘণ্টা হিসেবে আমাকে টাকা দিতে হবে। পাঁচ মিনিট কথা বললেও এক ঘণ্টার পেমেন্ট বলা হয় নি। হাসানের ধারণা কথাটা বলামাত্রই তা বড় সাহেবের কানে চলে যাবে। তিনি বিরক্ত হয়ে ভাববেন—ছেলেটা তো লোভী। হাসান চাচ্ছে না হিশামুদ্দিন সাহেব তাকে লোভী ভাবুন। কারণ প্রথমত সে লোভী না, দ্বিতীয়ত এই মানুষটাকে সে পছন্দ করে।

'হাসান।'

'জ্বি স্যার।'

'আজ শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ থাক।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হাসান মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। আজ কোনো কথাই হয় নি। তার হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি থাকলে বলে দিতে পারত দশ মিনিটের বেশি সময় পার হয় নি। মাত্র এক শ টাকা। হাসান উঠে দাঁড়াতে গেল—হিশামুদ্দিন বললেন, বোস একটু। হাসান বসল। হিশামুদ্দিন রুমাল দিয়ে আবার ঠোঁট মুছলেন। মাথার উপরের ফ্যানটার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোকের তাকানোর ভঙ্গি এমন যেন তিনি ফ্যানের কথা শোনার চেষ্টা করছেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না।

'হাসান।'

'জ্বি স্যার।'

'আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখেছি প্রচণ্ড গরমের সময় বুড়ো ধরনের মানুষরা গামছা ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে বসে থাকত। তুমি কি এ রকম দৃশ্য দেখেছ?'

'জ্বি না স্যার।'

'গরমের সময় ভিজিয়ে গায়ে রাখার জন্যে আলাদা গামছাই পাওয়া যেত। মোটা মোটা সুতা—গামছাগুলোকে বলত জলগামছা।'

হাসান মনে মনে কয়েকবার বলল, জলগামছা। জলগামছা। জলগামছার ব্যাপারটা লিখে ফেলতে হবে। কোনো এক ফাঁকে এই তথ্য ঢুকিয়ে দিতে হবে। শুধু জলগামছা আওড়ালে মনে নাও থাকতে পারে। কাছাকাছি আরো কয়েকটা শব্দ বলা দরকার—

জলগামছা
পানিগামছা
ওয়াটারগামছা

'হাসান।'

'জ্বি স্যার।'

'সবচে কষ্টের গরম কোন মাসে পড়ে জান?'

'জ্বি না স্যার।'

'ভাদ্র মাসে। ভাদ্র মাসের গরমকে বলে তালপাকা গরম। তখন বাতাসে জলীয় বাষ্প খুব বেশি থাকে। গরমটা বেশি লাগে এই কারণে। একবার ভাদ্র মাসে কী হয়েছে শোন—আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। আমাদের বাসা নেত্রকোনার উকিলপাড়ায়। দু কামরার ঘর। সাধারণ নাম হল হাফ বিল্ডিং। করোগেটেড টিনের ছাদ। টিনের ছাদের বাড়ি রাতে ঠাণ্ডা হবার কথা। আমাদের বাসা কখনোই ঠাণ্ডা হত না। আমরা সাত ভাইবোন গরমে ছটফট করতাম।'

'স্যার আপনি একবার বলেছিলেন আপনারা আট ভাইবোন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যখনকার কথা বলছি তখন আমরা সাত জন। আমার মেজো ভাই রাগ করে বাসা থেকে চলে গিয়েছিল। অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস নিয়ে রাগ করেছিল। তার কেডসের জুতার ফিতা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই ফিতা কিনে দেয়া হচ্ছিল না। একটা জুতায় ফিতা ছিল আরেকটায় ছিল না। সেই জুতাটা খুলে খুলে আসত। ক্লাসের বন্ধুরা তাকে নিয়ে খুব হাসাহাসি করত। বাবা প্রতিদিন বলতেন, আজ ঠিক নিয়ে আসব। আসতেন না। একদিন স্কুল থেকে বাসায় না ফিরে সে বাড়ি চলে গেল, সেদিন বিকেলে বাবা ফিতা নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজ পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ নেই।'

'স্যার আপনার ভাইটার নাম কী?'

'ভাইয়ের গল্প তো এখন করছি না। এখন তোমাকে বলছি অন্য গল্প। মেজো ভাইয়ের গল্প যখন বলব তখন তার নাম বলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আমি কী বলছিলাম যেন?'

'আপনারা সাত ভাইবোন গরমে ছটফট করতেন।'

'ও হ্যাঁ আমরা গরমে ছটফট করতাম। বাবা অনেক রাত পর্যন্ত তালপাখা দিয়ে আমাদের হাওয়া করতেন। সেই পাখা পানিতে ভিজিয়ে নেয়া হত। ভেজা পাখার হাওয়া নাকি ঠাণ্ডা।

একদিনের কথা—বাবা বাসায় ফিরলেন অনেক দেরিতে। তাঁর হাতে বাজার করার চটের একটা ব্যাগ, মুখ হাসি হাসি। তিনি রহস্যময় ভঙ্গিতে বললেন—কোথায় আমার সৈন্যসামন্ত। আমরা ছুটে এলাম। বাবা চটের ব্যাগ খুললেন। ব্যাগের ভেতর খবরের কাগজে মোড়া চকচকে নতুন সিলিং ফ্যান। আমরা হতভম্ব। সেই রাতেই ফ্যান লাগানো হল। বাবা নিজেই মিস্ত্রি। রাবারের জুতা পরে তিনি ইলেকট্রিসিটির কানেকশন দিলেন। ফ্যান ঘুরতে শুরু করল। কী বাতাস, মনে হচ্ছে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—এখন থেকে এক ঘুমে রাত কাবার করে দিবি। হাঁ করে ঘুমোবি যাতে পেটের ভেতরেও ফ্যানের হাওয়া চলে যায়।

সেই ফ্যান সর্বমোট আমরা তিন দিন ব্যবহার করি। চতুর্থ দিনে বাড়িতে পুলিশ এসে উপস্থিত। আমরা বিস্মিত হয়ে জানলাম বাবা যে দোকানে কাজ করতেন সেই দোকানের একটা ফ্যান তিনি খুলে নিয়ে চলে এসেছেন।

আমাদের চোখের সামনেই সিলিং থেকে ফ্যান খোলা হল। বাবা সবার দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণই অমায়িক ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন বেশ মজাদার একটা ঘটনা ঘটছে। তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পেরে আনন্দিত।

দোকানের মালামাল চুরির অভিযোগে বাবার বিরুদ্ধে মামলা হয়। বাবার দু মাসের জেল হয়ে যায়। কোর্টে আমরা কেউ ছিলাম না। শুধু আমার বড় বোন ছিলেন। মামলার রায় হবার পরে বাবা তাকে বলেন, পুষ্প কোনো রকম চিন্তা করিস না। জেলখানায় বিশ দিনে মাস হয়। দুই মাস আসলে চল্লিশ দিন। চল্লিশটা দিন তুই কোনো রকমে পার করে দে। পারবি না মা?

আমার বড় বোন পুষ্পের কথা কি এর আগে তোমাকে বলেছি?'

'জ্বি না।'

'ডাকনাম পুষ্প ভালো নাম লতিফা বানু।'

হিশামুদ্দিন সাহেব চুপ করলেন। সামনে রাখা পানের বাটা থেকে পান নিলেন। রুমালে ঠোঁট মুছলেন। আবার মাথা উঁচু করে ফ্যানের দিকে তাকালেন।

'হাসান।'

'জ্বি স্যার।'

'মানুষের প্রধান সমস্যাটা হল সে কোনো কিছুই খুঁটিয়ে দেখে না। তার সব দেখা, সব observation ভাসা ভাসা। ঠিক না?'

হাসান চুপ করে রইল। মানুষের প্রধান সমস্যা কী তা নিয়ে সে কখনো ভাবে নি। গল্প বলতে বলতে হঠাৎ মানুষের সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন কেন তাও তার কাছে পরিষ্কার না। তবে হিশামুদ্দিন সাহেবের এই স্বভাব আছে। কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে যান। তারপর আবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসেন।

হিশামুদ্দিন বললেন, তুমি এক শ টাকার নোট অনেকবার দেখেছ। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তুমি বলতে পারবে না এক শ টাকার নোটের দু পিঠে কী ছবি আছে। বলতে পারবে?

'জ্বি না স্যার।'

'একপিঠে আছে লালবাগ দুর্গের ছবি, আরেক পিঠে তারা মসজিদের ছবি। তোমার সঙ্গে এক শ টাকার নোট আছে না? আমার কথা মিলিয়ে দেখ।'

'এক শ টাকার নোট নেই স্যার।'

'কত টাকার নোট আছে?'

'দশ টাকার।'

'দশ টাকার নোটের এক দিকে আছে কাপ্তাই বাঁধের ছবি, আরেক দিকে টাঙ্গাইলের একটা মসজিদের ছবি—আতিয়া জামে মসজিদ। মানিব্যাগ খুলে দেখ।'

'দেখতে হবে না স্যার। আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই আছে।'

'তবুও তুমি একবার দেখে নাও।'

হাসান মানিব্যাগ বের করে দেখল। হিশামুদ্দিন সাহেব বললেন, নোটের গায়ে কী ছবি আঁকা তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। তারপরেও আমি মনে করি—আমাদের দৃষ্টি আরো পরিষ্কার থাকা দরকার। মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে এই কথাটা তোমাকে বললাম। কেন বললাম বল তো?

'বলতে পারছি না স্যার। আমার বুদ্ধি সাধারণ মানের।'

'আজ এই পর্যন্তই থাক।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হিশামুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। হাসান খুবই অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। না সে রকম কোনো ঘটনা ঘটে নি—লুঙ্গি গড়িয়ে নিচে নেমে যায় নি। হিশামুদ্দিন সাহেব ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

AMARBOI.COM

কাঁটায় কাঁটায় চারটা বাজছে। হিশামুদ্দিন সাহেব চারটা থেকে সাড়ে চারটা এই ত্রিশ মিনিট তাঁর শোবার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকেন। নিজের ইচ্ছায় না, ডাক্তারের নির্দেশে। দুটা বড় ধরনের স্ট্রোক তাঁর হয়ে গেছে। তৃতীয়টির জন্যে অপেক্ষা। অপেক্ষার সময়টায় নানান নিয়মকানুন মেনে চলা। আজ হিশামুদ্দিন সাহেব নিয়মের খানিকটা ব্যতিক্রম করলেন। শোবার ঘরে ঢোকার আগে মতিঝিলে হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের হেড অফিসে টেলিফোন করলেন। টেলিফোন ধরল জীবন। জীবনকে তিনি একটা কাজ দিয়েছিলেন। হাসান সম্পর্কে খোঁজখবর করা। ছেলেটি সম্পর্কে কৌতূহল বোধ করছেন বলেই অনুসন্ধান।

আজ হাসানের একটা ব্যাপার তাঁর চোখে পড়েছে। তিনি যখন বলছিলেন—সিলিং থেকে ফ্যান খোলা হচ্ছে আর তাঁর বাবা দূরে দাঁড়িয়ে অমায়িক ভঙ্গিতে হাসছেন—তখনই তিনি লক্ষ্য করলেন হাসানের চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখের পানি সামলাবার জন্যে দ্রুত অন্যদিকে তাকিয়েছে। হিশামুদ্দিন সাহেবের অনেক প্রিয় গল্পের মধ্যে এই গল্পটি একটি। অনেককে এই গল্প বলেছেন। সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনেছে। কারো চোখে পানি আসে নি। শুধু তাঁর মেয়ে চিত্রলেখার চোখে পানি এসেছিল। তাঁর মেয়েটি সেদিন স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে ফিরেছে। চোখ লাল। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। জ্বরে কাতর মেয়েটিকে দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। রাত ন'টায় তিনি রওনা হবেন জাপানে। এয়ারপোর্টে—সন্ধ্যা সাতটায় রিপোর্টিং। মেয়েটিকে একা রেখে তাকে যেতে হবে। বিশাল এই বাড়িতে চিত্রলেখা একা একা ঘুরবে। তিনি এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে মেয়ের পাশে বসলেন। না জ্বর বেশি না। উদ্বিগ্ন হবার

কিছু নেই। চিত্রলেখা বলল, তোমার এয়ারপোর্ট যাবার সময় হয়ে গেছে তাই না বাবা? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

'কতক্ষণ থাকতে পারবে আমার পাশে?'

'আধঘণ্টা।'

'তাহলে একটা গল্প বল।'

তিনি তাঁর বাবার ফ্যানের গল্পটা বললেন। গল্পের এক পর্যায়ে চিত্রলেখা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তিনি সহজ গলায় বললেন, কাঁদছ কেন মা?

'তোমার বাবার কথা মনে করে কান্না পাচ্ছে।'

'ও আচ্ছা।'

'তোমার বাবা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন তাই না? এখন তোমার কত টাকা। ইচ্ছে করলে বাংলাদেশের সব ফ্যান তুমি কিনে নিতে পার তাই না বাবা?'

'হুঁ।'

'তোমার বাবা তোমার ভাইবোনদের মধ্যে কাকে সবচে ভালবাসতেন?'

'আমার বড় বোনকে, তাঁর নাম পুষ্প।'

'তাঁকে সবচে ভালবাসতেন কেন?'

'বড়বুবু দেখতে অবিকল আমার মার মতো ছিল, এই জন্যেই বোধহয়। তাছাড়া প্রথম সন্তানের প্রতি বাবা–মার একটা আলাদা মমতা থাকে।'

'তোমাকে কতটা ভালবাসতেন?'

'আমাকে খুব সামান্য। আমি সবার শেষের দিকে তো এই জন্যে বোধহয়। মাঝে মাঝে আমার নাম পর্যন্ত ভুলে যেতেন।'

'কী যে তুমি বল বাবা নাম ভুলবে কী করে?'

'ভুলে যেতেন। আমার ঠিক আগের ভাইটার নাম ফজলু। আমার ডাকনাম বজলু। তিনি আমাকে ডাকতেন ফজলু বলে।'

'তুমি রাগ করতে না?'

'না।'

'আমি হলে খুব রাগ করতাম। আমাদের অঙ্ক আপা আমাকে মাঝে মাঝে ডাকেন চিত্ররেখা। আমি জবাব দিই না। চিত্ররেখা তো আমার নাম না। চিত্ররেখা ডাকলে আমি কেন জবাব দেব? ঠিক না বাবা?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'এখন তোমার এয়ারপোর্টে যাবার সময় হয়ে গেছে। তুমি চলে যাও।'

'তোমার জন্যে কি কিছু আনতে হবে?'

'না?'

'কিছু না?'

'না কিচ্ছু না।

হিশামুদ্দিন সাহেব তাঁর বাবার গল্প যখন বলছিলেন তখন ঠিক যে জায়গাটায় এসে চিত্রলেখা কেঁদে ফেলেছিল সেই জায়গায় হাসান ছেলেটার চোখে পানি এসেছে। ব্যাপারটা তুচ্ছ আবার ঠিক তুচ্ছও না। জীবনকে এই ছেলেটি সম্পর্কে খোঁজখবর করতে বলেছিলেন। সে কতটা খোঁজখবর করেছে কে জানে।

'হ্যালো জীবন?'

'জ্বি স্যার।'

'হাসান ছেলেটি সম্পর্কে তোমাকে খোঁজ নিতে বলেছিলাম—খোঁজ নিয়েছ?'

'জ্বি স্যার। খুবই সাধারণ ছেলে স্যার।'

'এ ছাড়া আর কী?'

'ঝিকাতলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে থাকে এড্রেস হচ্ছে এগার বাই.....'

হিশামুদ্দিন বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকালেন। হড়বড় করে এড্রেস বলছে—এড্রেস তো তার অফিসেই আছে। জীবন এখন পর্যন্ত কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারে নি। ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না। তবু এই ছেলেটিকে তাঁর বেশ পছন্দ।

'হাসান সম্পর্কে আর কী জান?'

'কয়েকটা প্রাইভেট টিউশ্যানি করে।'

'কটা?'

'একজাক্ট বলতে পারছি না স্যার।'

'বিয়ে করেছে?'

'জ্বি না।'

'তার কোনো পছন্দের মেয়ে কি আছে?'

'জ্বি স্যার একজনের বাসায় মাঝে মাঝে যায়—সেই বাসার এড্রেস হল স্যার—কলাবাগান— ভেতরের দিকে দুই বাই.....'

হিশামুদ্দিন আবারো ভুরু কুঁচকালেন। জীবন মনে হয় এড্রেস ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না। সে এড্রেস-বিশেষজ্ঞ।

'জীবন।'

'জ্বি স্যার?'

'মেয়েটির নাম কী?'

'কোন মেয়ের নাম স্যার?'

'হাসানের পছন্দের মেয়েটির নাম....'

'ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি নাম স্যার জানি না। তবে নাম-এড্রেস সব সংগ্রহ করতে পারব।'

'থাক সংগ্রহ করতে হবে না। আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব।'

হিশামুদ্দিন সাহেব টেলিফোন রেখে শোবার ঘরে ঢুকলেন। ঘর কেমন অন্ধকার হয়ে আছে। মনে হচ্ছে আকাশে মেঘ করেছে। তাঁর হিসেবমতো বৃষ্টি হবার কথা রাত ন'টা-দশটার দিকে। এখুনি আকাশ এত অন্ধকার হল কেন?

তাঁর ব্যক্তিগত বেয়ারা মোতালেব চায়ের কাপ নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সাড়ে চারটার সময় তিনি এক কাপ হালকা লিকারের চা খান। বিকেল পাঁচটায় অফিসে উপস্থিত হন। আজ নিয়ম ভাংতে ইচ্ছা করছে।

তিনি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললেন, মোতালেব আকাশে কি মেঘ আছে?

মোতালেব বিস্মিত হয়ে বলল, জ্বি।

'কী মনে হয় তোমার, বৃষ্টি হবে?'

'ঝুম বৃষ্টি হবে স্যার। আসমান অন্ধকার কইরা মেঘ করছে।'

'তুমি টেলিফোন করে জীবনকে জানিয়ে দাও যে আজ অফিসে যাব না।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'ঝুম বৃষ্টি যদি নামে তাহলে আজ বৃষ্টিতে গোসল করব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

হিশামুদ্দিন সাহেব লক্ষ্য করলেন মোতালেব তাঁর কথায় অবাক হল না। মোতালেবকে এখন পর্যন্ত তিনি বিস্মিত হতে দেখেন নি। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে হিশামুদ্দিন সাহেব বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁর খুব অস্থির লাগছে। অস্থির লাগছে কেন? তৃতীয় স্ট্রোকের সময় কি হয়ে গেছে? কপাল ঘামছে? পিঠের মাঝখানে ব্যথা বোধ হচ্ছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। তাঁর কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। কথা বলার জন্যে মোতালেবকে কি ডেকে পাঠাবেন? সে বিছানার কাছে এটেনশান হয়ে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে—তিনি কথা বলে যাবেন। তিনি ডাকলেন—মোতালেব।

মোতালেব ছুটে এল। তিনি কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। তার বাবার ফ্যান চুরির গল্পটা কি বলবেন? গল্পটা সে কীভাবে নেবে? সবাইকে কি সে বলে বেড়াবে—আমাদের স্যারের বাবা ছিলেন চোর। কথাগুলো সে বলবে ফিসফিস করে। যারা শুনবে তারাও অন্যদের কাছে ফিসফিস করবে।

'মোতালেব।'

'জ্বি স্যার।'

'বৃষ্টি কি নেমেছে?'

'জ্বি না স্যার।'

'আচ্ছা তুমি যাও—এক কাজ কর, টেলিফোন হ্যান্ডসেটটা দিয়ে যাও।'

মোতালেব বের হয়ে গেল। হিশামুদ্দিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরে টেলিফোন রাখেন না। টেলিফোন কেন—কিছুই রাখেন না। বিশাল একটা ঘর, ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা খাট—আর কিছু নেই। কাপড় বদলানোর জন্যেও তাকে পাশের ঘরে যেতে হয়। ফাঁকা একটা ঘরে রাতে যখন ঘুমোতে আসেন তখন তাঁর মনে হয় তিনি খোলা মাঠে শুয়ে আছেন।

টেলিফোন নিয়ে মোতালেব ঢুকল না, ঢুকল রহমতউল্লাহ। শঙ্কিত গলায় বলল, স্যারের শরীর কি ভালো?

হিশামুদ্দিন বললেন, শরীর ভালো। তুমি টেলিফোন রেখে চলে যাও।

'কাকে করবেন বলুন স্যার, আমি লাইন লাগিয়ে দি।'

'কাকে করব বুঝতে পারছি না। তুমি রেখে যাও।'

'ডাক্তার সাহেবকে কি খবর দেব স্যার?'

'না।'

'আজ রাত আটটায় আপনার ডিনারের দাওয়াত, চেম্বারস অব কমার্সের মিটিং। আপনি কি যাবেন?'

'আটটা বাজতে তো দেরি আছে—আছে না?'

'জ্বি স্যার।'

'আমি যাব। তবে বৃষ্টি নেমে গেলে যাব না। আজ বৃষ্টিতে ভিজব।'

রহমতউল্লাহ অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে। কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। হিশামুদ্দিন বললেন, আচ্ছা তুমি যাও। রহমতউল্লাহ গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। হিশামুদ্দিন বললেন, তুমি কিছু বলবে?

'জ্বি না স্যার।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও।'

হিশামুদ্দিন টেলিফোন সেট হাতে নিয়ে বসে আছেন। কাকে টেলিফোন করবেন? এমন কেউ যদি থাকত যার সঙ্গে সহজ স্বাভাবিকভাবে গল্প করা যায় তাহলে ভালো হত। এমন কেউ নেই। ক্ষমতাবান মানুষরা ধীরে ধীরে কী পরিমাণ নিঃসঙ্গ হয় তা তিনি এখন বুঝতে পারছেন। তাঁর ক্ষমতা আরো বাড়বে—তাঁকে অর্থমন্ত্রী করার কথা হচ্ছে। প্রস্তাব এখনো সরাসরি আসে নি—তবে চলে আসবে। তার গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়বে। পেছনের সিটে তিনি গা এলিয়ে বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে থাকবেন। ফাইল হাতে ড্রাইভারের পাশে তারচেয়েও বিমর্ষ ভঙ্গিতে বসে থাকবে তার পিএস। পেছনের একটা গাড়িতে বসে থাকবে সিকিউরিটির লোকজন।

হাসানকে তাঁর বাবার গাড়িপ্রীতির গল্পটা বলা হয় নি। একদিন বলতে হবে। তাঁর বাবার গাড়িপ্রীতি ছিল অসাধারণ। কিছু টাকা-পয়সা যোগাড় হলেই তিনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ফেলতেন। ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে আধঘণ্টা বা এক ঘণ্টা শহরে ঘোরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতালেব ঘরে ঢুকল। হিশামুদ্দিন বললেন, কিছু বলবে মোতালেব?

'বৃষ্টি নামছে স্যার।'

'বেশি নেমেছে না ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে?'

'ফোঁটা ফোঁটা।'

'যখন ঝুম বৃষ্টি নামবে তখন বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। চা দিমু?'

'না।'

হিশামুদ্দিন টেলিফোনের নাম্বার টিপছেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি অসাধারণ কিন্তু টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না। মনে রাখার চেষ্টাও অবশ্য করেন না। টেলিফোন নাম্বার মনে রাখার জন্যে তাঁর লোক আছে। একটা টেলিফোন নাম্বারই তাঁর মনে থাকে। মেয়ের নাম্বার। মেয়েকে টেলিফোন করে কি পাওয়া যাবে? সামারে সে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

'কে চিত্রলেখা?'

'বাবা তুমি কী ব্যাপার?'

'এত অবাক হচ্ছিস কেন! আমি টেলিফোন করতে পারি না?'

'অবশ্যই করতে পার। আমি সে জন্যে অবাক হচ্ছি না। আমার অবাক হবার কারণ ভিন্ন।'

'কারণটা কী?'

'আমি ক্যাম্পিং করতে যাচ্ছি ভার্জিনিয়াতে। গাড়িতে সব জিনিসপত্র তোলা হয়েছে। গাড়ি স্টার্টও দিয়েছিলাম হঠাৎ মনে হল সব নেয়া হয়েছে, কাগজ-কলম নেয়া হয় নি। কাগজ-কলম নেবার জন্যে আবার ফিরে এসেছি—শুনি টেলিফোন বাজছে। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'ভালো।'

'তোমার ডিপ্রেসন কেটেছে?'

'আমার আবার ডিপ্রেসন কী?'

'শেষবার যখন তোমার সঙ্গে কথা হল—তখন মনে হল—তুমি খুব ডিপ্রেসনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ।'

'আমি ভালো আছি।'

'তোমার জীবনের মজার মজার ঘটনাগুলো যে কাকে দিয়ে লেখাচ্ছিলে—এখনো কি লেখাচ্ছ?'

'হুঁ।'

'লেখা কেমন এগোচ্ছে?'

'খুব এগোচ্ছে না।'

'যা লিখেছ আমার কাছে ফ্যাক্স করে পাঠাও, আমি পড়ে দেখি।'

'আচ্ছা পাঠাব।'

'তোমাদের ওখানে ওয়েদার কেমন?'

'খুব গরম পড়েছে। অনেক দিন বৃষ্টি হচ্ছে না।'

'এদিকে ওয়েদার খুবই চমৎকার। তোমাকে কি আমি একটা অনুরোধ করতে পারি বাবা?'

'হ্যাঁ করতে পারিস।'

'তুমি আমার কাছে চলে এস। আমরা দুজনে মিলে ক্যাম্পিং করব। তাঁবুর ভেতর থাকব। নিজেরা জঙ্গল থেকে কাঠ এনে রান্না করে খাব। হ্রদে মাছ ধরব। সেই মাছ বারবিকিউ করে খাব। বাবা আসবে?'

'না।'

'তুমি এত কঠিন করে না বলা শিখেছ কীভাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না বলতে পারাটা খুব বড় গুণ মা। বেশিরভাগ মানুষ 'না' বলতে পারে না। এতে তারা নিজেরাও সমস্যায় পড়ে, অন্যদেরও সমস্যায় ফেলে। আমার বাবা কখনো না বলতে পারতেন না। যে যা বলত—তিনি বলতেন, আচ্ছা। শুধু এই কারণেই সারা জীবন তিনি একের পর এক সমস্যার ভেতর দিয়ে গেছেন....'

'বাবা!'

'হুঁ।'

'তুমি যে কোনো আলাপে তোমার বাবাকে নিয়ে আস কেন? তাঁর ব্যাপারে তোমার কি কোনো অপরাধবোধ আছে?'

হিশামুদ্দিন সাহেব জবাব দিলেন না। চিত্রলেখা বলল, বাবা আমি এখন রওনা হচ্ছি। পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব। আর শোন—কোনো কারণে আমি যদি তোমার মন খারাপ করিয়ে দিয়ে থাকি তাহলে—সরি। এপোলজি কি গ্রান্টেড বাবা?'

'হ্যাঁ গ্রান্টেড।'

হিশামুদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোতালেব চা নিয়ে ঢুকল। তিনি চা চান নি। কিন্তু এখন চা খেতে ইচ্ছে করছে। তিনি হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে বললেন, বৃষ্টি কি নেমেছে?

মোতালেব লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি না স্যার।

বৃষ্টি না নামার অপরাধে সে নিজেকে অপরাধী ভাবছে।

৩

আকাশে বৃষ্টি বৃষ্টি ভাব। বিজলি চমকাচ্ছে। বাতাস ভারি। মাটির ভেতর থেকে অদ্ভুত গন্ধ আসছে। ছোট বাচ্চাদের গায়ের গন্ধের মতো গন্ধ। প্রবল বর্ষণের আগে আগে এ রকম গন্ধ পাওয়া যায়। হাসান রিকশা থেকে নেমেছে তবে মনস্থির করতে পারছে না, রিকশাটা ছেড়ে দেবে না রিকশা করেই ফিরে যাবে। বৃষ্টি নামলে আর রিকশা পাওয়া যাবে না। রিকশাওয়ালারা এখন স্বাস্থ্যসচেতন। ভিজে জবজবা হয়ে তারা রিকশা চালায় না। বৃষ্টির সময় হুড তুলে সিটের উপর আরাম করে বসে বিড়ি টানে। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—'ভাড়া যাবেন?' বিরক্ত হয়, জবাব দেয় না।

হাসান আকাশের দিকে তাকাল—কতক্ষণে বৃষ্টি নামবে বোঝার চেষ্টা হাস্যকর চেষ্টা তো বটেই। আবহাওয়া বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান নেই। আকাশে কত রকমের মেঘ হয় ছোটবেলা পড়েছিল—স্তূপ মেঘ, পালক মেঘ,.....। তার আবহাওয়াবিদ্যা এই পর্যন্তই। রিকশাওয়ালা টুন টুন করে দুবার ঘণ্টা বাজিয়ে বিরক্ত গলায় বলল, 'খাড়াইয়া আছেন ক্যান? ভাড়া দেন।' হাসান ভাড়া দিয়ে দিল। পাঁচ টাকা ভাড়া, দু টাকা বাড়তি দিল। আজ তার পকেটে টাকা আছে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে তিতলীদের বাসার গেটের সামনে। গেট খুলে ভেতরে ঢুকবে কি ঢুকবে না বুঝতে পারছে না। তার হাতে ঘড়ি নেই, তবে রাত মনে হয় ভালোই হয়েছে, দশটার কম না। এত রাতে তিতলীদের বাসায় ঢুকলে সবাই সরু চোখে তাকাবে। না ভুল বলা হল, সবাই তাকাবে না তিতলীর বাবা মতিন সাহেব তাকাবেন। সেটা কি ভালো হবে? হাসান ক্লান্ত পায়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল, ঠিক করল গেট থেকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত যেতে যদি তার গায়ে কোনো বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে তাহলে সে ফিরে আসবে। এতদূর এসে তিতলীকে এক পলকের জন্যে না দেখে গেলে খুব খারাপ লাগবে। লাগুক। পৃথিবীতে বাস করতে হলে অনেক খারাপ লাগা সহ্য করে বাস করতে হয়। হাসান বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে, গায়ে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে নি। এখন কলিংবেল টেপা যেতে পারে।

কলিংবেলে হাত দিয়েই হাসান ভালো একটা শক খেল। ডান হাতটা ঝিনঝিন করে উঠল। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। শক খেলেও বেল ঠিকই বাজল। ভেতর থেকে ধমকের সুরে তিতলীর বাবা বললেন, কে? হাসান জবাব দিল না, সে শকের ধকল সামলাচ্ছে। হাতের ঝিনঝিন ভাব এখনো যাচ্ছে না।

তিতলীদের বাসার কলিংবেলটা অনেকদিন থেকেই নষ্ট। কিছুদিন কলিংবেলটার ঠিক উপরে হাতে লেখা একটা কাগজ স্কচটেপ দিয়ে আটকানো ছিল। কাগজে লেখা—

'কলিংবেল নষ্ট। দয়া করে হাত দেবেন না।'

কাগজটা এখন নেই। আর থাকলেও লাভ হত না। হাসান ঠিকই বেল টিপত। তিতলীদের বাসার আশপাশে এলে তার মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। সম্ভবত ব্লাডপ্রেসারঘটিত কোনো সমস্যা হয়। হয় প্রেসার বেড়ে যায় কিংবা কমে যায়।

হাসান কড়া নাড়ল। তিতলীর বাবা মতিন সাহেব একবার 'কে' বলে চুপ করে আছেন। তাঁকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার, যে কলিংবেল টিপেছিল সে চলে যায় নি। এখনো আছে। মতিন সাহেব আবারো ধমকের গলায় বললেন, কে? হাসান জবাব দিল না। বন্ধ দরজার দুপাশ থেকে বাক্যালাপ চালানোর অর্থ হয় না। হাসান বলবে আমি। মতিন সাহেব বলবেন, আমিটা কে? হাসান বলবে, জ্বি আমি হাসান। কোনো মানে হয় না। এরচে বিশ্রীভাবে কয়েকবার কড়া নেড়ে চুপ করে থাকা ভালো।

দরজার ছিটকিনি খোলার শব্দ হচ্ছে। এ বাড়ির দরজার ছিটকিনিগুলোও নষ্ট। সহজে খোলা যায় না, ধস্তাধস্তি করতে হয়। হাসান ভেবেছিল মতিন সাহেব দরজা খুলে—শ্লেষ-জড়ানো বিরক্ত গলায় বলবেন, ও আচ্ছা তুমি? এত রাতে কী মনে করে? হাসানকে অবাক করে দিয়ে দরজা খুলল তিতলী। এত রাতেও সে বেশ সেজেগুজে আছে। চুল বাঁধা। পরনে চাঁপা রঙের শাড়ি। ঠোঁটে লিপস্টিকও আছে। গলায় চিকমিক করছে সরু চেইন। মনে হয় কোনো বিয়েবাড়ি থেকে দাওয়াত খেয়ে এসেছে। তিতলী গভীর বিস্ময় নিয়ে বলল, আরে তুমি? এত রাতে তুমি কোত্থেকে?

'রাত খুব বেশি নাকি?'

'সাড়ে ন'টা বাজে।'

ভেতর থেকে মতিন সাহেব বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস? তিতলী লাজুক গলায় বলল, হাসান ভাইয়া এসেছেন বাবা। মতিন সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, ও।

তিতলী হাসানের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার এত আনন্দ লাগছে। আনন্দে চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। শুধু পানি জমা না—আনন্দে শরীরও কাঁপছে। এই তো সে দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়েছে। আঙুলগুলো সত্যি সত্যি কাঁপছে।

'বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ভেতরে এস।'

হাসান খানিকটা অস্বস্তি নিয়েই ঘরের ভেতর ঢুকল। এত রাতে এসে তিতলীকে বিব্রত করার কোনো মানে হয় না। তিতলীদের বসার ঘরের অবস্থা শোচনীয়। পুরোনো সোফার কয়েক জায়গায় গদি ছিঁড়ে তুলা বের হয়ে পড়েছে। একটা সোফার স্প্রিং নষ্ট। বসলে তলিয়ে যেতে হয়। দুটা বেতের চেয়ার আছে। চেয়ারের নানান জায়গা থেকে পেরেক বের হয়ে আছে। অসাবধানে চেয়ার থেকে উঠতে গেলে প্যান্ট বা শার্ট ছিঁড়বেই। হাসানের কালো প্যান্টটা এভাবেই ছিঁড়েছে। ঘরের অর্ধেকটা অংশজুড়ে খাট পাতা। খাটে তোশক বিছানো আছে। তোশকের উপর বেশিরভাগ সময় কোনো চাদর থাকে না। আজ অবশ্যি আধময়লা একটা চাদর আছে। দেয়ালে গত বছরের একটা ক্যালেন্ডার। জুন মাস বের হয়ে আছে। ক্যালেন্ডারের ছবিটা সুন্দর। হ্রদের জলে স্নানের পোশাকপরা এক তরুণী চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তরুণীর চোখ বন্ধ। হ্রদের জল যেমন নীল, তরুণীর স্নানের পোশাক তেমনি লাল। লাল-নীলে মিলে দারুণ একটা ছবি। ক্যালেন্ডারটার পাশেই একটা দেয়ালঘড়ি। ঘড়িটা আজ বন্ধ। সাতটা একুশ বাজছে। হাসান ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, তিতলী এক গ্লাস পানি খাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিতলী পানি আনতে গেল। খাবার ঘরের টেবিলে পানির জগ এবং গ্লাস রাখা আছে। তিতলী সেদিকে গেল না। বাবা খাবার টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। তাঁর মুখ সন্ধ্যা থেকেই থমথমে। এখন সেই থমথমে ভাব আরো বেড়েছে। তাঁর সামনে পড়লে তিনি কঠিন চোখে তাকাবেন। সব সময় কঠিন চোখ দেখতে ভালো লাগে না।

রান্নাঘরে তিতলীর মা সুরাইয়া ভাত বসিয়েছেন। মতিন সাহেবের জন্যে আলাদা করে ভাত রাঁধতে হচ্ছে। তিনি আতপ চালের ভাত খান। সেই ভাত ঝরঝরে হতে হয়। ভাতের প্রতিটি দানা থাকবে আলাদা। একটার গায়ে আরেকটা লেগে থাকবে না। পাকা রাঁধুনীর জন্যেও কঠিন ব্যাপার। সুরাইয়া পাকা রাঁধুনী নন। স্বামীর ভাত রান্নার সময় তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে থাকেন। তিতলী রান্নাঘরে ঢুকতেই সুরাইয়া মেয়ের দিকে তাকালেন। তিতলী লজ্জামাখা গলায় বলল, হাসান ভাইয়া এসেছে মা। বলতে গিয়ে তিতলীর কথা জড়িয়ে গেল, গাল খানিকটা লালচে হয়ে গেল। ব্যাপারটা সুরাইয়ার চোখ এড়াল না। সুরাইয়া ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, ওকে খেয়ে যেতে বল।

'দরকার নেই মা।'

তিতলী পানির গ্লাস নিয়ে বের হয়ে গেল। কেমন হড়বড় করে বের হচ্ছে। দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খেয়ে খানিকটা পানি সে ছলকে ফেলে দিল। মেয়েটার অস্বাভাবিক অস্থিরতা দেখে সুরাইয়ার মন কেমন করতে লাগল। হাসানকে দেখলেই মেয়েটা এমন অস্থির হয়ে পড়ে কেন? কী আছে হাসানের মধ্যে? এ বছরও এম. এ. পরীক্ষা দেয় নি। প্রতি বছর শোনা যায় পরীক্ষা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেয় না। হাসানের চেহারাও ভালো না। কেমন বোকা বোকা ভাব। সংসারের অবস্থা সাধারণ, ভাইয়ের সঙ্গে বাস করছে। চাকরি বাকরি কোনোদিন পাবে এ রকম মনে হয় না। আজকাল চাকরি বাকরি হল ধরাধরির ব্যাপার। হাসানের ধরাধরি করার কেউ নেই।

ভাতের পানি ফুটছে। সুরাইয়া ভাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর কেন জানি মনে হচ্ছে আজ ভাতে কোনো গণ্ডগোল হবে। ভাত গায়ে গায়ে লেগে যাবে। তিতলীর বাবা খেতে বসে নানান ধরনের কটু কথা বলবেন। সুরাইয়া তিনবার "ইয়া জালজালালু ওয়াল ইকরাম" বলে হাঁড়ির ঢাকনা তুলে ফুঁ দিলেন।

হাসান এক চুমুকে পানিটা শেষ করে গ্লাস তিতলীর দিকে বাড়িয়ে বলল, তিতলী যাই।

তিতলী কিছু বলল না। মাথা নিচু করে হাসল। এমনভাবে হাসল যেন হাসান দেখতে না পায়। হাসানের অনেক বিচিত্র অভ্যাসের একটা হচ্ছে তিতলীদের বাড়িতে এসেই সে প্রথমে এক গ্লাস পানি খেতে চাইবে। পানি খাওয়া শেষ হলে বলবে—তিতলী যাই। মুখে বলবে কিন্তু যাবার কোনো লক্ষণ দেখাবে না।

'মা তোমাকে খেয়ে যেতে বলেছে।'

'আরে না।'

'আরে না কেন? খেয়ে যাও না। মেনু অবশ্য ভালো না—চোখে দেখা যায় না এই সাইজের কই মাছ। বাবার ধারণা কই মাছ সাইজে যত ছোট হয় তত স্বাদ বেশি হয়।'

হাসান কিছু বলল না। তিতলী বলল, তুমি যে আজ আসবে এটা কিন্তু আমি জানতাম।

'আমি আসব কীভাবে জানতে?'

'আজ ঘুম থেকে উঠেই তিনটা শালিক দেখেছি। মুখ ধুতে কলঘরের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি বারান্দায় কাপড় শুকোবার দড়িতে দুটা শালিক বসে আছে। তারপর কী হয়েছে শোন—মুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখি আরো একটা শালিক এসে বসেছে। মোট তিনটা শালিক। তখনই আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হলাম—আজ তুমি আসবে।'

'তিনটা শালিক দেখলে কেউ আসে?'

তিতলী গানের মতো গুনগুন করে বলল,

'One for sorrow
Two for joy
Three for letter
Four for boy.'

প্রথমে দুটা শালিক দেখলাম—তার মানে আনন্দের কোনো ব্যাপার ঘটবে, তারপর দেখলাম তিনটা, অর্থাৎ চিঠি পাব। তুমি যখনই আস একটা চিঠি নিয়ে আস। কাজেই আমি পুরোপুরি নিশ্চিত তুমি আসবে। শাড়ি পরে কেমন সেজে আছি দেখছ না। রাত সাড়ে ন'টার সময় কেউ এমন সেজেগুজে থাকে? এটা নতুন শাড়ি আগে কখনো পরি নি। রংটা সুন্দর না?

'খুব সুন্দর।'

'না দেখেই তুমি বললে খুব সুন্দর। বল তো কী রঙের শাড়ি?'

'চাঁপা রং।'

'গুড। হয়েছে। আমার চিঠি এনেছ?'

'হুঁ।'

'দাও।'

হাসান পাঞ্জাবির পকেট থেকে চিঠি বের করল। তিতলীর হাতে দিতে দিতে বলল, আজ উঠি।

তিতলী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এসেই উঠি উঠি করছ কেন? মা তোমাকে ভাত খেয়ে যেতে বলেছে। তিতলী চিঠি হাতের মুঠোয় লুকিয়ে তার ঘরে চলে গেল। তার ঘর হলেও সে একা ঘুমোয় না। এই ঘরে দুটা খাট পাতা। দুটা খাটে তারা তিন জন ঘুমোয়। সে আর তার ছোট দু বোন—নাদিয়া, নাতাশা। নাদিয়া-নাতাশা আজ বড় ফুফুর বাসায় বেড়াতে গেছে, রাতে থাকবে। তিতলীরও যাবার কথা ছিল। ভোরবেলায় তিনটা শালিক না দেখলে সে অবশ্যই যেত। বড় ফুফুর বাসায় যেতে তার সব সময় ভালো লাগে।

চিঠি খুলে তিতলীর মন খারাপ হয়ে গেল। এতটুকু একটা চিঠি—এক সেকেন্ডে পড়া হয়ে যাবে। তিতলী চিঠিটা গালে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে, হাতপা কাঁপছে। আশ্চর্য, এ রকম হচ্ছে কেন? হাসানের চিঠি তো সে আজ নতুন পড়ছে না। অনেকদিন থেকেই পড়ছে। হাসানের এই চিঠিটা তিয়াত্তর নম্বর চিঠি। চিঠিটা পড়তে ইচ্ছে করছে না। পড়লেই তো ফুরিয়ে যাবে। এখন থাক, রাতে বিছানায় শুয়ে আরাম করে পড়া যাবে। ইচ্ছে করলে চিঠিটা বুকের উপর রেখে ঘুমিয়েও পড়তে পারে। নাদিয়া-নাতাশা কেউ নেই। ঘরটা আজ তার একার। আচ্ছা মানুষটা লম্বা একটা চিঠি লিখতে পারে না? উপন্যাসের মতো লম্বা একটা চিঠি। সে পড়তেই থাকবে পড়তেই থাকবে চিঠি ফুরাবে না। এমন লম্বা চিঠি যে রাতে ঘুমোতে যাবার সময় চিঠি পড়তে শুরু করল ভোরবেলা আযানের সময় চিঠি শেষ হল।

'তিতলী।'

তিতলী চমকে উঠল। এমনভাবে চমকাল যে গালে ধরে রাখা চিঠি মেঝেতে পড়ে গেল। দরজার কাছে সুরাইয়া দাঁড়িয়ে আছেন। তিতলীর বুক ধকধক করছে। মা কি চিঠিটা দেখে ফেলেছেন? মনে হয় না। চিঠি দেখলে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি তাকিয়ে আছেন তিতলীর দিকে। মা অবশ্যি দেখেও না দেখার ভান করতে পারেন। এইসব ছোটখাটো ভান মা খুব ভালো করেন।

সুরাইয়া বললেন, ঘরে একা একা কী করছিস?

'কিছু করছি না মা।'

তিতলী কী করবে বুঝতে পারছে না। পা দিয়ে চিঠিটা চেপে ধরবে? না যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে? মা সামনে থেকে না সরলে সে ঘর থেকে বের হতে পারবে না। আগে চিঠিটা লুকোতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোর বাবাকে ভাত দিচ্ছি। তোর বাবার খাওয়া হয়ে যাক তারপর তুই হাসানকে খাইয়ে দে। এত রাতে না খেয়ে যাবে কেন?'

'আচ্ছা।'

সুরাইয়া সরে যেতেই তিতলী ছোঁ মেরে চিঠিটা তুলে বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেলল। তার বুকের ধুকধুকানি এখনো যায় নি। তার কেন জানি মনে হচ্ছে মা চিঠিটা দেখেছে।

মতিন সাহেব প্লেটে ভাত নিতে নিতে বললেন, এতদিনেও সামান্য ভাত ঠিকমতো রাঁধা শিখলে না? এটা এমন কী জটিল কাজ যে কুড়ি বছরেও শেখা যাবে না।

সুরাইয়া চুপ করে রইলেন। মতিন সাহেব বললেন, তোমাকে পোলাও-কোরমা, কোপ্তা-কালিয়া তো রাঁধতে বলি না। সামান্য ভাত—এটাও ঠিকমতো রাঁধবে না।

সুরাইয়া কৌটা থেকে এক চামচ ঘি ভাতের উপর ছড়িয়ে দিলেন। মতিন সাহেব আগুনগরম ভাতের প্রথম কয়েক নলা ঘি দিয়ে খান। এই ঘি দেশ থেকে আসে।

মতিন সাহেব বললেন, রাতদুপুরে হাসান এসেছে কেন? তিতলীও দেখি ওর সঙ্গে গাবের আঠার মতো লেগে আছে। দুজনে মিলে গুটুর গুটুর গল্প। ঘরের ভেতর বাংলা সিনেমা আমার খুব অপছন্দ। রাতদুপুরে সে আসবেই বা কেন?

সুরাইয়া ক্ষীণ গলায় বললেন, আমি আসতে বলেছি।

'তুমি আসতে বলেছ? কেন?'

'শুনেছিলাম হাসানের মার খুব অসুখ ছিল—এখন কেমন তা জানার জন্যে আসতে বলেছিলাম।'

'কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো না। মার অসুখের খবর ছেলেকে রাতদুপুরে ঘরে এনে জিজ্ঞেস করতে হবে? মার অসুখে তুমি করবে কী? তুমি সিভিল সার্জনও না, পীর ফকিরও না।'

সুরাইয়া ক্ষীণ স্বরে বললেন, আরেক চামচ ঘি দেব?

'দাও। আর শোন, তোমাকে বলছি, তোমার কন্যাদেরও বলছি—বাড়াবাড়ি আমার পছন্দ না। বাড়াবাড়ি আমি খুব অপছন্দ করি। হাসানের মার খবর জেনেছ?'

'হুঁ।'

'তাহলে ওকে বসিয়ে রেখেছ কেন—চলে যাক না।'

'ভাত খেয়ে যেতে বলেছি।'

'ভাত খেয়ে যেতে বলেছ কেন?'

সুরাইয়া প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, এত রাতে না খেয়ে যাবে!

মতিন সাহেব প্লেটে ডাল নিতে নিতে বললেন, তুমি সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি কর। বাড়াবাড়ির ফল কখনো শুভ হয় না। হাসানের মার হয়েছে কী সেটা তো বললে না।

সুরাইয়া সমস্যায় পড়ে গেলেন। মেয়েকে বাঁচানোর জন্যে তিনি সামান্য মিথ্যা বলেছেন। মিথ্যা বলাটা ঠিক হয় নি। একটা মিথ্যা বললে পরপর কয়েকটা মিথ্যা বলতে হয়। সুরাইয়া ইতস্তত করে বললেন, জ্বর।

'জ্বর শুনে একেবারে ছেলেকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছ। টাইফয়েড-টয়েড হলে তো গুষ্ঠীসুদ্ধা খবর দিয়ে নিয়ে আসতে। আমাকে বল তো—এই বাড়াবাড়ির মানে কী?'

'আরেকটা মাছ নাও। আগেই ডাল নিলে কেন?'

মতিন সাহেব আরেকটা মাছ নিলেন। জনপ্রতি একটা করে কই মাছ তিনি হিসেব করে নিয়ে এসেছেন। দুই মেয়ে তাদের ফুফুর বাড়িতে গেছে। দুটা মাছ বেঁচে গেল। তিনি একটা নিতে পারেন। তারপরেও হাসানের জন্যে একটা থাকবে। মতিন সাহেব খাওয়া শেষ করে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আজ তিনি একা শোবেন। সুরাইয়া তার মেয়ের সঙ্গে ঘুমোবে। আঠার বছরের মেয়েকে কখনো একা ঘরে শুতে দিতে নেই। আঠার বছরের

মেয়ে হল সাক্ষাৎ আগুন। আগুনের সঙ্গে সব সময় পানি রাখতে হয়। মেয়ের মা হল সেই পানি। আগুন–পানি একসঙ্গে থাকলে বিপদ থাকে না।

হাসান লজ্জিতমুখে খেতে বসেছে। সুরাইয়া তিতলীকে বললেন, 'তুই খেতে বসে যা।'

তিতলী বলল, আমি তোমার সঙ্গে খাব মা।

তিতলীর চোখ জ্বলজ্বল করছে। মনে মনে মাকে সে অনেকবার ধন্যবাদ দিয়েছে। মা এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পদের খাবার করে ফেলেছে। বেগুন ভাজা, ডিম ভাজা, পটোল ভাজা। সুরাইয়া বললেন, তুই হাসানকে দেখেশুনে খাওয়া আমি দেখি তোর বাবার কিছু লাগে কি না।

তিতলী মনে মনে বলল, মা তুমি এত ভালো কেন? আমি কোনোদিনও তোমার মতো ভালো মেয়ে হতে পারব না। হাজার চেষ্টা করলেও পারব না।

হাসান কিছু খেতে পারছিল না। একটু ডিম ভেঙে মুখে দিল। বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত মেখে এক পাশে সরিয়ে রাখল।

'তোমার প্রাইভেট টিউশ্যানি কেমন চলছে?'

'ভালো।'

'আর ওই যে জীবনী লেখার কাজ। লিখছ?'

'হুঁ।'

'ভদ্রলোকের নাম যেন কী?'

'হিশামুদ্দিন।'

'তাঁকে তুমি বল না কেন একটা চাকরি যোগাড় করে দিতে। তাঁকে বল—স্যার আমি চাকরিও করব আর ফাঁকে ফাঁকে আপনার জীবনীও লিখব।'

হাসান জবাব দিল না। তিতলীর খুব ইচ্ছে করছে হাসানকে একটু ছুঁয়ে দেখতে। সাহসে কুলোচ্ছে না, কখন হুট করে মা ঢুকে পড়বেন। তাছাড়া হাত ছুঁয়ে দেখতে হলে অজুহাত লাগে। তেমন কোনো অজুহাতও মাথায় আসছে না। 'তোমার গালে এটা কী?' এই বলে কি গালটা ছুঁয়ে দেখা যায় না?

তিতলী বলল, খাচ্ছ না কেন?

'রুচি হচ্ছে না। জ্বর আসছে বোধহয়।'

'দেখি তো জ্বর কি না।'

তিতলী হাসানের কপালে হাত রেখে চমকে উঠল। জ্বরে কপাল পুড়ে যাচ্ছে। এত জ্বর নিয়ে কেউ খেতে বসে? তার উচিত গায়ে চাদর জড়িয়ে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকা। জ্বর নিয়ে তার আসার দরকার ছিল কী। সে তো তাকে আসার জন্যে খবরও দেয় নি।

'তোমাকে খেতে হবে না। তুমি হাত ধুয়ে ফেল।'

হাসান সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বেসিনের কাছে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল। তিতলী বলল, লেবু দিয়ে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দেব?

'না।'

'জ্বর নিয়ে আসার দরকারটা ছিল কী?'

'তোমার টাকাটা নিয়ে এসেছি।'

'টাকার জন্য কি আমি মরে যাচ্ছিলাম?'

'এখন দিতে না পারলে পরে হাত খালি হয়ে যাবে। দিতে পারব না।'

'সামান্য দু শ টাকা—আশ্চর্য! খবরদার ওই টাকা তুমি আমাকে দেবে না। তোমার কাছে থাকুক সুদে-আসলে বাড়ুক।'

'বমি বমি লাগছে। তিতলী ঘরে পান আছে?'

'আছে। তুমি বসার ঘরে গিয়ে বোস। এ কী! তুমি তো দেখি ঠিকমতো হাঁটতেও পারছ না। বাসায় যাবে কীভাবে?'

'অসুবিধা হবে না, রিকশা নিয়ে চলে যাব।'

তিতলী চিন্তিত গলায় বলল, এক কাজ কর—আজ থেকে যাও। বসার ঘরের খাটে মশারি খাটিয়ে দিচ্ছি। এত জ্বর নিয়ে তুমি কোথায় যাবে?'

'আরে না, তুমি কী যে বল! তোমার বাবা যদি ভোরবেলা উঠে দেখেন আমি শুয়ে আছি—তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় আমার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে দেবেন।'

'আমি মাকে বলি। মাকে বললেই মা ব্যবস্থা করে দেবে।'

'উনাকে কিছু বলবে না।'

'মা এত জ্বর নিয়ে তোমাকে কিছুতেই একা যেতে দেবে না।'

'উনাকে কিছু বলার দরকার নেই। তিতলী আমি যাচ্ছি।'

'পান। পান খাবে না?'

'উহুঁ।'

'বৃষ্টি পড়ছে তো, বৃষ্টির মধ্যে যাবে কীভাবে?'

'অসুবিধা হবে না।'

'জ্বর নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবে?'

'হুঁ।'

'পাগলের মতো হুঁ হাঁ করছ কেন? ভালোমতো কথা বল।'

হাসান হেসে ফেলল। তিতলীর অস্থিরতার মধ্যে শিশুসুলভ একটা ব্যাপার আছে, যা দেখতে ভালো লাগে।

'হাসছ কেন?'

'জ্বর হলে হাসতেও পারব না?'

'জ্বর নিয়ে তুমি এলে কেন? কে তোমাকে আসতে বলেছে?'

হাসান আবারো হাসল। তিতলী বিরক্তমুখে বলল, কথায় কথায় হাসবে না।

'আচ্ছা যাও হাসব না।'

তিতলী হাসানের হাত ধরল। ধরেই থাকল। মা এসে দেখে ফেললে দেখবে। সে কিচ্ছু কেয়ার করে না। তার চোখে এখন পানি এসে গেছে। হাসানের হাত ধরলেই তিতলীর চোখে পানি আসে।

হাসান নিজেই দরজা খুলল। ভালো বৃষ্টি নেমেছে। বাতাস নেই বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সরাসরি নেমে আসছে, বাঁকাভাবে আসছে না। বাতাস থাকলে বৃষ্টি ধরে যেত—বাতাস জলভর্তি মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যেত। আজ মেঘ উড়ে যাবে না। অনেক রাত পর্যন্ত বৃষ্টি পড়তেই থাকবে। আজ রাতটা হচ্ছে কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর রাত। হাসান বৃষ্টির ভেতর এগোচ্ছে। দরজা ধরে তিতলী দাঁড়িয়ে আছে। হাসানের ইচ্ছা করছে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তিতলীকে দেখে। ইচ্ছাটা সে চাপা দিল। মেয়েটার কান্না কান্না মুখ না দেখাই ভালো। হাসানের শরীর কাঁপছে। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। বরফের কুচির মতো গায়ে এসে লাগছে। চামড়া ভেদ করে ঠাণ্ডা ঢুকে যাচ্ছে শরীরের ভেতর। এমন প্রবল বৃষ্টিতে রিকশা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। হেঁটে হেঁটে পুরানা পল্টন থেকে ঝিকাতলা যাওয়া কি সম্ভব?

হাসান প্যান্টের পকেটে হাত দিল—টাকার বান্ডিলটা আছে তো? ডান প্যান্টের পকেটে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা তিন হাজার টাকা আছে। তিনটা পাঁচ শ টাকার নোট বাকি সব এক শ টাকার নোট। সুমির মা তাঁকে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন। সুমিকে তিন মাস ইংরেজি এবং অঙ্ক শেখানোর পারিশ্রমিক। টাকা দেবার সময় ভদ্রমহিলা শুকনো মুখে বললেন, টাকাটা দিতে দেরি হল কিছু মনে করবেন না। আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম মেয়ের বাবা প্রতি মাসে

টাকা পাঠান না, তিন–চার মাস পরপর একসঙ্গে পাঠান। হাসান হাসিমুখে বলল, কোনো অসুবিধা নেই। একসঙ্গে পেয়ে আমার বরং সুবিধাই হল।

'টাকাটা গুনে নিন।'

'গুনতে হবে না।'

'গুনতে হবে না কেন? অবশ্যই গুনতে হবে। গুনুন।'

ভদ্রমহিলা সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাসান টাকা গুনল। সব চকচকে নতুন নোট। নতুন নোটের গন্ধ শুঁকতে ভালো লাগে। ভদ্রমহিলার সামনে এই কাজটা করা যাবে না।

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমি ঠিক করেছি এখন থেকে আমার মেয়েকে আমি নিজেই পড়াব। আপনার আর আসার দরকার নেই।'

হাসানের মন খারাপ হয়ে গেল। তার তিন জন ছাত্রছাত্রী আছে। তিন জনের ভেতর সুমি মেয়েটা অন্যরকম। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে টুকটুক করে গল্প করে। প্রতিটি গল্পই খুব মজার। বেণি দুলিয়ে যখন গল্প করে তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।

'স্যার আমার বাবার যে অসম্ভব বুদ্ধি এই গল্পটা কি আপনাকে বলেছি?'

'না তো!'

'বাবার অসম্ভব বুদ্ধি। বুদ্ধিতে বাবার নাম্বার হল এক শ–তে এক শ দশ।'

'এক শ–তে এক শ দশ কীভাবে হয়?'

'সবার জন্যে হয় না, বাবার জন্যে হয়।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই। বাবার বুদ্ধি যে এক শ–তে এক শ দশ এটা কে বলে জানেন স্যার?'

'না জানি না। কে বলে?'

'আমার মা বলেন। আর কী বলেন জানেন?'

'জানি না।'

'আর বলেন—মানুষের এত বুদ্ধি থাকা ভালো না।'

'তোমার বুদ্ধি কেমন?'

'এখন আমার বুদ্ধি কম তবে আমি যখন বড় হব তখন আমার বুদ্ধিও হবে এক শ–তে এক শ দশ। স্যার আসুন এখন আমরা পড়াশোনা করি। অনেকক্ষণ ধরে গল্প করছি তো মা টের পেলে রাগ করবেন।'

হাসান টাকা গোনা শেষ করেছে। সুমির মা বললেন, রাবার ব্যান্ড দিচ্ছি রাবার ব্যান্ড দিয়ে বেঁধে নিন। আর শুনুন আমার মেয়েটা আপনাকে খুব পছন্দ করে। ওর বাবা বিদেশে—মেয়েটা একা একা থাকে, কথা বলার কেউ নেই। আপনি মাঝেমধ্যে এসে সুমিকে দেখে যাবেন।

'জ্বি আচ্ছা। সুমিকে একটু ডাকুন ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।'

'ওকে ডাকার দরকার নেই। আপনি চলে যাচ্ছেন সে জানে। কান্নাকাটি করতে পারে।'

এতগুলো টাকা পকেটে থাকলে মনের বিষণ্ন ভাব কেটে যায়। হাসানের কাটে নি। সে সুমিদের বাসা থেকে বের হবার সময় একবার ভাবল বলে—আমাকে কোনো টাকা–পয়সা দিতে হবে না। আমি সপ্তাহে তিন দিন এসে আপনার মেয়েকে পড়িয়ে যাব। বলা হয় নি। লাজুক ধরনের মানুষ বেশিরভাগ সময়ই মনের কথা বলতে পারে না। মনের কথা হড়বড় করে শুধুমাত্র পাগলরাই বলতে পারে। পাগলরা সেই কারণেই মনে হয় সুখী।

বড় রাস্তায় নেমেই হাসান রিকশা পেয়ে গেল। একটা না তিনটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। তিন জনই ঝিকাতলা যাবার জন্যে প্রস্তুত। হঠাৎ এ রকম সৌভাগ্যের কারণটা কী? সৌভাগ্যের

পরই দুর্ভাগ্য আসে। তাকে কি পথে হাইজ্যাকার ধরবে? ধরতে পারে। ধরলে মানিব্যাগ হাতে তুলে দিতে হবে। মানিব্যাগে দুটা এক শ টাকার নোট আছে। ওরা হাসিমুখে মানিব্যাগ নিয়ে চলে যাবে। প্যান্টের পকেটে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা তিন হাজার টাকার খোঁজ করবে না। তবে হাইজ্যাকারদের সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির রাতে দেখা হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। ঝড়বৃষ্টির রাতে তারা মজা করে নেশাটেশা করে। বৃষ্টিতে ভিজে হাইজ্যাকিং করা তাদের পোষায় না।

জ্বর সম্ভবত আরো বেড়েছে। হাসানের শরীর থরথর করে কাঁপছে। মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে রিকশায় পড়ে গেলে সমস্যা হবে। হাসান দু হাতে রিকশার হুড ধরে আছে। রিকশাওয়ালার হয়তো ধারণা হয়েছে সে রিকশা চালাচ্ছে না, স্পোর্টস কার চালাচ্ছে। রাস্তার পানি কেটে রিকশা শাঁ শাঁ করে এগোচ্ছে। বৃষ্টির পানিতে রাস্তা ডুবে আছে। গর্ত-খানা-খন্দ কিছুই চোখে পড়ছে না। হাসানের কেবলি মনে হচ্ছে কোনো একটা গর্তে পড়ে রিকশা উল্টে যাবে।

রিকশাওয়ালাকে রিকশা আস্তে চালাতে বলতেও ইচ্ছা করছে না। হাসানের মনে হচ্ছে— তার কথা বলার শক্তিও নেই।

ঝিকাতলা গলির মুখে এসে রিকশা থামল। এরচে ভেতরে আর যাবে না। গলিতে একহাঁটু পানি। ছোটখাটো একটা খাল তৈরি হয়ে গেছে। স্রোতের মতো পানি বইছে—কল কল শব্দও হচ্ছে।

হাসান রিকশা ভাড়া মিটিয়ে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে দেখে রাবার ব্যান্ডে মোড়া তিন হাজার টাকার প্যাকেটটা নেই। রিকশার সিট খালি—পা রাখার জায়গাটাও খালি।

রিকশাওয়ালা বলল, ভাইজান আপনার কি শইল খারাপ?

হাসান ক্লান্ত গলায় বলল, হুঁ।

'তাইলে টাইট হইয়া বহেন লইয়া যাই। জুম বিষ্টি নামছে—শোভানাল্লাহ কী অবস্থা!'

হাসান রিকশা থেকে নেমে গেল। রিকশায় টাইট হয়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না।

গলির নোংরা পানিতে পা টেনে টেনে হাসান এগোচ্ছে। বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে। হাসানের মনটা খুব খারাপ। তিন হাজার টাকা তার কাছে অনেক টাকা। এই টাকার শোক ভুলতে তার দীর্ঘদিন লাগবে। তিতলী দু শ টাকা পেত সেই টাকাটাও তাকে দেয়া হল না। আবার কবে তার হাতে টাকা আসবে কে জানে।

রাত যত বাড়ছে বৃষ্টি ততই বাড়ছে। তিতলী শুয়েছে জানালার পাশে। জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে তাকে প্রায় ভিজিয়ে দিচ্ছে। সুরাইয়া উঠে বসলেন, তিতলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, জানালাটা বন্ধ করে দে। ভিজে যাচ্ছিস তো।

'ভিজছি না।'

'ভিজছিস না মানে—গা তো অর্ধেক ভেজা।'

সুরাইয়া জানালা বন্ধ করার জন্য এগোলেন। তিতলী করুণ গলায় বলল, পায়ে পড়ি মা। জানালা খোলা থাকুক।

'শেষে একটা অসুখ-বিসুখ বাঁধাবি।'

'আমার কিচ্ছু হবে না।'

তিতলী গুটিসুটি মেরে মায়ের কাছে ঘেঁষে এল। সুরাইয়া মেয়ের গায়ের উপর একটা হাত তুলে দিলেন। মেয়ের জন্যে আজ তাঁর মনটা খুব কাঁদছে। তিতলীর সামনে ভয়াবহ দুঃসময়। তিতলীর বড় ফুফু তিতলীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলছেন। ছেলে খুবই ভালো, জিওলজিতে মাস্টার্স করে ইউনিভার্সিটির লেকচারার হয়েছে। কমনওয়েলথ স্কলারশিপ পেয়েছে। বউ নিয়ে পি.এইচডি করতে যাবে কানাডায়। তারা এসে কয়েক দফায় তিতলীকে দেখে গেছে। মেয়ে পছন্দ কি অপছন্দ হয়েছে এমন কিছু বলছে না। তবে পছন্দ তো হয়েছে নিশ্চয়ই—নয়তো দফায় দফায় মেয়ে দেখত না। তিতলীর ফুফু আজ এসেছিলেন, তিনি সুরাইয়াকে আড়ালে ডেকে

বলেছেন—ওরা খবর পাঠিয়েছে মেয়ে ওদের পছন্দ। তারপরেও একটু খোঁজখবর করছে—ফাইনাল কথা আগামী সপ্তাহে বলবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ কর।

যদি শেষ পর্যন্ত ওরা পছন্দ করে ফেলে তিতলীকে সেখানেই বিয়ে দিতে হবে। বড় ফুফুর ইচ্ছার বাইরে যাবার ক্ষমতা তিতলীর নেই। তিতলীর কেন, এ বাড়ির কারোই নেই।

'তিতলী।'

'জ্বি মা।'

'হাসানের কী একটা এনজিওর চাকরি যে হবার কথা ছিল হয় নি?'

'হয়েছিল। সে যায় নি—গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হয় বেতনও খুব কম।'

'কত বেতন?'

'আঠার শ টাকা।'

'বলিস কী! মাত্র আঠার শ টাকা?'

'হুঁ।'

সুরাইয়া বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন—তিতলীর শরীর কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। তিনি মেয়েকে আরো কাছে টেনে নিলেন।

'তিতলী!'

'জ্বি মা।'

'কাঁদছিস নাকি?'

তিতলী জবাব দিল না, তবে তার ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল।

'কাঁদছিস কেন?'

তিতলী অস্পষ্ট স্বরে বলল, ফুফু তোমাকে আড়ালে নিয়ে কী বলেছে?

'কিছু বলে নি।'

'আমি জানি বলেছে। মা শোন, আমি এখন বিয়ে করব না।'

'তোর ফুফু চাইলে না করবি কীভাবে?'

তিতলী জবাব দিল না। তার শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হয়েছে। সে নিজেকে সামলেছে। সুরাইয়া নরম গলায় বললেন—একটা মেয়ের জীবনে বিয়ে অনেক বড় ব্যাপার। বিয়ে হল তার নিজের ঘর-সংসার। সুন্দর ঘর-সংসার সব মেয়েই চায়। চায় না?

'হুঁ।'

'একটা বেকার ছেলেকে বিয়ে করে অভাব-অনটনে সারা জীবন কাটানোর কোনো মানে হয় মা? প্রেমের চেয়েও টাকা-পয়সা অনেক বেশি জরুরি।'

'এখন এইসব কথা থাক মা। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাক।'

'তোর ফুফুরা তোর জন্যে যে বিয়েটা দেখছে সেটা যদি হয় তাহলে তোর জন্যে কিন্তু ভালো হবে। বরের সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াবি। ঢাকা শহরে নিজের বাড়িতে থাকবি...'

'মা চুপ কর তো।'

'টাকা-পয়সাটা যে কত জরুরি সেটা কি তুই আমাদের এই সংসার দেখেও বুঝতে পারছিস না? তোর বাবার চাকরি নেই—সংসার চালাতে হয় ফুফুদের দেয়া টাকা থেকে। তোর ফুফুদের কথা আমরা ফেলব কীভাবে? মা ঘুমিয়ে পড়েছিস?'

তিতলী জবাব দিল না। তার আবারো কান্না পাচ্ছে। খুব সাবধানে কাঁদতে হবে। মা যেন টের না পায়। মা টের পেলে মনে কষ্ট পাবে। তিতলী কাউকে কষ্ট দিতে চায় না।

কষ্ট দিতে না চাইলেও তাকে কষ্ট দিতে হবে। হাসানকে ছাড়া সে বাঁচবে না। সে যদি পথে পথে ভিক্ষা করেও বেড়ায় তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। দেশ-বিদেশ দেখে কী হবে? সে তার একটা জীবন হাসান ভাইয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে।

তাছাড়া কোনো একটা চাকরি তো হাসান ভাইয়ের অবশ্যই হবে। তখন তারা ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া করবে। দু কামরার ঘর হলেই তাদের চলবে। একটা শোবার ঘর, একটা বসার ঘর। এক চিলতে বারান্দা থাকলে খুব ভালো হয়। বারান্দায় সে ফুলের টব রাখবে। কোনো এক সময় তাদের সংসারে একটা বাবু আসবে। বাবুর নামও সে ঠিক করে রেখেছে।

সুরাইয়া ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলছেন। তিতলীর ঘুম আসছে না। তার খুব অস্থির লাগছে। হাতের আঙুল কাঁপছে। হাসানের আশপাশে থাকলে তার এ রকম হয়। নির্জনে যখন হাসানের কথা ভাবে তখনো হয়। বিয়ের পরেও কি এ রকম হবে? নাকি সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে? বাবা যেমন মায়ের সঙ্গে কঠিন গলায় কথা বলেন, হাসানও তার সঙ্গে কঠিন গলায় কথা বলবে? না তা সে কখনো হতে দেবে না। তিতলী খুব সাবধানে বিছানা থেকে নামল। হাসানের চিঠিটা আরেকবার পড়তে ইচ্ছা করছে। সে বারান্দায় চলে যাবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিঠিটা আরেকবার পড়বে।

হাসানের চিঠিগুলো খুব সাদামাটা ধরনের হয়। আবেগের কথা কিছুই থাকে না, তবু চিঠি চোখের সামনে ধরলেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। কেন এ রকম হয়?

তিতলী,

কদিন ধরে আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। রাতে ঘুমোতে গেলেই উদ্ভট সব স্বপ্ন দেখি। একটা স্বপ্ন বেশ কয়েকবার দেখে ফেললাম—স্বপ্নটা হচ্ছে আমি একদল হাসের সঙ্গে ঘুরছি। শামুক গুগলি খাচ্ছি। কী বিশ্রী স্বপ্ন তাই না? আচ্ছা শোন হাস বানানে কি চন্দ্রবিন্দু আছে? যদি থাকে তুমি দিয়ে নিও।

ইতি হাসান।

এই হচ্ছে চিঠি। কষ্ট করে কি আরো কয়েকটা লাইন লেখা যেত না? সে কি লিখতে পারত না—

"তিতলী শোন, আমি সারাক্ষণ তোমার কথা ভাবি। সারাক্ষণ আমার ইচ্ছা করে তোমার হাত ধরে বসে থাকতে। সেই দিন কবে যে আসবে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। চল আমরা কোর্টে বিয়ে করে ফেলি—তারপর যা হবার হবে।"

না হাসান এই জাতীয় কথাবার্তা কখনো লিখবে না। তার চিঠিগুলো হল কাজের চিঠির মতো।

তিতলী ঘুমোতে এল। বৃষ্টি আরো প্রবল হয়েছে। তারা যখন সংসার করবে তখন বৃষ্টির রাতগুলো ঘুমিয়ে নষ্ট করবে না। তিতলী মায়ের গায়ে হাত উঠিয়ে দিল। সুরাইয়া মেয়েকে নিজের দিকে আরেকটু টেনে নিয়ে বললেন—চিঠিতে কী লেখা যে একটু পর পর পড়তে হচ্ছে? তিতলীর হাতপা শক্ত হয়ে গেল। সুরাইয়া হাসলেন। অন্ধকারে সেই হাসি তিতলী দেখতে পেল না—সে গুটিসুটি মেরে মায়ের বুকের কাছে চলে এল।

৪

মে মাসের কড়া ঝাঁঝালো রোদ এসে পড়েছে হাসানের মুখের উপর। রোদ ঠেকাবার জন্যে হাসানকে উঠে জানালা বন্ধ করতে হবে। সেটা সম্ভব হচ্ছে না। হাসানের বিছানায় উঠে বসার ক্ষমতা নেই জানালা বন্ধ করা তো অনেক পরের ব্যাপার। তার গায়ে এক শ তিন পয়েন্ট পাঁচ জ্বর। রীনা কিছুক্ষণ আগে জ্বর মেপেছে। জ্বর থার্মোমিটারে মাপা হয় নি, বাসায় থার্মোমিটার নেই। রীনা কপালে হাত রেখে গম্ভীর গলায় বলেছে—এক শ তিন পয়েন্ট পাঁচ। জ্বরের ক্ষেত্রে রীনার অনুমান ভালো। জ্বর মনে হয় বাড়ছে। গায়ে কাঁপুনি দিচ্ছে। মুখের উপর রোদটা আগেও ছিল। তখন এতটা খারাপ লাগছিল না। এখন অসহ্য বোধ হচ্ছে। রোদটা মনে হচ্ছে তরল আকার নিয়েছে। মুখ থেকে গড়িয়ে চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। চোখ ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে।

হাসান কয়েকবার ডাকল, "এদিকে কে আছে? এই এই।" ডাক তেমন জোরালো হল না। কিংবা জোরালো হলেও কেউ শুনল না। সকালবেলার কয়েকটা ঘণ্টা বাড়ির লোকজন সীমাহীন ব্যস্ততায় থাকে। সকাল আটটা থেকে সাড়ে ন'টা এই দেড় ঘণ্টা সময়ের ভেতর তারেক অফিসের দিকে রওনা হন। অফিসে যাবার প্রস্তুতি পর্ব শেষ হতে তাঁর পুরো এক ঘণ্টা লাগে। তিনি কোনো জিনিসই খুঁজে পান না। তাঁর হাঁকডাক ক্রমাগত শোনা যেতে থাকে—আমার জুতার ভেতর মোজাজোড়া রাখলাম, একটা আছে আরেকটা গেল কোথায়? পরিষ্কার একটা রুমাল দিতে বললাম—কথাটা কারো কানে যাচ্ছে না? এটা বলার জন্যে কি আমি মাইক ভাড়া করব? টেবিলের উপর বড় একটা হলুদ খাম ছিল—খামের উপর লালকালি দিয়ে 'Important' লেখা। খামটা গেল কোথায়? একটু আগেও তো দেখেছি। খামের তো আর পা নেই যে হেঁটে হেঁটে মালিবাগ চলে যাবে?

তারেক সাহেবের দুই ছেলে রকেট এবং বুলেটের স্কুল সাড়ে আটটায়। (আসল নাম মোহাম্মদ সালাউদ্দিন এবং মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন। রকেট এবং বুলেট হাসানের ছোট ভাই রকিবের দেয়া নাম—এই নামেই তারা স্কুলে এবং বাসায় পরিচিত। তাদের সুন্দর ডাকনামও আছে টগর এবং পলাশ। এই দুই নামে তাদের মা ছাড়া এখন আর কেউ ডাকে না।) তারা দুজন এক বছরের ছোট বড় হলেও একই ক্লাসে পড়ে। যমজ ভাইদের মতো প্রতিটি কর্মকাণ্ড তারা একসঙ্গে করে। সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলের জন্য তৈরি হয়ে দুজনই একসঙ্গে বলে—"আজ স্কুলে যাব না।" সাড়ে সাতটা থেকে আটটা এই আধঘণ্টা তাদের উপর স্কুলযাত্রায় রাজি করানোর নানান প্রক্রিয়া চালানো হয়। কোনোটিই কাজ করে না। শেষ ওষুধ হিসেবে রীনা দুজনের গালেই কষে চড় বসায়। দুজন একই সঙ্গে গলা ছেড়ে কাঁদে। ক্রন্দনরত অবস্থাতেই তাদের প্রায় টেনেহেঁচড়ে রিকশায় তুলে দেয়া হয়। এদের স্কুলে পৌঁছে দেয়া এবং স্কুল থেকে আনার দায়িত্ব পালন করেন তাদের দাদুভাই আশরাফুজ্জামান সাহেব। কাজটা তিনি যে খুব আগ্রহের সঙ্গে করেন তা না। রিটায়ার্ড বাবা যদি ছেলের সংসারে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও কিছু কাজকর্ম করতে হয়। জগতে ফ্রি লাঞ্চ বলে কিছু নেই।

হাসানের ছোট বোন লায়লা জগন্নাথ কলেজে বি.এ. পড়ে। সে লাঞ্চবক্সে করে দুপুরের টিফিন নিয়ে যায়। তাকে এই সময় অত্যন্ত ব্যস্ত দেখা যায়। সে খুব সাজগোজ পছন্দ করে। তার ব্যস্ততা একই সঙ্গে সাজগোজের দিকে এবং টিফিন তৈরি হল কি না সেই দিকে। নিজের সাজগোজের উপর লায়লার আস্থা খুবই কম। সাজের প্রতিটি পর্যায়ে সে তার ভাবীর কাছে ছুটে যায়—ভাবীর মতামত নিয়ে নিয়ে সাজের পরবর্তী ধাপের দিকে এগোয়, ভাবী টিপটা কি মাঝখানে হয়েছে? লাল টিপটাই পরব নাকি টিপ হাতে আঁকব? ঠোঁটের লিপস্টিক কি বেশি কড়া হয়ে গেছে?

রীনা বিরক্ত হয় না। সাজসজ্জার ব্যাপারে অন্যকে পরামর্শ দেবার ব্যাপারে কোনো মেয়েরই বিরক্তি থাকে না। মেয়েরা এই কাজটা খুব আগ্রহ এবং আনন্দ নিয়ে করে।

ঠিক ন'টার সময় ঠিকা কাজের মেয়ে ফুলির মা আসে। প্রতিদিনই তার সঙ্গে এ বাড়ির স্থায়ী কাজের মেয়ে কমলার মার একটা ঝগড়া শুরু হয়। কমলার মা নিচুগলায় ঝগড়া করলেও ফুলির মার গলা—কাকতাড়ুয়া গলা। সে চিৎকার শুরু করলেই আশপাশের কাক উড়তে থাকে। প্রতিদিনই একবার ঠিক করা হয় ফুলির মাকে আর রাখা হবে না। পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে বিদায় করা হবে। বিদায় করা হয় না। কারণ ফুলির মার কর্মক্ষমতা অসাধারণ। ঝগড়া করতে করতেই সে অতি দ্রুত বাসনকোসন মেজে ঝকঝকে করে ফেলবে। পুরো বাড়ি ঝাঁট দেবে, কলঘরে রাখা দু বালতি কাপড় ধুয়ে চিপে দড়িতে শুকোতে দেবে। তার দায়িত্ব এই পর্যন্তই। দায়িত্ব পালনের পরেও সে যাবার আগে রীনাকে জিজ্ঞেস করবে, আর কোনো কাম আছে আফা। থাকলে তুরন্ত কন। এক বাড়িত কাম করলেই আমার শেষ না, আরো বাড়ি আছে। নিজের ঘর-সংসার আছে।

এমন একজন কাজের মানুষকে শুধুমাত্র ঝগড়া করার স্বভাবের জন্যে কেউ বিদায় করে না। মানুষ এত বোকা না।

সকালের এই ব্যস্ততা, হট্টগোল হাসান তেমন টের পায় না। কারণ তার ঘুম ভাঙে ন'টার পরে। ততক্ষণে হইচই থিতিয়ে আসে। চারদিকে ঝড়ের পরের শান্ত অবস্থা বিরাজ করে। আজ জ্বরের কারণে সকাল ছ'টা থেকে সে জেগে। বাড়ির প্রতিটি শব্দ তার কানে আসছে। প্রবল জ্বরের সময় মানুষের কান তীক্ষ্ণ হয়। নিচু শব্দও অনেক বড় হয়ে কানে বাজে। হাসান বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলল, হইহল্লাটা একটু কমানো যায় না? গড অলমাইটি বাড়িটা একটু শান্ত করে দিন। আমার উপর একটু দয়া করুন। প্লিজ।

হইহল্লা কমল না, বরং বাড়তে থাকল। ঝনঝন শব্দে থালা বা কাচের জগ ভাঙল। কাচের জিনিস ভাঙার শব্দ একবার হয়েই থেমে যাবার কথা—এই শব্দ থামছে না—ঝনঝন করে বেজেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে থালাবাসনও টের পেয়েছে এ বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আছে। তাকে বিরক্ত করা তার পবিত্র কর্তব্য। এর মধ্যে লায়লা ঘরে ঢুকে বলল, দাদা তোর নাকি আকাশ-পাতাল জ্বর—ভাবী বলল।

হাসান জবাব দিল না। লায়লা সেন্ট মেখেছে, সেন্টের গন্ধে হাসানের গা গোলাচ্ছে। হাসান নিশ্চিত লায়লা আর কিছুক্ষণ তার ঘরে থাকলে সে বমি করে দেবে। যে কোম্পানি এই সেন্ট বানিয়েছে সেই কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়া দরকার।

'দাদা দেখ তো এই হলুদ শাড়িটা কি বেশি কটকটে লাগছে?'

হাসান ধমকের গলায় বলল, তুই ঘর থেকে যা তো। জাস্ট ক্লিয়ার আউট।

লায়লা হাসানের ধমকে বিস্মিত হল না বা রাগও করল না। যেভাবে ঘরে ঢুকেছিল, সেভাবেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল। তখন হাসানের মনে হল একটা ভুল হয়েছে লায়লাকে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করালে কাজ হত। রোদটা আর চোখের ভেতর ঢুকে যেত না। কী বিশ্রী কী ভয়ংকর রোদই না আজ উঠেছে! তরল রোদ। রোদের ভিসকোসিটি অনেক—গড়াতে গড়াতে কী সুন্দর চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে মাথাটা ভারি করে ফেলছে।

কলঘর থেকে কাপড় কাচার শব্দ এবং ফুলির মার গলাবাজি একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে—উচিত কথা আমারে শিখায়। আরে ধুমসী কাইলা মাগী—উচিত কথার ধার ফুলির মা ধারে না। তোর উচিত কথাত ফুলির মা থুক দেয়। থু থু থু।

রীনার গলা শোনা গেল—ফুলির মা চুপ কর তো।

ফুলির মার গলা আরো এক ধাপ উঠে গেল, আফা আমারে না—ধুমসী কাইলা মাগীরে চুপ করতে কন। হের গলা পাও দিয়া চাইপ্যা ধরেন। মাগী আমারে উচিত কথা শিখায়।

'ফুলির মা মাগী ফাগী বলবে না খবরদার।'

'মাগীরে মাগী বলব না তো কী বলব আফা? ছাগী বলব? মাগীরে ছাগী বললে ছাগীরে কী বলব—বোতল বলব? আপনেই বলেন, আপনের বিচারটা কী হুনি।'

'চুপ কর।'

'আপনে চুপ করেন। অত গরম ভালো না। ফুলির মা গরমের ধার ধারে না।'

হাসানের ইচ্ছা করছে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে—তোমরা দয়া করে চুপ করবে? দয়া করে কেউ একজন এসে আমার জানালা বন্ধ করবে? তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না আমার মাথার ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে।

হাসানের মনে হল হঠাৎ সব শব্দ কমে গেল। মাথার ভেতর জমে থাকা তরল রোদ হঠাৎ জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে গেল। হাসানের ঘুম ঘুম পেতে লাগল।

তার সত্যি ঘুম পাচ্ছে, না সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? প্রচণ্ড জ্বরে অজ্ঞান হয়ে যাবার কথা সে অন্যের কাছে শুনেছে। তার বেলায় এই প্রথম ঘটছে। খুব খারাপ তো লাগছে না। অজ্ঞানটা আরো আগে হতে পারলে ভালো হত। হাসান ক্ষীণ গলায় ডাকল—ভাবী, ভাবী।

মাথায় ঠাণ্ডা পানির ধারা। কেউ একজন চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। কে পানি ঢালছে? চোখ মেললেই দেখা যায়—চোখ মেলতে ইচ্ছা করছে না। বাসায় পানি ঢালার মানুষ নেই। কমলার মা কি পানি ঢালছে? মনে হচ্ছে কমলার মা। তবে কমলার মা মাথায় পানি ঢাললেও চুলে বিলি কাটবে না। তাহলে কে? চোখ মেলে কি দেখবে? না দেখতে ইচ্ছা করছে না। যার ইচ্ছা পানি ঢালুক কিছু যায় আসে না।

'হাসান!'

'জ্বি ভাবী।'

'একটু কি ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'তোমার জ্বর কত উঠেছে জান?'

'না।'

'এক শ পাঁচ। আমি বাড়িওয়ালাদের বাসা থেকে থার্মোমিটার এনে জ্বর মেপে হতভম্ব। তুমি অচেতনের মতো হয়ে ছিলে। মুখ দিয়ে ফেনা টেনা বের হয়ে বিশ্রী কাণ্ড। উঠে বসতে পারবে?'

'উঠে বসতে হবে কেন?'

'দুটা প্যারাসিটামল খাইয়ে দিতাম। জ্বরটা কমত।'

'শুয়ে শুয়ে খেতে পারব। দাও ট্যাবলেট দুটা দাও।'

'গলায় আটকাবে তো?'

'আটকাবে না।'

'হাসান শোন, পুরো এক ঘণ্টা তোমার মাথায় পানি ঢালা হয়েছে, গা স্পঞ্জ করা হয়েছে। আমার ধারণা জ্বর অনেকটা কমেছে। আমি দেয়ালে ঠেস দিয়ে তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি। তুমি বসে বসে প্যারাসিটামল খাও। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে জ্বরটা আরো কমবে তখন নাশতা নিয়ে আসব। দাঁড়াও মাথাটা আগে মুছে দি।'

হাসানকে ধরে উঠাতে হল না, সে নিজেই উঠে বসল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল। রীনা তার কোলে একটা বালিশ দিয়ে দিল। জ্বর কতটা কমেছে দেখতে পারলে হত। সম্ভব না—কারণ থার্মোমিটার কিছুক্ষণ আগে টেবিল থেকে পড়ে ভেঙেছে। বাড়িওয়ালাকে এই জাতীয় আরেকটা থার্মোমিটার কিনে দিতে হবে। আজ দিনের মধ্যেই কিনতে হবে। সন্ধ্যার মধ্যে থার্মোমিটার পাঠানো না হলে লোক চলে আসবে। তাদের বাড়িওয়ালা কঠিন বস্তু।

'এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'রাতদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বরজ্বারি তো হবেই।'

'মাঝে মাঝে অসুখ-বিসুখ হওয়া ভালো, সেবা পাওয়া যায়।'

'অসুখ-বিসুখ ছাড়াই সেবা পাওয়ার লোক নিয়ে এসো—চোখ বন্ধ করে বসে আছ কেন? তাকাও।'

'আলো চোখে লাগছে ভাবী।'

'লাগুক। চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে না। বিশ্রী লাগে। তোমার ভাইয়েরও একই অভ্যাস। খাটে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা আর পা নাচানো। মনে হয় তার একটা পা স্প্রিঙের। বাতাস পেলেই দোলে।'

হাসান চোখ মেলল। আলোটা এখন আর তেমন চোখে লাগছে না। শরীর ঘামছে, জ্বর মনে হয় সত্যি সত্যি কমছে। তবে সিগারেট খাবার ইচ্ছা এখনো হচ্ছে না। যখন হবে তখন বুঝতে হবে জ্বর পুরোপুরি কমে গেছে। হাসান রীনার দিকে তাকিয়ে হাসল। একবার ভাবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে—ভাবী আজ তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। শেষ পর্যন্ত বলল না। রীনা ভাবীর মুখ খুব আলগা—ফট করে এমন এক কথা বলবে যে অস্বস্তিতে মুখটুখ শুকিয়ে যাবে। ভাবী সেটা নিয়ে দিনের পর দিন ঠাট্টা করে বেড়াবে। একদিন রীনা হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরেছিল। চুলগুলো ছিল ছাড়া। হাসান তাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলেছিল—তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন ভাবী? রীনা গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কি রবীন্দ্রনাথ?'

'তার মানে?'

'রবীন্দ্রনাথ তাঁর বউদির প্রেমে পড়েছিলেন। তোমারও মনে হয় সেই অবস্থা।'

হাসান দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। রীনা সহজ ভঙ্গিতে বলল, চোখমুখ এমন করে ফেলেছ কেন? বউদিদের প্রেমে পড়া এমন কোনো ভয়াবহ অপরাধ না। এ দেশের সমাজ ব্যাপারটা সহজভাবেই দেখে। প্রেম খুব বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে দেবরকে বিয়ে দিয়ে দেয়। বউয়ের সঙ্গে এক রাত কাটাবার পর সব প্রেম শেষ। প্রেমের সলিল সমাধি হয় না—হয় বিছানা সমাধি।

রীনার রসিকতা এখানে শেষ হলেও হত। শেষ হয় নি। সেদিনই রীনা হাসানের সামনে তার বড় ভাইকে বলল, ঘটনা শুনেছ? তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তো আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। ভাইকে এক্ষুনি বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আর দেরি করলে সে আমাকে প্রেমপত্র-টত্র লিখে ফেলবে। তখন যন্ত্রণা হবে। ইট ইজ হাই টাইম।

হাসানের লজ্জায় মরে যাবার মতো অবস্থা। এ জাতীয় বিপজ্জনক মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা খুব সাবধানে বলতে হয়। হাসান খুবই সাবধানে কথা বলে তারপরেও মাঝে মাঝে বিশ্রী ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।

রীনাকে আজ আসলেই খুব সুন্দর লাগছে। কে বলবে এই মহিলা ত্রিশ বছর পার করে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে হালকাপাতলা গড়নের এক কিশোরী—আজ মজা করে শাড়ি পরে বড় সেজেছে।

AMARBOI.COM

'আজ কী বার ভাবী?'

'সোমবার।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশ কেন?'

'সোমবার আমার জন্যে খুব খারাপ। ভয়াবহ সব সমস্যা হয় সোমবারে।'

'তোমার তো শুধু সোমবার খারাপ আমার সব বারই খারাপ।'

'ভাবী চা খাব।'

'শুধু চা?'

'চায়ের সঙ্গে একটা টোস্ট খেতে পারি। জ্বর মনে হয় কমে যাচ্ছে ভাবী। ঘাম দিচ্ছে।'

'ভেরি গুড—শোন তোমার টাকাটা ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। তুমি এত অসাবধান কেন?'

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না ভাবী কিসের টাকা?

'কাল রাতে যে ভেজা প্যান্ট কলঘরে ছেড়ে এলে তার হিপ পকেটে তিন হাজার টাকা। রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। কাপড় ধুতে গিয়ে ফুলির মা পেয়েছে—আমাকে দিয়ে গেছে।'

'বল কী?'

'বল কী মানে? টাকার কথা জানতে না? অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর হয়, অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড বেকার হয় বলে তো জানতাম না। কোথায় পেয়েছ এত টাকা?'

'টিউশ্যানির টাকা ভাবী। সুমি বলে একটা বাচ্চা মেয়েকে পড়াতাম। তিন মাসের টাকা এক মাসে দিয়ে চাকরি নট করে দিয়েছে।'

'কেন?'

'পড়াতে পারি না এই জন্যে বোধহয়।'

'পড়াতে পার না?'

'নাহ্—পড়াতে গিয়ে শুধু গল্প করি।'

'বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে এত কিসের গল্প?'

'বাচ্চাদের সঙ্গে গল্পই সবচে ইন্টারেস্টিং ভাবী। যা ইচ্ছা বলতে পারেন। ওরা মন দিয়ে শুনবে। বড়দের সঙ্গে গল্প করা খুব সমস্যা। প্রতিটি কথা ভেবেচিন্তে বলতে হয়।'

'আমার সঙ্গে গল্প করার সময়ও কি তুমি প্রতিটি কথা ভেবেচিন্তে বল?'

রীনা ঠোঁট টিপে হাসছে। হাসান সাবধান হয়ে গেল। ভাবীর মতলব ভালো না—কোনো একটা প্যাঁচে ফেলে দেবে।

'চা খাব ভাবী।'

'চা, টোস্ট, সিদ্ধ ডিম?'

'হ্যাঁ।'

'মাথাটা এগিয়ে আন তো জ্বরের অবস্থাটা দেখি। এ কী! লজ্জায় এমন লাল হয়ে যাচ্ছ—তুমি কি সত্যি সত্যি আমার প্রেমে পড়েছ নাকি? আশ্চর্য কাণ্ড।'

রীনা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারটা প্রায় বাজে, আজ হাফস্কুল, বাচ্চাদের এগারটার মধ্যে চলে আসার কথা—এখনো আসছে না কেন? অস্পষ্ট কুয়াশার মতো দুশ্চিন্তা হচ্ছে। যদিও রীনা জানে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বাবা সঙ্গে আছেন। ট্রাফিক জ্যামট্যামে রিকশা নিশ্চয়ই আটকা পড়েছে।

আজ দুপুরে কী রান্না হবে সেটাও দেখতে হবে। বাজার হয় নি। রোজকার বাজার হাসান করে দেয়। আগে সপ্তাহের বাজার করে ফ্রিজে রাখা হত। ফ্রিজ কাজ করছে না। নতুন গ্যাস ভরতে হবে। দোকান থেকে ডিম আনিয়ে ডিমের তরকারি করা ছাড়া উপায় নেই। ডিম আনানোর লোক নেই। কমলার মাকে পাঠানো যাবে না। তার বাড়ি থেকে বের হওয়া মানেই অ্যাকসিডেন্ট। রিকশার নিচে পড়ে যাওয়া, ড্রেনে পড়ে যাওয়া—একবার মাইক্রোবাসের ধাক্কা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে দুদিন ছিল হাসপাতালে। আরেকবার পান কিনতে গিয়ে কুকুরের কামড় খেয়ে এল। মহাখালিতে নিয়ে নাভিতে ইনজেকশন—শতেক যন্ত্রণা।

রীনা রান্নাঘরে ঢুকল। গ্যাসের চুলা দুটিই জ্বলছে। চুলায় কিছু নেই। কমলার মা নির্বিকার ভঙ্গিতে সুপারি কাটছে। কমলার মা ঘণ্টায় ঘণ্টায় পান খায়। পানের খরচ তাকে আলাদা দিতে হয়।

'কমলার মা?'

'জ্বি।'

'একটা ডিম সিদ্ধ কর তো।'

'ডিম নাই আফা।'

'একটাও নেই?'

'জ্বি না। আমার পানও ফুরাইছি। সকাল থাইক্যা সুপারি চাবাইতাছি। অখন একটা পান না খাইলে দমফুটা লাইগ্যা মিত্যু হবে।'

'মৃত্যু হবার দরকার নেই—যাও পান নিয়ে আস। দু হালি ডিম আনবে। আজ ডিমের তরকারি করবে। ঘরে বেগুন আছে না? বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি। এস টাকা নিয়ে যাও। রাস্তা সাবধানে পার হবে কমলার মা। গ্যাসের চুলা নিভিয়ে দিয়ে যাও—শুধু শুধু জ্বলছে কেন?'

রীনার সংসারের টাকা স্টিলের আলমারিতে চকলেটের খালি টিনে আলাদা করে থাকে। আজ মাসের ২৫ তারিখ সেই টিন খালি। রীনা তা জানে তারপরেও টিন খুলল। টিন আসলেই খালি—একটা চকচকে দশ টাকার নোট পড়ে আছে। টাকার বাক্স পুরোপুরি খালি রাখতে নেই বলেই দশ টাকার নোটটা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা টিনের কৌটা আছে তার শোবার ঘরের টেবিলের ড্রয়ারে। ইমার্জেন্সি ফান্ড। সেটাও খালি। টাকা-পয়সার এই শোচনীয় অবস্থার কথা তারেককে সে দুদিন আগেই বলেছে। তারেক বলেছে ব্যবস্থা করছি। আজ তার কিছু টাকা আনার কথা। আজ না আনলে আগামীকাল বাচ্চাদের স্কুলেও পাঠানো যাবে না। এই মাসটা তাও কোনোক্রমে পার হয়ে গেল—সামনের মাসটায় কী হবে কে জানে। এ মাসে বাড়ি ভাড়া পুরোটা দেয়া হয় নি। এক হাজার টাকা কম দেয়া হয়েছে। সামনের মাসে বাড়ি ভাড়ার সঙ্গে এক হাজার টাকা বেশি দিতে হবে। বাড়তি এক হাজার টাকাটা আসবে কোত্থেকে?

এই বাড়িওয়ালা এমন না যে তাকে বাচ্চাদের মতো ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখা যাবে। সে ঠিকই সামনের মাসের দু তারিখে সস্তা কিছু লজেন্স নিয়ে উপস্থিত হবে। হাসিমুখে ডাকবে রীনা বউমা কোথায়? রকেট-বুলেট কোথায়? এই দুজনকে দিনে একবার না দেখলে ভালো লাগে না।

টাকা-পয়সার এই অশান্তি রীনার অসহ্য বোধ হচ্ছে। কোনোখান থেকে একবারে হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাওয়া গেলে খুচরা ঋণগুলো দিয়ে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা যেত। সেই সম্ভাবনা নেই। হার্ডওয়ারের দোকানে আলাদীনের চেরাগ কিনতে পাওয়া যায় না। আলাদীনের চেরাগ ছাড়া এই সমস্যার কোনো সমাধান নেই।

রীনার একটা ভারি নেকলেস আছে। তার দাদিজান বিয়ের সময় দিয়েছিলেন। পাঁচ ভরি সোনার পদ্মহার। দাদির স্মৃতিচিহ্ন। স্মৃতিচিহ্ন-ফিহ্ন আবার কী? বেঁচে থাকাটাই সবচে বড় স্মৃতিচিহ্ন। হারটা বিক্রি করে দিতে হবে।

রীনা আবার হাসানের ঘরে ঢুকল। হাসান হাসিমুখে বলল, ভাবী জ্বরটা মনে হয় পুরোপুরি সেরে গেছে। একটু আগে একটা সিগারেট খেলাম।

'ভালো। তোমার চা-টোস্ট এবং ডিম চলে আসবে। শোন হাসান, তোমার তিন হাজার টাকা থেকে আমাকে কিছু ধার দিতে পারবে—শ পাঁচেক?'

'ভাবী তুমি পুরোটাই নিয়ে যাও। টাকাটার আশা আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম পাওয়া যখন গেছে এটা তোমার।'

'আমি পাঁচ শ টাকাই নিচ্ছি বাকি টাকাগুলো দিয়ে তুমি দয়া করে কিছু ভালো কাপড়চোপড় বানাও। ইন্টারভ্যুর সময় এলেই তোমার ভাইয়ের শার্ট-প্যান্ট নিয়ে তুমি দৌড়াদৌড়ি কর—আমার খারাপ লাগে। তোমার বয়েসী একটা ছেলের এক সেট ভালো কাপড়চোপড় থাকবে না, এটা কেমন কথা। আর শোন, ভালো একজোড়া জুতা তুমি অবশ্যই কিনবে। শার্ট ইন করে প্যান্ট পরবে, জুতা পরবে, চকচকে নতুন টাকার মতো স্মার্ট ভঙ্গিতে ইন্টারভ্যু দিতে যাবে তবেই না চাকরি হবে। লেবেন্ডিসের মতো ইন্টারভ্যু দিতে যাও বলেই তোমার কিছু হয় না। তুমি আমাকে দোকানে নিয়ে যেও আমি দেখেশুনে তোমার জামাকাপড় কিনে দেব।'

হাসান লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা।

রীনা টাকা হাতে বের হয়ে এল। তার লজ্জা লাগছে। টিউশ্যানি করে হাসান অল্প কিছু টাকাই পায় সেই টাকায় রীনাকে প্রায়ই ভাগ বসাতে হয়। এরচেয়ে লজ্জার আর কী হতে পারে। রীনা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ঠিক করে ফেলল পদ্মহারটা সে অবশ্যই বিক্রি করবে। সেই টাকায় এক সেট পোশাক সে হাসানকে বানিয়ে দেবে। এটা হবে হাসানকে দেয়া তার উপহার। বাংলাদেশের দশটা ভালো ছেলের তালিকা তৈরি হলে হাসানের নাম সেখানে অবশ্যই থাকবে। এমন একটি ছেলেকে সামান্য উপহার দিতে না পারাটা খুব কষ্টের।

রীনা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বারটা একুশ বাজে। বাচ্চা দুটি এখনো ফিরছে না। কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয় নি তো। এত দেরি তো হবার কথা না। রীনার বুক ধড়ফড় করছে। কাল রাতে সে বাজে একটা স্বপ্নও দেখেছে—ঘরের ভেতর একটা হাতি ঘুরছে—শুঁড় দিয়ে আলনা থেকে টেনে কাপড়জামা নামাচ্ছে। স্বপ্নে হাতি দেখা খুব খারাপ। হাতির পিঠ কবরের মতো বলে হাতি দেখলে অতি প্রিয় কারো মৃত্যু হয়। রীনার হাতপা কাঁপছে। বারান্দার রেলিঙে একটা কাক

বসে আছে। কী বিশ্রী ভঙ্গিতেই না সে তাকাচ্ছে! রীনা জানে এইসব কিছুই না কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যাবে বাবা রিকশা করে ওদের নিয়ে আসছেন। সেই কিছুক্ষণটাই অনন্তকালের মতো দীর্ঘ মনে হবে। কোনো রকম দুশ্চিন্তা ছাড়া মনের আনন্দে মানুষের বাঁচাটা কি এতই কঠিন?

বারান্দা থেকে সামনের রাস্তার অনেকটা দেখা যায়। কমলার মার এর মধ্যে চলে আসার কথা। দু হালি ডিম আর পাঁচ টাকার পান কিনতে এত সময় লাগবে কেন? আবার কি কুকুর কামড়েছে? চিঠির ব্যাগ হাতে পোস্টম্যান আসছে। রীনার বুক ধক করে উঠল। যদিও ধক করে ওঠার কারণ নেই। পোস্টম্যান নিশ্চয়ই তাদের বাসার দিকে আসছে না। আর আসলেই বা কী?

রীনা অস্বস্তি নিয়ে পোস্টম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে। না সে তাদের বাড়িতে আসছে না। ওই তো রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। রীনা প্রায় এক মাস আগে রেজিস্ট্রি করা একটা চিঠি পেয়েছে। পত্র প্রেরকের কোনো নাম নেই। আধপৃষ্ঠার একটা চিঠিতে লেখা—

"ম্যাডাম,

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি আপনার স্বামীর অফিসে চাকরি করি। একটি বিশেষ কারণে আপনাকে এই পত্র লিখছি। আমাদের অফিসে লাবণী নামে একজন অল্পবয়স্কা টাইপিস্ট আছেন। আপনার স্বামী তারেক সাহেবের সঙ্গে তার গভীর প্রণয়। তাদের শারীরিক সম্পর্ক আছে ইহা নিশ্চিত। আমি ভেতরের খবর জানি। আপনি ঘর সামলান। বিলম্বে পস্তাবেন।

ইতি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী জনৈক অচেনা বন্ধু।"

এই চিঠির কথা রীনা কাউকে বলে নি। উড়ো চিঠিকে কখনো গুরুত্ব দিতে নেই। রীনার হিতাকাঙ্ক্ষী অচেনা বন্ধু তাকে নামহীন চিঠি পাঠাবে না। সবচে বড় কথা তারেককে সে চেনে। অতি সরল ধরনের একজন মানুষ। একজন সরল মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতিও সরল হয়।

চিঠি পাবার পর রীনা একবার ভাত খেতে খেতে তারেককে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা তোমাদের অফিসে লাবণী নামের কোনো মেয়ে আছে?

তারেক বিস্মিত হল না, চমকাল না। রীনার দিকে তাকালও না—ভাত মাখতে মাখতে বলল—আছে। টাইপিস্ট। আমাদের দুজন মহিলা আছেন। ক্যাশ সেকশনে নতুন একটা মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে। নাম সুস্মিতা।

'মেয়েদের সঙ্গে তোমাদের কথা হয় না?'

'হ্যাঁ হয়। হবে না কেন? সুস্মিতা মেয়েটা পাগলা ধরনের—সারাক্ষণ কথা বলে।'

'লাবণী কম কথা বলে?'

'ওর কথা বলার সুযোগ কোথায়! বড় সাহেবের চিঠি টাইপ করতে করতে হালুয়া টাইট।'

'লাবণীদের গ্রামের বাড়ি কোথায়?'

'জানি না তো কোথায়? আচ্ছা জিজ্ঞেস করে দেখব।'

'থাক তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না।'

'লাবণী দেখতে কেমন?'

'দেখতে ভালো। গোল মুখ। সুস্মিতা দেখতে ভালো না। মিকি মাউসের মতো দুটা বড় বড় দাঁত।'

কথা এই পর্যন্তই। তারেক না হয়ে অন্য যে কেউ হলে জিজ্ঞেস করত—লাবণীর কথা জানতে চাচ্ছ কেন?

তারেক এই প্রশ্ন করবে না। একজন সরল মানুষ পৃথিবীর সমস্ত প্রশ্নই সরলভাবে গ্রহণ করে।

রীনার মনে কোনো শঙ্কা নেই তারপরেও চিঠিটা কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে। হাসানকে দেখালে কেমন হয়? না, তা সম্ভব না। হাসান তাকে নিয়েই হাসাহাসি করবে। অলীক এক

গল্পের পেছনে সময় নষ্ট করার বা দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। দুশ্চিন্তার অনেক ব্যাপার আমাদের চারপাশেই আছে।

বাচ্চাদের আসতে দেখা যাচ্ছে। রীনা দেখল টগর ঘুমোচ্ছে। রীনার শ্বশুর ছেলেকে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে আছেন। তবে জড়িয়ে ধরে রাখতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। ছেলেটার পা অনেকখানি বের হয়ে আছে। যে কোনো সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারত। একটা ট্রাক কিংবা মাইক্রোবাস এসে ঘষা দিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস হয় নি। কমলার মাকেও আসতে দেখা গেল। ঘুমন্ত টগরকে রীনার শ্বশুর কমলার মার কোলে দেবার চেষ্টা করছেন। কমলার মা অতি সেয়ানা—সে ভুলেও নেবে না। বেচারা বুড়ো মানুষকেই নাতি কোলে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে হবে।

রীনার শাশুড়ি আছেন কল্যাণপুরে তাঁর মেয়ের বাসায়। স্বামীর সঙ্গে রাগ করে চলে গেছেন। রাগ ভাঙিয়ে তাঁকেও কল্যাণপুর থেকে আনতে হবে। রীনার শ্বশুর রাগ ভাঙানোর প্রচুর চেষ্টা করছেন—প্রতিদিন একবার করে কল্যাণপুরে যাচ্ছেন। লাভ কিছু হচ্ছে না—রোজ রিকশা ভাড়া দিতে হচ্ছে। টগরের বাবা ফিরলে তাকে দিয়ে মাকে আনিয়ে নিতে হবে। ছেলে গেলে মা সুড়সুড় করে চলে আসবেন। এ রকম ছেলেভক্ত মা খুব কম আছে।

টগরের ঘুম ভেঙেছে। দাদার কোল থেকে নেমে সে এখন ছুটতে ছুটতে আসছে। মাথাটা সামনের দিকে বাঁকা করা। এটা তাঁর মহিষ মহিষ খেলা। মহিষের মতো শিং দিয়ে সে মাকে গুঁতো দেবে। মহিষের বয়স পাঁচ বছর হলে কী হবে গায়ে জোর আছে। রীনা হাসিমুখে মহিষের ধাক্কা সামলানোর জন্যে রেলিং ধরে দাঁড়াল। তাঁর এত ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে আলাদীনের চেরাগ ছাড়াও বেঁচে থাকাটা এমন অসহনীয় নয়।

বাড়িওয়ালাদের কাজের মেয়েটি আসছে। মেয়েটার নাম হালিমা। খুব ভালো নাম। নরম স্বভাব। হাসিখুশি। এ রকম একটা কাজের মেয়ে থাকলে খুব ভালো হত। রীনা হালিমাকে বলে দিয়েছে দেশে গেলে সে যেন তার মতো একটা মেয়ে নিয়ে আসে।

রীনা বলল, কী খবর হালিমা।

হালিমা হাসিমুখে বলল, আফনের টেলিফোন আইছে গো আফা। জরুরি ফোন।

বাড়িওয়ালার বাসার টেলিফোন নাম্বারে ভাড়াটেদের ফোন এলে তাদের ডাকা হয় না। কোনো দুঃসংবাদের ফোন কি এসেছে? মৃত্যু সংবাদ? রীনার বুক আবারো ধক করে উঠল। আজকের দিনটা তার জন্যে খারাপভাবে শুরু হয়েছে। বারবার শুধু মৃত্যু সংবাদের কথা মনে আসছে। মানুষের মনে যা আসে তাই শেষ পর্যন্ত হয়। রীনার মুখ শুকিয়ে গেল।

'হ্যালো।'

'কে ভাবী? আমি রকিব।'

'ও আচ্ছা।'

'ভাইজান কি অফিস থেকে ফিরেছেন?'

'না। কেন বল তো।'

'আমি একটা সিরিয়াস বিপদে পড়েছি ভাবী।'

'কী বিপদ?'

'সেটা তোমাকে বলতে পারব না। তবে ভালো বিপদ। ভাবী আমি আসলে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।'

'কেন?'

'আছে ব্যাপার আছে। স্টুডেন্ট পলিটিক্সের অনেক ঝামেলা আছে। তুমি বুঝবে না। ভাবী আমার কিছু টাকা লাগবে।'

'কত টাকা?'

'পাঁচ হাজার টাকা।'

'এত টাকা আমি পাব কোথায়?'

'যে ভাবে হোক যোগাড় কর ভাবী।'

'রকিব শোন—তুমি খুবই অসম্ভব কথা বলছ। সংসারের অবস্থা তো তুমি জান।'

'আমি সবই জানি। কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। ভাবী শোন, আমি সন্ধ্যাবেলা একটা লোক পাঠাব, তার হাতে টাকাটা দিয়ে দিও।'

'রকিব কাউকে পাঠিও না। তুমি নিজে আস—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা কর।'

রকিব টেলিফোন রেখে দিল। রীনা বোকার মতো খানিকক্ষণ হ্যালো হ্যালো করল।

পাঁচ হাজার টাকা সে কিছুতেই যোগাড় করতে পারবে না। হাসানের কাছ থেকে নিয়ে হাজার দুয়েক টাকা সে দিতে পারবে—এর বেশি না। এতে কি রকিবের বিপদ কাটবে? বিপদটা কী তাও সে স্পষ্ট করে নি। এমন কী বিপদ যে বাসায় এসেও টাকা নেয়া যাবে না!

বাড়িওয়ালার স্ত্রী জাহেদা বললেন, মা বোস শরবত খেয়ে যাও।

রীনা বলল, জ্বি না চাচি—টগর-পলাশ এরা মাত্র স্কুল থেকে এসেছে। এদের গোসল করাব-খাওয়াব।

'শরবত খেতে কয় মিনিট লাগে? তিন মিনিট। গরমে তেঁতুলের শরবত খেয়ে দেখ—শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বোস খাটের উপর বোস।'

রীনা খাটে বসল। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বসল। জাহেদা গল্প করতে ভালবাসেন। তার হাতে ধরা খেলে সহজে মুক্তি পাওয়া মুশকিল। তার সব গল্পই ভাড়াটেদের কর্মকাণ্ডের উপর। ভদ্রমহিলা কখনো কোনো ভাড়াটের ঘরে যান না। কিন্তু তাদের সব খবর জানেন।

'কেমন আছ মা তুমি?'

'জ্বি ভালো।'

'তোমার দেওর যে হাসান সে চাকরি বাকরি কিছু পায় নি?'

'তেমন কিছু পায় নি, তবে বেকার না। হিশামুদ্দিন গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে কাজ করছে।'

'কী কাজ?'

হিশামুদ্দিন সাহেবের পারসোনাল কিছু কাজ করে দিচ্ছে। পরে ওই ফার্মেই চাকরি দেবে।'

'ওর বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছ। ভাবলে বলবে—আমার হাতে ভালো মেয়ে আছে। খরচপাতি করে বিয়ে দেবে। দানসামগ্রী ছাড়া ক্যাশ টাকাও দেবে।'

'জ্বি আচ্ছা বলব।'

'ভাগ্য ফেরাবার জন্যে হলেও পুরুষমানুষের বিয়ে দিতে হয়। কথায় আছে না স্ত্রীভাগ্যে ধন।'

'জ্বি।'

'শরবতটা কেমন লাগল মা?'

'খুব ভালো লেগেছে চাচি। এখন উঠি?'

দুটা মিনিট বোস মা। একটা ঘটনা বলি। এ রকম ঘটনা যে ঘটতে পারে বাপের জন্মে শুনি নাই। আমাদের চারতলায় ভাড়া থাকে যে ইয়াছিন সাহেব উনাকে চেন?'

'জ্বি না।'

'ওই যে রোগা—চিমসা মুখ। মাথায় টাক—এজি অফিসে কাজ করে তার ঘটনা।'

'চাচি আরেকদিন এসে শুনব?'

'এসেছ যখন শুনে যাও। ইয়াছিন সাহেবের ফ্যামিলি গিয়েছে দেশে। ভদ্রলোক ছুটি পায় নাই যেতে পারে নাই। একদিন দেখি কী একটা মেয়ে নিয়ে ঘরে যাচ্ছে। সুন্দর মতো চেহারা। সতের-আঠার বছর বয়স। আমার হল সন্দেহ—ব্যাপারটা কী? এই সময় তো তার অফিসে থাকার কথা। মেয়ে নিয়ে ঘরে কেন? বিষয় জানার জন্যে আমি নিজেই গেলাম।'

'কী জানলেন?'

'সে বিরাট ইতিহাস। ইয়াছিন সাহেব কেঁদে আমার পায়ে পড়ে গেল...'

'চাচি আরেক দিন এসে পুরো গল্প শুনব। মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং।'

রীনা উঠে দাঁড়াল। হাসান চলে যাবার আগেই তাকে ধরতে হবে। রকিবের জন্যে হাসানের টাকা রেখে দিতে হবে। ইয়াসিন সাহেব যা ইচ্ছা করুক। তার সংসার ঠিক থাকলেই হল।

৫

আশরাফুজ্জামান সাহেব দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে গেলেন। পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াকিটকি হাতে অল্প বয়েসী এক পুলিশ অফিসার। হাসি হাসি মুখ। যেন ঈদের দাওয়াত খেতে এসেছে। পুলিশের মুখের হাসিতে আশরাফুজ্জামান সাহেব বিভ্রান্ত হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কাকে চাই?

'আপনি কি রকিবউদ্দিনের বাবা?'

'জ্বি।'

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালো আছি।'

'একটু কথা ছিল আপনার সঙ্গে।'

'বলুন।'

'বাইরে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না। ঘরে গিয়ে বসি।'

আশরাফুজ্জামান দ্রুত চিন্তা করলেন। ঘরের ভেতর পুলিশ ঢোকানো ঠিক হবে না। একবার পথ চিনে ফেললে এরা বারবার আসবে। লোকজন নানান সন্দেহ করবে। আশরাফুজ্জামান সাহেব বললেন—আমি তো এখন বেরোচ্ছি। আমার একজন আত্মীয় অসুস্থ। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে।

'উনি কোথায় আছেন?'

'হলিফ্যামিলি হাসপাতালে। আমার ভাই হয়। চাচাতো ভাই।'

'আমি কি পরে আসব?'

'কখন বাসায় থাকি ঠিক নাই তো। রোগীর অবস্থা ভালো না। সারাদিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে। বুকে কনজেশান হয়েছে। ক্রিটিক্যাল অবস্থা।'

'তাহলে বরং একটা কাজ করুন—রোগী দেখে আপনি থানায় চলে আসুন। রমনা থানা। আমার নাম বললেই হবে। আমার নাম আব্দুল খালেক সাবইন্সপেক্টর।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনার ছেলের ব্যাপারে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করব। চিন্তিত হবার মতো কিছু না।'

'আমি চিন্তিত না।'

'তাহলে স্যার যাই? স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব পুলিশ অফিসারের সঙ্গেই বের হয়ে এলেন। মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট কিনলেন। সিগারেট তাঁর জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হলেও তিনি সমানে খেয়ে যাচ্ছেন। সিগারেট খাবার জন্যেই তাকে দীর্ঘ সময় বাসার বাইরে থাকতে হয়। সিগারেট হাতে তিনি ইস্কান্দরের চায়ের দোকানে ঢুকলেন। তাঁর ডায়াবেটিস আছে। চিনি দিয়ে চা খাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইস্কান্দরের চায়ের দোকানে তিনি এই নিষিদ্ধ কর্মটিও করেন। দু চামচের জায়গায় তিন চামচ চিনি দিয়ে চা খান।

ইস্কান্দর বলল, চাচামিয়া কেমুন আছেন?

তিনি হাসিমুখে বললেন, ভালো আছি। দেখি চা দাও। দই আছে?

'আছে।'

'মিষ্টি না টক?'

'মিষ্টি।'

'দাও একটু দই খাই। এক কাজ কর দইয়ের সঙ্গে একটা কালোজাম দাও।'

তিনি খুব আরাম করে দই–কালোজাম খেলেন। চা সিগারেট খেলেন। পুলিশের দুশ্চিন্তা তার মাথা থেকে চলে গেল। তাঁর এখন শেষ সময়। শেষ সময়ে দুশ্চিন্তা করে লাভ কী। তিনি কোনো অন্যায় করেন নি। পুলিশ তাকে নিয়ে জেলে ঢোকাতে পারবে না। যে কটা দিন আছেন—সুখে শান্তিতে পার করে দিতে পারলেই হল।

রকিব কী ঝামেলা পাকিয়েছে কে জানে? ঝামেলা যদি পাকিয়েই থাকে তার ভাইরা বুঝবে। তিনি কে? তিনি কেউ না।

আশরাফুজ্জামান সাহেব আরেক কাপ চা দিতে বললেন। প্রথম চা–টা সিগারেট ছাড়া খেয়েছেন। দ্বিতীয় কাপ সিগারেট দিয়ে খাওয়া। ইস্কান্দরের হোটেলে দুপুরে তেহারি রান্না হয়। আজ তেহারি খেতে ইচ্ছা করছে। গরম হাঁড়ি নামলেই খেয়ে ফেলতে হবে। দেরি করলে নিচে তেল জমে যায়। তেল খাওয়াটা ঠিক না।

'ইস্কান্দর।'

'জ্বি।'

'আজ তোমার এখানে তেহারি খাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মুখের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। ভালোমন্দ খেতে ইচ্ছা করে। তোমার তেহারিটা ভালো হয়। বাবুর্চি ভালো। নাম কী বাবুর্চির?'

ইস্কান্দর জবাব দিল না। সে জেনে গেছে বুড়োদের সব কথার জবাব দিতে হয় না। একটা পর্যায়ে কথা বলা বন্ধ করে দিতে হয়।

'ইস্কান্দর।'

'জ্বি।'

'দেশে রাজনীতির হালচাল কী?'

'জানি না।'

'মিলিটারি ছাড়া আমাদের গতি নাই ইস্কান্দর। লেফট রাইট না করালে দেশটার কিছু হবে না। দেখি তোমার পিচ্চিটারে ডাক তো—একটা খবরের কাগজ আনব।'

বাসায় খবরের কাগজ আছে। তারপরেও আলাদা করে কাগজ পড়ার অন্য রকম মজা। বাসার কাগজ পড়ায় সেই মজা নেই। আশরাফুজ্জামান সাহেব মাঝে মাঝে নিজের টাকায় কাগজ কেনেন। পড়া হয়ে গেলে সেই কাগজ যত্ন করে জমা করে রাখেন। অনেকগুলো কাগজ জমেছে। বিক্রি করে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। খবরের কাগজ কত দরে বিক্রি হয় কে জানে।

'ইস্কান্দর।'

'জ্বি।'

'পুরোনো খবরের কাগজের দর কত জান? কী দরে বিক্রি হয়?'

'জানি না।'

'দেখি আরেক কাপ চা দিতে বল। দুধ বেশি করে দিবে।'

খবরের কাগজ শেষ করতে তাঁর এক ঘণ্টার মতো লাগল। টাকা পুরোপুরি উসুল করলেন। কোনো কিছুই বাদ দিলেন না। এরশাদ সাহেবের একটা কবিতা ছাপা হয়েছে। নদী–পাখি–আকাশ বিষয়ক। সেই কবিতা তিনি পড়ে ফেললেন। নদী–পাখি এবং আকাশ নামক বস্তুগুলোর প্রতি তাঁর মমতা দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন কি না বোঝা গেল না।

আশরাফুজ্জামান সাহেব পত্রিকা ভাঁজ করে বগলে নিয়ে নিলেন। তেহারি রান্না হতে এখনো দেরি আছে। আজ ছুটির দিন বাসায় লোকজন নেই। বউমা তার ভাইয়ের বাসায়। খালি বাসায় চুপচাপ বসে থাকার অর্থ হয় না। বড় মেয়ের বাসা থেকে কি একবার ঘুরে আসবেন? তাঁর স্ত্রী বর্তমানে বড় মেয়ের বাসায় আছেন। স্ত্রীর সঙ্গেও দেখা হল। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়াটা অবশ্য তত জরুরি না। বড় মেয়ের কাছে গেলে একটা লাভ অবশ্য হয়। বড় মেয়ে মাঝেমধ্যেই তাকে কিছু টাকা-পয়সা দেয়। বেশি না, সামান্যই। কখনো এক শ টাকার দুটা নোট। কখনো পঞ্চাশ টাকার তিনটা নোট। তার স্বামী যখন আশপাশে থাকে না তখন চট করে নোট কটা পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে—বাবা রেখে দিন।

'চাচা স্লামালিকুম।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চমকে তাকালেন। লম্বা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। মুখভর্তি হাসি। এমন আনন্দিত মুখের কোনো ছেলেকে তিনি ইদানীংকালে দেখেছেন বলে মনে পড়ে না।

'চাচা আমাকে চিনতে পারেন নি, তাই না?'

'না চিনতে পারি নি।'

'আমি লিটন।'

'ও আচ্ছা লিটন। ভালো খুব ভালো।'

'আমি হাসানের বন্ধু। স্কুলে পড়েছি ওর সঙ্গে।'

'ভালো ভালো। খুব ভালো।'

'হাসানের খোঁজে বাসায় গিয়েছিলাম—দেখি বাসায় কেউ নেই।'

'হাসান কোথায় গেছে জানি না। বউমা গেছে তার ভাইয়ের বাসায়।'

'হঠাৎ করে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে চাচা। আজ সন্ধ্যাবেলায় বিয়ে। অনুষ্ঠান টনুষ্ঠান কিছু না—কাজি ডেকে বিয়ে। হাসানকে খবরটা দিতে এসেছিলাম।'

'আমি বলে দেব।'

'চাচা আমার নাম মনে থাকবে তো? লিটন। লিটন বললেই হবে।'

'আমি বলব।'

আশরাফুজ্জামান হাঁটছেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে লিটনও হাঁটছে। ভালো যন্ত্রণা হল দেখি।

'আমি পরশুদিন সকালে মালয়েশিয়া চলে যাচ্ছি। আদম বেপারিকে ধরে ব্যবস্থা হয়েছে। দেশে কিছু হচ্ছিল না। খুব কষ্টে ছিলাম চাচা—এখন মনে হয় আল্লা মুখ তুলে চেয়েছেন।'

'ভালো খুব ভালো।'

'হাসান আমার কাছে দুই হাজার টাকাও পায়। এক হাজার টাকা নিয়ে এসেছি। আপনার কাছে দিয়ে যাই।'

'আচ্ছা দাও।'

'ইচ্ছা ছিল সবার সব ঋণ শোধ করে যাব। সম্ভব হয় নাই। এখন বিদেশ থেকে পাঠাব।'

'ভালো খুব ভালো। ঋণ রাখতে নেই।'

'মালয়েশিয়ায় গুছিয়ে বসে ইনশাল্লাহ হাসানকেও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।'

আশরাফুজ্জামান লিটনের টাকাটা রাখলেন। তাঁর হেঁটে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল—এখন রিকশা নিয়ে ফেললেন। পকেটে টাকা আছে রিকশায় ঘোরাফেরা করা যায়।

'চাচা।'

'বল বাবা।'

'কাল সকালে চলে যাচ্ছি তো—তাই তাড়াহুড়া কর বিয়ে। আগেভাগে কাউকে কিছু বলতে পারি নি। হাসানকে আপনি অবশ্যই পাঠিয়ে দেবেন।'

'অবশ্যই পাঠাব।'

'আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন চাচা।'

'অবশ্যই দোয়া করব।'

লিটন পা ছুঁয়ে সালাম করল। আশরাফুজ্জামান সাহেব চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বিড়বিড় করলেন।

রিকশা চলছে। তিনি হুড ধরে আনন্দিত ভঙ্গিতে বসে আছেন। লিটনের টাকাটা পেয়ে ভালো লাগছে। হাত একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল। কিছু টাকা চলে এল। টাকার কথা, লিটনের বিয়ের কথা হাসানকে বলার তিনি কোনো কারণ দেখছেন না। তিনি বুড়ো মানুষ এইসব কথা ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।

রিকশাওয়ালা বললেন, কই যাইবেন চাচামিয়া?

'চল রমনা থানায় চল।'

রমনা থানার ঝামেলাটা চুকিয়ে আসা ভালো। তিনি রিকশার হুড ফেলে দিলেন। গায়ে রোদ লাগুক। রোদে ভাইটামিন সি না ডি কী যেন আছে। বৃদ্ধ বয়সে শরীরে সব রকম ভাইটামিন দরকার—এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এইচ, আই, জে,.....। রমনা থানার যার সঙ্গে কথা বলবেন তার নাম হচ্ছে—আব্দুল খালেক। হাসানের বন্ধুর নাম লিটন। বয়স হলেও স্মৃতিশক্তি এখনো ভালো আছে। মাথায় রোদ লাগছে। তিনি রিকশার হুড তুললেন না। বগলে রাখা খবরের কাগজটা মাথার উপর ধরলেন। আব্দুল খালেকের সঙ্গে কথা বলে বড় মেয়ের বাসায় যাবেন। আজ দিনটা শুভ, বড় মেয়েও হয়তো নতুন পাঁচ শ টাকার একটা নোট পকেটে ঢুকিয়ে দেবে। যখন টাকা আসতে থাকে তখন আসতেই থাকে। এটা হল টাকার ধর্ম।

আব্দুল খালেক হাসিমুখে বললেন, ও আপনি এসেছেন? আপনার রোগী কেমন?

আশরাফুজ্জামান চিন্তিতমুখে বললেন, ভালো না। মনে হয় সময় হয়ে গেছে।

'বয়স কত?'

'বয়স অল্প—৪৫/৪৬ হবে।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি না বাসায় গিয়ে ভাত খাব। আমার নিজের শরীরও ভালো না। আপনি কী জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলেন জিজ্ঞেস করুন।'

'আপনার ছোট ছেলের নাম রকিব?'

'জ্বি?'

'ও কী করে না করে তা কি আপনি জানেন?'

'পড়াশোনা করে—ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে।'

'পড়াশোনা ছাড়া আর কী করে জানেন?'

'জ্বি না।'

'আপনার সঙ্গে যোগাযোগ কেমন?'

'যোগাযোগ নেই। ছেলেমেয়ে কারো সঙ্গেই আমার যোগাযোগ নেই। বাপ বুড়ো হলে যা হয়।'

'সিগারেট খাবেন?'

'দেন একটা খাই।'

আব্দুল খালেক সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। তারপর নিজের চেয়ার আরো কাছে টেনে এনে গলা নিচু করে বললেন—

'আপনার এই ছেলে ভালো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। চকবাজারের একজন রাবারের ব্যবসায়ীকে সে এবং তার কয়েক বন্ধু মিলে ধরে নিয়ে গেছে। তিন লাখ টাকা দিলে ছেড়ে দেবে। এই হল ঘটনা।

তারা ওই ভদ্রলোককে প্রথম একদিন রেখেছে শহীদুল্লাহ হলে—এখন অন্য কোথায় যেন ট্রান্সফার করেছে। আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশরাফুজ্জামান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। কিছু বললেন না। তিনি খুব যে বিস্মিত হয়েছেন তাঁকে দেখে তাও মনে হল না।

'ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে তারা যদি মেরে টেরে ফেলে তাহলে অবস্থা খারাপ হবে। এই কথাটা আপনার ছেলেকে জানানো দরকার। যদি সে বাসায় আসে, বাসার কারো সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাকে ব্যাপারটা বলবেন।'

'জ্বি বলব।'

'আমার যা বলার বলেছি—এখন আপনি চলে যেতে পারেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনাকে থানায় এনে কষ্ট দিয়েছি কিছু মনে করবেন না।'

'জ্বি না।'

'সময় খারাপ—অপরাধ করে ছেলেমেয়ে আমরা বাবা-মাকে জেরা করি। আমাদেরও খারাপ লাগে।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মনটা খারাপ হয়েছে। তবে এই মন খারাপ ভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই বয়সে ছেলেপুলেদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন। অল্প যে কদিন আছেন নিশ্চিন্ত মনে থাকতে চান। তিনি রাস্তায় নেমে রিকশা নিলেন। বড় মেয়ের বাসায় যাবেন। আজ দুপুরে তেহারি মনে হয় খাওয়া হবে না। বড় মেয়ের বাসায় গেলে না খেয়ে আসা যায় না। খেয়ে আসতে হয়। ইদানীং ঘরের খাওয়া তার মুখে রুচে না—তবু ভাব করতে হয় যেন অমৃত খাচ্ছেন।

তিনি বাসায় ফিরলেন রাত আটটায়। ঘরে ঢুকে একটা মজার দৃশ্য দেখলেন—তার ছোট ছেলে রকিব এসেছে। সে ঘোড়া সেজেছে। রকেট এবং বুলেট দুজন তার পিঠে চেপে আছে। তারা হাঁট হাঁট করছে এবং ঘোড়া লাফিয়ে লাফিয়ে বারান্দার এক মাথা থেকে আরেক মাথায় যাচ্ছে—মাঝে মাঝে চিঁহি করে বিকট চিৎকার দিচ্ছে।

বাবাকে দেখে রকিব হাসিমুখে বলল, বাবা কেমন আছ?

'ভালো। তুই কখন এসেছিস?'

'এই তো কিছুক্ষণ আগে।'

রকেট আনন্দিত গলায় বলল, দাদুভাই ছোট চাচা আজ আমাদের সবাইকে চাইনিজ খাওয়াবে। তাড়াতাড়ি কাপড় পর।

আশরাফুজ্জামান বললেন, সত্যি নাকি রে?

রকিব বলল, হ্যাঁ সত্যি। তোমার জন্যেই দেরি করছি। কাপড় পরে নাও।

'চাইনিজ খাওয়াবি টাকা পেলি কোথায়?'

'খেলাধুলার জন্যে একটা স্কলারশিপ পেয়েছি।'

'ভালো খুব ভালো।'

আশরাফুজ্জামান খুশি মনে কাপড় বদলাতে গেলেন। অনেকদিন চাইনিজ খাওয়া হয় না। থাই স্যুপ তাঁর খুব পছন্দের জিনিস। বৃদ্ধ বয়সে স্যুপ জাতীয় খাবারই ভালো। সহজপাচ্য, খেতেও সুস্বাদু।

সবাই চাইনিজ খেতে গেল। শুধু যে এ বাড়ির সবাই তাই না রকিব তার বড় বোনকেও বলে এসেছিল। সেও চলে এল। হাসানের মা রাগ করে এতদিন মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। তিনিও এলেন। শুধু হাসান গেল না। তার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে মাথা ঘোরাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে থাকলে মাথা ঘোরায় না। চোখ মেললেই মাথা ঘোরে। একজন ডাক্তার মনে হয় দেখানো দরকার।

বাসা খালি হয়ে যাবার পর হাসানের মন কেমন করতে লাগল। বেশি রকম একলা লাগছে। সবার সঙ্গে গেলেই হত। কিছু না খেয়ে বসে থাকলেও হত। বাসার সবার একসঙ্গে হওয়া একটা বড় ঘটনা। অনেকদিন পর এই ঘটনা ঘটছে শুধু সে বাদ পড়ল।

হাসান বিছানা থেকে নামল। একা একা শুয়ে থাকতে অসহ্য লাগছে। রেস্টুরেন্টের ঠিকানা জানা থাকলে সেখানে চলে যেত। ঠিকানা জানা নেই। হাসান রওনা হল তিতলীদের বাসার দিকে। অসুস্থ অবস্থাতেই প্রিয়জনদের বেশি দেখতে ইচ্ছে করে। তিতলীকে কেন জানি খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। হাসান তিতলীদের বাড়ির গেট পর্যন্ত গেল। গেটের ভেতর ঢুকল না। এত ঘন ঘন ওই বাড়িতে যাওয়া ঠিক না। তিতলীর বাবা নিশ্চয়ই রাগ করবেন। সেই রাগ তিনি হাসানের উপর দেখাবেন না, দেখাবেন তিতলীর উপর। তার কারণে তিতলী বকা খাবে এটা ঠিক না।

ফেরার পথে হাসান ঠিক করে ফেলল পরের বার যখন হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে তখন সে অবশ্যই একটা চাকরির কথা তাঁকে বলবে। তাকে বলতেই হবে। এইভাবে আর থাকা যায় না।

একটা মোটামুটি ভদ্র চাকরি হলে সে তিতলীর মাকে বলতে পারে—খালা আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

না, তার পক্ষে এটা সরাসরি বলা অসম্ভব। সে ভাবীকে দিয়ে বলাবে। হিশামুদ্দিন সাহেব যেদিন তাকে চাকরি দেবেন সেদিনই সে ভাবীকে পাঠাবে। অবশ্যই, অবশ্যই অবশ্যই।

'হাসান কেমন আছ?'

'জ্বি স্যার ভালো।'

'চোখ লাল কেন?'

হাসান জবাব দিতে পারল না। তার যে চোখ লাল এই ব্যাপারটা সে জানে না। ঘর থেকে বেরোবার সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়েছে। তখন চোখের দিকে তাকায় নি। আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে দেখার অভ্যাস তার নেই।

হিশামুদ্দিন সাহেব বললেন, রাতে ঘুম হয় নি?

'জ্বি স্যার হয়েছে।'

'তোমার কি অনিদ্রা রোগ আছে?'

'জ্বি না।'

'তুমি তাহলে মানুষ হিসেবে খুব আধুনিক নও। অনিদ্রা হচ্ছে আধুনিক মানুষের রোগ।'

হাসান চুপ করে রইল। হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে সমান তালে গল্প করার মতো অবস্থা তার না। হিশামুদ্দিন সাহেব প্রশ্ন করলে সে জবাব দেবে। যতদূর সম্ভব কম কথায় জবাব দেবে। তবে আজ সে তার চাকরির কথাটা বলবে। যে ভাবেই হোক বলবে।

'বিয়ে কর নি তো?'

'জ্বি না।'

'বিয়ের কথা ভাবছ না?'

হাসান জবাব দিল না। একবার ভাবল এখনই সময়। এখনি বলা দরকার, স্যার চাকরি বাকরি নেই, বিয়ে করলে স্ত্রীকে খাওয়াব কী? এই কথায় দ্রবীভূত হয়ে হিশামুদ্দিন সাহেব তাঁর বিশাল কোম্পানিতে কোনো একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তবে বাস্তব আশার পথ ধরে চলে না—বাস্তব চলে নিরাশার এবড়োখেবড়ো পথে। তাঁর কথায় হিশামুদ্দিন সাহেব দ্রবীভূত হবেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এ জাতীয় মানুষকে অন্যরা দ্রবীভূত করতে পারে না। তবে চাকরির কথাটা আজ বলতেই হবে। এখন না হলেও কিছুক্ষণ পরে বলবে।

'হাসান।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমার কি পছন্দের কেউ আছে যাকে বিয়ে করতে চাও।'

হাসান লজ্জিত গলায় বলল, আছে স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তার নাম কী?'

'তিতলী।'

হাসান খুবই অবাক হচ্ছে। হিশামুদ্দিন সাহেব এ জাতীয় হালকা প্রশ্ন কেন করছেন সে বুঝতে পারছে না। তার পছন্দের কেউ আছে কি না তা দিয়ে হিশামুদ্দিন সাহেবের কিছু যায় আসে না।

'তিতলী নামের অর্থ কী?'

'প্রজাপতি।'

'প্রজাপতি তো সুন্দর নাম।'

হিশামুদ্দিন সাহেব দেয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে বললেন—এস শুরু করি। হাসান অপেক্ষা করছে হিশামুদ্দিন সাহেব কিছুই বলছেন না। মানুষটা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ভাবভঙ্গি ঘুমিয়ে পড়ার মতোই। এস শুরু করি বলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে না। হিশামুদ্দিন সাহেবের মতো মানুষ তো বটেই। হাসান বুঝতে পারছে না খুক্ খুক্ করে কেশে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কি না। সেটা ঠিক হবে না। অনেক উপরের লেভেলের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কাশি কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। হাত উঠানো যায়। হাত উঠালে লাভ হবে না, হিশামুদ্দিন সাহেব চোখ বন্ধ করে আছেন—কিছু দেখবেন না।

'হাসান।'

'জ্বি স্যার।'

'কী বলব গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। তুমি যদি জীবনের গল্প শুরু কর তখন দেখবে গোছানো খুব কঠিন। সিস্টেমেটিকালি সব মনেও আসে না। তুচ্ছ ঘটনা আগে মনে পড়ে। অনেক বড় বড় ঘটনা মনেই পড়ে না। ধারাবাহিকতা থাকে না। ধারাবাহিকভাবে মানুষ তার সমস্ত ঘটনা পানিতে ডুবে মরার সময় দেখতে পায় বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। তাও ঠিক না। আমি পানিতে ডুবে মরতে বসেছিলাম আমি কিছুই দেখি নি। চোখের সামনে শুধু হলুদ আর লাল আলো দেখেছি। তুমি কি কখনো পানিতে ডুবেছ?'

'জ্বি না স্যার?'

'সাঁতার জান?'

'জ্বি না।'

'আমার পানিতে ডোবার ঘটনাটা বলব, না বাবার জেল থেকে ফিরে আসার গল্পটা আগে বলব বুঝতে পারছি না।'

'আপনার বাবার ফিরে আসার গল্পটা বলুন।'

'বাবার নাম কি তোমাকে বলেছি?'

'জ্বি না।'

'উনার নাম আজহারউদ্দিন খাঁ। আমরা খাঁ বংশ। খুবই উচ্চ বংশ। যাই হোক আমাদের উচ্চ বংশীয় বাবা দু মাসের জেল খেটে হাসিমুখে একদিন বাসায় ফিরলেন। তাঁর হাতে চারটা কদবেল। জেলখানা গাছের কদবেল। জেলার সাহেবকে বলেটলে কীভাবে জানি নিয়ে এসেছেন। মানুষকে মুগ্ধ এবং খুশি করার আর্ট বাবা খুব ভালো জানতেন। যে কোনো মানুষের সঙ্গে বাবা যদি কিছুক্ষণ কথা বলেন তার ধারণা হবে বাবা অসাধারণ একজন মানুষ। বাবা বাসায় ফিরলেন নিজের হাতে কদবেলের ভর্তা বানালেন। কদবেলের ভর্তা কখনো খেয়েছ হাসান?'

'জ্বি না স্যার।'

'ঠিকমতো বানাতে পারলে অতি উপাদেয় একটা জিনিস। চিনি দিয়ে টক কমাতে হয়। কাঁচা মরিচ দিয়ে ঝাল ভাব আনতে হয়। লবণও দিতে হয়। চিনি এবং লবণের অনুপাতের উপর স্বাদ নির্ভর করে। বাবা ছিলেন কদবেল ভর্তার বিশেষজ্ঞ। আমরা বিপুল আনন্দে কদবেলের ভর্তা

খেলাম। বাবা হাসি হাসিমুখে জেলখানার গল্প করতে লাগলেন। রোমাঞ্চকর সব গল্প। গল্প শুনলে যে কেউ বাকি জীবনটা জেলখানায় কাটিয়ে দিতে চাইবে।

বাবা তাঁর জেল জীবনের স্মৃতির উপসংহার টানলেন এই বলে যে প্রতিটি মানুষের জীবনে জেলের অভিজ্ঞতার দরকার আছে। জেল একটা বিরাট ট্রেনিং সেন্টার। অনেক কিছু সেখানে শেখার আছে। বাবার গল্প শুনে আমি ঠিক করে ফেললাম জীবনের একটা অংশ যে করেই হোক আমাকে জেলে কাটাতে হবে।'

হিশামুদ্দিন সাহেব চুপ করলেন। হাসান মনে মনে কয়েকবার আওড়াল আজহারউদ্দিন। নামটা যেন মনে থাকে। হিশামুদ্দিন সাহেবের স্বভাব হল কোনো নাম তিনি বারবার বলেন না। এক-দুবার বলেন। আজহারউদ্দিন নামটা তিনি আরো বলবেন বলে মনে হয় না।

'হাসান!'

'জ্বি স্যার।'

'গল্প বলার সময় তোমার মনে যদি কোনো প্রশ্ন আসে—তুমি যদি কিছু জানতে চাও জিজ্ঞেস কোরো। চুপ করে থেকো না। প্রশ্ন করলে আমার মনে হবে তুমি আগ্রহ করে শুনছ।'

'স্যার আমি খুব আগ্রহ করেই শুনছি?'

'কেন?'

হাসান জবাব দিতে পারল না। হিশামুদ্দিন বললেন, আমি যে সব গল্প বলছি তা খুবই সাধারণ গল্প। কিন্তু তুমি আগ্রহ করে শুনছ কারণ যিনি গল্প বলছেন তিনি অসম্ভব বিত্তবান একজন মানুষ। তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। পরাজিত মানুষের গল্প আমাদের শুনতে ভালো লাগে না। বিজয়ী মানুষের গল্প আমরা আগ্রহ নিয়ে শুনি। চেঙ্গিস খাঁর গল্প আমরা পড়ি কারণ তিনি জয়ী। যে সব রাজাদের তিনি পরাজিত করেছেন—যারা ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের গল্প আমরা পড়ি না। ঠিক বলছি হাসান?

'জ্বি স্যার।'

'বাবার গল্পে চলে যাই। বাবা জেল থেকে ফেরার পর আমরা খুব কষ্টে পড়লাম। আসল কষ্ট—ভাতের কষ্ট। তিনি যে কদিন জেলে ছিলেন সেই কদিন ভাতের কষ্ট আমাদের ছিল না। দুবেলা ভাত খেতে পেরেছি। আমাদের বড় বোন পুষ্প ব্যবস্থা করেছেন। কী করে করেছেন আমরা জানি না—কিন্তু করেছেন। বাবা ফেরার পর দায়িত্ব তাঁর হাতে চলে গেলে তিনি অকূল সমুদ্রে পড়লেন। জেলখাটা দাগী লোক কাজেই কোথাও চাকরি জোটাতে পারছেন না। সারাদিন চাকরির সন্ধানে ঘোরেন।

রাত আটটা-ন'টার দিকে বাসায় ফেরেন। খাবার নিয়ে ফেরেন। আমরা রাতে একবেলা খাই—তবে পেট ভরে খাই। বাবা খাবার আনতেন হোটেল থেকে। তুমি জান কি না জানি না ভালো চালু হোটেলে উৎকৃষ্ট খাবার প্রচুর জমে যায়। হোটেল মালিকরা সেইসব খাবার ফেলে না। একত্রে জমা করে রাখে। গরিব-দুঃখীদেরকে দিয়ে দেয়। বাবা একটা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করেছিলেন। রাত আটটার দিকে প্যাকেটভর্তি খাবার নিয়ে আসতেন। সবকিছু একসঙ্গে মেশানো বলে অদ্ভুত স্বাদ। মাছ, গোশত, ভাজি, বিরিয়ানি, খিচুড়ি—সবকিছুর অদ্ভুত মিশ্রণ!'

'স্যার খেতে কেমন?'

'প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে যা খাওয়া যায় তাই অমৃতের মতো লাগে—তবে ওই খাবারটা ভালো ছিল। আমরা সবাই খুব আগ্রহ করে খেতাম। শুধু আমার মেজো বোন খেতেন না। আমার মেজো বোন ছিলেন বিদ্রোহী টাইপের। তিনি বিদ্রোহ করে ফেললেন, কঠিন গলায় বললেন, মানুষের এঁটো খাবার আমি খাব না। মরে গেলেও না। বাবা তাকে নানা যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন—"সবকিছু এঁটো হয় কিন্তু খাবার কখনো এঁটো হয় না।" মেজো বোন বাবার যুক্তির ধার দিয়েও গেলেন না। তিনি চোখমুখ শক্ত করে বললেন, আমি এঁটো খাবার খাই না। তার জন্যে চিঁড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সে শুকনো চিঁড়া চিবিয়ে পানি খেত।

আমার মেজো বোন খুব রূপবতী ছিলেন। আমরা সবাই দেখতে মোটামুটি ভালোই ছিলাম—মেজো বোন ছিলেন সেই ভালোর মধ্যেও ভালো। খুব হাসিখুশি ছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে আশপাশের মানুষদের চমকে দিতে ভালবাসতেন। যেমন তাঁর একটা কথা ছিল—একটা পোকা আছে আমার খুব প্রিয়। আমি সেই পোকা কী যে পছন্দ করি। পোকাটার নাম চিংড়ি মাছ।'

'আপনার সেই বোনের নাম কী স্যার?'

হিশামুদ্দিন ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন—তার নাম আমি তোমাকে বলব না। ওই নামটা অজানাই থাকুক। হাসান আজ আর কথা বলব না কেমন যেন মাথা ধরে গেছে। আগামী সপ্তাহে আবার দেখা হবে।

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তোমাকে টাকা-পয়সা ঠিকমতো দিচ্ছে তো?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

হাসান তার কথা বলতে পারল না। হিশামুদ্দিন সাহেব যেখানে তাঁর গল্প থামিয়েছেন সেখানে হুট করে চাকরি চাওয়া যায় না।

হিশামুদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কেমন জানি অস্বস্তি লাগছে। বুকে চাপ ব্যথা বোধ হচ্ছে। লক্ষণগুলো পরিচিত। আবার ঠিক পরিচিতও নয়। শরীর খারাপের একটা লক্ষণের সঙ্গে অন্যটার তেমন মিল থাকে না।

হিশামুদ্দিন নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন। বিছানায় কি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকবেন? তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হচ্ছে না। বুকের ব্যথাটা কমে গেছে তবে মাথার যন্ত্রণাটা বাড়ছে। মনে হয় চোখ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা। কাল অনেক রাত জেগে কাগজপত্র দেখেছেন—চোখের উপর চাপ পড়েছে। চশমাটা বদলানো দরকার, বদলানো হচ্ছে না। তাঁর পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি দেবার জন্যে কাউকে বলতে হয়—এই পরিশ্রমটুকু করতে ইচ্ছা করছে না। খাটের পাশে কলিংবেলের সুইচ আছে সুইচে হাত পড়লেই কেউ একজন ছুটে আসবে। তিনি বসেছেন সোফায়—কলিংবেলটা মনে হচ্ছে অনেক দূরে।

চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বললে কেমন হয়। মেরিল্যান্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের সময়ের ব্যবধান যেন কত? এই তথ্য তাঁর জানা, তারপরেও চিত্রলেখার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিবার নতুন করে জানতে হয়। দিনের শুরুতেই তিনি জানেন আজ কত তারিখ। তারপরেও প্রতিটি সিগনেচারের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হয়—আজ কত তারিখ।

বাংলাদেশের সঙ্গে আমেরিকার সময়ের ব্যবধান কত? আট ঘণ্টা? বার ঘণ্টা? রাত দুটার সময় মেয়েকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার কোনো অর্থ হয় না। হিশামুদ্দিন সোফা থেকে উঠে খাটের দিকে গেলেন। খাটে হেলান দিয়ে সুইচ টিপলেন। মোতালেব উদ্বিগ্নমুখে ছুটে এল। ঘরে ঢুকল না। দরজার পরদা সরিয়ে উঁকি দিলেন। হিশামুদ্দিন সাহেব ঠিক বুঝতে পারলেন না, কী জন্যে মোতালেবকে ডেকেছেন। পানি দেবার জন্যে, নাকি কটা বাজে জানার জন্যে। তাঁর শোবার ঘরে কোনো ঘড়ি নেই। ঘড়ির শব্দে তাঁর অস্বস্তি বোধ হয়। সময় জানার জন্যে তাকে কাউকে না কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয়।

'কটা বাজে মোতালেব?'

'স্যার চারটা এখনো বাজে নাই। চা দিব।'

'না—আজ চা খাব না। তুমি টেলিফোন হ্যান্ডসেটটা নিয়ে এস।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

মোতালেব প্রায় দৌড়ে গেল। বাংলাদেশ-আমেরিকার সময়ের পার্থক্যটা জানা হল না। চিত্রলেখা হয়তো ডরমিটরিতে নেই—ক্লাসে গেছে। টেলিফোন বেজে যাবে কেউ ধরবে না।

'হ্যালো।'
'কেমন আছিস রে মা?'
'বাবা এক সেকেন্ড ধরে রাখ—আমি আসছি।'
হিশামুদ্দিন টেলিফোন ধরে আছেন। তাঁর মাথার যন্ত্রণাটা এখন খুব বেড়েছে। এই যন্ত্রণা নিয়েই তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে মেয়ের সঙ্গে কথা বলবেন। এটাও এক ধরনের খেলা।
'হ্যালো বাবা।'
'এক সেকেন্ডের জন্যে কোথায় গিয়েছিলে?'
মাইক্রো আভেন বন্ধ করতে গিয়েছিলাম।'
'রান্নাবান্না?'
'ঠিক রান্নাবান্না না—ক্ষিধে লেগেছিল। পিজা 'থ' করতে দিয়েছিলাম।'
'থ হয়েছে?'
'হুঁ। হয়েছে। আমি কপ কপ করে খাচ্ছি। শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?'
'পাচ্ছি।'
'তোমার খবর কী বাবা?'
'খবর ভালো।'
'জীবনী লেখা হচ্ছে?'
'হুঁ।'
'যতটুক লেখা হয়েছে পাঠিয়ে দিতে পারবে—এখন আমার একটা ফ্যাক্স নাম্বার আছে। নাম্বার দেব?'
'না।'
'না কেন?'
'সবটা লেখা হোক তারপর।'
'তোমার গলা এমন শোনাচ্ছে কেন বাবা?'
'কেমন শোনাচ্ছে?'
'মনে হচ্ছে তুমি অসুস্থ।'
'আমি সুস্থই আছি। তোর পড়াশোনার অবস্থা কী?'
'অবস্থা ভালো। এখন পর্যন্ত কোনো B পাই নি। স্ট্রেইট A।
'ও আচ্ছা।'
'তুমি একটা শুকনা ও আচ্ছা দিয়ে সেরে ফেললে? স্ট্রেইট A যে কী ভয়াবহ জিনিস তুমি কি জান? আমি যখন করিডোর দিয়ে হাঁটি ছেলেমেয়েরা তখন অদ্ভুত চোখে তাকায়। বাবা এক সেকেন্ড ধরবে—আমি একটা কোকের ক্যান নিয়ে আসি।'
হিশামুদ্দিন টেলিফোন ধরে রাখলেন। মাথার ব্যথাটা এখন আর নেই, তবে পিঠে ব্যথা হচ্ছে। ব্যথার ব্যাপারটা কি সাইকোলজিক্যাল? মনস্তাত্ত্বিক ব্যথাই শুধু মিনিটে মিনিটে স্থান বদলায়।
'বাবা।'
'কী মা।'
'কোকের ক্যান নিয়ে এসেছি এখন কথা বল।'
'কী কথা বলব?'
'কী কথা বলবে সেটা তুমি জান। আমি কী করে বলব।'
'তুই কথা বল আমি শুনি।'
'আমার কথা বলার হলে তো আমিই টেলিফোন করতাম। টেলিফোন তুমি করেছ। তুমি কথা বলবে আমি শুনব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আগের বার বলেছিলি ব্রাজিলের এক ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে সেই ভাব এখনো আছে?'

'ভাব হয়েছে এই কথা তো বাবা বলি নি—সে আমাকে ডিনার এবং মুভি দেখার জন্য ইনভাইট করেছিল আমি গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর আবার কী?'

'একবারই গিয়েছিলি? আর যাস নি?'

'না। হাঁদা টাইপ ছেলে। চেহারা দেখে বোঝা যায় না। কিছুক্ষণ কথা বললেই টের পাওয়া যায়। ওর সঙ্গে কথাটথা বলে আমার কী মনে হয়েছে জান?'

'কী মনে হয়েছে?'

'মনে হয়েছে—মানুষ বানর থেকে এসেছে ঠিকই তবে সবাই পুরোপুরি মানুষ হয় নি। অনেকেই বানর রয়ে গেছে। হি হি হি।'

'এখন এমন কেউ নেই যার সঙ্গে ডিনার খেতে যাচ্ছিস বা মুভি দেখছিস?'

'উঁহুঁ। ইচ্ছে করে না। বাবা আমার কী ধারণা জান? আমার ধারণা পুরুষরা প্রাণী হিসেবে মেয়েদের অনেক নিচে। বুদ্ধিবৃত্তি লোয়ার লেভেলে। রাগ করেছ বাবা?'

'রাগ করব কেন?'

'তুমিও তো পুরুষ এই জন্যে হি হি হি।'

'কথায় কথায় হাসার অভ্যাস কি তোর এখনো আছে?'

'এটা তো বাবা কোনো খারাপ অভ্যাস না যে ছেড়ে দিতে হবে।'

'তা না।'

'তুমি যে বলেছ আমার জন্যে ভালো একটা ছেলে খুঁজে বের করবে যাকে আমি বিয়ে করব, খুঁজে পেয়েছ?'

'এখনো পাই নি।'

'খুঁজছ নাকি খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছ?'

'খুঁজছি।'

'বাবা আমার পয়েন্টগুলো মনে আছে তো? ছেলেটির কী কী গুণ থাকতে হবে মনে আছে?'

'আছে।'

'বল তো শুনি।'

'লম্বা হতে হবে, গায়ের রং শ্যামলা, I Q থাকবে ১৬০ এর উপরে, কথায় কথায় হি হি করে হেসে ওঠার ক্ষমতা থাকতে হবে, পড়াশোনায় খুব ভালো হতে হবে।'

'একটা পয়েন্ট বাদ গেছে বাবা।'

'কোন পয়েন্ট?'

'ঠোঁট মোটা হলে চলবে না, ঠোঁট পাতলা হতে হবে।'

'তুই কি এর মধ্যে দেশে বেড়াতে আসবি?'

'পাগল হয়েছ? আমার মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগলের অবস্থা। পড়াশোনার যে কী প্রচণ্ড চাপ তুমি বিশ্বাসই করতে পারবে না। এখন সবাই ঘুরে টুরে বেড়াচ্ছে আর আমি চারদিকে বই সাজিয়ে বসে আছি। তুমি টেলিফোন রাখামাত্র আমি ফার্মাকোলজির বই খুলে বসব।'

'তাহলে টেলিফোন এখন রাখি মা?'

'আচ্ছা।'

হিশামুদ্দিন টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। মোতালেব চা নিয়ে এসেছে। তিনি চা দিতে নিষেধ করেছিলেন তার পরেও এনেছে।

হিশামুদ্দিন চায়ের কাপ হাতে নিলেন।

৬

তিতলী কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছে। অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। মতিন সাহেব বাথরুমে ঢুকেছেন। বাথরুম থেকে বের হলে তিতলী রিকশা ভাড়া চাইবে। একবার না তিতলীকে কয়েকবার চাইতে হবে। তিনি শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্তমুখে মানিব্যাগ খুলে দুটা দশ টাকার নোট বের করবেন। আসা–যাওয়ার রিকশা ভাড়া বাবদ পনের টাকা আর পাঁচ টাকা টিফিনের জন্যে। টাকাটা চাওয়া মাত্র দিয়ে দিলে কী হয়? একসঙ্গে কয়েকদিনের টাকা দিয়ে দিলে রোজ রোজ চাইতেও হয় না।

মতিন সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, অস্থির হয়ে পড়েছিস কেন? টাকা টাকা করে তুই তো দেখি দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকে পড়ার ব্যবস্থা করেছিস। স্বভাব থেকে অস্থিরতা দূর কর। অস্থির মানুষ কোথাও গিয়ে পৌঁছতে পারে না।

রাগে–দুঃখে তিতলীর কান্না পেয়ে যাচ্ছে। বাবার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলার সম্পর্ক থাকলে সে অবশ্যই বলত, তুমি নিজে তো খুব সুস্থির মানুষ। তুমি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছ?

বাবার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলার সম্পর্ক তার না। তিতলী চাপা নিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইল। মতিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। টেবিলের ড্রয়ার থেকে মানিব্যাগ বের করবেন। তিতলীর প্রতীক্ষার অবসান হবে। তিতলী বাবার পেছনে পেছনে গেল। মতিন সাহেব ড্রয়ারের দিকে গেলেন না। খাটের উপর বসতে বসতে বললেন, আজকের কাগজটা দিয়ে যা। আর তোর মাকে বল এক কাপ চা দিতে। চিনি দিয়ে যেন আবার শরবত না বানায়। এক কাপে এক পোয়া চিনি না দিয়ে তো সে আবার চা বানাতে পারে না।

'আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বাবা।'

'খবরের কাগজটা দিতে আর তোর মাকে চায়ের কথা বলতে কতক্ষণ লাগবে? কথা বলে তুই যে সময়টা নষ্ট করছিস তারচে কম সময়ে কাগজটা দিয়ে যেতে পারতি। মাকেও খবর দিতে পারতি।'

তিতলী কাগজ এনে বাবার হাতে দিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সুরাইয়া মেয়েকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, কী রে এখনো কলেজে যাস নি?

তিতলী বলল, বাবাকে এক কাপ চা দাও। আর আমাকেও এক কাপ দাও। আজ কলেজে যাব না।

'যাবি না কেন?'

'যেতে ইচ্ছা করছে না।'

সুরাইয়া কলেজ প্রসঙ্গে আর কিছু বললেন না। মনে হল মেয়ে কলেজে না যাওয়ায় তিনি খুশিই হয়েছেন। তিতলী যেদিন কলেজে যায় না সেদিন মাকে নানান কাজে সাহায্য করে। দুপুরে রান্নার সময় বলে—মা তুমি একটা মোড়া এনে মোড়ায় চুপচাপ বসে থাক আমি তোমার রান্না করে দিচ্ছি। রোজ রোজ রান্না করতে তোমার নিশ্চয়ই বিরক্তি লাগে। আজ সব রান্না আমি রাঁধব তুমি শুধু বাবার ভাতটা রাঁধবে।

তিতলীর হাতে কোনো মন্ত্রতন্ত্র আছে—যাই রাঁধে খেতে ভালো হয়।

'কলেজে যাবি না কেন?'

'বললাম তো ইচ্ছা করছে না।'

'অসুবিধা হবে না?'

'কোনো অসুবিধা হবে না। কলেজে পড়াশোনা কিছু হয় না মা। টিচাররাও আসেন না। যারা আসেন হড়বড় করে দু–এক কথা বলে চলে যান। তারা কী বলেন—আমরা কেউ শুনিও না। আমরা নিজেদের মতো ফিসফিস করে গল্প করি। কাটাকুটি খেলা খেলি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলিস কী!'

'সত্যি কথা বললাম মা। আমরা কলেজে যাই গল্পগুজব হইচই করার জন্যে। পড়াশোনা যাদের করার তারা ঘরে বসে করে।'

'কলেজে তাহলে খুব খারাপ অবস্থা?'

'খারাপ হবে কেন ভালো অবস্থা।'

সুরাইয়া চায়ের কাপে চা ঢাললেন। তিতলী কাপ হাতে বাবার ঘরের দিকে রওনা হল। চট করে বাবার কাপে একটা চুমুক দিয়ে দেখে নিল চিনি ঠিক আছে কি না। কাজটা ঠিক হল না। চা এঁটো করে দেয়া হল। তবে বাবা-মার চা এঁটো করা যায়।

মতিন সাহেব চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বললেন—টেবিলের উপর পেপারওয়েটে টাকা চাপা দেয়া আছে। নিয়ে যা।

তিতলী টাকাটা নিল।

মতিন সাহেব বললেন, এদিক থেকে লালমাটিয়া কলেজে কোনো মেয়ে পড়ে না? তাহলে দুজনে শেয়ার করে যেতে পারতিস। খরচও বাঁচত। দুজন একসঙ্গে যাবার একটা সিকিউরিটিও আছে। কলেজের নোটিশ বোর্ডে একটা নোটিশ দিয়ে দিবি।

তিতলী অবাক হয়ে বলল, কী নোটিশ দেব?

'সহযাত্রী চেয়ে বিজ্ঞপ্তি।'

তিতলী বলল, আচ্ছা।

'টাকাটা যে সেভ হচ্ছে সেটা বড় কিছু না—সিকিউরিটিটা আসল। দিনকাল খুবই খারাপ। চারদিকে সিকিউরিটি প্রবলেম।'

তিতলী বাবার সামনে থেকে চলে গেল। বাবার বক্তৃতা মার্কা কথা শুনতে অসহ্য লাগছে। এরচে মার সঙ্গে গল্প করার অন্য আনন্দ। মা যত না গল্প করবেন তারচে বেশি গল্প শুনতে চাইবেন। সামান্য গল্পও মা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। এই ধরনের মানুষকে গল্প শুনিয়ে খুব আনন্দ।

সুরাইয়া মেয়ের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিতে দিতে বললেন, নাদিয়ার কী হয়েছে তুই জানিস?

তিতলী বিস্মিত হয়ে বলল, না তো। ওর আবার কী হবে!

সুরাইয়া বললেন, আমি নাশতা খাবার জন্যে ডাকতে গেলাম দেখি বই পড়ছে ঠিকই কিন্তু চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম কী হয়েছে— কিছু বলে না।

'আমি জেনে আসছি কী ব্যাপার। মা শোন আজ দুপুরে আমি রাঁধব।'

'কী রাঁধবি? ঘরে তো বাজারই নেই।'

'বাবা বাজারে যাবে না? বাবাকে দিয়ে এক কেজি ভালো গরুর গোশত আনিয়ে দাও তো মা। আমি কাটা পেঁয়াজ দিয়ে একটা গোশত রান্না করব। প্রমীদের বাড়িতে একদিন খেয়েছিলাম। খেতে খুব ভালো। আমি প্রমীর আম্মার কাছে সব জেনে এসেছি। ঘরে কি সিরকা আছে মা? সিরকা লাগবে। সিরকা ছাড়া হবে না।'

'ঘরে তো সিরকা নেই।'

'সিরকা আনিয়ে দাও না মা। রান্নাটা একবার রাঁধতে না পারলে ভুলে যাব। একবার রাঁধলে আর ভুলব না।'

'সিরকা টিরকার কথা বললে তোর বাবা আবার রেগে যায় কি না কে জানে।'

'এটা আবার কী ধরনের কথা মা? বাবাকে তুমি ভয় পাও কেন? স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো। তোমাদের এ রকম কেন? তোমাদের দেখে মনে হয় একজন গুরুমশাই আরেকজন প্রাইমারি ক্লাসের ছাত্রী।'

তিতলী উঠে দাঁড়াল। তার চা শেষ হয় নি। খেতে ভালো লাগছে না। তিতলী জানে তার মা তার চায়ের কাপের চাটুকু এক সময় চুমুক দিয়ে খাবেন। তিনি অপচয় সহ্য করতে পারেন না।

নাদিয়া নিঃশব্দে পড়ছে। তিতলী ঘরে ঢুকতেই সে বই থেকে মাথা না সরিয়ে বলল, কলেজে যাও নি আপা?

তিতলী বলল, আজ কলেজে যাব না। আজ আমার ছুটি।

নাদিয়া বই থেকে মুখ ঘুরিয়ে বড় বোনের দিকে তাকিয়ে হাসল। তার হাসিই বলে দিচ্ছে বড় আপার কলেজে না যাওয়ার সংবাদে সে খুব আনন্দিত। যদিও তার আনন্দিত হবার কিছু নেই—সে বই রেখে আপার সঙ্গে গল্প করতে বসবে না। বিকেলে একবার কিছুক্ষণের জন্যে উঠবে। ছাদে হাঁটতে যাবে, তাও একা একা। ছাদ থেকে নেমে আবারো বই নিয়ে বসবে।

তিতলী একটা চেয়ার টেনে নাদিয়ার পাশে বসতে বসতে বলল, নাদিয়া তোকে খানিকক্ষণ বিরক্ত করি?

'কর। কিন্তু আপা বেশিক্ষণ না।'

'দিনরাত যে এত পড়িস তোর ভালো লাগে?'

'হুঁ।'

'যে হারে পড়াশোনা করিস সব বই তো তোর মুখস্থ হয়ে যাবার কথা।'

নাদিয়া লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, সব বই তো আমার মুখস্থই।

'মুখস্থ! তাহলে আর পড়ার দরকার কী?'

'না পড়লে ভুলে যাব না?'

'ভুলে গেলে ভুলে যাবি। সামান্য এস.এস.সি. পরীক্ষার জন্যে জীবনটা নষ্ট করে ফেলবি। তোকে দেখে মনে হয় তুই মানুষ না—একটা যন্ত্র।'

নাদিয়া বলল, আপা তুমি অনেকক্ষণ বিরক্ত করে ফেলেছ। এখন যাও। তোমাকে আর সময় দেয়া যাবে না।

'আসল কথা যা বলতে এসেছিলাম সেটা বলা হয় নি।'

'আসল কথা কী?'

'মা সকালে নাশতা নিয়ে এসে দেখে তুই বই পড়তে পড়তে কাঁদছিস। কী হয়েছে?'

'কিছু হয় নি।'

'আমাকে বলতে কোনো অসুবিধা আছে?'

'না। খুবই তুচ্ছ ব্যাপার আপা। এই জন্যে বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'কাউকে কিছু বলবি না—আবার ফিঁচ ফিঁচ করে কাঁদবি এটা কেমন কথা।'

'আর কাঁদব না।'

'আমরা তিন বোনের কেউ কাঁদলে মা মনে খুব কষ্ট পায়। কী জন্যে কাঁদছিস এ জন্যেই মাকে সেটা জানানো দরকার।'

'মাকে কিছু জানাতে হবে না আপা—তোমাকে বলছি তুমি শুনে রাখ। ফুফুর বাসায় যে গিয়েছিলাম সেখানে জামান ভাইয়া আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে। কুৎসিত একটা চিঠি। কেউ যে কাউকে এমন কুৎসিত চিঠি দিতে পারে তাই আমি জানতাম না।'

'কী লেখা চিঠিতে?'

'কী লেখা তোমাকে আমি বলতে পারব না।'

'চিঠিটা কি ফেলে দিয়েছিস?'

'না ফেলি নি রেখে দিয়েছি, কিন্তু তোমাকে চিঠিটা আমি কোনোদিন দেখাব না। দেখতে চেও না। চিঠিটা পড়লে তোমার শরীর অশুচি হয়ে যাবে। আপা এখন তুমি যাও।'

তিতলী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চিঠিতে কি ভালবাসার কথা লেখা?

নাদিয়া চাপা গলায় বলল, ভালবাসার কথা লেখা থাকলে আমি রাগ করব কেন? ভালবাসা টাসা না আপা অতি কুৎসিত কিছু কথা। আপা শোন মাকে কিছু বলার দরকার নেই।

'ফুফুকে কি ঘটনাটা বলব?'

'না ফুফু উল্টা আমার উপর রাগ করবে। কোনো মার কাছেই নিজের ছেলের দোষ ধরা পড়ে না। তাছাড়া এইসব ঘটনায় সবার আগে দোষী ভাবা হয় মেয়েটাকে। ফুফু কী বলবে জান? ফুফু বলবে বাংলাদেশে তো মেয়ের অভাব ছিল না। এত মেয়ে থাকতে জামান তোকে কেন এই চিঠি লিখল? এই রহস্যটার মানে কী? তুই নিশ্চয়ই এমন কিছু করেছিস যে তোকে এ ধরনের চিঠি লেখার সাহস পেয়েছে।

তিতলী বলল, ফুফু এ রকম বলবে ঠিকই। তুই তো বেশ গুছিয়ে চিন্তা করা শিখে গেছিস।

'আমি মোটেও গুছিয়ে চিন্তা করি না আপা। যা মনে আসে বলে ফেলি। পড়তে পড়তেই সময় পাই না—এত চিন্তা করব কীভাবে।'

নাদিয়া হাসল। এত সুন্দর করে হাসল যে তিতলীর তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা করল বোনকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকতে। সেটা করতে গেলে নাদিয়া বিরক্ত হবে। আচ্ছা নাদিয়া কি জানে যত দিন যাচ্ছে সে তত সুন্দর হচ্ছে। না, তা সে জানে না। আয়নায় সে মনে হয় নিজেকে দেখেও না। তার সমস্ত জগৎ পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ। তিতলীর ধারণা সে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে কোনো মানুষের প্রেমে পড়বে না, কোনো একটা পাঠ্যবইয়ের প্রেমে পড়বে। তিতলী উঠে পড়ল।

মতিন সাহেব গোশত বা সিরকা কোনোটাই আনেন নি। গোশত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, গোশত শরীরের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সবচে খারাপ ধরনের প্রোটিন হল এনিমেল প্রোটিন। সপ্তাহে এক দিনের বেশি গোশত খাওয়া ঠিক না। এই সপ্তাহে এর মধ্যে দুদিন হয়ে গেছে—আর না। সিরকার প্রসঙ্গে বলেছেন—সিরকাটা কোন কাজে লাগে? বাড়িটা তো কাবাব হাউস না যে সিরকা লাগবে, সয়াসস লাগবে।

সুরাইয়া স্বামীর সঙ্গে যুক্তিতর্কে যান নি। চুপ করে গেছেন। তাঁর মন একটু খারাপ হয়েছে। মেয়েটা শখ করে একটা জিনিস চেয়েছে।

মতিন সাহেব তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রাগারাগিও করেছেন। তিতলীর কলেজ বাদ দেয়া প্রসঙ্গে রাগারাগি।

'সকাল থেকে তো রিকশা ভাড়া রিকশা ভাড়া করে আমার মাথা খারাপ করে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দরজা ভেঙে বাথরুমে ঢুকে পড়বে। যখন ভাড়া দিলাম তখন আর কোথাও যায় না। এর মানে কী? আদর দিয়ে দিয়ে সব কটা মেয়ের মাথা যে তুমি খেয়েছ সেটা কি তুমি জান? মেয়েরা কিছু বললে তোমার হুঁশ থাকে না। মেয়েদের কেউ মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করলে ওইটা নিয়েই থাক। মুখে দিয়ে 'সিরকা' শব্দটা বের করেছে, তুমিও তসবি জপা শুরু করলে ''সিরকা সিরকা।'' আদর এবং প্রশ্রয় কম দেবে। এর ফল আখেরে শুভ হবে।'

মতিন সাহেব বাজার এনে দিয়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন। তিতলীর কলেজের নোটিশ বোর্ডে ঝোলানোর জন্যে একটা বিজ্ঞাপন তিনি নিজেই লিখবেন। কাল কলেজে যাবার সময় মেয়ের হাতে ধরিয়ে দেবেন। মেয়ে নিজের আগ্রহে এই কাজ করবে না। তেমন শিক্ষা তারা মার কাছ থেকে পায় নি। তাদের মা তাদের শুধু আদরই দিয়েছে—শিক্ষা দেয় নি। মতিন সাহেব অনেক চিন্তাভাবনা এবং পরিশ্রম করে জিনিসটা দাঁড় করালেন।

সহযাত্রীর জন্যে বিজ্ঞপ্তি

আমার বাসা কলাবাগানের অভ্যন্তরে। দেশের বর্তমান অশান্ত পরিবেশে রিকশাযোগে একা একা কলেজে আসবার সময় কিঞ্চিৎ ভীত থাকি। এমতাবস্থায় সহপাঠী বন্ধুদের জানাচ্ছি তাহাদের কেহ যদি কলাবাগান এলাকায় থাকেন এবং আমার সঙ্গে একত্রে রিকশায় আসা-যাওয়া করতে রাজি থাকেন তাহা হইলে আমার জন্যে অত্যন্ত শুভ হয়। রিকশা ভাড়া বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয় তা সমান সমান ভাগাভাগি করা হইবে

ফলশ্রুতিতে অভিভাবকেরও অর্থনৈতিক সাশ্রয় হইবে। যোগাযোগের ঠিকানা—তিতলী বেগম, ১২/১০ কলাবাগান। হলুদ কাঠের গেটওয়ালা বাড়ি।

দুপুরে খেতে বসে নাদিয়া উৎফুল্ল গলায় বলল, নিশ্চয় আপা রেঁধেছে। রং দেখেই টের পাচ্ছি আপার রান্না।

তিতলী লজ্জিত গলায় বলল, আহ্লাদী করিস না খা।

'তুমি যাই রাঁধ তাই এমন অপূর্ব কেন হয় বল তো। তুমি একটা রান্নার স্কুল দিও তো আপা। দেখবে দলে দলে তোমার স্কুলে ছাত্র ভর্তি হবে।'

'যথেষ্ট হয়েছে।'

'মোটেই যথেষ্ট হয় নি। আপা তুমি কি জান তুমি খুব অল্পবয়সে বিধবা হবে।'

সুরাইয়া তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এটা কী ধরনের কথা?

নাদিয়া বলল, আপা ভালো ভালো রান্না করবে। সেই রান্না খেয়ে খেয়ে দুলাভাই ফুলে ফেঁপে একাকার হবে। কোলেস্টরল হবে, হাই ব্লাডপ্রেসার হবে। তারপরেও খাওয়া ছাড়তে পারবে না। তারপর একদিন হার্ট অ্যাটাক।

সুরাইয়া বললেন, রসিকতা ভালো, এ ধরনের রসিকতা ভালো না। তওবা কর। বল তওবা।

নাদিয়া বলল, তওবা।

সুরাইয়া বললেন, তুই কথাবার্তা আরো সাবধানে বলবি। যা ইচ্ছা বলে ফেলিস। আশ্চর্য!

তিতলী বলল, বক্তৃতা বন্ধ কর তো মা। বেচারি আরাম করে খাচ্ছে খাক।

সন্ধ্যাবেলা তিতলীর ফুফু নাফিসা খানম এলেন। পরনে ধবধবে সাদা শাড়ি। কাঁধে গোলাপি চাদর। ছোটখাটো মহিলা, সরল ধরনের গোলগাল মুখ, কথা বলেন নিচু গলায়—কিন্তু তাঁর নিচু গলার প্রতিটি শব্দের গুরুত্ব অসীম।

নাফিসা খানম গাড়ি থেকে নেমেই ভুরু কোঁচকালেন। নষ্ট কলিংবেল এখনো বদলানো হয় নি। গত সপ্তাহে তিনি শক খেয়েছিলেন। মতিনকে বলে গেছেন ঠিক করতে। মতিন সেটা করে নি।

তিনি ড্রাইভারকে তৎক্ষণাৎ দোকানে পাঠালেন। ড্রাইভার ডিংডং শব্দ হয় এমন একটা কলিংবেল কিনবে, একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। তিনি থাকতে থাকতেই কলিংবেল ঠিক হবে।

নাফিসা খানম কারো বাড়িতেই খালি হাতে যান না। এখানেও এক কেজি জিলাপি নিয়ে এসেছেন। জিলাপি দোকানের কেনা না—তাঁর নিজের বানানো। এক ময়রার কাছ থেকে তিনি মিষ্টি বানানো শিখছেন। জিলাপি ভালো হয়েছে তবে জিলাপির প্যাঁচ ঠিকমতো হয় নি। আড়াই প্যাঁচ হবার কথা—তার কোনো কোনোটিতে তিন প্যাঁচ হয়েছে, কোনোটিতে এক প্যাঁচ।

মতিন এসে বড়বোনকে কদমবুসি করলেন। এটা নতুন না, সব সময় করেন। নাফিসা খানম এত ভক্তিতেও বিচলিত হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কী রে তোকে না বললাম, কলিংবেল ঠিক করাতে। ঠিক করাস নি কেন?

মতিন আমতা আমতা করে বললেন—বেল কিনিয়েছি। বেল—ইলেকট্রিক তার সব কেনা, মিস্ত্রি পাচ্ছি না।

'মিস্ত্রি পাবি না কেন? মিস্ত্রিরা সব দল বেঁধে গেল কই?'

'আমার পরিচিত একজন মিস্ত্রি আছে—ও গেছে দেশের বাড়িতে।'

'পয়সা দিয়ে কাজ করাবি তার আবার পরিচিত-অপরিচিত কী?'

'কাল–পরশুর মধ্যে লাগিয়ে ফেলব আপা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তিতলীকে ওযুর পানি দিতে বল—মাগরেবের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। জিলাপি নিয়ে এসেছি—খা। গরম গরম খা ঠাণ্ডা হলে ভালো লাগবে না।'

নাফিসা খানম ওযু করে নামায পড়তে বসলেন। মতিন সাহেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন যে কলিংবেল সমস্যা বেশিদূর গড়ায় নি।

সমস্যার এত সহজ সমাধান অবশ্যি হল না। নামায শেষ করেই নাফিসা খানম বললেন, মতিন তুই তোর কলিংবেল আর তারফার কী কিনেছিস আমাকে দেখা। আমি ড্রাইভারকে কিনতে পাঠিয়েছি যেটা ভালো সেটা লাগাব। বাকিটা তুলে রাখব।

মতিন মুখ শুকনো করে কলিংবেল খুঁজতে গেলেন। যে জিনিস কেনাই হয় নি সে জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। মতিন সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গা খুঁজছেন আর কিছুক্ষণ পর পর বলছেন, আশ্চর্য পলিথিনের একটা কালো ব্যাগে ছিল—খাটের নিচে রেখেছি গেল কোথায়? তাঁর স্বগতোক্তি নাফিসা খানম শুনেও না শোনার ভাব করছেন। এত কিছু শোনার সময়ও তাঁর নেই। তিনি এসেছেন জরুরি কাজে—তিতলীর বিয়ের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে। ওই পার্টি গা এলিয়ে দিয়েছিল ফাইনাল কথা বলবে বলে ডেট দিয়ে আসে নি। এখন আবার খানিকটা উৎসাহ দেখাচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে তিনি আলাপ করতে এসেছেন। আলাপ তিনি করছেন সুরাইয়ার সঙ্গে তবে তিনি চাচ্ছেন মেয়েরাও ব্যাপারটা শুনুক। মতামত দেবে না, শুধু শুনে যাবে। বিয়েটিয়ে বিষয়ক গল্প শুনতে নাদিয়ার একেবারেই ভালো লাগে না—তারপরেও তাকে গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে হচ্ছে। ফুফু যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ সবাই তাঁকে ঘিরে থাকবে এটাই অলিখিত নিয়ম।

নাফিসা খাটে পা উঠিয়ে বসে আছেন। তাঁর দুপাশে নাদিয়া এবং তিতলী। নাতাশা ঠিক তার পেছনে হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নাতাশার দায়িত্ব হচ্ছে ফুফুর চুল টেনে দেয়া। এই কাজটা নাকি নাতাশা খুব ভালো পারে।

'ঘটনা কী হল শোন। রাত আটটা বাজে। তিতলীর ফুফার কাছে গেস্ট এসেছে। আমি গেস্টদের চা আর নুডলস দিয়ে শোবার ঘরে এসেছি। খুবই মাথা ধরেছে। কাজের মেয়েটাকে বললাম চুল টেনে দিতে। সে চুল টানছে তখন টেলিফোন এল। খুবই নরম গলা—আপা কেমন আছেন? শরীর ভালো? এই সব ন্যাকামি টাইপ কথা। আমি গলা শুনেই বুঝেছি—কে। তারপরেও বললাম, চিনতে পারছি না তো কে বলছেন? বলল—আমি বুলা। আমি বললাম, ও আচ্ছা। বুলা হচ্ছে ছেলের মামি। পশ্চিমবঙ্গের মেয়ে তো চর্বির ভাঁজে ভাঁজে দুষ্টবুদ্ধি। আমাদের মতো সোজা সরল না। আমি বললাম, কী ব্যাপার হঠাৎ টেলিফোন? সে বলে কী—আপা আপনার সঙ্গে একটু যে বসতে হয়। সোমবারে কি আপনার সময় হবে? আমি বললাম, না। এই সপ্তাহটা খুব ব্যস্ত থাকব। কোনোরকম আগ্রহ দেখালাম না। ভাবটা এ রকম করলাম যে আমার কোনো গরজ নেই। গরজ দেখালেই এরা মাথায় উঠে যায়। শুরুতে বেশি গরজ দেখানোর জন্যে ওরা ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিল। যেই গরজ দেখানো বন্ধ ওমনি খোঁজ পড়েছে।'

সুরাইয়া বললেন, ওদের আগ্রহ আছে?

'আগ্রহ অবশ্যই আছে। তবে ভালো ছেলে একটা হাতে থাকলে যা হয়—দুনিয়ার মেয়ে বাজিয়ে দেখে। তাই করছে—দুনিয়ার মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছে। কোনো মেয়েরই ভালো কিছু চোখে পড়ছে না শুধু খুঁতগুলো চোখে পড়ছে।'

নাদিয়া বলল, ভালো ছেলে আপনি কাকে বলেন ফুফু?

নাফিসা খানম পানের বাটা থেকে পান মুখে দিতে দিতে বললেন, আমার কাছে ভালো ছেলের হিসাব খুব সোজা। ছেলের ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি থাকতে হবে। ভালো একটা চাকরি থাকতে হবে। পরিবারের ছোট বা মেজো ছেলে হতে হবে—বড়ছেলের উপর সংসারের দায়-দায়িত্ব থাকে। বড়ছেলে চলবে না। গায়ের রং ফরসা হতে হবে। রং ময়লা হলে তার মেয়েগুলোর রং হবে ময়লা—মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে জান বের হয়ে যাবে। লম্বা হতে

হবে। বাপ বাঁটু হলে—ছেলেমেয়ে সব নাটবল্টু হয়। তোর বাবাকে ডাক তো তাকে দুটা কথা বলে বিদেয় হব।

মতিন শুকনো মুখে এসে দাঁড়ালেন। নাফিসা খাতুন চায়ের কাপে পানের পিক ফেলতে ফেলতে বললেন, কলিংবেল পাওয়া গেছে?

'না। পলিথিনের ব্যাগে করে খাটের নিচে এনে রেখেছিলাম।'

'ভালো করে ভেবে দেখ। কিনে হয়তো দোকানেই ফেলে এসেছিস।'

'সেটাও হতে পারে।'

'কিনেছিস কোত্থেকে?'

'নওয়াবপুর থেকে।

'কাল গিয়ে খোঁজ নিবি। পয়সা দিয়ে জিনিস কিনে দোকানে ফেলে আসা কোনো কাজের কথা না।'

'জ্বি বুবু।'

'আচ্ছা এখন যা।'

মতিন হাঁপ ছাড়লেন। মনে হচ্ছে ঘাম দিয়ে তাঁর জ্বর ছেড়েছে। নাফিসা বললেন—তিতলী কাগজ আর কলম আন। জিলাপির রেসিপি তোকে লিখে দিয়ে যাই। আমি মুখে মুখে বলি তুই লিখে নে। না নাদিয়া তুই লেখ। তোর হাতের লেখা ভালো।

নাদিয়া জিলাপির রেসিপি লিখছে। আজ তার অনেক সময় নষ্ট হল। নষ্ট সময়টা কাভার করার জন্যে অনেক রাত জাগতে হবে।

সুন্দর করে লিখে রাখ উপকরণ—

ময়দা ১ কাপ
চিনি ১ কাপ
গোলাপজল ১ টেবিল চামচ
সয়াবিন তেল ১ কাপ।

ময়দা আধকাপ পানিতে ভালো করে গুলে—দুদিন ঢেকে রাখতে হবে।.....

রেসিপি দিয়ে নাফিসা উঠলেন। সুরাইয়ার হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিলেন। সামনের মাসের খরচ চার হাজার টাকা। টাকার খাম সুরাইয়া খুব লজ্জিত মুখে নিলেন। তাঁর লজ্জা অবশ্যি নাফিসা খানমের চোখে পড়ল না। তিনি কলিংবেল লাগানো হয়েছে কি না দেখতে গেলেন। মিস্ত্রি কলিংবেল লাগিয়েছে। নাফিসা খানম দুবার বেল টিপলেন। বেলের আওয়াজে তেমন খুশি হলেন না। ক্যানক্যানে শব্দ। কানে লাগে।

নাদিয়া রাত একটা পর্যন্ত পড়ে। বড় ফুফুর জন্যে দেড় ঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। সেই সময় পুষিয়ে নেবার জন্যে সে আড়াইটা পর্যন্ত পড়ে ঘুমোতে গেল। দুটা খাটের একটাতে সে একা ঘুমোয় অন্যটাতে তিতলী নাতাশাকে নিয়ে শোয়। কেউ সঙ্গে শুলে নাদিয়ার ঘুম আসে না। এটা তার ছেলেবেলার অভ্যাস। একমাত্র ব্যতিক্রম বড় আপা। বড় আপা তার সঙ্গে ঘুমোলে কোনো সমস্যা হয় না। বরং ঘুমের আগে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করতে পেরে ভালো লাগে।

রাত আড়াইটার সময় কারো জেগে থাকার কথা না। নাদিয়া ঘুমোতে এসে দেখে তিতলী জেগে আছে। নাদিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?

তিতলী হাই তুলতে তুলতে বলল, তোর জন্যে জেগে আছি। ঘুমের আগে খানিকক্ষণ গল্প না করলে ভালো লাগে না।

'আপা থ্যাংক য়্যু।'

'আজ কী নিয়ে গল্প করবি?'

'আমি তো আপা গল্প করতে পারি না। তুমি গল্প করবে আমি শুনব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী গল্প শুনতে চাস?'

'কলেজে কী মজাটজা কর সেই সব বল।'

'কলেজে কোনো মজাটজা করি না। মজা মজা ভাব করি—এই পর্যন্তই।'

'তোমার মজা মজা ভাবের গল্প কর আমি শুনি। আমার নিজের কোনো মজা করতে ইচ্ছে করে না—অন্যের মজা শুনতে খুব ভালো লাগে। হাসান ভাইয়া হঠাৎ হঠাৎ যখন আসে তুমি মুখটুখ লাল করে তাঁর সঙ্গে গল্প কর। আমার কী যে ভালো লাগে! কিন্তু আপা আমি কোনোদিনও এ রকম করতে পারব না। একটা ছেলের সঙ্গে আমি গল্প করছি—ভাবতেই পারি না।'

'গল্প করায় সমস্যাটা কী?'

'কী গল্প করব—"আমি তোমাকে ভালবাসি" এইসব বলব। ভাবতেই তো গা শিরশির করছে।'

'একটা ছেলে আর মেয়ে যখন গল্প করে তখন কেউ কিন্তু বলে না—আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'বলে না কেন?'

'ভালবাসার কথা বলার দরকার হয় না।'

'হাসান ভাই তোমার সঙ্গে কী নিয়ে গল্প করে?'

'ও কী গল্প করবে? ও চুপচাপ থাকে।'

'তুমি একা বকবক করে যাও?'

'হুঁ।'

'কী নিয়ে বকবক কর?'

'ভালো যন্ত্রণা হল দেখি! আমি কি মুখস্থ করে রেখেছি নাকি?'

'হাসান ভাইয়ের কোন জিনিসটা তোমার সবচে ভালো লাগে আপা?'

'জানি না। এই সব নিয়ে ভাবি নি।'

'একজন ছেলের প্রেমে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ, আর তাকে কী জন্যে ভালবাস তা জান না?'

'তুই হঠাৎ এমন বকবক শুরু করলি কেন?'

নাদিয়া বলল, আর করব না।

'আয় শুয়ে পড়ি।'

নাদিয়া লজ্জিত গলায় বলল, ছাদে যাবে আপা?

তিতলী বিস্মিত গলায় বলল, রাত তিনটার সময় ছাদে যাবি মানে? তোর মাথায় আসলে ছিট টিট আছে।

নাদিয়া মাথা নিচু করে হাসছে।

তিতলী চিন্তিত গলায় বলল, শোন নাদিয়া আমার কেন জানি সন্দেহ হচ্ছে তুই রাতদুপুরে এ রকম একা একা ছাদে যাস। যাস নাকি?

নাদিয়া হাসছে। বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসছে।

'এ রকম করে হাসছিস কেন?'

'আমি সহজভাবেই হাসছি তোমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। চল না আপা ছাদে যাই। দশ মিনিটের জন্যে।'

'বৃষ্টিতে ছাদ পিছল হয়ে আছে।'

'অকারণে অজুহাত তৈরি করবে না তো আপা। তুমি যদি এখন আমার সঙ্গে ছাদে যাও তাহলে তোমাকে মন খুশি হয়ে যাবার মতো একটা কথা বলব।'

তিতলী বোনের সঙ্গে ছাদে গেল। নিশিরাতের ছাদ গা কেমন জানি ছমছম করে। তিতলী বলল, তুই একা একা ছাদে এসে কী করিস?

'কিছু করি না। আকাশের তারা দেখি।'

‘আমাকে কী কথা বলবি বলেছিলি বলে ফেল। কী সে কথা যা শুনলে আমার মন ভালো হয়ে যাবে?’

নাদিয়া হাসতে হাসতে বলল, কোনো কথা না আপা। তোমাকে ছাদে আনার জন্যে এটা হল আমার একটা ট্রিকস। সরি।

‘ট্রিকস করার দরকার ছিল কি? আমাকে বললেই আমি আসতাম।’

‘না আসতে না। আচ্ছা আপা আমার একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করছে। তুমি যদি রাগ না কর তাহলে বলি।’

‘রাগ করব না—বল।’

‘আগে প্রতিজ্ঞা কর যে রাগ করবে না।’

‘তোর এইসব প্রতিজ্ঞা ফতিজ্ঞা ছেলেমানুষি আমার ভালো লাগে না—বললাম তো রাগ করব না। কথাটা কী?’

নাদিয়া মুখ নিচু করে প্রায় ফিসফিস করে বলল, তুমি কি কখনো হাসান ভাইকে চুমু খেয়েছ আপা?

তিতলী স্তম্ভিত হয়ে গেল। নাদিয়ার মতো মেয়ে যে এ রকম অশালীন একটা কথা বলতে পারে তা তার কল্পনাতেও আসে নি। হতভম্ব ভাব সামলিয়ে তিতলী বলল, তুই এসব কী বলছিস! পড়াশোনা করতে করতে তোর কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে?

‘সরি আপা।’

‘আমি খুব রাগ করেছি। অসম্ভব রাগ করেছি।’

‘তুমি কিন্তু বলেছিলে রাগ করবে না।’

‘আমি তো বুঝতে পারি নি তুই এ ধরনের কথা বলতে পারিস।’

‘আর কোনোদিন বলব না আপা। তুমি কি খুব বেশি রাগ করেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নটার জবাব দাও নি।’

‘তারপরেও তুই জবাব চাচ্ছিস?’

‘হ্যাঁ। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। আমি তো কল্পনাও করতে পারি না আপা একটা মেয়ে কী করে একটা ছেলেকে চুমু খাবে।’

তিতলীর ইচ্ছে করছে বোনের গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে কঠিন গলায় বলল, চল নিচে যাই।

‘আপা তোমার মনটা তো খুব বেশি খারাপ হয়েছে—এখন তোমার মন ভালো করে দিচ্ছি। তোমাকে আমি বলেছিলাম না যে তোমার মন খুশি হবার মতো একটা কথা বলব। এটা কোনো ট্রিকস না—সত্যি। কথাটা হচ্ছে কাল তুমি যখন নিউমার্কেটে গিয়েছিলে তখন হাসান ভাই এসেছিলেন।’

‘কখন, সকালে?’

‘হুঁ।’

‘কাল দিন গেল, আজকের দিন গেল তুই বলিস নি কেন?’

‘তোমাকে চমকে দেবার জন্যে জমা করে রেখেছিলাম। হাসান ভাই যখন এলেন তখন বাবা বাসায় ছিলেন না। কাজেই আমি উনাকে যত্ন করে বসালাম। অনেক গল্প করলাম।’

‘কী গল্প করলি।’

‘উনি তো গল্প করতে পারেন না। আমি একাই গল্প করলাম।’

‘তুই গল্প করতে পারিস নাকি?’

‘মাঝে মাঝে আমি খুব মজা করে গল্প করতে পারি। হাসির কথা বলতে পারি। আমি মানুষের গলার স্বরও নকল করতে পারি।’

‘সে কী!’

'আমি তোমার গলার স্বর নকল করে হাসান ভাইকে শুনিয়ে দিলাম—উনি খুব হেসেছেন।'

'তোর যে এমন গোপন প্রতিভা আছে তা তো জানতাম না।'

'হাসান ভাই তোমার জন্যে একটা চিঠি আমার কাছে দিয়ে গেছেন। এই নাও চিঠি। খামে বন্ধ চিঠি—এই চিঠি দিতেও তাঁর কী সংকোচ! আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, হাসান ভাই ভয় নেই আমি চিঠি পড়ব না। আমার উপর রাগ কি তোমার একটু কমেছে আপা? মনে হচ্ছে কমেছে। চল নিচে যাই। তোমার নিশ্চয়ই চিঠি পড়ার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে।'

তিতলী নিজের ঘরে এসে চিঠি খুলল। একটু দূর থেকে খুব আগ্রহ নিয়ে নাদিয়া বোনের দিকে তাকিয়ে আছে। দু পাতার চিঠি। পুরো পাতাজুড়ে গুণ চিহ্ন আঁকা। তিতলী লজ্জা পেয়ে হাসল। এই গুণ চিহ্নের মানে শুধু তারা দুজনই জানে।

নাদিয়া বলল, এত লম্বা চিঠি এত তাড়াতাড়ি পড়া শেষ হয়ে গেল?

'হুঁ।'

'এখন কী করব? বাতি নিভিয়ে দেব? শুয়ে পড়বে?'

'হুঁ।'

বাতি নিভিয়ে নাদিয়া বোনের সঙ্গে ঘুমোতে এল। বোনের বুকে খানিকক্ষণ মাথা ঘষে আদুরে গলায় বলল, আপা গুণ চিহ্নের মানে কী? চুমু? বলেই নাদিয়া খিলখিল করে হাসল। হাসি থামলে চাপা গলায় বলল—সরি আপা তোমার চিঠি আমি পড়েছি। লোভ সামলাতে পারি নি। তুমি যদি এখন শাস্তি হিসেবে ধাক্কা দিয়ে আমাকে খাট থেকে ফেলে দিতে চাও ফেলে দিতে পার। আমি কিচ্ছু মনে করব না।

তিতলী বোনকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল।

AMARBOI.COM

৭

সন্ধ্যা এখনো হয় নি কিন্তু ঘরের ভেতর অন্ধকার। দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতরে বাতি জ্বালানো হয় নি। বাতাস ভারি হয়ে আছে। বাতাসে সিগারেটের কটু গন্ধ। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বমির গন্ধ। খালি পেটে হুইস্কি খাওয়ার ফল ফলেছে—সাখাওয়াত বমি করে ঘর ভাসিয়েছে। সাখাওয়াতের মদ্যপানের অভ্যাস নেই। গত কয়েকদিন খুব খাচ্ছে—আজ বেশি খেয়ে ফেলেছে। বমি করেও তার উৎসাহ কমে নি—হানড্রেড পাইপারের বোতল উঁচু করে বলল, আর মাত্র তিন আঙ্গুল আছে। আয় সবাই এক আঙ্গুল করে খেয়ে বোতল ফেলে দিই।

রকিব জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল। তার প্যাকেটের শেষ সিগারেট। ঘরে আর কারো কাছেই সিগারেট নেই। রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কয়েক প্যাকেট সিগারেট এনে রাখা দরকার ছিল। এখন ঘর থেকে বের হয়ে সিগারেট আনা ঠিক হবে না। রাত ন'টায় একসঙ্গে বের হতে হবে।

সাখাওয়াত চারটা গ্লাসে হুইস্কি ঢালছে। মাপমতো ঢালার চেষ্টা করছে। তার হাত কাঁপছে। বদরুল বলল, এই সাখাওয়াত তোর মুখে বমি লেগে আছে মুখ ধুয়ে আয় না!

সাখাওয়াত হাসিমুখে বলল, আর মুখ ধোয়াধুয়ি। আগে মাল খেয়ে নি।

রকিব বলল, তিন গ্লাসে ঢাল আমি খাব না।

'খাবি না কেন?'

'তোর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে? খেতে ইচ্ছা করছে না, খাব না।'

'শালা তোর বাপ খাবে।'

রকিব ক্রুদ্ধচোখে তাকাল। তার চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে। সাখাওয়াত ভীত গলায় বলল, এ রকম করে তাকাচ্ছিস কেন?

রকিব বলল, বাপ তুলে আর যদি কথা বলিস তোর নিজের বমি তোকে চেটে খাইয়ে দেব।

'ঠাট্টা করছিলাম রে দোস্ত। থাক তোর খেতে হবে না—তোরটা আমি খাব। এই দেখ খাচ্ছি।'

রকিব মুখ ফিরিয়ে সিগারেট টানছে। ঘড়িতে মাত্র ছ'টা বাজে। ন'টা বাজতে এখনো তিন ঘণ্টা। এই দীর্ঘ সময় শুধু শুধু বসে থাকতে হবে ভাবতেই তার মাথা ধরে যাচ্ছে। তার উপর সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

ঘরের এক কোনায় বিড়ি ব্যবসায়ী হাজি মুসাদ্দেক পাটোয়ারী বসে আছেন। তাঁর হাত পেছন দিক করে বাঁধা। তিনি ভয়ে অস্থির হয়ে আছেন। যদিও এখন তাঁর ভয় থাকার কথা না। তাঁর পরিবার থেকে তিন লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। রাত ন'টার সময় তাকে একটা বেবিট্যাক্সিতে তুলে দেয়া হবে। সেই বেবিট্যাক্সি নিয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন।

হাজি মুসাদ্দেক পাটোয়ারী বিড়বিড় করে বললেন, বাবা আপনাদের দয়ার কথা কোনোদিন ভুলব না। আমি খাস দিলে আপনাদের জন্যে দোয়া করি।

হাজি সাহেব কথাগুলো আন্তরিকভাবেই বললেন। তিনি বেঁচে আছেন এবং তাঁকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে এই আনন্দেই তিনি অভিভূত।

'বাবারা একটা কথা।'

মোজাম্মেল কঠিন গলায় বলল, অকারণ কথা বলবেন না। চুপচাপ থাকেন। ন'টা বাজুক ছেড়ে দিব।

'বাবারা একটু পিশাব করব।'

'পিশাব ন'টার পরে করবেন। বাড়িতে গিয়ে আরাম করে পিশাব করবেন। কমোডে বসে করবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

সাখাওয়াত বলল, হাজি সাহেবকে একটু মাল খাইয়ে দিব? আমি আর খেতে পারছি না।

কেউ কোনো জবাব দিল না। সাখাওয়াত উৎসাহের সঙ্গে বলল, কী হাজি সাহেব, হুইস্কি খাবেন?

'বাবারা আপনারা বললে অবশ্যই খাব।'

সাখাওয়াত আনন্দিত স্বরে বলল, হাজি সাহেব হুইস্কি খেতে চায়।

রকিব বলল, সাখাওয়াত তুই বাড়াবাড়ি করছিস।

সাখাওয়াত সাথে সাথে বলল, ঠাট্টা করছি রে দোস্ত। আমি কি আর সত্যি খাওয়াতাম! তোরা আমাকে ভাবিস কী?

ছড় ছড় শব্দ হচ্ছে।

সবাই হাজি সাহেবের দিকে তাকাল। হাজি সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, পিশাব হয়ে গেছে বাবারা। বয়স হয়েছে, ডায়াবেটিস আছে। বাবারা কিছু মনে করবেন না। আপনাদের দয়ার কথা আমি কোনোদিন ভুলব না। আমি খাস দিলে আপনাদের জন্যে দোয়া করি।

'ঘ্যানঘ্যান করবেন না। চুপ থাকেন।'

'বাবারা একটু পানি খাব।'

রকিব বলল, সাখাওয়াত দেখ তো পানি আছে কি না।

সাখাওয়াত অপ্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়াল। এটা সাখাওয়াতের বোনের বাড়ি। বোন মিডল ইস্টে তার স্বামীর কাছে গিয়েছে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সাখাওয়াতের কাছে দেয়া। মাঝেমধ্যে সাখাওয়াত বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা বসাত। নিরিবিলিতে বাড়ি। রাতভর হইচই করে আড্ডা দিলেও কেউ কিছু বুঝবে না। দু দিন দু রাত হাজি সাহেবকে এই বাড়িতে রাখা হয়েছে। তাঁকে ছেড়ে দিলেও তিনি এই বাড়ি চিনে বের করতে পারবেন না। তাঁকে আনা হয়েছে গভীর রাতে—কম্বল দিয়ে মুড়ে। তাঁকে ছাড়াও হবে এই ভাবে। সাখাওয়াত পানির বোতল এনে দিল। রকিব বলল, গ্লাস দে। হাত বাঁধা, পানি খাবে কীভাবে? হাতের বাঁধন খুলে দে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজি সাহেব অনবরত নিচু গলায় বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। সাখাওয়াত বলল, বিড়বিড় করে কী বলেন?

'বাবারা দুরুদ শরিফ পড়তেছি। আপনাদের ডিসটার্ব হলে পড়ব না।'

'পাকসাফ হয়ে দুরুদ পড়বেন। পেশাব করে ঘর ভাসিয়ে দুরুদ শরিফ।'

'বাবারা আমি খুবই শরমিন্দা। আমি পায়ে ধরে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাই।'

হাজি সাহেব রকিবের পায়ে ধরার জন্যে এগোলেন। রকিব কঠিন গলায় বলল, যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। খবরদার নড়বেন না।

'জ্বি আচ্ছা বাবা।'

সাখাওয়াত বাঁধন খুলতে পারছে না। সাহায্য করার জন্য বদরুল এগিয়ে গেল। সে বিরক্ত গলায় বলল, হাজি সাহেবের গা তো পুড়ে যাচ্ছে। হাজি সাহেব বললেন, সামান্য জ্বর হয়েছে বাবারা। বাড়িতে গেলে ইনশাল্লাহ্ আরোগ্য হব।

'পুলিশের কাছে বা অন্য কারো কাছে আমাদের নাম বলবেন না তো?'

'জ্বি না বাবারা। পাক কোরআনের দোহাই, নবীজীর দোহাই কাউরে কিচ্ছু বলব না। কোরআন মজিদ নিয়া আসেন কোরআন মজিদে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করব।'

রকিব ঘড়ি দেখল। ছ'টা পঁয়ত্রিশ। মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট পার হয়েছে। আরো দুই ঘণ্টা পঁচিশ মিনিটই পার করতে হবে। সর্বনাশ! এত সময় পার করবে কীভাবে? সাখাওয়াত বলল, দোস্ত সিগারেট দে।

'সিগারেট নাই।'

'সর্বনাশ! সিগারেট ছাড়া চলবে কীভাবে? প্যাকেটটা খুলে দেখ না ফাঁকেফুকে থাকতেও পারে।'

'সাখাওয়াত তুই কথা বেশি বলছিস। চুপ থাক।'

'তুই ঝিম ধরে বসে আছিস কেন? তোর কী হয়েছে?'

'চুপ থাক।'

'শালা তুই চুপ থাক।'

রকিব উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় কষাল। সাখাওয়াত উল্টে পড়ল তার নিজের বমিতে।

হাজি সাহেব বিড়বিড় করে আবারো দুরুদ শরিফ পড়ছেন। তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। এরা কি তাকে সত্যি ছাড়বে?

রাত ন'টায় হাজি সাহেবকে বেবিট্যাক্সিতে তুলে দেয়া হল। তিনি বসেছেন মাঝখানে, একপাশে বদরুল অন্যপাশে সাখাওয়াত। বদরুল হাজি সাহেবের মাথা চেপে ধরে আছে, যাতে তিনি কিছু দেখতে না পান। তারা কিছুদূর গিয়ে নেমে পড়বে। হাজি সাহেব একা একা যাবেন। হাজি সাহেব বিড়বিড় করে আবারো বললেন, বাবারা আপনাদের দয়ার কথা কোনোদিন ভুলব না। আমি আপনাদের জন্যে খাস দিলে দোয়া করি।

রকিব এক প্যাকেট বেনসন সিগারেট কিনল। চমনবাহার দেয়া মিষ্টি পান কিনল এক খিলি।

তিন লাখ টাকার ভাগাভাগিতে তার অংশে পড়েছে এক লাখ তিরিশ। সে আরো বেশি নিতে পারত, নেয় নি। এক লাখ টাকা আলাদা করে রাখতে হবে। কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দেয়াও দরকার। পাসপোর্ট করে ইন্ডিয়া ঘুরে এলে হয়। তিন হাজার টাকা ফিস দিলে চব্বিশ ঘণ্টায় পাসপোর্ট হয়। ইন্ডিয়ায় দেখার অনেক কিছু আছে। কোনারকের সূর্যমন্দিরটা নাকি দেখার মতো। কোনারক কোথায় কে জানে? খোঁজ নিতে হবে। পাসপোর্ট করতে ছবি লাগে। ছবিটা আজকে তুলে ফেললে কাল পাসপোর্টের টাকা জমা দেয়া যায়। এত রাতে কি কোনো স্টুডিও খোলা আছে? আছে নিশ্চয়ই। রাত ন'টা এমন কিছু রাত না। রকিব স্টুডিওর খোঁজে রওনা হল।

আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠেছে। সুন্দর জোছনা। জোছনায় হাঁটতে রকিবের বেশ ভালো লাগছে। নতুন প্যাকেট খুলে সিগারেট ধরাল। নতুন প্যাকেটের প্রথম সিগারেটের স্বাদ আলাদা।

ক্ষিধে লেগেছে। প্রচণ্ড ক্ষিধের সময় সিগারেট ধরালে ধোঁয়াটা চট করে মাথায় গিয়ে লাগে। এখনো তাই হচ্ছে। ক্ষিধের দোষ নেই—দুপুরে কিছু খাওয়া হয় নি। শিঙাড়া-বাদাম, এখন বাজে রাত সাড়ে ন'টা ক্ষিধের দোষ কী? কোনো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকে চাইনিজ ফাইনিজ খেয়ে নিলে হয়। রেস্টুরেন্টে একা খেতে ইচ্ছে করে না। রেস্টুরেন্টে একা খেতে যাবার অর্থ—এই মানুষটার সংসার নেই, বন্ধুবান্ধব নেই। বয় বেয়ারার চোখে করুণা চলে আসে। সে করুণার ধার ধারে না।

বাসায় চলে গেলে কেমন হয়। বাসায় সবাই সকাল সকাল খেয়ে ফেলে। ভাত তরকারি কিছুই হয়তো নেই। তাতে কী, রীনা ভাবী চোখের নিমিষে চাল ফুটিয়ে একটা ডিম ভেজে দেবে। ভাপ ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে ডিমভাজা—এই তো যথেষ্ট। রীনা ভাবীর কাছ থেকে টাকাটা নেয়া হয়েছিল, টাকাটা ফেরত দেয়া দরকার। রকেট এবং বুলেটের জন্যে কিছু গিফটও কেনা দরকার। খেলনার দোকান কি খোলা আছে? গরমের সময় রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকার কথা। রকেট এবং বুলেটের পছন্দের খেলনা একটাই—বল। যখনই জিজ্ঞেস করা হয়—কী খেলনা চাই ওরা বলবে, বল। সে নিজেই ওদের চার-পাঁচটা বল দিয়েছে। ঠিক আছে—পুরোনো বলের সঙ্গে যুক্ত হোক আরো দুটা বল। বলে বলে ধুলপরিমাণ।

রকিব দুটা বল কিনল।

দোকানদার বলল, স্যার রং পেন্সিল কিনবেন? চাইনিজ পেন্সিলের সেট আছে, দাম খুব সস্তা। আশি টাকা করে।

রকিব দুই সেট পেন্সিলও কিনে ফেলল। সুন্দর সুন্দর কলম বিক্রি হচ্ছে। দেখে মনে হয় ফাউন্টেনপেন, খুললে দেখা যায় বল পয়েন্ট। কালির কলম বোধহয় পৃথিবী থেকে উঠে যাচ্ছে। একবার রীনা ভাবী বলছিল—কালির কলমে লিখতে তার সবচে ভালো লাগে। একটা কালির কলম কিনে ফেললে হয়। রকিব দেখেশুনে কালির কলমও একটা কিনল। দাম বেশি নিল পাঁচ শ টাকা। নিক রীনা ভাবীকে কখনো কোনো গিফট দেয়া হয় না।

সবার জন্যে একটা করে গিফট কিনলে কেমন হয়? কত আর টাকা লাগবে? দোকানটা ছোট। সবার পছন্দসই জিনিস এখানে পাওয়া যাবে না। গুলশানের দিকে গেলে হয়। গুলশানের দোকানগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা থাকে। লায়লার জন্যে একটা ঘড়ি কিনতে হবে। লায়লার হাতঘড়ি চুরি হয়ে গেছে আর কেনা হয় নি।

রকিব দোকান থেকে বেরোল। তার কেমন যেন মাথা ঘুরছে। শরীর মনে হয় ভেঙে আসছে। সাততলা দালান দ্রুত উঠে এলে যেমন লাগে তেমন লাগছে, অথচ আজ সে কোনো পরিশ্রমই করে নি। বলতে গেলে সারাদিনই সাখাওয়াতের বোনের বাসায় বসা। রকিব রিকশা নিল। বাসায় যাবার পরিকল্পনা বাদ দিল। তার মুখ দিয়ে নিশ্চয়ই ভক ভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে। ভাড়া ঠিক করার সময় রিকশাওয়ালা অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছিল। কথাও বলছিল উঁচু গলায়। মাতালদের সঙ্গে মানুষ সব সময় উঁচু গলায় কথা বলে। সবাই ধরেই নেয় নিচু গলায় কিছু বললে মাতালরা শুনতে পায় না।

সে মাতাল না। তার মাথা ঠিক আছে। খুব ঠিক আছে।

৮

সন্ধ্যা মিলাবার পরপর খানিকটা সময় হাসানের খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটে। মনে হয় কিছুই করার নেই। ঘরে মন টেকে না, বাইরেও মন টেকে না। ব্যাপারটা কি শুধু তার একারই হয় না কমবেশি সবার হয়? এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে তার মনে এলেও উত্তর জানার সে কোনো চেষ্টা

করে নি। এ রকম এক সন্ধ্যায় মনের অস্থির ভাব কাটাবার জন্যে সে সুমিদের বাসায় উপস্থিত হল। উপস্থিত হয়ে সে খানিকটা লজ্জায় পড়ে গেল। সুমি পড়ছে তার স্যারের কাছে। স্মার্ট ধরনের যুবক। চোখে চশমা। ঠোঁটের উপরে ঘন গোঁফ। মনে হচ্ছে সিরিয়াস ধরনের শিক্ষক। এরা ছাত্রীর সঙ্গে গল্প করে সময় নষ্ট করে না। পড়া শেষ করে যাবার সময় একগাদা হোমওয়ার্ক দিয়ে যায়। সুমির মা হাসানকে ছাড়িয়ে দিয়ে নতুন এই টিচার রেখেছেন। হাসানের উপর আস্থা রাখতে পারেন নি। ভদ্রমহিলা যদিও তাকে বলেছিলেন মেয়েকে তিনি নিজেই পড়াবেন। হাসান তাই বিশ্বাস করেছিল।

সুমি হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার আপনি কিন্তু চলে যাবেন না। এক্ষুনি আমার পড়া শেষ হবে।

সুমির এই কথাতেও তার নতুন শিক্ষক ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছে। এটিও সিরিয়াস শিক্ষকের নমুনা। সিরিয়াস শিক্ষক পড়াশোনা ছাড়া যে কোনো কথায় ভুরু কুঁচকাবেন। তিন বছরের মাথায় তাঁর কপালে পার্মানেন্ট 'ভুরু-কুঁচকা' দাগ পড়ে যাবে। হাতের রেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলার মতো 'ভুরু-কুঁচকা' দাগ দেখে বলে দেয়া যাবে ইনি একজন আদর্শ শিক্ষক।

হাসান চুপচাপ বসে আছে। ঘরের পরদা সরিয়ে সুমির মাও তাকে এক ঝলক দেখেছেন। তাকে দেখে খুশি হয়েছেন না বিরক্ত হয়েছেন হাসান তা বুঝতে পারে নি। তিনিও কি হাসানের মতো অস্বস্তিতে পড়েছেন? অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা অবশ্যি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বেশি। তারা যে কোনো পরিস্থিতি অতি দ্রুত সামাল দিতে পারে। পরম শত্রুকেও হাসিমুখে জিজ্ঞেস করতে পারে—তারপর ভাই কী খবর?

সুমির পড়া শেষ হয়েছে। তার টিচার এখন হোমওয়ার্ক দাগিয়ে দিচ্ছেন।

'সুমি।'

'জ্বি স্যার।'

'আগামীকাল আমার আসতে আধঘণ্টা দেরি হবে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'জ্বি আচ্ছা বললে হবে না, তোমার মাকে বলতে হবে, তিনি যেন আধঘণ্টা পরে গাড়ি পাঠান।'

'আমি বলব।'

নতুন টিচার উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন হাসানের দিকে। সেই দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ—'এ আবার কে?'—টাইপ দৃষ্টি।

হাসান নতুন শিক্ষকের ভাগ্যে সামান্য ঈর্ষা অনুভব করল। ইনাকে গাড়ি দিয়ে আনা-নেয়া করা হয়। হাসানের বেলা কখনো তা করা হয় নি। একবার খুব বৃষ্টি হচ্ছিল—সুমি বলল, "মা স্যারকে গাড়ি দিয়ে আসুক"। সুমির মা বলেছিলেন, ড্রাইভার আজ সারাদিন গাড়ি চালিয়েছে। এখন রেস্ট নিচ্ছে। গাড়ি বের করতে বললে রাগ করবে। হাসান ড্রাইভারকে রাগ করতে দেয় নি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রওনা হয়েছিল।

সুমি পা দোলাতে দোলাতে বলল, স্যার আজ যে আপনি আসবেন তা কিন্তু আমি জানতাম।

হাসান একটু চমকাল। জগতের অনেক বিস্ময়কর রহস্যের মতো একটি রহস্য হল আট বছরের বালিকা এবং একুশ বছরের তরুণীর কথার ভেতরও মিল আছে। তারা একই ভঙ্গিতে কথা বলে। সুমি সামনের খালি সোফায় বসেছে। পা নাচাচ্ছে। তিতলীও সুমির মতো পা নাচায়। এবং তিতলীও প্রায়ই বলে তুমি যে আজ আসবে তা কিন্তু আমি জানতাম।

'আমি যে আজ আসব তুমি জানতে?'

'জ্বি।'

'কীভাবে জানতে? শালিক দেখেছিলে?'

'শালিক দেখি নি। শালিক দেখলে তো কেউ আসে না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হয়েছে আপনি আসবেন।'

হাসান সিরিয়াস শিক্ষকদের মতো ভুরু কুঁচকে ফেলল। মেয়েটি কি সত্যি কথা বলছে? না তাকে খুশি করার জন্যে বাক্য তৈরি করছে।

'আপনি তো আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না স্যার? মা কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। যেদিন যেদিন বাবার চিঠি আসে আমি আগে আগে বলে দেই। এই জন্যেই বিশ্বাস করেছে।'

'তুমি কেমন আছ সুমি?'

'ভালো আছি।'

'তোমার নতুন স্যার কেমন?'

'ভালো।'

'আমার চেয়ে ভালো?'

'হুঁ।'

'তোমার ধারণা আমি বেশি ভালো না?'

'আপনি তো ভালো পড়াতে পারতেন না।'

'ও আচ্ছা।'

'আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?'

'না রাগ করি নি। শোন সুমি আমি তোমার জন্যে একটা বই নিয়ে এসেছি।'

'ইংরেজি বই?'

'না বাংলা। পথের পাঁচালী।'

'সত্যজিৎ রায়ের?'

'না। সত্যজিৎ রায় তো ছবি বানিয়েছিলেন—এটা মূল বই বিভূতিভূষণের লেখা।'

'বাংলা গল্পের বই পড়তে আমার ভালো লাগে না।'

হাসান বইটি বাড়িয়ে দিল। সুমি বইয়ের প্রতি তেমন আগ্রহ দেখাল না। সে পা দোলাচ্ছে এবং হাসানের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।

'হাসছ কেন সুমি?'

'এমনি হাসছি।'

'তোমার পরীক্ষা কবে?'

'পরীক্ষা দেরি আছে। আপনি এত রোগা হয়ে গেছেন কেন স্যার?'

'রোগা হয়ে গেছি নাকি?'

'হুঁ। আপনার খুব জ্বর হয়েছিল তাই না?'

'জ্বর অবশ্যি হয়েছিল। তুমি জানলে কীভাবে?'

সুমি জবাব দিল না। আগের মতো রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল এবং পা দোলাতে লাগল। ট্রেতে করে শিঙাড়া এবং চা নিয়ে সুমির মা ঢুকলেন। এটি একটি বিশেষ ভদ্রতা। অন্য সময় কাজের মেয়ে আসে।

'হাসান সাহেব কেমন আছেন?'

'জ্বি ভালো।'

'আপনার ছাত্রী আজ সকালেই বলছিল আপনি আসবেন।'

হাসান চুপ করে রইল। সুমির মা বসতে বসতে বললেন, আপনার জন্যে আপনার ছাত্রী খুব ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিন সে কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আমার সঙ্গে আপনার গল্প করবে।

'আমাকে নিয়ে গল্প করার মতো তেমন মালমসলা তো তার কাছে নেই।'

'গল্প করার জন্যে ওর কোনো মালমসলা লাগে না। বানিয়ে বানিয়ে সে অনেক কিছু বলতে পারে। আপনার অনেক ছবিও সে এঁকেছে। সেগুলো কি দেখেছেন?'

'জ্বি না।'

'সুমি স্যারকে তোমার ছবি দেখাও।'

'না।'

'না কেন? ছবিগুলো তো সুন্দর হয়েছে এনে দেখাও।'

'না।

সুমি পা দোলানো বন্ধ করে উঠে চলে গেল। তার জন্যে আনা বইটিও নিয়ে গেল না। পথের পাঁচালী পড়ে রইল অনাদরে। সুমির মা বললেন, আপনার ছাত্রী যে কিসে রাগ করে কিসে রাগ করে না তা বোঝা খুব মুশকিল। এখন রাগ করে উঠে গেল।

'রাগ করল কেন?'

'একমাত্র সেই জানে কেন। হাসান সাহেব চা খান। আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি। সামনের মাসে সুমির বাবা আসবেন—তখন আপনাকে খবর দেব। আপনি এসে আমাদের সঙ্গে একবেলা ডালভাত খাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা। আজ উঠি?'

'একটু বসুন সুমিকে ডেকে নিয়ে আসি। ওকে হ্যালো বলে যান। জানি না সে আসবে কি না।'

সুমি এল না। তবে সুমির মা প্রথমবারের মতো আর একটা ভদ্রতা করলেন। ড্রাইভারকে বললেন—হাসানকে গাড়িতে পৌঁছে দিতে। ড্রাইভার বিরক্ত হল—গাড়িতে চড়ার যোগ্য নয় মানুষকে গাড়িতে চড়তে দেবার ব্যাপারে ড্রাইভারদের খুব অনাগ্রহ থাকে।

বাজছে মাত্র আটটা। এখন বাসায় ফিরে হবে কী? ছাত্র অবস্থায় বাসায় ফেরার একটা তাড়া থাকে। বই নিয়ে বসতে হবে। এখন সেই তাড়া নেই। এম.এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দেখলে হয়। সাহসে কুলোচ্ছে না। তারপরেও মনে হয় দেয়া উচিত। তখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে তাকে বলা যাবে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষা করছি। কী করেন? 'আমি কিছু করি না' বলা খুব কষ্টের।

ড্রাইভার বিরক্ত গলায় বলল, আপনে যাবেন কই?

হাসান বলল, কোথাও যাব না। তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে নামিয়ে দিতে পার।

'আপনার বাসা কোন দিকে?'

'বাসা অনেক দূর। এতদূর আমাকে নিয়ে যাবার মতো ধৈর্য তোমার নেই—কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দাও।'

ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল। হাসান নেমে গেল। ড্রাইভারের সঙ্গে সামান্য রসিকতা করলে কেমন হয়? পকেট থেকে ছেঁড়া ন্যাতন্যাতে একটা এক টাকার নোট যদি ড্রাইভারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলা হয়—এই নাও বকশিশ। ড্রাইভারের চোখমুখের ভাব কেমন হবে? যত ইন্টারেস্টিংই হোক চোখমুখের ভাব দেখাটা ঠিক হবে না। বেকারদের অনেক কিছু নিষিদ্ধ। সেই অনেক কিছুর একটা হচ্ছে রসিকতা। বেকারদের কিছু ধর্ম আছে। তাদের সেই ধর্ম পালন করতে হয়। হাসানের স্কুল জীবনের বন্ধু জহিরের মতে বেকার ধর্মের চারটি স্তম্ভ—

(১) কচ্ছপ বৃত্তি।

সবসময় কচ্ছপের মতো নিজেকে খোলসের ভেতর লুকিয়ে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে মাথা বের করে চারপাশ দেখে আবার টুক করে মাথা ঢুকিয়ে ফেলা।

(২) গণ্ডার বৃত্তি।

চামড়াটাকে গণ্ডারের চামড়ার মতো করে ফেলা। কোনো কিছুই যেন গায়ে না লাগে। গায়ে এসিড ঢেলে দিলেও ক্ষতি হবে না।

(৩) প্যাঁচা বৃত্তি।

কাজকর্ম সবই রাতে। গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হবে রাত এগারটা থেকে বারটার দিকে যখন বেশিরভাগ মানুষই শুয়ে পড়ে।

(৪) কাক বৃত্তি।

কাকের মতো যেখানে যা পাওয়া যাবে তাই সোনামুখ করে খুঁটিয়ে খেয়ে ফেলা। কোনো অভিযোগ নেই।

বেকার ধর্মের চারটি স্তম্ভ যে মেনে চলে সে আদর্শ বেকার। তার কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাও হবে না। হাসানের নিজের ধারণা সে একজন আদর্শ বেকার। আদর্শ বেকার রাত এগারটার আগে বাসায় ফেরে না। রাত এগারটা পর্যন্ত হাসানের করার কিছু নেই। জহিরের কাছে যাওয়া যায়। জহির থাকে আগামসি লেনের এক মেসে। রাত বারটার আগে তাকে পাওয়া যাবে না। বারটা পর্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করা যায়। অনেক দিন জহিরের সঙ্গে দেখা হয় না। জহিরের "প্রোজেক্ট বাংলা হোটেলে" কিছু টাকা দিয়ে আসা যায়। গত কয়েক মাসে কোনো টাকা-পয়সা দেয়া হয় নি।

জহির নানান সময়ে নানান ধরনের স্বপ্ন দেখে, তার বর্তমান স্বপ্ন হল—সাধারণ ডালভাতের হোটেল দেয়া। বিভূতিভূষণের আদর্শ হিন্দু হোটেলের মতো আদর্শ বাংলা হোটেল। সে হোটেলে আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, করলা ভাজি, ডালের চচ্চড়ি টাইপ খাবার ছাড়া কোনো খাবার পাওয়া যাবে না। নতুন ধরনের এই হোটেল দেখতে দেখতে জমে যাবে। বন্যার স্রোতের মতো হু-হু করে টাকা আসতে থাকবে।

'বুঝলি হাসান ফালতু চাইনিজ খেতে খেতে আমাদের মুখ পচে গেছে। চাইনিজদের মতো নাকও খানিকটা ডেবে গেছে। আগে বাঙ্গালি জাতির যে খাড়া নাক ছিল এখন তা নেই। আমাদের নতুন ধরনের খাবার, নতুন ব্যবস্থা—লোকজন পাগলের মতো হয়ে যাবে। ভাত খাবার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'নতুন ব্যবস্থাটা কী?'

'পাটি পেতে খাবার ব্যবস্থা। আয়েশি ব্যবস্থা। পা ছড়িয়ে আরাম করে বসে খাবে।'

'প্যান্ট পরে তো পাটিতে বসতেই পারবে না।'

'যারা বসতে পারবে না তারা খাবে না। আমাদের হোটেল এমন হবে যারা আসবে তারা তৈরি হয়েই আসবে।'

জহির আদর্শ বাংলা হোটেল ফান্ড খুলেছে। ফান্ড চালু হয়েছে এক বছরের মতো। প্রতি মাসেই রোজগারের একটা অংশ হাসানের সেই ফান্ডে দেবার কথা। গত তিন মাস কিছু দেয়া হয় নি। ফান্ডে দেবার মতো রোজগারই হয় না—দেবে কী? আজ কিছু টাকা আছে জহিরকে দিয়ে এলে সে খুশি হবে। হাতে টাকা বেশি দিন থাকবে না। দিতে হলে এখনই দিয়ে আসা দরকার।

জহিরকে পাওয়া না গেলে সে যাবে লিটনের খোঁজে। লিটন বেচারা খুব খারাপ অবস্থায় আছে। তাকে কিছু টাকা দিয়ে আসবে। সে নিতে চাইবে না। জোর করে দিতে হবে। তার চাকরি হচ্ছে না—ঠিক আছে। কিন্তু জহিরের মতো একটা ভালো ছেলের চাকরি হবে না এটা খুব কষ্টের।

হাসান আগামসি লেনের দিকে রওনা হল। জহিরের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। হেঁটে হেঁটে যাওয়াই ভালো—সময় কাটবে। স্বাস্থ্যটাও ভালো থাকবে। বেকাররা ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় কারণ তাদের প্রচুর হাঁটতে হয়।

রাত বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও জহিরের দেখা পাওয়া গেল না। ইদানীং নাকি জহিরের ফেরার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। কয়েক দিন রাত তিনটায় ফিরেছে। এত রাত পর্যন্ত সে বাইরে কী করে তাও কেউ বলতে পারছে না। আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। এত রাতে লিটনের খোঁজে যাওয়াও অর্থহীন। হাসান রাত একটায় বাড়ি ফিরে এল।

রীনা দরজা খুলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, তুমি কোথায় ছিলে? রীনার পাশে লায়লা। সেও কাঁদছে। বেশ শব্দ করেই কাঁদছে।

হাসান অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ভাবী?

'তোমার ভাই তো মরতে বসেছিল।'

'মরতে বসেছিল মানে কী?'

রীনা কী হয়েছে বলার আগে বাচ্চা মেয়েদের মতো কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। হাসান হাত ধরে ভাবীকে চেয়ারে বসাল।

ঘটনা যা ঘটেছে তা ভয়াবহ তো বটেই।

ঘটনাটা এ রকম—তারেক অফিস থেকে ফিরে চা খেল। রীনা একবাটি মুড়ি ভেজে দিয়েছিল। সে মুড়ি খেল না। তার নাকি শরীরটা ভালো লাগছে না। রাত আটটার সময় হঠাৎ দেখা গেল তারেক শার্ট-প্যান্ট পরছে। রীনা অবাক হয়ে বলল, এত রাতে কোথায় যাচ্ছ?

তারেক বিরক্ত গলায় বলল, এত রাত কোথায় দেখলে রাত মোটে আটটা বাজে।

'যাচ্ছ কোথায়?'

'ফ্রিজ সারাইয়ের দোকানে যাব। ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে। গ্যাস ভরে দেবে।'

'রাত আটটার সময় যাবার দরকার কী? দিনের বেলা যেও।'

তারেক বিরক্ত গলায় বললেন, দিনের বেলা আমার অফিস থাকে। দিনের বেলা যাব কীভাবে?

'তাহলে থাক তোমাকে যেতে হবে না। ফ্রিজের দোকানের ঠিকানাটা দিও। হাসান যাবে।'

'সবকিছু নিয়ে হাসানকে ডাকার আমি কোনো কারণ দেখি না। ওদের সঙ্গে কথা হয়ে আছে—সামান্য ব্যাপার।'

'তুমি বলছিলে শরীরটা ভালো লাগছে না।'

'এখন ভালো লাগছে। দেখি এক গ্লাস পানি দাও।'

রীনা পানি এনে দিল। তারেক সেই পানিতে এক চুমুক মাত্র দিল। তারপর গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। রীনা খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল, যদিও অস্বস্তির তেমন কোনো কারণ নেই। রীনা বাচ্চাদের হোমওয়ার্ক শেষ করে এদের খাইয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।

বাসায় তার শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই নেই। শাশুড়ির রাগ এখনো ভাঙে নি। রীনার শ্বশুর স্ত্রীর রাগ ভাঙানোর চেষ্টা হিসেবে গত তিন দিন হল মেয়ের বাড়িতে আছেন। রীনা লায়লার সঙ্গে গল্প করতে গেল। প্রায় এক ঘণ্টার মতো গল্প করল। লায়লার সঙ্গে গল্প করার জন্যে কোনো বিষয়বস্তু লাগে না। যে কোনো বিষয়ে গল্প শুরু করলে লায়লা কীভাবে কীভাবে সেই গল্প সাজগোজের দিকে নিয়ে আসে। আজ গল্প হল ইটালিয়ান স্যান্ডেল নিয়ে। ইটালিয়ান ঘাসের স্যান্ডেল লায়লার এক বান্ধবীর বাবা মেয়ের জন্যে নিয়ে এসেছেন। লায়লা সেই স্যান্ডেল পায়ে পরে দেখেছে। তার সমস্ত হৃদয় এখন স্যান্ডেলে। তার কথা শুনে মনে হতে পারে সে তার সমগ্র পৃথিবী একজোড়া ঘাসের স্যান্ডেলের জন্যে দিয়ে দিতে পারে।

'বুঝলে ভাবী স্যান্ডেল পায়ে দিয়েছি—মনে হচ্ছে স্যান্ডেল না, পায়ে খানিকটা মাখন মেখেছি। এত সফট। আর কেমন ওম ওম ভাব।'

'ঢাকায় পাওয়া যায় না?'

'পাগল হয়েছ ভাবী—এইসব জিনিস ঢাকায় কোথায় পাবে!'

'গুলশানের দোকানে নাকি অনেক বিদেশি জিনিস পাওয়া যায়।'

'পাওয়া গেলেও সব সেকেন্ড গ্রেড জিনিস পাওয়া যায়। গরিব দেশে ভালো ভালো জিনিস এনে লাভ কী? কে কিনবে? স্যান্ডেল জোড়ার দাম কত জান?'

'কত?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইউএস ডলারে দু শ কুড়ি ডলার। ডিউটি-ফ্রি শপ থেকে কিনেছে বলে সস্তা পড়েছে। সাধারণ শপিং মল থেকে কিনলে—আড়াই শ ডলার মিনিমাম লাগত। আড়াই শ ডলার হচ্ছে—বাংলাদেশি টাকার দশ হাজার টাকা। দশ হাজার টাকা দামের স্যান্ডেল। চিন্তা করা যায় ভাবী?'

'চিন্তা করা যায় না। আমি যদি এই স্যান্ডেল পরি তাহলে আমার পায়ে ফোসকা পড়ে যাবে।'

'আমি একদিন স্যান্ডেলগুলো তোমাকে দেখাবার জন্যে নিয়ে আসব। তুমি পায়ে পরে কিছুক্ষণ হাঁটলে তোমার কাছেই মনে হবে—দশ হাজার টাকা কোনো দামই না।'

লায়লা ভাত খেতে গেল এগারটার দিকে। তারেক তখনো আসে নি। লায়লা বলল, ভাইয়া কোথায় গেছে ভাবী?

'ফ্রিজ সারাইয়ের দোকানে।'

'রাতদুপুরে ফ্রিজ সারাইয়ের দোকানে কেন?'

'কী জানি কেন? চলে আসবে।'

'আমার তো টেনশান লাগছে ভাবী। ঢাকা শহরের যে অবস্থা। আমার এক বান্ধবীর মামাকে হাইজ্যাকাররা পেটে ছুরি মেরেছে। নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়েছিল। আমি উনাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলাম।'

রীনার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল।

'ভাবী তুমি টেনশান করছ নাকি?'

'না।'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি টেনশান করছ। প্লিজ টেনশান কোরো না। তোমাকে গল্পটা বলাই ঠিক হয় নি।'

রাত এগারটার পর থেকে রীনা বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। বারান্দা থেকে রাস্তা দেখা যায়। বাসার সামনে রিকশা বা বেবিট্যাক্সি থামলে চোখে পড়ে। ফ্রিজের দোকানে তারেকের এত সময় লাগার কথা না। রাত ন'টার ভেতর দোকান বন্ধ হয়ে যাবার কথা। সে এত দেরি করছে কেন? সত্যি সত্যি হাইজ্যাকারদের হাতে পড়লে ভয়াবহ অবস্থা হবে। ছুরি মেরে ফেলে রাখলেও কেউ আগাবে না। মানুষের বিপদে এখন আর মানুষ এগিয়ে আসে না। এই যুগের নীতি হচ্ছে বিপদগ্রস্ত মানুষের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। যে যত দূরে যাবে সে তত ভালো থাকবে। টেনশানে রীনার বুক ধক ধক করা শুরু হল। তার এই অসুখ ছোটবেলা থেকেই আছে। যত দিন যাচ্ছে অসুখ তত বাড়ছে। আগে শুধু বুক ধক ধক করত। এখন শুধু যে বুক ধক ধক করে তাই না—প্রচণ্ড ব্যথাও হয়। নিশ্বাস আটকে আটকে আসে। খুব শিগগিরই ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের কাছে যেতেও ভয় লাগে। রীনা নিশ্চিত জানে—ডাক্তারের কাছে যাওয়ামাত্রই ডাক্তার ইসিজি ফিসিজি করিয়ে একগাদা খরচ করাবে। তারপর বলবে—আপনার হার্টের অসুখ আছে। একটা আর্টারি ব্লক। এনজিওগ্রাম করাতে হবে। তারচে বুকের ব্যথা সহ্য করা ভালো। এই ব্যথা বেশিক্ষণ থাকে না। টেনশান চলে যাওয়া মাত্র ব্যথাও চলে যায়।

ঠিক বারটার সময় বাসার সামনে এসে একটা বেবিট্যাক্সি থামল। হতভম্ব রীনা দেখল দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক বেবিট্যাক্সি থেকে ধরাধরি করে তারেককে নামাচ্ছে। তারেক ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না, মনে হচ্ছে মাথা এলিয়ে পড়ে যাচ্ছে। সে কি মদ টদ খেয়ে এসেছে? গল্প-উপন্যাসে এ রকম বর্ণনাই তো থাকে। মাতাল স্বামীকে বন্ধুরা পৌঁছে দিতে আসে। দুদিক থেকে দুজন তাকে ধরে রাখে। রীনা দৌড়ে এসে দরজা খুলল। তারেক এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন রীনাকে চিনতে পারছে না। মোটাসোটা ধরনের অপরিচিত ভদ্রলোক বললেন—আপা উনি কি এখানে থাকেন?

রীনা হতভম্ব গলায় বলল, ওর কী হয়েছে?

'আমরাও বুঝতে পারছি না। রাস্তার মাঝখানে চুপচাপ বসে ছিলেন। বিড়বিড় করে কী বলছিলেন। তারপর ঠিক মাঝরাস্তায় বসে পড়লেন।'

'আপনারা এইসব কী বলছেন!'

'চিন্তা করবেন না আপা। শুরুতে উনি তাঁর নাম, বাসার ঠিকানা কিছুই বলতে পারছিলেন না। শেষে বলেছেন। উনার কথামতোই আমরা এসেছি। একজন ডাক্তারের কাছেও নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তার বললেন—কাউন্ড অব নার্ভাস ব্রেক ডাউন। ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন। রাতে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে বলেছেন।'

রীনা অস্পষ্ট গলায় কী একটা বলল। কী বলল সে নিজেও বুঝতে পারল না। তারেক স্পষ্ট গলায় বলল, রীনা বাচ্চারা কি স্কুল থেকে ফিরেছে?

এই হল ঘটনা।

হাসান পুরো ঘটনা নিঃশব্দে শুনছে। রীনা ঘটনাটা খুব গুছিয়ে বললেও মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছে। রীনা যতবার কেঁদে উঠছে, লায়লাও তার সঙ্গে কেঁদে উঠছে।

'ভাইজান এখন কী করছে?'

'ঘুমাচ্ছে।'

'তুমি ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছ?'

'হুঁ।'

'তোমার সঙ্গে ভাইজানের কোনো কথা হয় নি? তুমি জিজ্ঞেস কর নি ব্যাপার কী?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম—কিছু বলে না।'

'রাতে খাওয়াদাওয়া করেছে?'

'রুটি বানিয়ে দিয়েছিলাম। একটা রুটি খেয়েছে।'

'তার মানিব্যাগ কি আছে না খোয়া গেছে?'

'মানিব্যাগ আছে।'

'যে দুজন ভদ্রলোক নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—তাদের ঠিকানা কি রেখেছ?'

'না। ঠিকানা জিজ্ঞেস করার কথা মনেও হয় নি। আমি তাদের থ্যাংকস পর্যন্ত দেই নি। মাথা তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। আমার এখন এত খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগার কিছু নেই ভাবী। এই জাতীয় কাজ যারা করে—তারা থ্যাংক-এর আশা করে না।'

'তোমার কি ধারণা তোমার ভাইজানের মাথা খারাপ হয়ে গেছে?'

'ভাইজানের কিছু হয় নি। মানুষের মাথা খুব শক্ত। চট করে খারাপ হয় না। মাথার কোনো সমস্যা হলে বাসার ঠিকানা বলতে পারত না। কাল সকালে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'যদি ঠিক না হয়?'

'অবশ্যই ঠিক হবে। ভাবী তুমি দয়া করে কাঁদা বন্ধ কর। ঘুমের ওষুধ তুমিও একটা খাও, খেয়ে ঘুমাতে যাও।'

তারেক সারা রাত মরার মতো ঘুমাল। তার পাশে তার গায়ে হাত দিয়ে রীনা বসে রইল। এক পলকের জন্যেও চোখ বন্ধ করল না।

সকালবেলা তারেক খুব স্বাভাবিকভাবে বিছানা থেকে নামল। রীনার চোখ তখন ধরে এসেছে। সে খাটে হেলান দিয়েছে, এই অবস্থাতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। চিন্তিত গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ? তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, কোথায় যাই মানে! বাথরুমে যাই—আবার কোথায় যাব?

'তোমার শরীরটা কি এখন ভালো লাগছে?'

'শরীর খারাপ লাগবে কেন?'

রাতের প্রসঙ্গ টেনে আনা ঠিক হবে কি না, রীনা বুঝতে পারছে না। মনে হয় ঠিক হবে না। সে খাটে বসে রইল। তারেকের বাথরুমে ঢোকার শব্দ, কল খোলার শব্দ, দাঁতে ব্রাশ ঘষার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ সবই শুনল কান খাড়া করে। শব্দগুলোর ভেতর কি কোনো অস্বাভাবিকতা আছে? ব্রাশ কি অন্যদিনের চেয়ে দ্রুত ঘষছে? কলটা বন্ধ করছে না কেন? পানি ছড়ছড় করে পড়েই যাচ্ছে। ব্রাশ ঘষার সময় কলটা বন্ধ করছে না কেন? কলের পানি পড়েই যাচ্ছে। স্বাভাবিক একজন মানুষ তো এই সময় কলটা বন্ধ করবে।

তারেক বাথরুম থেকে বের হয়ে বলল, রীনা চা দিতে বল তো। চা খাব।

এটাও তো অস্বাভাবিক। তারেকের কোনো অস্বাভাবিক চা-প্রীতি নেই। বাসিমুখে কখনো চা খেতে চায় না। আজ চাচ্ছে কেন? রীনা চিন্তিতমুখে রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। টগর এবং পলাশ দুজনেরই ঘুম ভেঙেছে। কমলার মা তাদের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে কলঘরের দিকে। টগর বলল, মা আমি কিন্তু আজ স্কুলে যাব না। পলাশও সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমিও যাব না।

অন্যদিন হলে রীনা কঠিন গলায় বলত, অবশ্যই স্কুলে যাবে। স্কুলে যাব না এই কথা যেন না শুনি। আজ রীনা বলল, আচ্ছা যেতে হবে না।

টগর এবং পলাশ বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছে। ব্যাপারটা তাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত যে আনন্দের বিকট চিৎকার দিতেও ভুলে গেছে।

আজ তাদের স্কুলে পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। স্কুলে নিয়ে যাবার মানুষ নেই। হাসানকে পাঠানো যায় । রীনা তা করতে রাজি না। তারেককে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। সে একা যাবে না, হাসানকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। শ্বশুর-শাশুড়িকেও বাসায় নিয়ে আসতে হবে। মাথার উপর মুরব্বি কেউ থাকলে ভরসা থাকে। যে কোনো দুশ্চিন্তার ভাগ মুরব্বিরা নিয়ে দুশ্চিন্তা হালকা করে ফেলেন। কাল তাঁর শাশুড়ি বাসায় থাকলে তিনিও রীনার সঙ্গে সারা রাত জাগতেন।

তারেক চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, তোমার চোখমুখ এমন শুকনো কেন, কী ব্যাপার?

রীনা বলল, রাতে ঘুম হয় নি।

'শোবার আগে আমার মতো গোসল করে শুবে তাহলে দেখবে ভালো ঘুম হবে।'

রীনা ইতস্তত করে বলল, কাল রাতে তুমি ফ্রিজের দোকানে গিয়েছিলে?

তারেক বলল, ফ্রিজের দোকানে যাব কেন?

'যাবে বলছিলে এই জন্যে জিজ্ঞেস করলাম।'

তারেক চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। রীনা বুঝতে পারছে না, কাল রাতের প্রসঙ্গটা নিয়ে আরো কথা বলাটা ঠিক হবে কি না। মনে হয় ঠিক হবে না। রীনা বলল, এক কাজ কর, আজ তোমার অফিসে যাবার দরকার নেই।

তারেক বলল, তোমার কথা বুঝতে পারছি না। শুধু শুধু অফিস কামাই করব কেন? খবরের কাগজ এসেছে কি না একটু দেখ তো। হকারটাকে বদলাতে হবে। ঠিক অফিসে যাবার আগে আগে কাগজ এনে দেয়। অফিসে যেতে হয় কাগজ না পড়ে।

তারেক খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাশতা খেল, অফিসের জন্যে তৈরি হতে লাগল। রীনা বলল, হাসান তোমার সঙ্গে যাবে।

'আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?'

'মতিঝিলে ওর নাকি কী কাজ আছে। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে সে তার কাজে যাবে। তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?'

তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, কী উদ্ভট কথা আমার আপত্তি থাকবে কেন?

মতিঝিলে হাসানের কোনো কাজ নেই। সে ঠিক করে রেখেছে কাজ না থাকলেও সে আজ মতিঝিলেই ঘোরাফেরা করবে। দুপুরে কোনো সস্তা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে বিকেলে ভাইকে নিয়ে একসঙ্গে ফিরবে। ভাবী বেশি রকম চিন্তিত। যদিও সে চিন্তার তেমন কিছু দেখছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান ভাইকে নামিয়ে দিয়ে ঘুরতে বের হল। বিশাল কর্মকাণ্ডের মতিঝিলের সঙ্গে তার যোগ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার। অঞ্চলটা কেমন গমগম করছে। কাজ ছাড়া হাঁটতেও ভালো লাগে। অপরিচিত এক ভদ্রলোক চোখ ইশারায় হাসানকে ডাকল। হাসান এগিয়ে গেল। ভদ্রলোক গলা নিচু করে বললেন, ডলার কিনবেন?

'জ্বি না।'

'ডলার আছে? বিক্রি করবেন?'

'জ্বি না।'

লোকটা উদাস হয়ে গেল। হাসান ভেবে পেল না তার চেহারায় ডলারের কেনাবেচার কোনো ছাপ কি আছে? ছাপ না থাকলে শুধু শুধু তার সঙ্গে ডলার নিয়ে ভদ্রলোক কথা বলবেন কেন? এরা অভিজ্ঞ ধরনের মানুষ। চোখ দেখে অনেক কিছু বলে ফেলে। এদের তো ভুল করার কথা না।

এক জায়গায় টেবিল-চেয়ার পেতে ফরম বিক্রি হচ্ছে। লোকজন লাইন দিয়ে ফরম কিনছে। হাসান কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। আমেরিকা যাবার ইমিগ্রেশন ফরম। দুদিন পর পর আমেরিকানরা একটা তাল বের করে বাংলাদেশের কিছু লোকজন তাতে মোটামুটি ভালো ব্যবসা করে। ফরম বিক্রি হচ্ছে কুড়ি টাকায়। পুরোপরি ফিলাপ করলে পঞ্চাশ টাকা।

ফরম যে বিক্রি করছে তার চোখেমুখে খুব সিরিয়াস ভাব। যেন ফরম ফিলাপ করামাত্র আমেরিকান ভিসা সে দিয়ে দেবে। সমানে বেনসন সিগারেট টেনে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ব্যবসা তার ভালোই হচ্ছে।

হাসান লাইনে দাঁড়িয়ে ফরম কিনল। সময় কাটানো দিয়ে হচ্ছে কথা। লম্বা লাইনে দাঁড়ানোয় কিছু সময় কেটে গেল। লাইনে দাঁড়ানো নিয়েও সমস্যা। একজন আগে ঢুকে পড়েছিল তাকে বের করে দেয়া হল। সে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে শাসাচ্ছে। ভালো যন্ত্রণা।

আরেক জায়গায় বিক্রি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড যাবার ফরম। এই ফরমের দামও বেশি এদের পোজপাজও বেশি। ফরমের দাম দু শ টাকা। দাম বেশি বলেই কোনো লাইন নেই। বেকারদের পকেটে দু শ টাকা থাকে না। যে ফরম বিক্রি করছে তার পেছনে নিউজিল্যান্ডের ছবি। নীল পাহাড়, পাহাড় মনে হচ্ছে লেকের পানি ফুঁড়ে বের হয়ে এসেছে। পালতোলা নৌকায় তরুণ-তরুণী। তরুণী যে পোশাক পরে আছে তাতে তাকে নগ্নই বলা যায়। যারা নিউজিল্যান্ডের ফরম কিনবে তারা অবশ্যই মেয়েটির কথা মনে রাখবে।

'ভাই আপনি কি ফরম কিনবেন?'

'জ্বি না।'

'তাহলে শুধু শুধু ভিড় করবেন না।'

'ভিড় তো করছি না আপনার এখানে তো লোকই নেই।'

হাসান চলে এল। বিমান অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর ঢুকে গেল অফিসে। এখানেও প্রচণ্ড ভিড়। এই ভিড়ের জাত আলাদা। যারা ভিড় করে আছে তাদের চোখ অনেক উজ্জ্বল। সেই চোখে স্বপ্নের ছায়া।

দুপুরে হাসান এক ছাপড়া হোটেলে খেতে গেল। ছাপড়া হোটেল হলেও কায়দাকানুন আছে। মিনারেল ওয়াটারের বোতল আছে। যারা খাচ্ছে তারাও শার্ট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক। হোটেলের মালিককে গিয়ে হাসান জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ভাই সাহেব, বড় বড় হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার কি আছে? কাস্টমারদের না খাওয়া খাবার জমা করে পরে বিক্রি করে সেই জাতীয় কিছু?

হোটেলের মালিক চোখমুখ কুঁচকে বলল, দুই নম্বরী কোনো কিছু এইখানে পাবেন না।

'কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারবেন? একটু খাওয়ার শখ ছিল।'

'জানি না। আমাদের সব টাটকা ব্যবস্থা। বাসির কারবার নাই। খেতে চাইলে হাত ধুয়ে আসেন।'

চারটার পর হাসান তার ভাইয়ের অফিসে উপস্থিত হল। সে ভেবেছিল তারেক তাকে দেখে খুব বিরক্ত হবে।

তারেক বিরক্ত হল না, অবাকও হল না। হাসানই বরং বিব্রত গলায় বলল, মতিঝিলের দিকে এসেছিলাম ভাইয়া, ভাবলাম দেখি তোমার ছুটি হয়েছে কি না। ছুটি হলে একসঙ্গে বাসায় ফিরব।

তারেক বলল, চল যাই। এখন বেবিট্যাক্সি-রিকশা কিছুই পাওয়া যাবে না। হাঁটতে হবে। আমার হাঁটতে ভালোই লাগে। এক্সারসাইজ হয়। ফোর্স সেভিংসের মতো—ফোর্স এক্সারসাইজ।

রাস্তায় নেমে তারেক নিচু গলায় বলল, তোকে একটা কথা বলি তোর ভাবী যেন না জানে। তোর ভাবী জানলে দুশ্চিন্তা করবে।

'কথাটা কী?'

'মাঝে মাঝে আমার মেমোরি লসের মতো হয়। খুবই অল্প সময়ের জন্যে হয়— কিন্তু হয়।'

'ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'এই যেমন ধর অফিস থেকে বাসায় ফিরছি। হঠাৎ মনে হয় কিছু চিনতে পারছি না। আমি কোথায় যাচ্ছি—বাসা কোথায় কিছুই মনে করতে পারি না। খুব অল্প সময়ের জন্যে হয়—কিন্তু যখন হয় তখন খুব ভয় লাগে।'

'ভয় লাগারই তো কথা।'

'একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'চল আজই চল।'

'আজ না—যাব একদিন। তোর ভাবীকে কিছু বলিস না—দুশ্চিন্তা করা হল তার নেচার।'

'তোমার মেমোরি লসের ব্যাপারটা শেষ কবে হয়েছে ভাইয়া?'

তারেক জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন যেন উসখুস করছে। চারদিকে তাকাচ্ছে। হাসান শংকিত গলায় বলল, কী হয়েছে?

তারেক বলল, কিছু হয় নি। চা খাবি?

'চা?'

'চল নিরিবিলিতে কোথাও বসে চা খাই।'

অফিস ছুটির সময় নিরিবিলি কোথায় পাওয়া যাবে? চায়ের দোকানগুলোতে রাজ্যের ভিড়। এর মধ্যেই আকবরিয়া রেস্টুরেন্টের একটা কেবিন হাসান যোগাড় করল। শিক কাবাব তৈরি হচ্ছে, তার ধোঁয়ার সবটাই সরাসরি কেবিনে ঢুকে যাচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে ভাইয়া? শিক কাবাব?'

'খাওয়া যায়।'

শিক কাবাব চলে এসেছে। নোংরা একটা বাটিতে খানিকটা সালাদ। অন্য একটা বাটিতে হলুদ বর্ণের কী একটা তরল পদার্থ। সম্ভবত টক জাতীয় কিছু। তারেক বলল, তুই খাবি না?

'না। তুমি খাও।'

তারেক আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে। মনে হয় সে দুপুরে কিছু খায় নি।

'চা দিতে বলেছিস?'

'বলেছি। কাবাব কি তোমাকে আরেকটা দিতে বলব?'

'বল।'

আরেকটা কাবাবের অর্ডার দিয়ে হাসান বসে আছে। সে তার ভাইয়ের ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছে না।

'হাসান!'

'বল।'

'আমি আসলে বিরাট একটা সমস্যায় পড়েছি। কাউকে বলতেও পারছি না।'

'সমস্যাটা কী? চাকরি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা?'

'না চাকরি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা না। পারসোনাল।'

'বল আমাকে শুনি।'

'তোর কাছে সিগারেট আছে? দে তো একটা।'

'সিগারেট তো তুমি খাও না।'

'একদম যে খাই না তা না। মাঝেমধ্যে অফিসে এসে একটা–দুটা খুচরা কিনি।'

'তুমি বস আমি তোমাকে সিগারেট এনে দিচ্ছি। কী সিগারেট খাও?'

'বাংলা ফাইভ। আর শোন যাচ্ছিস যখন জর্দা দিয়ে একটা পানও নিয়ে আসিস।'

হাসান সিগারেট–পান নিয়ে ফিরল। তারেক আনন্দিত গলায় বলল, এরা চা–টা খুব ভালো বানায়। মনে হয় আফিং টাফিং মেশায়—ভেরি গুড টেস্ট। এরপর থেকে অফিস ফেরতের সময় এদের এখানে এক কাপ করে চা খেতে হবে।

'আরেক কাপ চা দিতে বলব?'

'বল।'

'নাও ভাইয়া সিগারেট ধরাও এই নাও ম্যাচ।'

হাসান লক্ষ্য করল তার ভাইয়া সিগারেট ধরাতে পারছে না। তার হাত কাঁপছে।

'ভাইয়া!'

'হুঁ।'

'তোমার সমস্যাটা কী বল শুনি।'

'তেমন কোনো সমস্যা না। আবার তুচ্ছ করাও ঠিক না।'

'আমি তুচ্ছ করছি না, তুমি বল।'

'বলছি দাঁড়া সিগারেটে কয়েকটা টান। পান এনেছিস?'

'এনেছি।'

'জর্দা দিয়ে এনেছিস তো?'

'হ্যাঁ জর্দা দিয়েই এনেছি।'

'এই রেস্টুরেন্টটা মনে হচ্ছে খুব চালু। কাস্টমারে একেবারে গমগম করছে। ভাগ্যিস আমরা একটা ফাঁকা কেবিন পেয়েছিলাম।'

'ভাইয়া তোমার সমস্যার কথা বল।'

'আমাদের অফিসে একজন মহিলা কলিগ আছেন—নাম হচ্ছে গিয়ে লাবণী। বয়স অল্প—কুড়ি–একুশ হবে। গত বছর বি.এ. পাস করেছে পাসকোর্সে।'

'দেখতে কেমন?'

'আছে ভালোই। এভারেজ বাঙ্গালি মেয়েরা যেমন থাকে।'

'আনমেরিড?'

'বিয়ে হয়েছিল হাসবেন্ড মারা গেছে। বিয়ে হয়েছিল খুব অল্প বয়সে—ক্লাস নাইনে পড়ার সময় বিয়ে হয়। প্রেমের বিয়ে। হাসবেন্ড মারা যায় বিয়ের দু বছরের মধ্যে। সে আরিচা থেকে ফিরছিল। রাস্তায় একটা কুকুর দাঁড়িয়েছিল। কুকুরকে সাইড দিতে গিয়ে অ্যাকসিডেন্টটা হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'লাবণীর একটা মেয়ে আছে। খুবই সুইট চেহারা। মেয়েটার নাম কেয়া। লাবণীর হাসবেন্ডই শখ করে নাম রেখেছিল। কেয়া এখন ক্লাস থ্রিতে পড়ে। কলাবাগানে ওমেন ফেডারেশনের একটা স্কুলে। খুব ভালো ছাত্রী। প্রতি বছর ফার্স্ট হচ্ছে। গান জানে, নাচ জানে। টেলিভিশনের 'নতুন কুঁড়ি'তে গিয়েছিল। টিকতে পারে নি। ওইসব জায়গায় সবই তো ধরাধরির ব্যাপার। লাবণীর ধরাধরি করার কেউ নেই।'

'সমস্যার ব্যাপারটা বল।'

'না মানে হয়েছে কী, একদিন অফিসে কাজ করছি লাবণী এসে খুব লজ্জিত গলায় বলল, সে ক্যান্টিনে আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে চায়। আমি একটু অবাক হলাম, তবে এর মধ্যে দোষের কিছু দেখলাম না। চা খেতে গেলাম। সেইখানেই লাবণী বলল যে আমার চেহারা স্বভাব চরিত্র সব নাকি তার হাসবেন্ডের মতো।'

'তাই নাকি?'

'লাবণী তার হাসবেন্ডের একটা সাদাকালো ছবিও নিয়ে এসেছিল। মিল কিছুটা আছে। তবে সে যতটা বলছে ততটা না। তবে মেয়ে মানুষ তো বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দেখে।'

'লাবণী কি তোমাকে প্রায়ই ক্যান্টিনে নিয়ে চা খাওয়াচ্ছে?'

'আরে না। ও সেই রকম মেয়েই না।'

'তোমার কামরায় প্রায়ই আসে?'

'এক অফিসে কাজ করছি। আসবে না। ধর আমি একটা চিঠি টাইপ করতে দিলাম—চিঠি নিয়ে তাকে তো আসতেই হবে।'

'সমস্যাটা কোথায়?'

তারেক বলল, না সমস্যা আবার কী? সমস্যা কিছু না।

'তুমি যে বললে তুমি একটা সমস্যায় পড়েছ।'

'লাবণীকে দেখে খারাপ লাগে—এই আর কী? দুঃখী মেয়ে। একে তো রূপবতী মেয়ে, তার উপর অল্প বয়স, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিধবা টাইটেল। এই তিন সাইনবোর্ডের মেয়ে আমাদের দেশে টিকতে পারে না। লাবণী থাকে তার বড় বোনের সঙ্গে। বেশ ভালোই ছিল। ইদানীং সমস্যা হচ্ছে। বড় বোনের হাসবেণ্ডের ভাবভঙ্গি সুবিধার মনে হচ্ছে না। গত সপ্তাহে ওই হারামজাদা রাত তিনটার সময় লাবণীর দরজায় টোকা দিয়েছে। লাবণী দরজা খুলে হতভম্ব। লাবণী বলল, দুলাভাই কী ব্যাপার? হারামজাদাটা বলে কী—মাথা ধরেছে তোমার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট আছে? লাবণী কি তার ঘরে ফার্মেসি দিয়েছে যে তার কাছে ঘুমের ট্যাবলেট খুঁজতে হবে?'

'এইসব গল্প কি লাবণী তোমার সঙ্গে করেছে?'

'হ্যাঁ। দুঃখের কথা ঘনিষ্ঠ দু-এক জনের কাছে বললে মনটা হালকা হয়।'

'তুমি কি তার ঘনিষ্ঠজন?'

তারেক জবাব দিল না। পান মুখে দিল। হাসান বলল, ভাইয়া তুমি কি প্রায়ই লাবণীদের বাসায় যাও?

তারেক বলল, আরে না। প্রায়ই যাব কী! মাঝেমধ্যে যাই। কেয়ার জন্মদিন হল। জন্মদিনে গেলাম। সেও গত সপ্তাহে। এই সপ্তাহে এখনো যাই নি।

হাসান বলল, ভাইয়া চল উঠি।

তারেক উঠে দাঁড়াল।

হাসান বলল, ভাইয়া একটা কথার জবাব দাও তো। তুমি কি লাবণী মেয়েটার প্রেমে পড়েছ?

তারেক জবাব দিল না। ভাইয়ের চোখের দিকে সরাসরি তাকালও না। তবে তাঁর মুখে এক ধরনের শান্তি শান্তি ভাব দেখা গেল। যেন ভাইকে ব্যাপারটা বলতে পেরে সে শান্তি পেয়েছে।

তারেকের অফিসে যাবার পর থেকে রীনার মন উতলা হয়ে ছিল। বাড়িওয়ালার বাসা থেকে সে অফিসে একবার টেলিফোনও করেছিল। তারেকের সঙ্গে কথা হয়েছে তাতেও রীনার উতলা ভাব দূর হয় নি। দুপুরে সে তার শাশুড়িকে নিয়ে এল। রীনার শাশুড়ি এতদিন রাগ করে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় মেয়ের বাসায় ছিলেন। কঠিন রাগ। অনেক চেষ্টা করেও ভাঙানো যাচ্ছিল না। আজ তারেকের ঘটনা শুনে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছেন। তিনি বাসায় পা দেয়ামাত্র রীনার মনে হয়েছে—আর ভয় নেই। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

মনোয়ারা তসবি টিপতে টিপতে রীনার কাছে পুরো ঘটনা দুবার শুনলেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, বউমা কোনো চিন্তা করবে না। একটা মুরগি ছদকা দিয়ে দাও। আর শোন—সন্ধ্যার পর বাড়ি থেকে বের হতে দেবে না। যা কাজকর্ম দিনে করবে। সন্ধ্যার পর সংসার দেখবে। চিরকালের নিয়ম। রীনা বলল, মা আপনি একটু বলে দেবেন।

মনোয়ারা বললেন, আমি তো বলবই। বিয়ের পর মার কথার ধার থাকে না। তার উপর আমি হলাম পরগাছা মা। ছেলের রক্ত চুষে বেঁচে আছি। আমার কথার দাম কী। তুমি বলবে। শক্ত করে বলবে।

'জ্বি আচ্ছা।'

'বিবাহিত ছেলে সন্ধ্যার পর ঘরের বাইরে থাকবে এটা কেমন কথা!'

শাশুড়ির কথা রীনার এত ভালো লাগল। তার মনের সমস্ত চিন্তাভাবনা এক কথায় উড়ে গেল। বিকেলে আরো আনন্দের ব্যাপার হল। রকিব একগাদা উপহার নিয়ে বাসায় উপস্থিত। পলাশ এবং টগরের জন্যে দুটা ফুটবল। তার জন্যে কালির কলম। লায়লার জন্যে ঘড়ি। রীনার কাছ থেকে ধার করা টাকাটাও ফেরত দিল। রীনা হতভম্ব গলায় বলল, তুমি এত টাকা পেলে কোথায়?

রকিব বলল, কিছুদিন ধরে একটা ফার্মের সঙ্গে থেকে একটা পার্টটাইম চাকরি করেছি। ওরা থোক কিছু টাকা দিয়েছে।

'কত টাকা?'

'সেটা তোমাকে বলব না। ভাবী শোন আজ রাতে ভালোমন্দ কিছু রান্না কর তো। পোলাও-কোরমা-রোস্ট। আমি বাজার করে নিয়ে আসছি।'

সন্ধ্যা হয়েছে।

বাচ্চারা ফুটবল নিয়ে খেলছে। তাদের চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। রকিব গিয়েছে বাজার করতে। তারেক ও হাসান দুজনই ফিরেছে। আশ্চর্য কাণ্ড—তারেক তার জন্যে একটা শাড়ি কিনে এনেছে। আহামরি কিছু না—সবুজ জমিন লাল পাড়। তবুও তো সে কিনল। এই প্রথম তারেক তার জন্যে শাড়ি কিনল।

তারেক গম্ভীর গলায় বলল, শাড়িটা পর দেখি।

রীনা লজ্জিত গলায় বলল, হঠাৎ শাড়ি কেন?

'আনলাম আর কী? সবুজ রং কি তোমার পছন্দ না?'

'খুব পছন্দ।'

রীনার লজ্জা লাগছে। আনন্দও লাগছে। তার চোখ ভিজে উঠছে। সে বুঝতে পারছে না এত সুখী আল্লাহ তাকে কেন বানিয়েছেন!

৯

বিবাহিত পুরুষ সন্ধ্যার পর ঘরে থাকবে। সন্ধ্যায় সে ঘরে ফিরবে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে সময় কাটাবে। মনোয়ারার এই কথাগুলো রীনার খুব মনে ধরলেও সে জানে এটা অসম্ভব একটা ব্যাপার। পুরুষমানুষ মানেই—একটা অংশ ঘরের বাইরে। ভালো না লাগলেও এটা স্বীকার করে নিতে হবে। রীনা স্বীকার করে নিয়েছে।

তারেককে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে জামাকাপড় পরতে দেখেও চুপ করে রইল। তারেক বলল, দেখি একটা চিরুনি দাও তো চুলটা আঁচড়াই। রীনা চিরুনি এনে দিল এবং হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জিতমুখে বলল, মাথাটা নিচু কর—চুল আঁচড়ে দেই। বিয়ের পর অনেক দিন রীনা তারেকের চুল আঁচড়ে দিয়েছে। তারপর এক সময় সংসারে টগর-পলাশ এল—রীনা ব্যস্ত হয়ে পড়ল সংসার নিয়ে। অফিসে যাবার সময় স্বামীর চুল আঁচড়ানো বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়াটা ঠিক হয় নি। তার অবশ্যই উচিত ছিল স্বামীর জন্যে কিছুটা সময় আলাদা করে রাখা। রাখলে তারেকের বাইরে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসটা নিশ্চয়ই কিছু কমত।

'তোমার চুল খুব লম্বা হয়েছে। চুল কাটাও না কেন?'

'কাটাব।'

'সন্ধ্যাবেলা যাচ্ছ কোথায়?'

তারেক বলল, নাপিতের কাছে যাব। চুল কাটাব। চুল লম্বা হয়ে কানে লাগছে— অসহ্য।

রীনার মনটা খারাপ হয়ে গেল। তারেক মিথ্যা কথা বলছে। সন্ধ্যাবেলা সে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে যাচ্ছে না। চুল কাটার প্রসঙ্গ উঠেছে বলেই সে ফট করে বলল, চুল কাটাতে যাচ্ছি। মানুষটা গুছিয়ে মিথ্যা কথাও বলতে পারে না। বেচারা।

তারেক বলল, জুতার ব্রাশটা দাও তো। জুতাজোড়া কালি করি।

রীনা নিজেই জুতা কালি করতে বসল। তারেক মোজা পায়ে অপেক্ষা করছে। রীনার কেমন যেন মায়া লাগছে। এই মায়ার উৎস সে জানে না। রীনা বলল, সেজেগুজে নাপিতের কাছে চুল কাটাতে যাচ্ছ?

তারেক বলল, সাজের কী দেখলে? জুতা ময়লা হয়েছিল।

'ফিরতে দেরি হবে?'

'দেরি হবে কেন? চুল কাটাতে যতক্ষণ লাগে।'

রীনার মনে হল সে শুধু শুধুই সন্দেহ করছিল। বেচারা আসলে চুল কাটাতেই যাচ্ছে। সরল ধরনের মানুষের কর্মকাণ্ডও সরল প্রকৃতির হয়। নাপিতের দোকানে যে জুতা ব্রাশ করে যাবার দরকার নেই তা মনে থাকে না।

তারেক চলে যাবার পর রীনার নিজেকে খুব একলা মনে হতে লাগল। সবাই কাজকর্ম করছে শুধু তার কিছু করার নেই। টগর-পলাশ তার দাদুভাইয়ের সঙ্গে পড়তে বসেছে। তার শাশুড়ি বসেছেন জায়নামাজে। ন'টার আগে তিনি উঠবেন না।

লায়লা পড়ছে। তার পড়া বাচ্চাদের মতো। শব্দ করে সে পড়া মুখস্থ করে।

হাসান আজ বের হয় নি। ঘরে আছে। তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করা যায়। রীনার ইচ্ছা করছে না। মাকে চিঠি লিখবে। অনেকদিন মাকে চিঠি লেখা হয় না। রকিবের দেয়া কলমটায় এখনো কিছু লেখা হয় নি। রীনার মনে হল প্রথম চিঠিটা মাকে না লিখে তারেককে লিখলে কেমন হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার সে তার স্বামীকে এখন পর্যন্ত কোনো চিঠি লেখে নি। চিঠি লেখার প্রয়োজন হয় নি। বিয়ের আগে তাদের পরিচয় ছিল না যে চিঠি লেখালেখি হবে। বিয়ের পর থেকে তো তারা একসঙ্গেই আছে। চিঠি লেখার দরকার কী? আজ একটা চিঠি লিখে ফেললে কেমন হয়? রীনা কাগজের খোঁজে লায়লার ঘরে ঢুকল। লায়লা সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করে হাসিমুখে তাকাল।

'এক টুকরা কাগজ দিতে পারবে লায়লা?'

'হ্যাঁ পারব। ভাবী তোমাকে আজ এমন দুঃখী দুঃখী লাগছে কেন?'

'দুঃখী দুঃখী লাগছে?'

'খুব দুঃখী দুঃখী লাগছে। বোস, বল তোমার কী দুঃখ?'

'আমার কোনো দুঃখ নেই লায়লা।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। তোমার মনে কি কোনো দুঃখ আছে?'

'হুঁ।'

'কী দুঃখ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বলা যাবে না, বললে তুমি হাসবে।'

'মানুষের দুঃখ শুনে আমি হাসব। আমি কি এতই খারাপ?'

লায়লা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার দুঃখটা খুবই হাস্যকর। আমার সব সময় মনে হয় আমার বিয়েটিয়ে হবে না।

'বিয়ে হবে না কেন?'

'চেহারা ভালো না। রঙেও ময়লা।'

'তোমার চেহারা ভালো না কে বলল? আর শ্যামলা মেয়েদের বুঝি বিয়ে হয় না? সবচে ভালো বিয়ে হয় শ্যামলা মেয়েদের এটা কি তুমি জান?'

'না জানি না। সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। তোমার বিয়ে নিয়ে তুমি কোনো দুশ্চিন্তা কোরো না তো লায়লা। যথাসময়ে বিয়ে হবে।'

'আমার বিয়ে নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। কোনো সম্বন্ধ আসে না—তোমরাও তো কখনো কিছু বল না।'

'তোমার সামনে বলি না। তবে আড়ালে সবসময় বলি। অনেক ছেলে দেখাও হয়েছে।'

'সত্যি ভাবী?'

'অবশ্যই সত্যি। দেখি এখন আমাকে একটা কাগজ দাও।'

লায়লা কাগজ দিতে দিতে লজ্জিত গলায় বলল, ভাবী নিজের বিয়ে নিয়ে এতগুলো কথা বললাম, আমার এখন খুব লজ্জা লাগছে।

'লজ্জার কিছু নেই। তুমি পড়াশোনা কর।'

লায়লা সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করতে শুরু করল। লায়লার জন্যে রীনার খুব মায়া লাগছে। তার বিয়ে নিয়ে আসলেই কোনো কথাবার্তা হচ্ছে না। হওয়া উচিত। রীনা নিজের ঘরে ঢুকে চিঠি লিখতে বসল। সে দীর্ঘ সময় নিয়ে তার স্বামীকে ছোট্ট একটা চিঠি লিখল। সেই চিঠি পড়ে নিজেই খুব লজ্জা পেল। চিঠিটা ড্রয়ারের অনেক নিচে লুকিয়ে রাখল। আজই চিঠি দিতে হবে এমন না। কোনো এক সময় দিলেই হবে। রীনা বারান্দায় এসে বসল। তার একা ভাবটা কাটছে না।

AMARBOI.COM

হাসানের ঘর বন্ধ। সে বিছানায় উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। তিতলীর কাছে চিঠি। তেমন এগোচ্ছে না। 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এ ছাড়া তিতলীকে তার লেখার কিছু নেই। সে কোনো বড় লেখক বা কবি হলে এই বাক্যটি ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখতে পারত। লেখালেখির হাত তার একেবারেই নেই। আমি তোমাকে ভালবাসি ছাড়া তিতলীকে তার আর কী লেখার আছে? "তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে"—হ্যাঁ এই বাক্যটাও লেখা যায়। তিতলীকে তার সবসময় দেখতে ইচ্ছা করে। বিয়ের পরেও কি এই ইচ্ছাটা থাকবে? নাকি প্রেমে ভাটা পড়বে? দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে চোখমুখ শক্ত করে ঝগড়া করবে? হাসান লিখল,

তিতলী

তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে।

হাতের লেখাটা ভালো হল না। অক্ষরগুলো কেমন জড়িয়ে গেছে। তার হাতের লেখা ভালো না। তিতলীর হাতের লেখা অপূর্ব। গোটা গোটা অক্ষর। জড়ানো না, পেঁচানো না। প্রতিটা অক্ষর আলাদা। প্রতিটি শব্দ হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

দরজায় টক টক শব্দ হল। হাসান ভুরু কুঁচকে তাকাল। যতক্ষণ দরজা খোলা থাকে, কেউ আসে না। দরজা বন্ধ করামাত্র দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। সে কাগজ-কলম নিয়ে বসার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনবার উঠে দরজা খুলতে হয়েছে। এবারেরটা নিয়ে হবে চতুর্থবার। অথচ মাত্র একটা লাইন লেখা হয়েছে।

'কে?'

'রীনা।'

হাসান ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামল। রীনা ভাবীর কিছু কিছু ব্যাপার আছে বেশ মজার। সবাই 'কে?' প্রশ্নের জবাবে বলে আমি। একমাত্র রীনা ভাবীই 'কে?'-র উত্তরে বলবে—রীনা।

'দরজা বন্ধ করে কী করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না। উপুড়পটাং হয়ে পড়েছিলাম।'

'উপুড়পটাং আবার কী?'

'চিৎপটাং-এর উল্টোটা উপুড়পটাং।'

'চিঠি লিখছিলে?'

'হুঁ।'

'তোমার সেই তিতলী বেগমকে?'

'হুঁ।'

'মেয়েটাকে একদিন নিয়ে আসতে পার না?'

'পারি।'

'একদিন নিয়ে এসো। জমিয়ে আড্ডা দেব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার এই চিঠি কি এক্ষুনি লিখতে হবে, না কিছুক্ষণ পরে লিখলেও হবে?'

'পরে লিখলেও হবে।'

'আমি আসলে তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। বাচ্চারা পড়ছে। একা একা আমার দেখি কিছু ভালো লাগছে না।'

'গল্প কর—আমি শুনি।'

রীনা খাটের এক মাথায় বসতে বসতে বলল, আমি কোনো গল্প করব না। আমার কাছে গল্প নেই। তুমি সারা শহর ঘুরে বেড়াও তুমি গল্প কর আমি শুনি।

'হিশামুদ্দিন সাহেবের গল্প বলব? তাঁর জীবন কাহিনী।'

'দূর দূর—তার জীবন কাহিনী শুনে কী হবে? একটা লোক একগাদা টাকা করেছে বলেই তার জীবন কাহিনী শুনতে হবে?'

কমলার মা ট্রে নিয়ে ঢুকল। ট্রেতে দু কাপ চা। রীনা বলল, গল্প করার প্রস্তুতি দেখছ। কমলার মাকে বলেছি—আধঘণ্টা পর পর দু কাপ করে চা দিয়ে যেতে।

হাসান বলল, তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুমি আসলে গল্প শুনতে আস নি। কিছু বলতে এসেছ? সেটা কী?

'তুমি কি মিসির আলি হয়ে গেছ? ভাবভঙ্গি দেখে মনের কথা বলে ফেলছ। শুনুন মিসির আলি সাহেব—আমি গল্প শুনতেই এসেছি—কিছু বলতে আসি নি।'

'ভূতের গল্প শুনবে ভাবী?'

'ভূতের গল্প শোনা যেতে পারে। তবে ঝড়বৃষ্টির রাত ছাড়া ভূতের গল্প জমে না। তুমি জমাতে পারবে তো?'

'পারব। আমি যে কজনকে এই গল্প বলেছি তারা সবাই যে রাতে এই গল্প বলেছি সেই রাতে ঘুমোতে পারে নি। গল্পটা ঠিক ভূতেরও না। একটা ফ্যামিলিতে দুটা কিশোরী মেয়ে খুন হয় তার গল্প।'

'বল শুনি।'

'দাঁড়াও একটা সিগারেট খেয়ে নি।'

হাসান সিগারেট বের করল। রীনা চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, গত কয়েকদিন ধরে তোমার ভাই একটা অদ্ভুত ব্যাপার করছে—এর মানেটা কী বল তো।

'অদ্ভুত ব্যাপারটা কী?'

'যেমন ধর—পরশুদিন রাতে ঘুমোতে গেছি। বাতি নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকতেই সে বলল—লাবণী আমার মনে হয় মশারির ভেতর মশা আছে। বাতি জ্বালিয়ে মশাগুলো মেরে নাও।'

হাসান তাকিয়ে আছে। ভাবীর গল্প করতে আসার কারণটা এখন তার কাছে পরিষ্কার হয়েছে।

'হাসান।'

'জ্বি ভাবী।'

'তোমার ভাইয়ের এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ কী? মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে সে নিশ্চয়ই লাবণী নামের কোনো মেয়ের কথা ভাবছিল। মাথার মধ্যে সেই নামটা ঘুরছিল। ফস করে মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়েছে।'

'তুমি কিছু জিজ্ঞেস কর নি?'

'না। আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই বাতি জ্বালিয়ে মশা মারলাম। তারপর বাথরুমে হাত ধুয়ে ঘুমোতে গেলাম। সারারাত আমার এক ফোঁটা ঘুম হল না। তোমার ভাই অবশ্যি তার স্বভাবমতো কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকিয়ে ভস ভস করে ঘুমোতে শুরু করল।'

'সামান্য একটা কারণে তোমার সারারাত ঘুম হল না?'

'কারণটা তুমি যত সামান্য ভাবছ তত সামান্য না। আরো একবার এ রকম হয়েছে। আমাকে রীনা ডাকার বদলে লাবণী ডেকেছে।'

'সেটা কবে?'

'সপ্তাহখানেক আগে। সকালে নাশতা খেতে বসেছে—হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, লাবণী দেখ তো খবরের কাগজ দিয়ে গেছে কি না। আমি খবরের কাগজ এনে দিলাম। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে খবরের কাগজ পড়তে লাগল।'

'আর তুমি চিন্তায় অস্থির হলে।'

'চিন্তায় অস্থির হওয়াটা কি অন্যায়?'

'অবশ্যই অন্যায়। ভাইয়াকে তুমি চেন। চেন না?'

'মানুষকে চেনা কি এতই সহজ?'

'ভাইয়াকে চেনা খুবই সহজ। ভাইয়া হচ্ছে পানির মতো।'

'হাসান তুমি একটা ভুল উপমা দিলে। পানি মোটেই সহজ বস্তু না। পানি অতি জটিল। পানি একমাত্র দ্রব্য যা কঠিন হলে আয়তনে বাড়ে।'

'পানি আয়তনে বাড়লেও ভাইয়া বাড়ে না। ভাইয়া খুবই সাধারণ সহজ সরল একজন মানুষ। লাবণী ফাবনী নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না তো ভাবী।'

রীনা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, ওদের অফিসে লাবণী নামে একটা মেয়ে আছে। ওদের সঙ্গে কাজ করে। নতুন এসেছে।

হাসান হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপারটা তো তাহলে আরো সহজ হয়ে গেল। ভাইয়া মেয়েটাকে চেনে। তার নামটা মনে আছে। সে হয়তো দেখতেও অনেকটা তোমার মতো। থুতু দেখে যক্ষ্মা ভেবে বসবে না ভাবী। মেয়েদের স্বভাব হচ্ছে থুতু দেখলে যক্ষ্মা ভাবা।

'আর ছেলেদের স্বভাব কী? যক্ষ্মা দেখলে থুতু ভাবা?'

'আমার ভূতের গল্পটা কি তোমাকে এখন বলব?'

'বল।'

'তাহলে পা তুলে খাটে হেলান দিয়ে আরাম করে বস।'

'বসলাম।'

'তোমার মুখের চামড়া এখনো শক্ত হয়ে আছে। রিলাক্স কর।'

'তুমি তোমার গল্প শুরু কর তো।'

'দাঁড়াও আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে নি।'

'হাসান তুমি আজকাল বেশি সিগারেট খাচ্ছ। সিগারেটের গন্ধে তোমার ঘরে ঢোকা যায় না।'

হাসান গল্প শুরু করল। সে লক্ষ্য করল রীনা মন দিয়ে কিছু শুনছে না। তাকিয়ে আছে ঠিকই কিন্তু অন্য কিছু ভাবছে। অমনোযোগী শ্রোতাকে দীর্ঘ গল্প শোনানো খুবই কষ্টের ব্যাপার। হাসান বলল, গল্পটা কেমন লাগছে ভাবী?

'ভালোই তো।'

'শেষ করব, না বাকিটা আরেক দিন শুনবে?'

'কেমন যেন মাথা ধরেছে। বাকিটা আরেক দিন শুনব। তুমি আজ বরং তোমার চিঠি শেষ কর।'

'ভাবী তোমার কি মন খারাপ?'

'না মন খারাপ না। কেমন যেন একা একা লাগছে।'

'ভাইয়া বাসায় নেই?'

'উঁহঁ। নাপিতের কাছে চুল কাটাতে গেছে।'

'রাতদুপুরে চুল কাটাচ্ছে?'

রীনা হালকা গলায় বলল, নাপিতের কথা বলে অন্য কোথাও যেতে পারে। আচ্ছা হাসান ছেলেরা ঘরের চেয়ে বাইরে থাকতে বেশি পছন্দ করে কারণটা কী?

'জানি না ভাবী।'

'আমি মনে মনে একটা কারণ খুঁজে বের করেছি। আমার ধারণা, অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন পশু শিকার করে বেঁচে থাকত তখন থেকেই ব্যাপারটার শুরু। পুরুষরা শিকারে বের হত। মেয়েরা সন্তানের দেখাশোনা করত। ওই যে পুরুষদের বাইরে থাকা অভ্যাস হয়ে গেল—সেই অভ্যাস আর যায় নি।'

'ভালো বলেছ তো ভাবী!'

'তোমাদের পক্ষে বলেছি তো তাই ভালো।'

রীনা উঠে তার ঘরে চলে গেল। হাসান চিন্তিতমুখে বসে রইল। তিতলীর চিঠিটা শুরু করা দরকার। ঘোর কেটে গেছে লিখতে ইচ্ছে করছে না।

তারেক বাসায় ফিরল রাত এগারটায়। তার হাতে দড়িবাঁধা মাঝারি সাইজের একটা কাতল মাছ। রীনা বলল, রাতদুপুরে মাছ আনলে কোত্থেকে?

আড়ঙের সামনে হাতে নিয়ে নিয়ে মাছ বিক্রি করে। ধানমণ্ডি লেকের মাছ। এক ব্যাটা জোর করে গছিয়ে দিয়েছে। সস্তা পড়েছে—এক শ টাকা।

'তুমি খেয়ে এসেছ?'

'হুঁ।'

'কী দিয়ে খেলে?'

তারেক কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, সাধারণ খাবার—ভাজাভুজি। তবে নতুন একটা জিনিস খেলাম কালিয়াজিরার ভর্তা। একটু তিতা তিতা, তবে খেতে ভালো। কালিয়াজিরার ভর্তা দিয়ে এক প্লেট ভাত খেয়ে ফেলেছি।

লাবণীর কাছ থেকে রেসিপি নিয়ে এসো, আমিও কালিয়াজিরা ভর্তা বানাব।

তারেক অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা। বলেই চমকে গেল। রীনার কাছে সে বলে গেছে নাপিতের কাছে যাচ্ছে। সেখানে রীনা হুট করে লাবণীর প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছে এবং সেও স্বীকার করে ফেলেছে। তারেক অসহায় ভঙ্গিতে বলল, এক কাপ চা খাব রীনা।

রীনা স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, হাতমুখ ধোও চা নিয়ে আসছি।

'চিনি দিও না। একটা বয়সের পরে চিনি ছেড়ে দেয়া দরকার।'

'আচ্ছা চিনি কমই দেব।'

তারেক শোবার ঘরের চেয়ারে বসে আছে। বিছানায় টগর এবং পলাশ দুই ভাই জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। তারা ঘুমোয় দাদাদাদির সঙ্গে, আজ এখানে চলে এসেছে। ওদেরকে দাদির ঘরে পার করতে হবে। কাজটা করতে হবে খুব সাবধানে—একবার ঘুম ভেঙে গেলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করবে।

রীনা চা এনে তারেকের সামনে রাখল। টগরকে খুব সাবধানে কোলে নিয়ে রওনা হল। তারেক বলল, হাসানের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে এসো তো। রীনা বলল, আচ্ছা।

তারেক চায়ে চুমুক দিচ্ছে। সে খুবই অসহায় বোধ করছে। রীনা যদি আবারো লাবণীর প্রসঙ্গ তোলে সে কী বলবে। হুট করে রীনা লাবণীর প্রসঙ্গ তুললই বা কেন? হাসান কি তাকে কিছু বলেছে? বলার তো কথা না।

'এই নাও সিগারেট।'

'থ্যাংক য়ু্য।'

'তুমি দেখি পুরোপুরি সিগারেট ধরে ফেলছ।'

'আরে না টেনশানের সময় দু-একটা খাই?'

'এখন কি তোমার টেনশানের সময়?'

'কী যে বল টেনশানের কী আছে! তুমি কি ভাত খেয়েছ?'

'না, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'ব্যাপারটা কী তোমাকে বলি—'

'কিছু বলতে হবে না।'

'আরে শোন না। বোস তো খাটে।'

রীনা খাটে বসল। তারেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল—আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার শামসুল কাদের সাহেবের গলব্লাডার অপারেশন হয়েছে। সাকসেসফুল অপারেশন, হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দিয়েছে। বাসায় এসে আবার আগের মতো ব্যথা। ডাক্তার বলল ব্যথাটা সাইকোলজিক্যাল। ব্যথা হবার কোনো কারণ নেই। যাই হোক আমি দেখতে গেলাম, গিয়ে দেখি আমাদের অফিসের লাবণী। সেও দেখতে এসেছে। তার বাসা কাদের সাহেবের বাসার সামনে। রাস্তার এ মাথা ও মাথা। ফেরার সময় লাবণী বলল, স্যার আমার বাসাটা দেখে যান। এমন করে ধরল না যাওয়াটা অভদ্রতা হয়। গেলাম। লাবণীর বাবা ছিলেন বাসায় তিনি না খাইয়ে ছাড়বেন না। এই হল ঘটনা।

রীনা বলল, তোমার সিগারেট খাওয়া তো হয়েছে। চল শুয়ে পড়ি।

তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, চল। সে খুবই ভালো বোধ করছে। খুব গুছিয়ে সে সুন্দর একটা মিথ্যা গল্প ফেঁদেছে। গল্পটা বলেছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে। রীনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে গল্পটা বিশ্বাস করছে। মেয়েরা সত্যির চেয়ে মিথ্যাটাকে সহজে গ্রহণ করে।

'রীনা।'

'হুঁ।'

'একটা পান দাও না। চা খেয়ে মুখটা মিষ্টি হয়ে আছে। ঘরে পান আছে না?'

'আছে।'

রীনা পান আনতে গেল। তারেক বেশ আয়েশ করে পা নাচাচ্ছে। সে বেশ আনন্দিত। তাৎক্ষণিকভাবে জটিল একটা মিথ্যা তৈরির আনন্দ। রীনা এই গল্পটা বিশ্বাস করেছে জটিলতার কারণে। কারণ রীনা জানে তার ভেতরে কোনো জটিলতা নেই।

রীনা পান দিয়ে মশারির ভেতর ঢুকল। মশারিভর্তি মশা। এত মশা ঢোকে কীভাবে কে জানে। মশারিতে কোনো ফুটা কি আছে? ফুটা তো চোখে পড়ছে না।

'পান খাওয়া শেষ হলে বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে এসো।'

'আচ্ছা।'

'বাড়িওয়ালার টাকাটা তুমি এখনো দিচ্ছ না। উনি আজো এসেছিলেন।'

'দিয়ে দেব।'

'কবে দেবে সেটা পরিষ্কার করে বল, আমি সেই ভাবে তাঁকে বলব। রোজ আসেন, বিশ্রী লাগে।'

'সামনের সপ্তাহে দেব। শনি-রোববারে আসতে বোলো।'

'আচ্ছা।'

'নাপিতের কাছে আর যাও নি না?'

'গিয়েছিলাম, এত ভিড়!'

রীনা জেগে আছে। বিছানায় শোয়ামাত্র তার ঘুম আসে না। গভীর রাত পর্যন্ত সে জেগে থাকে। আজ তার ঘুম একেবারেই আসবে না। তারেকের মতো একটা মানুষ কী করে জটিল একটা গল্প ফাঁদল এটা তার মাথাতেই আসছে না। খুব সহজ যে মানুষ তার ভেতরেও কি জটিল একটা অংশ লুকিয়ে থাকে? ঠিক তেমনি ভয়াবহ জটিল মানুষের একটা অংশে কি থাকে শিশুর সারল্য? পুরোপুরি সহজ কিংবা পুরোপুরি জটিল মানুষ কি এই পৃথিবীতে হয় না?

তারেক বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম। সুখী মানুষের নিদ্রা। মানুষটা কি সত্যি সুখী? একজন সুখী মানুষকে জটিল মিথ্যা গল্প বানাতে হয় না। জটিল সব গল্প অসুখী মানুষেরা তৈরি করেন।

রীনা সাবধানে খাট থেকে নামল। তার কেমন যেন গা জ্বালা করছে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে থাকলে গা জ্বালা ভাবটা হয়তো বা কমবে।

হাসানের ঘরে বাতি জ্বলছে। সে মনে হয় চিঠি লিখছে। ভালবাসার চিঠি। রীনা তার এই জীবনে ভালবাসার কোনো চিঠি পায় নি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার কেউ তাকে কখনো বলে নি—আমি তোমাকে ভালবাসি। তারেকও না। সোজা সরল মানুষরা ন্যাকামি ধরনের কথা বলে না।

AMARBOI.COM

১০

সোমবার তিতলীর তিনটা ক্লাস। তিনটাই পর পর। ন'টার মধ্যে শুরু হয়ে বারটার মধ্যে সব ক্লাস শেষ। ঝড়-বৃষ্টি-টর্নেডো যাই হোক না সোমবার বারটায় হাসান লালমাটিয়া কলেজের আশপাশে ঘোরাঘুরি করে। এক জায়গায় থাকে না। একেক দিন একেক জায়গায়। তিতলীর দায়িত্ব হচ্ছে কলেজ থেকে বের হয়ে তাকে খুঁজে বের করা। একদিন সে হাসানকে পেয়েছে নাপিতের দোকানে মাথা মালিশ করাচ্ছে। কুৎসিত দৃশ্য। চোখ বন্ধ করে আয়েশ করে সে বসে আছে। নাপিত শব্দ করে মাথা বানাচ্ছে। তিতলী তার জীবনে এমন ভীতু কোনো ছেলে দেখে নি। তিতলীর ধারণা, হাসানের তুলনায় তার সাহস অনেক বেশি। যেমন—হাসান কখনো তাকে নিয়ে রিকশায় উঠবে না। কোথাও যেতে হলে বেবিট্যাক্সি নেবে। বেবিট্যাক্সির সিটের দু প্রান্তে দুজন বসে থাকলে নাকি বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না। বেবিট্যাক্সিতে উঠেও শান্তি নেই—হাসান বলবে, তিতলী ওড়নাটা দিয়ে নাক আর মুখ ঢেকে রাখ। নাকমুখ ঢাকা থাকলে মানুষ চেনা যায় না। তোমার পরিচিত কেউ যদি তোমাকে দেখেও ফেলে চিনতে পারবে না।

'চিনতে পারলে চিনবে। তোমাকে এত ভাবতে হবে না। তুমি সহজ হয়ে বস তো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে 'উইজার্ড অব ওজের' কাঠের পুতুল।'

অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি হাসান কখনো তিতলীর হাত ধরে না। বেবিট্যাক্সিতে উঠে হাত ধরার কাজটা তিতলীকে করতে হয়। হাত ধরার পর হাসান বাইরের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন ভেতরে কী হচ্ছে তা সে জানে না।

ছেলেদের এত ভীতু হলে মানায় না। ছেলেরা হবে সাহসী, বেপরোয়া। তাদের দাবি থাকবে অনেক বেশি। মেয়েরা সেই সব দাবি সামলে সুমলে মোটামুটি একটা সাম্যাবস্থায় নিয়ে আসবে। এটাই নিয়ম। যে ছেলের দাবি এক শ তাকে দেবে কুড়ি কিন্তু এমন ভাব করতে হবে যেন সত্তর দেয়া হয়ে গেল। হাসানের বেলায় সব নিয়ম উল্টো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় তিতলীর অনেক সাহসী দাবি সে সামলে সুমলে চলছে।

ফার্স্ট পিরিয়ড শেষ হবার পর জানা গেল বাকি দুটা ক্লাস হবে না। ক্লাস না হওয়া সবসময়ই আনন্দজনক ব্যাপার। তিতলীর আনন্দ হচ্ছে না। কারণ, তাকে বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। বারটার পর হাসানকে খুঁজে বের করতে হবে। এই দু ঘণ্টা সময় কী করা যায়? কলেজ ক্যান্টিনে চা খাওয়া যায়। দশ মিনিট গেল সেখানে—তারপর? লাইব্রেরিতে যাবে? অসম্ভব। লাইব্রেরিতে গেলেই তার মাথা ধরে যায়। সঙ্গে কোনো গল্পের বই নেই। গল্পের বই থাকলে কোনো একটা ফাঁকা ক্লাসরুমে বসে গল্পের বই পড়া যেত।

তিতলী ক্যান্টিনের দিকে এগোচ্ছে। ক্যান্টিনে কাউকে পেলে তাকে নিয়ে আড়ঙে চলে যাওয়া যায়। আড়ঙে শাড়ি নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা কেটে যাবে।

'এই তিতলী!'

তিতলী তাকাল—নাসরিন হাত ইশারা করে ডাকছে। তার তাকানো এবং হাত ইশারার ভঙ্গি সবই রহস্যময়। নববর্ষে নাসরিন খেতাব পেয়েছে সর্পিণী। নাসরিন লম্বা ও ছিপছিপে। সর্পিণী নাম তার জন্যে মানানসই। সাপ যেমন প্রতিবছর খোলস ছাড়ে নাসরিনও নাকি খোলস ছাড়ে। তবে তার জন্যে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় না। পছন্দের কোনো মানুষ তাকে খোলস ছাড়তে বললেই নাকি সে ছাড়ে।

তিতলী অপ্রসন্নমুখে নাসরিনের দিকে এগিয়ে গেল।

আশপাশে কেউ নেই। তবু নাসরিন গলা নামিয়ে বলল, তোর কাছে পঞ্চাশটা টাকা আছে? সহজ স্বাভাবিকভাবে সে কোনো কথাই বলতে পারে না। তার সবকিছুতেই খানিকটা রহস্য।

'না।'

'তাহলে ভালো একটা জিনিস মিস করলি। আমার কাছে পাঁচটা ছবি আছে। একেকটা ছবি দেখতে দশ টাকা করে লাগবে।'

'কী ছবি?'

'কী ছবি বুঝতে পারছিস না? ওইসব ছবি—হুঁ হুঁ।'

'ওইসব ছবি দেখার আমার কোনো শখ নেই।'

'না দেখেই বলে ফেললি? ছবিগুলো সব টিভি স্টারদের। এদের কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথায় হাত দিয়ে বসে যাবি।'

'আমার মাথায় হাত দিয়ে বসার দরকার নেই। তুই ছবি দেখিয়ে টাকা নিচ্ছিস আশ্চর্য তো!'

'টাকা না নিলে হবে? পাঁচটা ছবি আমাকে কি কেউ মাগনা দিয়েছে। নগদ টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। গলাকাটা ছবি না। একজনের মুখ কেটে আরেকজনের শরীরে বসানো না। জেনুইন ছবি।'

'বুঝলি কী করে জেনুইন ছবি?'

'যে দেখবে সেই বুঝবে জেনুইন ছবি। তুই দশ টাকা দিয়ে একটা ছবি দেখ। তারপর যদি তোর মনে হয় ছবি জেনুইন না, আমি টাকা ফেরত দেব।'

'কোনো দরকার নেই। ছবি দেখার পর তাদের নাটক দেখব তখন শরীর ঘিনঘিন করবে।'

'আচ্ছা যা তোর টাকা লাগবে না। তোকে বিনা টাকায় দেখাব। আমাকে চা আর আলুর চপ খাওয়া। দারুণ ক্ষিধে লেগেছে।'

ক্যান্টিনে এখন ভিড় কম। টিফিন টাইমে বসার জায়গা থাকে না। আজ ফাঁকা ফাঁকা। সর্পিণী তিতলীকে নিয়ে কোনার দিকের একটা টেবিলে চলে গেল। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে পাঁচটা ছবি বের করে তিতলীর হাতে দিল। ছবি হাতে নেবার পর তিতলীর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। সে ছবিগুলোর দিকে তাকাতেও পারছে না। আবার চোখ সরিয়েও নিতে পারছে না। নাসরিন পা নাচাতে নাচাতে শিস দিচ্ছে। শিস দেয়া বন্ধ করে সে তিতলীর দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, এই জাতীয় ছবি তুই আগে দেখিস নি?

'না।'

'তোর দেখি শরীর কাঁপছে। ফোঁসফোঁসানি শুরু হয়ে গেছে। ছবিগুলো আমার কাছে দিয়ে নরম্যাল হ।'

তিতলী ছবিগুলো দিয়ে দিল—নরম্যাল হওয়া বলতে যা বোঝায় তা হতে পারল না। এখনো তার হাতপা কাঁপছে। নাসরিন বলল, তোকে দেখে আমার ভয় লাগছে তুই বাথরুমে গিয়ে ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে আয়। আমি চায়ের অর্ডার দিচ্ছি। হাতমুখ ধুয়ে এসে চা খা।

'আমি চা খাব না। বাসায় চলে যাব।'

'ন্যাকামি করিস না তো। তোর ন্যাকামি অসহ্য লাগছে। বাসায় চলে যাবি? তোর নায়ক বারটার সময় আসবে তখন কী হবে?'

'প্লিজ চুপ কর।'

'ছবিগুলো আরেকবার দেখবি?'

'না।'

'আচ্ছা তুই একটা কাজ কর একটা ছবি আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি। তুই নিয়ে যা।'

'কী আশ্চর্য কথা! আমি ছবি নিয়ে কী করব?'

'তোর নায়ককে দেখাবি। এইসব ছবি দুজনে মিলে দেখার মধ্যে অনেক মজা। পাঁচটার মধ্যে কোনটা নিবি?'

'কী অদ্ভুত কথা! আমি কোনোটা নেব না।'

'এক কাজ কর পাঁচটাই নিয়ে যা। রাতে দরজা-টরজা বন্ধ করে আরাম করে দেখ। কাল নিয়ে আসিস। ক্যান্টিনে বসে টেনশানে এইসব ছবি দেখে কোনো মজা পাওয়া যায় না।'

'এই নিয়ে আর কোনো কথা বলবি না তো নাসরিন। আমি তোর কাছে হাতজোড় করছি।'

তিতলী উঠে দাঁড়াল। নাসরিন বিস্মিত গলায় বলল, তুই যাচ্ছিস কোথায়? তোর না আমাকে চা আর আলুর চপ খাওয়ানোর কথা।

'বাথরুমে যাচ্ছি। হাতমুখ ধোব।'

'সামান্য ছবি দেখে এত গরম হয়েছিস যে শীতল জলে হাতমুখ ধুয়ে শরীর ঠাণ্ডা করতে হবে?'

'নাসরিন প্লিজ।'

হাতমুখ ধুয়ে এসেও তিতলী ঠিক স্বাভাবিক হতে পারল না। মাথার ভেতরটা তার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। নাসরিন চা আলুর চপ খেল। তিতলীর কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে চলে গেল। তার নাকি আজ বাসায় ফেরার রিকশা ভাড়া নেই।

তিতলী ক্যান্টিনেই বসে আছে। তার সময় কাটছে না। এখন বাজছে মাত্র দশটা চল্লিশ। চিঠি লিখতে শুরু করলে হয়। তাহলে কিছুটা সময় কাটে। তিতলী খাতা বের করল। চিঠি লেখার জন্যে সে পাঁচ শ পৃষ্ঠার একটা খাতা কিনেছে। না পাঁচ শ পৃষ্ঠা না। সে গুনে দেখেছে চার শ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা। তিতলী ঠিক করেছে সে চার শ ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠার একটা চিঠি লিখবে। যদি শেষ পর্যন্ত লিখতে পারে তাহলে তার চিঠিই হবে কোনো মেয়ের তার প্রেমিকের কাছে লেখা

দীর্ঘতম প্রেমপত্র। মাত্র আঠার পৃষ্ঠা লেখা হয়েছে। সে একসঙ্গে বেশিক্ষণ লিখতে পারে না। তার শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে। ছবিগুলো দেখার পর আজ যেমন হয়েছিল, অবিকল সে রকম হয়।

তিতলী ঠিক করে রেখেছে চিঠি শেষ হবার পর হাসানকে সে খাতাটা দেবে তার জন্মদিনের উপহার হিসেবে। কদিন ধরে অবশ্যি অন্যরকম একটা পরিকল্পনা মাথার ভেতর ঘুরছে। এই খাতাটা বাসর রাতে হাসান ভাইয়ের হাতে দিলে কেমন হয়? হাসান ভাই বিস্মিত হয়ে বলবে এই গাব্দুস খাতাটা কিসের? সে বলবে—পড়ে দেখ। এটা একটা চিঠি চার শ ছাপান্ন পৃষ্ঠার চিঠি।

'চার শ ছাপান্ন পৃষ্ঠার চিঠি! বল কী তুমি। কী লিখেছ?'

'পড়ে দেখ?'

বাসর রাতে হাসান তার স্ত্রীকে দূরে সরিয়ে চিঠি পড়বে তা মনে হয় না। শুকনা চিঠির চেয়ে রহস্যময়ী রমণী কি অনেক প্রিয় হবার কথা না?

তিতলী চিঠিটা লিখেছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। শুরু করেছে তাদের প্রথম দেখা হবার দিন থেকে। শুরুটা ভালোই। তিতলী খাতা বের করল। খাতার প্রথম পাতায় লেখা—বাংলা দ্বিতীয় পত্র। লালমাটিয়া কলেজ। যেন হঠাৎ কারো হাতে খাতাটা পড়লে সে কিছু বুঝতে না পারে। চিঠির শুরুতে কোনো সম্বোধনও নেই।

> *"তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কবে দেখা হয়েছিল তোমার কি মনে আছে? আমি এক লক্ষ টাকা বাজি রাখতে পারি তোমার মনে নেই। আমার কিন্তু সব মনে আছে। এমনিতে আমার স্মৃতিশক্তি খুব খারাপ। কিছু মনে থাকে না। এস.এস.সি. পরীক্ষার হলে ইংরেজি রচনা ঝাড়া মুখস্থ করেছিলাম—A Journey by boat. পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি এই রচনাটাই এসেছে। সবার আগে রচনা লিখতে বসলাম। দুটা লাইন লেখার পর সব ভুলে গেলাম। এই হল আমার স্মৃতিশক্তির নমুনা। কিন্তু তোমার প্রতিটি ব্যাপার আমার মনে আছে। উয়ারীতে আমরা পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকতাম সেটা অবশ্যই তোমার মনে আছে। আচ্ছা তোমার কি মনে আছে শবেবরাতের হালুয়া নিয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠছি তুমি নামছ। হঠাৎ কী হল তুমি হুড়মুড়িয়ে গড়িয়ে আমার গায়ে পড়ে গেলে। তারপর দুজন গড়াতে গড়াতে একেবারে সিঁড়ির নিচে। পিরিচ ভেঙে তোমার ঠোঁট কেটে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। সারা গা হালুয়া দিয়ে মাখামাখি। লজ্জায় তুমি মরে যাচ্ছিলে আমার দিকে চোখ তুলে তাকানো তো অনেক পরের কথা। আমি সিঁড়ির নিচে পড়েই রইলাম তুমি রক্ত এবং হালুয়ায় মাখামাখি অবস্থাতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালে এবং দৌড়ে ফ্ল্যাটের বাইরে চলে গেলে। এই ঘটনা তোমার অবশ্যই মনে থাকার কথা। তারপরেও কিছু কিছু ব্যাপার তোমার মনে নেই যা আমার মনে আছে। যেমন ওইদিন তোমার গায়ে ছিল হালকা সবুজ রঙের একটা ফুলশার্ট। শার্টে কালো স্ট্রাইপ ছিল। ওইদিন যে তুমি দৌড়ে পালিয়ে গেলে বাসায় ফিরলে ঠিক রাত এগারটা পাঁচ মিনিটে। আমি তখন বারান্দায় বসেছিলাম। বারান্দার বাতি নেভানো ছিল। যাতে তুমি আমাকে দেখতে না পাও। তুমি কখন ফের তা দেখার জন্যেই আমি বসেছিলাম। ওইদিন কত তারিখ ছিল তোমার মনে আছে? দুই লক্ষ টাকা বাজি, তোমার মনে নেই। আমার মনে আছে—১২ তারিখ। কী বার মনে আছে? জানি মনে নেই—রোববার। এতসব খুঁটিয়ে কেন মনে রেখেছি? মেয়েদের স্বভাব হল তুচ্ছ ব্যাপারগুলো মনে করে রাখা। আমি তো সাধারণ একটা মেয়ে তাই না? শোন ওইদিনটা ছিল আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিন। ওই দিনের কথা মনে হলেই তোমার লজ্জিত, ব্যথিত মুখের কথা আমার মনে হয়। ভয়ংকর লজ্জায় ওইদিন তোমার মাথা কাটা যাচ্ছিল। তোমার চোখ ভর্তি হয়ে*

গিয়েছিল পানিতে। তুমি জলভর্তি চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলে আমার দিকে। তোমার ব্যথিত মুখ দেখে আমার কিশোরী হৃদয়ে এক ধরনের হাহাকার তৈরি হল। ইচ্ছে করল তোমার হাত ধরে বলি—এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? অ্যাকসিডেন্ট হয় না? আমি অবশ্যই বলতাম। তুমি বলার সুযোগ দিলে না দৌড়ে পালিয়ে গেলে।......"

তিতলী খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। মাত্র এগারটা বাজে। এখন একবার কলেজের বাইরে গিয়ে খুঁজে দেখা যেতে পারে। হাসান যে কাঁটায় কাঁটায় বারটার সময়ই আসবে তা তো না। বারটার আগেই তার আসার কথা। হয়তো এগারটার সময় এসে নাপিতের দোকানে বসে মাথা বানাচ্ছে। নাপিত তার নোংরা হাতে হাসানের সুন্দর চুলগুলো ছানাছানি করছে। অসহ্য। অসহ্য।

তিতলী কলেজ গেটের বাইরে এসেই দেখে রাস্তার ওপাশে হাসান দাঁড়িয়ে। তার দৃষ্টি আকাশের দিকে। হাতে চায়ের কাপ। ফুটপাতের দোকান থেকে চা কিনে বাবুর খুব আয়েশ করে চা পান করা হচ্ছে। কী অদ্ভুত মানুষ! সত্যি সত্যি এক ঘণ্টা আগে এসে বসে আছে। হাবলার মতো তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তিতলী এক দৌড়ে রাস্তা পার হল। আজ সে একটা কাণ্ড করবে চুপিচুপি হাসানের পেছনে দাঁড়িয়ে 'হালুম' করে একটা চিৎকার দেবে। এমন চিৎকার যেন হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে যায়। বেচারাকে চায়ের কাপের দাম দিতে হবে। ভালো হবে। উচিত শিক্ষা হবে। এক ঘণ্টা আগে এসে বসে থাকার শিক্ষা।

তিতলী বলল, চিঠি এনেছ?

হাসান হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। তিতলী লক্ষ্য করেছে কলেজের আশপাশে হাসান তার সঙ্গে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে ইশারায় জবাব দেবার চেষ্টা করে। তিতলী বলল, কই চিঠি দাও।

'দেব।'

'দেব টেব না, এখনই দাও।'

হাসান অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাচ্ছে। তিতলীর খুব মজা লাগছে। এমন অস্বস্তি বোধ করার কী আছে? সে কি ভয়ংকর কোনো পাপ করছে? এমন পাপ যে এক্ষুনি ফেরেশতারা এসে দোজখে ঢুকিয়ে গেটে তালা লাগিয়ে দেবে।

'কই চিঠি দিচ্ছ না কেন?'

'বললাম তো দেব। দাঁড়াও একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে আসি।'

'বেবিট্যাক্সি না। বেবিট্যাক্সিতে ভটভট শব্দ হয়। কোনো কথা শোনা যায় না। চল একটা রিকশা নিই। ওই রিকশাওয়ালাটাকে ডাক। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ভদ্র। বারবার পেছনে ফিরে আমাদের দেখার চেষ্টা করবে না। আমাদের কথা শোনার চেষ্টাও করবে না।'

হাসান একটা বেবিট্যাক্সি নিয়ে এল। তিতলী ভাব করল খুব বিরক্ত হচ্ছে তবে সে বিরক্ত হয় নি। খুশি হয়েছে। বেবিট্যাক্সিতে চিঠি পড়তে পড়তে যাওয়া যায়। রিকশায় চিঠি পড়া যায় না। সবাই তাকিয়ে থাকে।

হাসান বলল, বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে খানিকক্ষণ ঘুরবে?

তিতলী বলল, ঘুরব। আমি কিন্তু সাঁতার জানি না। নৌকা ডুবলে তুমি টেনে তুলবে।

হাসান বলল, আমিও সাঁতার জানি না।

তিতলী খুশি খুশি গলায় বলল, তাহলে চল। নৌকা ডুবলে দুজন একসঙ্গে তলিয়ে যাব। একজন পানির নিচে আরেকজন বেঁচে আছে—তাহলে খারাপ হত।

হাসান বলল, বুড়িগঙ্গায় ওইপারে আমার স্কুলজীবনের এক বন্ধু থাকে। ধূপনগর। সে মাছের খামার করেছে সেখানে যাবে?

'তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব। তুমি যদি আমাকে সস্তা কোনো হোটেলে নিয়ে যাও হোটেলের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও তাতেও আমার আপত্তি নেই।'

'এসব কী ধরনের কথা?'

'বাজে ধরনের কথা। আচ্ছা যাও আর বলব না। চল ধূপনগরে যাই। মাছের খামার দেখে আসি।'

'ধূপনগরে গেলে ফিরতে কিন্তু দেরি হবে। পাঁচটার আগে ফিরতে পারবে না।'

'দেরি হলে অসুবিধা হবে না। বাবা দেশের বাড়িতে গেছেন। রাত আটটার ট্রেনে ফিরবেন। বাসায় পৌঁছতে পৌঁছতে ন'টা।'

'তোমার মা চিন্তা করবেন না?'

'মা তো সবসময়ই চিন্তা করছেন। একদিন না হয় একটু বেশি করলেন। কই চিঠি দাও।'

হাসান চিঠি বের করল। বেবিট্যাক্সি চলছে। তিতলী হাসানের গা ঘেঁষে বসেছে। তার সমস্ত মনোযোগ চিঠিতে। চিঠির লেখক পাশে বসে আছে সেটা কোনো ব্যাপার না। হাসানের চিঠি তিতলী যেভাবে পড়ে আজ সেভাবে পড়তে পারল না। হাসানের সামনে তা সম্ভবও নয়। তিতলীর চিঠি পড়ার নিয়ম হচ্ছে—পড়ার আগে খানিকক্ষণ চিঠিটা সে গালে ছুঁইয়ে রাখবে। তারপর চিঠি পড়বে। চিঠি পড়তে পড়তে অবশ্যই তার চোখে পানি আসবে। চিঠি দিয়েই সে চোখের পানি মুছবে। চিঠি পড়তে গিয়ে চোখে যে জল এসেছে সেই জল চিঠিতেই জমা থাকুক।

তিতলী চিঠি শেষ করে নিচু গলায় বলল—তুমি লম্বা চিঠি লিখতে পার না? অনেকক্ষণ ধরে পড়া যায় এমন চিঠি? স্লিপের মতো ছোট্ট কাগজ—কয়েকটা মাত্র লাইন—পড়ার আগেই চিঠি শেষ।

হাসান কিছু বলল না। তিতলী বলল, এ পর্যন্ত তুমি আমাকে কটা চিঠি লিখেছ বলতে পারবে?

'না।'

'তবুও একটা অনুমান কর দেখি কাছাকাছি হয় কি না?'

'এক শ?'

'চুয়াত্তরটা। আজকেরটা নিয়ে চুয়াত্তর।'

'তুমি সব চিঠি জমা করে রাখ?'

'জমা করে রাখব না তো কী করব, পড়া শেষ হলেই কুচিকুচি করে ফেলে দেব?'

'ফেলে দেয়াই তো ভালো—কখন কার হাতে পড়ে!'

'হাতে পড়লে পড়বে। আমার এত ভয়ডর নেই।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু খুব সাহসী মনে হয় না। ভীরু টাইপের লাজুক লাজুক একটা মেয়ে মনে হয়।'

'আমি আসলেই ভীরু এবং লাজুক লাজুক টাইপের মেয়ে। তারপরেও প্রয়োজনের সময় আমি খুব সাহসী।'

'এটা ভালো।'

'আমিও জানি এটা ভালো। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে আছে শবনম। খুব সাহসী। টিচারদের সঙ্গে টক টক করে তর্ক করে। রাজনীতি করে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের একবার একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল তখন শবনম সমানে পুলিশের দিকে ঢিল ছুড়েছে। কিন্তু যখন সত্যিকার সাহস দেখানোর প্রয়োজন পড়ল তখন সে মিইয়ে গেল। কোনো সাহস দেখাতে পারল না।'

'প্রয়োজনটা কী?'

'সেটা তোমাকে বলব না। মেয়েদের অনেক ব্যাপার আছে—যা ছেলেদের জানা ঠিক না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। যদিও আমরা সবসময় বলি—একটা ছেলেও মানুষ, একটা মেয়েও মানুষ। তারা আলাদা কিছু না—আসলে কিন্তু অনেকখানিই আলাদা।'

হাসান হাসল। তিতলীকে নিয়ে বাইরে বের হলেই সে হড়বড় করে ক্রমাগত কথা বলতে থাকে। সেসব কথা হাসান যে খুব মন দিয়ে শোনে তা না। তবে একটা মেয়ে মনের আনন্দে কথা বলে যাচ্ছে—ব্যাপারটাই মজার।

তিতলীর কথা বলার মধ্যে আবার হাত নাড়ানাড়িও আছে। মনে হবে তার শ্রোতা একজন না। সে আসলে একদল ছাত্রছাত্রীকে বোঝাচ্ছে।

'একটা ছেলে এবং একটা মেয়ের মধ্যে আসলে কোনো মিলই নেই। শরীরের অমিল খুব ক্ষুদ্র অমিল—আসল অমিল হল মনে, মানসিকতায়। একটা ছেলের মানসিকতা এবং একটা মেয়ের মানসিকতা—আকাশ এবং পাতাল পার্থক্য। কোনো ছেলে যদি কোনো মেয়ের মনের ভেতরটা একবার দেখতে পারত তাহলে সে বড় ধরনের চমক খেত।'

'এত কিছু বুঝলে কী করে?'

'বোঝা যায়। চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যায়। বাবাকে দেখে বুঝি, মাকে দেখে বুঝি, তোমাকে দেখে বুঝি, নিজেকে দেখে বুঝি।'

'আমাকে দেখে কী বোঝ?'

'তোমাকে দেখে বুঝি যে তোমার সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে কিন্তু আমার সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে করে। আমাদের বিয়ের পর কী হবে জান?'

'কী হবে?'

'তুমি তো আর সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকবে না—অফিসে যাবে। কাজকর্ম করবে। আমি ওই সময়টা সহ্য করতে পারব না। আমার মাথা খারাপের মতো হয়ে যাবে। সেটা আবার তোমার খারাপ লাগবে। তুমি ভাববে এ কী বন্ধনে জড়িয়ে পড়লাম। আর আমি তখন বন্ধন তো আলগা করবই না আরো নতুন নতুন শিকলে তোমাকে জড়ানোর চেষ্টা করব।'

'ইন্টারেস্টিং।'

'আমি আরো অনেক ইন্টারেস্টিং কথা জানি। সে সব কথা বলছি না, জমিয়ে রাখছি—বিয়ের পর বলব।'

'তুমি যে এত সহজে বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আস অস্বস্তি লাগে না?'

'না অস্বস্তি লাগে না। উল্টোটা হয়—ভালো লাগে। বাসর রাতে তোমার সঙ্গে আমি কী নিয়ে গল্প করব সব ঠিক করে রেখেছি?'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। আমি সেই রাতে খুব মজার একটা ব্যাপার করব।'

'মজার ব্যাপারটা কী?'

'এখন বলব না। আগে বললে তো মজা থাকবে না। আচ্ছা শোন আমার ক্ষিধে লেগেছে। আজ বাসা থেকে নাশতা না খেয়ে কলেজে এসেছি।'

'নাশতা না খেয়ে এসেছ কেন?'

'মা ঢেলঢেলা একটা খিচুড়ি রান্না করেছে। মুখে দিয়েই বমি আসার মতো হয়েছে। এখন ক্ষিধেয় মারা যাচ্ছি। আচ্ছা শোন এতক্ষণ হয়ে গেছে তুমি সিগারেট খাচ্ছ না ব্যাপারটা কী? সিগারেট ধরাও। বিয়ের আগ পর্যন্ত তোমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে কিছু বলব না। বিয়ের পর—নো সিগারেট।'

'বিয়ের পর নো কেন?'

'তোমার উপর যে আমার অধিকার আছে এটা জাহির করার জন্যেই নো।'

হাসান পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। তিতলী তার ব্যাগ থেকে দেয়াশলাই বের করল। হাসানের সিগারেট ধরিয়ে দেবে। হাসানের সঙ্গে বাইরে বের হবার সময় তার ব্যাগে একটা দেয়াশলাই থাকে। সে ঠিক করে রেখেছে টাকা জমিয়ে জমিয়ে সে সুন্দর একটা লাইটার কিনবে। লাইটারটা থাকবে তার কাছে। শুধু যখন হাসান সিগারেট ঠোঁটে দেবে তিতলী ধরিয়ে দেবে।

'আজ কয়েকটা অদ্ভুত ছবি দেখেছি।'

AMARBOI.COM

'অদ্ভুত ছবি মানে?'
'না থাক ছবির ব্যাপারটা থাক।'
'তুমি আজ এমন ছটফট করছ কেন?'
'আর ছটফট করব না। আচ্ছা শোন তুমি আমার হাতটা ধরে বসে থাক না কেন? এমন দূরে সরে আছ কেন?'

সদরঘাট পৌঁছে হাসান ছইওয়ালা একটা নৌকা তিন ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করল। ঘণ্টায় পঞ্চাশ টাকা হিসেবে দেড় শ টাকা ভাড়া, পঞ্চাশ টাকা বকশিশ। সব মিলিয়ে দু শ টাকা। হাসান তার বন্ধুর বাড়িতে যাবার পরিকল্পনা বাদ দিয়েছে। হুট করে একটা মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত হলে সে কী ভাববে কে জানে। হাসানের স্কুলজীবনের বন্ধুর সঙ্গে তার মাও থাকেন। তিনি প্রাচীনপন্থী মহিলা তার কাছে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। এরচে নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়ানো ভালো। হাসান দু প্যাকেট মোরগ পোলাও, এক বোতল পানি এবং চারটা মিষ্টি পান কিনেছে। বাসা থেকে ফ্লাস্ক নিয়ে এলে ফ্লাস্কে করে চা নেয়া যেত। ফ্লাস্ক আনা হয় নি। পরের বার অবশ্যই ফ্লাস্ক আনতে হবে।

নৌকা ছোটখাটো হলেও সুন্দর। পাটাতনে শীতলপাটি বিছানো। দুটা ফুলতোলা বালিশ আছে। নৌকার বালিশ তেলচিটচিটে হয়—এই দুটা বালিশ পরিষ্কার। তিতলী বলল—মাঝিভাই শুনুন, আমরা দুজনই কিন্তু সাঁতার জানি না। নৌকা সবসময় তীরের আশপাশে রাখবেন। মাঝনদীতে যাওয়া একদম নিষিদ্ধ।

মাঝি দাঁত বের করে বলল, কিছু হইব না আফা। এক্কেবারে লিচ্ছিন্ত থাকেন।

'আচ্ছা বেশ 'লিচ্ছিন্ত' থাকব। তারপরেও শুনে রাখুন নৌকা যদি ডুবে যায়—আপনি কিন্তু আমাদের দুজনের একজনকেও বাঁচাতে চেষ্টা করবেন না। ভয় পেয়ে তখন হয়তো আমরা দুজনই 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে চিৎকার করব। আপনি আমাদের বাঁচাবেন না—নিজে সাঁতরে তীরে উঠে পড়বেন।'

মাঝি দাঁত বের করে হাসছে। মেয়েটার পাগলামি ধরনের কথায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

বেবিট্যাক্সিতে তিতলী সারাক্ষণ কথা বলছিল। নৌকা ছাড়তেই সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। পানির দিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল। তার চোখও কেমন ছলছল করছে। মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে।

হাসান বলল, তিতলী খাবার গরম আছে, হাত ধুয়ে খেয়ে ফেল। ঠাণ্ডা হলে খেতে ভালো লাগবে না।

'আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'
'তুমি না বলেছিলে ক্ষিধে লেগেছে।'
'একসময় লেগেছিল এখন ক্ষিধে নেই।'
'কী হয়েছে তিতলী?'
'কিছু হয় নি। মন খারাপ লাগছে।'
'মন খারাপ লাগছে কেন?'
'গান জানি না এই জন্যে খুব মন খারাপ লাগছে। গান জানলে তোমাকে গান গেয়ে শোনাতাম। তোমার কত ভালো লাগত।'
'আমার যথেষ্টই ভালো লাগছে।'
'আমার গানের গলা কিন্তু ভালো। বাবার টাকা-পয়সা নেই গান শিখতে পারলাম না। একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবার জন্যে মার কাছে বাবার কাছে কত কান্নাকাটি যে করেছি! বিয়ের পর তুমি কিন্তু আমাকে একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবে। তোমার টাকা থাকুক বা না থাকুক।'
'অবশ্যই কিনে দেব। আমার প্রথম চাকরির বেতনের টাকায় কিনে দেব।'

'পানিতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা কর। ঠাট্টা না সত্যি।'

হাসান পানিতে হাত রাখল। তিতলী মেয়েটাকে মাঝে মাঝে তার অদ্ভুত লাগে। ঠিক বুঝতে পারে না। একটা মেয়ের ভেতরে আসলেই অনেকগুলো মেয়ে বাস করে।

'আমি গান জানলে তোমাকে কোন গানটা গেয়ে শুনাতাম জান?'

'না—কোনটা?'

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না।"

তিতলীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে।

'কী হয়েছে তিতলী?'

'কিছু হয় নি।'

'কাঁদছ কেন?'

'বুঝতে পারছি না কেন। হঠাৎ খুব মনটা খারাপ লাগছে।'

'মন খারাপ লাগছে কেন?'

'জানি না কেন? জানলে তোমাকে জানাতাম।'

'বাসায় চলে যাবে?'

'হুঁ।'

'বেশ তো চল চলে যাই।'

তিতলী চারটার আগেই বাসায় পৌঁছে গেল এবং রাত আটটায় তার বিয়ে হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজির এক লেকচারারের সঙ্গে। ছেলের মামারা বললেন—অনুষ্ঠান পরে হবে আকদ হয়ে যাক। আজকের দিনটা খুব শুভ। ছেলের দাদি খুবই অসুস্থ। পিজিতে ভর্তি হয়েছেন। যে কোনো সময় মারা যাবেন। মৃত্যুর আগে নাতবউয়ের মুখ দেখে যেতে চান।

কীভাবে কী ঘটল তিতলী নিজেও জানে না। তিতলীর শুধু মনে আছে তার বাবা কাঁদতে কাঁদতে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুই আপত্তি করিস না মা। আমি দরিদ্র মানুষ—এমন ভালো ছেলে তোর জন্যে আমি যোগাড় করতে পারব না। তোর কী সমস্যা আমি কিছু শুনতে চাই না। মা রে তুই আমার প্রতি দয়া কর। তুই রাজি না হলে আমি বিষ খাব রে মা। সত্যি বিষ খাব। তোর মার নামে আমি কসম কেটে বলছি বিষ খাব।

তিতলী তার বাবাকে কোনোদিন কাঁদতে দেখে নি—সে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। সে তাকাল তার মার দিকে। ফিসফিস করে বলল, মা আমি কী করব? সুরাইয়া জবাব দিলেন না। তিনিও কাঁদছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নাদিয়া তাঁকে জড়িয়ে ধরে আছে। তিতলী নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, নাদিয়া আমি কী করব?

নাদিয়া বলল, আপা তুমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরো না।

কিন্তু বাবা কাঁদছেন। হাউমাউ করে কাঁদছেন। বাবাকে তিতলী কখনো কাঁদতে দেখে নি।

পিজি হাসপাতালের আঠার নম্বর কেবিনে তিতলী দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে সুন্দর চেহারার একটি যুবক। যুবকের মুখ হাসি হাসি। এই যুবকটি তার স্বামী। তার নাম যেন কী? আশ্চর্য নামটা মনে পড়ছে না।

বৃদ্ধ এক মহিলা আধবোজা চোখে তাকিয়ে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল। কাঠির মতো সরু সরু হাত। হাতের নীল রগ বের হয়ে আছে। ভদ্রমহিলার বুক হাপরের মতো উঠানামা করছে।

খুব গয়না-টয়না পরা এক মহিলা তিতলীকে বললেন—তোমার দাদিশাশুড়ি, সালাম কর।

তিতলী নড়ল না। বৃদ্ধা অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে কী যেন বললেন। তিতলী সেই কথার কিছু বুঝতে না পারলেও অন্যরা বুঝল। বৃদ্ধার বালিশের নিচ থেকে গয়নার বাক্স বের করে আনল।

বাক্স খুলে গয়না বের করে বৃদ্ধার হাতে দেয়া হল। বৃদ্ধা তিতলীর দিকে চোখের ইশারা করলেন। গয়নাটা নিতে বললেন। পুরোনো দিনের পাথর বসানো হার। বেদানার দানার মতো লাল লাল পাথর—।

তিতলীর মনে হচ্ছে লাল পাথরগুলো যেন চোখ। যেন বৃদ্ধার হাতের হারটা অনেকগুলো লাল চোখে তিতলীকে দেখছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটা হাসছে। এই যুবক তার স্বামী। তার নাম তিতলীর মনে পড়ছে না।

"মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না"

গানটার সুর যেন কী? আচ্ছা এই বৃদ্ধার কী হয়েছে? ক্যানসার?

১১

লিটনকে কেমন জানি অন্যরকম লাগছে। কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনটা সূক্ষ্ম বলে ধরা যাচ্ছে না। চুল কেটেছে কি? না চুল কাটে নি। মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল। চুলের জন্যে কলেজে তার নাম ছিল শ্যাওড়াগাছ। লিটন বলল, তুই এ রকম করে তাকিয়ে আছিস কেন? কী দেখছিস?

হাসান বলল, তোকে দেখছি।

'আমাকে দেখার কী আছে?'

'তোকে কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।'

লিটন বলল, মনটা খুব খারাপ সেইজন্যেই বোধহয় অন্যরকম লাগছে।

'মন খারাপ কেন?'

লিটন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে দেখে বুঝতে পারছিস না কেন মন খারাপ? মালয়েশিয়া শেষ পর্যন্ত যেতে পারি নি। ঢাকা এয়ারপোর্টে আটকে দিয়েছে। ফলস ভিসা।

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, তোর মালয়েশিয়া যাবার কথা ছিল নাকি?

'তুই জানিস না?'

'না।'

'আমি যে বিয়ে করেছি সেটা জানিস?'

'না জানালে জানব কীভাবে? আমি তো অন্তর্যামী না।'

'চাচাজান তোকে বলেন নি। আমি তাঁকে বলে গেছি। আমার বিয়ে তো আর কার্ড ছাপিয়ে হবে না যে কার্ড দিয়ে যাব। সস্তার বিয়ে। বন্ধুবান্ধব যে কজনকে বলেছিলাম কেউ আসে নি। কেউ না এলেও তুই আসবি সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। বলতে গেলে একা একা বিয়ে করেছি মনটা এত খারাপ হয়েছে।'

'মন খারাপ হবার কথাই।'

'বুঝলি হাসান আমি ঠিক করেছিলাম আর কোনোদিন তোর সঙ্গে কথা বলব না।'

'তোর বিয়ের কথা জেনেও আমি যাব না তুই ভাবলি কী করে?'

লিটন আনন্দিত গলায় বলল, শম্পাকেও আমি এই কথা বলেছি। আমি বলেছি—শোন শম্পা, আর কেউ আসুক না আসুক হাসান আসবেই। শম্পা বলেছে উনি কি আলাদা? আমি বললাম হাসান আলাদা কি আলাদা না তা আমি জানি না, হাসান আসবে এইটুকু জানি।

হাসান বলল, বাবা আমাকে কিছু বলেন নি, বোধহয় ভুলে গেছেন।

'বুড়ো মানুষ ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। চাচাজানের কাছে এক হাজার টাকাও দিয়েছিলাম। ভেবেছি বিদেশ চলে যাচ্ছি যে যা টাকা-পয়সা পেত দিয়ে যাই। সেই যাওয়া আটকে গেল। কী যে সমস্যার মধ্যে পড়েছি! আমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে না। শম্পার জন্য কষ্ট হচ্ছে। ও খুব কান্নাকাটি করে।'

AMARBOI.COM

'ভাবীকে কান্নাকাটি করতে নিষেধ কর। তুই না যাওয়াতে দুজন একসঙ্গে থাকতে পারছিস।'

'আমিও একজাক্ট এই কথাই শম্পাকে বলেছি। আমাদের দেশের ব্যাপার তো জানিস—সবাই বলাবলি করছে বিদেশ যাওয়া–টাওয়া সব ভাঁওতাবাজি বিদেশ যাচ্ছে এই ভাঁওতা দিয়ে বিয়ে করেছে। আমার মনটা যে কী খারাপ তুই দেখে বুঝবি না।'

'মন খারাপের কথা বাদ দে তো। ভাবীর কথা বল। ভাবী দেখতে কেমন?'

'দেখতে মোটামুটি মানে এভারেজ আর কী। কিন্তু অসাধারণ একটা মেয়ে। অন্তরে এত মায়া তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমার সম্পর্কে কেউ একটা কথা বললে তার চোখ দিয়ে টৌ টৌ করে পানি পড়ে। একদিন হয়েছে কী শোন—সকালবেলা তাদের বাসায় গিয়ে নাশতা করার কথা। যেতে পারি নি। রাত ন'টার দিকে গেছি। গিয়ে শুনলাম—রাত ন'টা পর্যন্ত তোর ভাবী না খেয়ে বসে আছে। সলিড ফুড তো খায়ই নি— পানি পর্যন্ত না—এটা পাগলামি না!'

'পাগলামি হলেও সুন্দর পাগলামি।'

'তোরা যতই সুন্দর বলিস—আমি খুব রাগ করেছি। শম্পাকে কঠিন কঠিন কিছু কথা বলব বলে ভেবেছিলাম, শেষ পর্যন্ত বলি নি। হাইলি সেনসেটিভ মেয়ে তো—কঠিন কথা শুনে কী করে না করে তার ঠিক আছে। চুপচাপ থাকাই ভালো।'

'ভাবী কোথায় এখন? তোর সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে থাকবে কীভাবে? আমি থাকি মেসে। বউ নিয়ে তো আর মেসে উঠতে পারি না। শম্পা তার বড় মামার সঙ্গে থাকে আমি প্রতিদিন কমপক্ষে একবার হলেও দেখে আসি। একবার রাতে ছিলামও। ওদের বাসা খুবই ছোট! দুই কামরার বাসা। এতগুলো মানুষ। আমরাই যদি একটা ঘর দখল করে থাকি তাহলে হবে কীভাবে? আর নিউলি ম্যারিড কাপল তো আর অন্যদের সঙ্গে খাটে আড়াআড়িভাবে ঘুমোতেও পারে না।'

হাসান হাসছে। লিটন এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। কী সহজ আন্তরিক ভঙ্গিতেই না সে গল্প করছে!

'হাসান শম্পার ছবি দেখবি?'

'সঙ্গে আছে?'

'ওদের ক্যামেরায় কিছু ছবি তুলেছিলাম। ছত্রিশটা স্ন্যাপ নিয়েছি আটটা এর মধ্যে নষ্ট হয়েছে। এই দেখ।'

হাসান ছবি দেখছে। লিটন গভীর আগ্রহে প্রতিটি ছবি ব্যাখ্যা করছে।

'শম্পার সঙ্গে যে ছোট মেয়েটা দেখছিস সে শম্পার মামাতো বোন। ক্লাস টুতে পড়ে। এমনিতে খুব শান্ত মেয়ে, একটা বিচিত্র অভ্যাস আছে। আদর করে কামড় দেয়। ওইতো পরশুদিন হঠাৎ শম্পার নাক কামড়ে ধরল। এক্কেবারে রক্ত বের করে দিয়েছে।'

'এই ছবিটা দেখ শম্পার গলায় যে হারটা দেখতে পাচ্ছিস এটা রিয়েল না ইমিটেশন।'

হাসান বলল, ভাবী তো দেখতে খুব সুন্দর। তুই কী বলছিস মোটামুটি!

'সামনাসামনি আরো সুন্দর দেখা যায়। ছবিতে তেমন ভালো আসে নি। ক্যামেরাটাও তত ভালো ছিল না—দেখ না সবাই আউট অব ফোকাস। তোকে একদিন নিয়ে যাব। শম্পা খুব খুশি হবে। তোর কত গল্প করেছি।'

'আমার আবার কী গল্প?'

'তোর গল্পের কি শেষ আছে? তোর টাকা নেই পয়সা নেই—তারপরেও তুই আমাদের জন্যে যা করিস সেটা কে করে? তোর একটা গল্প শুনে শম্পার চোখে পানি এসে গিয়েছিল গল্পটা হচ্ছে....'

'থাক তোকে গল্প বলতে হবে না।'

'আহা শোন না, এই গল্প আমি যে কতজনকে করেছি—ওই যে কলেজে পড়ার সময় আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তুই খবর পেয়ে.......'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'চুপ কর তো।'

'আচ্ছা চুপ করলাম, শম্পাকে কবে দেখতি যাবি?'

'হাত একদম খালি। খালি হাতে তাঁকে দেখতে যাব কীভাবে। কিছু তো নিয়ে যেতে হবে। দেখি তিন–চার দিনের মধ্যে যাব।'

'তোকে এসে নিয়ে যাব। শুক্রবারে আসি? কিছু নিতে হবে না, তোকে দেখলেই খুশি হবে। উপহার দিয়ে তাকে খুশি করার ক্ষমতা তো আমার নেই। মানুষ দেখিয়ে খুশি করা সেটাও তো কম না। আজ উঠি রে।'

হাসান তাকে সঙ্গে করেই বেরোল। আজ বুধবার—হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। হিশামুদ্দিন সাহেবকে এখনো তার নিজের চাকরির কথা বলা হয় নি। লজ্জার কারণে বলা হচ্ছে না—লিটনেরটা বলে দেখবে নাকি? এই মুহূর্তে তারচেয়ে লিটনের চাকরি অনেক বেশি দরকার।

রাস্তায় বের হতেই আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখা গেল। তিনি কয়েক পলক তাদের দিকে তাকিয়ে হুট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লেন। আজকাল তিনি ছেলেদের দেখলে সরে পড়েন। হাসানের খুব মায়া লাগছে। মানুষের কত পরিবর্তনই না হয়! একটা সময় ছিল তাঁর পায়ের শব্দেই বুক ধড়ফড় করত—সেই মানুষ আজ পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। পথেঘাটে হঠাৎ দেখা হলে এমন বিব্রত হন।

লিটন বলল, চাচাজান কি তোকে টাকাটা দিয়েছেন? এক হাজার টাকা?

হাসান বলল, না।

'তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করিস না। বুড়ো মানুষ ভুলে গেছেন। জিজ্ঞেস করলে লজ্জা পাবেন।'

'আমি কিছু জিজ্ঞেস করব না।'

প্রচণ্ড রোদ উঠেছে। এই রোদে হাঁটতে কষ্ট হয়। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। হাসানের পকেটে কুড়িটা মাত্র টাকা। কুড়ি টাকার একটা চকচকে নোট। নোটটা খরচ করা যাবে না। বেকারদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার আছে। পকেট একেবারে শূন্য করতে নেই। হাসান ঘড়ি দেখল। হেঁটে যেতে গিয়ে দেরি হয়ে যাবে না তো?

দেরি হলেই হিশামুদ্দিন সাহেবের পি.এ. মোতালেব ভুরু কুঁচকে বলবে, মাই গড আজো দেরি? ভাবটা যেন সে সবসময় দেরি করেই যাচ্ছে।

'স্যার তো মনে হয় আজ কথা বলতে পারবেন না।'

হাসান বলল, 'ও আচ্ছা।'

মোতালেব হাই তুলতে তুলতে বলল, স্যারের মেয়ে এসেছে—'চিত্রলেখা'; সে স্যারের সব টাইমটেবল ভণ্ডুল করে দিচ্ছে।

হাসান বলল, চলে যাব?

মোতালেব এই প্রশ্নের জবাব দিল না—হাই তুলল। গুরুত্বহীন মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের শরীরে অক্সিজেনের অভাব হয়। তাকে ঘন ঘন হাই তুলতে হয়। মোতালেব এই জন্যেই হাই তুলছে।

'মোতালেব সাহেব আমি কি চলে যাব?'

'থাকুন কিছুক্ষণ। চা খান দেখি স্যার কী বলেন।'

হাসান বসে পড়ল। মোতালেবের এই ঘরটা ডাক্তারদের ওয়েটিং রুমের মতো। দেয়ালের সঙ্গে ঘেঁষে একসারি বেতের চেয়ার সাজানো। চেয়ারগুলোতে এককালে গদি ছিল—এখন নেই। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। ভারি কালো রঙের টেবিলের উপর ময়লা কয়েকটা ম্যাগাজিন। ঘরের এক কোনায় ছোট্ট টেবিল নিয়ে ডাক্তার সাহেবের অ্যাসিস্ট্যান্টের মতো বিরক্তমুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোতালেব বসে থাকে। মোতালেবের হাতে মুনশি আমিরুদ্দিনের লেখা চটি একটা বই, নাম প্রেমের সমাধি। বইটির কভারে একটা ফুটন্ত ফুলের ছবি। সেই ফুলের উপর কুৎসিতদর্শন একটা পোকা উড়ছে। পোকাটার গায়ের রং ঘনকৃষ্ণ, চোখ টকটকে লাল। পোকাটা খুব সম্ভব ভ্রমর, তবে দৈত্যাকৃতি ভ্রমর। প্রেমের সমাধি নামের এই চটি বইটি মোতালেব গত দু মাস ধরে পড়ছে। হাসান ঠিক করে রেখেছে মোতালেব সাহেবের এই বই পড়া শেষ হলে সে বইটা তাঁর কাছ থেকে ধার করে নিয়ে পড়ে দেখবে, ব্যাপারটা কী?

ডাক্তারের ঘরে যেমন ওষুধের গন্ধ থাকে, এই ঘরেও তেমনি ওষুধের কড়া গন্ধ। এই গন্ধ-রহস্য হাসান বের করেছে। ইনসেকটিসাইডের গন্ধ। বাগানের ফুলগাছে প্রতি সপ্তাহে একবার স্প্রে করে ইনসেকটিসাইড দেয়া হয়। ইনসেকটিসাইডের বোতল এই ঘরের আলমিরায় তালাবন্ধ থাকে। আলমিরায় হাতে লেখা একটা নোটিশ আছে—

'বিপদজণক'

জনক বানানে মূর্ধন্য ন ব্যবহার করা হয়েছে বলেই বোধহয় নোটিশটা দেখলেই গা ছমছম করে। এই ঘরে সময় থেমে থাকে। পাঁচ মিনিট বসে থাকলেই মনে হয় পাঁচ ঘণ্টা বসে থাকা হয়েছে। হাসান নড়েচড়ে বসল। সময় থামা অবস্থাতেও অনেকক্ষণ পার হয়েছে।

'মোতালেব সাহেব!'

মোতালেব বই থেকে মুখ তুলল। তাঁর দৃষ্টি অপ্রসন্ন, ভুরু কুঁচকানো। হাসান অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বলল, চলে যাব?

'বাজে কটা?'

'সাড়ে তিনটা।'

'আরো পাঁচ-দশ মিনিট বসে চলে যান।'

'আপনি কি একটু জেনে আসবেন?'

'জেনে আসা যাবে না। এতদিন পর স্যারের মেয়ে এসেছে। স্যার মেয়ের সঙ্গে গল্প করছেন—এর মধ্যে হুট করে আমি উপস্থিত হব? ব্যালেন্স ছাড়া কথা বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'চারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তিনটা থেকে চারটা এই এক ঘণ্টার পেমেন্ট নিয়ে হাসিমুখে চলে যাবেন। বাকিটা আমি দেখব।'

'জ্বি আচ্ছা। স্যারের মেয়ে দেখতে কেমন?'

'দেখতে কেমন তা দিয়ে আপনার কোনো দরকার আছে?'

'জ্বি না।'

'তাহলে জানতে চান কেন? স্যারের মেয়ে কালো কুৎসিত হলেও আপনার কিছু যায় আসে না, ডানাকাটা পরী হলেও না।'

'তা তো বটেই।'

হাসান একটা ম্যাগাজিন হাতে নিল। সময় কাটানোর জন্যে রোমহর্ষক অপরাধের কাহিনী পড়া ছাড়া কোনো গতি নেই। অপরাধের কাহিনী ছাড়া এখন কোনো ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় না। দেশে তেমন কোনো মজাদার অপরাধের কাহিনী পাওয়া না গেলে বিদেশি অপরাধের কাহিনী ছেপে দেয়া হয়। লস এঞ্জেলসের তিন সমকামী তরুণীর গোপন কাহিনী জাতীয় মজাদার কেচ্ছা।

'আপনি কি হাসান সাহেব?'

হাসান ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

এক শ ভাগ খাঁটি বাঙালি মেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে। কেউ না বলে দিলেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই মেয়ের নাম চিত্রলেখা। বাবার মতো টকটকে গায়ের রং না—শ্যামলা মেয়ে। মাথাভর্তি চুল—চুল নিয়ে সে খানিকটা বিব্রত। একটু পর পর মুঠো করে চুল ধরছে। খুব

সাধারণ সুতির শাড়ি পরেছে। মনে হচ্ছে এই সাধারণ শাড়িটা না পরলে তাকে মানাত না। সবচে মজার ব্যাপার মেয়েটির পায়ে স্যান্ডেল নেই। খালি পা। খালি পা'তেও তাকে মানিয়েছে। মনে হচ্ছে কোনো স্যান্ডেলেই এই মেয়েকে মানাত না। এক ধরনের মানুষ আছে যাদের সবকিছুতেই মানায়। এও বোধহয় সে রকম কেউ।

'আপনি হাসান সাহেব তো?'

'জ্বি।'

'আপনার না তিনটার সময় বাবার ঘরে যাবার কথা? আমি আপনার জন্যেই বসে ছিলাম।'

'আমার জন্যে?'

'জ্বি। আপনাকে বাবা কী সব গল্প বলেন এইসব আর আপনি কীভাবে নোট করেন তাও দেখব। ও আচ্ছা আমি তো আমার পরিচয় দিই নি। আমার নাম চিত্রলেখা।'

'জ্বি আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কীভাবে বুঝলেন? ও আচ্ছা বোঝাটাই তো স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই এর মধ্যে শুনে ফেলেছেন যে আমি এসেছি তাই না?'

'জ্বি।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

হাসান পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তার খুব ইচ্ছে করছে জিজ্ঞেস করে—আপনি খালি পায়ে হাঁটছেন কেন? জিজ্ঞেস করল না। এ ধরনের প্রশ্ন করার মতো ঘনিষ্ঠতা মেয়েটির সঙ্গে হয় নি। কোনোদিন হবেও না।

'হাসান সাহেব?'

'জ্বি।'

'আমেরিকার কেউ যদি আমার নাম জিজ্ঞেস করে আমি কী বলি জানেন? আমি বলি আমার নাম মিস পিকচার ড্র। আমার এই নামটিই এখন চালু। অনুবাদটা ভালো হয়েছে না?'

'জ্বি।'

'যান আপনি বাবার সঙ্গে বসুন আমি চা নিয়ে আসছি।'

হিশামুদ্দিন সাহেব আজ একটা ধবধবে পাঞ্জাবি গায়ে বসে আছেন। হাসান তাকে খালি গায়ে দেখেই অভ্যস্ত। পাঞ্জাবিতে তাকে অন্যরকম লাগছে। তাঁর সামনে পানের বাটাও নেই। হাসানের মনে হচ্ছে চিত্রলেখার উপস্থিতির সঙ্গে ঘটনা দুটি সম্পর্কিত।

'স্যার স্লামালিকুম।'

'হাসান বস। আমার মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'আমার মেয়ের মধ্যে এমন কিছু কি দেখলে চোখে পড়ার মতো?'

হাসান ইতস্তত করে বলল, উনি খালি পায়ে হাঁটছেন।

হিশামুদ্দিন হাসতে হাসতে বললেন—আরে দূর। খালি পায়ে হাঁটছে কারণ স্যান্ডেল খুঁজে পাচ্ছে না। ওর সবচে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে ওর কাছে সব মানুষই চেনা। অতি আপন। তোমার সঙ্গেও নিশ্চয়ই খুব চেনা ভঙ্গিতে কথা বলেছে। আমার বড় বোনের মধ্যেও এই ব্যাপারটা ছিল। আমার বড়বোনের নাম কি তোমার মনে আছে?'

'পুষ্প। ভালো নাম লতিফা বানু।'

'হ্যাঁ ঠিক আছে।'

'চিত্রলেখার খুব ইচ্ছা আমি তোমাকে কীভাবে গল্পগুলো বলি তা শুনবে। ও আসুক তখন তোমাকে আমার বড় বোনের একটা গল্প বলব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি টাকা-পয়সা ঠিকমতো পাচ্ছ তো?'

'পাচ্ছি স্যার।'

চিত্রলেখা চা নিয়ে ঢুকল। টি-পটভর্তি চা। দুধের পট, চিনির পট। হাসান অবাক হয়ে লক্ষ্য করল প্রথম চায়ের কাপটি চিত্রলেখা তার বাবার জন্যে না বানিয়ে তার জন্যে বানাচ্ছে। খুব সাধারণ একটি ভদ্রতা। হাসানের মতো অভাজনের জন্যে এ ধরনের ভদ্রতা চিত্রলেখাদের মতো মানুষরা করে না। তার প্রয়োজন নেই।

'হাসান সাহেব আপনি কতটুকু চিনি খান?'

'তিন চামচ।'

'আজ প্রথমদিন বলে তিন চামচ দিচ্ছি—দয়া করে চিনি খাওয়া কমাবেন। আমি কিন্তু ডাক্তার। অকারণে উপদেশ দিই না। যখন প্রয়োজন তখনি উপদেশ দি।'

হিশামুদ্দিন বললেন, তোর স্যান্ডেল পাওয়া গেছে?

চিত্রলেখা হাসিমুখে বলল, একপাটি পাওয়া গেছে—অন্য পাটি খোঁজা হচ্ছে।

হিশামুদ্দিন বললেন, তোর কি এক জোড়াই স্যান্ডেল?

'হ্যাঁ। এক শ জোড়া স্যান্ডেল দিয়ে আমি কী করব? আমি কি লেডি ইমালডা? বাবা তোমার গল্প শুরু কর।'

চিত্রলেখা ঠিক তার বাবার মতোই দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছে। একটা হাত তার গালে। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—যে গল্প বলে শ্রোতারা তার দিকেই তাকিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম করে চিত্রলেখা তাকিয়ে আছে হাসানের দিকে। তার চোখ চাপা কৌতুকে ঝিলমিল করছে। হিশামুদ্দিন গল্প শুরু করেছেন।

"আমাদের নেত্রকোনার বাসায় একটা শিউলিগাছ ছিল। শিউলিগাছ জংলি ধরনের হয়। খসখসা পাতা—ঝুপড়ির মতো বড় হয়। জঙ্গলে জন্মালেই এই গাছগুলোকে মানাত। শিউলিগাছের আরো সমস্যা আছে—শুঁয়োপোকা। বৎসরের একটা সময়ে আমাদের শিউলিগাছ ভর্তি হয়ে যেত শুঁয়োপোকায়। সেই সময় বাবা ঠিক করতেন গাছ কেটে ফেলা হবে। বড় আপার জন্যে কাটা হত না। শিউলি ফুল তাঁর খুব প্রিয় ছিল। গাছটার ফুল ফোটাবার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শীতের সময় উঠোন ফুলে ফুলে ভরে থাকত। বড় আপা বলতেন—জোছনার চাদর। যাই হোক এক বৎসর হঠাৎ কী হল গাছটায় ফুল ফুটল না। একটা ফুলও না। আমরা সবাই খুব অবাক হলাম—বড় আপা হলেন অস্থির। গাছটায় একটা ফুলও ফুটবে না এ কেমন কথা। প্রায় সময়ই দেখতাম কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে বড় আপা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেই শীতেই বড় আপা মারা গেলেন। অতি তুচ্ছ কারণে তাঁর মৃত্যু হল। বাথরুমে পা পিছলে পড়ে মাথায় ব্যথা পেলেন। সামান্য ব্যথা—তেমন কিছু না। রান্নাবান্না করলেন। আমাদের খাওয়ালেন। নিজে কিছু খেলেন না—তাঁর নাকি শরীরটা ভালো লাগছে না, মাথা ঘোরাচ্ছে। তিনি বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। তার আধঘণ্টা পর বাবাকে ডাকলেন। বাবা বিছানায় তার পাশে বসলেন। বড় আপা বললেন, বাবা তুমি আমার মাথার চুল বিলি করে দাও। তারপর হঠাৎ করে বললেন, বাবা আমি মরে যাচ্ছি। বাবা ভয় পেয়ে আমাদের সবাইকে ডাকলেন। তার ঘণ্টাখানিকের মধ্যেই বড় আপা মারা গেলেন। নেত্রকোনা বড় মসজিদের গোরস্থানে তাঁর কবর হল। হতদরিদ্র পরিবারে মৃত্যুশোক স্থায়ী হয় না। সাত দিনের মাথায় বাসার সব মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। সেই সময় একটা আনন্দের ব্যাপারও ঘটল—বাবা একটা চাকরি পেয়ে গেলেন। চাকরি তেমন ভালো না, তবে বাবা খুব উল্লসিত—কারণ এই চাকরিতে বাড়তি আয়ের সুযোগ-সুবিধা খুবই ভালো। মাছ সাপ্লাইয়ের কাজ। ভাটি অঞ্চলের বড় বড় মাছ কাঠের পেটিতে বরফ দিয়ে ভরে ঢাকা পাঠানো। বরফের প্যাকিং হয় রাতে। এর মধ্যে দু-একটা মাছ এদিক-ওদিক করা যায়। তাতে কেউ কিছু মনেও করে না। এই ধরনের ক্ষতি

হিসেবের মধ্যে ধরা থাকে। বাবা আনন্দিত গলায় বললেন—এইবার দেখা যাবে তোরা কে কত মাছ খেতে পারিস। মাছের বড় বড় পেটি খেয়ে দেখবি এক সময় মাছের ওপর ঘেন্না ধরে যাবে। তখন মাছের ছবি দেখলেও 'ওয়াক থু' করে বমি করে ফেলবি।

চাকরি শুরু করার তিন দিনের মাথায় বাবা বিশাল এক চিতল মাছ নিয়ে শেষরাত্রে বাসায় চলে এলেন। মহা উৎসাহে চিতল মাছ রান্না করলেন। সকালে নাশতার বদলে বারান্দায় পাটি পেতে চিতল মাছের পেটি দিয়ে আমরা ভাত খেতে বসলাম। আর তখনি আমার মেজো বোন ময়না চেঁচিয়ে বলল, দেখ দেখ! আমরা অবাক হয়ে দেখলাম শিউলিগাছের নিচটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে আছে। শিউলিগাছ আবার ফুল ফোটাতে শুরু করেছে।

হাসান আজ এই পর্যন্তই।"

চিত্রলেখা বলল, হাসান সাহেব আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?

'জ্বি না।'

'আপনি কি বাবার সব গল্প লিখে ফেলেছেন?'

'জ্বি।'

'পরের বার যখন আসবেন—লেখা কপিগুলো নিয়ে আসবেন। আমি একটু পড়ে দেখব। আপনি পরের বার কবে আসবেন?'

'আমি প্রতি বুধবারে আসি। আপনি বললে আমি কালই দিয়ে যাব।'

'প্লিজ। আমার খুব পড়ার ইচ্ছা। চলুন আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'না না এগিয়ে দিতে হবে না।'

'অবশ্যই এগিয়ে দিতে হবে। আমি খুবই ভদ্র মেয়ে।'

হাঁটতে হাঁটতে চিত্রলেখা বলল, হাসান সাহেব!

'জ্বি।'

'বাবার গল্পগুলো শুনতে আপনার কেমন লাগে?'

'ভালো লাগে।'

'বাবা খুব গুছিয়ে গল্প বলেন। লেখক হলেও তিনি খুব নাম করতেন।'

'জ্বি।'

'তবে আপনাকে একটা গোপন তথ্য দিচ্ছি—বাবার গল্পে কিছু বানানো ব্যাপার আছে। আপনি সামনে ছিলেন বলে আমি বাবাকে ধরলাম না। আপনি সামনে না থাকলে অবশ্যই ধরতাম।'

হাসান বলল, কোন জিনিসটা বানানো?

'ওই যে শিউলিগাছে বাবার বড় বোন পুষ্পের মৃত্যুর পর পর ফুল ফুটল।'

'বানানো বলছেন কেন?'

'কারণ এই গল্প বাবা আমাকেও বলেছেন। তখন গল্পটা অন্য রকম ছিল।'

'কী রকম ছিল?'

'আমাকে বাবা বলেছিলেন—আমাকে বাবা বলেছিলেন তার বড় বোনের মৃত্যুর পর আমাদের দাদাজানের সব রাগ গিয়ে পড়ল গাছটার উপর—তিনি পাগলের মতো সামান্য মাছকাটা বঁটি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে গাছটা কেটে ফেললেন।'

'ও আচ্ছা—উনি হয়তো ভুলে গেছেন।'

'এ রকম একটা বড় ঘটনা ভুলে যাবার কথা তো না।'

'সবগুলো ডাল হয়তো কাটা হয় নি—একটা রয়ে গিয়েছিল। সেই ডালে ফুল ফুটেছে।'

চিত্রলেখা খিলখিল করে হাসছে। অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, বাবাকে তো আপনি দেখি আমার চেয়েও বেশি পছন্দ করেন। এখন একটা ব্যাপার পরিষ্কার হল।

হাসান ভীত গলায় বলল, কোন ব্যাপার।

'বাবা আপনাকে এত পছন্দ করেন কেন সেই কারণটা ধরা গেল। আপনি বাবাকে পছন্দ করেন বলেই বাবা আপনাকে পছন্দ করেন। পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার মানুষ খুব সহজেই ধরতে পারে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করে ফেললাম। এখন আপনি চলে যান।'

চিত্রলেখা হাসানকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিল। খালি পায়ে সে হাঁটছে—হাসানের আবারো মনে হল এই মেয়ে খালি পায়ে না হেঁটে স্যান্ডেল পায়ে হাঁটলে তাকে মোটেও মানাত না।

দিনটা মেঘলা।

সারাদিন মেঘ ছিল না। এখন কোথেকে গাদা গাদা মেঘ আকাশ অন্ধকার করে ফেলছে। হাসানের মনে হল নীল রঙে আকাশকে মানায় না, কালো রঙেই মানায়।

হাসানের হাঁটতে ভালো লাগছে। মেঘলা দিনের বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে। শুধু সারাক্ষণ মনে হয় একজন প্রিয় কেউ পাশে থাকলে আরো ভালো লাগত। তিতলীদের বাসায় গিয়ে দেখা যেতে পারে। তাকে যদি কোনোভাবে শুধু বলা যায়—তিতলী আমার খুব ইচ্ছা করছে তোমাকে নিয়ে হাঁটতে। সে যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা করবে। তারা হাঁটবে মেঘের দিকে তাকিয়ে। ওই যে একটা গান আছে না—মেঘ বলেছে যাব যাব। ওই গানটা দুজনই মনে মনে গুনগুন করবে।

হাসান সাত টাকা দিয়ে বড় একটা গোলাপ কিনল। গোলাপ যে এত বড় হয় তার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে বোম্বাই গোলাপ। বড় বলেই দাম বেশি। প্রমাণ সাইজের গোলাপ চার টাকা করে বিক্রি হচ্ছে—এই গোলাপ সাত টাকা। প্রায় ডাবল দাম। গোটাদশেক কিনতে পারলে তিতলী হতভম্ব হয়ে যেত। টাকা নেই। সাত টাকা খরচ করতেও গায়ে লাগছে।

সাত টাকায় সাত কাপ চা খাওয়া যায়। এক প্যাকেট সস্তা সিগারেট কেনা যায়। এক ডজন দেয়াশলাই কেনা যায়। সাত টাকার এই বোম্বাই গোলাপ একদিনে বাসি হয়ে যাবে। মনে হবে গোলাপটার খারাপ ধরনের ডায়রিয়া হয়েছে। তারপরেও ফেলা হবে না। রেখে দেয়া হবে। তিতলীর যা কাণ্ডকারখানা পাপড়িগুলো সে হয়তো কোনোদিনও ফেলবে না। কোনো একটা গল্পের বইয়ের পাতার ভাঁজে ভাঁজে রেখে দিয়ে ভুলে যাবে। হঠাৎ একদিন বই ঝাড়তে গিয়ে পাতায় পাতায় পাওয়া যাবে গোলাপের পাপড়ির অপূর্ব শুঁটকি। হাসানের মনে হল একটা গোলাপ নিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। এক হচ্ছে অমঙ্গলসূচক। এক মানেই একা। সবচে মঙ্গলসূচক সংখ্যা হল দুই। দুই মানেই আমি এবং তুমি। পনেরটা টাকা চলে যাবে। তার সঙ্গে আছে কুড়ি টাকার একটা নোট। ফেরার সময় ফিরতে হবে হেঁটে হেঁটে। হাঁটা মন্দ কী? তিতলীর সঙ্গে দেখা হবার পর হেঁটে হেঁটে ফিরতে খারাপ লাগবে না।

হাসান ফুলওয়ালাকে বলল, ভাই ঠিক এই সাইজের আরেকটা গোলাপ দিন। এই গোলাপগুলোর নাম কী বলুন তো? ফুলওয়ালা বিরস গলায় বলল, তাজমহল।

গোলাপের নাম তাজমহল ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। মোতালেব সাহেবকে একদিন জিজ্ঞেস করতে হবে। তিনি যেহেতু বাগানে বিষ স্প্রে করেন তিনি জানবেন। হিশামুদ্দিন সাহেবের মেয়েটিও জানতে পারে। তাকে দেখলেই মনে হয় এই মেয়ে সব জানে। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে হাসিমুখে বলে দেবে।

দুবার কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলল। দরজা খুলে দিল নাদিয়া। হাসান বলল, কেমন আছ নাদিয়া?

নাদিয়া জবাব দিল না। হাসান জানে নাদিয়া জবাব দেবে না। এই মেয়েটা অসম্ভব লাজুক। তবে একবার কথা শুরু করলে ফড়ফড় করে অনেক কথা বলে। ওইদিন খুব কথা বলেছে।

'তোমার প্রিপারেশন কেমন হল?'

'জ্বি ভালো।'

'সব বই নিশ্চয়ই ঠোঁটস্থ হয়ে গেছে?'

নাদিয়া জবাব দিল না। চোখ বড় বড় করে হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল। হাসানের একটু অস্বস্তি লাগছে। এই মেয়েটা কখনো তো এ রকম করে তাকায় না। ব্যাপারটা কী?

'তিতলী বাসায় আছে?'

'জ্বি না।'

'কোথায় গেছে? তার ফুফুর বাসায়?'

'জ্বি না। হাসান ভাই আপনি বসুন আপনাকে সব বলছি।'

হাসান হঠাৎ বুকে একটা ধাক্কা খেল। তিতলীর কি কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে? হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। নাকি তারচেয়েও খারাপ কিছু? না তারচে খারাপ কিছু না। তারচে খারাপ কিছু হলে নাদিয়া এমন সহজভাবে কথা বলতে পারত না। কিন্তু সহজভাবে সে কি কথা বলছে?

'কী হয়েছে নাদিয়া?'

'আপার কাল রাতে হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে গেছে। ফুফু একটা ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন—সেই ছেলের সঙ্গে....'

'তিতলীর বিয়ে হয়ে গেছে?'

'জ্বি।'

'ও এখন তার শ্বশুরবাড়িতে?'

'জ্বি।'

'ও আচ্ছা। নাদিয়া আমি তাহলে আজ যাই।'

'হাসান ভাই প্লিজ আপনি এক সেকেন্ডের জন্যে হলেও বসে যান। আপনি এইভাবে চলে গেলে আমি সারা রাত কাঁদব।'

হাসান কিছু বলল না। বসল। তার কেমন অদ্ভুত লাগছে। তার মনে হচ্ছে এই ঘরের আলো হঠাৎ অনেক বেড়ে গেছে। ঘরের একপ্রান্তে ষাট পাওয়ারের বাতি জ্বলছে না। জ্বলছে ফ্লাডলাইটের তীব্র আলো। সেই আলো চোখে লাগছে। চোখ জ্বালা করছে। খুব ঠাণ্ডা পানি চোখেমুখে ছিটাতে পারলে ভালো লাগত।

'হাসান ভাই!'

'হুঁ।'

'চা খাবেন হাসান ভাই? আপনার জন্যে এক কাপ চা নিয়ে আসি?'

মেয়েটা এভাবে কথা বলছে কেন? মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। কেঁদে ফেলার মতো কিছু হয় নি। তিতলী একটা সমস্যায় পড়ে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। এ রকম সমস্যা তো হতেই পারে।

'নাদিয়া আমি চা খাব না। তবে একটু পানি খাওয়াতে পার, খুব তৃষ্ণা লেগেছে। আচ্ছা থাক পানি লাগবে না।'

'হাসান ভাই আপনি বসুন। আমি এক্ষুনি পানি এনে দিচ্ছি।'

নাদিয়া ছুটে বের হয়ে গেল। আর প্রায় তৎক্ষণাৎ হাসানের মনে হল তিতলী এ বাড়িতেই আছে। নাদিয়া ছোট্ট একটা মিথ্যা বলেছে। তার বিয়ে হয়ে গেছে এটা ঠিক তবে সে এখনো শ্বশুরবাড়িতে যায় নি। এই মিথ্যাটার হয়তো প্রয়োজন ছিল।

হাসানকে নাদিয়া গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। হাসান বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল নাদিয়া কাঁদতে কাঁদতে তার সঙ্গে আসছে। হাসান বলল, কাঁদছ কেন নাদিয়া।

নাদিয়া গায়ের ওড়নায় চোখ মুছল। কিছু বলল না। হাসান বলল, তিতলী ঘরেই আছে তাই না?

নাদিয়া ক্ষীণস্বরে বলল, জ্বি।

'ওকে বোলো—সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাগ্যে যা ছিল তাই হয়েছে ও যেন মন খারাপ না করে।'

'আপনি ভালো থাকবেন হাসান ভাই।'

'ভালো থাকব। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা কোরো। আমি জানি তুমি খুব ভালো রেজাল্ট করবে।'

'কী করে জানেন?'

'আমার মন বলছে।'

'হাসান ভাই, আপনি আপার উপর রাগ করে থাকবেন না।'

'না রাগ করব কেন? যাই নাদিয়া?'

হাসান এগোচ্ছে। ঠিকমতো পা ফেলতে পারছে না। টিপটিপ বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। আশ্চর্য কাণ্ড যখনই সে তিতলীর কাছে আসে তখনি বৃষ্টি হয়।

হাসান হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তিতলীদের বাসাটা একবার তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। সবসময় এই জায়গা থেকে সে পেছনে ফিরে তাকায়। আরেকটু এগোলে তিতলীদের বাসা আড়ালে পড়ে যাবে আর দেখা যাবে না। হাসান যতবারই এখান থেকে তাকিয়েছে ততবারই দেখেছে তিতলী বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আজ নিশ্চয়ই দেখা যাবে না। শুধু আজ কেন আর কোনোদিনই দেখা যাবে না। হাসানও আর আসবে না। আসা ঠিক হবে না।

তিতলীর বাবা নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান করবেন। সেই অনুষ্ঠানে তার দাওয়াত হবে না। তিতলী এমন হৃদয়হীন কাণ্ড কখনো করবে না। ভালো কোনো উপহার তার অবশ্যি দিতে ইচ্ছে করছে। টাকা থাকলে তিতলীকে সে একটা হারমোনিয়াম কিনে দিত। মেয়েটার হারমোনিয়ামের খুব শখ ছিল। তার স্বামী নিশ্চয়ই তিতলীর সেই শখ মেটাবেন। মানুষের সবচে প্রিয় ইচ্ছা প্রকৃতি সবসময় পূর্ণ করে।

তিতলী কী গানটা জানি তাকে শোনাতে চেয়েছিল। হাসান কিছুতেই মনে করতে পারছে না—মেঘ বলেছে যাব যাব, মেঘের পরে মেঘ জমেছে? নাকি অন্য কোনো গান? না এটা না অন্য কী একটা গান। আশ্চর্য মনে পড়ছে না। হাসান মাথার ভেতর তীব্র চাপ অনুভব করছে। গানের লাইনগুলো মনে না পড়লে কিছুতেই মনের এই চাপ কমবে না। একবার চট করে তিতলীকে জিজ্ঞেস করে এলে কেমন হয়। না না তিতলীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা ঠিক হবে না। সে জিজ্ঞেস করবে নাদিয়াকে। নাদিয়া তার আপার কাছ থেকে জেনে আসবে।

হাসান পেছন দিকে তাকাল। বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

বৃষ্টির ফোঁটা বড় বড় হয়ে পড়তে শুরু করেছে। হাসান এগোচ্ছে ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

১২

তিতলীদের বাড়ির সামনে বড় একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। কালো রঙের গাড়ি—জানালার কাচ উঠানো বলে গাড়ির ভেতরে কে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না।

মতিন সাহেব জানালার পরদার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন। দুপুরে খাবারের পর তিনি খালি গায়ে হাতপা এলিয়ে ফুলস্পিডে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বড় একটা ঘুম দেন। আজো ঘুমোচ্ছিলেন হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ায় ফ্যান থেমে গেল, তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি চামচিকার বাচ্চারা দেশটার বারটা বাজিয়ে দিল বলতে বলতে জানালার পরদা সরিয়ে কালো গাড়িটা দেখলেন। তিতলীর বিয়ের পর পর বড় বড় গাড়ির আনাগোনা শুরু হয়েছে। তিতলীর শ্বশুরবাড়ির দিকের সব আত্মীয়স্বজনেরই মনে হয় গাড়ি আছে। রোজই কেউ না কেউ আসছে।

দেখতে ভালো লাগছে। খালি হাতেও কেউ আসছে না। ঘর ভর্তি হয়ে আছে মিষ্টিতে। মিষ্টি খাওয়া তাঁর নিষেধ। সামান্য ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে। সেই নিষেধ অমান্য করে তিনি নিয়মিত মিষ্টি খাচ্ছেন। খাওয়া শেষ হবার পর উদাস গলায় বলছেন—মিষ্টিটিষ্টি কী আছে দাও। খাওয়ার পর মিষ্টি খাওয়া রসুলে করিমের সুন্নত। সুন্নত পালন করলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না।

আজ কে এসেছে? যে এসেছে সে গাড়ি থেকে নামছে না কেন? মতিন সাহেব এই বয়সেও বুকের ভেতর এক ধরনের ছেলেমানুষি উত্তেজনা অনুভব করলেন। তাঁর সেই উত্তেজনা চরমে উঠল যখন দেখলেন গাড়ি থেকে নামছে শওকত। তিতলীর হাসবেন্ড। কথা ছিল রুসমত না হওয়া পর্যন্ত শওকত এ বাড়িতে আসবে না। কী জন্যে এসেছে কে জানে। মতিন সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন। আলনা থেকে নিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। সুরাইয়াকে খবর দিতে হবে। গরমের সময় তার একটা বাজে অভ্যাস আছে—ভেতরের মেঝেতে হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়া। জামাই যদি এসে দেখে শাশুড়ি মাতারিদের মতো হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। মুখের উপর মাছি ভন ভন করছে—সেই দৃশ্য সুখকর হবে না।

সুরাইয়া ঘুমোচ্ছিলেন না। রান্নাঘরে চায়ের পানি চাপিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। মতিন সাহেব চাপা গলায় বললেন, জামাই এসেছে। জামাই। মেয়েরা কোথায়?

তিনি সুরাইয়ার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। মেয়েদের ঘরের দিকে ছুটে গেলেন।

তিতলী ঘরেই ছিল। নাদিয়া তার বই নিয়ে গেছে ছাদে। মুখস্থ করার কোনো ব্যাপার থাকলে সে ছাদে চলে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সে পড়া মুখস্থ করে।

তিতলী শুয়ে ছিল। হাতপা গুটিয়ে কেন্নোর মতো শুয়ে থাকা। মাথাটা পর্যন্ত বালিশে নেই। বিয়ে হওয়া মেয়ে সবসময় সুন্দর করে সেজেগুজে থাকবে—কী বিশ্রী ভাবেই না সে আছে! মতিন সাহেব কড়া গলায় বললেন, তিতলী ওঠ তো! জামাই এসেছে—শওকত। যা কথাটথা বল, দেখ কী ব্যাপার। হাতমুখ ধুয়ে চুলটুল বেঁধে তারপর যা।

কলিংবেল বাজতে শুরু করেছে। দরজা খুলে দেবার মতো কেউ নেই। মতিন সাহেব নিজেই দরজা খোলার জন্যে গেলেন।

তিতলী শুয়ে শুয়ে কলিংবেলের শব্দ শুনছে—এক দুই তিন চার। চারবার বেল বাজল। হাসান বেল বাজাত দুবার। দুবারের বেশি কখনো না। দরজা না খুললে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার দুবার। এই বিষয়ে হাসানের বক্তব্য হচ্ছে দুই হচ্ছে পৃথিবীর সবচে সুন্দর সংখ্যা। দুই মানেই আমি এবং তুমি। এটা নিশ্চয়ই হাসানের নিজের কথা না। কোনোখান থেকে শুনে এসে বলেছে। এ রকম গুছিয়ে কথা হাসান বলতে পারে না।

সুরাইয়া দরজা ধরে দাঁড়ালেন। চাপা গলায় বললেন, মা শুয়ে আছিস? জামাই এসেছে। ওঠ মা।

তিতলী হাই তুলতে তুলতে বলল, তুমি এ রকম করে কথা বলছ কেন মা? জামাই এসেছে শুনে মনে হচ্ছে তুমি ভয় পাচ্ছ। জামাই এসেছে তো কী হয়েছে?

'হাতমুখ ধুয়ে বসার ঘরে যা।'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন মা? বিয়ে যখন করেছি বসার ঘরে নিশ্চয়ই যাব। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তুমি আমাকে চা খাওয়াও। চা খেয়ে তারপর যাব।'

'কাপড় বদলাবি না?'

'তুমি বললে অবশ্যই বদলাব।'

সুরাইয়া ক্ষীণস্বরে বললেন—তুই এ রকম করে কথা বলছিস কেন?

'আমি ভালোমতোই কথা বলছি—তুমি আমাকে নিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে আছ বলে আমার স্বাভাবিক কথাই তোমার কাছে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ভয় কোরো না মা। আমি হাস্যকর কোনো ড্রামা করব না। গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়া আমাকে দিয়ে হবে না। কেউ একজন আমাকে দিয়ে একটা খেলা শুরু করেছে। সেই খেলাটা আমি শেষ পর্যন্ত খেলব।'

'খেলা মানে? কী খেলা?'

'ও তুমি বুঝবে না মা। চা এনে দাও। চা খাব। চা খেয়ে গোসল করব। তারপর সেজেগুজে শওকত সাহেবের সামনে দাঁড়াব। উনি প্রেম করতে চাইলে প্রেম করব। হাত ধরতে চাইলে হাত ধরব।'

সুরাইয়া চিন্তিতমুখে রান্নাঘরে ফিরে এলেন। তাঁর মন বলছে এই মেয়ে ভয়ংকর কিছু করবে। সেই ভয়ংকরটা কী তিনি ধরতে পারছেন না। মেয়ের জন্যে এক বৈঠকে এক শ রাকাত নামায তিনি মানত করেছেন। রুসমতের পর মেয়ে যে রাতে প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবে সেই রাতে তিনি মানত শেষ করবেন। মানত শেষ না করা পর্যন্ত তিনি শান্তি পাচ্ছেন না।

মতিন সাহেব অতি আনন্দের সঙ্গে তাঁর জামাইয়ের সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর হাতে রথম্যান সিগারেটের প্যাকেট। শওকতের ভদ্রতায় এই মুহূর্তে তিনি মোহিত। শওকত তার জন্যে এক কার্টন রথম্যান সিগারেট এবং একটা লাইটার নিয়ে এসেছে। এমন সুন্দর লাইটার তিনি তাঁর জন্মে দেখেন নি। কখনো দেখবেন এই আশাও করেন না। লাইটারটা কালো রঙের। ছোট্ট একটা লাল বোতাম আছে। বোতামে চাপ দিলেই নীলাভ অগ্নিশিখা দেখা দেয়। লাইটারের কর্মকাণ্ড এইখানেই শেষ হয়ে যায় না। যতক্ষণ অগ্নিশিখা জ্বলে ততক্ষণই টুন টুন টুন শব্দ হতে থাকে। লাইটারটা তিনি এর মধ্যেই কয়েকবার জ্বালিয়েছেন–নিভিয়েছেন। আবারো জ্বালাতে ইচ্ছে করছে। জামাইয়ের সামনে এ জাতীয় ছেলেমানুষি শোভন হবে না বলে মনের ইচ্ছা চাপা দিয়ে রেখেছেন। তিনি সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, তারপর বাবা বল কেমন আছ?

শওকত বিনীতভাবে বলল, জ্বি ভালো।

'তুমি কি ধূমপান কর? করলে আমার সামনে সিগারেট খেতে পার। এইসব প্রিজুডিস আমার একেবারেই নেই। বিলেত, আমেরিকায় বাপ–ছেলে এক টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে—আর আমাদের দেশে..... শ্রদ্ধা–ভক্তি আসলে মনের ব্যাপার। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর কি কর না তা আমার সামনে সিগারেট খাওয়া না–খাওয়া দিয়ে বিচার করা যাবে না। তুমি কী বল?'

'জ্বি তা তো ঠিকই।'

'নাও একটা সিগারেট খাও।'

'আমি সিগারেট খাই না।'

'ভেরি গুড। এটা এমন একটা অভ্যাস যার কোনো ভালো দিক নেই—শরীর নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, পরিবেশ নষ্ট, অর্থ নষ্ট....কোটি কোটি টাকা ধোঁয়ায় উড়ে যাচ্ছে—ভাবাই যায় না। ঠিক বলছি না?'

'জ্বি।'

'তারপর বল তোমার খবরাখবর বল।'

শওকত লজ্জিত গলায় বলল, আমি একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছিলাম।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, বল ব্যাপারটা কী?

'আমার এক বন্ধুর বিয়ে। আমার ছোটবেলার বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিয়ে হচ্ছে গাজীপুরে। ওর খুব ইচ্ছা আমি তিতলীকে নিয়ে সেই বিয়েতে যাই.....'

'ইচ্ছে হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তুমি তিতলীকে নিয়ে যাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি নিয়ে যাবে এর মধ্যে আবার অনুরোধ কী?'

'এখনো ফরম্যালি উঠিয়ে নেয়া হয় নি.....'

'তুমি এইসব ব্যাপার নিয়ে একেবারেই চিন্তা করবে না। কাবিননামা তৈরি হওয়া মানে বিয়ে হয়ে যাওয়া।'

'ফিরতে হয়তো দেরি হবে। গাজীপুর অনেকখানি দূরে—।'

'হোক দেরি কোনো সমস্যা নেই। আমি রাত দুটার আগে ঘুমাই না।'

'আমার বন্ধু বলছিল রাতটা তার ওখানে থেকে যেতে। রাস্তাটা খারাপ। প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

'রাতটা থেকে সকালে আস। কোনো সমস্যা নেই। আমি তিতলীকে বলে দিচ্ছি। তুমি চা-টা কিছু খাবে?'

'এক কাপ চা খেতে পারি।'

'বোস তুমি, আমি চায়ের কথা বলে আসি।'

মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন—তাঁর সঙ্গে শওকত উঠে দাঁড়াল। শওকতের ভদ্রতায় মতিন সাহেব আবারো মোহিত হলেন। অসাধারণ একটা ছেলে—তিতলীর ভাগ্য ছক্কা ভাগ্য। দান ফেলেছে ছক্কা উঠে গেছে।

তিতলী লাল রঙের জামদানি শাড়ি পরেছে। লাল শাড়িতে কালো ফুল। শাড়ির পাড়টাও কালো। যেহেতু বিয়েতে যাচ্ছে সুরাইয়া মেয়েকে কিছু গয়নাও পরিয়েছেন। হাতে চারগাছ করে চুড়ি। গলায় পাথর বসানো হার। এই হার তিতলীর ফুফু ধার দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন ক্রমাগত আসছে। বিয়ে হওয়া মেয়ে খালি গলায় থাকবে এটা ঠিক না। তিতলীর কানে সবুজ পাথরের দুটা দুল। গায়ের শাড়ির সঙ্গে কানের এই দুলজোড়া মানাচ্ছে না। কিন্তু তারপরেও দেখতে ভালো লাগছে।

তিতলী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, মা আমাকে কেমন লাগছে? সুরাইয়া সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। মেয়ের বাঁ হাতের চেটোয় হালকা করে থু থু দিলেন। এই থু থু সুন্দর দেখানোর দোষ কাটিয়ে দেয়। খুব সুন্দর কখনো ভালো না। খুব সুন্দরকে ঘিরে থাকে অসুন্দর। তিতলী বলল, মা যাচ্ছি।

বিসমিল্লাহ করে রওনা হও মা। গলার হারটা সাবধানে রাখবে। খুলে পড়ে না যায়।

'পড়বে না।'

'শওকতের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবি।'

'অবশ্যই ভদ্রভাবে কথা বলব।'

'চোখমুখ এমন শক্ত করে রেখেছিস কেন? মনে হচ্ছে ফাঁসি দেখতে যাচ্ছিস। ঘর থেকে হাসিমুখে বের হ।'

'নতুন স্বামীর সঙ্গে হাসিমুখে বের হলে লোকজন বেহায়া ভাববে এই জন্যে চোখমুখ শক্ত করে রেখেছি।'

'বিয়েবাড়িতে মুখ এমন শক্ত করে থাকবি না।'

'আচ্ছা। এবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি।'

মতিন সাহেব মেয়েকে গাড়ি পর্যন্ত উঠিয়ে দিতে গেলেন। অবাক হয়ে বললেন, গাড়ির ড্রাইভার কোথায়?

শওকত বলল, ড্রাইভার নেই। গাড়ি আমি চালাব।

মতিন সাহেব আবারো মোহিত হলেন। জামাই গাড়ি চালিয়ে যাবে। পাশে বসে থাকবে তিতলী। অসাধারণ দৃশ্য। দেখাতেও আনন্দ।

গাড়ি সাবধানে চালাবে বাবা। ঢাকার ট্রাফিকের যে অবস্থা। নিয়মকানুন বলে কিছুই নেই। অদ্ভুত দেশ।

শওকত হাসিমুখে বলল, আপনারা কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি খুব সাবধানী ড্রাইভার।

মতিন সাহেব তাঁর নতুন লাইটারে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন—সাবধান হওয়াই ভালো। সাবধানের মার নাই।

শওকত শহর ছাড়িয়ে হাইওয়েতে না পড়া পর্যন্ত একটা কথাও বলল না। মনে হচ্ছে সে কী বলবে বা বলবে না তা গুছিয়ে নিচ্ছে। তিতলীর বসে থাকার মধ্যেও কোনো আড়ষ্টতা নেই। বাতাসে তার চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার ভালোই লাগছে।

'আমি একটা সিগারেট ধরালে কি তোমার খারাপ লাগবে?'

'জ্বি না।'

'আমি অবশ্যি তোমার বাবাকে বলেছি আমি সিগারেট খাই না। আসলে মাঝেমধ্যে খাই। আমি প্রফেশন্যাল না, এমেচার। তারপর বল কেমন আছ?'

'জ্বি ভালো আছি।'

'বল তো আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'আপনার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুর বিয়েতে। গাজীপুর।'

'এখানেও আমি তোমার বাবাকে একটা মিথ্যা কথা বলেছি। আমরা গাজীপুর যাচ্ছি ঠিকই কিন্তু কোনো বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছি না।'

'ও।'

'তোমাকে নিয়ে একটু ঘোরার ইচ্ছা হল। কাজেই একটা অজুহাত তৈরি করে তোমাকে বের করে নিয়ে এলাম। তুমি রাগ কর নি তো?'

'রাগ করব কেন?'

শওকত হাসিমুখে বলল, আমার সবচে ছোটমামাকে আমরা ডাকি মিজু মামা। উনি ফটকাবাজি ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছেন। গাজীপুরে একটা জঙ্গল কিনে বাগানবাড়ি বানিয়েছেন। আজ রাতের জন্যে সেই বাগানবাড়ির চাবি আমার কাছে। জঙ্গল তোমার কাছে কেমন লাগে?'

'জানি না। জঙ্গলে তো কখনো থাকি নি।'

'সত্যিকার জঙ্গল অবশ্যি আমাদের দেশে নেই। সুন্দরবনে খানিকটা আছে তাও মূলটা পড়েছে ইন্ডিয়ায়। তুমি কখনো ইন্ডিয়া গিয়েছ?'

'জ্বি না।'

'আমি নিয়ে যাব। ইন্ডিয়ার উত্তরপ্রদেশে বড় বড় জঙ্গল আছে। কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ বইটা পড়েছ? জিম করবেটের লেখা?

'জ্বি না।'

'ওই বইটা পড়লে জঙ্গল সম্পর্কে ধারণা পেতে। তোমার গলার এই হারটা তো খুব সুন্দর। কী পাথর এটা?'

'আমি জানি না। আমার ফুফুর হার। আমার না।'

'যতদূর মনে হয় জিরকন। জিরকন ছাড়া এমন ব্রাইট রেড পাথর হয় না। আমার কাছে অবশ্যি লালের চেয়ে নীল পাথর বেশি পছন্দ। একটা পাথর আছে নাম একুয়ামেরিন। অপূর্ব নীল! মনে হয় আকাশ জমাট বাঁধিয়ে পাথর তৈরি করা হয়েছে। তবে খুব হালকা পাথর। ভঙ্গুর। আমি যে বকবক করে যাচ্ছি, তোমার বিরক্তি লাগছে না তো?'

'জ্বি না।'

'তুমি মনে হয় কথা কম বল।'

'জ্বি না। আমিও প্রচুর কথা বলি, এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।'

'গাজীপুরে যেখানে যাচ্ছি সেখানে ছোটমামার এক বাবুর্চি থাকে—নাম মন্তাজ মিয়া। আজ রাতে সে-ই আমাদের রেঁধে খাওয়াবে। মন্তাজ মিয়ার বিশেষত্ব কী শুনবে?'

'বলুন শুনি।'

'মিজু মামার ধারণা—মন্তাজ মিয়া হচ্ছে পৃথিবীর পাঁচ জন সেরা রাঁধুনীর এক জন। ও শুধু দেশি রান্না পারে। রোস্ট টোস্ট পারে না। আমি শুনেছি তুমিও খুব ভালো রাঁধতে পার।'

'কার কাছে শুনলেন?'

'তোমার বড় ফুফু বললেন। তোমার হাতে নাকি জাদু আছে। আরেকবার তোমাকে নিয়ে এখানে আসব সেদিন তুমি রাঁধবে। সব যোগাড় যন্ত থাকবে। তুমি শুধু রান্না চড়িয়ে দেবে। তোমার কী কী লাগবে একটা লিস্ট করে দিলে সেইভাবে ব্যবস্থা করে রাখব। ঠিক আছে?'

'জ্বি ঠিক আছে?'

'তোমার কোন রান্নাটা ভালো হয়? মাছ না মাংস?'

'আমার মনে হয় মাছ।'

'সর্বনাশ করেছ, মাছ তো আমি খেতেই পারি না। মাছের মধ্যে চিংড়িটা খাই। তাও যে খুব আগ্রহ করে তা না।'

শওকত আরেকটা সিগারেট ধরাল। তিতলী তাকিয়ে আছে বাঁ পাশের জানালার দিকে। গাড়িতে বসে থাকতে তার ভালোই লাগছে। লোকটা অকারণে কথা বলে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে এটাও খারাপ লাগছে না। একবার তার ইচ্ছা করল বলে—ভাব জমানোর জন্যে অকারণ কথা বলার দরকার নেই। ভাব হবার হলে আপনাতেই হবে।

'একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছি তোমার অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'জ্বি না।'

'খুব সস্তা ধরনের একটা কথা তোমাকে বলার ইচ্ছে করছে তুমি কী ভাববে ভেবে বলতে অস্বস্তি বোধ করছি। এ জাতীয় কথা ছেলেরা বাংলা সিনেমায় বলে।'

'আপনার যা বলতে ইচ্ছে করে বলুন।'

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে। সারাক্ষণ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তাকিয়ে থাকলে অ্যাকসিডেন্ট হবে সেই ভয়ে তাকাচ্ছি না।'

'গাড়ি কোথাও পার্ক করুন। পার্ক করে তাকিয়ে থাকুন।'

শওকত শব্দ করে হেসে উঠল। সেই হাসি আর থামেই না।

বাগানবাড়িতে পৌঁছে শওকতের মুখের হাসি পুরোপুরি মিলিয়ে গেল। গেট তালাবন্ধ। আশপাশে কেউ নেই। ডাকাডাকি, চিৎকার, তালা ধরে ঝাঁকুনি কিছুতেই কিছু না। চারদিক জনমানবশূন্য। তিতলী বলল, আপনি না বলেছিলেন আপনার কাছে চাবি আছে।

শওকত বিরক্তমুখে বলল, ভেতরের ঘরের চাবি। গেটের চাবি নেই। সবাইকে খবর দেয়া আছে তারপরেও এ কী অবস্থা।

গেট শেষ পর্যন্ত খুলল। দারোয়ান ভেতরে ঘুমোচ্ছিল। চোখ ডলতে ডলতে সে এসে গেট খুলে দিল। এতে সমস্যার সমাধান হল না। শোনা গেল মন্তাজ মিয়ার জ্বর এসেছে বলে সে দুপুরে ঢাকায় চলে গেছে। রান্নার কোনো যোগাড় যন্তও নেই। সবকিছু মন্তাজের করার কথা। শওকত রাগে ফুঁসতে লাগল। তিতলী বলল, আপনি অস্থির হবেন না। একটা তো মোটে রাত—না খেয়ে আমি থাকতে পারব।

শওকত বিরক্ত গলায় বলল, না খেয়ে থাকবে কেন? আমি বাজারে যাচ্ছি, যা পারি নিয়ে আসব—দারোয়ান রাঁধবে। তুমি একা থাকতে পারবে তো? ঠিক একাও না। দারোয়ান থাকবে। থাকতে পারবে?

'পারব।'

'ভয়ের কিচ্ছু নেই। আর এই দারোয়ান খুব বিশ্বাসী।'

'আপনি বাজার করে আনুন। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।'

'তুমি ঘুরে ঘুরে বাগান দেখ। শোবার ঘরে ছোটখাটো লাইব্রেরির মতো আছে। গল্পের বইটই পড়তে পার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

তিতলী একা একা অনেকক্ষণ হাঁটল। বাগানবাড়িটা আসলেই সুন্দর। শহরে পাখির ডাক শোনা যায় না—এখানে অনবরত পাখি ডাকছে। কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। পাখির ক্যানক্যানে ডাক খুব শ্রুতিমধুর না। শান্ত কোনো বন কি পৃথিবীতে আছে? যেখানে একটি পাখিও ডাকে না? শুধু খুব বাতাস হলে পাতার শব্দ শোনা যায়। এ রকম বন থাকলে চমৎকার হত। ভদ্রলোকের মামা—কী নাম যেন মিজু মামা তিনি জায়গাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছেন। ঝিলের মতো

একটা জায়গার পাশে বসার জন্যে সিমেন্টের আসন বানিয়েছেন। দেখলেই বসতে ইচ্ছে করে। ঝিলের পানি অবশ্যি ঘোলা। পুকুর বা ঝিলের পানি হবে আয়নার মতো চকচকে—যে পানি দেখামাত্র হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করবে। যে পানিতে মুখ দেখতে মন চাইবে। এই পানির কাছে যেতে ইচ্ছে করে না।

মানুষের সঙ্গে পানির আশ্চর্য মিল আছে। কোনো কোনো মানুষকে পরিষ্কার ঝকঝকে পানির মতো মনে হয়। তাদের কাছে যেতে ইচ্ছে করে, সেই পানি ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করে, সেই পানিতে নিজের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে। আবার কিছু কিছু মানুষ এই ঝিলের পানির মতো হাত দিয়ে ছোঁয়া দূরের কথা, কাছে যেতেও ইচ্ছে করে না। তারপরেও যেতে হয়। এই যেমন সে ঝিলের এই পানি পছন্দ করছে না, তারপরেও পানির পাশেই বসে আছে।

'তিতলী তুমি এখানে?'

'জ্বি।'

'খাবারের ব্যবস্থা করেছি। ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছি। দোকানের চা। ওভালটিন দেয়া, খেতে পারবে কি না জানি না। খাবে?'

'জ্বি খাব।'

শওকত ব্যস্ত ভঙ্গিতে চা আনতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্লাস্ক এবং দুটা কাপ নিয়ে এল। শার্টের বুকপকেটে এক প্যাকেট বিসকিট। মনে হচ্ছে মানুষটা খুব গোছানো স্বভাবের।

'তিতলী।'

'জ্বি।'

'বাগানবাড়ি কেমন লাগছে?'

'সুন্দর।'

'আমাদের গ্রামের বাড়ি কিন্তু খুব সুন্দর। বিরাট পুকুর। শান বাঁধানো ঘাট। পানিও খুব পরিষ্কার—তোমাকে নিয়ে যাব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তুমি দেখি জ্বি এবং জ্বি আচ্ছা ছাড়া কোনো কথা বলছ না। মাথা ধরেছে?'

'জ্বি।'

'এই নাও প্যারাসিটামল। আমি গাড়িতেই বুঝেছি তোমার মাথা ধরেছে—একপাতা প্যারাসিটামল নিয়ে এসেছি। দাঁড়াও একটা পানির বোতল নিয়ে আসি।'

শওকত ব্যস্ত ভঙ্গিতে পানির বোতল আনতে গেল। তিতলী ট্যাবলেটের পাতা হাতে নিয়ে বসে আছে। সে নিজেকে তৈরি করছে। খুব কঠিন কিছু আজই তাকে বলতে হবে। বলতে হবে খুব সহজ ভঙ্গিতে। কথাগুলো সে মনে মনে অনেকবার বলেছে। মনে মনে বলা এক কথা, আর সামনাসামনি বলা আরেক কথা। তবু তাকে বলতেই হবে।

যে কথাটা সে বলবে তা হচ্ছে—আমি আপনাকে বিয়ে করে আপনার উপর খুব অবিচার করেছি। কারণ আমি কখনো আপনাকে আমার খুব কাছে আসতে দেব না। আমি নিজেকে সাজিয়েছি অন্য একজনের জন্যে। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন—কিংবা সারাজীবন পুতুলের মতো সাজিয়ে রাখতেও পারেন। সেটা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি কখনো আপনার অবাধ্য হব না। আমার কাছে আপনি যা চাবেন তাই পাবেন।

তিতলী একদৃষ্টিতে ঝিলের পানির দিকে তাকিয়ে আছে। পানিতে কিছু শুকনো পাতা পড়েছে। বাতাসে ঢেউয়ের মতো উঠেছে। পাতাগুলো ঢেউয়ে উঠছে-নামছে। দেখতে ভালো লাগছে।

'তিতলী!'

'জ্বি।'

'নাও পানি নাও—তুমি কি মাথাধরার ট্যাবলেট প্রায়ই খাও?'

'জ্বি।'

'বেশি খেও না। কিডনির ক্ষতি করে।'

শওকত তিতলীর পাশে বসল। তিতলী সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। শওকত বলল, জায়গাটা খুব সুন্দর না?

'জ্বি।'

'বাগানবাড়ি শুনতে অবশ্যি অস্বস্তি লাগে। বাগানবাড়ি শুনলেই মনে হয় নিষিদ্ধ আনন্দের জায়গা। বাগানবাড়ি না বলে খামারবাড়ি বললে মনে হয়—খুব কাজের জায়গা। A place for productive work. তিতলী তুমি কি গান পছন্দ কর?'

'করি।'

'কী ধরনের গান তোমার পছন্দ?'

'সব ধরনের।'

'নাচ? নাচ কেমন লাগে?'

'ভালো।'

'গানকে বলা হয় হৃদয়ের শব্দ, আর নাচকে কী বলা হয় জান?'

'জ্বি না।'

'নাচকে বলা হয় শরীরের সঙ্গীত। নাচ কত রকমের আছে জান?'

'জ্বি না।'

'নাচ মূলত চার রকমের—ভারত নাট্যম, কথাকলি, মণিপুরী, কথক। ইদানীং অবশ্যি আরো দুটা ধারা ধরা হচ্ছে—ওড়িশি, কুচিপুড়ি।'

'ও আচ্ছা।'

'এ ছাড়াও আছে—যেমন ধর লোকনৃত্য, ছৌ ছৌ, রায়বেঁশে, বাউল, ঝুমুর, কাঠিনৃত্য, ব্রতচারী, খেমটা, কারবা, তয়ফা, ঠুমকি, বিহু, ভাংরা, গরবা....।'

তিতলী মনে মনে হাসল। মানুষটা তাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে। গান, নাচ এই দুটি বিষয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ ব্যাপার মুখস্থ করে এসেছে। তিতলী কিছু বলবে না বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, নাচের এইসব নামধাম আপনি মুখস্থ করেছেন কেন?

শওকত হাসতে হাসতে বলল, এর একটা মজার ইতিহাস আছে। আরেক দিন বলব।

'আচ্ছা।'

'তুমি কি গান গাইতে জান?'

'জ্বি না।'

'তোমার ফুফু যে বললেন তুমি সুন্দর গান কর।'

'ভুল বলেছেন। আমার অনেক গুণ আছে এটা বোঝানোর জন্যে বানিয়ে বলেছেন।'

'তুমি যদি গান শিখতে চাও আমি শেখাবার ব্যবস্থা করব। শিখতে চাও?'

'জ্বি না।'

'এমনভাবে কথা বলছ কেন? তোমার কি মাথাধরা কমে নি?'

তিতলী জবাব দিল না। সে অনেক কথা বলে ফেলেছে আর ইচ্ছা করছে না।

১৩

আজ রীনার জীবনে খুব আনন্দময় একটা ঘটনা ঘটেছে। তার এমনই কপাল যে আনন্দের ঘটনাগুলো যখন ঘটে তখন আশপাশে কেউ থাকে না। নিজের সুখ অন্যকে দেখিয়েও আনন্দ। এই সুখ থেকে রীনা বারবার বঞ্চিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে একটা গল্পের বই নিয়ে সে ঘুমোতে গেছে। ফ্যান ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মেঝেতে সে শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়বে। এই ঘুমের আলাদা মজা। ঘুমে যখন চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে তখন কমলার মা বলল, আফনেরে কে জানি খুঁজে? বুড়া এক লোক।

রীনা বিরক্ত হয়ে বসার ঘরে গেল। মাথাভর্তি সাদা চুলদাড়ির এক ভদ্রলোক বসে আছেন। এই গরমেও তাঁর গায়ে সাদা সামার কোট। ভদ্রলোককে খুব চেনা লাগছে আবার ঠিক চেনাও যাচ্ছে না। ভদ্রলোক বললেন, কী রে রীন রীন টিন টিন চিনতে পারছিস না?

রীনা হতভম্ব গলায় বলল, ছোটমামা!

'যাক চুলদাড়ি দিয়ে তোকে বিভ্রান্ত করতে পারি নি। তোকে কিন্তু আমি একবার দেখেই চিনেছি। হাফপ্যান্ট পরা অবস্থায় তোর চেহারা যা ছিল—শাড়ি পরা অবস্থাতেও তাই আছে, একটুকুও বদলায় নি।'

রীনা তার ছোটমামার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কত প্রিয় একজন মানুষকে কতদিন পরে দেখা। মনে হচ্ছে অন্য কোনো জীবন থেকে মানুষটা হঠাৎ উঠে এসেছে। যেন একটা স্বপ্নদৃশ্য।

'মা শোন, কেঁদে সময় নষ্ট করিস না, আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি গত তিন দিন ধরে ঢাকায় আছি কিন্তু তোর ঠিকানা বের করতে পারছিলাম না। আজ বিকেলে ফ্লাইট।'

'এক্ষুনি চলে যাবে?'

'হ্যাঁ এক্ষুনি চলে যাব। আমি হংকঙের একটা সেমিনারে এসেছিলাম। হঠাৎ ভাবলাম বাংলাদেশ হয়ে যাই। তোর সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবু যাক শেষ মুহূর্তে দেখা হল।'

'তুমি এমন বুড়ো হয়ে গেলে কেন মামা?'

'বয়স কত হয়েছে দেখবি না?'

'তুমি সত্যি আজই চলে যাবে?'

'হ্যাঁ ইয়াং লেডি, তুই চোখের পানি মুছে ফেলে দুই-একটা কথাটথা বল আমি শুনি। তোর বরের সঙ্গে কথা বলার শখ ছিল ও তো মনে হয় অফিসে।'

'মামা আমি বাড়িওয়ালার বাসা থেকে টেলিফোন করে দিচ্ছি ও চলে আসবে।'

'কোনো দরকার নেই। আসতে আসতে এক ঘণ্টা লাগবে—ততক্ষণ আমি থাকব না। মা শোন আমি তোর জন্যে কোনো গিফট আনতে পারি নি—এখানে যে আসব তেমন পরিকল্পনা ছিল না। কয়েকদিন ছুটি পাওয়া গেল, তারপর দেখি টিকিটও এভেইলেবল। ভালো কথা, তোর ছেলেমেয়ে কী?'

'দুই ছেলে মামা—টগর এবং পলাশ।'

'বাহ্ নাম তো খুব সুন্দর! ওরা কোথায়?'

'ওরা তার ফুফুর বাসায় বেড়াতে গেছে।'

'আমার ভাগ্য খারাপ কারো সঙ্গে দেখা হল না। মা শোন আমি কিন্তু আর দশ মিনিট থাকব তারপর উঠব। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

রীনার মামা সত্যি সত্যি দশ মিনিট থাকলেন। যাবার সময় রীনার হাতে একটা খাম দিয়ে বললেন, তোর বিয়েতে আমি কিছু দিতে পারি নি এখানে সামান্য কিছু ডলার আছে। তুই তোর বরকে নিয়ে তোদের পছন্দমতো কোনো উপহার কিনে নিস। ছোটমামা চলে যাবার পর রীনা খাম খুলে দেখে সাতটা এক শ ডলারের নোট। নিশ্চয়ই অনেক টাকা। জীবনে এই প্রথম রীনা ডলার দেখছে। সবুজ রঙের এই নোটগুলোর কী প্রচণ্ড ক্ষমতা!

সারা বিকাল রীনা ডলারভর্তি খাম নিয়ে ঘুরে বেড়াল। সাত শ ডলারে ঠিক কত টাকা হবে তাও জানে না। জানতে খুব ইচ্ছা করছে। যত টাকাই হোক সে একটা পয়সা খরচ করবে না। জমা করে রাখবে। শুধু শীতের আগে আগে টগর এবং পলাশের জন্যে সুন্দর দুটা স্যুয়েটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনবে। গত বৎসর এদের জন্যে দুটা স্যুয়েটার তার খুব পছন্দ হয়েছিল। একেকটার সাড়ে চার শ টাকা করে দাম। তার বাজেটে ছিল পাঁচ শ টাকা। তারেককে ভালো একজোড়া পামসু কিনে দিতে হবে। প্রতিবছর ঈদের বাজারের সময় সে পামসু দেখে বেড়ায়। জুতা পরে মচ মচ করে খানিকক্ষণ হাঁটে। রীনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলে—ভালো ফিট করেছে। দাম শুনে আর কেনে না।

এই দুটা জিনিসের জন্যে সে যা টাকা লাগে খরচ করবে। তার বেশি না। একটা টাকাও না।

সন্ধ্যার আগে আগে তারেক ফেরে, আজ ফিরল না তবে হাসান ফিরল। রীনা প্রায় ছুটে গেল হাসানের ঘরে। উৎফুল্ল গলায় বলল, কেমন আছ হাসান?

হাসান প্রাণহীন গলায় বলল, ভাবী ভালো আছি।

হাসানের নিষ্প্রাণ গলা রীনার কানে বাজল না। সে আনন্দ ও উত্তেজনায় ঝলমল করছে।

'আজ এত সকাল সকাল ফিরলে যে?'

'একদিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ফিরে দেখলাম কেমন লাগে।'

'কফি খাবে হাসান?'

'কফি?'

'আজ তোমার ভাইকে চমকে দেবার জন্যে একটিন কফি কিনিয়ে এনেছি। এতটুকু একটা টিন, দাম নিয়েছে আশি টাকা।'

'ভাবী কফি খাব না।'

'আহা খাও। আমিও তোমার সঙ্গে খাব।'

'বেশ তো খাব।'

রীনা চেয়ারে বসতে বসতে বলল, হাসান তুমি কি জান বাংলাদেশে ডলার কত করে?

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না ভাবী।'

'এক শ ডলারের বদলে বাংলাদেশি কত টাকা পাওয়া যাবে?'

'তুমি ডলারের খোঁজ করছ কেন?'

রীনা খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আদার ব্যাপারি তো এইজন্যে ডলারের খোঁজ করছি। কত করে ডলার তুমি জান না?

'এক শ ডলারে তিন হাজার পাঁচ শ টাকা করে পাওয়া যায়।'

রীনা দ্রুত হিসাব করে বলল—চব্বিশ হাজার পাঁচ শ, কী সর্বনাশ!

'ভাবী বিড়বিড় করে কী বলছ?'

'আমি কী বলব তুমি বুঝতে পারবে না। দেখি তুমি হাত পাত তো। চোখ বন্ধ করে হাত পাত। আহা হাত পাত না।'

হাসান হাত পাতল।

রীনা তার হাতে একটা এক শ ডলারের নোট দিয়ে বলল, এটা তোমার।

'ভাবী ব্যাপারটা কী?'

'আমি কিছু ডলার পেয়েছি, সেখান থেকে এক শ ডলার তোমাকে দিলাম। তোমার টাকায় আমি কত অসংখ্যবার ভাগ বসিয়েছি আজ সামান্য কিছু তোমাকে ফেরত দিতে পেরে আমার কী যে ভালো লাগছে তা তুমি কোনোদিনও বুঝতে পারবে না।'

'ডলার তোমাকে কে দিয়েছে?'

'আমার ছোটমামা। আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন তিনি দেশ ছেড়ে চলে যান। আর ফিরে আসেন নি। তিনি আজ দুপুরে হঠাৎ বাসায় এসে উপস্থিত। যাবার সময় আমাকে সাত শ ডলার দিয়ে গেছেন।'

'তুমি তো বিরাট বড়লোক ভাবী।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বড়লোকের চেয়ে বড় কথা হল—আমি কী যে খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।'

'তোমার খিলখিল হাসি শুনে বুঝতে পারছি।'

'ডলারটা পকেটে রাখ হাসান।'

হাসান ডলারটা পকেটে রাখল। রীনা বলল, তোমার মুখ এমন শুকনো কেন তোমার কি শরীর খারাপ?

'না।'

'মন খারাপ?'

হাসান কিছু বলল না। রীনার গলার স্বর তীক্ষ্ণ হল, সে চিন্তিতমুখে তাকিয়ে আছে। হাসানের যে মন এতটা খারাপ তা সে বুঝতে পারে না। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে হাসানকে।

'সত্যি কিছু হয় নি?'

'না।'

'আমাকে বলতে পার। আমি শ্রোতা হিসেবে ভালো। তোমার সমস্যা আমাকে শুনিয়ে লাভ হবে না। আমি কিছু করতে পারব না। তারপরও শুনতে চাই।'

'শোনাবার মতো কোনো সমস্যা হয় নি।'

'বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? তিতলী বেগম।'

হাসান সামান্য হাসল। শার্টের পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে বলল, না ঝগড়া হয় নি।

'আমার মনে হচ্ছে তোমরা ঝগড়া করেছ। ভালবাসাবাসির সময়ে অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়। কঠিন প্রেম ভেঙে যায় যায় অবস্থাও হয়।'

'এসব কিছু না ভাবী। আমাদের কখনো ঝগড়া হয় নি। মনোমালিন্য হয় নি।'

'তাহলে কী?'

হাসান সহজ গলায় বলল, তিতলীর বিয়ে হয়ে গেছে।

রীনা বিস্মিত হয়ে বলল, কী বললে?

'কাল বিকেলে ওদের বাসায় গিয়ে শুনলাম হঠাৎ করে ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

'কবে বিয়ে হল?'

'কবে বিয়ে হল বলতে পারব না। এত কিছু জিজ্ঞেস করি নি।'

'ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'না। ও বাসাতেই ছিল—দেখা হয় নি।'

রীনা কোমল গলায় বলল, হাসান মনটা কি খুব বেশি খারাপ হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'তোমার মন ভালো করার মতো কিছু কি আমি করতে পারি?'

'কড়া করে এক কাপ কফি বানিয়ে খাওয়াতে পার।'

'তিতলীর উপর তোমার কি খুব রাগ হচ্ছে?'

'না রাগ হচ্ছে না। এক সময় আমরা দুজন একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে যত অন্যায়ই করুক আমরা কেউ কারো ওপর রাগ করব না। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি।'

রীনা উঠে দাঁড়াল। নিচু গলায় বলল, আমি তোমার জন্যে কফি নিয়ে আসছি। হাসান বলল, এখন কফি খাব না ভাবী। পরে একসময় বানিয়ে দিও। কারো হাতে বরং খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি পাঠাও—পানির পিপাসা হচ্ছে।

ঘর থেকে বের হওয়ামাত্র রীনার চোখে পানি এসে গেল। এমন একটা কষ্টের ব্যাপার ঘটেছে অথচ সান্ত্বনার কোনো কথা সে বলতে পারছে না। সান্ত্বনা হাসান চাচ্ছেও না। চাইলে নিজেই এসে বলত—। সে বলতে চায় নি রীনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করেছে। কোনো দরকার

ছিল না। কেন সে জিজ্ঞেস করতে গেল? রীনা বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রাত ন'টার মতো বাজে। টেবিলে রাতের খাবার দেবার সময় হয়েছে। কমলার মা আজ টেবিলে খাবার দেবে না। তার শরীর ভালো না। সন্ধ্যা থেকে কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। রীনা শংকিত বোধ করছে। কমলার মার লক্ষণগুলো ভালো মনে হচ্ছে না। তার শরীর খারাপটা দেশে যাওয়ার ছুতো না তো? প্রতিবারই দেশে যাবার আগে কমলার মার শরীর খারাপ করে। কয়েকদিন কোনো কাজকর্ম করে না। শুয়েবসে থাকে। তারপর হঠাৎ বলে মন টিকছে না, দেশে যাব। টিনের ট্রাংক গুছিয়ে সে তৈরি। কার সাধ্য তাকে আটকায়। আনন্দের ব্যাপার হচ্ছে সপ্তাহখানিক থেকে সে ফিরে আসে। ঘরের ছেলের বউয়ের যন্ত্রণায় টিকতে পারে না। এবার যদি ছেলের বউ যন্ত্রণা না করে, যদি আদর-যত্ন করে তাহলে কী হবে? আচ্ছা রীনার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু আগে সে হাসানের এত বড় একটা দুঃসংবাদ শুনেছে। শোনার পরে সে কিনা ভাবছে কমলার মার কথা?

রীনা রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। মনোয়ারার ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকলেন।

'বউমা শুনে যাও তো।'

রীনা শাশুড়ির ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে ভীত গলায় বলল, মা কিছু বলবেন?

শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলার সময় তার সব সময় একটু ভয় ভয় লাগে।

'তোমাকে দুপুরে একবার বললাম না ডেটল পানি দিয়ে আমার ঘরটা মুছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে? এখন বাজে রাত ন'টা। ঘরটা মোছা হবে কখন? আর শুকাবে কখন?'

'কমলার মার শরীরটা খারাপ। শুয়ে আছে।'

'দুদিন পরে পরেই তো শুনি শরীর খারাপ। মাখনের শরীর নিয়ে ঝি-গিরি করতে আসে কেন? পটের বিবি সেজে পালংকে ঘুমায়ে থাকলেই পারে। তুমি বালতিতে করে এক বালতি পানি, ডেটলের শিশি আর একটা ন্যাকড়া দিয়ে যাবে। তোমার শ্বশুরকে দিয়ে মোছাব। উপায় কী?'

'টগরদের খাইয়ে আমি নিজেই এসে মুছে দেব।'

'তোমার মুছতে হবে না। তারপর চারদিকে বলে বেড়াবে শাশুড়ি এই করেছে সেই করেছে। ছেলের বউয়ের কথা শোনার আমার দরকার নেই। এই বয়সে কথা শুনতে ভালো লাগে না।'

'আপনি কি মা এখন ভাত খাবেন?'

'এখন ভাত খাব না তো কি শেষরাতে খাব? এটা তো মা রোজার মাস না যে সেহেরি খাওয়াবে।'

'টেবিলে ভাত বেড়ে আপনাকে খবর দেব।'

'তারেক এসেছে?'

'জ্বি না।'

'এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকে?'

'জানি না মা।'

'জানি না মা বললে তো হবে না। জানতে হবে। পুরুষমানুষ আর ছাগল এই দুই জিনিসকে চোখে চোখে রাখতে হয়। কখন কিসে মুখ দেয় কিছু বলা যায় না। রাতে যেদিনই দেরি করে ফিরবে মুখের কাছে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকবে। মদ ফদ খেয়েছে কি না বোঝার এইটাই বুদ্ধি। একদিন তোমার শ্বশুর কী করেছে শোন; বাসায় ফিরেছে রাত বারটায়। দেখি মুখভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। দেখেই সন্দেহ হল কোনোদিন পান খায় না আজ হুজুর পান খাচ্ছেন কেন? মুখের কাছে মুখ নিতেই গন্ধ পেলাম। বললাম, গন্ধ কিসের? তোমার শ্বশুর বলল,

জর্দা দিয়ে পান খেয়েছি তো জর্দার গন্ধ। আমি বললাম, তুমি পানই খাও না—আজ একেবারে জর্দা দিয়ে পান। ব্যাপারটা কী? তখন দেখি হুজুর গাঁইগুঁই করে। একটু চাপ দিতেই আসল জিনিস বের হয়ে পড়ল। সে নাকি বন্ধুদের চাপে পড়ে অতি সামান্য হুইস্কি খেয়েছে। আমি বললাম, অতি সামান্যটা কত?

হুজুর বললেন, এক চামচ।

আমি বললাম, কত বড় চামচ? ডালের চামচ না চায়ের চামচ?

তরকারির চামচের এক চামচ।

আমি বললাম, এক চামচ হুইস্কি যখন খেয়েছ তখন এক চামচ গু খেতে হবে। গু খেলে বমি হবে। পেটের জিনিস বের হয়ে আসবে। আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, তোমাকে আজ আমি এক চামচ গু খাওয়াব বলেই চায়ের চামচে এক চামচ গু নিয়ে এলাম।'

রীনা শংকিত গলায় বলল, খাওয়ালেন?

'গু দেখেই হুজুরের খবর হয়ে গেল। বুঝে গেল আমি খাইয়ে ছাড়ব। বমিটমি করে ঘর ভাসিয়ে ফেলল। সত্যি সত্যি তো আর খাওয়াতাম না। ভাব ধরেছিলাম। ওই ভাবেই কাজ হয়েছে। শাশুড়ির কাছ থেকে একটা জিনিস শিখে রাখ মা। সব সময় ভাব ধরবে। ভাবেই কাজ হবে। পুরুষমানুষ যদি রাত এগারটা-বারটার সময় ঘরে ফেরে তখন বুঝবে খবর আছে। অনেক কথা বলা হয়েছে এখন যাও ভাত দাও। হুজুর কোথায়?'

'টগর আর পলাশকে পড়াচ্ছেন।'

'তাহলেই কাজ হয়েছে। ওদের আর ইহজনমে পাস করা লাগবে না। হুজুরকে আগে ভাত দাও। হুজুরের খাওয়া শেষ হলে আমাকে দেবে।'

তারেক ফিরল রাত বারটার একটু আগে। রীনা দরজা খুলে দিল। তারেক বিব্রতমুখে বলল, দেরি করে ফেললাম। তুমি ভাত খেয়েছ? রীনা না সূচক মাথা নাড়ল।

'তুমি খেয়ে নাও। আমি খাব না। খেয়ে এসেছি।'

'কোত্থেকে খেয়ে এলে?'

'বলছি দাঁড়াও। হাতমুখটা ধুয়ে নি। শরীর ঘামে চট চট করছে। রিকশা পাচ্ছিলাম না। হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা কাহিল। গোসল করে ফেলব কি না ভাবছি।'

'ভাবাভাবির কী আছে, কর।'

'তুমি এক কাপ চা দাও। গোসল করে গরম গরম এক কাপ চা খাব। আচ্ছা থাক তুমি খাওয়াদাওয়া সেরে চা দিও।'

'গিয়েছিলে কোথায়?'

'লাবণীদের বাসায় মিলাদের দাওয়াত ছিল। ওর স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকী। না গেলে ভালো দেখায় না। দুঃখী মেয়ে সেই জন্যেই যাওয়া।'

'মিলাদ কখন ছিল?'

'বাদ আছর ছিল। অফিস থেকে সরাসরি সেই জন্যেই চলে গিয়েছিলাম। মিলাদে লোকজন কিছুই হয় নি। বলতে গেলে আমি আর মওলানা সাহেব। মিলাদে তো আর আজকাল লোক হয় না, গানবাজনার জলসা হলে লোক হয়।'

'মিলাদ রাত বারটা পর্যন্ত চলল?'

'আরে না। আছর ওয়াক্তের মিলাদ খুব ছোট হয়। আমি চলে আসতাম লাবণী এমন কান্নাকাটি শুরু করল। ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রাত হয়ে গেল।'

তারেক বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রীনার খিদে মরে গেছে। কিছু মুখে দিতে ইচ্ছা করছে না। তারপরেও তাকে খেতে বসতে হবে কারণ লায়লা তার সঙ্গে খাবে বলে এখনো খায় নি। ভাবী খায় নি বলে সে না খেয়ে বসে থাকবে লায়লা তেমন মেয়ে নয়। তার পেটে বিশেষ কোনো গল্প আছে বলেই সে ভাবীর সঙ্গে নিরিবিলিতে খাবারের জন্যে অপেক্ষা করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে বসে রীনা বলল, কিছু বলবে লায়লা?

লায়লা বলল, না তো।

'তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাও।'

'কিছু বলতে চাই না। বলব আবার কী? ভাবী তুমি কি কখনো মাড ট্রিটমেন্ট করেছ?'

'মাড ট্রিটমেন্টটা কী?'

'মাড ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ভাবী অদ্ভুত একটা জিনিস। মুখের চামড়া ঠিক করার জন্যে এরচে ভালো কিছু হতে পারে না। কী করতে হয় শোন—কিছু এঁটেল মাটি নিতে হয়। কাগজি লেবুর রস, জামপাতার রস আর সামান্য ফিটকিরি মিশিয়ে এঁটেল মাটিটাকে কাদা বানাতে হয়। খুব মিহি কাদা প্রয়োজনে শিলপাটায় বেটে নেয়া যায়। তারপর সেই মিহি কাদাটা মুখে মেখে ঘুমিয়ে পড়তে হয়। সকালবেলা মুখ ধুয়ে ফেলা। সপ্তাহে একদিনও যদি করা যায় তাহলে মুখে কোনোদিনও রিংকেলস পড়ে না। চামড়া হয় উজ্জ্বল এবং সফট.....'

লায়লা আপন মনে কথা বলে যাচ্ছে রীনা মনে মনে ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলল—মেয়েটা কী সুখে আছে! পৃথিবীর কোনো সমস্যাই তাকে স্পর্শ করে না। সে আছে নিজের মতো। সাজগোজের সামান্য উপকরণ পেলেই সে তৃপ্ত। সংসার চলছে না, একটা ভাইয়ের চাকরি নেই, তার নিজের বিয়ের কিছু হচ্ছে না—তাতে কী?

'ভাবী।'

'হুঁ।'

'তুমি আমাকে খানিকটা এঁটেল মাটি যোগাড় করে দেবে?'

'তুমি মাড ট্রিটমেন্ট করে কী করবে। তোমার মুখের চামড়া এমনিতেই উজ্জ্বল। আয়নায় নিজেকে দেখ না?'

'দেখি তো। সারাক্ষণই তো আয়নায় দেখি। আমার নিচের ঠোঁটটা ভাবী একটু বেশি মোটা, আরেকটু কম মোটা হলে ভালো লাগত।'

'মোটা ঠোঁটের আলাদা সৌন্দর্য আছে।'

'এটাও ভাবী ঠিক বলেছ। পুরুষরা মোটা ঠোঁট পছন্দ করে। মোটা ঠোঁটের মেয়েদের খুব সেক্সি লাগে তো এই জন্যে।'

হাসান ভাত খাবে না।

তার জ্বর এসেছে। রীনা গায়ে হাত দিয়ে দেখেছে আসলেই জ্বর। বেশ ভালো জ্বর।

রীনা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ল। রুচি হচ্ছে না। প্লেটভর্তি ভাত রেখে উঠতেও কষ্ট হচ্ছে। ছোটবেলায় মা বলতেন না খেয়ে ফেলে রাখা প্রতিটা ভাত সত্তরটা করে সাপ হয়ে দংশন করবে। সেই স্মৃতি বোধহয় মনে রয়ে গেছে।

'ভাবী তোমার কি কোনো কারণে মন খারাপ?'

'না।'

'ভাবী মন সব সময় ভালো রাখতে হবে। মন খারাপ হলে শরীরের ওপর তার এফেক্ট হয়। চোখের নিচে কালি পড়ে, মুখের চামড়া টামড়া চিমসে মেরে যায়। মাথার চুলও পাতলা হয়ে যায়।'

'এই জন্যেই কি তুমি কখনো মন খারাপ কর না?'

'অনেকটা তাই। আমি দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপন করি ভাবী।'

'দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন যাপনের পদ্ধতি এক সময় তোমার কাছ থেকে আমার শিখতে হবে। আমি সব সময় ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় থাকি।'

'তোমাকে দেখে অবশ্যি তা বোঝা যায় না। তবে এক সময় বোঝা যাবে। হঠাৎ একদিন দেখা যাবে তুমি বুড়ি হয়ে গেছ। তোমার চামড়ায় রিংকেলস পড়েছে।'

'তখন মাড ট্রিটমেন্ট করব। এ ছাড়া আর উপায় কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাবী কমলার মা তো দেশে যাচ্ছে ওকে বলেছি কিছু এঁটেল মাটি নিয়ে আসতে।'

রীনা শংকিত গলায় বলল, ও দেশে যাচ্ছে নাকি?

'হ্যাঁ আমাকে তো বলল, তার নাকি শরীর টিকছে না।'

'কী সর্বনাশের কথা!'

'এক বস্তা এঁটেল মাটি নিয়ে এলে আমাদের অনেক দিন চলে যাবে।'

রীনা চা বানাতে বসেছে। লায়লা তার পাশে বসে অনবরত কথা বলে যাচ্ছে। রীনার মনে হল লায়লা তার মার স্বভাব পেয়েছে। দুজনই কথা বলতে পছন্দ করে। মাকে কথাগুলো বলা হচ্ছে সে শুনছে কি শুনছে না তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

তারেক গোসল শেষ করে তার ভাইয়ের ঘরে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা আসবে। চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। সিগারেটের অভ্যাসটা বোধহয় হয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই সিগারেট খেতে ইচ্ছে করে। একটা প্যাকেট কিনে আলমিরাতে রেখে দিতে হবে।

হাসানের ঘরে বাতি জ্বলছে। সে আধশোয়া হয়ে আছে। সন্ধ্যা থেকেই তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল এখন যন্ত্রণাটা বেড়েছে। জ্বর এসেছে। জ্বরটা কত কে জানে। মনে হচ্ছে আজ রাতে ঘুম হবে না। আর ঘুম হলেও হাঁসের স্বপ্নটা দেখবে।

'তোর শরীর খারাপ নাকি রে?'

'না।'

'মুখটুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে আছে। তোর কাছে কি সিগারেট আছে? থাকলে একটা দে।'

হাসান প্যাকেট বের করল। একটা সিগারেট বের করে ভাইয়ের দিকে দিল। তারেক বলল, আরেকটা দে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাব।

'তোমার দেখি সিগারেটের নেশা হয়ে যাচ্ছে।'

তারেক হাসল। হাসানের মনে হল তার ভাইকে আজ খুশি খুশি লাগছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার জীবনে আনন্দময় কোনো ঘটনা ঘটেছে।

'ভাইয়া বস।'

'তোর ভাবীকে বলেছিলাম চা দিতে। ভুলে গেছে কি না কে জানে।'

'ভাবী ভুলবে না।'

'তুই খাবি? তুই খেলে রীনাকে বলে আসি।'

'আমি খাব না। তুমি খাও।'

তারেক বসল। আরাম করে সিগারেট ধরাল। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোর চাকরির ব্যাপারে আজ কথা বললাম।

'কার সঙ্গে কথা বললে?'

'লাবণীর সঙ্গে কথা বললাম। লাবণীর আপন মামা কমার্স মিনিস্টার। তাদের হাতে অনেক চাকরি। লাবণীর চাকরির ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।'

'আজ কি তুমি ওই মহিলার বাসায় গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'প্রায়ই কি যাও?'

'প্রায়ই যাব কী? মাঝেমধ্যে যাই। দুঃখী মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বললে মনে শান্তি পায়। আজ ওর হাসবেন্ডের মৃত্যুদিবস ছিল। সেই উপলক্ষে মিলাদ।'

'ও।'

'লাবণীকে চিটাগাং বদলি করে দিয়েছে। সামনের সপ্তাহে চলে যাবে। অফিসের কাণ্ডকারখানা দেখ—একটা মহিলা হুট করে তাকে বদলি করে দিল চিটাগাং।'

'উনার মামাকে দিয়ে বলালেই বদলি রদ হয়ে যাবে।'

'লাবণীও চিটাগাং যেতে চাচ্ছে—সেখানে কোয়ার্টার পাবে। নিজের মতো করে থাকতে পারবে। অবশ্যি আজকালকার সোসাইটি যা হয়েছে একজন মহিলার পক্ষে বাচ্চা একটা মেয়ে নিয়ে থাকা মুশকিল। তার উপর আবার বিধবা।'

'হুঁ।'

'একা একা চিটাগাং যেতেও ভয় পাচ্ছে। আমি বলেছি পৌঁছে দেব।'

'তোমার যাওয়াটা ঠিক হবে না ভাইয়া।'

'এত জিনিসপত্র নিয়ে একা একা যাবে কীভাবে?'

'দরকার হলে আমি পৌঁছে দেব।'

'তোর সঙ্গে যাবে কেন? তোকে সে চেনে নাকি? আমাকেই যেতে হবে। তোর ভাবীকে বলব দুদিনের একটা ট্যুর পড়ে গেছে।'

হাসান গভীর বিস্ময়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। কী রকম সহজ সরল ভঙ্গিতে কথা বলে যাচ্ছে—যেন জীবনে জটিলতা বলতে কিছুই নেই। জীবনটা শান্ত দিঘির জলের মতো।

রীনা চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হল।

'তুমি এখানে আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তারেক আনন্দিত গলায় বলল, হাসানের সঙ্গে গল্প করছিলাম—ওর চাকরির একটা লাইন পাওয়া গেছে। লাবণীর এক মামা হচ্ছেন কমার্স মিনিস্টার। ফুল মিনিস্টার না—প্রতিমন্ত্রী। তবে প্রতিমন্ত্রীদেরও অনেক ক্ষমতা। মোটামুটি ধরনের একটা চাকরি ওদের কাছে কোনো ব্যাপারই না। লাবণী বলেছে একটা বায়োডাটা তৈরি করে ওর হাতে দিতে।

রীনা গম্ভীর গলায় বলল, ভালো কথা, দিও।

তারেক উৎসাহী গলায় বলল, হাসান তুই সুন্দর করে একটা বায়োডাটা তৈরি করে দু-এক দিনের মধ্যে আমাকে দে, সার্টিফিকেট মার্কশিটের ফটোকপি দিবি, দুটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, লেটার অব রেফারেন্স কিছু থাকলে তাও দিবি।

'আচ্ছা দেব।'

'আমি যাই তুই আরাম করে ঘুমো। এত চিন্তা করে কী হবে। রুটিরুজি নিয়ে এত চিন্তা করতে নাই।'

তারেক চলে যাবার পর হাসান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। গত রাতে সে এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমোতে পারে নি—মনে হয় আজো ঘুমোতে পারবে না। কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসা দরকার ছিল।

তিতলী অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে সুখে আছে—গল্প করছে এই চিন্তাটাই তাকে কষ্ট দিচ্ছে। তিতলী কী নিয়ে গল্প করে? তার গল্প করার বিষয়বস্তুর অভাব হবার কথা না। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়েও সে সুন্দর কথা বলে। বড়লোক স্বামীর ঘর করছে—গানও নিশ্চয়ই এখন শিখবে। সে কি তার স্বামীকে ওই গানটা শোনাবে? যে গানটা তাকে শোনাবার কথা ছিল। গানটার লাইনগুলো কী? আশ্চর্য এখনো মনে আসছে না। এক কপি গীতবিতান কিনে প্রতিটি গানের প্রথম লাইনের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই গানটা পাওয়া যাবে। হাসান সেটা চাচ্ছে না। তার ইচ্ছা আপনাতেই গানটা তার মনে আসুক। "বিধি ডাগর আঁখি"? উঁহুঁ। "চরণ ধরিতে দিও গো...." উঁহুঁ। না তাও না। তাহলে গানটা কী?

হাসানের মাথা দপ দপ করছে। সে উঠে এসে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়াল। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ আছে—চাঁদটা দেখা যাচ্ছে না। ডানদিকের সাততলা বাড়ির আড়ালে ঢাকা পড়েছে। তিতলী এবং তার স্বামী কি চাঁদটা দেখতে পাচ্ছে? আচ্ছা তারা কি জেগে আছে? জেগে থাকারই কথা। নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রীরা চট করে ঘুমোতে যায় না। এক ধরনের মধুর ইনসমনিয়ায় তারা আক্রান্ত হয়। হাসানের মাথাধরাটা আরো বাড়ছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুমের দিকে রওনা হল। কলের নিচে মাথা দিয়ে সে কলটা অনেকক্ষণ ছেড়ে রাখবে। কলে পানি আছে তো? কদিন ধরে পানির খুব টানাটানি যাচ্ছে। সন্ধ্যারাতেই পানির ট্যাংক খালি হয়ে থাকে। আজ কি কৃষ্ণপক্ষ না শুক্লপক্ষ?

১৪

এক শ ডলারের নোটটা হাসান ভাঙিয়েছে। তার ভাগ্য ভালো ডলারের দাম হঠাৎ চড়ে যাওয়ায় তিন হাজার সাত শ টাকা পেয়ে গেছে। এক শ টাকার নোটে পাঞ্জাবির পকেট ভর্তি। একটা হাত সব সময় পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে হচ্ছে। সব সময় টাকা ছুঁয়ে থাকা।

হাসান আজ কিছু উপহার কিনবে। লিটনের স্ত্রীর জন্যে ভালো একটা শাড়ি। লিটনের জন্যে একটা পাঞ্জাবি, পায়জামা এবং একজোড়া স্যান্ডেল। লিটনের স্যান্ডেল দেখে সেদিন খুব মায়া লেগেছিল। উপহারের চেয়ে টাকাটা পেলে তাদের কাজে লাগত। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় বিয়ে করার যন্ত্রণায় হাসানকে যেতে হয় নি। এটা কম কি?

তার জীবনে যা ঘটেছে মনে হয় ঠিকই ঘটেছে। তিতলীর ভালো বিয়ে হয়েছে। প্রথম কিছুদিন সে কষ্ট করবে তারপর সেই কষ্ট গা সহা হয়ে যাবে। সব কষ্টই মানুষের একসময় শেষ হয়ে যায়। মানুষের কষ্ট গ্যাস বেলুনের মতো—উঁচুতে উঠে থাকে—এক সময় না এক সময় সেই বেলুন নেমে আসতে থাকে। বেলুনভর্তি গ্যাস থাকে ঠিকই তবে গ্যাসের বেলুনকে উড়িয়ে রাখার ক্ষমতা থাকে না।

হাসান সুন্দর একটা সিল্কের শাড়ি কিনল। শাড়ি কেনার সময় তিতলীর কথা মনে পড়ল। কোন রংটা তিতলীকে মানাবে ভেবে কেনা। শাড়ি পছন্দ করার একটা বুদ্ধিও তিতলী তাকে শিখিয়ে দিয়েছিল। সেই বুদ্ধিটাও খুব সুন্দর। "দোকানদার অনেকগুলো শাড়ি মেলে ধরবে। তখন তুমি দেখবে কিছু কিছু শাড়ি তোমার হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করবে। ওই শাড়িগুলোই শুধু কিনবে।" তিতলী সব সময় মজার মজার কথা বলত। এখনো কি বলে?

লিটনকে তার মেসে পাওয়া গেল। কেরোসিনের চুলায় সে ভাত বসিয়েছে। একটা বাটিতে ডিম ফেটে রেখেছে। ভাত নেমে যাবার পর ডিম ভাজবে। লিটন হাসানকে দেখে লাফিয়ে উঠল—আরে তুই।

'ভাবীকে দেখতে এসেছি, আমাকে নিয়ে চল।'

লিটন হাসিমুখে বলল, আশ্চর্য কাণ্ড, আমি গত রাতে স্বপ্নে দেখেছি তুই এসেছিস। খুবই অদ্ভুত একটা স্বপ্ন।

দেখি কী, আমি আর শম্পা কক্সবাজারে বেড়াতে গেছি। সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছি। হঠাৎ শম্পা চেঁচিয়ে বলল, ওই দেখ তোমার বন্ধু বসে আছে। আমি বললাম, তুমি তো তাকে কোনোদিন দেখ নি। চিনলে কী করে। শম্পা তখন এমন হাসতে শুরু করল যে হাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়িতে দেখি রাত তিনটা বাজে। তারপর আর ঘুম হয় নি। রাতে চা বানিয়ে খেলাম। সকালে দোকান থেকে পরোটা এনে খেয়েছি। এখন এগারটা বাজে, এর মধ্যে ক্ষিধে লেগে গেছে। ভাত বসিয়েছি।

'নিজেই রান্না করে খাস?'

'হুঁ। খরচ বাঁচে। অবস্থা কাহিল রে দোস্ত।'

'তুই ভাত খেয়ে নে। আমি বসি।'

'তোকে একটা ডিম ভেজে দি খা।'

'না—আমি খাব না।'

'খা নারে দোস্ত। আমি গরিব মানুষ এর বেশি কী দেব। দাঁড়া আমি চট করে একটা ডিম নিয়ে আসি।'

'আমার জন্যে কিচ্ছু আনতে হবে না। তুই খেয়ে শেষ কর। তোর জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি—গায়ে দিয়ে দেখ লাগে কি না।'

'আমার জন্যে পাঞ্জাবি কেন? আমি কী করলাম?'

'তুই বিয়ে করেছিস। ফকির অবস্থায় বিয়ে করে যে সাহস দেখিয়েছিস সেই সাহসের পুরস্কার।'

'মাই গড! স্যান্ডেলও কিনেছিস নাকি?'

'হ্যাঁ। তোর এখনকার স্যান্ডেলজোড়া দয়া করে আমার হাতে দে। আমি নিজে ডাস্টবিনে ফেলব।'

'এত দামি পাঞ্জাবি কিনেছিস? টাকা পেলি কোথায়? তোর কি চাকরি বাকরি কিছু হয়েছে?'

'না। শোন লিটন তোদের উপহার দেয়ার জন্যে আমি কিছু টাকা বাজেট করেছিলাম। উপহার কেনার পর কিছু টাকা বেঁচে গেছে। এই টাকাটাও আমি দিতে চাই। কার কাছে দেব? তোর কাছে না তোর স্ত্রীর কাছে?'

লিটন কথা বলছে না। তার ডিম ভাজা হয়ে গেছে—আগুনগরম ভাত সে কপ কপ করে খাচ্ছে। অভাবের সময় মানুষের ক্ষিধে বেশি লাগে এটা বোধহয় ঠিক।

'হাসান।'

'হুঁ।'

'তুই যে খুব অদ্ভুত একটা প্রাণী তা কি তুই জানিস?'

'না।'

'তোর বন্ধুবান্ধবরা সবাই কিন্তু এটা জানে।'

'জানলে তো ভালোই।'

'কত মানুষের দোয়া যে তোর উপর আছে!'

'দোয়ায় তো কাজ হয় না।'

'তা হয় না। কাজ হলে আমার দোয়াতেই তোর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। ভালো চাকরি বাকরি করে সুখে ঘর-সংসার করতি।'

'আমি সুখেই আছি।'

'সুখে থাকলে তো ভালোই।'

লিটন নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরল। স্যান্ডেল পরল। হাসিমুখে বলল, হাসান আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

'খুবই ভালো দেখাচ্ছে শুধু মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িটায় সমস্যা করছে। ভালোমতো শেভ কর।'

'নাপিতের দোকানে শেভ করব। শম্পা আজ কী যে খুশি হবে—ওর খুশি খুশি মুখ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গত চার দিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

'কেন?'

'খুবই লজ্জার ব্যাপার—তোকে বলতেও লজ্জা লাগছে।'

'লজ্জা লাগলে বলার দরকার নেই।'

'শোন। তোকে না বললে আর কাকে বলব, হয়েছে কী, শেষবার যখন শম্পার সঙ্গে দেখা হল সে হঠাৎ খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিতে পারবে? আমি বললাম, কত? সে বলল, পাঁচ শ টাকা দিলেই হবে। আমি বললাম, আজ তো সঙ্গে নেই। পরের বার যখন আসব নিয়ে আসব। টাকার যোগাড় হয় নি যাওয়াও হয় নি। আজ তুই যখন বললি, উপহার কেনার পর কিছু টাকা বেঁচেছে তুই টাকাটা দিয়ে দিতে চাস তখন আমার চোখে পানি

AMARBOI.COM

এসে গিয়েছিল। তুই বোধহয় লক্ষ্য করিস নি আমি সেই সময় ডিম ভাজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। পুরুষমানুষের চোখের পানি কাউকে দেখাতে নেই।'

শম্পা শাড়ি দেখে ছেলেমানুষের মতো খুশি হল। কয়েকবার বলল, আশ্চর্য এত সুন্দর শাড়ি! এত সুন্দর রং!

লিটন বলল, যাও তো তুমি শাড়ি পরে আস। আর এই খামটা রাখ।

'খামে কী?'

'এক হাজার টাকা আছে। রেখে দাও—টুকটাক খরচ আছে না?'

শম্পা খুবই লজ্জিত ভাবে হাসানের দিকে তাকাচ্ছে। লিটন বলল, হাসান মিষ্টি এনেছে—মিষ্টি ভেতরে দিয়ে আস। বাচ্চারা খাক। আর শোন তুমি হাসানের সঙ্গে দু-একটা কথাটথা বল। এমন মূর্তির মতো বসে আছ কেন?

শম্পা আরো লজ্জিত হয়ে বলল, আমি শাড়িটা পরে আসি। আর শোন তুমি এই চার দিন আস নি কেন?

'মানুষের কাজকর্ম থাকে না?'

শম্পা হাসানকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে লিটনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি গতকাল তোমার মেসে গিয়েছিলাম। তুমি ছিলে না। কেউ তোমাকে বলে নি?

'কী আশ্চর্য! তুমি মেসে উপস্থিত হলে কোন আন্দাজে। তোমাকে না বলেছি আজেবাজে জায়গায় থাকি কখনো যাবে না।'

'কেন তুমি চার দিন আসলে না?'

শম্পার চোখে পানি এসে গেছে। একটু আগে যে মেয়ে শাড়ি হাতে আনন্দে ঝলমল করছিল এখন সে প্রায় বাচ্চাদের মতোই শব্দ করে কাঁদছে। হাসান খুব অস্বস্তিতে পড়েছে। আবার তার খুব ভালোও লাগছে। তার মন বলছে লিটনের সব সমস্যার সমাধান হবে। তাদের দুজনের সুন্দর সংসার হবে। সেই সংসারে চাঁদের মতো খোকাখুকু আসবে। ভালবাসার পবিত্র অশ্রু প্রকৃতি কখনো অবহেলা করে না।

লিটন খুবই বিব্রত বোধ করছে। তার অসহায় মুখ দেখেও হাসানের মায়া লাগছে। এদের দুজনের মাঝখানে এখন তার আর থাকা ঠিক না। তার সরে যাওয়া উচিত। কিন্তু এই সুন্দর আনন্দময় দৃশ্য দেখার লোভও সামলানো যাচ্ছে না।

লিটন বলল, শম্পা তুমি যাও তো শাড়িটা পরে আস। আর শোন প্লেটে করে হাসানকে একটু মিষ্টি দাও। ওর মিষ্টিই ওকে খাইয়ে দি। বেলপাতায় বেলপূজা। হা হা হা।

শম্পা শাড়ি হাতে ভেতরে চল গেল। লিটন বলল, হাসান আমার বউকে কেমন দেখলি?

'সুন্দর। খুব সুন্দর।'

'ছেলেমানুষ—বয়সও অবশ্য কম। জুন মাসে আঠার হবে। এই কদিন আসি নি কেঁদেকেটে কী সিন ক্রিয়েট করল দেখলি! তুই থাকায় রক্ষা নয়তো আরো হইচই করত।'

'লিটন তুই এক কাজ কর বউকে নিয়ে আজ সারাদিন ঘুরে বেড়া। কিছু টাকা তো আছে?'

'কোথায় ঘুরব?'

'জাদুঘর, চিড়িয়াখানা কিংবা এক কাজ কর—সদরঘাটে গিয়ে একটা নৌকা ভাড়া কর। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরবি। কিছু খাবারদাবার সঙ্গে নিবি, একটা ফ্লাস্কে করে চা।'

'নৌকা ভাড়া কত জানিস?'

'ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া। পঞ্চাশ টাকা করে ঘণ্টা। নৌকায় বসে দুজনে গল্পগুজব করবি।'

'মাজি ব্যাটা তো সব শুনবে।'

'শুনুক, অসুবিধা কী?'

'তুইও চল আমাদের সাথে।'

'আরে না। আমি না। পুরো ব্যাপারটাই দুজনের।'

'শম্পার চুল কত লম্বা দেখেছিস?'

'হ্যাঁ, খুব লম্বা চুল।'

'সেদিন কী বলল শোন, ফট করে বলল, আমি যদি তার সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া করি তাহলে সে চুল কেটে ফেলবে। যা সেনসেটিভ স্বভাব—কেটে ফেলবে তো বটেই। আমি খুব ভয়ে ভয়ে থাকি।'

লিটন তৃপ্তির হাসি হাসছে। হাসান মুগ্ধ হয়ে লিটনের হাসি দেখছে। না, শম্পা মেয়েটা ভাগ্যবতী। সে তার এক জীবনে অসংখ্যবার স্বামীর সুন্দর হাসি দেখবে।

১৫

হিশামুদ্দিন সাহেব বাথরুমে ঢুকে কল ছাড়লেন তখন হঠাৎ তাঁর মনে হল ভূমিকম্প হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। অস্পষ্ট কাঁপুনি। আশ্চর্য কাণ্ড! সেই কাঁপুনি তাঁর শরীরের প্রতিটি কোষে ঢুকে যাচ্ছে। শরীরও কাঁপছে। ব্যাপারটা কী? তিনি এক হাতে বেসিনে ধরে ভূমিকম্পের ধাক্কা সামলালেন। ভূমিকম্পের সময় ঘরবাড়ি ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় ছুটে যেতে হয়। তাঁর পা জমে গেছে—তিনি বাথরুম থেকে বেরোবার আশা ছেড়ে দিলেন। বের হওয়া এখন অসম্ভব। তাঁকে যেতে হবে দরজা পর্যন্ত। দরজার লক খুলতে হবে। অথচ পা জমে আছে। ভূমিকম্পের দুলুনি আরো বাড়ছে। তাঁর শরীরের দুলুনিও বাড়ছে। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন—চিত্রলেখা! চিত্রলেখা! নিজের গলা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে কি না তাও তিনি বুঝতে পারছেন না। চারদিক থেকে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। সবাই যেন টিনের থালাবাসন হাতুড়ি দিয়ে পেটাচ্ছে। তিনি আবারো ডাকলেন—চিত্রলেখা! চিত্রলেখা। কেউ কি আযান দিচ্ছে। তিনি আযানের শব্দও শুনছেন।

মহাপ্রাকৃতিক বিপদে মানুষ আযান দেয়। আযান কে দিচ্ছে? মোতালেব?

বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ছে। কে যেন মিষ্টি গলায় ডাকছে—বাবা দরজা খোল। দরজা খোল। কে ডাকছে? চিত্রলেখা? তার গলা তো এমন না। মনে হচ্ছে দশ বছরের কোনো বালিকা।

'বাবা তোমার কী হয়েছে?'

'ভূমিকম্প হচ্ছে রে মা।'

'দরজাটা খোল তো বাবা।'

'আমি নড়তে পারছি না রে মা।'

খোলা কল দিয়ে ছড়ছড় শব্দে পানি পড়ছে। বাথরুমের আলো উজ্জ্বল হচ্ছে আবার কমে যাচ্ছে। হিশামুদ্দিন বুঝতে পারছেন তাঁর বাথরুমের দরজার পাশে অনেকেই ভিড় করেছে। দরজায় শব্দ হচ্ছে। তারা বোধহয় দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টা বাদ দিয়ে তাদের উচিত—নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়া। ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কারো দিকে তাকাতে হয় না। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী কারো দিকেই না। শুধুই নিজেকে বাঁচানো। তার মধ্যে দোষের কিছু নেই। প্রকৃতি মানুষের ডিএনএ কোডে এই ব্যাপারটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির মমতা তার সৃষ্টির জন্যে। প্রকৃতি জানে মহা বিপদের সময় যদি একে অন্যকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে তাহলে কেউ বাঁচবে না। কাজেই প্রকৃতি এই বিধান ডিএনএ-তে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যে বিধানে ভয়ংকর বিপদে মানুষের সব চিন্তা নিজের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু এরা এমন করছে কেন? এরা কেন ছুটে গিয়ে মাঠে কিংবা ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়াচ্ছে না। টিনের থালাবাসন পেটানোরও বা অর্থ কী। আনন্দের কোনো ব্যাপার তো না যে ঘণ্টা বাজাতে হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাথরুমের দরজা ভাঙা হয়েছে। দরজার ওপাশে উদ্বিগ্নমুখে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। মোতালেব, রহমতউল্লাহ, চিত্রলেখা। চিত্রলেখা বাথরুমে ঢুকে বাবার হাত ধরল। পানির ট্যাপ বন্ধ করল। হিশামুদ্দিন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন, ভূমিকম্প হচ্ছে। চিত্রলেখা বলল, ভূমিকম্প হচ্ছে না। তোমার শরীর খারাপ করেছে। মনে হয় প্রেসার সাডেন শুট করেছে। তুমি কি আমার হাত ধরে ধরে হাঁটতে পারবে? নাকি তোমাকে কোলে করে নিতে হবে?

'হাঁটতে পারব।'

'তাহলে এস।'

'পা আটকে গেছে। পা নাড়াতে পারছি না।'

'কোনো অসুবিধা নেই। আপাতত পা না নাড়ালেও চলবে। তোমাকে কোলে করে নেবার ব্যবস্থা করছি।'

হিশামুদ্দিন সাহেব খুবই বিস্মিত হচ্ছেন। কল বন্ধ করা হয়েছে অথচ এখনো পানি পড়ার ছড়ছড় শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে শব্দটা মাথার ভেতর ঢুকে পড়েছে। অনন্তকাল এই শব্দ মাথার ভেতর হতেই থাকবে। একঘেয়ে শব্দের জন্যে হিশামুদ্দিন সাহেবের কেমন ঘুমও পেয়ে গেছে। যন্ত্রণাময় ঘুম। প্রবল জ্বরের সময় এ ধরনের ঘুম পায়। ঘুম হচ্ছে অথচ শারীরিক সব যন্ত্রণা টের পাওয়া যাচ্ছে। সবার কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে—এ রকম।

হিশামুদ্দিন সাহেব শুয়ে আছেন তাঁর নিজের খাটে। ঘর অন্ধকার। জানালার সব পরদা টেনে দেয়া। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। দিনের শুরুটা ঠাণ্ডা। ফ্যানের বাতাসে তাঁর শীত শীত লাগছে। গায়ে একটা পাতলা চাদর দিয়ে দিতে কি চিত্রলেখাকে বলবেন? শীত শীত ভাবটা খুব যে খারাপ লাগছে তা না। মাঝে মাঝে একটু শুধু কাঁপন লাগছে—এই যা।

'শরীরটা এখন কেমন লাগছে বাবা?'

'ভালো।'

'তোমার ব্লাডপ্রেসার এখন অনেকখানি কমেছে। তবে পালস রেট এখনো হাই—মিনিটে ৯৮, তবে রেগুলার হয়েছে—আগে খানিকটা ইরেগুলারিটি ছিল। তোমাকে আমি ট্রাংকুলাইজার দিয়েছি। এতে ঘুম হবে কিংবা তন্দ্রার মতো হবে। তোমার থরো চেকাপের একটা ব্যবস্থা আমি করছি। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটা তুমি নাড়াতে পার কি না একটু দেখ তো।'

হিশামুদ্দিন পায়ের বুড়ো আঙুল নাড়ালেন। চিত্রলেখা বলল, গুড। এখন ব্রেকফাস্ট কর। হালকা কিছু খাও। দুধ সিরিয়েল, আধ কাপ ফলের রস। এক কাপ আগুনগরম চা।

'তুই তো সত্যিকার ডাক্তারদের মতো কথা বলছিস।'

'আমি তো সত্যিকারেই ডাক্তার। আমি এখন একটু বের হব। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরব। তোমার কানে যে যন্ত্রণা হচ্ছিল সেটা কি এখনো হচ্ছে?'

'না।'

'একসেলেন্ট। কাঁপছ কেন? তোমার কি শীত লাগছে?'

'একটু মনে হয় লাগছে।'

'গায়ে চাদর দিয়ে দেব?'

'না।'

'আমি রহমতউল্লাহকে তোমার নাশতা দিয়ে যেতে বলেছি।'

'কটা বাজে?'

'এখন বাজছে আটটা পঁয়ত্রিশ।'

'আজ এগারটার সময় একটা জরুরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

'শুধু আজ না, আগামী এক সপ্তাহ তোমার কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। তুমি বিছানায় শুয়ে রিলাক্সড করবে। গল্প করবে। বইটই পড়বে।'

'আজ এগারটায় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটা ক্যানসেল করা যাবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সব অ্যাপয়েন্টমেন্টই ক্যানসেল করা যায়। মৃত্যুর সঙ্গে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটাকেও পেছনের ডেটে সরানোর জন্য আছি আমরা—ডাক্তাররা।'

'সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু ক্যানসেল হয় না।'

'আজ হয় না একদিন হবে। মানুষ অমরত্বের কৌশল জেনে যাবে। এজিং প্রসেস—বৃদ্ধ হবার প্রক্রিয়াটা জানার চেষ্টা হচ্ছে—যেদিন মানুষ পুরোপুরি জেনে যাবে ব্যাপারটা কী সেদিনই দেখবে মৃত্যু জয় করার চেষ্টা শুরু হবে।'

'ভালো।'

'তিন হাজার সনের মানুষের অমর হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি।'

হিশামুদ্দিন সহজ গলায় বললেন, তিন হাজার সনের মানুষ তাহলে খুব দুঃখী মানুষ। মৃত্যুর আনন্দ থেকে তারা বঞ্চিত।'

চিত্রলেখা অবাক হয়ে বলল, মৃত্যুর আবার আনন্দ কী?

হিশামুদ্দিন হাসিমুখে বললেন, আনন্দ তো মা আছেই। আমরা জানি একদিন আমরা মরে যাব এই জন্যেই পৃথিবীটাকে এত সুন্দর লাগে। যদি জানতাম আমাদের মৃত্যু নেই তাহলে পৃথিবীটা কখনো এত সুন্দর লাগত না।

'তুমি ফিলোসফারদের মতো কথা বলছ বাবা।'

'আর বলব না। ক্ষিধে লেগেছে নাশতা দিতে বল। আর শোন দুধ সিরিয়েল খাব না। দুধ-চিঁড়া খাব। দুধ-চিঁড়াও না—দই-চিঁড়া। পানিতে ভিজিয়ে চিঁড়াটাকে নরম করে টক দই, সামান্য লবণ, কুচিকুচি করে আধটা কাঁচামরিচ....এটা হচ্ছে আমার বাবার খুবই প্রিয় খাবার।'

'তুমি যেভাবে বলছ আমারও খেয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে। এক কাজ করলে কেমন হয় আগামীকাল আমরা এই নাশতাটা খাব—আজ আমার মতো খাও।'

'আচ্ছা।'

'আমি চলে যাচ্ছি, রহমতউল্লাহ ঠিক দশটার সময় দুটা ট্যাবলেট দেবে তুমি হাসিমুখে খেয়ে নেবে।'

'আচ্ছা হাসিমুখেই খাব।'

হিশামুদ্দিন সাহেব নাশতা খেলেন। রহমতউল্লাহ তাকে খাটে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভীতচোখে তাকিয়ে আছে। সাধারণত তিনি তার নাশতা বা খাবার একা একা খান। কেউ পাশে দাঁড়িয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগে। আজো লাগছে কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

'রহমতউল্লাহ।'

'জ্বি স্যার।'

'কাল দই-চিঁড়া খাব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'দই-চিঁড়া আমার বাবার খুব প্রিয় খাবার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হিশামুদ্দিনের ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি ঠিক কথা বলছেন না। দই-চিঁড়া তাঁর বাবার প্রিয় খাবার না। গরিব মানুষদের কোনো প্রিয় খাবার থাকে না। খাদ্যদ্রব্য মাত্রই তাদের প্রিয়। তাঁর বাবা যখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিছু খেতে পারতেন না তখন বলেছিলেন, দই-চিঁড়া দে। দই-চিঁড়া বলকারক, খেতেও ভালো। সেই দই-চিঁড়ার ব্যবস্থা হয় নি। তাঁর বাবার বিচিত্র ধরনের অসুখ হয়েছিল। অসহ্য গরম লাগত। কাপড় ভিজিয়ে গায়ে জড়িয়ে হাওয়া করেও সেই গরম কমানো যেত না। রাতে ঘরে ঘুমোতে পারতেন না। বারান্দায় হাওয়া বেশি খেলে বলে বারান্দায় শুইয়ে রাখা হত। এক রাতে অবস্থা খুব খারাপ হল। কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ এনে খাওয়ানো হল। সেই ওষুধের নাকি এমনই তেজ যে খাওয়ামাত্র মরা রোগী লাফ দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিছানায় উঠে বসে। মকরধ্বজ খাওয়ার পর তাঁর অবস্থা আরো খারাপ হল, তিনি ছটফট করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে ছটফটানি কমত—তিনি তখন বলতেন—আমার শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে। আরো জোরে হাওয়া কর। আরো জোরে। রাত দুটার দিকে তাঁর জ্বলুনি বোধহয় একটু কমল। তিনি ক্লান্তভঙ্গিতে বললেন—আজ মৃত্যু হবে কি না বুঝতে পারছি না। চাঁদনী রাত ছিল। মরণ হলে খারাপ ছিল না। শরীরের জ্বলুনিটা কমত। জ্বলুনি আর সহ্য হয় না।

দুর্ভাগাদের কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না। তাঁর শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হয় নি। তিনি মারা যান পরের রাতে। সে রাতে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল। চাঁদ বা তারা কোনোটাই ছিল না।

আচ্ছা তিনি কি তাঁর বাবাকে গ্লামারাইজড করছেন না? একটা দুষ্ট প্রকৃতির লোককে দুঃখী, মহৎ এবং সুন্দর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। ব্যাপারটা আসলে সে রকম না। তাঁর বাবা ছিলেন চোর, অসৎ প্রকৃতির মানুষ, সর্বরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন একজন দুর্বল মানুষ। দুর্বল মানুষদের চরিত্রও দুর্বল থাকে। তাঁর চরিত্রও দুর্বল ছিল। তাঁর খারাপ পাড়ায় যাতায়াত ছিল। খারাপ পাড়ার একটি মেয়েকে তিনি বিয়েও করেছিলেন। সেই মেয়েকে তিনি অবশ্যি ঘরে আনেন নি। তবে সেই নষ্ট মেয়ের গর্ভের একটি সন্তানকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। এই ঘটনা চিত্রলেখাকে বলা হয় নি, হাসানকেও বলা হয় নি। তিনি পাশ কাটিয়ে গল্প বলছেন। এটা ঠিক হয় নি।

'রহমতউল্লাহ!'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি হাসানকে একটু খবর দাও।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'পান দিতে বল। চা খেয়ে মুখ মিষ্টি হয়ে গেছে। জর্দা ছাড়া পান।'

'জ্বি দিচ্ছি।'

'একটা পাতলা চাদর আমার গায়ে দিয়ে দাও। শীত লাগছে।'

'ফ্যান বন্ধ করে দিব স্যার?'

'না ফ্যান বন্ধ করতে হবে না।'

হিশামুদ্দিন চোখ বন্ধ করলেন। বেশ ভালো ঠাণ্ডা লাগছে। তাঁর বাবা মৃত্যুর সময় অসহ্য গরমে ছটফট করেছেন। আর তিনি নিজে হয়তো শীতে কাঁপতে কাঁপতে মারা যাবেন। তাঁর বাবার কোনো সাধই পূর্ণ হয় নি। তাঁর নিজের প্রতিটি সাধ পূর্ণ হয়েছে। তিনি যদি চান তাঁর মৃত্যু হবে জোছনা দেখতে দেখতে তাহলে হয়তো-বা কৃষ্ণপক্ষের রাতেও পূর্ণচন্দ্র দেখা যাবে।

'স্যার!'

'হুঁ।'

'পান এনেছি স্যার।'

'পান খাব না। নিয়ে যাও। আরেকটা পাতলা চাদর গায়ে দাও। শীত বেশি লাগছে।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

'তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুমি চলে যাও।'

রহমতউল্লাহ চলে গেল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল ঠিকই তবে দাঁড়িয়ে রইল দরজার ওপাশে। মনে হয় তার প্রতি চিত্রলেখার এ ধরনের নির্দেশ আছে।

হিশামুদ্দিন চোখ বন্ধ করে আছেন। পানিতে ডুবে যারা মারা যায় সমগ্র জীবনের ছবি তাদের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যায়। খাটে শুয়ে যাদের মৃত্যু তাদের চোখের উপর দিয়ে কিছু কি ভাসে? যাপিত জীবনের খণ্ডচিত্র?

রহমতউল্লাহ আবার ঘরে ঢুকেছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে লজ্জিত এবং কিঞ্চিৎ ভীত।

'কিছু বলবে?'

'হাসান সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছে স্যার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালো। ভেরি গুড। সে এলে তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে আসবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপা এই ওষুধ দুটা দিয়ে গেছেন। দশটার সময় আপনাকে খাওয়াতে বলেছেন।'

'আচ্ছা দাও।'

হিশামুদ্দিন ট্যাবলেট দুটা গিলে ফেললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ঝিমুনির মতো এসে গেল। তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

হাসান অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে। তাকে চা-স্যান্ডউইচ দেয়া হয়েছে। বলা যেতে পারে খানিকটা আদর-যত্ন করা হচ্ছে। অন্য সময় এরচে দীর্ঘ সময় বসে থাকলেও চা-টা কিছুই দেয়া হয় না। হিশামুদ্দিন সাহেব খুব অসুস্থ এই খবরটা তাকে দেয়া হয়েছে। অসুস্থতার ফলে তাকে এখানে ডেকে আনার কারণটা সে ধরতে পারছে না। গুরুতর অসুস্থ মানুষ ল'ইয়ারদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। বিষয়-সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ মওলানা ডেকে এনে তওবা করেন। পরকালে নির্ভয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। তবে তওবার ব্যাপারটা নিম্নবিত্তের মানুষদের ক্ষেত্রেই বেশি ঘটে। হিশামুদ্দিন সাহেবদের মতো অকল্পনীয় বিত্তের মানুষরা তওবা করেন না।

'হাসান সাহেব!'

হাসান প্রায় লাফিয়ে উঠল। হিশামুদ্দিন সাহেবের মেয়ে চিত্রলেখা দরজা ধরে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটিকে আজ খুব বিষণ্ণ লাগছে। বাবার অসুখের ব্যাপারে সে হয়তো চিন্তিত।

'ম্যাডাম স্লামালিকুম।'

'আমাকে ম্যাডাম ডাকবেন না তো—শুনতে কুৎসিত লাগে। আমাকে নাম ধরে ডাকবেন—চিত্রলেখা। কোনো সমস্যা নেই। চা খাওয়া হয়েছে?'

'জ্বি।'

'বাবা অসুস্থ শুনেছেন বোধহয়?'

'জ্বি।'

'অসুখ যতটা সহজ ভেবেছিলাম তত সহজ না। বেশ জটিল। আমি বেশ চিন্তিত বোধ করছি। ভালো কোনো ক্লিনিকে তাঁকে ট্রান্সফার করলে ভালো হত। আমি ক্লিনিক খুঁজে বেড়ালাম। কোনোটাই পছন্দ হচ্ছে না। ক্লিনিকে সুযোগ-সুবিধা কী আছে জানতে চাইলে ওরা বলে—এসি আছে, কালার টিভি আছে, ফ্রিজ আছে, ইন্টারকমের ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসার ব্যবস্থা কী তা বলে না।'

'স্যারের কী হয়েছে?'

'ব্লাডপ্রেসার খুব ফ্লাকচুয়েট করছে। পালস ইরেগুলার। তাঁর এখন দরকার কনসটেন্ট মনিটরিং।'

'কোনো হাসপাতালে কি ভর্তি করাবেন? ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা পিজি?'

'এখনো বুঝতে পারছি না। আজ দিনটা দেখে আগামীকাল ডিসিশান নেব। আপনি আসুন। বাবার ঘুম ভেঙেছে তাঁর সঙ্গে কথা বলুন।'

'উনি আমাকে কেন ডেকেছেন বলতে পারেন?'

'লাইফ স্টোরি সম্ভবত বলবেন।'

'এখন কি উনার কথা বলা ঠিক হবে?'

'আমি তাতে কোনো অসুবিধা দেখছি না। কথা বলে তিনি যদি আনন্দ পান তাহলে কথা বলাই উচিত। উনি যে গুরুতর অসুস্থ তা আমি তাঁকে বুঝতে দিতে চাচ্ছি না। আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?'

'জ্বি।'

'বাবা যে আপনাকে গল্প বলেন তার পেছনের কারণটা কি আপনি ধরতে পেরেছেন?'

'জ্বি না।'

'বাবা যা করছেন তা হচ্ছে এক ধরনের কনফেসন। খ্রিস্টানরা যখন কোনো অপরাধ করে তখন তারা পাদ্রীদের কাছে কনফেসন করে। বাবা যা করছেন তা হচ্ছে এক ধরনের কনফেসন।'

'উনি তো কোনো অপরাধ করেন নি।'

'অপরাধ না করেও কেউ কেউ নিজেকে অপরাধী ভাবে। বাবার মা-বাবা, ভাইবোন হতদরিদ্র ছিলেন। অনেকেই মারা গেছেন বিনা চিকিৎসায়। যারা বেঁচে আছেন তাদের অবস্থা শোচনীয়। অথচ মাঝখান থেকে বাবা হয়ে গেলেন বিলিওনিয়ার। এই কারণেই তিনি হয়তো নিজেকে অপরাধী ভাবেন। মানুষ অতি বিচিত্র প্রাণী হাসান সাহেব। কী, ঠিক বলছি না?'

'জ্বি।'

'আপনার কথাবার্তা দেখছি—জ্বি এবং জ্বি নাতে সীমাবদ্ধ। হড়বড় করে কথা বলা অভ্যাস করুন তো। হড়বড় করে যারা কথা বলে তাদের মন সব সময় প্রফুল্ল থাকে। এটা হচ্ছে রিসেন্ট ফাইন্ডিং নিউজউইকে উঠেছে।'

হাসান চুপ করে রইল। চিত্রলেখা বলল, বাবার অপরাধবোধের আরেকটা বড় কারণও আছে। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের কোনো সাহায্য করেন নি। কেউ কেউ সাহায্যের জন্যে এসেছিল তাদের দূর দূর করে তাড়িয়েছেন।

'ও।'

'বাবার অনেক কিছু আমি বুঝতে পারি না। এই ব্যাপারটিও পারি না।'

'বুঝতে বোধহয় চেষ্টাও করেন নি।'

'ঠিক বলেছেন, চেষ্টাও করি নি। আমার উচিত ছিল বাবার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, আমি সেটাও করি নি। বাবা যেমন পৃথিবীতে একা আমিও একা। আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে—কিন্তু আমার কথা বলার মানুষ নেই। এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি—আমার ভালো লাগছে। কেন ভালো লাগছে বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'কারণ আপনি বাবার খুব পছন্দের মানুষ। কী করে বললাম বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কাল রাতে খেতে বসে বাবা হঠাৎ বললেন, হাসানকে একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে বলি। আমি বললাম, বেশ তো বল। উনি তৎক্ষণাৎ বললেন—না থাক। বাবার সমস্যা কী জানেন? তাঁর সমস্যা হচ্ছে—তিনি যাদের পছন্দ করেন তাদের কখনো তা জানান না। তার পছন্দ এবং অপছন্দ দুটা ব্যাপারই খুব গোপন। আমি বোধহয় বকবক করে আপনার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। চলুন বাবার ঘরে যাই।'

হাসানকে দেখেই হিশামুদ্দিন বললেন, তোমার কী হয়েছে হাসান?

হাসান হকচকিয়ে গেল। সে রোগীর ঘরে ঢুকেছে। রোগী তাকে দেখে বলছেন তোমার কী হয়েছে।

'কিছু হয় নি স্যার।'

'তোমাকে মৃত মানুষদের মতো দেখাচ্ছে।'

'আমি ভালোই আছি স্যার। আপনি কেমন আছেন?'

'আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি ভালোই আছি—কিন্তু আমার মেয়ের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভালো নেই। ডাক্তাররা যখন রোগীর সামনে অতিরিক্ত রকমের হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করে তখন বুঝতে হয়—সামথিং ইজ রং। দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান বসল। হিশামুদ্দিন সাহেব আগ্রহের সঙ্গে বললেন—আমার বাবা প্রসঙ্গে নানান সময় তোমাকে নানান কথা বলেছি। আমার কথা শুনে শুনে তাঁর একটা ছবি নিশ্চয়ই তোমার মনে তৈরি হয়েছে। ছবিটা কেমন?

'স্যার ছবিটা খুবই সুন্দর। আপনার বাবাকে আমার অসাধারণ মানুষ বলে মনে হয়।'

হিশামুদ্দিন শান্ত গলায় বললেন, তিনি খুবই সাধারণ মানুষ। ভণ্ড টাইপের মানুষ। মিথ্যাবাদী, চোর, স্বার্থপর, অলস...যে কটি খারাপ গুণ মানুষের থাকা সম্ভব সবকটি তাঁর মধ্যে ছিল। খারাপ পাড়ার একটি মেয়েকে তিনি বিবাহ করেছিলেন—সেই ঘরে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল। ওই মহিলা বাবাকে এক পর্যায়ে ছেড়ে চলে যান... আমি কী বলছি তুমি মন দিয়ে শুনছ তো?'

'জ্বি স্যার শুনছি।'

'বাবা ওই মহিলার গর্ভজাত সন্তানকে নিজের কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তাকে দু চোখে দেখতে পারতেন না। তাঁর অন্য সন্তানরাও দেখতে পারত না। কেউ তার সাথে রাতে ঘুমোত না। সে ঘুমোত একা একা। সে জ্বরে ছটফট করলে কেউ এসে মাথায় হাত দিয়ে জ্বর দেখত না। বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সেই ছেলেটা সারাজীবন করেছে। তোমার বুদ্ধি কেমন হাসান?'

'আমার বুদ্ধি স্যার মোটামুটি পর্যায়ের।'

'মোটামুটি পর্যায়ের বুদ্ধি দিয়েও তুমি আশা করি বুঝতে পারছ সেই ছেলেটি কে। পারছ না?'

'জ্বি স্যার পারছি।'

'এখন বল তোমাকে এমন মলিন দেখাচ্ছে কেন? তোমার সমস্যা কী?'

'তেমন কোনো সমস্যা নেই স্যার।'

'সমস্যা থাকলে বলতে পার। বিত্তবান মানুষরা নিজের সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও অন্যের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।'

হাসান কিছু বলল না, চুপ করে রইল। একবার তার ইচ্ছা করছিল বলে ফেলে—স্যার আমাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। বলতে লজ্জা লাগল। একজন অসুস্থ মানুষকে চাকরির কথা বলা যায় না। লিটনের কথা কি সে স্যারকে বলবে? নিজের কথা বলা না গেলেও অন্যের কথা নিশ্চয়ই বলা যায়।

'আমার এক বন্ধুর জন্যে কি স্যার আপনি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন?'

'তোমার বন্ধু?'

'জ্বি স্যার। খুব ভালো ছেলে।'

'কী করে বুঝলে খুব ভালো ছেলে?'

'আমি তাকে স্কুলজীবন থেকে দেখছি। ও খুব কষ্টে আছে। বিয়ে করে খুব ঝামেলায় পড়েছে।'

'চাকরি বাকরি নেই বিয়ে করে ফেলল? ও তো বোকা। বোকাদের সমস্যার সমাধান করতে নেই। বোকাদের সমস্যা নিজের ঘাড়ে নিলে কী হয় জান হাসান?'

'জ্বি না।'

'তখন নিজের সমস্যার সঙ্গে বোকার সমস্যাও যুক্ত হয়।'

হাসান চুপ করে গেল। হিশামুদ্দিন বললেন, তোমার বন্ধুর নাম কী?

'লিটন।'

'ভালো নাম কী?'

'হামিদুর রহমান।'

'পড়াশোনা কী?'

'এম. এ. পাস করেছে।'

'কত টাকা বেতনের চাকরি হলে তোমার বোকা বন্ধুর সমস্যার সমাধান হয়?'

'মাসে হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই ওরা মহাখুশি হবে। একটা কিছু পেলেই হয় স্যার।'

'তুমি একটা কাগজে তার নাম-ঠিকানা লিখে মোতালেবের কাছে দিয়ে যাও।'

'স্যার থ্যাংক য়্যু।'

হাসান লক্ষ্য করল হিশামুদ্দিন সাহেব হাসছেন। এই মানুষটাকে সে খুব কম হাসতে দেখেছে। উনি হাসছেন কেন?

'হাসান!'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি বরং আজ যাও। এখন আবার কেন জানি মাথাটা ঝিমঝিম করছে।'

'স্যার আমি কাল এসে খোঁজ নিয়ে যাব।'

'কাল এসে খোঁজ নিতে হবে না। তোমার সঙ্গে যেমন কথা আছে তেমনি আসবে বুধবার বিকেল তিনটায়।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার।'

পরের বুধবার বিকাল তিনটায় এসে হাসান জানতে পারল, হিশামুদ্দিন সাহেব আজ দুপুরের আগে মারা গেছেন।

বাড়িভর্তি মানুষ। কম্পাউন্ডের ভেতরে এবং বাইরে প্রচুর মানুষ। হাসান গেট থেকেই বিদেয় হল। একবার মুহূর্তের জন্যে তার ইচ্ছা হল সে চিত্রলেখার সঙ্গে দেখা করে—সান্ত্বনার দুটা কথা বলে। পর মুহূর্তেই মনে হল সান্ত্বনার কথা সে জানে না। এবং চিত্রলেখার মতো মেয়েদের সান্ত্বনার দরকার নেই।

AMARBOI.COM

১৬

রেজিস্ট্রি করা চিঠি।

লিটন সই করে চিঠি নিল। রেজিস্ট্রি চিঠি তাকে কে পাঠাবে? সাধারণ চিঠিই আসে না আর রেজিস্ট্রি চিঠি। ইংরেজিতে টাইপ করে তার নাম লেখা।

হামিদুর রহমান। নিজের নাম অথচ অপরিচিত লাগছে। ভালো নামটা সে ভুলতে বসেছে। চিঠি এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে। এটিও অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার। জেনারেল ম্যানেজার মাহিটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড। কে আছে সেখানে? বন্ধুবান্ধবদের কেউ। ভাগ্যবানদের একজন। বিদেশে চাকরি করছে। তার সুখ ও আনন্দ পুরোনো বন্ধুকে জানাতে চাচ্ছে। সে এই মেসের ঠিকানা জানল কী করে?

পিয়ন দাঁড়িয়ে আছে। লিটন বলল, কী ব্যাপার?

'স্যার বকশিশ।'

লিটন বিস্মিত হয়ে বলল, বকশিশ কেন? সে কি এতই হতভাগ্য যে বিদেশ থেকে একটা চিঠি আসার জন্যে বকশিশ দিতে হবে?

'জান ভাই বকশিশ-টকশিশ নেই।'

পিয়ন বিমর্ষমুখে চলে যাচ্ছে। টাকা থাকলে পাঁচটা টাকা দিয়ে দেয়া যেত। টাকা নেই।

লিটন খিচুড়ি বসিয়ে দিল। চালডালের খিচুড়ি। আনাজপাতি থাকলে দিয়ে দেয়া যেত। কিছু নেই। চিঠিটা বিছানায় পড়ে আছে। থাকুক পড়ে। বন্ধুর চিঠি পড়ার কোনো আগ্রহ এই মুহূর্তে সে অনুভব করছে না। তার মনটা খুব খারাপ। শম্পার শরীর ভালো না। গা দিয়ে গুটির মতো বের হয়েছে। সম্ভবত হাম। বড়দের হাম হওয়া খুব কষ্টের। বেচারি কষ্টের মধ্যে পড়েছে—অথচ সে কিছু করতে পারছে না। সে রোজই সন্ধ্যার পর যাচ্ছে। দশটা সাড়ে দশটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত থেকে চলে আসছে। তাকে ভদ্রতা করেও কেউ বলছে না— জামাই আজ থেকে যাও। শম্পাকে এখনো ডাক্তার পর্যন্ত দেখানো হয় নি। এমন কষ্টে মানুষ পড়ে?

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর লিটন চিঠি খুলে পড়ল। জন স্মিথ জুনিয়ার নামের এক ভদ্রলোক তাকে জানাচ্ছেন যে, মাহিটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির সিঙ্গাপুর শাখার একজিকিউটিভ অফিসার প্রোডাকশান শাখায় তাঁকে নিয়োগপত্র দেয়া হচ্ছে। তিন বৎসর মেয়াদি এই নিয়োগ। পরবর্তী এক্সটেনশন কোম্পানি শর্তে আলোচনাসাপেক্ষ। মাসিক বেতন সাত হাজার সিঙ্গাপুরি ডলার। ফ্রি ফার্নিশড কোয়ার্টার। ফ্রি মেডিকেল। তাকে অতি দ্রুত সিঙ্গাপুর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে। ঢাকায় মতিঝিলে কোম্পানির একটা অস্থায়ী অফিসের ঠিকানা দেয়া হয়েছে। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে তারা তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

এর মানে কী? কেউ কি রসিকতা করছে? এপ্রিলফুল জাতীয় কিছু? কিংবা কোনো দুষ্ট লোক টাকা কামানোর ফন্দি করছে। সব অভাবী যুবকদের এই জাতীয় চিঠি পাঠিয়েছে। চিঠি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে। মতিঝিল অফিসে ছুটে যাবে। সেই অফিসের একজন বলবে—আমরা সব খবরাখবর আনিয়ে দিচ্ছি তার খরচ বাবদ এক শ ডলার লাগবে। আমাদের অফিসে একটা ফর্‌ম ফিলাপ করতে হবে। ফরমের দাম তিন ডলার। সাত দিনে রমরমা ব্যবসার পর কোম্পানি ডুব মারবে।

আরেকটা ব্যাপার হতে পারে। হয়তো তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনো চিঠিই তার নামে আসে নি। পুরোটাই সে কল্পনায় দেখছে।

মতিঝিলের যে অফিসের ঠিকানা আছে সেখানে গিয়ে খোঁজ নেয়া যায়। দুটা বাজে। অফিস কি বন্ধ হয়ে গেছে না খোলা? চারটা পর্যন্ত অফিস খোলা থাকলে অফিসে পৌঁছানো যাবে। কারণ তাকে যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। লিটন কাপড় পরল।

অফিস খোলাই ছিল। বয়স্ক একজন ভদ্রলোক তার ঘর বন্ধ করে চলে যাচ্ছিলেন—লিটন তার চিঠিটা ভদ্রলোকের হাতে দিল। তিনি চিঠি খুলেই বললেন— ও আপনি। আপনার নামে ফ্যাক্স এসেছে আমাদের কাছে। আমাদের কাছ থেকে কী ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্স চাচ্ছেন।

লিটন কী বলবে বুঝতে পারছে না। ভদ্রলোক বললেন, আপনার হাতে তো এখনো দিন পনের সময় আছে। এর মধ্যে গোছগাছ করে নিন।

লিটন অস্পষ্ট গলায় বলল, ও আচ্ছা।

'আপনার টিকিট সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্‌সে—পি. টি. এ। আমরা আনিয়ে রাখব।'

লিটন আবারো বলল, জ্বি আচ্ছা। কেন সে জ্বি আচ্ছা বলছে তা নিজেও বুঝতে পারছে না।

'কাল তো অফিস ছুটি আপনি পরশু সকালের দিকে চলে আসুন।'

লিটন আবার বলল, জ্বি আচ্ছা।

'আপনার ভাগ্য খুব ভালো। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। পৃথিবীজুড়ে এদের শাখা।'

লিটন ক্ষীণ গলায় বলল, চাকরিটা কি সত্যি পেয়েছি?

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। লিটন কুণ্ঠিত মুখে বলল, ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন।

'পরশু আসুন। বিশ্বাস না হবার কী আছে। আপনার হাতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। এইসব কোম্পানি যে শুধু শুধু চাকরি দিচ্ছে তা তো না। বাংলাদেশে তারা কোটি কোটি টাকার কাজ করছে। এইসব কাজের একটা শর্ত আছে—এ দেশের কিছু ছেলেমেয়েকে চাকরি দিতে হবে। এইসব শর্ত তারা মানে না। কালেভদ্রে মানে। আপনার স্ট্রং রিকমন্ডেশন ছিল—আপনি পেয়ে গেছেন।'

'পরশু আসব?'

'জ্বি পরশু আসুন। আপনার পাসপোর্ট আছে তো?'

লিটনের পাসপোর্ট আছে। সেই পাসপোর্টে কি কাজ হবে? সেখানে মালয়েশিয়ার একটা মিথ্যা ভিসা আছে।

'পাসপোর্ট না থাকলে অসুবিধা নেই। চব্বিশ ঘণ্টায় পাসপোর্ট পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরে আপনি একা যাবেন না ফ্যামিলি নিয়ে যাবেন?'

'ফ্যামিলি নিয়ে যাব।'

'সব পার্টিকুলারস নিয়ে আসবেন। ফ্যাক্স করে দেব। কোনো সমস্যা হবে না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

লিটন রাত ন'টা পর্যন্ত রাস্তায় রাস্তায় হাঁটল। সব কেমন অদ্ভুত লাগছে। শম্পাকে কি ব্যাপারটা জানানো উচিত না? উঁহুঁ—উচিত হবে না। পরে দেখা যাব মালয়েশিয়ার ভিসার মতো ফলস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। পরশুর আগে কিছু জানা যাবে না। বেছে বেছে কালই কিনা ছুটি পড়ে গেল?

আচ্ছা পুরো ব্যাপারটা তো সত্যি হতেও পারে! সে কত অসংখ্য মানুষকে চাকরির কথা বলেছে তাদের কেউ একজন দয়াপরবশ হয়ে সুপারিশ করেছে। পুরোটাই ভাগ্য। কথায় আছে না—পাথরচাপা ভাগ্য। তারটাও তাই ছিল হঠাৎ পাথর সরে গেছে। হাসানের সঙ্গে কথা বললে হয়। ওকে চিঠিটা দেখানো যেতে পারে। না তাও ঠিক হবে না। হাসান মন খারাপ করবে। বেচারার মন খারাপ করিয়ে কোনো দরকার নেই।

আজ সারারাত রাস্তায় হাঁটলে কেমন হয়?

পকেটের চিঠিটার একটা ফটোকপি করিয়ে রাখা দরকার। যদি হারিয়ে যায়। একটা না কয়েকটা ফটোকপি করানো দরকার।

পুরো ব্যাপারটা সত্যি হলে সামনে বিরাট ঝামেলা। শম্পার পাসপোর্ট। কাপড়চোপড় বানানো।

সিঙ্গাপুর দেশটা কেমন? শীতকালে বরফ পড়ে? বরফ পড়া দেখার তার খুব শখ ছিল। এই শখটা বোধহয় এবার মিটবে।

লিটন চায়ের স্টলে ঢুকল। তার পকেটে একটি টাকাও নেই। না থাকুক—এক কাপ চা খেয়ে সে যদি বলে, ভাই ভুলে মানিব্যাগ ফেলে এসেছি আপনাকে কাল টাকাটা দিয়ে যাব তাহলে দোকানদার নিশ্চয়ই তাকে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেবে না। মানুষ এখনো এতটা নিচে নামে নি। মানুষের মনে মমতা, করুণা, দয়া এখনো আছে।

চা খেয়ে সে যাবে আজিমপুর গোরস্থানে। বাবার কবর জিয়ারত করবে। কতদিন হয়েছে যাওয়া হয় না। কবরের চিহ্ন এখন আর নিশ্চয়ই নেই। না থাকুক।

লিটন চায়ে চুমুক দিচ্ছে। এরা তো চা খুব ভালো বানায়। অপূর্ব লাগছে। আরেক কাপ চা কি খাবে? এক কাপ চায়ের দাম বাকি রাখা আর দু কাপের দাম বাকি রাখা তো একই ব্যাপার।

১৭

কর্মহীন লোক নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। মতিনউদ্দিনের বেলায় এই কথাটি সর্বাংশে সত্য। তিনি নানান কাজে প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তাঁকে দেখে মনে হতে পারে—এমন কাজের একজন মানুষ নিজের সংসার কেন চালাতে পারছেন না। তাঁর অনেক কর্মকাণ্ডের একটি হচ্ছে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা। তিনি তাঁর প্রবন্ধগুলো দেশের সবকটি দৈনিকে নিয়মিত পাঠান। এখন পর্যন্ত তাঁর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। তবে সম্পাদকের কাছে লেখা দুটি চিঠি ছাপা হয়েছে। একটি দৈনিক বাংলায় এবং একটি সংবাদে। তিনি পত্রিকার কাটিং ফাইল করে রেখেছেন।

আজো তিনি খুব ব্যস্ত। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ শুরু করেছেন। এটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয় তবে শিক্ষামূলক প্রবন্ধ, প্রবন্ধের নাম—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নারী জাগরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপ্রয়োজনীয়তা"

শিরোনামটি তাঁর তেমন পছন্দ হচ্ছে না। এক দুই তিন করে নম্বর দেয়া আরো তিনটি শিরোনাম তাঁর খাতার উপর লেখা। প্রবন্ধ শেষ হবার পর ঠিক করবেন কোন শিরোনামটা শেষ পর্যন্ত যাবে। বাকি তিনটি শিরোনাম হল—

১. আমার চক্ষে নারী।

২. বেগম রোকেয়া থেকে মাদার তেরেসা।

৩. হে নারী।

এখন রাত বাজছে সাড়ে আটটা। টিভিতে বাংলা খবর শেষ হয়ে গেছে। 'নৃত্যের তালে তালে' নামে নাচের একটি অনুষ্ঠান হচ্ছে। মতিনউদ্দিন টিভির সামনেই বসে আছেন। তবে টিভি দেখছেন না বা শুনছেনও না। টিভির সাউন্ড অফ করে দেয়া আছে।

টিভির বাংলা সংবাদ মতিনউদ্দিন সাহেব সব সময় শোনেন। কর্মহীন লোকরা দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকতে ভালবাসে এবং এটাকে তার প্রধান দায়িত্বের একটি বলে মনে করে। মতিনউদ্দিন সাহেব শুধু যে টিভির সংবাদ শোনেন তা না, বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকাও শোনেন। আগে রেডিও পিকিঙের এক্সটারনাল সার্ভিস শুনতেন। ইদানীং শোনেন না, কারণ তাঁরা বাংলাদেশ সম্পর্কে খবর দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

বেছে বেছে আজকের দিনটাতেই মতিনউদ্দিন টিভির খবর শুনলেন না। নারী বিষয়ক প্রবন্ধে অতিরিক্ত মনোযোগ দেবার কারণে এই ঘটনাটা ঘটল। আজ টিভি শুনলে তিনি বড় রকমের বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। কারণ আজ এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। টিভিতে তাঁর মেজো কন্যা নাদিয়া মেহজাবিন-এর নাম বলা হয়েছে। আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় থেকে নাদিয়া মেহজাবিন আটটি লেটার নিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ছেলে ও মেয়ে সবার মধ্যে প্রথম হয়েছে।

রাত দশটায় সুরাইয়া স্বামীর ঘরে ঢুকলেন। মতিনউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, এখন ভাত খাব না। পরে খাব। তোমরা খেয়ে নাও। আমি যখন লেখালেখির কোনো কাজে ব্যস্ত থাকি তখন আমাকে খাওয়াদাওয়ার মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিরক্ত করবে না। এই কথাটা কতবার বলতে হবে?

সুরাইয়া বললেন, আজ এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। আটটার বাংলা সংবাদে বলেছে।

মতিনউদ্দিন স্ত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানির শব্দ শুনলেন। তাকিয়ে দেখলেন দরজা ধরে নাদিয়া দাঁড়িয়ে আছে। সে ফোঁপাচ্ছে এবং তার চোখ দিয়ে সমানে পানি পড়ছে। মেয়েদের চরিত্রের এই দুর্বলতায় তিনি খুবই বিরক্ত হলেন। মাত্র টিভিতে রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করেছে। পাস-ফেল জানতে জানতে আরো দুদিন—এর মধ্যেই নাকের জলে চোখের জলে একাকার। তাঁর রাগ উঠে গেল। তিনি প্রবন্ধের স্বার্থে রাগ সামলাবার চেষ্টা করলেন। মাথায় রাগ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী জটিল প্রবন্ধ লেখা যায় না। মতিনউদ্দিন গম্ভীর গলায় বললেন—গাধা মেয়ে কাঁদছ কেন?

সুরাইয়া নিজেও কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন—তোমার মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। আটটা লেটার পেয়েছে।

'কী বললে?'

'ওদের স্কুলের হেডমিসট্রেস এসেছেন। মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। স্কুল থেকে দুজন টিচারও এসেছেন।'

'নাদিয়া ফার্স্ট হয়েছে? কী বলছ এইসব! সে ফার্স্ট হবে কী জন্যে?'

সুরাইয়া এইবার সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলে বললেন—আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি নিজে একটু নাদিয়ার হেডমিসট্রেসের সঙ্গে কথা বল। আমার মাথা যেন কেমন করছে।

'উনাদের চা-টা দাও। আমি যাচ্ছি। ফলস নিউজ হতে পারে। হয়তো নাদিয়ার নামে নাম একটা মেয়ে ফার্স্ট হয়েছে বেকুব হেডমিসট্রেস মনে করেছে তোমার মেয়ে।'

'টিভিতে ওদের স্কুলের নামও বলেছে।'

'বাংলাদেশ টিভির নিউজের কোনো মূল্য আছে? মূল্য থাকলে আমরা ব্যাটারি পুড়িয়ে বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা শুনি? পাঞ্জাবিটাতে ইস্ত্রি দিয়ে দুটা ডলা দিয়ে দাও—আমি দেখছি ব্যাপার কী? অল্পতে অস্থির হয়ো না। অস্থির হবার মতো কিছু হয় নাই। বোঝাই যাচ্ছে ফলস নিউজ।'

রাত এগারটার ভেতর মতিনউদ্দিন জেনে গেলেন ঘটনা সত্যি। মিষ্টি নিয়ে নাদিয়ার বড়ফুফু চলে এসেছেন। নাদিয়ার স্কুলের কিছু বান্ধবী এসেছে। আশপাশের বাসার কিছু মহিলা এসেছেন। সবকটা পত্রিকা অফিস থেকে লোক এসেছে। বাবা-মা দুপাশে মেয়ে মাঝখানে এইভাবে ছবি তোলা হবে। মতিনউদ্দিন রাজি হলেন না। তিনি বিনীত গলায় বললেন, ভাই আমি আমার মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে কিছুই জানি না। ওদের দিকে কোনোদিন লক্ষ্য করি নি। আজ যদি মেয়েকে সাথে নিয়ে ছবি তুলে পত্রিকায় ছাপতে দেই সেটা খুবই অন্যায় হবে। মেয়ে তার মাকে নিয়ে ছবি তুলুক। সেটাই হবে ঠিক এবং শোভন। মতিন সাহেব কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হলেন। মেয়ের জন্যে কোনো একটা উপহার কিনতে ইচ্ছে করছে। এত রাতে দোকানপাট সব বন্ধ থাকার কথা। তারপরেও চেষ্টা করে দেখা। কিছু কিছু দোকান অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। একটা ভালো হাতঘড়ি কি পাওয়া যাবে? মেয়েটা ঘড়ি ছাড়া পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার শেষ পর্যায়ে তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। পরীক্ষার জন্যে ঘড়িটা প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এই মেয়ে মুখ ফুটে তা বলে নি। ভালো একটা ঘড়ির কত দাম পড়বে কে জানে। তাঁর কাছে এত টাকা নেই। টাকা যা ছিল সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ছ-সাত শ'র বেশি হবে না। এই টাকায় ভালো ঘড়ি হবে না। একটা কলম কিনে দেয়া যায়। কলমটা নিশ্চয়ই সে খুব যত্ন করে রাখবে। তার ছেলেমেয়েরা যখন বড় হবে তখন তাদেরকে সে কলমটা দেখিয়ে বলবে—আমার বাবা আমাকে দিয়েছিলেন। যেদিন আমার এস.এস.সি.র রেজাল্ট হল সেই রাতে বাবা কিনে নিয়ে এসেছেন।

শাড়ি কাপড়ের একটা দোকান খোলা পাওয়া গেল। মতিনউদ্দিন মেয়ের জন্যে একটা শাড়ি কিনে ফেললেন। সাড়ে ছয় শ টাকা দাম। হাফসিল্ক। শাড়ির রং গাঢ় কমলা। রংটা মতিনউদ্দিনের খুবই পছন্দ হল। তিনি ইতস্তত করে দোকানিকে বললেন, আমার মেয়ে শ্যামলা এই শাড়িটাতে তাকে মানাবে তো?

দোকানি শাড়ি প্যাক করতে করতে বলল, একটা পেত্নীকে যদি এই শাড়ি পরিয়ে দেন তাকে লাগবে রাজকুমারীর মতো।

'আরো দশটা দোকান দেখেশুনে কিনতে পারতাম কিন্তু জিনিসটা আজই দরকার। আমার মেয়ের জন্য উপহার। ওর এস.এস.সি.র রেজাল্ট হয়েছে। ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে, বিজ্ঞান গ্রুপ। লেটার পেয়েছে আটটা। কাল সব পত্রিকায় তার ছবি দেখবেন। নাম হল নাদিয়া মেহজাবিন। মেহজাবিন শব্দের অর্থ হল চাঁদকপালী। আরবিতে মে হচ্ছে চন্দ্র। জাবিন হল কপাল। আসলেই আমার মেয়েটা চাঁদকপালী।'

দোকানদার সত্যিকার অর্থেই বিস্মিত হল।

'আপনার মেয়ে?'

'জ্বি ভাইসাহেব আমার মেজো কন্যা। নাদিয়া মেহজাবিন।'

দোকানদার ড্রয়ার খুলে এক শ টাকা ফেরত দিল। শাড়ির দাম পড়ল সাড়ে পাঁচ শ।

মতিনউদ্দিন দোকানদারের ভদ্রতায় মোহিত হলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল।

ঘরে অনেকরকম খাবার ছিল। নাদিয়ার ফুফু হোটেল থেকে রোস্ট, পোলাও আনিয়েছেন। মতিনউদ্দিন কিছুই খেতে পারলেন না—যাই খান ঘাসের মতো লাগে। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল মেয়ের সঙ্গে খানিক গল্পগুজব করেন। তাও করতে পারলেন না। মেয়ে তার সামনেই আসে না। নিজ থেকে মেয়েকে ডেকে গল্প করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

রাতে যথাসময়ে শুতে গেলেন। সুরমা বললেন, তিনি আজ নাদিয়ার সঙ্গে ঘুমোবেন। এটাও তার মনঃকষ্টের কারণ হল। তিনি ভেবেছিলেন স্ত্রীর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলবেন—তা হল না। না হলে কী আর করা।

'মেয়ের শাড়ি কি পছন্দ হয়েছে?'

'হয়েছে বোধহয় কিছু তো বলল না।'

'নতুন শাড়ি পরে সালাম করল না। শুধু পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হলে হবে না আদব কায়দা তো শিখতে হবে। ফার্স্ট-সেকেন্ড হওয়া কঠিন কিছু না—আদব কায়দায় দুরস্ত হওয়া কঠিন।'

'শাড়ি পরতে বলেছিলাম, তার নাকি লজ্জা লাগবে। পরে আসতে বলব?'

'না থাক। যন্ত্রণা ভালো লাগছে না। ঘুম পাচ্ছে।'

মতিনউদ্দিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তিনি নিশ্চিত আজ রাতে তাঁর এক ফোঁটা ঘুম হবে না। বুকও কেমন যেন ধড়ফড় করছে। হার্ট অ্যাটাক ট্যাটাক হবে না তো। হার্ট অ্যাটাক হয়ে মরে থাকলেও কেউ কিচ্ছু টের পাবে না। এটা হচ্ছে কপাল। সংসার থেকেও সন্ন্যাসী। মতিনউদ্দিন তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন। মাথায় কিচ্ছু আসছে না। চিন্তাভাবনা সব এলোমেলো হয়ে গেছে। নজরুলের সেই কবিতাটা যেন কী? বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। কবিতাটা ঠিক না। বেশিরভাগই নারী করে—পুরুষ করে সামান্যই। তাকে দিয়েই এর প্রমাণ। তিনি কিছুই করতে পারেন নি। মতিনউদ্দিনের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। তিনি বাতি জ্বালালেন—ঘরে আজ পানি রাখা হয় নি। ভুলে গেছে। পানির জন্যে যেতে হবে রান্নাঘরে। তিনি দরজা খুলে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন। নাদিয়ার ঘরে বাতি জ্বলছে। মা-মেয়ের হাসি শোনা যাচ্ছে। এই হাসিতে তিনি যুক্ত হতে পারছেন না। আশ্চর্য। আচ্ছা তিতলীকে কি খবরটা দেয়া হয়েছে? তার শ্বশুরবাড়িতে কেউ কি একটা টেলিফোন করে নি। করে নি নিশ্চয়ই—করলে ওরা চলে আসত। খবর না দেয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে। তিতলীর শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভোরবেলা খবরের কাগজ পড়ে সংবাদ জানবে। এর আনন্দও তো কম না। মতিনউদ্দিন পরপর দু গ্লাস পানি খেলেন তার পিপাসা মিটল না। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে যতই পানি খাচ্ছেন—পিপাসা ততই বাড়ছে। তিনি আরেক গ্লাস পানি হাতে বারান্দায় এসে বসলেন। ঘুম যখন হবেই না—বারান্দায় বসে থাকা যাক। আবারো নাদিয়ার হাসি শোনা যাচ্ছে। মা-মেয়ে কী নিয়ে এত হাসাহাসি করছে? দরজায় টোকা দিয়ে তাদের কি বলবেন—এই তোমরা বাইরে চলে আস। সবাই মিলে একসঙ্গে গল্প করি। না থাক। তারা আসবে, মুখ গম্ভীর করে বসে থাকবে এরচে মা-মেয়ে গল্প করুক। সুরাইয়ার জন্যে একটা শাড়ি কিনে আনলে হত। কাগজে লিখে দিতেন—মাতা শ্রেষ্ঠাকে সামান্য উপহার। ইতি মতিনউদ্দিন। না সেটাও ঠিক হত না। বাড়াবাড়ি হত। কোনোক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি করা উচিত না। বাড়াবাড়ি করার কারণে বড় বড় জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। তারচে বরং মনে মনে নারী জাগরণ বিষয়ক প্রবন্ধটার খসড়া করে ফেলা যাক। শুরুটা ইন্টারেস্টিং হওয়া দরকার। পড়তে গিয়ে পাঠক ভাববে গল্প পড়ছে। গল্পের লোভ দেখিয়ে তাকে জটিল প্রবন্ধে ঢুকিয়ে দেয়া হবে—শুরুটা এ রকম করলে কেমন হয়—

ঘুঘু ডাকা ছায়া ঢাকা ছোট্ট সুন্দর সবুজ গ্রাম।
গ্রামের নাম পায়রাবন্দ। সেই গ্রামের একটি
শিশু তার নাম রোকেয়া.........

নাদিয়ার ঘর থেকে আবার হাসির শব্দ আসছে। মতিনউদ্দিন উঁচু গলায় বললেন, তোমরা একটু আস্তে হাসাহাসি কর, মানুষকে ঘুমোতে দেবে না।

হাসির শব্দ থেমে গেল। মতিন সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে গেল। হাসাহাসি করছিল করত। তিনি কেন ধমক দিলেন। সারাজীবন তিনি কি শুধু ভুলই করে যাবেন! তাঁর চোখে পানি এসে গেল। কেউ সেই পানি দেখল না।

শওকতের অভ্যাস হচ্ছে ভোরবেলা দুটা খবরের কাগজ নিয়ে চা খেতে বসা। নাশতাটা জরুরি না, খবরের কাগজ পড়াটা জরুরি। তিতলী সেই সময় তার সামনেই থাকে তবে সে নাশতা খায় না। সঙ্গ দেবার জন্যে যে বসে তাও না। নিজ থেকে একটি কথাও বলে না। শওকত

কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় সেই জবাবও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মানুষের অভ্যস্ত হবার ক্ষমতা অসাধারণ। শওকত মনে হচ্ছে এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে।

আজ শওকত খবরের কাগজ তিতলীর দিকে বাড়িয়ে দিল—বিস্মিত গলায় বলল, নাদিয়ার ছবি ছাপা হয়েছে।

তিতলী কিছু বলল না, সে তার চায়ের কাপে চা ঢালছে। তাকে কোনো প্রশ্ন করা হয় নি, কাজেই জবাব দেবার কিছু নেই।

শওকত বলল কী ব্যাপার, তুমি এই খবর পেয়েছ?

'পেয়েছি।'

কখন পেয়েছ?'

'কাল রাতে।'

'রাতে মানে কটার সময়?'

'এগারটার সময়। নাদিয়া টেলিফোন করেছিল।'

'আমি তো তখন বাড়িতেই ছিলাম। আমাকে কিছু বল নি কেন?'

'বলার কী আছে?'

'এত বড় একটা খবর তুমি আমাকে জানাবে না?'

'এখন তো জানলেই।'

'তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে—তুমি নিজ থেকে আমাকে কিছু বলবে না?'

তিতলী জবাব দিল না, চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। শওকত বিরক্তমুখে বলল, তুমি যা করছ তা যে ছেলেমানুষি তা কি বুঝতে পারছ?

তিতলী এই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। শওকত ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি যা করছ তা হচ্ছে হাস্যকর ছেলেমানুষি। যখন ছেলেমানুষিটা শুরু করেছিলে আমি তোমাকে বাধা দেই নি। আমার ধারণা ছিল বাধা দিলে এটা আরো বাড়বে। আমি ভেবেছি সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখছি ঠিক হচ্ছে না।

'এখন কী করবে?'

'শোন তিতলী! আমার ধৈর্য অপরিসীম। আমি তোমাকে আরো সময় দেব। দু বছর, তিন বছর, চার বছর... কোনো অসুবিধা নেই। আমি দেখতে চাই এক সময় তুমি তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ।'

'যদি কোনোদিনই ভুল বুঝতে না পারি?'

'তুমি তো বোকা মেয়ে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে—আমি নিশ্চিত তুমি ভুল বুঝতে পারবে। তখন আমরা জীবন শুরু করব। সে জীবন অবশ্যই আনন্দময় হবে।'

'আনন্দময় হলেই তো ভালো।'

'ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার কি এর মধ্যে দেখা হয়েছে?'

'না।'

'টেলিফোনে কথা হয়েছে?'

'না।'

'শোন তিতলী আমি চাচ্ছি ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হোক, কথা হোক।'

'কেন চাচ্ছ?'

'আমার ধারণা ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার যদি দু-একবার দেখা হয়—তুমি তোমার ভুল আরো দ্রুত বুঝতে পারবে। এক কাজ করা যাক—আমি ভদ্রলোককে বাসায় একদিন খেতে বলি।'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

'তোমার অস্বস্তি বোধ করার কিচ্ছু নেই। আমি তার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করব।'

তিতলী চুপ করে আছে। তার দৃষ্টি চায়ের কাপের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তিতলী ঠিক তার সামনে বসা। নতুন বউরা শ্বশুরবাড়িতে এসে শুরুর কিছুদিন ঘোমটা দিয়ে থাকে। তার মাথায়ও ঘোমটা। লালপাড়ের কালো শাড়িতে তাকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। দেবী প্রতিমার মতো মেয়েটি চোখমুখ শক্ত করে বসে আছে। শওকত নিশ্চিত জানে এই শক্ত মুখ একদিন কোমল হবে। সেই একদিনটা কবে এটাই সে জানে না।'

'তিতলী!'

'জ্বি।'

'আমি আশপাশে থাকলে তোমার কি অসহ্য লাগে?'

'না।'

'আমি আশপাশে থাকলে তোমার মুখ শক্ত হয়ে থাকে এই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি। নাদিয়াকে কনগ্রাচুলেট করতে যাবে না?'

'যাব।'

'আমি সঙ্গে গেলে কোনো অসুবিধা আছে?'

'অসুবিধা নেই—তবে আমি একাই যেতে চাই।'

'ব্যাপারটা খুব অশোভন হবে না? তুমি আমার সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার করছ সেটা তো তোমাদের বাড়ির কেউ জানে না। সবাই জানে আমরা খুব সুখে আছি। আনন্দে আছি।'

'সেটা জানাই তো ভালো।'

'তাদের জন্যে ভালো তো বটেই। তাদের সেই ভালোতে যেন খুঁত না থাকে সেই চেষ্টা তো আমাদের করা উচিত। তোমার পক্ষ থেকে কিছু অভিনয় দরকার। কাজেই হাসিমুখে আমার সঙ্গে চল।'

'আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা। তুমি তো জানই আমি পি.এইচডি করতে বাইরে যাচ্ছি। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?'

'সেটা তোমার ইচ্ছা।'

'অর্থাৎ তোমার নিজের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই।'

'না।'

'সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভালো। এখানে থাকতে পার বা ইচ্ছে করলে তোমার মা–বাবার সঙ্গে থাকতে পার।'

'আমি এখানেই থাকব।'

'বেশ তো থাকবে। যদি এর মধ্যে তোমার ইচ্ছা করে আমার কাছে যেতে—চিঠি দিলেই আমি টিকিট পাঠাব তুমি চলে আসবে।'

'আচ্ছা।'

'তোমার সব কথাই তো এ পর্যন্ত শুনে আসছি—এখন তুমি কি আমার একটা কথা শুনবে? কথাটা হচ্ছে—চল আমার সঙ্গে দুজন মিলে কোনো সুন্দর জায়গা থেকে ঘুরে আসি। যেমন ধর নেপাল। সুন্দর দৃশ্যের পাশে থাকলে মন সুন্দর হয়। পুরোনো অসুন্দর ধুয়েমুছে যায়। যাবে?'

'তুমি বললে যাব।'

'ভেরি গুড।'

'তোমার নাশতা খাওয়া তো হয়েছে আমি কি এখন উঠতে পারি?

শওকত ক্লান্ত গলায় বলল, পার। তার মেজাজ খুবই খারাপ হয়েছে। সে অনেক চেষ্টা করেও মেজাজ ঠিক রাখতে পারছে না। মনে হচ্ছে সে সমস্যাটা সামলাতে পারছে না। ভবিষ্যতেও পারবে কি না বুঝতে পারছে না।

হাসান নামের ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে তার কি দেখা করা উচিত? তার সমস্যা মেটানোর জন্যে ভদ্রলোকের সাহায্য প্রার্থনা করাটা কি ঠিক হবে? ভদ্রলোক কি সাহায্য করবেন? মনে হয় করবেন।

যে কোনো বিবেকবান মানুষেরই সাহায্য করা উচিত। তিতলীকে না জানিয়ে ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এলে হয়। সহজ স্বাভাবিকভাবে সবাই মিলে কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করা হবে। ক্ষতি কী?

'তিতলী! তিতলী!'

তিতলী এসে দাঁড়াল, কিছু বলল না। শওকত বলল, আচ্ছা যাও। এমনি ডেকেছিলাম। ও আচ্ছা শোন, নাদিয়ার ইন্টারভ্যুটা পড়েছ?

'না।'

'পড় নি কেন? নাকি প্রতিজ্ঞা করেছ আমার কেনা খবরের কাগজও পড়বে না?'

'আমি কোনো প্রতিজ্ঞা করি নি।'

'পড়ে দেখ। ভালো লাগবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তোমার প্রিয় মানুষ কে? সে তোমার নাম বলেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তিতলী!'

'থ্যাংক য়্যু।'

'তুমি কি আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ রাখবে? খুব ছোট্ট অনুরোধ?'

'কী অনুরোধ?'

'হাসলে তোমাকে কেমন দেখায় আমি জানি না। একটু হাস আমি দেখি। এত বড় খুশির একটা খবর পেয়েছ এমনিতেই তো হাসা উচিত।'

'উচিত কাজ কি মানুষ সব সময় করতে পারে?'

'না, উচিত কাজ মানুষ সব সময় করতে পারে না। মানুষ বরং অনুচিত কাজটাই সব সময় করে। আমাকে বিয়ে করাটা ছিল খুবই অনুচিত কাজ সেই কাজটা তুমি করেছ। বিয়ের পর পুরোনো সমস্যা ভুলে গিয়ে স্বাভাবিক হওয়াটা ছিল উচিত কাজ—তুমি করছ উল্টোটা। দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস কথা বলি।'

তিতলী বসল।

শওকত ক্লান্ত গলায় বলল, তুমি আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো। তুমি কি আমার কাছ থেকে মুক্তি চাও? চুপ করে থেকো না, বল হ্যাঁ বা না।

'মুক্তি চাইলে পাব?'

তিতলী তাকিয়ে আছে। তার চোখে পলক পড়ছে না। শওকত চুপ করে রইল। তিতলীর প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। সম্ভবত জবাব তার জানা নেই।

১৮

ইংরেজিতে লেখা একটা ছোট্ট চিঠি।

যার বঙ্গানুবাদ মোটামুটি এ রকম—

প্রিয় হাসান সাহেব,

আশা করি ভালো আছেন। আমার বাবা গত মাসের ৯ তারিখে মাইয়োকাড্রিয়েল ইনফ্রেকশনে মারা গেছেন। তাঁর জীবনের অংশবিশেষ যা আপনি লিখেছেন তা আমাকে দিয়ে গেলে বাধিত হব। আপনি আপনার জনৈক বন্ধুর জন্যে বাবার কাছে চাকরি চেয়েছিলেন। তিনি সে ব্যবস্থা করে গেছেন। আশা করি ইতিমধ্যে আপনার বন্ধু সে খবর জানেন। আপনি ভালো আছেন তো?

বিনীতা
চিত্রলেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অফিস অফিস গন্ধওয়ালা চিঠি। অফিস বস ডিকটেট করেছেন—পি.এ. ডিকটেশন নিয়ে চিঠি টাইপ করেছে। ফাইনাল কপি বস পড়েছেন, দু-একটা বানান ঠিক করে নাম সই করেছেন। চিঠি চলে গেছে ডিসপাচ সেকশানে। চিঠিতে নাম্বার বসিয়ে ডিসপাচ ক্লার্ক চিঠি পোস্ট করে দিয়েছে। চিঠিতে আন্তরিক অংশ হচ্ছে গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা আপনি ভালো আছেন তো? এটাকেও আন্তরিক ধরার কোনো কারণ নেই। অফিসিয়েল চিঠিকে ব্যক্তিগত 'ফ্লেভার' দেয়ার এটা একটা টেকনিক।

হাসান চিঠি পেয়েছে বিকেলে। সন্ধ্যা মিলাবার পরপরই ফাইল হাতে হিশামুদ্দিন সাহেবের বাড়ির গেটের সামনে উপস্থিত হল। গেটের দুজন দারোয়ানই তাকে খুব ভালো করে চেনে—তারপরেও তারা এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন তাকে তারা এই প্রথম দেখছে। হাসান বলল, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করব। উনি আছেন না?

দারোয়ানের একজন গম্ভীর গলায় বলল, ম্যাডাম বাড়িতে কারো সঙ্গে দেখা করেন না। আপনি অফিসে যাবেন।

দারোয়ানরা দর্শনপ্রার্থীদের আটকে দিতে পারলে খুশি হয়। হাসান লক্ষ্য করল দারোয়ান দুজনের মুখেই তৃপ্তির ভাব।

'উনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ভেতরে খবর দিয়ে দেখুন। ইন্টারকম তো আছে।'

'আমাদের উপর অর্ডার আছে কাউকে ঢুকতে না দেয়ার।'

'ও আচ্ছা। আমার কাছে ম্যাডামের কিছু জরুরি কাগজপত্র ছিল।'

দারোয়ানদের একজন নিতান্ত অনিচ্ছায় ইন্টারকমের দিকে এগোচ্ছে। তার যেতে-আসতে প্রচুর সময় লাগবে—হাসান সিগারেট ধরাল। সে অবাক হয়ে লক্ষ্য করল হিশামুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে কথা বলার আগে আগে বুকের উপর সে যেমন চাপ অনুভব করত এখনো তাই করছে।

'আপনি যান। সিগারেট ফেলে দিয়ে যান।'

হাসান সিগারেট ফেলল। সিগারেট হাতে কাউকে ঢুকতে দেয়া যাবে না—এমন নির্দেশ কি আছে? দারোয়ানরা ক্ষমতাবানদের যেমন সম্মান দেখাতে ভালবাসে তেমনি ক্ষমতাহীনদের অপমান করতেও ভালবাসে। গেটের সামনে চিত্রলেখা দাঁড়িয়ে থাকলে সে নিশ্চয়ই বলত না—সিগারেট ফেলে দিয়ে আসুন।

হাসান বসার ঘরে চুপচাপ বসে আছে। কতক্ষণ হয়েছে? তার হাতে ঘড়ি নেই। বসার ঘরেও ঘড়ি নেই। সময় কতটা পার হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না, মনে হয় অনেকক্ষণ হয়েছে। একা একা বসে থাকতে অদ্ভুত লাগছে। নীরব একটা বাড়ি। শব্দ নেই, হইচই নেই। টিভি চলছে না, কেউ হাঁটাহাঁটি করছে না। এ রকম শব্দহীন ঘরে মানুষ বাস করে কী করে। বাড়িতে নানান রকম শব্দ হবে—শিশুরা চিৎকার করবে—দাপাদাপি করবে। তাদের হাসি এবং কান্নার শব্দ ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাবে....

'সরি হাসান সাহেব দেরি করে ফেলেছি। দেরিটা ইচ্ছাকৃত না। নিন চা নিন।'

চিত্রলেখা নিজেই হাতে করে চায়ের কাপ এনেছে। তার এই ভদ্রতায় দীর্ঘ অপেক্ষা এবং গেটের সামনের অপমান ভুলে যাওয়া যায়।

'আপনি এসেছেন শোনার পর হট শাওয়ার নিতে বাথরুমে ঢুকেছিলাম। সারাদিন নানান জায়গায় ছোটাছুটি করেছি। গা ঘেমে ছিল। একা একা নিশ্চয়ই খুব বোর হচ্ছিলেন?'

'বোর হচ্ছিলাম না।'

'বাবার মৃত্যুর খবর জানতেন?'

'উনি যেদিন মারা গিয়েছিলেন আমি সেদিনই এসেছিলাম। উনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আসি নি—এমনিতেই এসেছিলাম। বাড়ির সামনে প্রচুর গাড়ি দেখলাম। খবর শুনলাম—তারপর ভাবলাম আমার কিছু করার নেই। চলে গিয়েছি।'

'আপনি মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারেন না তাই না?'

'জ্বি না।'

'বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন, উনাকে একবার শেষ দেখার ইচ্ছাও আপনার হয় নি?'

'জ্বি না। জীবিত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি সেই স্মৃতিই আমি রাখতে চাই। মৃত মুখের স্মৃতি রাখতে চাই না।'

'এটা অবশ্য ভালোই বলেছেন। বাবার জীবনী লেখা কাগজগুলো কি এনেছেন?'

'জ্বি। ফাইলে সব গোছানো আছে। কিছু বানান ভুল থাকতে পারে। বাংলা বানানে আমি খুব কাঁচা।'

'এখানে ক'পৃষ্ঠা আছে?'

'পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মতো। স্যার যখন যা বলেছেন আমি লিখেছি। সাজাই নি। আপনি যদি বলেন—সাজিয়ে দেব।'

চিত্রলেখা হাসছে। হাসান বুঝতে পারছে না মেয়েটার হাসির কারণ কী। বাবার মৃত্যুশোক এই মেয়ে সামলে উঠেছে। সামলে না উঠলেও তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই তার জীবনের উপর এত বড় একটা ঝড় গেছে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'এই লেখাগুলো আপনি আমার সামনে বসে কুটিকুটি করে ছিঁড়ুন।'

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

চিত্রলেখা ছোট্ট করে নিশ্বাস ফেলে বলল, বাবা নিজেই আমাকে বলে গেছেন কাগজগুলো যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়। আপনাকে যা বলা হয়েছে—তা ঠিক না। ভুল বলা হয়েছে। উইসফুল থিংকিঙের মতো উইসফুল পাস্ট বলে একটা ব্যাপার আছে। বাবা তাই করেছেন।

'ও আচ্ছা।'

'তাঁর বড় বোন পুষ্পের কথা আছে না? যিনি হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি হঠাৎ মারা যান নি। বিষ খেয়েছিলেন। বিষ খাওয়া ছাড়া তাঁর উপায়ও ছিল না। এই তরুণী মেয়েটিকে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্যে কুৎসিত নোংরামির ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। বাবার উচিত ছিল তাঁর নিজের সংগ্রামের গল্প বলা। কী করে তিনি ধাপে ধাপে এতদূর উঠেছেন। এত শক্তি পেয়েছেন কোথায়? বাবা যে স্কুলে পড়তেন সেই স্কুলের একজন শিক্ষক নজিবুর রহমান তাঁকে নানানভাবে সাহায্য করেছিলেন। নিজে দরিদ্র মানুষ হয়েও বাবাকে কলেজে পড়ার খরচ দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করিয়েছেন। এই অসাধারণ মানুষটির জন্যে বাবা কিছুই করেন নি। তিনি শেষ জীবনে খুব কষ্টে পড়েছিলেন, বাবা তাকে দেখতে পর্যন্ত যান নি।'

চিত্রলেখা একটু থামতেই হাসান বলল, এইসব কথা বলতে আপনার বোধহয় খারাপ লাগছে। প্রসঙ্গটা থাক।

'আমার বলতে খারাপ লাগছে না। বরং ভালো লাগছে। আমি মনে হয় বাবাকে একটু একটু বুঝতে পারছি। তাঁর চরিত্রের একটা অদ্ভুত দিক কী জানেন? জীবনে বড় হবার জন্যে তিনি যাদের সাহায্য নিয়েছেন পরবর্তী সময়ে তাদের পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। আবার কারো কারো প্রতি অকারণ মমতা পোষণ করেছেন। যেমন ধরুন আপনি। কারোর কথায় বা কারোর সুপারিশে বাবা কাউকে চাকরি দিয়েছেন বা চাকরির যোগাড় করেছেন এমন নজির নেই। কিন্তু আপনার ব্যাপারে ভিন্ন ব্যবস্থা হল। তাৎক্ষণিকভাবে বাবা সব ঠিকঠাক করলেন। আপনার বন্ধু নিশ্চয়ই খুব খুশি?'

'জ্বি খুবই খুশি।'

'উনি কি সিঙ্গাপুর চলে গিয়েছেন?'

'জ্বি।'

'আপনার প্রতি নিশ্চয়ই তিনি খুব কৃতজ্ঞ। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গিটা কী একটু বলুন তো শুনি। তিনি কী করলেন? আপনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন?'

'ও আমার ভূমিকাটা জানে না। ওকে কিছু বলি নি।'

'কিছুই বলেন নি?'

'জ্বি না।'

'বলেন নি কেন?'

'বলতে ইচ্ছা করে নি।'

চিত্রলেখা তাকিয়ে আছে। তার চোখে কৌতুক ঝিলমিল করছে। মনে হচ্ছে হাসানের এই ব্যাপারটায় সে খুব মজা পাচ্ছে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'লোকচরিত্র বোঝার ব্যাপারে বাবার ক্ষমতা ছিল অসীম। আমার ধারণা আপনাকে উনি ঠিকই বুঝেছিলেন। আপনি কি জানেন বাবা আপনার পেছনে স্পাই লাগিয়ে রেখেছিলেন?'

'কী বললেন?'

'চমকে উঠবেন না। এটাও বাবার পুরোনো স্বভাব। কারো সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তিনি লোক লাগিয়ে দিতেন। আপনার উপর বিরাট একটা ফাইল আছে। আপনি কোথায় যান, কী করেন মোটামুটি সবই সেই ফাইলে আছে।'

হাসান হতভম্ব গলায় বলল, ও।

'তিতলী নামের একটা মেয়ের সঙ্গে আপনার খুব ভাব ছিল তাই না?'

'জ্বি।'

'উনাকে নিয়ে আপনি মাঝেমধ্যে বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরতেন।'

'এইসবও কি ফাইলে আছে?'

'জ্বি।'

'আপনার এক ভাই রকিব সম্পর্কে অনেক কিছু আছে।'

'কী আছে?'

'থাক আপনার না জানলেও চলবে। আপনি বরং তিতলীর কথা বলুন। উনার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়?'

'জ্বি না।'

'দেখা করতে ইচ্ছে করে না?'

'জ্বি না।'

'ভুল কথা বলছেন কেন? আপনি তো মাঝে মাঝেই তিতলীদের বাড়ির সামনে রাস্তা দিয়ে হাঁটাহাঁটি করেন।'

'ফাইলে লেখা?'

'জ্বি। ভুল লেখা?'

'জ্বি না ভুল লেখা না।'

'আপনি তো এখনো বুড়িগঙ্গায় নৌকায় চড়ে একা একা ঘোরেন তাই না?'

'জ্বি।'

'আপনার কি মনে হয় না—আপনার কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক।'

'হতে পারে।'

'আপনার সঙ্গে অনেকক্ষণ বকবক করলাম। কিছু মনে করবেন না। আসলে কথা বলার কেউ নেই। বাবার সব দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার হাতে। সামাল দিতে পাচ্ছি না। আপনার

মতো একটা জীবন আমার হলে মন্দ হত না। কাজকর্ম নেই। ঘুরে বেড়ানো—হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি। বিষণ্ন মনে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ।'

চিত্রলেখা কিশোরীদের মতো হাসছে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, সরি। ঠাট্টা করলাম কিছু মনে করবেন না।

হাসান বলল, আজ উঠি?

'আচ্ছা। ভালো কথা, হাসান সাহেব আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে বাবা আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দিতেন না?'

'জ্বি।'

'আমিও আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে টাকা দেব। মাঝে মাঝে এসে আমার বকবকানি শুনে যাবেন।'

হাসান কিছু বলল না। চিত্রলেখা বলল, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন?

'বুঝতে পারছি না। সুমিদের বাসায় যেতে পারি।'

'আপনার ছাত্রী?'

'জ্বি।'

চিত্রলেখা হাসতে হাসতে বলল—এখন তো সে আপনার ছাত্রী না। এক সময় ছিল। আচ্ছা যান শুধু শুধু আপনাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছি...। আসুন আপনাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দি।

চিত্রলেখা হাসানের সঙ্গে নিঃশব্দে হাঁটছে। দারোয়ান দুজন চট করে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিল।

হাসান বলল, যাই।

চিত্রলেখা জবাব দিল না। তার বাবা হিশামুদ্দিন সাহেব এই ছেলেটিকে এত পছন্দ কেন করতেন তা সে বোঝার চেষ্টা করছে। হিশামুদ্দিন সাহেব হাসানের ফাইল এত যত্ন করে কেন তৈরি করেছেন। তাঁর মাথায় অন্য কোনো পরিকল্পনা কি ছিল?

বেল টিপতেই সুমি দরজা খুলে দিল। সহজ গলায় বলল, স্যার কেমন আছেন? যেন সে স্যারের বেল টেপার জন্যেই বসার ঘরে চুপচাপ বসে ছিল।

হাসান বলল, কেমন আছ সুমি?

সুমি বলল, ভালো। স্ট্রং ডায়রিয়া হয়েছিল—এখন ভালো।

'স্ট্রং ডায়রিয়ার জন্যেই কি তোমাকে এমন রোগা রোগা লাগছে?'

'না। বাবা চলে গেছেন তো খুব মন খারাপ। এই জন্যেই রোগা রোগা লাগছে। মন খারাপ হলে মানুষকে রোগা রোগা লাগে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ তাই। আপনারও নিশ্চয়ই মন খারাপ। আপনাকেও খুব রোগা রোগা লাগছে।'

'আমার মন অবশ্যি একটু খারাপ। তুমি ঠিকই ধরেছ।'

'স্যার বসুন। কী খাবেন বলুন, চা না কোক?'

'বাসায় আর কেউ নেই?'

'কাজের মেয়েটা আছে—রহমত চাচা আছে। মা গিয়েছে মেজোখালার বাসায়। আমারও যাবার কথা ছিল।'

'যাও নি কেন?'

'আপনি আসবেন তো—এই জন্যে যাই নি।'

হাসান হেসে ফেলল। সুমির এই ব্যাপারটা খুব মজার। এমনভাবে কথা বলে যেন সে ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখছে। দু মাস পর আজ হাসান এসেছে। তাও আসার কথা ছিল না। বেবিট্যাক্সি দিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ বেবিট্যাক্সির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেবিট্যাক্সিওয়ালা স্টার্টারের হাতল ধরে অনেক টানাটানি করে হাল ছেড়ে দিল। হাসান বেবিট্যাক্সি থেকে নেমে দেখে সুমিদের বাসা দুটা বাড়ির

পরেই। বাসার আশপাশেই যখন আসা হল তখন সুমিকে দেখে যাওয়া যাক। এই ভেবে সুমিদের বাসায় আসা। অথচ মেয়েটা ভবিষ্যদ্বক্তা জেন ডিক্সনের মতো কথা বলছে।

'স্যার।'

'হুঁ।'

'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'

'কে বলল করছি না। করছি তো।'

'উঁহুঁ। আপনি বিশ্বাস করছেন না। আপনার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে আপনি মনে মনে হাসছেন। কেউ যখন মনে মনে হাসে তখন তার চোখ হাসতে থাকে। মুখ থাকে খুব গম্ভীর।'

'আমার বুঝি এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি আমার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করবেন।'

'সেটা কীভাবে?'

'ফুলিকে আমি বলব—আমার পড়ার টেবিলের উপর থেকে নীল ভেলভেটের ডায়েরিটা আনতে। ওই ডায়েরিতে আজকের তারিখে আমি লিখে রেখেছি—আজ হাসান স্যার আমাদের বাসায় আসবেন।'

'বল কী?'

'ডায়েরিটা আমি নিজেই আনতে পারতাম। আমি আনলে আপনি ভাবতেন আমি আপনার সামনে থেকে চলে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ডায়েরিতে এটা লিখে নিয়ে এসেছি। এই জন্যেই ফুলিকে দিয়ে আনাব।'

সুমি গম্ভীরমুখে বসে আছে। পা দোলাচ্ছে। হাসান মনে মনে বলল, মেয়েটা খুবই অন্যরকম। বিরাট একটা বাড়িতে একা একা বড় হয়ে মেয়েটা অন্যরকম হয়ে গেছে। যতটুকু ভালবাসা তার প্রয়োজন তার মা একা তাকে ততটুকু ভালবাসা দিতে পারছে না। মেয়েটা নিঃসঙ্গ। সঙ্গপ্রিয় মানুষের জন্যে নিঃসঙ্গতার শাস্তি—কঠিন শাস্তি। এই শাস্তি মানুষকে বদলে দেয়।

'স্যার।'

'বল।'

'আমার বাবার ধারণা আমার ই.এস.পি. ক্ষমতা আছে। ই.এস.পি. হচ্ছে এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন।'

'তুমি এই কঠিন বাক্যটা জান!'

'হ্যাঁ জানি। বাবা আমার সম্পর্কে কী বলে জানেন?'

'না।'

'জানতে চান?'

'হ্যাঁ জানতে চাই।'

'বাবা বলেন—আমি ইচ্ছা করলেই মানুষের ভবিষ্যৎ বলে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাতে পারি। বাবার কথা কিন্তু ঠিক না। আমি সবার ভবিষ্যৎ বলতে পারি না। যাদের খুব পছন্দ করি শুধু তাদেরটা বলতে পারি।'

'আমাকে কি তুমি খুব পছন্দ কর?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'সেটা আমি আপনাকে বলব না।'

'ফুলিকে ডেকে বল ডায়েরিটা আনতে। দেখি ডায়েরিতে তুমি কী লিখেছ?'

হাসান ডায়েরি দেখে সত্যিকার অর্থেই একটা ধাক্কার মতো খেল। ডায়েরিতে গোটা গোটা হরফে লেখা—"আজ হাসান স্যার আমাকে দেখতে আসবেন। তবে আমার জন্যে কিছু আনবেন না। খালি হাতে আসবেন।"

হাসান সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোমার তো দেখি আসলেই ই.এস.পি. আছে। তুমি আমার সম্পর্কে আর কী বলতে পার?

'অনেক কিছুই বলতে পারি। আপনি কাকে বিয়ে করবেন—তাও বলতে পারি।'

'বলতে পারলে বল।'

'উঁহুঁ আমি বলব না।'

'বলবে না কেন?'

'শুধু শুধু কেন বলব? স্যার আপনি চা খাবেন, না কোক খাবেন?'

'চা খাব।'

'আগে একটু কোক খেয়ে নিন না। তারপর চা খাবেন। আমি কোক দিয়ে খুব একটা মজার ড্রিংকস বানাতে পারি। বাবা শিখিয়েছেন। কী করতে হয় জানেন—কোকের গ্লাসে দুটা কালো কাঁচা মরিচ মাঝামাঝি চিরে দিয়ে দিতে হয়। তার সঙ্গে এক চামচ লেবুর রস এবং সামান্য বিট লবণ দিতে হয়। তারপর কোকের গ্লাসটা ডিপ ফ্রিজে দিয়ে খুব ঠাণ্ডা করতে হয়। সার্ভ করার আগে সামান্য গোলমরিচের গুঁড়া গ্লাসে দিয়ে দিতে হয়। না দিলেও চলে। আমি দেই নি। বাসায় গোলমরিচের গুঁড়া ছিল না, এই জন্যে দেই নি।'

'তুমি কি ড্রিংকস বানিয়ে রেখেছ?'

'হুঁ।'

'বেশ তো তাহলে নিয়ে এস খাই।'

'বাবার ধারণা ড্রিংকসটা খুব ভালো। আমার ভালো লাগে না। ঝাল তো এই জন্যে ভালো লাগে না। আপনার কি ঝাল পছন্দ?'

'হ্যাঁ পছন্দ।'

'ঝাল কম খাবেন। ঝাল বেশি খেলে পেটে আলসার হবে।'

'আচ্ছা কমই খাব। তোমাকে আজ অন্যরকম লাগছে কেন?'

সুমি পা দোলাতে দোলাতে বলল, চশমা নিয়েছি তো এই জন্যে অন্যরকম লাগছে। চশমা পরলে সবাইকে অন্যরকম লাগে। কাউকে বেশি অন্যরকম লাগে, আবার কাউকে কম অন্যরকম লাগে। আমাকে বেশি লাগছে।

AMARBOI.COM

হাসান কাঁচা মরিচের কোক খেল। চা খেল। সে ভেবেছিল মিনিট দশেক থেকে চলে যাবে। সে থাকল প্রায় দু ঘণ্টা। নানান রকম সমস্যায় সে পর্যুদস্ত। বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার সময় কোনো সমস্যা মাথায় থাকে না। বরং মনে হয়—পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা অর্থহীন নয়। বেঁচে থাকার আনন্দ আলাদা। শুধুমাত্র সেই আনন্দের জন্যেই দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যায়।

হাসান বলল, সুমি আজ উঠি?

সুমি বলল, আচ্ছা।

'আবার আসবেন' বাক্যটা বলল না। এই মেয়ে কখনো তা বলে না। কারণটা কী? সে জানে আবার কবে স্যার আসবেন সেই জন্যেই কি? এই হাস্যকর যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না। জানে না বলেই তারা মনের আনন্দে বর্তমান পার করতে পারে।

হাসানের বড় মামা—মুকুল মামা ভবিষ্যৎ জেনে ফেলেছিলেন। ডাক্তারেরা তার পেট পরীক্ষা করে বললেন—স্টোমাক ক্যানসার মেটাসথিসিস হয়ে গেছে। শরীরে ক্যানসারের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে গেছে। আয়ু আছে তিন মাস। ভবিষ্যৎ জানার পর মুকুল মামার জীবন বিষময় হয়ে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলেন তিন মাস আগে থেকেই। যার সঙ্গেই দেখা হয় তাকে জড়িয়ে ধরেই কাঁদেন—আমার জীবনটা রক্ষা কর। আমার জীবনটা রক্ষা কর। মুকুল মামার জন্যে ভবিষ্যৎ জেনে ফেলাটা সুখকর হয় নি। আনন্দময় কোনো ভবিষ্যৎ আগেভাগে জেনে ফেললে কী হবে? সেই আনন্দ অনেকখানি কমে যাবে। মানুষকে সুখী থাকা উচিত বর্তমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে। মানুষ তা পারে না। বর্তমানে সে দাঁড়িয়েই থাকতে পারে না। তার এক পা থাকে অতীতে আরেক পা ভবিষ্যতে। দু নৌকায় পা, সেই দু নৌকা আবার যাচ্ছে দুদিকে।

রাস্তায় নেমে হাসান রিকশা নিল। রাত বেশি হয় নি—ন'টা বাজে। এখনি বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বেকারদের রাত দশটার আগে বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করে না। হঠাৎ করে তিতলীদের বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে এই ইচ্ছা হয়। যখন হয় তখন আর কিছু ভালো লাগে না। ইচ্ছাটা হু-হু করে বাড়তে থাকে। তিতলীদের বাড়িতে যাবার জন্যে অজুহাত একটা আছে। ভালো অজুহাত। নাদিয়া এমন চমৎকার রেজাল্ট করেছে তাকে কনগ্রাচুলেট করা তার অবশ্যই কর্তব্য। যেদিন নাদিয়ার রেজাল্টের কথা জেনেছে সেদিনই সে নাদিয়ার জন্যে ভালো একটা কলম কিনেছে। কলমের বাক্সটা গিফট র‍্যাপে মুড়েছে। ছোট্ট একটা চিরকুট গিফট র‍্যাপে ঢোকাল। সেখানে লেখা—

নাদিয়া,

ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়ে এতদিন শুধু পত্রিকায় দেখেছি। বাস্তবে এদের সত্যি সত্যি কোনো অস্তিত্ব আছে তা মনে হত না। রেজাল্ট হবার পর তোমাকে বাস্তবের কেউ মনে হয় না। মনে হয় তুমি অন্য কোনো গ্রহের। তুমি আমার অভিনন্দন নাও।

ইতি

হাসান ভাইয়া।

উপহারটা নাদিয়াকে এখনো দেয়া হয় নি। অনেকবারই সে তিতলীদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গেছে। শেষ পর্যন্ত গেট খুলে ভেতরে ঢোকে নি। হয়তো বাড়িতে ঢুকে দেখা যাবে তিতলী মার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। হাসিমুখে শ্বশুরবাড়ির নানান গল্প করছে। হাসান সেই আনন্দময় মুহূর্তে প্রবেশ করামাত্র ছন্দপতন হবে। আজ বোধহয় যাওয়া যায়। তিতলী মার বাড়িতে এলেও এত রাত পর্যন্ত নিশ্চয়ই থাকবে না। নববিবাহিতা তরুণীরা মার বাড়িতে এত সময় নষ্ট করে না। এরা দ্রুত অতীত ভুলতে চেষ্টা করে। মেয়েরা তাদের শরীরে সন্তান ধারণ করে। সন্তান ধারণ করে বলেই হয়তো প্রকৃতি তাদের ভবিষ্যৎমুখী করে রাখে। অতীত তাদের কাছে পুরোনো গল্পের বইয়ের মতো। যে গল্প একবার পাঠ করা হয়েছে বলে কৌতূহল মরে গেছে। দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা করে না। বইটি হারিয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

হাসান তিতলীদের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট শেষ করল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকতে যতটুকু মনের জোর দরকার এই মুহূর্তে ততটুকু মনের জোর তার নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে তিতলী তার মার বাড়িতে। কারণ ঘরে অনেকগুলো বাতি জ্বলছে। বারান্দায়ও বাতি জ্বলছে। এতগুলো বাতি জ্বলার কথা না। বাইরের বারান্দার বাতি তো কখনোই জ্বালানো থাকে না। ঘটনা কী ঘটেছে হাসান তা অনুমান করার চেষ্টা করছে। তিতলী এসে কলিংবেল টিপেছে। নাদিয়া বাইরের বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে দরজা খুলল। তারপর আপাকে দেখে এতই আনন্দিত হল যে বাতি নেভাতে ভুলে গেল। তিতলী এ বাড়িতে এলে গেটের ভেতর একটা গাড়ি থাকার কথা। গাড়ি অবশ্যি নেই। তিতলীর স্বামী এসে হয়তো তিতলীকে নামিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। রাত এগারটার দিকে আবার এসে নিয়ে যাবেন।

হাসান হাঁটা শুরু করল। আজ থাক আরেকদিন সে আসবে। নাদিয়ার উপহারটা মনে হয় দীর্ঘদিন পকেটে পকেটে ঘুরবে। গিফট র‍্যাপ কুঁচকে যাবে, ময়লা হয়ে যাবে উপহার আর দেয়া হবে না। সবচে ভালো হত হঠাৎ যদি রাস্তায় নাদিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। উপহারটা তার হাতে দিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলা যেত। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা শূন্য। নাদিয়া এমন মেয়ে যে কখনো ঘর থেকে বের হয় না। ঘর থেকে বের হলেই তার নাকি কেমন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। চার দেয়ালের ভেতরে সে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই নাকি তার শান্তি শান্তি লাগে। কী অদ্ভুত কথা!

বাসায় ফিরতে হাসানের ইচ্ছা করছে না। আজ বাসার পরিস্থিতি খুব খারাপ থাকার কথা। তারেক এক দিনের অফিস ট্যুরের কথা বলে চিটাগাং গিয়েছিল। এক দিনের জায়গায় সাত দিন কাটিয়ে আজ দুপুরে ফিরেছে। ট্যুরের ব্যাপারটা যে মিথ্যা রীনার কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। চার দিনের দিন অফিস থেকে তারেকের এক কলিগ এসেছিল খোঁজ নিতে—তারেকের অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে কি না, তার কাছেই রীনা জেনেছে তারেক দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছে। রীনা খুবই বুদ্ধিমতী মেয়ে—দুইয়ে দুইয়ে চার করা তার জন্যে কোনো সমস্যাই না। হাসান এখনো জানে না ভাবী হিসাব মিলাতে বসেছে কি না। সব ঘটনা জানার পর রীনার প্রতিক্রিয়া কী হবে হাসান তাও বুঝতে পারছে না। হঠাৎ করে ধৈর্য হারালে সমস্যা হবে। তবে ভাবী সম্ভবত ধৈর্য হারাবে না।

তারেক দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। সন্ধ্যায় গোসল করে পুরোনো খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে। দুবার চা চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। তার চেহারা এবং কথাবার্তায় কোনোরকম উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। বরং মুখটা হাসি হাসি। টগরের কথা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর টগর ঠিকই শব্দে কাশছে তারেক সেটা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করল। রীনাকে ডেকে বলল, টগরের বুকে কফ বসে গেছে। এক কাজ কর সরিষার তেলে রসুন দিয়ে তেলটা গরম করে বুকে মালিশ করে দাও। আর এক কাপ কুসুমগরম পানিতে এক চামচ মধু দিয়ে ওই পানিটা খাইয়ে দাও। কফ আরাম হবে। ঘরে মধু আছে?

রীনা স্বাভাবিক গলায় বলল, না মধু নেই।

তারেক বলল, এক শিশি মধু ঘরে সবসময় রাখবে। মেডিসিন বক্সে যেমন নানান ধরনের ওষুধপত্র থাকে তেমনি এক শিশি মধু থাকা উচিত। কোরান শরিফে কয়েকবার মধুর কথা উল্লেখ করা আছে। হাসানকে বল মধু নিয়ে আসুক।

'হাসান বাসায় নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে—কাগজটা পড়ে দি। আমি এনে দেব।'

তারেক মধু এনে দিয়ে রাতের খাবার খেতে গেল। সে সাধারণত চুপচাপ খাওয়া শেষ করে। আজ রীনার সঙ্গে গল্প শুরু করল। রাজনৈতিক গল্প। তারেক বিএনপির সমর্থক ছিল। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবার পর সে কিছুটা আওয়ামী লীগঘেঁষা হয়ে পড়েছে।

'শেখ হাসিনা দেশ তো মনে হয় ভালোই চালাচ্ছে, কী বল?'

'হুঁ।'

'সাহস আছে। রাজনীতিতে সাহসটা অনেক বড় জিনিস। কর্নেল ফারুক গং-কে কেমন জেলে ঢুকিয়ে দিল দেখলে?'

'হুঁ।'

'ভালো কাজ করলে সাপোর্ট পাবে। তবে মূল সমস্যাটা কোথায় জান?'

'না।'

'মূল সমস্যা মানুষের ভেতর না। মূল সমস্যা সিংহাসনে। সিংহাসনে কিছুদিন বসলেই মাথা এলোমেলো হয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধীকে দেখ—লোকে যে তাঁকে এখনো ভালো বলে কেন বলে? সিংহাসনে বসেন নি বলেই বলে। দু মাস সিংহাসনে বসতেন দেখতে মানুষ গান্ধীজীর নাম শুনে থুতু দিত। ছাগল নিয়ে ঘুরেও লাভ হত না। ঠিক বলছি না?'

'হুঁ।'

'ঘরে কি পান আছে?'

'আছে।'

'কাঁচা সুপারি আছে?'

'না।'

'কাল অফিস থেকে ফেরার সময় কাঁচা সুপারি নিয়ে আসব। কাঁচা সুপারি হার্টের জন্যে ভালো। কাঁচা সুপারিতে এলকলিয়েড বলে একটা জিনিস থাকে। নাইট্রোজেনঘটিত কম্পাউন্ড। এটা হার্টের জন্যে উপকারী। পেপারে পড়েছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আমাদের গ্রামের মানুষদের মধ্যে হার্টের অসুখ নেই তার মূল কারণ ওরা কাঁচা সুপারি খায়।'

'ও।'

খাওয়াদাওয়া শেষ করে তারেক নিজেই বিপুল উৎসাহে ছেলের বুকে তেল মালিশ করে দিল। কোলে নিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল। নিজে ঘুমোতে এল রাত এগারটার দিকে। পান খেয়ে তার মুখ লাল। হাতে সিগারেট। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শেষ সিগারেটটা খাবে। সুখী সুখী চেহারা। রীনা মশারি খাটাল। পানির গ্লাস, জগ এনে রাখল। ঘুমোতে যাবার আগে আয়নার সামনে চুল বাঁধতে বাঁধতে সহজ গলায় বলল, চিটাগাঙের ওয়েদার কেমন?

তারেক বলল, ভালো।

'বৃষ্টি হচ্ছে না?'

'একদিন হয়েছিল।'

'এই কদিন লাবণীর বাসাতেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। আর বল কেন যন্ত্রণা—ওরা এপার্টমেন্ট দিয়েছে। কমপ্লিট হবার আগেই দিয়ে বসে আছে। ইলেকট্রিসিটির কানেকশান নেই। গ্যাসের কানেকশান নেই। দুটা বাথরুমের একটায় কোনো ফিটিংসই নেই। এই অবস্থায় ওদের ফেলে রেখে আসতে পারি না।'

'আমাকে তুমি মিথ্যা কথা বলে গিয়েছ। বলেছ ট্যুরে যাচ্ছ।'

'তাই বলেছিলাম?'

'হ্যাঁ।'

'মিথ্যা না—ট্যুরেই গিয়েছিলাম। চিটাগাং অফিসের হিসাবপত্র অডিট হচ্ছে। ঢাকা থেকে অডিট টিম যাচ্ছে, আমি সেই অডিট টিমে আছি।'

চুল বাঁধা শেষ করে রীনা স্বামীর দিকে ফিরল। সহজ গলায় বলল, আমি এর মধ্যে তোমার অফিসে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে জানলাম তুমি দুদিনের ক্যাজুয়েল লিভ নিয়েছ।

'ও এই ব্যাপার। আসলে হয়েছে কী—অডিটের ডেট হঠাৎ করে পিছিয়ে দিল। এদিকে মানসিকভাবে আমি তৈরি চিটাগাং যাব। তখন ভাবলাম যাই ঘুরেই আসি।'

'তুমি তো মিথ্যা কখনো বল না। আজ এমন সহজ ভঙ্গিতে মিথ্যা বলছ কেন? আমি তো কোনো রাগারাগিও করছি না হইচইও করছি না। মিথ্যা বলার দরকার কী? তুমি কি লাবণী মেয়েটির প্রেমে পড়েছ?'

'আরে কী যে বল, প্রেমে পড়াপড়ির এর মধ্যে কী আছে। একটা অসহায় মেয়ে বিপদে পড়েছে তাকে সাহায্য করেছি। এর বেশি কিছু না।'

'এর বেশি কিছু না?'

'না।'

'দয়া করে তুমি আমাকে সত্যি কথা বল—এর বেশি তোমার কাছে কিচ্ছু চাচ্ছি না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি কোনো সমস্যা তৈরি করব না। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি কী সমস্যা করব? আচ্ছা তুমি ছ'দিন ওই মেয়েটির বাড়িতেই ছিলে?'

'হ্যাঁ। ওর হল টু বেডরুম এপার্টমেন্ট। আমি একটাতে ছিলাম, ওরা মা-মেয়ে একটাতে ছিল।'

'রাতে সে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আসে নি?'

'এসেছে।'

'কী নিয়ে গল্প করলে? পলিটিক্স?'

'না—লাবণী তার জীবনের নানান গল্প করত, শুনতাম। খুবই দুঃখী মেয়ে।'

'মেয়েটির সঙ্গে তোমার শারীরিক কোনো সম্পর্ক হয়েছে?'

'আরে ছিঃ ছিঃ এইসব কী বলছ?'

'হয়েছে কি না সেটা বল? গল্প করতে করতে হয়তো অনেক রাত হয়ে গেল। মেয়েটা ঠিক করল রাতটা তোমার সঙ্গেই থাকবে।'

'কী যে তুমি বল রীনা, আমি ফেরেশতার মতো মানুষ!'

'ইবলিশ শয়তানও এক সময় ফেরেশতা ছিল—তারপর সে শয়তান হয়েছে।'

'এইখানে তুমি একটা ভুল করলে। অধিকাংশ মানুষ এই ভুলটা করে। ইবলিশ কিন্তু ফেরেশতা ছিল না। ইবলিশ আসলে ছিল জ্বিন।'

'জ্বিন ছিল না ফেরেশতা ছিল সেটা পরে দেখা যাবে—এখন বল, মেয়েটার সঙ্গে কি তোমার কোনো শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে?'

'পানি দাও। এক গ্লাস পানি খাব।'

রীনা পানি এনে দিল। তারেক কয়েক চুমুক পানি খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিল। রীনা বলল, তুমি আমার প্রশ্নের জবাব কি দেবে, না দেবে না? হ্যাঁ বলবে কিংবা না বলবে। তুমি যা বলবে তাই আমি বিশ্বাস করব। সত্যি কথা বলার অনেক উপকারিতা আছে। তুমি তো বিরাট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছ—এখন তোমার উচিত সত্যি কথা বলা। এখন মিথ্যা কথা বললে ঝামেলা আরো বাড়বে। সবকিছু জট পাকিয়ে যাবে। এখন তোমার উচিত জট কমানো। তুমি কি মেয়েটার সঙ্গে ঘুমিয়েছ? আমি খুব ভদ্রভাবে তোমাকে প্রশ্নটা করলাম। আসলে কী বলতে চাচ্ছি তা নিশ্চয়ই বুঝছ? মেয়েটার সঙ্গে রাতে ঘুমিয়েছ?

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটি কি তোমাকে বিয়ে করতে চায়?'

'চাইলেই বা উপায় কী?'

'উপায় থাকবে না কেন? বিয়ে তো আর কিছুই না এক ধরনের কনট্রাক্ট। আরবিতে নিকাহনামার অর্থ হচ্ছে sex contract। তুমি পুরোনো কনট্রাক্ট বাতিল করে নতুন কনট্রাক্ট করবে।'

'তুমি রেগে যাচ্ছ রীনা।'

'আমি মোটেই রাগি নি। তবে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে বাস করব না। আগামী পরশু আমি চলে যাব। কালকের দিনটা আমার যাবে গোছগাছ করতে। তোমার সংসার তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিয়ে যাব। তারপর তুমি আমাকে ডিভোর্সের ব্যবস্থা করবে। ডিভোর্স হয়ে যাবার পর ওই মেয়েটিকে বিয়ে কোরো। চাকরিজীবী মেয়ে আছে তোমার জন্যে সুবিধাও হবে। তোমার একার রোজগারে সংসার চলছে না। দুজনের রোজগারে চলবে।'

'রীনা তুমি খুবই রেগে গেছ বুঝতে পারছি। রাগারই কথা।'

'আমি মোটেও রাগি নি। ব্যাপারটা জানার পর থেকেই আমি এটা নিয়ে ভাবছি। তোমাকে যে কথাগুলো বললাম তার প্রতিটি শব্দ নিয়ে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবেছি। যাই হোক এখন ঘুমোতে চল।'

রীনা বাতি নিভিয়ে বিছানায় উঠে এল। গত চার রাতে তার এক ফোঁটা ঘুম হয় নি। আজ বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। শান্তিময় ঘুম।

১৯

রীনা খুব শান্ত ভঙ্গিতেই তার সুটকেসে কাপড় ভরল। কয়েকটা ব্যবহারি শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট। ব্যস এই তো। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে নেই নেই করেও অনেক কিছু জমে

গেছে। সবকিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। থাকুক তার স্মৃতি হিসেবে কিছু জিনিসপত্র। সঙ্গে করে সামান্য হলেও কিছু টাকা-পয়সা নেয়া দরকার। সেটা নিতে ইচ্ছে করছে না। ছোটমামার দেয়া সাত শ ডলারের কিছুই নেই। রীনা ভেবেছিল একটা টাকাও সে খরচ করবে না। সব জমা করে রাখবে। অথচ কত দ্রুতই না সেই টাকাটা খরচ হল। তারেকের অফিসের কিছু দেনা শোধ করা ছাড়া টাকাটা আর কোনো কাজে লাগে নি। তার হাত আজ পুরোপুরি খালি।

বউ হিসেবে যখন সে বাবার বাড়ি থেকে আসে তখনো খালি হাতে এসেছিল। বাবা কয়েকবার বলেছিলেন, মেয়েটার হাতে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে দাও। টুকটাক খরচ আছে। ফট করে স্বামীর কাছে চাইতেও পারবে না লজ্জা লাগবে। বিয়েবাড়ির উত্তেজনায় শেষ পর্যন্ত তার হাতে টাকা দেয়ার ব্যাপারটা মনে রইল না। সে গাড়িতে উঠল একেবারে খালি হাতে। আজ বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময়ও খালি হাতে বিদায় নেয়া ভালো। যেভাবে এসেছি—সেভাবে যাচ্ছি। না তাও ঠিক না। সে স্বামীর কাছে এভাবে আসে নি। তার দরিদ্র বাবা ধারদেনা করে অনেক গয়নাপাতি দিয়েছিলেন। এই নিয়ে বাড়িতে অনেক অশান্তিও হয়েছে। রীনার মা ঝাঁঝালো গলায় বলেছিলেন—এত যে ঋণ করলে শোধ দিবে কীভাবে? টাকার গাছ পুঁতেছ? রীনার বাবা হাসিমুখে বলেছিলেন, মেয়েটা ঝলমলে গয়না পরে স্বামীর কাছে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখাতেও অনেক আনন্দ। তোমার এই মেয়ে সুখের সাগরে ডুবে থাকবে।

সুখের সাগরে ডুবে থাকার এই হল নমুনা। নয় বছর স্বামীর সঙ্গে থেকে আজ সব ফেলে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে।

রীনা তার গলার হারটা সঙ্গে নিল। বাবার দেয়া গয়না একে একে বিক্রি করে সংসারের ক্ষুধা মেটাতে হয়েছে। হারটা রয়ে গেছে। হার বিক্রি করে নগদ কিছু টাকা হাতে নিতে হবে। মানুষের সবচে বড় বন্ধু অর্থ। স্বার্থহীন বন্ধু। যে মানুষের চারদিকে শক্ত দেয়াল হয়ে মানুষকে রক্ষা করে। রীনার সে রকম বন্ধু নেই। আশ্রয় দেবার মতো আত্মীয়স্বজনও নেই। সে যার কাছেই উঠবে সেই ব্যস্ত হয়ে উঠবে তাকে তাড়িয়ে দিতে। তাকে উঠতে হবে স্কুলজীবনের কোনো বান্ধবীর বাসায়। তারা তাকে তাড়িয়ে দেবে না। স্কুলজীবনের বন্ধুত্ব অন্যরকম ব্যাপার। এই বন্ধুত্ব সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। কখনো কমে না। রীনার সঙ্গে তার স্কুলজীবনের বন্ধুদের কোনো যোগ নেই। কে কোথায় আছে সে জানেও না। একজন থাকে বারিধারায়। সুস্মিত তার সঙ্গে নিউমার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল। সুস্মিতা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুস্মিতা বাড়ির নম্বর, টেলিফোন নম্বর সব একটা কাগজে লিখে দিয়েছিল কাগজটা অনেকদিন ছিল টেবিলের ড্রয়ারে। তারপর উড়ে চলে গেল। সুস্মিতার ঠিকানাটা জানা থাকলে কাজ হত

বিকালের মধ্যে রীনা সব গুছিয়ে ফেলল। বিকেলে বাচ্চারা খাবে তার জন্যে নুডলস রাতের জন্যে পোলাও। দুজনই খুব পোলাও পছন্দ করে। রোজ খেতে বসে বলবে, মা "পিলাউ"। টগর সব শব্দ উচ্চারণ করতে পারে শুধু পোলাও বলতে গিয়ে বলে পিলাউ। পোলাও থাকলে তার আর কিচ্ছু লাগবে না। তরকারি না হলেও চলবে। কপ কপ করে 'পিলাউ' খাবে। সেই খাওয়া দেখার ভেতরও আনন্দ আছে। আজ রীনা এই আনন্দ পাবে না। টগর 'পিলাউ' খাবে একা একা। না, একা একা নিশ্চয় খাবে না—লায়লা থাকবে।

রীনা এক শ টাকার একটা নোট এবং কিছু ভাংতি টাকা সঙ্গে নিল। যেখানেই যাক, রিকশা ভাড়া, বেবিট্যাক্সি ভাড়া তো দিতে হবে।

আলমিরা খুলে টগর এবং পলাশের জুতাজোড়া নিল। জন্মের এক মাস পর এলিফ্যান্ট রোডের এক দোকান থেকে রীনা নিজে এই দু জোড়া জুতা কিনেছিল। লাল ভেলভেটের জুতা। এখনো ঝলমল করছে। জুতাজোড়া কেনার সময় সে বিস্মিত হয়ে ভাবছিল—জন্মের সময় মানুষের পা এত ছোট থাকে? রীনার অনেক দিনের শখ টগর এবং পলাশের যেদিন বিয়ে হবে সেদিন কাচের বাক্সে জুতাজোড়া রেখে সেই বাক্সটা মায়ের বিয়ের উপহার হিসেবে সে দেবে।

প্রতীকী উপহার। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া—দেখ একদিন তুমি এ রকম ছোট ছিলে—আজ বড় হয়েছ। তোমার সংসারে এ রকম ছোট একটা শিশু আসবে। চক্র কোনোদিন ভাঙবে না চলতেই থাকবে।

এই জীবনে রীনার কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয় নি। কে জানে এই ইচ্ছাটাও হয়তো পূর্ণ হবে না। টগর-পলাশের বিয়ে হয়ে যাবে সে খবরও পাবে না। রীনার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যেন চোখের পানি চোখেই শুকিয়ে যায়। বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় চোখের পানি ফেলতে নেই। চোখের পানি বাড়ির জন্যে ভয়াবহ অমঙ্গল নিয়ে আসে। রীনা চায় না, এই বাড়ির অমঙ্গল হোক। এই বাড়িতে টগর এবং পলাশ থাকে। হাসান থাকে, লায়লা থাকে। তার শ্বশুর-শাশুড়ি থাকেন। এদের সবাইকে রীনা অসম্ভব পছন্দ করে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সবচে বেশি পছন্দ করে তার শাশুড়ি মনোয়ারাকে। কেন করে সে নিজেও জানে না।

সব গোছানোর পর রীনা মনোয়ারার ঘরে উঁকি দিল। যাবার আগে একটু দেখা করা। তাঁকে কিছু বলে যাওয়া যাবে না। সেটা সম্ভব না।

রীনা শাশুড়ির ঘরের দরজা ফাঁক করল। মনোয়ারা বললেন, বউমা তোমার শ্বশুর কোথায় জান?

'জানি না মা।'

'বারান্দায় গিয়ে উঁকি দাও—তোমার শ্বশুরকে দেখবে রাস্তার ওই পাশে যে চায়ের স্টল আছে, বিসমিল্লাহ টি-স্টল, ওইখানে বসে আছে।'

'খবর দিয়ে আনব মা?'

'না খবর দিয়ে আনতে হবে না। কয়েকদিন ধরেই আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করছি। বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। ঠিক এই সময় বুড়ো চায়ের স্টলে বসে থাকে কেন জানতে চাও?'

'কেন?'

'মেয়েস্কুল ছুটি হয়। মেয়েগুলো শরীর দোলাতে দোলাতে রাস্তা দিয়ে যায়। আর আমাদের বুড়ো এই দৃশ্য চোখ দিয়ে চাটে। বুঝলে কিছু?'

রীনা চুপ করে রইল।

'একটা বয়সের পর পুরুষমানুষের এই রোগ হয়। চোখ দিয়ে চাটার রোগ। খুবই ভয়ংকর রোগ। আল্লাহপাক এই বিষয়টা জানেন বলেই এই বয়সে চোখে ছানি ফেলে দেন। আমাদের বুড়োর চোখ পরিষ্কার, ছানি পড়ে নি। তার খুব সুবিধা হয়েছে। রোজ বিকেলে চা খেতে যাচ্ছে। জীবনে তাকে চা খেতে দেখলাম না, এখন চা খাওয়ার ধুম পড়েছে। ভেবেছে আমি কিছু টের পাই নি। কোনো ভরা বয়সের মেয়ে ঘরে এলে বুড়ো কী করে লক্ষ্য করেছ? তার মা ডাকার ধুম পড়ে যায়। মা মা বলে আদরের ঘটা। মা ডাকলে মাথায়, পিঠে, পাছায় হাত বোলানোর সুযোগ হয়ে যায়—। সুযোগ আমি বার করছি। আজ বাসায় ফিরুক। সাপের পা তো কেউ দেখে নাই। তোমার শ্বশুর আজ সাপের পা দেখবে, শিয়ালের শিং দেখবে।'

'মা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।'

'একা যাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'একা যাবার দরকার নেই, বুড়ো শয়তানকে সাথে নিয়ে যাও। বুড়ো একদিনে অনেক মেয়ে দেখে ফেলেছে আর না দেখলেও চলবে। যাচ্ছ কোথায়?'

'আমার এক বান্ধবীর বাসায়।'

'শয়তানটাকে সাথে নিয়ে যাও। তুমি বন্ধুর বাসায় যেও। শয়তানটাকে রিকশায় বসিয়ে রাখবে। সে রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করবে। এটাই তার শাস্তি। আর শোন মা তুমি দেরি করবে না। সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরবে। বাড়ির বউ সন্ধ্যার পর বাইরে থাকলে সংসারের অমঙ্গল হয়। বাড়ির বউকে দুটা সময়ে অবশ্যই ঘরে থাকতে হয়। সূর্য ওঠার সময় এবং সূর্য ডোবার

সময়। এই কথাগুলো মনে রাখবা মা। তোমার ছেলে দুটাকে যখন বিয়ে দিবে তখন তাদের বউদেরও বলবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রীনা শাশুড়ির ঘর থেকে বেরোল। টগর-পলাশ বারান্দার দেয়ালে মহানন্দে রং পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকছে। দেয়ালে ছবি আঁকা নিষিদ্ধ কর্ম। এই নিষিদ্ধ কর্মের জন্যে দু ভাই অতীতে অনেক শাস্তি পেয়েছে। আজ পেল না। রীনা তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। দু ভাই মাথা নিচু করে বসে আছে। ভয়ে কেউ মাথা তুলছে না। রীনার খুব শখ ছিল যাবার আগে ছেলে দুটির মুখ ভালোমতো দেখে যায়। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মাকে দেখে এরা দুজন মাথা আরো নিচু করে ফেলল। দেয়ালে দু মাথাওয়ালা একটা ভূত আঁকা হয়েছে। রীনা ভূতের দিকে তাকিয়ে আছে। রীনা নরম গলায় ডাকল টগর। টগর মার গলায় বিপদের আভাস পেয়েছে সে ছুটে দাদিমার ঘরে ঢুকে গেল, মুহূর্তের মধ্যেই তাকে অনুসরণ করল পলাশ। মার হাত থেকে মুক্তির এই একটিই উপায়।

'ভাবী শোন।'

বারান্দায় লায়লা দাঁড়িয়ে আছে। তার গলার স্বর ভারি। মনে হয় সে এতক্ষণ কাঁদছিল। চোখে কাজল লেপ্টে আছে।

'কী ব্যাপার লায়লা?'

'তুমি একটু আমার ঘরে আস তো ভাবী।'

রীনা লায়লার ঘরে ঢুকতেই লায়লা দরজা বন্ধ করে দিল। রীনা বলল, ব্যাপার কী বল তো?

লায়লা কান্না চাপতে চাপতে বলল, ভাবী তুমি বল আমি কি এতই ফেলনা? আমি কি বানের জলে ভেসে এসেছি?

'ব্যাপারটা কী?'

'আমি জানি আমার চেহারা ভালো না। রং ময়লা—তাই বলে আমার জন্যে ডিভোর্সড ছেলে খুঁজতে হবে?'

'কে খুঁজছে ডিভোর্সড ছেলে?'

'বড়বুবু একটা ছেলের সন্ধান এনেছেন। ডিভোর্সড। আগের ঘরের একটা ছেলে আছে তিন বছর বয়স। আমার চেহারা খারাপ বলে আমার ভাগ্যে বুঝি সেকেন্ডহ্যান্ড হাসবেন্ড।'

'বিয়ে তো এখনো হয়ে যায় নি লায়লা।'

'না হোক বড়বুবু কেন সেকেন্ডহ্যান্ড হাসবেন্ডের খোঁজ আনবে। ভাবী তুমি তো জান সেকেন্ডহ্যান্ড জিনিসই আমি দু চোখে দেখতে পারি না। নিউমার্কেটে কত সুন্দর সুন্দর সেকেন্ডহ্যান্ড স্যুয়েটার পাওয়া যায়। আমার বন্ধুরা সবাই কিনেছে। আমি কখনো কিনেছি?'

'লায়লা চুপ কর তো!'

'কেন আমি চুপ করব? ভাবী আমি কি মানুষ! আমাকে আগেভাগে কিছু না বলে মেয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। আমিও হাসিমুখে সেকেন্ডহ্যান্ডটার সাথে কথা বলেছি। গাধাটা আবার যাবার সময় বড়বুবুকে বলেছে মেয়ে পছন্দ হয়েছে। আরে গাধা তোর তো যে কোনো মেয়েই পছন্দ হবে।'

'লায়লা শোন এখানে তোমার পছন্দটাই জরুরি। তুমি তোমার পছন্দ-অপছন্দটা কড়া করে বলবে। তুমি যে জীবন যাপন করবে সেটা তো তোমার জীবন। অন্যের জীবন তো না।'

লায়লাকে শান্ত করে রীনা বের হয়ে এল। ভাগ্য ভালো সুটকেস হাতে বেরোতে তাকে কেউ দেখল না।

রীনা রিকশায় উঠেছে। ঢাকায় তার থাকতে ইচ্ছে করছে না। ঢাকার বাইরে কোথাও চলে যেতে হবে। ময়মনসিংহ চলে গেলে কেমন হয়। রীনার বড়মামা ময়মনসিংহ জজকোর্টের পেশকার। কেউটখালিতে বাসা। বাসে ময়মনসিংহ যেতে আড়াই ঘণ্টার মতো লাগে। সে

পৌঁছবে সন্ধ্যার পরপর। তখন কেউটখালিতে গিয়ে বড়মামাকে খুঁজে বের করতে হবে। বাসার ঠিকানা রীনার জানা নেই। যদি খুঁজে না পাওয়া যায়। যদি মামা এর মধ্যে বাসা বদল করে থাকেন? দুশ্চিন্তা হচ্ছে। রীনা দুশ্চিন্তাকে আমল দিল না। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিমঝিম করছে। মুখ শুকিয়ে পানির পিপাসা হচ্ছে। কোনো একটা দোকানের সামনে রিকশা দাঁড় করিয়ে সে কি এক বোতল পানি কিনে নেবে? কত দাম এক বোতল পানির?

রিকশাওয়ালা বলল, কই যাবেন?

রীনা বলল, কমলাপুর রেলস্টেশন।

বলেই মনে হল সে ভুল করেছে। সে যাবে মহাখালি বাসস্টেশন। মহাখালি বাসস্টেশন থেকেই ময়মনসিংহের বাস ছাড়ে। শুধু শুধু কমলাপুর রেলস্টেশন বলল কেন? ভুলটাকে ঠিক করতে ইচ্ছা করছে না। যাক কমলাপুরেই যাক। ময়মনসিংহ যাবার কোনো একটা ট্রেন নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর পাওয়া না গেলে একটা রাত রেলস্টেশনে কাটিয়ে দেয়া তেমন কঠিন হবে না। স্টেশনে সারা রাত গাড়ি আসা-যাওয়া করবে। অসুবিধা কী? জনতার মধ্যেই আছে নির্জনতা।

২০

যে চেয়ারটায় হিশামুদ্দিন বসতেন সেই চেয়ারে চিত্রলেখা বসে আছে। প্রথম দিন অস্বস্তি লেগেছিল—এরপর আর লাগে নি। এমন ব্যস্ততায় তার দিন কাটছে যে অস্বস্তি লাগার সময়ও ছিল না। ব্যস্ত মানুষদের অস্বস্তি বোধ করার সময় থাকে না। চিত্রলেখার দিন কাটছে বাবার কর্মপদ্ধতির মূল সূত্রগুলো ধরতে। তাকে কেউ সাহায্য করছে না। যাদের সাহায্য করার কথা তারা এক ধরনের নীরব অসহযোগিতা করছেন। অফিসের প্রধান প্রধান কর্তাব্যক্তিরা এগিয়ে আসছেন না। তাদের প্রশ্ন করেও তেমন কিছু জানা যাচ্ছে না। এ রকম কেন হচ্ছে চিত্রলেখা বুঝতে পারছে না। তারা কি চান না সব আগের মতো চলুক?

চিত্রলেখার সামনে তিন কর্মকর্তা বসে আছেন, জিএম আবেদ আলি, এজিএম ফতেহ খান এবং প্রোডাকশান ম্যানেজার নূরুল আবসার। তাদের চা দেয়া হয়েছে। তারা বিমর্ষমুখে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। আবেদ আলি পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। চিত্রলেখা বলল, আপনি সিগারেট ধরাবেন না। সিগারেটের ধোঁয়া আমার পছন্দ না। বন্ধঘরে ধোঁয়া যেতে চায় না। অসহ্য লাগে।

আবেদ আলি সিগারেটের প্যাকেট সরিয়ে রাখলেন। তার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেল।

চিত্রলেখা বলল, আমি যদি কারোর চাকরি টার্মিনেট করতে চাই আমাকে কী করতে হবে বলুন তো?

আবেদ আলি কিছু বললেন না, ফতেহ খান বললেন, আপনি যা করবেন কোম্পানি আইন মোতাবেক করবেন। কোম্পানি আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা মালিকদের দেয়া হয় নি। মালিক চেয়েছেন বলে চাকরি নেই এই ব্যবস্থা এখন নেই।

'প্রাইভেট কোম্পানিতে কোনো একটা ব্যবস্থা তো থাকতেই হবে। সেই ব্যবস্থাটা জানতে চাচ্ছি।'

ফতেহ খান বললেন, আপনাকে ল'ইয়ারের পরামর্শ নিতে হবে। কোম্পানির নিজস্ব ল'ইয়ার আছে তাঁর কাছে জেনে নিন।'

'আপনারা কিছু জানাবেন না?'

'আমরা তেমন জানি না।'

'আপনি জানেন না সেটা বলুন। আমরা বলছেন কেন? আবেদ আলি সাহেব হয়তো জানেন, নূরুল আবসার সাহেবও হয়তো জানেন। অন্যদের দায়িত্ব নেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

নূরুল আবসার বললেন, মিস চিত্রলেখা আপনাকে একটা কথা বলি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না, আপনি একসঙ্গে সবকিছু বুঝে ফেলতে চেষ্টা করছেন। আমাদের এই কোম্পানি অনেক বড় কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত তারা দীর্ঘদিন থেকে জড়িত। বছরের পর বছর কাজ করে আমরা যা শিখেছি আপনি এক সপ্তাহে তা শিখে ফেলতে চান, তা কী করে হবে! ধীরে চলার একটা নীতি আছে সেই নীতি মেনে চলাই ভালো।

'আমাকে ধীরে চলতে বলছেন?'

'অবশ্যই ধীরে চলতে বলছি।'

'আপনাদের ধারণা আমি ধীরে চলছি না?'

'আমাদের ধারণা আপনি একসঙ্গে সব জেনে ফেলার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন। ছটফট করছেন।'

'আপনিও বললেন—আমাদের ধারণা। আপনি বলুন আমার ধারণা। নাকি আপনাদের তিন জনের ধ্যান-ধারণা সব এক রকম।'

'আমরা সব একজিকিউটিভ ডিসিশান মেকিঙে থাকি। আমাদের ধ্যান-ধারণা এক রকম হওয়ারই তো কথা।'

'গত মাসে কোম্পানি প্রায় এক কোটি টাকা লোকসান করেছে। কেন করেছে আবেদ আলি সাহেব আপনি বলুন?'

'এক কোটি টাকা না—সত্তর হাজার পাউন্ড। একটা বিশেষ খাতে লোকসান হয়েছে। সেই লোকসান আমরা সামলে উঠব। ব্যবসায়ে লাভ-লোকসান থাকে। বিজনেস হচ্ছে এক ধরনের গ্যামলিং।'

'লাভ-লোকসান ব্যবসায় থাকবে তাই বলে ব্যবসা গ্যামলিং হবে কেন? আমরা তো জুয়া খেলতে বসি নি।'

আবেদ আলি ভুরু কুঁচকালেন। মনে মনে বললেন—ভালো যন্ত্রণায় পড়া গেল। চিত্রলেখা বলল, আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি—এত বড় একটা লোকসান হল কেন?

'যথাসময়ে এলসি খোলা হয় নি। তারপর আমাদের কিছু ত্রুটি ছিল যার জন্যে পেনাল্টি দিতে হয়েছে।'

'কী ত্রুটি?'

'ম্যাডাম বিষয়টা তো জটিল—চট করে বোঝাতে পারব না। সময় লাগবে।'

'সময় আপনাকে দিচ্ছি—আপনি বোঝাতে শুরু করুন। কাগজ-কলম লাগবে?'

আবেদ আলি বললেন, মিস চিত্রলেখা, বসের কন্যাকে প্রাইভেট পড়ানো আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না। তারপরেও আমি আপনাকে বোঝাব। তবে এখন না। এখন আমাকে যেতে হবে। আমার জন্যে লোকজন অপেক্ষা করছে। আপনাকে আরো একটা কথা বলি মিস চিত্রলেখা, যখন-তখন আপনি মিটিং ডাকবেন না। এতে সবারই কাজের ক্ষতি হয়। মিটিং যখন ডাকবেন—এজেন্ডা ঠিক করে ডাকবেন। এজেন্ডা জানা থাকলে আমাদেরও তৈরি হয়ে আসতে সুবিধা হয়।

আবেদ আলি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অনুমতির অপেক্ষা করলেন না। শুধু ফতেহ খান বললেন, ম্যাডাম তাহলে যাই? চিত্রলেখা বলল, আচ্ছা যান। তাকে সূক্ষ্মভাবে অপমান করা হল তবে সে অপমান গায়ে মাখল না। সে বাবার চেয়ারে কিশোরী মেয়েদের মতো খানিকক্ষণ দোল খেল। তারপরই চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলল।

কিছু মজার মজার ফাইল এই ড্রয়ারে আছে। ফাইলগুলো বাড়িতে ছিল সে নিয়ে এসেছে। প্রতিদিনই সে খুব মন দিয়ে পড়ে। হিশামুদ্দিন সাহেব তার অফিসের প্রতিটি কর্মচারী সম্পর্কে আলাদা আলাদা নোট রেখে গেছেন। পড়তে পড়তে চিত্রলেখার প্রায়ই মনে হয়—বাবা যেন জানতেন একদিন চিত্রলেখা এই ফাইল পড়বে। পড়ে পড়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

ফাইল তৈরি করা ছাড়াও হিশামুদ্দিন সাহেব আরো একটা কাজ করে গেছেন। কোম্পানি পরিচালনা সম্পর্কে দীর্ঘ নির্দেশ দিয়ে গেছেন। চিঠির মতো করে লেখা এই নির্দেশনামা চিত্রলেখা বলতে গেলে প্রতিদিনই একবার করে পড়ছে।

মা চিত্রলেখা,

তোমার মাথায় বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। তোমার কি মনে হচ্ছে তোমার মাথায় তিন মন ওজনের পাথর চেপে বসেছে? তুমি নিশ্বাস নিতে পারছ না?

যদি এ রকম মনে হয় তুমি পাথর ছুড়ে ফেলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে। আমি একটি কর্মকাণ্ড শুরু করেছি আমার মৃত্যুর পরেও তা চলতে থাকবে এ জাতীয় চিন্তাভাবনা আমার কোনো কালেই ছিল না। এই পৃথিবীতে সবকিছুই সাময়িক।

অবশ্য পুরো ব্যাপারটা তুমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে দেখতে পার। আমার ধারণা তোমার সেই যোগ্যতা আছে। যদি তুমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নাও তাহলে তোমাকে আমার কিছু উপদেশ দেবার ইচ্ছা।

পুরোনো কালে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধবিগ্রহ চলত। দু দল যুদ্ধ করছে। সেনাপতিরা যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। এই সময় হঠাৎ যদি কোনো কারণে কোনো একদলের সেনাপতি নিহত হন তখন সেই দল সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়। সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলে অস্ত্র ফেলে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে। এই ব্যাপারটা এখনো আছে। এখনো সেনাপতির মৃত্যু মানে যুদ্ধে পরাজয়। সৈন্যরা এখনো যুদ্ধ করে তাদের নিজেদের জন্যে না—যুদ্ধ করে তাদের সেনাপতির জন্যে।

সেনাপতিকে সৈন্যদের আস্থা অর্জন করতে হবে। এই কাজটা সবচে কঠিন। তুমি তা পারবে। ভালোভাবেই পারবে।

কোম্পানি পরিচালনা শুরুতে তোমার কাছে জটিল মনে হবে—কাজটা কিন্তু জটিল নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়া এবং ঘোড়াটাকে দৌড়ানো শুরু করাটা জটিল, কিন্তু একবার যখন ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করে তখন জটিলতা কিছু থাকে না। শুধু দেখতে হয়—পথ ঠিক আছে কি না। পথে কোনো খানা-খন্দ পড়ল কি না। অবশ্য আরেকটা জিনিস দেখতে হয় তোমার শেষ সীমাটা কোথায়? গোলটা কী?

তুমি অবশ্যই কোমল হবে। সেই কোমলতার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের নির্মমতাও তোমার মধ্যে থাকতে হবে। যেখানে নির্মম হওয়া দরকার সেখানে কখনো কোমল হবার চেষ্টা করবে না। দয়া, করুণা এইসব মানবিক গুণাবলি কোম্পানি পরিচালনার কাজে আসে না বরং কাজ শ্লথ করে দেয়। মনে কর কেউ একটা অন্যায় করল, কিংবা কারো কোনো কাজে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হল। তুমি যদি তার শাস্তি না দাও তাহলে এই অন্যায়টি সে আবারো করবে। সে ধরে নেবে যে সে ক্ষমা পেয়ে যাবে। শুধু সে না অন্যরাও তাই ভাববে। You have to be cruel, only to be kind. কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে তেমনি অন্যায়ের শাস্তিও থাকবে।

ক্ষমা অত্যন্ত মহৎ গুণ। কোম্পানি পরিচালনায় ক্ষমা একটা বড় ত্রুটি।

কোম্পানির কার্যপ্রণালীর প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমাকে জানতে হবে। উদাহরণ দিয়ে বলি—কোম্পানির অতি তুচ্ছ কাজ যে কজন করে তাদের একজন হল রশীদ। রশীদ হল সাইকেল পিয়ন। তার একটা সাইকেল আছে। হাতে হাতে চিঠি পাঠাতে হলে চিঠি এবং ঠিকানা দিয়ে রশীদকে বললেই সে চলে যাবে। তুমি কি জান রশীদ তার এই কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে করে? তাকে তুমি ঠিকানা লিখে চিঠি দেবে এবং তা সে পৌঁছাবে না এটা কখনো হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার কী হয়েছে শোন—সে একটা চিঠি নিয়ে গেল। যার চিঠি সে বাসায় ছিল না। রশীদ বাসার সামনে রাত তিনটা পর্যন্ত বসে রইল। কোম্পানি ঠিকমতো তখনই চলবে যখন যার যা কাজ তা ঠিকমতো করা হবে।

তোমাকে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর একটি অপ্রিয় কাজ করতে হবে—কাজটা হচ্ছে জেনারেল ম্যানেজার পদে নতুন কাউকে আনা। অবশ্যই তোমাকে আবেদ আলিকে অপসারণ করতে হবে। কাজটা আমিই করে যেতাম। তোমার জন্যে রেখে গেলাম। আবেদ আলি অত্যন্ত কর্মঠ। সে নিজের কাজ খুব ভালো জানে। তার সমস্যা হল সে নিজেকে এখন অপরিহার্য বিবেচনা করছে। যখন এই কাজটা কেউ করে তখন নানান সমস্যা হতে থাকে। সে নিজের স্বার্থটাকে প্রাধান্য দেয়। কাজকর্মেও হেলাফেলা ভাব চলে আসে। সে তার প্রতি অনুগত একটা শ্রেণীও তৈরি করে নেয়। আবেদ আলি তাই করেছে।

আবেদ আলির চাকরির টার্মিনেশন লেটার আমি তৈরি করে রেখেছি। আইনগত কিছু জটিলতা আছে বলেই তৈরি করে যাওয়া। তুমি যদি কোম্পানির দায়িত্ব নাও তাহলে এই টার্মিনেশন লেটার সই করে তুমি তাকে দেবে। আর তুমি যদি দায়িত্ব না নাও তাহলে যেমন আছে তেমনি থাকবে। তোমার অনুপস্থিতিতে তার প্রয়োজন আছে।....

চিত্রলেখা আবেদ আলির চাকরির টার্মিনেশন লেটারে নিজের নাম সই করল। তারিখ বসাল। ইন্টারকমে বলে দিল—সাইকেল পিয়ন রশীদকে যেন পাঠানো হয়।

রশীদ এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। বেঁটেখাটো মানুষ। মালিক শ্রেণীর কারো দিকে চোখ তুলে তাকানোর বোধহয় তার অভ্যাস নেই। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

'কেমন আছ রশীদ?'

'ভালো।'

'এই ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়ে এসো।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার সাইকেলটি ঠিক আছে?'

'বেল নষ্ট।'

'বেল ঠিক করার ব্যবস্থা কর।'

'কেয়ারটেকার স্যারকে বলেছিলাম।'

'উনি ব্যবস্থা করেন নি?'

রশীদ চুপ করে রইল। সে কখনো তার উপরওয়ালাদের বিষয়ে কোনো নালিশ করে না।

'আচ্ছা আমি বলে দেব।'

'আমি চলে যাব? চিঠি দিয়ে এসে আপনাকে রিপোর্ট করব?'

'দরকার নেই। তুমি যাও।'

চিত্রলেখা কেয়ারটেকারকে ডেকে পাঠাল। কেয়ারটেকারের নাম সালাম। সে ভীতমুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

'কেমন আছেন সালাম সাহেব?'

'জ্বি আপা ভালো। কাজকর্মে মন বসছে না আপা।'

'মন বসছে না কেন?'

'স্যার নাই। কী কাজ করব কার জন্য করব?'

'আমার জন্যে করবেন।'

'তা তো অবশ্যই।'

'আমাদের যে সাইকেল পিয়ন রশীদ তার সাইকেলের বেল নষ্ট। বেল ঠিক হচ্ছে না কেন?'

'আমাকে তো আপা সে কিছু বলে নাই।'

'সে বলেছে। যেহেতু আপনার কাজকর্মে মন নাই আপনি শুনতে পান নি। বাবার মৃত্যুতে আপনি এতই ব্যথিত যে, কোনো কিছুই আপনি এখন মন দিয়ে শুনছেন না। আচ্ছা আপনি যান—আমাদের জিএম সাহেবকে একটু আসতে বলে দিন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

চিত্রলেখা ঘড়ি দেখল। তিনটা বাজে। অফিস আরো এক ঘণ্টা চলবে। সে অফিস থেকে ঠিক চারটায় বের হবে। আজ তার পরিকল্পনা হল রাস্তায় খানিকক্ষণ হাঁটা।

আবেদ আলি বিরক্তমুখে ঢুকলেন।

'আমাকে ডেকেছেন?'

চিত্রলেখা বলল, আবেদ আলি সাহেব বসুন।

'মিটিঙের মাঝখান থেকে উঠে এসেছি।'

'কিসের মিটিং?'

'এলসি খোলার দেরি এবং ইরেগুলারিটি বিষয়ে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করছি।'

'ও আচ্ছা।'

'কী জন্যে ডেকেছিলেন?'

'একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গের জন্যে ডেকেছি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন, তারপর বলছি।'

আবেদ আলি বসলেন। তার ভুরু কুঞ্চিত। চিত্রলেখা খুব সহজ এবং স্বাভাবিক গলায় বলল, কোম্পানির বৃহত্তর স্বার্থে আমাকে একটি অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে। আপনার সার্ভিস আমাদের আর প্রয়োজন নেই। আমাদের কাছে মনে হচ্ছে—কোম্পানির স্বার্থ আপনি এখন আর আগের মতো দেখছেন না। সত্তর হাজার পাউন্ডের যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে—তার দায়-দায়িত্বও সম্পূর্ণ আপনার।

'কী বলছেন?'

'যা সত্যি তা বলছি।'

'আমাকে ছাড়া আপনি তো সাত দিনও চলতে পারবেন না। আপনি তো সামান্য মানুষ আপনার বাবারও আমি ডানহাত ছিলাম।'

'আমার বাবা যেহেতু নেই; আমার বাবার ডানহাতেরও প্রয়োজন নেই তাই না? নিন এইটা হচ্ছে আপনার জব টার্মিনেশন লেটার। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কী জানেন, এই চিঠি বাবাই লিখে টাইপ করে রেখে গেছেন। আমি শুধু নাম সই করেছি। কিছু কিছু মানুষ মৃত্যুর পরেও তাদের উপস্থিতির ব্যবস্থা রেখে যায়।'

আবেদ আলি চিঠি পড়ছেন। তার হাত কাঁপছে। ব্যাপারটা তার কাছে খুবই অপ্রত্যাশিত।

'আবেদ আলি সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনার দায়িত্ব আপনি এজিএম সাহবেকে বুঝিয়ে দেবেন।'

'ম্যাডাম ব্যাপারটা কি আরেকবার কনসিডার করা যায় না?'

'জ্বি না, যায় না। পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। আপনি এখন আসুন।'

'আপনি বিরাট সমস্যায় পড়বেন। হাতেপায়ে ধরে আবার আমাকেই আপনার আনতে হবে।'

'আনতে হলে আনব। এই মুহূর্তে আপনাকে আমাদের দরকার নেই।'

চিত্রলেখা আরেক কাপ চায়ের কথা বলল। অফিসে বসার পর থেকে তার খুব ঘন ঘন চা খাওয়া হচ্ছে। অভ্যাসটা কমাতে হবে। মাথা ধরেছে। মাথাধরা কমানোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ওষুধ খেতে ইচ্ছা করছে না। খোলা বাতাসে বসা দরকার। এসি দেয়া বদ্ধঘরে এক সময় দম আটকে আসে। চিত্রলেখা এসি বন্ধ করল। জানালার পরদা সরাল। জানালা খুলল। দিনের আলো নিভে আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেঘ বলেছে যাব যাব? মেঘেরা কোথায়

যেতে চায়? হিমালয়ের দিকে না অন্য কোথাও? মানুষের পাখা থাকলে ভালো হত। মেঘদের সঙ্গে উড়ে বেড়াত। মেঘেদের সঙ্গে বাস করলেই জানা যাবে মেঘেরা কোথায় যেতে চায়।

'আসব?'

চিত্রলেখা জানালা থেকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, আসুন। রশীদ তাহলে আপনাকে খুঁজে পেয়েছে। বসুন।

হাসান বসল।

সে হিশামুদ্দিন সাহেবের এই বিশাল অফিসে এই প্রথম এসেছে। তার চোখে বিস্ময়।

'চা খাবেন?'

'জ্বি না।'

'খেয়ে দেখতে পারেন। এরা চা খুব ভালো বানায়। দার্জিলিঙের চা পাতা এবং বাংলাদেশের চা পাতা সমান সমান নিয়ে একটা মিকচার তৈরি হয়। সেই মিকচার দিয়ে চা বানানো হয়।'

'তাহলে দিতে বলুন।'

'আপনাকে ডেকেছি কী জন্যে জানেন?'

'জ্বি না।'

'আপনাকে ডেকেছি কারণ আজ বিকেলে আপনাকে নিয়ে ঘুরব। গাড়িতে করে না— হণ্টন।'

'বৃষ্টি আসছে তো!'

'আসুক। আমার একটা রেইনকোট আছে—আপনার জন্যে ছাতা আনিয়ে দিচ্ছি। বৃষ্টির সময় রেইনকোট পরে হাঁটা আমার খুব পুরোনো অভ্যাস। নোট করছেন তো?'

হাসান বিস্মিত হয়ে বলল, কী নোট করব?

'কথাবার্তা যা বলছি এইসব—এই যে একটু আগে বললাম, আমার পুরোনো অভ্যাস হচ্ছে বৃষ্টিতে রেইনকোট পরে হাঁটা। আমি তো আগে একবার আপনাকে বলেছি—বাবার মতো আমিও আপনাকে ঘণ্টা হিসেবে পে করব। কাজেই আপনি যত বেশি সময় আমার সঙ্গে কাটাবেন ততই আপনার লাভ।'

হাসান তাকিয়ে আছে। চিত্রলেখাকে কেমন যেন অস্থির লাগছে।

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'অকারণে আপনাকে ডেকে আনায় আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?'

'জ্বি না।'

'বিরক্ত হলেও কিচ্ছু করার নেই। আমি মাঝে মাঝে খুব নিঃসঙ্গ বোধ করি। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে মরে যাব।'

'আপনার এ রকম অবস্থা যখনই হবে খবর দেবেন—আমি চলে আসব।'

'বৃষ্টি মনে হয় আসছে—তাই না?'

'জ্বি।'

চিত্রলেখা মুগ্ধ হয়ে বৃষ্টি দেখছে।

২১

তারেক মাগরেবের নামায শেষ করে বারান্দায় এসে বলল, লায়লা আমাকে চা দে।

চা তৈরিই ছিল। লায়লা চায়ের কাপ এনে সামনে রাখল। তারেক চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, তোর অবস্থা কী?

লায়লা বিস্মিত গলায় বলল, আমার আবার কী অবস্থা?

'পড়াশোনার অবস্থা।'

'পড়াশোনার অবস্থা খুবই খারাপ। এইবার পরীক্ষা দিলে পাস করতে পারব না।'

'তাহলে এ বছর ড্রপ দিয়ে পরের বছর দে।'

'ভাইয়া আর কিছু বলবে?'

'না। সিগারেটের প্যাকেট আর দেয়াশলাই এনে দে।'

লায়লা সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই এনে দিল। তারেক বলল, টগর আর পলাশকে বই নিয়ে বসতে বল। আমি পড়া দেখিয়ে দেব।

তারেক চুকচুক করে চায়ে চুমুক দিচ্ছে। নামাযের সময় সে মাথায় টুপি পরেছিল, সেই টুপি এখনো খোলা হয় নি। টুপি মাথায় তাকে শান্ত সমাহিত মনে হচ্ছে। চা খেতে খেতে সে পা নাচাচ্ছে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যাকালীন এই চায়ের আসর তার ভালো লাগছে।

এক মাসের ওপর হল রীনা নেই। তার অনুপস্থিতিতে বড় ধরনের যে সমস্যার আশঙ্কা করা গিয়েছিল এখন মনে হচ্ছে সে আশঙ্কা অমূলক। সে না থাকায় বরং কিছু সুবিধা হয়েছে। তারেক ঘুমাচ্ছে একা। বেশ হাতপা ছড়িয়ে ঘুমাতে পারছে। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে পারছে। কথা বলার কেউ নেই। টুথপেস্টের মুখ লাগানো হয় নি, ব্রাশটা বেসিনে পড়ে আছে কেন এই নিয়েও বলার কেউ নেই। রীনা মশারি না খাটিয়ে ঘুমাতে পারত না। তারেকের কাছে মশারি ছিল অসহনীয় যন্ত্রণা। এখন মশারি খাটাতে হচ্ছে না। ফুলস্পিডে ফ্যান ছেড়ে শুয়ে থাকলে মশারা কাছে ভিড়তে পারে না। মানুষের কাছে ফ্যানের বাতাসটা আরামদায়ক। মশাদের কাছে সেই বাতাস হল টর্নেডো। প্রচণ্ড টর্নেডোর সময় মানুষ যেমন ডিনার খেতে বসে না, মশারাও তেমনি রক্ত খেতে আসে না। এই সহজ সত্য সে রীনাকে বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছে—রীনা বুঝতে চায় নি। এখন আর বোঝাবুঝির কিছু নেই।

মনোয়ারা ছেলের ওপর রাগ করে চলে গেছেন। এটা একটা দুঃখের ব্যাপার হয়েছে। তারেক তার মাকে খুবই পছন্দ করে। মার সঙ্গে মাঝেমধ্যে কথা না বললে তার দমবন্ধ লাগে। মা না থাকার একটা ভালো দিকও আছে। মার ঘরটাকে তারেক বর্তমানে নামাযঘর করে ফেলেছে। পাঁচ ওয়াক্তের জায়গায় এখন শুধু দু ওয়াক্ত করে নামায পড়া হচ্ছে। শুরু হিসেবে এটা খারাপ না।

রীনার অভাব লায়লা অনেকটাই পূরণ করেছে। রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখছে। টগর-পলাশকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসার কাজও করছে। কলেজে যাচ্ছে খুব কম। মনে হয় এ বছর বি.এ. পরীক্ষা সে ড্রপই করবে। সংসারের জন্যে এটা ভালো। বি.এ. পরীক্ষার চেয়ে সংসার অনেক বড়।

টগর-পলাশের ব্যাপারটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। 'মা নেই কেন? কবে আসবে?' এ জাতীয় কথা তারা তারেককে এখনো জিজ্ঞেস করে নি। তবে লায়লাকে এবং হাসানকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছে। তারা কী জবাব দিচ্ছে কে জানে। সময় এবং সুযোগমতো একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। অবশ্যি জিজ্ঞেস না করলেও হয়। এরা ঝামেলা করছে না এটাই বড় কথা। এমন কি হতে পারে মা ঘরে না থাকায় তারা আনন্দিত? হতে পারে। খাওয়া নিয়ে তাদের বকাঝকা কেউ করছে না, চড় থাপ্পড় মারছে না। দেয়ালে ছবি আঁকছে কেউ কিছু বলছে না। প্রায়ই স্কুল কামাই করছে। মা থাকলে সে উপায় ছিল না। স্কুলে যেতেই হত।

তারেকের আজকাল প্রায়ই মনে হয় মানুষের সংসার না থাকাই ভালো। আর থাকলেও সে সংসার হবে সাময়িক ধরনের সংসার। সেই সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা সবই থাকবে। মাঝে মাঝে সেখানে বেড়াতে যাওয়া, কয়েকদিন থেকে চলে আসা। সব পুরুষরা থাকবে হোটেলে। সবার জন্যে আলাদা আলাদা ঘর। ঘরে এটাচড বাথ থাকবে, টিভি থাকবে। খাবারের সময় হোটেল থেকে খাবার দিয়ে যাবে। ছেলের জন্মদিন, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি এইসব উৎসবে সংসারে ফিরে যাওয়া। আবার ফিরে আসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রীনা চলে যাবার পর লাবণীর সঙ্গে তারেকের আর তেমন যোগাযোগ হয় নি। লাবণী একটা চিঠি লিখেছিল। কেমন আছেন, ভালো আছেন টাইপ চিঠি। চিঠির জবাব দেয়া হয় নি। তারেক রোজই একবার ভাবে চিঠির জবাব দেবে—শেষে আর দেয়া হয় না। রাতে ঘুম পেয়ে যায়। ইদানীং তার ঘুমও খুব বেড়েছে। ভাত খাবার পর থেকে হাই উঠতে থাকে।

দুই পুত্রকে নিয়ে তারেক পড়াতে বসল। বাচ্চা দুটি বিচ্ছু হয়েছে। যমজ বাচ্চারা বিচ্ছু ধরনের হয় এটি সনাতন সিদ্ধ ব্যাপার। এরা দুজন যমজ না হলেও বিচ্ছুর ওপরেও এক ডিগ্রি বিচ্ছু। হোমওয়ার্কের খাতায় ভূতের ছবি আঁকা। মাথা থেকে এইসব দুষ্টামি দূর করতে হবে। কঠিন হওয়া যাবে না। কাঠিন্য যে কোনো সমস্যার বড় বাধা।

'কেমন আছিস রে টগর?'

'গুড আছি বাবা।'

'পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?'

'গুড হচ্ছে।'

'কথায় কথায় গুড বলছিস কেন?'

'মিস বলেছে বাসায় সব সময় ইংরেজি বলতে হবে।'

'হোমওয়ার্কের খাতায় এটা কিসের ছবি?'

'ভূতের ছবি।'

'ভূতের গলা এত লম্বা থাকে নাকি?'

'এটা সাপভূত তো এইজন্যে গলা লম্বা। সাপভূতদের গলা লম্বা হয়।'

'হোমওয়ার্কের খাতায় ছবি আঁকছিস কেন?'

'ছবি আঁকার খাতা শেষ হয়ে গেছে এই জন্যে।'

'মিস রাগ করবে।'

'মিস খুব এংরি হবে। রাগের ইংরেজি হল এংরি।'

'এংরি বানান কী?'

'বানান জানি না।'

'পলাশ তুই জানিস?'

'জানি না।'

'গুড বানান জানিস?'

'জানি, কিন্তু বলব না।'

'বলবি না কেন?'

'তুমি তো আমাদের মিস না।। মিস বানান জিজ্ঞেস করলে বলতে হয়।'

'আর কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতে হয় না?'

'না।'

তারেক সিগারেট ধরাল। এদের পড়শোনা করানো মোটামুটি অসম্ভব ব্যাপার। একজন টিচার রেখে দিতে হবে। বাড়তি খরচ, তাতে অসুবিধা হবে না। সংসারে মানুষ কমে গেছে। লায়লার বিয়ে হলে আরো কমবে। তার বেতনও কিছু বাড়বে। খুব শিগগিরই প্রমোশন হবার কথা। পলাশ বলল, বাবা সিগারেট খেলে ক্যানসার হয়।

'কে বলেছে, মিস?'

'না, মা বলেছে।'

মাব প্রসঙ্গ চলে আসায় তারেক একটু শঙ্কিত বোধ করল। এই প্রসঙ্গ আলোচনায় না আসাই বোধহয় মঙ্গলজনক। টগর গম্ভীর গলায় বলল, যে সিগারেট খায় সে মারা যায়। আর সিগারেট খাবার সময় আশপাশে যারা থাকে তারাও মারা যায়। তুমি সিগারেট খেলে আমরা মারা যাব।

'কে বলেছে, তোদের মা না মিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা বলেছে। সিগারেট যেমন খারাপ, চকলেটও খারাপ। চকলেট খেলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। এক রকম পোকা এসে দাঁত খেয়ে ফেলে। দাঁতের ইংরেজি হল টুথ।'

তারেক সিগারেট ফেলে দিল। মার প্রসঙ্গ চলে এসেছে—এখন কি সেই বিষয়ে দু-একটা কথা বলা ঠিক হবে? না পুরো বিষয়টা নিয়ে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে?'

'টুথের বানান কী?'

'ট উ-কারে টু, থ—টুথ।'

'বাংলা বানান না ইংরেজি?'

'জানি তোমাকে বলব না।'

তারেক ইতস্তত করে বলল, তোর মা যে আসছে না এ নিয়ে কী করা যায় বল তো? টগর-পলাশ দুজনই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। তারেক বাচ্চাদের দিকে না তাকিয়ে বলল, তোর মা যে আসছে না, এ জন্যে নিশ্চয়ই তোদের মন খারাপ। তার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না।

পলাশ বলল, দেখা হয় তো।

পলাশের এই কথা বলা মনে হয় ঠিক হয় নি। টগর চোখের ইশারায় তাকে চুপ করতে বলছে। তারেক বিস্মিত হয়ে দুই ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে।

'মার সঙ্গে দেখা হয়?'

'হুঁ।'

'বাসায় আসে নাকি?'

'না স্কুলে যায়।'

'স্কুলে যায়?'

'একদিন মা তার বাসায় নিয়ে গেল।'

'বাসায় নিয়ে গেল মানে—বাসা ভাড়া করেছে? বাসা কোথায়?'

'জানি না।'

'বাসাটা কেমন?'

'সুন্দর।'

'সে একাই থাকে না আরো লোকজন থাকে?'

'জানি না।'

'জানিস না মানে কী? বাসায় আর কাউকে দেখিস নি?'

'উঁহুঁ।'

'তোদের মা যে তোদের দেখতে আসে, তোরা যে তার বাসায় গিয়েছিলি এটা এ বাড়ির আর কে জানে?'

'সবাই জানে। শুধু তুমি জান না।'

'মার বাসায় কীভাবে গিয়েছিলি—সে এসে নিয়ে গিয়েছিল?'

'চাচু নিয়ে গিয়েছে। আবার নিয়ে এসেছে।'

'হাসান নিয়ে গেছে?'

'হুঁ।'

তারেক অ্যাশট্রেতে ফেলে দেয়া আধ-খাওয়া সিগারেট তুলে নিল। তার দুই পুত্র তার দিকে তাকিয়ে আছে। টগর বলল, ব্যাটম্যান মানে কী, তুমি জান বাবা?

তারেক অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, না।

'ব্যাটম্যান মানে হল বাদুরমানুষ। ব্যাট মানে বাদুর। ম্যান মানে মানুষ।

'ও।'

'বাদুরমানুষ কিন্তু উড়তে পারে না। শুধু লাফ দিতে পারে। একটা বাড়ির ছাদ থেকে আরেকটা বাড়ির ছাদে যায়। আর ঘোস্ট মানে কী জান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'ঘোস্ট মানে ভূত। ভূত কিন্তু পৃথিবীতে হয় না। শুধু কার্টুনে হয়। আমাদের মিস বলেছে। অদৃশ্য মানব কাকে বলে তুমি কি জান বাবা?'

'না।'

'অদৃশ্য মানবকে চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য মানব কিন্তু ভূত না। মানুষ।'

'হুঁ।'

'অদৃশ্য মানব চোখে দেখা যায় না এই জন্যে এদের ছবিও আঁকা যায় না। কিন্তু পলাশ তো বোকা—এই জন্যে সে অদৃশ্য মানবের ছবি এঁকেছে। ছবি দেখবে বাবা?'

তারেক 'হুঁ' বলল কিন্তু উঠে চলে গেল। ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—সবাই মিলে কি তাকে বয়কট করেছে? হাসানের সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলা দরকার। হাসানের সঙ্গে তার দেখা ইদানীং হচ্ছে না। হাসানের ব্যস্ততা খুব বেড়েছে। কোনো একটা কাজটাজ বোধহয় করছে। কী কাজ তা এখনো জিজ্ঞেস করা হয় নি। যে কাজই করুক খুব পরিশ্রমের কাজ নিশ্চয়ই। রোদে পুড়ে চেহারা নষ্ট হয়ে গেছে। সস্তা সিগারেটও মনে হয় প্রচুর খাচ্ছে। হাসান পাশ দিয়ে গেলে মনে হয় তামাকের একটা ফ্যাক্টরি হেঁটে চলে গেল। জর্দা দিয়ে পানও খাচ্ছে—দাত লাল—মুখ দিয়ে ভুরভুরে জর্দার গন্ধ আসে।

হাসান দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল। তারেক দরজা ধাক্কা দিতেই উঠে এসে দরজা খুলল।

'ঘুমোচ্ছিলি?'

'না। শুয়েছিলাম।'

'দশটা বাজতেই শুয়ে পড়লি, শরীর খারাপ?'

'জ্বর জ্বর লাগছে।'

'রোদে রোদে ঘুরলে জ্বর তো লাগবেই—ভাদ্র মাসের রোদে তাল পেকে যায়, মানুষ তো পাকবেই। ভাদ্র মাসে রাস্তাঘাটে যত মানুষ ঘোরে তাদের বেশিরভাগই পাকা মানুষ।'

'সিগারেট লাগবে ভাইয়া?'

'না সিগারেট লাগবে না। এক প্যাকেট কিনেছিলাম, সাতটা খেয়েছি। এখনো তেরটা বাকি আছে। এলাম তোর সাথে একটু গল্প-গুজব করি বাতিটা জ্বালা।'

হাসান অনিচ্ছার সঙ্গে বাতি জ্বালাল। তার জ্বর এসেছে। ভালো জ্বর। দুপুরে সে কিছু খায় নি। রাতেও খায় নি। ক্ষিধেয় নাড়ি পাক দিচ্ছে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে কোনো খাবার সামনে আনলেই বমি হয়ে যাবে।

তারেক বসতে বসতে বলল, তোর ভাবী ঝোঁকের মাথায় ফট করে চলে গেল। এই নিয়ে কারো সঙ্গে কথাও বলা হয় নি।

'কথা বলার কী আছে?'

'সেটাও ঠিক কথা বলার কী আছে? লজ্জাজনক ব্যাপার।'

'তোমার জন্যে লজ্জাজনক তো বটেই। যা ঘটেছে তোমার জন্যেই ঘটেছে।'

'তোর ভাবী কোথায় আছে কিছু জানিস?'

'শ্যামলীতে আছে। তাঁর এক বান্ধবীর বাড়িতে।'

'ও আচ্ছা।'

'ঠিকানা চাও?'

'না ঠিকানা দিয়ে কী করব?'

'তুমি যদি মনে কর—ভাবীর সঙ্গে কথা বলে তাকে ফিরিয়ে আনবে।'

'সেটা ঠিক না। ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কোনো কাজের কথা না। আমি তাকে চলে যেতে বলি নি—সে চলে গেছে। আমি যদি তাকে চলে যেতে বলতাম তাহলে তাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আমার ছিল। যদি আসার হয় নিজেই আসবে।'

হাসান হাই তুলতে তুলতে বলল, ভাবী কঠিন জিনিস। নিজ থেকে আসবে না।

'না এলে কী আর করা। বাচ্চাদের খানিক সমস্যা হবে—এই আর কী? সমস্যা তো পৃথিবীতে থাকেই। সমস্যা নিয়েই আমাদের বাস করতে হয়।'

'তুমি কি তোমার অফিসের ওই মহিলাকে বিয়ে করবে?'

'বিয়ের কথা আসছে কেন?'

'বিয়ে হচ্ছে না?'

তারেক সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সহজ গলায় বলল, টগরের কাছে শুনলাম—ওদের মার সঙ্গে দেখা হয়—এটা ভালো। আর্লি স্টেজে মার ভালবাসা দরকার। মায়ের ভালবাসা ভিটামিনের মতো কাজ করে। যাক—সময়ে-অসময়ে ভিটামিনটা পাচ্ছে।

'হুঁ।'

'ও কি চাকরি-বাকরি কিছু করছে?'

'জানি না। হয়তো করছে।'

'চাকরির বাজার খুবই টাইট—তবে মেয়েদের স্কোপ বেশি। বলিস ভালোমতো যোগাযোগ করতে। পত্রিকা দেখে এপ্লিকেশন করলে হবে না। সরাসরি উপস্থিত হতে হবে।'

'ভাইয়া আমার মাথা ধরেছে। কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'দে একটা সিগারেট খাই। সিগারেটটা শেষ করে চলে যাব।'

'নিজের ঘরে গিয়ে খাও।'

'তোর এখানে খেয়ে যাই।'

'ভাইয়া তুমি কি ভাবীকে টেলিফোন করতে চাও? ভাবী যে বাড়িতে থাকে সেখানকার টেলিফোন নাম্বার আমার কাছে আছে।'

'টেলিফোন করে কী করব?'

'কী করবে তা জানি না। টেলিফোন নাম্বার আছে তুমি চাইলে দিতে পারি।'

'আচ্ছা দে রেখে দেই। তোর এই অবস্থা কেন? মনে হচ্ছে রোদে পুড়ে কাঠকয়লা হয়ে গেছিস। ব্যাপার কী?'

'কোনো ব্যাপার না।'

'রোদে বেশি ঘুরবি না। চামড়া নষ্ট হয়ে যাবে। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে খুব খারাপ। স্কিনক্যানসার হয়।'

'হুঁ। ভাইয়া এই নাও ভাবীর টেলিফোন। এখন চলে যাও। আমার প্রচণ্ড মাথাধরা—কথা বলতে ভালো লাগছে না।'

'হালকা ধরনের কথাবার্তা বললে বরং মাথাধরাটা কমে। লাইট ডিসকাশন ওষুধের মতো কাজ করে।'

'ভাইয়া আমার বেলায় করে না। তাছাড়া আমাদের ডিসকাশন মোটেই লাইট হচ্ছে না।'

তারেক উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, তোর সঙ্গে আরেকটা জরুরি কথা ছিল—এখন মনে পড়ছে না।

'মনে পড়লে বলবে।'

'যখন মনে পড়বে তখন দেখা যাবে তুই পাশে নেই। আর তোর সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন আর জরুরি কথাটা মনে পড়বে না। মানুষের জীবন মানেই এই জাতীয় জটিলতা।'

'হুঁ।'

'মানুষের মনে যে বয়সে নানান ধরনের শখ হয় সে বয়সে টাকা-পয়সা থাকে না। বুড়ো বয়সে যখন টাকা-পয়সা হয় তখন আর শখ থাকে না।'

'তোমার কী শখ?'

'ব্যাংককে গিয়ে একবার একটা ম্যাসেজ নেয়ার শখ ছিল। এই বিষয়ে অনেক কথা শুনেছি। আমার পরিচিত কয়েকজন ম্যাসেজ নিয়েছে। খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। বিরাট একটা কাচের ঘরের পেছনে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ইয়াং মেয়েরা সেজেগুজে বসে থাকে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নম্বর আছে। তোর একটা মেয়ে পছন্দ হল—ধর তার নাম্বার তিন শ তের। তুই তিন শ তের নাম্বারের একটা কার্ড....।'

'ভাইয়া চুপ কর। তোমার কাছ থেকে এসব শুনতে খুবই অস্বস্তি লাগছে। এইসব তুমি কী বলছ?'

'কী বলছি মানে? খারাপ কী বলছি?'

'কী বলছ বুঝতে পারছ না? তোমার জীবনের সবচে বড় শখ একটা বেশ্যা মেয়ে তোমার গা দলাই মলাই করবে।'

'বেশ্যা মেয়ে বলছিস কেন? ওরা সব কলেজ-ইউনিভার্সিটির মেয়ে। স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলির মেয়ে। তাছাড়া এটাই যে আমার জীবনের সবচে বড় শখ তাও না। অনেকগুলো শখের মধ্যে একটা....।'

'ভাইয়া আমার খুবই মাথা ধরেছে, তুমি এখন যাও।'

'শ্যাম্পেনের এত নামধাম শুনেছি। খেয়ে দেখার শখ ছিল—একটা বোতলের দামই শুনেছি দু-তিন হাজার টাকা.....।'

'ভাইয়া প্লিজ! আমি আরেকদিন তোমার শখের কথাগুলো শুনব।'

'তুই এমন রেগে গেলি কেন?'

'রাগি নি। আমি তো বললাম, আমার খুব মাথা ধরেছে।'

'কমলার মাকে বল এক বালতি গরম পানি করে দিতে। গরম পানি দিয়ে হট শাওয়ার নিলে শরীরটা হালকা হবে, ভালো ঘুম হবে।'

'আচ্ছা আমার যা করার করব তুমি যাও।'

'ফট করে রেগে গেলি। আশ্চর্য!'

তারেক নিজের ঘরে ঢুকল। হাসানকে যে জরুরি কথাটা বলার ছিল সেই কথা তখনি মনে পড়ল। তাকে গিয়ে সেই কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না। অকারণে সে যেমন রেগে গেছে—দরজায় ধাক্কা দিলে সে হয়তো দরজাই খুলবে না। কথাটা হচ্ছে তার অফিসে একটা মেয়ে টেলিফোন করেছে। মেয়েটার নাম চিত্রলেখা। সে হাসানকে খুঁজছে। খুব নাকি জরুরি। একবার না, মেয়েটা টেলিফোন করেছে দুবার।

ঘুমোতে যাবার আগে তারেক একটা কাগজে বড় বড় করে লিখল—চিত্রলেখা। সকালবেলা এই কাগজটা দেখলেই তার মনে পড়বে। হাসানকে খবরটা দেয়া যাবে। সবচে ভালো হত এখন দিতে পারলে।

রীনাকে টেলিফোন করার কোনো ইচ্ছা তারেকের ছিল না। অফিসে এসে রুমাল বের করার জন্যে পকেটে হাত দিয়ে দেখে রীনার টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজ। টেলিফোন করলে কে ধরবে? রীনার বান্ধবী? নাকি রীনাই ধরবে? তারেক টেলিফোন করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না। তারপরেও কী মনে করে করল। দুটা রিঙের ভেতর না ধরলে সে রেখে দেবে।

দুটা রিং বাজতেই রীনা ধরল। গম্ভীর গলায় বলল, হ্যালো কাকে চাচ্ছেন?

তারেক বলল, কে রীনা?

'হ্যাঁ। কী ব্যাপার?'

'কোনো ব্যাপার না। কেমন আছ?'

'ভালো আছি।'

'ও আচ্ছা এইটা জানার জন্যে। বাসার খবর ভালো—টগর পলাশ দুজনই ভালো আছে।'

'আচ্ছা।'

'হাসানের শরীরটা মনে হয় খারাপ। কাল রাতে জ্বরটর মনে হয় এসেছে ভাত খায় নি। রোদে রোদে ঘুরে চেহারাটাও খারাপ হয়ে গেছে। আমি বলেছি রোদে কম ঘুরতে।'

'ভালো।'

'লায়লার বিয়ের কথা হচ্ছিল—বিয়েটা হয়ে যাবে মনে হয়। ছেলে ভালো। বয়স সামান্য বেশি। ডিভোর্সড।'

'ও।'

'রকিব এসেছিল। ও এর মধ্যে দু মাসের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল। ঘুরেটুরে এসেছে। দু মাসের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল আমি তো জানতামই না। তাজমহল দেখে এসেছে। জয়সলমীরও গিয়েছিল। উটের পিঠে চড়ে ছবি তুলেছে। আমার জন্যে জয়পুরী পাঞ্জাবি এনেছে। তোমার জন্যে একটা শাড়ি এনেছে। আমি হাসানকে বলব তোমাকে দিয়ে আসতে। ও তো তোমার বাসা চেনে।'

'আর কিছু বলবে?'

'না।'

'চিটাগাঙের ওই মেয়ে—লাবণীর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'ও দুটা চিঠি দিয়েছিল। আগে জবাব দেই নি—কাল একটার জবাব দিয়েছি।'

'এর মধ্যে চিটাগাং যাও নি?'

'না।'

'কবে যাবে?—ঘুরে আসছ না কেন? লাবণী আর তার মেয়েকে নিয়ে কক্সবাজার থেকে ঘুরে আস। সমুদ্র দেখিয়ে আন।'

তারেক কিছু বলল না। রীনা বলল, টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। তারেক বলল, আচ্ছা পরে কথা হবে। তুমি ভালো থেকো।

'আমি ভালোই থাকব। আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা শোন, আমি টেলিফোন রেখে দিচ্ছি আমার অফিসের গাড়ি এসে গেছে। হর্ন দিচ্ছে।'

'অফিসের গাড়ি এসেছে মানে তুমি কি চাকরি করছ নাকি?'

'সামান্য চাকরি করছি।'

'রিসিপশনিস্ট? শোন, রিসিপশনিস্টের কাজে কোনো প্রসপেক্ট নেই—অন্য কোনো লাইনে ঢোকার চেষ্টা কর।'

'আমি এখন রাখলাম।'

তারেকের একটু মন খারাপ লাগছে। অফিসের ব্যাপারটা ভালোমতো জানা হল না। কোন অফিস—কত বেতন কিছুই জানা হল না। অফিসের টেলিফোন নাম্বারটাও নিয়ে রাখলে হত।

২২

রীনা ভালো আছে কি না তা সে এখনো বুঝতে পারছে না। দিনের বেলায় সে বেশ ভালোই থাকে। দিনটা শুরু হয় ব্যস্ততার ভেতর শেষও হয় ব্যস্ততার ভেতর। সন্ধ্যার পর থেকে কিছু করার থাকে না। বুকে হাঁপ ধরার মতো হয়। সে বসে থাকে টিভির সামনে। টিভিতে ক্রমাগত হিন্দিগানের নাচ হতে থাকে। নাচের মুদ্রা কুৎসিত। নাচের সঙ্গে যে গান হয় সেই গানের সুর একই রকম। তারপরেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাচ ছাড়া আর কিছু দেখার নেই। কারণ গৃহকর্তা মনসুর সাহেব এই অনুষ্ঠানটাই দেখেন। রীনা এ বাড়িতে আছে আশ্রিতের মতো। একজন আশ্রিতের ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকতে পারে না।

শ্যামলী রিং রোডের এই বাড়ি রীনার বান্ধবী আফরোজার। আফরোজা রীনার সঙ্গে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছে। পাস করার পর আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। দশ বছর পর আবার যোগাযোগ হয়েছে। কাকতালীয়ভাবেই হয়েছে। আফরোজা স্কুলে থাকতেও হড়বড় করে কথা বলত—এখনো হড়বড় করেই বলে। সে রীনাকে জড়িয়ে ধরে হড়বড় করে যে কথা বলল তা হচ্ছে—তুই পাগলীর মতো এইসব কী বলছিস? স্বামীকে ছেড়ে চলে এসেছিস। চাকরি খুঁজছিস। আমি তোর জন্যে চাকরি কোথায় পাব? কাকে আমি চিনি? তবে চাকরি দিতে না পারলেও তোকে থাকতে দিতে পারব। চলে আয় আমার বাড়িতে। রিং রোডে একটা ফ্ল্যাট কিনেছি। চার বেডরুমের ফ্ল্যাট। একটা গেস্টরুম খালি পড়ে থাকে। ওইখানে থাকবি।

রীনা বলল, তোর হাসবেন্ড কিছু বলবে না।

'কিছুই বলবে না। আমার হাসবেন্ড হচ্ছে টবের গাছের মতো। কথাবার্তা কিছুই বলে না। সন্ধ্যাবেলা টিভির সামনে বসে। মাঝখানে একবার ভাত খাওয়ার জন্যে ওঠে। বারটা বাজলে ঘুমোতে যায়।'

'উনি করেন কী?'

'ব্যবসাপাতি করে। কী ব্যবসা তাও জানি না। ও কী করে না করে তা নিয়ে ভাবতে হবে না—তুই আয় তো। কাঁথা-বালিশ নিয়ে উঠে আয়।'

রীনা রিং রোডে আফরোজার ফ্ল্যাটবাড়িতে গিয়ে উঠল। সুন্দর গোছানো ফ্ল্যাট। দামি হোটেলের মতো সবকিছু ঝকঝক করছে। যে গেস্টরুমে রীনাকে থাকতে দেয়া হয়েছে সেখানেও এসি আছে। মেঝেতে দামি কার্পেট। আফরোজা বলল, গরম লাগলে এসি ছাড়বি। কোনোরকম কিপ্টামি করবি না। নিজের বাড়ি মনে করে থাকবি। পরের বাড়িতে আছিস বলেই যে কিছু কর্ম করবি—চা বানাবি, রান্না করবি তাও না। তিনটা কাজের মানুষ। কাজ না করে করে ওদেরও হাতে পায়ে জং ধরে গেছে। রীনা বলল, তোর ছেলেপুলে কী?

'ছেলেপুলে কিছু নেই। আমার নাকি কী সব সমস্যা আছে। ও বলছিল টেস্টটিউব বেবি নিতে। শুনেই আমার ঘেন্না লাগল। টেস্টটিউব অদল বদল হয়ে যাবে—কার না কার দিয়ে দেবে। ছিঃ। তারপরও কলকাতা গিয়ে দু মাস ছিলাম। লাভের মধ্যে লাভ হয়েছে—ডাক্তাররা খোঁচাখুঁচি করে যন্ত্রণার চূড়ান্ত করেছে। বাচ্চাকাচ্চা ছাড়া আমি ভালোই আছি। পালক নেবার কথা মাঝে মাঝে ভাবি। দেখা যাক। আমার এত গরজ নেই।'

আফরোজার স্বামীর নাম নুরউদ্দিন। থলথলে ধরনের শরীর। দেখেই মনে হয় এই মানুষটার জন্ম হয়েছে আরাম করার জন্যে। ফ্ল্যাটে যখন থাকে বেশিরভাগ সময় চেয়ারে পা তুলে বসেই থাকে। হয় খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকে নয়তো টিভির দিকে তাকিয়ে থাকে। হাঁটাচলা করতে মনে হয় কষ্ট হয়।

আফরোজা রীনাকে তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—এ হচ্ছে স্কুলজীবনে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড—রীনা। রীনা আমাদের ফ্ল্যাটে কিছুদিন থাকবে। কতদিন এটা বোঝা যাচ্ছে না। মাসখানেকও হতে পারে—আবার বছরখানেকও হতে পারে। বুঝতে পারছ?

নুরউদ্দিন বলল, হুঁ।

আফরোজা বলল, রীনার দিকে তাকিয়ে হুঁ বল। অন্যদিকে তাকিয়ে হুঁ বলছ কেন? আরেকটা কথা শোন—তুমি তোমার পরিচিত সবাইকে বলে দেবে রীনার জন্যে যেন একটা চাকরির খোঁজ করে। ও বি.এ. পাস করেছে। সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছে। অতি সুইট মেয়ে।

'আচ্ছা।'

'বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম ওর সঙ্গে দুটা কথা বল। ভদ্রতাও তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? বেচারি মনে করবে কী?'

নুরউদ্দিন রীনার দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবী দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন।

আফরোজা বিরক্ত গলায় বলল, ভাবী ডাকছ কেন? তুমি নাম ধরে ডাকবে। বয়সে তুমি আমার দশ বছরের বড়। রীনার চেয়েও দশ বছরের বড়। নাম ধরে ডাকবে কোনো অসুবিধা নেই।

'আচ্ছা।'

'ওর নাম কী জান?'

'না।'

'ওর নাম রীনা।'

'ও আচ্ছা রীনা।'

'তুমি রীনার জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে।'

'আচ্ছা।'

রীনা লক্ষ্য করল মানুষটা আসলেই টবের গাছের মতো। ফ্ল্যাটে যখন থাকে বসে বসেই সময় কাটিয়ে দেয়। নিজে কথা বলে না। অন্যের কথা শোনার আগ্রহও তার নেই। মাঝে মাঝে রীনার মনে হয়—আফরোজা যে তাকে ফ্ল্যাটবাড়িতে এনে তুলেছে সে তার নিজের গরজেই এনে তুলেছে। আফরোজার কথা বলার মানুষ দরকার। মুখ সেলাই করে দুজন মানুষ দিনের পর দিন পাশাপাশি বাস করতে পারে না। রীনার মাঝে মাঝেই মনে হয়—সংসারে ছেলেপুলে থাকাটা যে কত দরকার তা মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে বোঝানোর জন্যে আল্লাহ্ এই সংসারটা তৈরি করেছেন।

তবে কথা না বললেও রীনার নুরউদ্দিনকে পছন্দ হয়েছে। পুরুষদের স্বভাবই হচ্ছে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে আশপাশের মেয়েদের শরীরের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়া। এই মানুষটি তা থেকে মুক্ত। তার ভদ্রতাবোধও ভালো। মানুষটা টিভি সেটের সামনে বসে থাকে খালি গায়ে। রীনা ঘরে এলে পাশে খুলে রাখা পাঞ্জাবিটা চট করে গায়ে দেয়। রীনা বলেছে—আপনার যদি খালি গায়ে থাকতে আরাম লাগে আপনি সেইভাবে থাকুন। আমি কিছু মনে করব না। নুরউদ্দিন খালি গা হয় নি। তাছাড়া রীনাকে সে রীনা নামেও ডাকছে না। ভাবীই ডাকছে। এটিও রীনার পছন্দ হয়েছে। বান্ধবীর স্বামী তাকে নাম ধরে ডাকবে এটা ভাবতে তার ভালো লাগে না।

নুরউদ্দিনের যে ব্যাপারটা রীনার খারাপ লাগে তা হচ্ছে ভদ্রলোকের মদ্যপানের অভ্যাস আছে। সবদিন না—মাঝে মাঝে। প্রথম দিন মদ্যপানের দৃশ্য দেখে আতংকে রীনার হাতপা নীল হয়ে যাবার উপক্রম হল। মদ্যপানের ব্যাপারটা বড় বড় হোটেলে হয়, এবং অপরিচিত লোকরা মদ্যপান করে—এই ছিল তার ধারণা। পরিচিত একজন মানুষ চেয়ারে পা তুলে মদ খাবে এই দৃশ্য রীনার কল্পনাতেও ছিল না। আফরোজা এই দৃশ্য দেখেও কিছু বলছে না এতেও রীনা খুব অবাক হচ্ছে। সে বলেই ফেলল, আফরোজা তুই কিছু বলছিস না?

আফরোজা বলল, কী বলব?

'উনি যে ড্রিংক করছেন।'

'বদঅভ্যাস করে ফেলেছে, বলে কী হবে। শুরুতে বলেছি কাজ হয় নি—এখন আর বলি-টলি না। তাছাড়া কোনো সমস্যা করে না। নিজের মনে খায়। মদে ওর কিছু হয় না। টাল না হয়ে পুরো এক বোতল ভদকা সে খেতে পারে।'

'টাল না হয়ে মানে কী?'

'টাল হল—মাতাল। মদভর্তি চৌবাচ্চায় ওকে ডুবিয়ে দে ও চৌবাচ্চার সব মদ খেয়ে বের হয়ে এসে বলবে—ভাত দাও। ক্ষিধে হয়েছে।'

'কী আছে এর মধ্যে যে উনি এত আগ্রহ করে খাচ্ছেন?'

'কিছুই নেই। তিতকুট একটা জিনিস, খেলে মাথা ঘোরে।'

'তুই খেয়ে দেখেছিস?'

'হুঁ। একবার রাগ করে খেয়েছিলাম—অতি অতি অতি কুৎসিত। তুই একবার খেয়ে দেখিস।'

'সর্বনাশ!'

'সর্বনাশের আবার কী? ছেলেরা খেতে পারলে আমাদের খেতে অসুবিধা কী।'

মদ্যপানের পর নুরউদ্দিনের তেমন কোনো পরিবর্তন রীনার চোখে পড়ে নি। শুধু একটা পরিবর্তন হয়—টুকটাক দু-একটা কথা বলে। প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়। যেমন একদিন রীনা বলল, আপনি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাচ দেখেন আপনার ভালো লাগে?

নুরউদ্দিন গ্লাসে হালকা চুমুক দিয়ে বলল, না। মনে হয় একদল ছেলেমেয়ে পিটি করছে।

'ভালো লাগে না তো দেখেন কেন?'

'কিছু করার নেই এইজন্যে দেখি। দেখিও ঠিক না, তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে থাকা আর দেখা এক না।'

'গল্পের বইটই আপনি পড়েন না?'

'কলেজ জীবনে দু-একটা পড়েছি। এখন আর পড়ি না।'

'পড়েন না কেন?'

'সব বই তো একই রকম—একটা পড়লেই সব পড়া হয়। একটা ছেলে থাকবে, একটা মেয়ে থাকবে। তাদের প্রেম হবে। তারপর হয় তাদের বিয়ে হবে, নয় বিয়ে হবে না। এই তো ব্যাপার।'

'আপনার বন্ধুবান্ধব খুব কম?'

'হুঁ। বন্ধু কম, শত্রুও কম। যাদের বন্ধু বেশি তাদের শত্রুও বেশি। যাদের কোনো বন্ধু নেই, তাদের কোনো শত্রুও নেই।'

রীনার চাকরি নুরউদ্দিনই যোগাড় করে দিল। এক কথায়—মাসে ছ হাজার টাকা বেতনের চাকরি তো সহজ ব্যাপার না। রীনার বিস্ময়ের সীমা রইল না। যে লোকটার প্রধান কাজ সন্ধ্যার পর থেকে টিভির সামনে বসে মদ্যপান করা সে এক কথায় চাকরির ব্যবস্থা করতে পারে এটা রীনা ভাবে নি। হাসান বছরের পর বছর ঘুরে চাকরি পায় নি। আর সে দশ দিনের মাথায় চাকরি পেয়ে গেল। থলথলে শরীরের খালি গায়ের মানুষটার ক্ষমতা অবশ্যই আছে।

চাকরি রীনার ভালো লাগছে। সুন্দর ছিমছাম অফিস। ভালো ব্যবসা হচ্ছে। অফিসের লোকজনদের মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। সবার ভেতরই ব্যস্ততা। রীনার বসকেও তার পছন্দ হয়েছে। স্মার্ট মানুষ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। টকটকে লাল গেঞ্জি গায়ে দিয়ে একদিন অফিসে এসেছিলেন। তাঁকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েসী যুবকের মতো লাগছিল। ভদ্রলোকের কথাবার্তা মার্জিত। অফিসের বসরা সব সময় গোমড়া মুখে থাকেন। ভদ্রলোকের মুখ গোমড়া না—কথায় কথায় রসিকতা করেন। রসিকতা যখন করেন—এমন গম্ভীর ভঙ্গিতে করেন যে প্রথম কিছুক্ষণ বোঝাই যায় না—রসিকতা।

প্রথম দিন রীনা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল। দরজায় পেতলের দুটা অক্ষর A. H.—আজিজুল হকের আদ্যক্ষর। নামের বদলে কেউ শুধু আদ্যক্ষর দরজায় লাগিয়ে রাখতে পারে রীনা ভাবে নি। সে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। ভদ্রলোক বললেন, রীনা কী খবর?

রীনা বলল, জ্বি স্যার ভালো।

'কাজ বুঝে নিয়েছেন?'

'জ্বি।'

'আপনার কাজটা কী বলুন তো?'

রীনা হকচকিয়ে গেল। তাকে রিসিপশনে বসতে বলা হয়েছে। এর বেশি কিছু বলা হয় নি। ভদ্রলোককে সেটা বলা কি ঠিক হবে? রীনা ইতস্তত করতে লাগল। হক সাহেব বললেন,

ওরা আপনাকে কী করতে বলেছে, আমি জানি না। আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে রোজ একবার এসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ হাসিমুখে গল্প করা। অফিসের বেশিরভাগ মানুষ গোমড়া মুখে বসে থাকে। আমার অসহ্য লাগে।

রীনা খানিকটা হকচকিয়ে গেল। ভদ্রলোকের এ জাতীয় কথা বলার মানে কী? মেয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে অফিস বসদের নানান ধরনের গল্প শোনা যায়। এ রকমই কি? উনি কি অন্য কিছু বলার চেষ্টা করছেন?

'রীনা।'

'জ্বি।'

'আমার কথা শুনে মোটেই ঘাবড়াবেন না। রসিকতা করছি। তবে আমি সত্যি সত্যি হাসিমুখ দেখতে পছন্দ করি। নকল হাসিতেও আমার আপত্তি নেই। সত্যি কান্নার চেয়েও নকল হাসি আমার কাছে অনেক ভালো। ঠিকমতো কাজ শিখুন। আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি—মেয়েরা যখন অফিসে কাজ করতে আসে তখন হয় তারা দারুণ কাজের হয়, নয়তো নিতান্তই অকাজের হয়। মাঝামাঝি কিছু মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না, শুধু পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায়। আমি কর্মী মহিলা চাই। গল্পবাজ মহিলা না যাদের প্রধান কাজ ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লিপস্টিক বের করে ঠোঁটে ঘষা। প্রথম দিনে অনেক কথা বলে ফেললাম—আর না।'

রীনা প্রথম কাজ শুরু করেছিল রিসিপশনে—এখন তাকে দেয়া হয়েছে ফরেন করেসপনডেন্স ডেস্কে। যে বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে তাকে কাজ শিখতে হচ্ছে তিনি খিটখিটে এবং বদমেজাজী। কথায় কথায় তিনি রীনাকে ধমক দেন তবে প্রায় প্রতিদিনই বলেন—তোমার মাথা পরিষ্কার। অন্যরা যে কাজ এক বছরে শিখেছে তুমি তা শিখেছ এক মাসে।

এই জাতীয় কথা শুনতে আনন্দ লাগে। বুড়ো ভদ্রলোক রীনাকে শুধু যে আনন্দ দেবার জন্যে এই কথাগুলো বলছেন—তা যে না, রীনা নিজেও তা বুঝতে পারে। কাজ করতে তার ভালো লাগে। হক সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে একদিন বললেন, আপনার কাজের খুব সুনাম শুনি। আপনি স্পোকেন ইংরেজি কেমন জানেন?

রীনা বলল, ভালো জানি না স্যার।

'ভিসিআরে বেশি বেশি ইংরেজি ছবি দেখে স্পোকেন ইংলিশ বানিয়ে নিন। আপনাকে আমরা আমাদের লন্ডন অফিসে পাঠিয়ে দেব। দেশের বাইরে যেতে আপত্তি নেই তো?'

'জ্বি না স্যার।'

'আপনার পারিবারিক আনফরচুনেট অবস্থার কথা আমাকে বলা হয়েছে। পারিবারিক বিধিনিষেধ নেই তো?'

'জ্বি না।'

'ভালো করে ভেবে বলুন। সব ঠিকঠাক করে আপনার বাইরে যাবার ব্যবস্থা করা হল—তারপর আপনি বেঁকে বসলেন বা আপনার স্বামী বেঁকে বসলেন। এমন হবে না তো?'

'জ্বি না।'

'হুট করে কিছু বলতে হবে না। আপনি সপ্তাহখানিক ভাবুন। তারপর বলুন।'

রীনা এক সপ্তাহ ভেবেছে। কখনো তার কাছে মনে হয়েছে—না সম্ভব না। দেশে সে আছে বলেই অন্তত সপ্তাহে একবার সে টগর-পলাশকে দেখতে পারছে। আবার কখনো মনে হয়েছে—সব ছেড়েছুড়ে দূরে চলে যেতে। একবার মনে হল তারেক যদি শোনে সে লন্ডন চলে যাচ্ছে তাহলে সে কী বলবে? টেলিফোনে আলাপ করবে না সরাসরি তার অফিসে চলে যাবে? অফিসে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তারেক যদি ভাবে সে আসলে এসেছে ঘরে ফিরে যেতে? ভাবলে ভাবুক। যদি সে সত্যি সত্যি লন্ডনে চলে যায়—যাবার আগে একবার দেখা করাও তো উচিত।

বুধবার দুপুরবেলা রীনা তারেকের অফিসে উপস্থিত হল। তারেক লাঞ্চ সেরে পান চিবোচ্ছিল। রীনাকে দেখে বিস্মিত-অবাক কিছুই হল না। স্বাভাবিক গলায় বলল, রীনা কী খবর?

রীনা বলল, ভালো।

'আজ আমার ব্যাডলাক, সকালে এসে দেখি ফ্যান নষ্ট। সকাল থেকে গরমে সিদ্ধ হচ্ছি। মিস্ত্রি আনতে লোক গেছে। এগারটার সময় গেছে—এখন দুটা। মিস্ত্রিও নেই, লোকও নেই। নো ম্যাংগো, নো গানিব্যাগ। আমও নেই ছালাও নেই।'

রীনা বলল, তুমি কেমন আছ?

'ভালো।'

'বাসার খবর কী?'

'বাসার খবরও ভালো। পলাশ গতকাল রেলিঙের উপর পড়ে একটা দাঁত ভেঙে ফেলেছে। রক্তটক্ত কিছু বের হয় নি। কট করে দাঁতের একটা কণা ভেঙে গেল।'

'তোমার চাকরি কেমন চলছে?'

'ভালো।'

'প্রথম প্রথম চাকরি খুব ভালো লাগে। কিছুদিন পর আর ভালো লাগে না। আমার তো রোজ সকালে অফিসে এসে একবার করে ইচ্ছা করে ফাইল টাইল সব জ্বালিয়ে দিয়ে হাঁটা ধরি।'

'কোনদিকে হাঁটা ধরতে ইচ্ছা করে, চিটাগাঙের দিকে?'

'হাঁটা ধরতে ইচ্ছ করে এই পর্যন্তই। তুমি চা খাবে?'

'না।'

'পান খাবে? মিষ্টিজর্দা দেয়া পান আছে। দুপুরে খাবার পর একটা পান খেতে ভালো লাগে। পান হচ্ছে পিত্তনাশক এবং হজম সহায়ক।'

রীনা অবাক হয়ে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। কী আশ্চর্য—দু মাস পর দেখা—মানুষটা কত সহজেই না কথা বলছে। যেন কিছু যায় আসে না। রীনা বলল, আমাদের অফিসের একটা ব্রাঞ্চ আছে লন্ডনে। আমাকে খুব সম্ভব সেখানে পাঠাবে।

'কবে?'

'জানি না কবে।'

'বেতন কত দেবে? দেশে যে বেতন দেবে বাইরে সে বেতন দিলে তো হবে না। ফরেন কারেন্সিতে বেতন হওয়া উচিত।'

'উচিত হলে নিশ্চয়ই ফরেন কারেন্সিতে বেতন দেবে। তোমার ওই মেয়ের খবর কী?'

'লাবণীর কথা বলছ? ভালোই আছে। গত সপ্তাহে চিটাগাং গিয়েছিলাম—ওদের কক্সবাজার ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি। লাবণীর মেয়েটা আগে সমুদ্র দেখে নি। এই প্রথম দেখল। খুব খুশি।'

'তুমি এইভাবে ঘোরাফেরা করছ লোকজনের চোখে লাগছে—তুমি মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল না কেন?'

তারেক বিস্মিত হয়ে বলল, এক বউ থাকতে আরেক বউ ঘরে আনব কীভাবে?

'আইনে বাধা আছে?'

'ইসলামি আইনে বাধা নেই—কিন্তু দেশে তো পুরোপুরি ইসলামি আইন নেই—'

'থাকলে তোমার সুবিধা হত তাই না?'

তারেক সিগারেট ধরাল। রীনার কান্না পাচ্ছে। এখানে আসা তার উচিত হয় নি। মানুষটার সঙ্গে তার বাসায় চলে যেতে ইচ্ছা করছে। একবার যদি সে বলত—রীনা তুমি চল আমার সঙ্গে—সে নিশ্চয়ই যেত। রীনা ক্লান্ত গলায় বলল, যাই কেমন?

'দাঁড়াও পিয়নকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। রিকশা ঠিক করে দেবে। দুপুরবেলায় রিকশা-বেবিট্যাক্সি কিছুই পাওয়া যায় না।'

রীনা বলল, রিকশা লাগবে না।

অফিস থেকে বের হয়ে রীনার ইচ্ছা করল আবার তারেকের সঙ্গে দুটা কথা বলতে। ওকে খুব রোগা লাগছে। ওর কি ঘুম হচ্ছে না?

২৩

আজ লায়লার বিয়ে।

দায়সারা টাইপ বিয়ে। বর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবে। কয়েকজন আত্মীয়স্বজন থাকবে। কাজি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। তারা কনে নিয়ে চলে যাবে। পাঁচ লাখ টাকা দেনমোহর। এক লাখ উসুল।

এটা কী রকম বিয়ে? গায়ে হলুদ না, কিছু না। লায়লা ঠিক করে ফেলেছে দুপুরে সে পালিয়ে যাবে। কোথায় যাবে এখনো ঠিক করে নি। কল্যাণপুরে তার এক বান্ধবী থাকে। তাদের বাড়িতে ওঠা যায়। সেখানে টেলিফোন আছে। টেলিফোনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে।

বিয়ের দিনটা অন্যরকম থাকে। অথচ তার বিয়ের দিন অন্য দিনগুলোর চেয়ে মোটেও আলাদা না। সবকিছু আগের মতো শুধু টগর-পলাশ স্কুলে যাচ্ছে না। তারা বারান্দায় মহা উৎসাহে ফুটবল খেলছে।

তারেকও অফিসে যায় নি। সে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে ছেলেদের খেলা দেখছে। তারেক বলল, লায়লা আমাকে চা দে।

লায়লা চা বানাতে গেল। কমলার মা বলল, বিয়ার দিন চুলার ধারে আইয়েন না আফা। ঘরে গিয়া টাইট হইয়া বইয়া থাকেন। চা আমি বানাইতেছি।

লায়লা তাকে ধমক দিয়েছে—বেশি কথা বলবে না কমলার মা। এত কথা আমার ভালো লাগে না।

চা বানাতে গিয়ে লায়লার চোখে পানি এসে গেল। তার কত শখ ছিল অল্পবয়েসী, লম্বা পাতলা সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। যার সঙ্গে সে নানান ধরনের আহ্লাদী করবে। আহ্লাদী করতে তার খুব ভালো লাগে। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে সে আহ্লাদী কী করবে? হেডমাস্টার চেহারার একজন মানুষ। আগে বিয়ে হয়েছে। সেই পক্ষের ছেলে আছে। কে জানে ছেলেও হয়তো বাবার বিয়েতে বরযাত্রী আসবে।

মানুষটার কথাবার্তাও গা জ্বালা ধরনের—শুনুন প্লেইন এন্ড সিম্পল বিয়ে হবে। কোনো অনুষ্ঠান না, কিচ্ছু না। অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমি যেতে চাচ্ছি না।

তুই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে যাবি কী রে গাধা? তোর একটা চক্ষুলজ্জা নেই! দুদিন পরে পরে বিয়ে করছিস!

লায়লা তার বিয়ের খবর কাউকে জানায় নি। কোন লজ্জায় জানাবে? সবাই হাসাহাসি করবে না! হয়তো বলবে—গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? বিয়ের আগেই এত বড় ছেলে?

'ভাইয়া চা নাও।'

তারেক চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বলল, মা-বাবা কেউ তো এখনো আসছে না? মা বোধহয় রাগ করেই বসে আছে। আমাকে গিয়ে রাগ ভাঙিয়ে আনতে হবে। বড়বুবুরই বা ব্যাপারটা কী? সব ঠিকঠাক করে—তাঁরই খোঁজ নেই।

লায়লা জবাব দিল না। তারেক বলল, চা ভালো বানিয়েছিস। একটু কড়া হয়েছে—আরেকটু কড়া হলে ভালো হত। রকিব কি তোর বিয়ের খবর জানে?

'আমি জানি না।'

'হাসানকে বলেছিলাম খবর দিতে। দিয়েছে হয়তো। লায়লা যা আমার জন্যে আরেক কাপ চা আন।'

লায়লা চা আনতে গেল। সেখান থেকেই দেখল হাসান বের হচ্ছে। এই সকালে চা-টা না খেয়ে কোথায় যাচ্ছে। লায়লা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। হাসানকে ডাকবে না ডাকবে না করেও ডাকল, ভাইয়া শোন। যাচ্ছ কোথায়?

'রহমানদের বাড়িতে। তার দাদির অবস্থা নাকি খুব খারাপ। রাতে খবর পাঠিয়েছে যেতে পারি নি। চট করে দেখে আসি।'

'চা খাবে?'

'চা হচ্ছে নাকি? চা হলে দে। তোর মুখ এমন শুকনা লাগছে কেন? রাতে ঘুম হয় নি?'

'না।'

'বিয়ে নিয়ে টেনশান করছিস?'

'তোমরা কেউ টেনশান করছ না, আমি শুধু শুধু টেনশান করব কেন?'

'রাগ করেছিস নাকি?'

'আমি রাগ করব কেন? আমার রাগ করার কী আছে? তুমি ভাইয়ার কাছে বোস আমি চা নিয়ে আসছি।'

লায়লার চোখে আবার পানি আসছে। হাসানকে সরিয়ে দিতে না পারলে সে তার চোখের পানি দেখে ফেলবে। কী দরকার চোখের পানি দেখানোর।

'লায়লা!'

'হুঁ।'

'আমি দেরি করব না। যাব আর আসব—যেতে-আসতে যা সময় লাগে। এই ধর দু ঘণ্টা। তোর কিছু লাগবে?'

'না আমার আবার কী লাগবে?'

'হুট করে বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল—এইজন্যে আর উৎসব হচ্ছে না। এটা নিয়ে মন খারাপ করবি না। উৎসব বড় ব্যাপার না। যার সঙ্গে সারাজীবন থাকবি সেই মানুষটা বড় ব্যাপার। ভদ্রলোককে আমার পছন্দ হয়েছে।'

'ভালো।'

'এখন তুই খুব রেগে আছিস—তোর পছন্দ হবে সবচে বেশি। তুই আমাদের সামনেই ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আহ্লাদী করবি—দেখে রাগে আমাদের গা জ্বলে যাবে।'

'এই নাও তোমার চা।'

'লায়লা আজ সকালে কি তুই আয়নায় নিজেকে দেখেছিস?'

'আয়নায় নিজেকে দেখার কী আছে।'

'তোকে আজ খুবই সুন্দর লাগছে। যা আয়নায় নিজেকে দেখে আয়।'

'ভাইয়া প্লিজ আহ্লাদী করবে না।'

লায়লা তারেকের চায়ের কাপ নিয়ে বের হয়ে গেল। আসলেই আয়নার সামনে আজ দাঁড়ানো হয় নি। হাসান যখন বলেছে তখন একবার নিজেকে দেখতেই হয়। লায়লা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছে, তখন চোখে পড়ল বাসার সামনে ট্যাক্সি থামল। ট্যাক্সিভর্তি মানুষ। বড়বুবু সবাইকে নিয়ে চলে এসেছেন। পেছনে আরেকটা ট্যাক্সি সেখান থেকে মা-বাবা নামছেন। সবার মুখ হাসি হাসি। এ কী! উৎসব শুরু হয়ে গেল নাকি? লায়লার বুকে সামান্য কাঁপন লাগল। ছোটবেলায় ঈদের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই যেমন মনে হত আজ ঈদ এবং বুকে কাঁপন লাগত তেমন কাঁপন।

টগর এবং পলাশ দাদিমা দাদিমা বলে বিকট চিৎকার করছে। বড়বুবু হাতে অনেকগুলো প্যাকেট নিয়ে নামছেন। কে জানে প্যাকেটগুলোতে কী আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আম্বিয়া খাতুন আবারো একটা ভেলকি দেখিয়েছেন। হাতপা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছিলেন। এক সময় শ্বাস নেয়া স্তিমিত হয়ে গেল। সেকান্দর আলি "ও আমার মারে" বলে বিকট চিৎকার দিয়ে উঠতেই আম্বিয়া খাতুন ক্ষীণ গলায় বললেন—গাধাটা চিল্লায় কেন? আম্বিয়া খাতুনের অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল। নিয়মিত শ্বাস পড়তে লাগল। তিনি পানি খেতে চাইলেন। আত্মীয়স্বজনরা দল বেঁধে এসেছিলেন তারা চলে যেতে চাচ্ছিলেন, সেকান্দর আলি বললেন—এখন যাবেন না। মৃত্যুর আগে আগে হঠাৎ শরীরটা ভালো হয়ে যায়। তাই হচ্ছে। আপনারা চলে যাবেন, ঘটনা ঘটে যাবে। আপনাদের মনে থাকবে আফসোস—শেষ সময়ে কাছে থাকতে পারলেন না। আত্মীয়স্বজন বেশিরভাগই থেকে গেলেন। সব অপেক্ষাই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যুর অপেক্ষাও তাই।

হাসান যখন পৌঁছল তখন লোকজনে বাড়ি গমগম করছে। উৎসব উৎসব ভাব। ছোট বাচ্চারা উঠোনে খেলছে। বয়স্করা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করছেন। ট্রেভর্তি চা এসেছে। চা নেয়া হচ্ছে। সবার মধ্যে ঢিলেঢালা ভাব। শুধু সেকান্দর আলি বিরসমুখে বসে আছেন। রাত্রি জাগরণের কারণে তাঁর শরীর খারাপ করেছে। সামান্য হাঁপানির টানও উঠেছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে থাকলে হত। সেটা ভালো দেখায় না। মার এখন তখন অবস্থা আর পুত্র এসি ঘরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে! তাঁর যেসব আত্মীয়স্বজন একটু পর পর তাঁকে বলছে "সেকান্দর তুমি যাও শুয়ে একটু রেস্ট নাও, তোমার দিকে তাকানো যাচ্ছে না"—তারাই তখন নানান কথা ছড়াবে। দরকার কী?

হাসানকে দেখে সেকান্দর আলি বললেন, কী খবর হাসান?

হাসান বলল, জ্বি চাচা ভালো।

'মার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তোমাকে দেখতে চাচ্ছিলেন। এসেছ ভালো করেছ। যাও দেখা দিয়ে এস।'

'রহমান কোথায়?'

'ওকে টঙ্গী পাঠিয়েছি। একজন কাউকে তো ব্যবসাপাতি দেখতে হবে।'

'জ্বি দেখতে তো হবেই।'

'শোন হাসান, তোমার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছি। গ্রামের দিকে যেতে হবে। স্কুলমাস্টারি। শিক্ষকতা পেশা হিসেবে খারাপ না। গ্রামে থাকবে ফ্রেশ আলোবাতাস, ফ্রেশ সবজি। সবাই শহর শহর করলে গ্রামগুলো চলবে কীভাবে?'

'জায়গাটা কোথায়?'

'আমাদের গ্রামের বাড়িতে। আমারই দেয়া আমার মায়ের নামে স্কুল—আম্বিয়া খাতুন গার্লস হাইস্কুল।'

'ও আচ্ছা।'

'নদীর পাড়ে স্কুল। অতি মনোরম পরিবেশ। মেয়েদের হোস্টেল আছে। শিক্ষকদের থাকার জায়গা আছে। বেতন যা দেয়া হয় খারাপ না। সরকারি ডিএ তো আছেই। আনম্যারিড কোনো শিক্ষক ওই স্কুলে দেয়া হয় না—তোমার বেলায় নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। গ্রামে যাবে?'

'জ্বি ভেবে দেখি।'

'হ্যাঁ ভেবে দেখ। আর যদি যাবার সিদ্ধান্ত নাও তাহলে বিয়ে করে ফেল। বউ নিয়ে থাকবে। সুখে থাকবে। তোমরা ঢাকা শহর ঢাকা শহর কর। কী আছে এই শহরে। পলিউশন। বেবিট্যাক্সির ধোঁয়া খেয়ে মানুষের গড় আয়ু কমেছে পাঁচ বছর। ঠিক না?'

'জ্বি।'

'আচ্ছা যাও মার সঙ্গে দেখা করে আস। একটা কথা শোন—মা তোমার জন্যে এত ব্যস্ত কেন?'

'জানি না চাচা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝলে হাসান, মার এই ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝি না। আমি অতি মাতৃভক্ত ছেলে। মা যা বলেছে করেছি। স্কুল বানাতে বলেছে, বানিয়েছি। শীতের সময় আসে মা বলে ওরে গরিব-দুঃখীকে শীতের কম্বল দে, পুরোনো কম্বল দিবি না—নতুন কম্বল। দেই নতুন কম্বল। অমুক এতিমখানার ছেলেপুলেদের ঈদের কাপড় দে। এতিমখানায় কি ছেলেপুলে একটা-দুটা থাকে? শত শত ছেলেপুলে। উপায় কী—মাতৃআজ্ঞা; তাদের দেই কাপড়—অথচ দেখ আমাকে সহ্যই করতে পারেন না। আচ্ছা তুমি যাও দেখা করে আস। চাকরির ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিলে আমাকে জানাবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

হাসান ভেতরের দিকে রওনা হল।

আম্বিয়া খাতুনকে আধশোয়া করে বসানো হয়েছে। অল্পবয়েসী একটা মেয়ে চামচে করে তাঁকে স্যুপ খাইয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি তাকে দেখে খুবই বিরক্তমুখে তাকাল। আম্বিয়া খাতুন বললেন, কী রে হাসান তোর সময় হল শেষ পর্যন্ত?

'কেমন আছেন দাদিমা?'

'ভালো আছি। দেখছিস না স্যুপ খাচ্ছি। তোর চাকরি বাকরি কিছু হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'যার যা ক্ষমতা আল্লাহপাক তাকে তাই দেন। যার ক্ষমতা চোর হবার তাকে তিনি চোর বানান। যার কিছুই করার ক্ষমতা নেই তাকে কিছুই বানান না—সে তোর মতো পথে পথে ঘোরে। বুঝেছিস?'

'জ্বি।'

'সেকান্দরকে বলেছি তোর চাকরির জন্যে।'

'দাদিমা আমার চাকরির জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'ব্যস্ত তোকে কে বলেছে? তোর চাকরি হলেই কী আর না হলেই কী? যা আমার সামনে থেকে। যাবার আগে সেকান্দরের সঙ্গে দেখা করে যাবি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোকে স্কুলের চাকরি গছিয়ে দিতে চাইবে। খবরদার নিবি না। কোনোমতে একটা চালাঘর তুলে দিয়েছে—না আছে ছাত্র না আছে কিছু। মাস্টাররা বেতন পায় না। বুঝেছিস?'

'জ্বি।'

'বিয়েটিয়ে করবি না?'

হাসান চুপ করে রইল।

'না করাই ভালো। বউ তো আর তোর মতো বাতাস খেয়ে থাকবে না। তোকে না চলে যেতে বললাম, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আজকাল কি কানেও শুনতে পাস না?'

যে মেয়েটি স্যুপ খাওয়াচ্ছিল সে শুকনো গলায় বলল, আপনি এখন যান। উনাকে আর বিরক্ত করবেন না। স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছি।

হাসান বের হয়ে এল। এই বৃদ্ধার স্নেহের কোনো কারণ সে জানে না। কোনোদিন জানবেও না। ঘর থেকে বের হবার সময় হঠাৎ তার মনে হল, এই বৃদ্ধার সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। এ রকম মনে হবার কোনো কারণ নেই তবু মনে হল। গুরুতর অসুস্থ যে কোনো মানুষের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এ রকম অনুভূতি হয়—যার আসলে তেমন গুরুত্ব নেই।

সেকান্দর সাহেব বললেন, হাসান চলে যাচ্ছ নাকি?

'জ্বি।'

'মা কী বলল?'

'তেমন কিছু বলেন নি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। স্কুলের ব্যাপারে কোনো ডিসিশান নিলে জানাবে। স্কুলের চাকরি খারাপ না। স্যাটিসফেকশন আছে। একটা ভালো কাজ করছ তার স্যাটিসফেকশন।'

'জ্বি।'

'সন্ধ্যার দিকে সময় পেলে একবার এসো। মার জন্যে খতমে শেফা পড়াচ্ছি। বাদ মাগরেব দোয়া হবে।'

'বাসায় একটা কাজ আছে চাচা।'

'কাজ থাকলে আসার দরকার নেই।'

সেকান্দর আলি বিমর্ষমুখে সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে তিনি কোনো স্বাদ পাচ্ছেন না।

লায়লার বিয়ে হয়ে গেল।

তার মন খারাপ ভাবটা বিয়ের পর পুরোপুরি কেটে গেল। যতটা দায়সারা বিয়ে হবে বলে সে ভেবেছিল দেখা গেল বিয়েটা সে রকম দায়সারা হয় নি। ওরা বিয়ের শাড়িই এনেছে তিনটা। একটার চেয়ে আরেকটা সুন্দর। এর মধ্যে একটা নীল শাড়ি দেখে লায়লা মোহিত হয়ে গেল। সে ফিসফিস করে বলল, ভাবী নীল শাড়িটা কেমন লাগছে?

বিয়ে উপলক্ষে রীনা এসেছে। সে বেশ স্বাভাবিকভাবেই আছে। টগর–পলাশ মাকে দেখে বেশ স্বাভাবিক আছে। তাদের মধ্যে বাড়তি কোনো আবেগ বা উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে না।

রীনা বলল, শাড়িটা তো খুবই সুন্দর।

'এখন বল শাড়ি কোনটা পরব?'

'সবচে সুন্দরটাই পর। নীলটা পর।'

'কিন্তু ভাবী লাল শাড়ি ছাড়া বিয়ে কেমন কেমন জানি লাগছে।'

'তাহলে থাক লালটাই পর। বিয়ে পড়ানো হোক—তারপর বদলে নীলটা পরলেই হবে।'

গায়ে হলুদ হয় নি বলে লায়লার মনে যে খুঁতখুঁতানি ছিল সেটা দূর হয়েছে—রীনা দুপুরে এসেই গায় হলুদের ব্যবস্থা করেছে। লায়লা খুবই আপত্তি করছিল, কী ছাতার বিয়ে তার আবার গায়ে হলুদ! ভাবী তুমি বরং কিছু শুকনা মরিচ পিষে গায়ে ডলে দাও। গায়ে মরিচ হয়ে যাক!

রীনা ধমক দিয়েছে—ঝামেলা করবে না তো। এস বলছি।

লায়লা আর ঝামেলা করে নি। খুশি মনেই গিয়েছে।

বিয়ের শাড়ি পরানোর পর লায়লার খুব ইচ্ছা করতে লাগল কোনো একটা পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধে আসতে। ভুরুও প্লাক করা দরকার। ভুরু প্লাক সে নিজে নিজে করে। বিউটি পার্লারে ওরা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে করবে। কিন্তু কথাটা সে বলবে কাকে? বলতে লজ্জাও লাগবে। তার বান্ধবীরা কেউ থাকলে বলত। কাউকেই আসতে বলা হয় নি। এখন মনে হচ্ছে আসতে বললে ভালো হত। নীল শাড়িটা সবাইকে দেখাতে ইচ্ছা করছে।

বরযাত্রীদের কাজি নিয়ে আসার কথা। তারা আনতে ভুলে গেছেন। গাড়ি পাঠানো হয়েছে কাজি আনতে। লায়লা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। মাথার চুল বাঁধাটা নিয়ে তার মনটা খুঁতখুঁত করছে। আচ্ছা লজ্জার মাথা খেয়ে সে কি ভাবীকে বলে ফেলবে? ভাবী আবার তাকে বেহায়া ভাববে না তো? লায়লা ক্ষীণস্বরে ডাকল, ভাবী।

রীনা বলল, কী ব্যাপার বল? লায়লা তোমাকে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে। আয়নায় দেখেছ নিজেকে?

'চুল বাঁধাটা মনে হয় ঠিক হয় নি ভাবী। কেমন ফুলে ফুলে আছে।'

রীনা বলল, লায়লা চল একটা কাজ করি। এখনো তো হাতে সময় আছে চল কোনো পার্লারে গিয়ে চুল বেঁধে আসি।

'যাব কী করে ভাবী? বেবিট্যাক্সি করে? বিয়ের শাড়ি পরে বেবিট্যাক্সি করে যাওয়া বিশ্রী দেখাবে না?'

'বেবিট্যাক্সি করে যাব কেন? তোমার বরের গাড়ি নিয়ে যাব। তোমার বরের গাড়ি তো তোমারই গাড়ি।'

'দেখ ভাবী তুমি যা ভালো বোঝ। কী ছাতার বিয়ে—এর জন্যে আবার পার্লারে গিয়ে চুল বাঁধা!'

'লায়লা তোমার গয়নাগুলো দেখেছ। একটা নীল পাথরের সেটও আছে। তোমার নীল শাড়ির সঙ্গে খুব মানাবে।'

'ওইসব তুমি দেখ ভাবী, আমার কিচ্ছু দেখতে ইচ্ছে করছে না।'

দেখতে ইচ্ছা করছে না বললেও লায়লা পাথরের সেটটা আগেই দেখেছে। উফ! এত সুন্দর!

যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সেই মানুষটাকেও সে এক ফাঁকে দেখেছে। বাহ্! পায়জামা-পাঞ্জাবিতে খুব মানিয়েছে! আর আগে একবার দেখেছিল শার্ট-প্যান্ট পরা—তখন এত ভালো লাগে নি। আশ্চর্যের ব্যাপার—লোকটার ছেলের জন্যেও তার মায়া লাগছে। বাচ্চা একটা ছেলে—মার ভালবাসা পাচ্ছে না। ছেলেটাকে সে অবশ্যই আদর করবে। সে বেচারা তো কোনো দোষ করে নি। তাকে এরা কোথায় একা একা রেখে এসেছে কে জানে। মনে করে নিয়ে এলেই হত। লোকে কী বলবে? বলুক। লায়লা মানুষের কথার ধার ধারে না।

লায়লার বান্ধবীরাও শেষ পর্যন্ত বিয়েতে এসে যুক্ত হল। বিউটি পার্লার থেকে লায়লা তাদের টেলিফোন করে দিয়েছিল। দুজনের বাসায় টেলিফোন ছিল না। লায়লা চিঠি লিখে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। আশ্চর্য এই গাড়িটা তাদের ভাবতেও ভালো লাগছে। সে যখন ড্রাইভারকে ঠিকানা দিয়ে বলল, এই দুজনকে আমার চিঠিটা দিয়ে আনতে পারবেন? ড্রাইভার বলেছে, অবশ্যই পারব ম্যাডাম। ড্রাইভারের মুখে ম্যাডাম শব্দটা শুনতে এত ভালো লাগল!

বর-কনে চলে যাবার পর মনোয়ারা রীনাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, শোন বউমা তুমি যে এসেছ আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি দশ রাকাত নফল নামায পড়ে তোমার জন্যে দোয়া করেছি। মা তুমি কি থাকবে না চলে যাবে?

'আমি চলে যাব। হাসানকে বলেছি ও পৌঁছে দেবে।'

'এক কাজ করলে কেমন হয় মা, আমি তারেককে ডাকি ও কানে ধরে তোমার সামনে দশবার উঠবোস করুক।'

'ছিঃ মা! কী বলছেন এসব!'

'ভুল বলছি না। ঠিকই বলছি। ও কানে ধরে উঠবোস করলে তোমার রাগটা একটু পড়বে।'

'মা এইসবের কোনো দরকার নেই।'

'তারেক যে কাণ্ড করেছে তারপরে তোমাকে আমি থাকতেও বলতে পারি না। বুড়ো মার একটা কথা তুমি রাখ। আজ রাতটা থাক কাল সকালে চলে যেও।'

'একটা রাত থাকলে কী হবে?'

'গাধাটার সঙ্গে কথা বল। কথা বলে তোমার যদি মন গলে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে মা আজ রাতটা থেকে যাচ্ছি।'

'একটু বস আমার সামনে। তোমার সঙ্গে গল্প করি। লায়লাকে কেমন মনে হল মা—খুশি?'

'হ্যাঁ, খুব খুশি।'

'একেবারে গাধা মেয়ে। শাড়ি-গয়না দেখে এলিয়ে পড়েছে। যে যা চায় আল্লাহ তাকে তাই দেন। ও শাড়ি-গয়না চেয়েছিল, আল্লাহ তাকে শাড়ি-গয়না দিয়েছেন। আমার একেকটা ছেলেমেয়ে হয়েছে একেক পদের।'

তারেক শুয়ে পড়ছিল। রীনা ঘরে ঢুকতেই উঠে বসে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, একটা পান দাও তো।

যেন কিছুই হয় নি সব আগের মতো আছে। রীনা পান এনে দিল। তারেক হাই তুলতে তুলতে বলল, বাতি নিভিয়ে আস। তুমি ছিলে না মশারি তুলে ফেলেছিলাম। মশারি খাটিয়েছি।

'ভালো।'

'মশা অবশ্যি নেই বললেই হয়। কয়েকদিন ঝড় হয়েছে তো বেশিরভাগ মশার পাখা ঝড়ে ছিঁড়ে গেছে ওরা উড়তে পারে না।'

'ভালো।'

রীনা বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, লাবণী কেমন আছে?

'ভালো আছে। ওর মেয়েটার নিউমোনিয়ার মতো হয়েছে। খুবই টেনশানে আছি। নিউমোনিয়া খারাপ ধরনের অসুখ। চিকিৎসার চেয়ে যত্নটা বেশি লাগে। লাবণী অফিস নিয়ে ব্যস্ত, বাচ্চাটার যত্ন হচ্ছে কি না কে জানে।'

'ডাক্তার দেখছে না?'

'দেখছে। রসিফিন দিচ্ছে। রসিফিন ভালো এন্টিবায়োটিক। নিউ জেনারেশন ড্রাগ। ঠিকমতো ওষুধ পড়ছে কি না কে জানে।'

'তুমি চলে যাও। দেখেশুনে ওষুধ দেবে।'

'যাব। বৃহস্পতিবার নাইটকোচে চলে যাব। শুক্র-শনি ছুটি আছে। নাইটকোচগুলো ভালো করেছে। পাঁচ ঘণ্টা লাগে যেতে। গাড়িতে টয়লেটের ব্যবস্থা আছে।'

তারেক মশারির ভেতর থেকে বের হবার উপক্রম করল। রীনা বললা, যাচ্ছ কোথায়?

'একটা সিগারেট খেয়ে আসি। তুমি তো আবার সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পার না।'

তারেক চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। আগুনের ফুলকি উঠছে-নামছে। রীনা তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। এই মানুষটাকে ছেড়ে সে কাল ভোরে চলে যাবে। কিন্তু তার কী প্রচণ্ড ইচ্ছাই না করছে মানুষটার সঙ্গে থাকতে! একটা জীবন সুখে-দুঃখে পার করে দিতে!

রীনা চোখের জল সামলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

AMARBOI.COM

২৪

'আপনার নাম?'

'জ্বি আমার নাম হাসান। হাসানুজ্জামান।'

'আপনি কী করেন?'

'কিছু করি না—বেকার বলতে পারেন। সম্প্রতি অবশ্য একটা চাকরি পেয়েছি।'

'কী চাকরি?'

'স্কুল টিচারের চাকরি। ঢাকার বাইরে।'

'আপনি ধূমপান করেন?'

'জ্বি।'

'নিন একটা সিগারেট খান।'

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। হাসান সিগারেট নিল। তার অস্বস্তি বাড়ছে। তাকে থানায় ডেকে আনার কারণ স্পষ্ট হচ্ছে না। তারাও ভেঙে কিছু বলছেন না। ওসি সাহেবকে বেশ ভদ্র মনে হচ্ছে। পুলিশের চাকরি না করে এই ভদ্রলোক কোনো কলেজের শিক্ষকতাও করতে পারতেন। খাকি পোশাকে তাঁকে মানাচ্ছে না।

'চা খাবেন?'

'জ্বি না। আমাকে কেন ডেকেছেন দয়া করে বলবেন?'

'আপনার ছোট ভাই আছে না—রকিব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জ্বি।'

'তার সঙ্গে কি আপনাদের যোগাযোগ নেই?'

'যোগাযোগ থাকবে না কেন? আছে তো। মাঝখানে বেশ কিছুদিনের জন্যে ইন্ডিয়া গিয়েছিল।'

'শেষ কবে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

শেষ কবে দেখা হয়েছে হাসান মনে করতে পারল না। লায়লার বিয়েতে আসে নি এটা মনে আছে। তাকে খবর দেয়া হয়েছিল, সে নিজেই খবর দিয়ে এসেছে।

'দিন তারিখ বলতে হবে না। মোটামুটি একটা সময় বললেই হবে।'

'শেষবার সে এসেছিল খুব সম্ভব দিন পনের আগে। কেন বলুন তো?'

'এর মধ্যে সে কি কোনো খবর পাঠিয়েছে?'

'জ্বি না। পাঠালেও আমি জানি না।'

'সে কি বাসায় আপনাদের কারো কাছে টাকা-পয়সা রাখতে দিয়েছে?'

'জ্বি না।'

'এমন কি হতে পারে যে কারো কাছে রাখতে দিয়েছে আপনি তা জানেন না? ব্যাপারটা গোপনে ঘটেছে।'

'আমি আসলে কিছু বুঝতে পারছি না। এই প্রশ্নগুলো আপনি কেন করছেন জানতে পারলে আমার উত্তর দিতে সুবিধা হত।'

'চা দিতে বলি—এক কাপ খান। চা খেতে খেতে কথা বলি। দিতে বলব?'

'বলুন।'

ওসি সাহেব চা দিতে বললেন। হাসান খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। রকিব কি কোনো ঝামেলায় পড়েছে? ঝামেলাটা কোন ধরনের? বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার কোনোই কারণ নেই। রকিব রগচটা কিন্তু ভালো ছেলে।

'চা নিন হাসান সাহেব।'

হাসান চা নিল। ওসি সাহেব বললেন, আমি বেশ কিছুদিন আগে একজন এস.আইকে পাঠিয়েছিলাম। ও আপনার বাবার সঙ্গে রকিব সম্পর্কে কথা বলেছিল। এক ধরনের সাবধানবাণী বলতে পারেন। উনি কি ব্যাপারটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করেন নি?

'আমাকে কিছু বলেন নি। মনে হয় অন্য কারো সঙ্গেও বলেন নি। বাবা কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। সমস্যার কথা একেবারেই বলেন না।'

'আপনার ছোট ভাই রকিব বাজে ধরনের সমস্যায় জড়িত ছিল। তার মধ্যে একটা হচ্ছে মানি এক্সটরশন?'

'কী বললেন?'

'বিত্তবান লোকজন আটকে রেখে টাকা চেয়ে পাঠানো।'

'কী বলছেন এসব?'

'তার বিরুদ্ধে একটা হত্যা মামলাও আছে।'

'আপনাদের নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'জ্বি না ভুল হচ্ছে না।'

'আমার মনে হয় শত্রুতাবশত তার সম্পর্কে এই জাতীয় কথা বলা হচ্ছে। সে ছাত্র রাজনীতি করে—তাকে বিপদে ফেলার জন্যে এইসব হয়তো ছড়াচ্ছে। সে খুবই ভালো ছেলে। পড়াশোনায় ভালো। চিকেন পক্স নিয়ে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়েছিল—তারপরেও চারটা লেটার নিয়ে এস.এস.সি. পাস করেছিল।'

'বুঝলেন হাসান সাহেব—দেশের পরিবেশ এখন এমন রাতারাতি একজন ভালোমানুষ নষ্টমানুষ হয়ে যায়।'

'নষ্ট হবার একটা সীমা থাকে। সীমার নিচে নষ্ট হওয়া সম্ভব না। আপনি কী করে বললেন রকিব হত্যা মামলার আসামি?'

'আপনার চা কি শেষ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'চলুন আমার সঙ্গে?'

'কোথায় যাব?'

'আপনি একটা ডেডবডি আইডেনটিফাই করবেন।'

হাসান হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকাল। খাকি পোশাক পরা এই মানুষটা এইসব কী বলছে। সে ডেডবডি আইডেনটিফাই করবে কেন? কার ডেডবডি?

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'বস্তায় ভরে পুকুরে ফেলে দেয়া ডেডবডি। চেনার অবস্থা না। পচেগলে গিয়েছে। নিকট আত্মীয়স্বজনরা মাথার চুল দেখে, জামাকাপড় দেখে হয়তো আইডেনটিফাই করতে পারবেন। এই জন্যেই আপনাকে আনা।'

'আপনার কী করে ধারণা হল এটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি?'

'আপনার ভাইয়ের একজন সহযোগীকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। তার স্বীকারোক্তি থেকে জেনেছি। সে বলেছে রকিবকে ছুরি দিয়ে জবাই করা হয়—তারপর ডেডবডি ইটসহ বস্তায় ভরে পানিতে ফেলে দেয়া হয়।'

হাসানের মনে হল—খাকি পোশাক পরা এই মানুষটা আসলে মানুষ না, পিশাচ। এর হৃদয় বলে কিছু নেই। সে নির্বিকারভাবে কীভাবে কথাগুলো বলছে? তার মন বলে কিছু নেই? তার কি বাসায় ভাইবোন নেই? ছেলেমেয়ে নেই? সে কি স্ত্রীর সঙ্গে বসে টিভিতে নাটক দেখে না? ঘন বর্ষায় কি তার বাড়িতে খিচুড়ি ইলিশ মাছ রান্না হয় না?

'হাসান সাহেব!'

'জ্বি।'

'নিন আরেকটা সিগারেট নিন।'

'জ্বি না সিগারেট নেব না।'

'তাহলে চলুন।'

'কোথায় যাব?'

'মেডিকেল কলেজে। ডেডবডি মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। আপনি আইডেনটিফাই করার পর সুরতহাল হবে। যদিও সুরতহাল অর্থহীন। তবুও নিয়ম রক্ষার জন্যে করতে হবে।'

'আপনি যে ডেডবডি আমাকে দেখাতে যাচ্ছেন সেটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি না। আপনারা মস্ত বড় ভুল করছেন।'

'ভুল হতেও পারে। ভুল হচ্ছে কি না তা জানার জন্যেই আপনাকে নিয়ে যাওয়া।'

লাশের পাশে একজন ডোম দাঁড়িয়ে। তার নাক গামছা দিয়ে বাঁধা। তার হাতে একটা লাঠি। সে লাঠি দিয়ে উল্টেপাল্টে দেখাচ্ছে।

ওসি সাহেব বললেন, দেখলেন!

হাসান জবাব দিল না।

'দাঁতগুলো দেখুন। উপরের পাটির প্রথম দাঁতটা ভাঙা। হাতের রিস্টওয়াচটা দেখুন।'

হাসান বলল, এটা আমার ভাইয়ের ডেডবডি না।

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে—চলুন যাই।'

ঘর থেকে বের হয়েই হাসান বলল, আমার মাথা ঘুরছে শরীর কেমন যেন করছে। আমি বমি করব।

'বারান্দায় গিয়ে বমি করুন। কোনো অসুবিধা নেই। আমি পানি এনে দিচ্ছি।'

হাসান মুখ ভর্তি করে বমি করল। তার মনে হচ্ছে শরীরের ভেতরটা পুরোপুরি মুখ দিয়ে বের হয়ে যাবে। সে হয়ে যাবে উল্টো মানুষ। শরীরের বাইরের অংশ চলে যাবে ভেতরে। ভেতরের অংশ চলে আসবে বাইরে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'এখন কি একটু ভালো বোধ করছেন?'

'জ্বি।'

'নিন পানি দিয়ে মুখ ধোন। একটা পান খান।'

'আমি কি চলে যেতে পারি?'

'জ্বি পারেন। চলুন আমি আপনাকে একটা রিকশা করে দি। পুলিশের গাড়ি করে পাঠাতে পারতাম সেটা ঠিক হবে না। প্রতিবেশীরা নানান কথা বলতে পারে।'

'আপনাকে রিকশা করে দিতে হবে না। ধন্যবাদ।'

ওসি সাহেব বললেন, কুৎসিত একটা দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি—সামান্য ভদ্রতা আমাকে করতে দিন।

'ওসি সাহেব!'

'জ্বি।'

'ডেডবডিটা আমার ছোট ভাইয়ের।'

'আমি জানি।'

'আমি কাউকে বলতে চাচ্ছি না। কাউকে না। বাবা–মা কাউকে না। তাতে কোনো অসুবিধা আছে?'

'অসুবিধা নেই।'

'সবাই জানবে একটা ছেলে ছিল, হারিয়ে গেছে। কত মানুষ তো হারিয়ে যায়।'

'তা যায়।'

'আমার ভাইয়ের কি জানাজা হবে? কবর হবে?'

'হ্যাঁ হবে। আপনি কাঁদবেন না।'

'ওসি সাহেব আপনার নামটা কি জানতে পারি?'

'কাকতালীয় ব্যাপার হচ্ছে আমার নামও রকিব। হাসান সাহেব কাঁদবেন না প্লিজ। আর ভাই শুনুন—আই অ্যাম সরি।'

জ্বরে হাসানের গা পুড়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে কেউ নেই। তারেক গিয়েছে চিটাগাং। রীনা এসে টগর–পলাশকে নিয়ে গেছে। লায়লা তার শ্বশুরবাড়িতে। হাসানের মা তাঁর বড় মেয়ের বাড়িতে। শুধু হাসানের বাবা আশরাফুজ্জামান সাহেব আছেন। তবে এই মুহূর্তে তিনি বাড়িতে নেই। চায়ের স্টলে বসে আছেন। গরম গরম জিলাপি ভাজা হচ্ছে। তিনি জিলাপি খাচ্ছেন। রসে তার মুখ মাখামাখি। এত ভালো জিলাপি তিনি অনেকদিন পর খাচ্ছেন। মাখনের মতো মোলায়েম হয়েছে। মুখে দেয়ামাত্র গলে যাচ্ছে।

কমলার মা গোঙানির শব্দ শুনে হাসানের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ভীত গলায় ডাকল, ভাইজান?

হাসান চোখ মেলল। তার চোখ টকটকে লাল। হাসান ভারি গলায় বলল, কে?

কমলার মা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ভাইজান আমি।
হাসান আবারো বলল, কে?
'ভাইজান আমি কমলার মা। আপনের কী হইছে ভাইজান?'
'মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে কমলার মা।'
'খুব বেশি?'
'হ্যাঁ খুব বেশি।'

হাসান চোখ বন্ধ করে ফেলল। সে জেগে আছে অথচ সেই বিশ্রী স্বপ্নটা আবার শুরু হয়েছে। একদল হাঁস হেঁটে যাচ্ছে। সে হাঁটছে হাঁসের সঙ্গে। হাঁসরা শামুক গুগলি জাতীয় খাবার খাচ্ছে। সেও খাচ্ছে। ঝিনুকের খোল খুলতে তার কষ্ট হচ্ছে। একটা হাঁস তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। হাঁসটার চোখ মানুষের চোখের মতো বড় বড়।

জেগে থেকেই সে এই দুঃস্বপ্নটা দেখছে কেন? তার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? এই দুঃস্বপ্নের কথা সে তিতলী ছাড়া আর কাউকে বলে নি।

স্বপ্নের কথা শুনে তিতলী বলেছিল খিচুড়ি দিয়ে ভুনা হাঁসের মাংস খেলে তোমার হাঁসের স্বপ্ন দেখার এই রোগ সেরে যাবে। শীতকাল আসুক আমি নিজে তোমাকে ভুনা হাঁসের মাংস খাওয়াব। তুমি কি জান আমি খুব ভালো রাঁধুনী?

'না জানি না।'

'আমার অনেক কিছুই তুমি জান না। একেক করে জানবে আর মুগ্ধ হবে। এই পৃথিবীতে মটরশুঁটি দিয়ে কই মাছের ঝোল আমার চেয়ে ভালো কেউ রাঁধতে পারে না। শীতকাল আসুক তোমাকে মটরশুঁটি আর কই মাছের ঝোল খাওয়াব।'

'আচ্ছা।'
'মাছের ঝোল রান্নার গোপন কৌশল কি তুমি জান?'
'জানি না।'
'জানতে চাও?'
'না।'

'জানতে না চাইলেও বলব। মাছের ঝোল রান্নার আসল কৌশল হল—অনেকক্ষণ ধরে মসলা কষাতে হবে। মাছ ছাড়ার আগে ক্রমাগত মসলা কষাবে। চামচ নাড়তে নাড়তে হাত ব্যথা হয়ে যাবে তবু চামচ নাড়ানো বন্ধ করবে না। বুঝেছ?'

'হুঁ।'
'শীতকাল আসতে কত দেরি? এখন কোন কাল? বর্ষা শেষ হয়ে গেছে না?'
হাসান চোখ মেলল।
কমলার মা বলল, ভাইজান মাথাত পানি ঢালমু?
হাসান বলল, না।
'যন্ত্রণা কি আরো বাড়ছে ভাইজান?'
'হুঁ।'
'মাথা বিষের বড়ি খাইবেন?'
'না। তুমি এখন যাও।'

হাসান চোখ বন্ধ করছে না। চোখ বন্ধ করলেই হাঁসের পাল চলে আসবে। চুড়ির শব্দ হচ্ছে। কে এসে চুড়ি পরে? তিতলী না তো? হাসান জানে কেউ নেই তারপরেও বলল, কে তিতলী! আশ্চর্য ব্যাপার। মাথার ভেতরে তিতলী কথা বলে উঠল।

'হুঁ।'
'কেমন আছ?'
'ভালো।'

'তোমাকে অনেক দিন থেকে মনে মনে খুঁজছি।'

'কেন?'

'ওই যে একটা গান করেছিলে বুড়িগঙ্গায় ওই গানের লাইনগুলো কী?'

'আমি তো গান করি নি।'

'তিতলী শোন!'

'শুনছি।'

'আমি খুব একটা অন্যায় করেছি। তোমাকে বলা হয় নি।'

'বল।'

'নাদিয়া এত ভালো রেজাল্ট করেছে, ওকে কনগ্রাচুলেশনস জানানো হয় নি। আমি ওর জন্যে একটা গিফট কিনে রেখেছিলাম। সেই গিফটটাও তাকে দেয়া হয় নি।'

'একদিন বাসায় গিয়ে ওকে দিয়ে এসো।'

'তুমি রাগ করবে না তো?'

'আমি রাগ করব কেন?'

'তিতলী!'

'বল শুনছি।'

'হাঁসের স্বপ্নটা আমি এখনো দেখি।'

'ও আচ্ছা।'

'স্বপ্নটা দেখার সময় মাথায় খুব যন্ত্রণা হয়।'

'ও আচ্ছা।'

'তিতলী আমার মনটা সারাক্ষণ খুব খারাপ থাকে।'

'ও আচ্ছা।'

'তুমি কি জান আমি এখনো মাঝে মাঝে তোমাদের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি?'

'ও আচ্ছা।'

'কয়েকদিন আগে তোমাদের কলেজে গিয়েছিলাম। মনের ভুলে চলে গিয়েছি।'

'ও আচ্ছা।'

'এখন আমার মাথায় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'ও আচ্ছা।'

আশরাফুজ্জামান বাড়িতে ফিরলেন রাত ন'টায়। তিনি ছেলেকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কী হয়েছে হাসানের? তিনি ভীত গলায় বললেন, তোর কী হয়েছে রে? তোর চোখ এত লাল কেন?

হাসান লাল চোখে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না।

২৫

তিতলী লক্ষ্য করল শওকতের বাঁ গাল খানিকটা ফোলা। সে কিছুক্ষণ পরপর গালে হাত দিচ্ছে। তাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। বেশিরকম চিন্তিত হলে শওকত মাথার চুল টানে। এখন মাথার চুলও টানছে। চুল এলোমেলো হয়ে আছে। চিন্তিত হবার মতো কোনো কারণ কি ঘটেছে? পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে। ট্রাভেলার্স চেকভর্তি মানিব্যাগ খোয়া গেছে? তিতলী বসে আছে। কাঠমণ্ডু এয়ারপোর্টে। সে কৌতূহল নিয়ে শওকতকে লক্ষ্য করছে। সমস্যায় যে সে পড়েছে তা তাকে দেখে বোঝা যায়। মানুষটার একটা বড় গুণ হচ্ছে যত সমস্যাতেই পড়ুক সে ধৈর্য হারায় না। খুব বেশি হলে মাথার চুল টানে। চুল টানারও কি কোনো বিশেষ ভঙ্গি আছে? টেনশান বেশি

হলে মাথার সামনের চুল টানা। টেনশান কম হলে পেছনের চুল টানা জাতীয় কিছু। তিতলী এমনভাবে মানুষটাকে কখনো লক্ষ্য করে নি। প্রয়োজন বোধ করে নি। এখনো প্রয়োজন বোধ করছে না।

শওকত বড় একটা পেপার গ্লাস নিয়ে তিতলীর দিকে আসছে। তার ভুরু কুঁচকে আছে। চিন্তা মনে হয় আরো বেড়েছে।

'তিতলী নাও পেপসি খাও।'

তিতলী গ্লাস হাতে নিল। তার পেপসি খেতে ইচ্ছে করছে না—মানুষটা এত আগ্রহ করে এনেছে, না খেলে ভালো দেখায় না। একবারের জন্যে হলেও গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়ানো দরকার। তারপর হাতে নিয়ে বসে থাকলেই হবে।

তিতলী বলল, কোনো সমস্যা হয়েছে?

'না। তেমন কিছু না। আমার সুটকেসটা আসে নি। ওরা বলছে এক ঘণ্টা পর রয়েল নেপাল এয়ারলাইন্‌সের একটা প্লেন আসবে। সুটকেসটা নাকি সেখানে। অপেক্ষা করা ছাড়া পথ দেখছি না। তোমার বোধহয় চুপচাপ বসে থাকতে খারাপ লাগছে।'

'খারাপ লাগছে না। তোমার গাল ফোলা। কী হয়েছে?'

'হঠাৎ করে দাঁত ব্যথা শুরু হয়েছে।'

'বেশি?'

'হ্যাঁ বেশি। হোটেলে গিয়ে পেইনকিলার টিলার খেতে হবে।'

'আমার কাছে প্যারাসিটামল আছে।'

'প্যারাসিটামলের স্টেজ পার হয়ে গেছে। তুমি বস, আমি হোটেলের খোঁজ নিই। গল্পের বইটই কিছু এনেছ? বসে বসে পড়।'

'গল্পের বই লাগবে না।'

শওকত চিন্তিতমুখে হোটেল ইনকোয়েরির দিকে যাচ্ছে। এয়ারপোর্ট থেকে তাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাংলাদেশ এম্বেসির এক ভদ্রলোকের আসার কথা। হোটেল বুকিং তাঁরই করে রাখার কথা। তিনি আসেন নি। এম্বেসিতে টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। চারটা বাজে। অফিস আওয়ার্স শেষ। হোটেল রিজার্ভেশনের সমস্যা হয়তো হবে না। এখন ট্যুরিস্ট সিজন না। ভরা বর্ষায় কেউ নেপাল বেড়াতে আসে না। হোটেলের চেয়েও বেশি জরুরি—একজন ডাক্তার খুঁজে পাওয়া। দাঁতের ব্যথা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। মাথা দপ দপ করছে। নেপাল এয়ারলাইন্‌সে সুটকেস না এলে ভালো সমস্যা হবে। তার নিজের সব কাপড় ওই সুটকেসে। সুটকেস পাওয়া না গেলে রেডিমেড শার্ট-প্যান্ট থেকে শুরু করে টুথপেস্ট, টুথব্রাশ সবই কিনতে হবে।

নেপাল এয়ারলাইন্‌সের ফ্লাইট দু ঘণ্টা দেরি করে এল। সেখানে সুটকেস নেই। শওকতের গাল আরো ফুলেছে। মনে হচ্ছে জ্বর এসে গেছে। বাইরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। মুষলধারে বৃষ্টি। পাহাড়ি অঞ্চল বলেই কি বৃষ্টির ফোঁটা এত বড়?

এম্বেসির ভদ্রলোকের নাম সোবাহান। তিনি শেষ পর্যন্ত এসেছেন। ভদ্রলোক বিমানের টাইমিঙে গণ্ডগোল করেছেন। তবে ভদ্রলোক করিতকর্মা। নগরকোটে হোটেল বুকিং নিয়ে রেখেছেন। কাঠমণ্ডুতে নাকি দেখার কিছু নেই। ভদ্রলোকের মতে হিমালয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় নগরকোটে হওয়া উচিত। ভদ্রলোক এয়ারপোর্ট থেকেই শওকতের সুটকেস খুঁজে বের করলেন। পরের দিন বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটে সুটকেস আসবে এটা নিশ্চিত করলেন। ডেনটিস্টের সঙ্গেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন। বিদেশের এম্বেসিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা ঘুমানো এবং শপিং করা ছাড়া অন্য কিছুই পারেন না বলে যে ধারণা দেশে প্রচলিত তা সম্ভবত সত্যি নয়।

ভদ্রলোক শওকতকে শার্ট-প্যান্ট কিনতে দিলেন না। গম্ভীরমুখে বললেন, কাল তো সুটকেস চলেই আসছে—শুধু শুধু ডলার খরচ করবেন কেন? একটা রাতেরই তো কারবার।

ভাবীর শাড়ি প্যাঁচ দিয়ে লুঙ্গির মতো পরে শুয়ে থাকবেন। দুপুরের মধ্যে আমি সুটকেস পৌঁছে দেব। পরদিন রওনা করবেন পোখরা।

শওকত বলল, কোথায় যাব?

'পোখরা। সেখানে খুব সুন্দর তিনটা হ্রদ আছে—ফিওয়া, বেগনাস এবং রূপা। লেকগুলোর উৎস হল অন্নপূর্ণা রেঞ্জের তুষার গলা পানি। ফিওয়া হ্রদের পাশে লেকভিউ হোটেল। একটা রুম নিয়ে রেখেছি। এসি রুম, আপনাদের পছন্দ হবে।'

'যাব কীভাবে?'

'বাইরোডে যাবেন। ট্যাক্সি নিয়ে যাবেন। প্লেনেও যাওয়া যায়। ওয়ান ওয়ে টিকিট ফোর্টি নাইন ডলার। প্লেনে যাওয়া অর্থহীন। পোখরা যাবার দুপাশের দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা।'

'কাঠমণ্ডুতে কিছু দেখার নেই?'

'মন্দির ফন্দির আছে—চাইলে একদিন দেখিয়ে আনব। ইউরোপ আমেরিকার ট্যুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে নিয়ে খুব আগ্রহ করে পটাপট মন্দিরের ছবি তোলে। মন্দির দেখার জন্যে নেপালে আসার দরকার কী? নেপালে এসেছেন হিমালয় দেখবেন। প্রাণভরে হিমালয় দেখুন। তবে...।'

'তবে কী?'

'বর্ষাকাল তো। হিমালয় দেখতে পারবেন কি না, সেটা হল কথা। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কিচ্ছু দেখা যায় না। আপনাদের ভাগ্য ভালো হলে ইনশাল্লাহ্ দেখবেন।'

তারা নগরকোটে পৌঁছল রাত আটটার দিকে। বৃষ্টি তখনো ঝরছে। মুষলধারে না হলেও ঝিরঝির করে পড়ছে। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা। রাস্তায় আলো নেই। একপাশে গভীর গিরিখাদ। স্টিয়ারিঙের হাত শক্ত না হলে ভয়াবহ অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে। বৃষ্টিভেজা রাস্তাও খুব পিছল। মাঝে মাঝেই গাড়ি ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে যাচ্ছে। অল্পবয়েসী ড্রাইভার জয় পশুপতিনাথজী বলে গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে।

শওকত বলল, রাস্তা তো ভয়াবহ। তিতলী তোমার ভয় লাগছে?

তিতলী বলল, না।

'তাহলে তোমাকে 'সাহসী তরুণী' টাইটেল দেয়া যায়। ভয়ের চোটে আমার দাঁত ব্যথা সাময়িকভাবে চলে গেছে। আমার ধারণা হোটেলে পৌঁছার পর ভয় কেটে যাবে, দাঁত ব্যথা আবার শুরু হবে।'

'সেক্ষেত্রে হোটেলে না পৌঁছে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ভালো।'

শওকত শব্দ করে হাসল। তিতলীর মনে হল—মানুষটার হাসি খুব সুন্দর। হাসান ভাইয়ের হাসিও সুন্দর, তবে হাসান ভাই এত শব্দ করে হাসত না। তিতলীর অস্বস্তি লাগছে। তুলনামূলক চিন্তা সে কেন করছে। এর মধ্যে তুলনার কী আছে?

বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়ি থেমেছে। ড্রাইভার জয় জয় পশুপতিনাথজী বলে দু হাত একত্র করে স্টিয়ারিংকে নমস্কারের মতো করেছে। তিতলী ভীত গলায় বলল, কী হয়েছে? ড্রাইভার হাসিমুখে বলল, বহেনজি আ গয়া।

'এত অন্ধকার কেন?'

নেপালি ড্রাইভার বাংলা বাক্য বুঝল। জবাব দিল ইংরেজিতে—নো ইলেকট্রিসিটি। পাওয়ার ফেইলিউর।

অন্ধকারে এতক্ষণ চোখে পড়ে নি—এখন দেখা যাচ্ছে—দক্ষিণে বিশাল দোতলা হোটেল। ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ইলেকট্রিসিটি না থাকলে এত বড় হোটেলে চার্জলাইট জ্বলবে, বাতি জ্বলবে—পুরোপুরি অন্ধকার থাকবে কেন? এত বড় ট্যুরিস্ট স্পটে লোকজনও তো থাকার কথা। মনে হচ্ছে চারদিক খাঁখাঁ করছে। বৃষ্টি সুচের মতো গায়ে বিঁধছে। তিতলীর শরীর

কাঁপছে। এত ঠাণ্ডা বৃষ্টি এর আগে তার গায়ে পড়ে নি। পাহাড়ি বৃষ্টি কি এত ঠাণ্ডা হয়? বৃষ্টির এই নমুনা জানলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই লিখতেন না, এস কর স্নান নবধারা জলে।

তিতলী হোটেলের লবিতে পা দেয়ামাত্র ইলেকট্রিসিটি চলে এল। চারদিক ঝলমল করে উঠল। হোটেল দেখে তিতলী মুগ্ধ। শোবার ঘরগুলো বড় বড়। ঘরে কাঠের পুরোনো ধরনের আসবাব। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা সুন্দর। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। হোটেলের আয়না সচরাচর ভালো হয় না। বাথরুমও ঝকঝক করছে।

তিতলী খুশি খুশি গলায় বলল, হোটেলটা তো খুব সুন্দর।

শওকত বলল, হোটেলটা খুব সুন্দর না। মাঝারি ধরনের। তুমি কখনো ভালো হোটেলে থাক নি বলে তোমার কাছে এত সুন্দর লাগছে। তোমার কি ক্ষিধে লাগছে?

'হুঁ।'

'তাহলে তুমি এক কাজ কর খেয়ে এস। ডাইনিং হলে চলে যাও। রাত বেশি হলে ডিনার পাবে না।'

'তুমি খাবে না?'

'আমার দাঁতের যে অবস্থা! পানি ছাড়া কিছু খেতে পারব না। তাছাড়া খেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে জ্বর আসছে। আমি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকব।'

'আমি একা একা খেতে যাব?'

'হ্যাঁ যাবে। আমরা যে বিচিত্র জীবন শুরু করেছি সেখানে দোকার ব্যাপার তো নেই—তাই না? এক কাজ কর—ভালো করে হাতমুখ ধুয়ে নাও কিংবা গোসল করে ফ্রেশ হয়ে নাও। তারপর খেতে যাও। মেনু দেখে দেখে অর্ডার দেবে সমস্যা কিছু নেই। পারবে না?'

'পারব।'

'গুড।'

শওকত বিছানায় গা এলিয়ে দিল। শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। গা কেমন ঘিনঘিন করছে। বাসি কাপড় ছাড়া হয় নি। ছাড়ার উপায়ও নেই। একসেট কাপড় হলেও কেনা দরকার ছিল। গরম পানিতে গোসল সেরে হোটেলের গামছা গায়ে জড়িয়ে শুয়ে থাকলে হয়। ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে একজন তরুণীর সামনে ব্যাপারটা শোভন হবে না। এই তরুণী তার স্ত্রী এটিও খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ভিক্টোরিয়ান যুগের গল্প-উপন্যাসে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন স্বামী-স্ত্রী হয়তো থাকে। এ যুগে কি থাকে? তিতলী যা করছে তা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতা থেকে করছে। আর সে নিজে যা করছে তাও কি অসুস্থতা নয়? অন্যের অসুখকে প্রশ্রয় দেয়াও তো এক ধরনের অসুখ। সে যা ভেবেছিল তা হচ্ছে না—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিতলী সহজ হচ্ছে না বরং উল্টোটা হচ্ছে—অস্বাভাবিক সম্পর্কই এখন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। এক সময় আরো স্বাভাবিক মনে হবে। ভুল হচ্ছে, মস্ত বড় ভুল। ভুলের ছোট্ট চারা রোপণ করা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই চারা ডালপালা মেলে মহীরুহ হয়ে গেছে। এই মহীরুহ এখন আর খুব সহজে টান দিয়ে উপড়ে ফেলা যাবে না। বড় করাত দিয়ে গাছটা কাটতে হবে। সেই করাত দুজনের করাত। করাতের এক মাথা থাকবে তার হাতে অন্য মাথা থাকবে তিতলীর হাতে। তিতলী কি সেই করাতের এক মাথা ধরবে? মনে হয় না।

শওকতের জ্বর বাড়ছে। মনে হচ্ছে এন্টিবায়োটিকগুলো কাজ করছে না। ঠাণ্ডাও বোধহয় লেগেছে—বুকের ভেতর ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। সামান্য কাশি। নিউমোনিয়া না তো? বড় ধরনের অসুখ বাঁধিয়ে ফেললে তিতলী সমস্যায় পড়বে। বিদেশে অসুস্থ মানুষ মানে নানান যন্ত্রণা। তিতলী নামের এই মেয়েটিকে এ জাতীয় যন্ত্রণায় ফেলার কোনো অর্থ হয় না। মেয়েটা কে? কেউ না। খুব রূপবতী একটা মেয়ে যে বাস করছে ভয়ঙ্কর এক ঘোরের জগতে। ঘোর কাটছে না। সম্ভবত কাটবেও না।

'তিতলী?'

'হুঁ।'

'ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিতে বল। পানি খাব।'

'কাকে বলব?'

'রুম সার্ভিসকে বলতে হবে। আচ্ছা টেলিফোনটা আমার কাছে দাও—আমিই বলছি।'

'তোমার জ্বর কি বেড়েছে?'

'তাই মনে হচ্ছে।'

'মাথায় পানি ঢালতে হবে?'

'না। তুমি বসে আছ কেন? খেতে যাও।'

তিতলী চলে গেল। শওকত ভেবেছিল তিতলী গায়ে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে। এই ভদ্রতা সাধারণ ভদ্রতা। তিতলীর কাছ থেকে এই সামান্য ভদ্রতাটুকু কি আশা করা যায় না?

নতুন জায়গায় তিতলীর ঘুম হয় না। নগরকোটের হোটেলে তার খুব ভালো ঘুম হল। দীর্ঘ ঘুম এবং খুব আরামের ঘুম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। হোটেলের ভেতরে তখনো অন্ধকার। শওকত চাদর মুড়ি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মাথা বালিশ থেকে সরে গেছে। বাচ্চাদের এই অভ্যাস শওকতের আছে। মাথার নিচে বালিশ থাকে না। তিতলীর একবার ইচ্ছা করল শওকতের মাথাটা বালিশে তুলে দেয়। তারপরই মনে হল থাক।

সে বাথরুমে ঢুকে হাতমুখ ধোল। কলটা ছাড়ল খুব সাবধানে। অসুস্থ মানুষ—ঘুম যেন না ভাঙে।

তিতলী ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় এল। সেখান থেকে চলে এল হোটেলের বাগানে। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। যে বিস্ময়কর দৃশ্য তার সামনে ছিল তার জন্যে তার কোনো প্রস্তুতি ছিল না। দিগন্তজুড়ে হিমালয় পর্বতমালা। বরফের চাদরে তার গা ঢাকা। প্রভাতের প্রথম সূর্যকিরণে সেই চাদরে সোনালি আভা লাগতে শুরু করেছে। এ কী অপরূপ দৃশ্য! তিতলী মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন কুয়াশা তাকে ঢেকে ফেলল। বর্ষাকালে এত কুয়াশা এল কোথেকে? হঠাৎ তার মনে হল—এটা মেঘ না তো? জলভরা একখণ্ড মেঘ কি তাকে জড়িয়ে ধরেছে? অবশ্যই তাই। এম্বেসির সোবাহান সাহেব এ জাতীয় কথাই তো বলেছিলেন। নগরকোট এত উঁচুতে যে গায়ের উপর দিয়ে মেঘ চলে যায়। হাতের মুঠোয় মেঘ ধরা যায়। এই তো সেই মেঘ। আকাশের মেঘ হাত দিয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে! মেঘে শরীর ডুবিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! চোখের সামনে হিমালয়ের রং বদলে যাচ্ছে—প্রকৃতি এত সুন্দর হয়? তিতলীর রীতিমতো কান্না পেয়ে গেল। এত সুন্দর কখনো একা দেখা যায় না। শওকতকে এনে দেখাতে হবে। ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বাগানে চেয়ার-টেবিল পাতা আছে। হোটেলের গেস্টরা চেয়ারে বসে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের সামনে পটভর্তি চা। তিতলীরাও তাই করবে। দুজন বসে চা খাবে তারপর হঠাৎ একসময় বিশাল একখণ্ড মেঘের ভেতর তারা ডুবে যাবে।

তিতলী শওকতের গায়ে হাত রেখে কোমলস্বরে ডাকল—এই ওঠ তো। ওঠ।

শওকত চোখ মেলল। অদ্ভুত একটা দৃশ্য সে দেখছে—তিতলী তার গা ঘেঁষে বসে আছে। তিতলীর একটা হাত তার পিঠে। এটি কি কোনো স্বপ্নদৃশ্য? না স্বপ্নদৃশ্য নয়। তিতলীর গা থেকে বাসি ফুলের গন্ধ আসছে। স্বপ্নদৃশ্যে গন্ধ থাকে না।

'চট করে উঠে হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

'কেন?'

'বাইরে যে কী সুন্দর! আমি এতক্ষণ মেঘের ভেতর দাঁড়িয়েছিলাম।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। এই দেখ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। শুয়ে আছ কেন ওঠ।'

শওকত হাত বাড়িয়ে তিতলীর হাত ধরল। তিতলী হাত সরিয়ে নিল না। শওকত তাকে কাছে টানল। তিতলী কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে রইল—তারপর হঠাৎ নিজেকে ছেড়ে দিল। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, কী করছ দরজা খোলা! শওকত বলল, থাকুক খোলা।

তিতলী বলল, তোমার গায়ে জ্বর নেই?

'না নেই।'

তিতলী বলল, আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে। তুমি কি এক সেকেন্ডের জন্য আমাকে ছাড়বে?

'এক সেকেন্ডে কী করবে?'

'দরজা লাগিয়ে দেব।'

'দরজা লাগাতে হবে না।'

'কী আশ্চর্য! বারান্দা দিয়ে বেয়ারারা আসা-যাওয়া করছে।'

'ওরা হাইলি ট্রেন্ড। হোটেলের খোলা দরজা দিয়ে এরা কখনো ভেতরে তাকাবে না।'

'আমরা হিমালয় দেখব না?'

'হিমালয় পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'আমিও তো পালিয়ে যাচ্ছি না। ছিঃ ছিঃ তুমি তো আমাকে নগ্ন করে ফেলছ। আমি কিন্তু এখন ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বিছানা থেকে ফেলে দেব।'

'ফেলে দাও।'

ধাক্কা দিতে গিয়ে তিতলী ধাক্কা দিতে পারল না। তার শরীর জেগে উঠেছে। সে গভীর মমতা ও ভালবাসায় শওকতকে জড়িয়ে ধরল। হিমালয় সূর্যকিরণ মেখে তার রং বদলাচ্ছে। ফেরারি মেঘমালার দু-একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে হোটেলের চারপাশে। তিতলীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে কোনো একটা দুষ্ট প্রকৃতির মেঘ বোধহয় খোলা দরজা দিয়ে তাদের ঘরে ঢুকে পড়েছে। তারা ডুবে গেছে মেঘের দিঘিতে।

AMARBOI.COM

২৬

তারেক অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছে। কোনো কথাটথা না। চুপচাপ বসে থাকা।

হাসান চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার বিছানার চাদরটা ধবধবে সাদা। গায়ে যে চাদরটা আছে তার রঙও সাদা। সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। বাইরে বেশ গরম। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু হাসানের মনে হয় শীত লাগছে।

তারেক বলল, তোর মাথার যন্ত্রণা কি একটু কমেছে?

হাসান নিচু গলায় বলল, হুঁ।

হুঁ বলার ধরন থেকেই বোঝা যায় মাথার যন্ত্রণা আসলে কমে নি। কড়া পেইনকিলার ব্যথাটাকে ভোঁতা করে দিয়েছে।

'তুই যে এত বড় অসুখ নিয়ে ঘুরে বেড়াতি বুঝতেই পারি নি। আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে।'

'অসুখ-বিসুখ তো পৃথিবীতে আছেই।'

'তাও ঠিক।'

তারেক আবার চুপ করে গেল। হাসান বলল, শুধু শুধু বসে আছ কেন? চলে যাও।

'কোথায় যাব?'

'তোমার ঘরে যাও। অফিস থেকে এসেছ বিশ্রাম কর।'

'তোর কি কিছু খেতেটেতে ইচ্ছা করে?'

'না।'

'খেতে ইচ্ছে হলে বল। লজ্জা করবি না।'

হাসান হাসল। একবার ভাবল বলে, আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে। আঙুর নিয়ে এসো। বলা ঠিক হবে না। ভাইজান সত্যি আধকেজি আঙুর কিনে নিয়ে আসবে।

'হাসান!'

'জ্বি ভাইজান।'

'আমার মনটা খুবই খারাপ হয়েছে।'

'তুমি ঘরে যাও তো। ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।'

'আমার যদি ক্ষমতা থাকত—অবশ্যই তোকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করাতাম। ঘরবাড়ি জমিজমা থাকলে অবশ্যই বিক্রি করতাম। কিছুই নেই। প্রভিডেন্ট ফান্ডে ষোল-সতের হাজার টাকা আছে। আমি অবশ্য হাল ছাড়ি নি। দেখি কী করা যায়। লায়লার স্বামীর কাছে টাকা ধার চাইব?'

'কারো কাছে কিচ্ছু চাইতে হবে না।'

'সে তো বাইরের কেউ না। এখন তো আমাদেরই একজন। টাকা তো আমি মেরেও দিচ্ছি না। মাসে মাসে শোধ দেব। মাসে তিন হাজার টাকা করে শোধ দিলেও বছরে হয় ছত্রিশ হাজার...

'ভাইজান আমার আঙুর খেতে ইচ্ছে করছে।'

'কোনো ব্যাপারই না। এনে দিচ্ছি। কোনটা খাবি—সাদাটা না কালোটা? আচ্ছা যা দু পদেরই আনব। ভিটামিন সি ছাড়া আঙুরে অবশ্য ফুডভ্যালু কিছু নেই। তোর যখন খেতে ইচ্ছে করছে খা।'

তারেক উঠে দাঁড়াল। হাসান স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কেউ একজন পাশে এসে বসলেই তার খারাপ লাগে। পুরোপুরি একা সময়টা কাটাতে পারলে ভালো লাগত। কেউ কাছে আসবে না। চিঠি লিখবে। সেই চিঠিগুলো থাকবে বালিশের নিচে। যখন মাথার যন্ত্রণা একটু কমবে তখন সে চিঠি খুলে পড়বে। মানুষের সঙ্গের চেয়ে তাদের চিঠি পড়াটা এখন বোধহয় আনন্দময় হবে।

লিটনের একটা চিঠি পরশুদিন পেয়েছে। চিঠিটা বালিশের নিচে ছিল। আজ সকালে পড়েছে। কয়েকদিন পর হয়তো আবারো পড়বে। লিটন লিখেছে—

হাসান,

তোকে চিঠি লিখতে অনেক দেরি করে ফেললাম। আসলে কী ব্যস্ততায় যে সময় কাটছে। আমাকে না দেখলে তুই আমার ব্যস্ততা বুঝতে পারবি না। আমি ভোর আটটায় চলে যাই। ফিরি সন্ধ্যার পর। গ্রোসারি করা, ঘর-সংসার দেখা, রান্না করা—সব তোর ভাবীর একা করতে হয়। সেই বেচারিরও নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমাদের এপার্টমেন্টটা উনত্রিশ তলায়। আর লন্ড্রিঘর হচ্ছে এক তলায়। কাপড় ধুতে হলেও নিচে নামতে হয়। এত উঁচুতে থাকতে শুরুতে খুব অস্বস্তি লাগত। মনে হত জোরে বাতাস এলেই বিল্ডিংটা বুঝি ভেঙে পড়বে। এখন অবশ্য সয়ে গেছে।

শম্পা সারাদিন কী করে জানিস? শুধু ঘর গোছায়। রাজ্যের জিনিস কিনে ঘর ভর্তি করে ফেলেছে। তার যে এমন খরুচে হাত তা জানতাম না। তার শখের জিনিস কী জানিস—স্টাফড এনিমেল। ঘরটাকে সে একটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে ফেলেছে। আমি একদিন তার উপর সামান্য রাগই করলাম—সে কেঁদেকেটে একটা কাণ্ড করেছে। তার অভিমান ভাঙাবার জন্যে শেষে আমি নিজেই একটা বিশাল হাতি কিনে দিয়েছি। দাম কত নিয়েছে শুনলে তুই ভিরমি খেয়ে পড়ে যাবি—সাত শ সিঙ্গাপুরি ডলার। শম্পার সঙ্গে থেকে থেকে আমারও খরুচে হাত হয়ে যাচ্ছে। এক সময় কী যে কষ্ট করেছি ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। আমার খুব ইচ্ছা তোকে এনে কিছুদিন আমাদের সংসারে রাখি। আরেকটু গুছিয়ে বসেই তোর জন্যে টিকিট পাঠাব।

ইতি লিটন।

পুনশ্চ : হাসান তুই কি একটা কাজ করবি? খুব সুন্দর কিছু বাংলা নাম পাঠাবি? কুড়িটা ছেলের নাম এবং কুড়িটা মেয়ের নাম। কী জন্যে নাম পাঠাতে বলছি বুঝতেই পারছিস। বিদেশে শিশুপালন খুবই যন্ত্রণা হবে। কী আর করা। আমরা খুবই খুশি। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।

হাসানকে রোজই একবার লায়লা দেখতে আসে। এই মেয়েটাকে হাসানের ভালো লাগে। লায়লা ঘরে ঢোকে কাঁদো কাঁদো মুখে।

"ভাইয়া আজ তোমার অবস্থা কী?" বলে বিছানায় বসে। কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখ থেকে কাঁদো কাঁদো ভাবটা চলে যায়। সে মনের আনন্দে তার সংসারের গল্প শুরু করে। গল্প করার সময় আনন্দে সে ঝলমল করতে থাকে। হাসানের সব সময় মনে হয় এই আনন্দের পাশে দীর্ঘ সময় থাকলে তার মাথার অসুখটা কমে যাবে।

ভাইয়া শোন—বাবু কী রকম যে দুষ্ট তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না। ওর বাবার অবশ্য ধারণা আগে এত দুষ্ট ছিল না। আমি নাকি লাই দিয়ে দিয়ে তাকে দুষ্ট বানাচ্ছি। এত ছোট একটা বাচ্চা আমি তো আদর করবই। মুখে ভাত তুলে না দিলে সে খায় না। বেচারা ছেলেমানুষ না। ও কী বলে জান? ও বলে রাত্রি তুমি বাবুকে যতটা ভালবাস আমাকে তার দশ ভাগের এক ভাগও বাস না। বুঝলে ভাইয়া ও আমাকে লায়লা ডাকে না। লায়লার অর্থ রাত। সেই জন্যে ডাকে রাত্রি। লজ্জার ব্যাপার না? এখন কী করব বল? আদর করে ডাকে আমি তো 'না' বলতে পারি না। পরশুদিন আবার বলল, চল সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসি। ছেলের স্কুল কামাই করে আমি সিঙ্গাপুর যাব। আমার এত শখ নেই। ও তা শুনবে না। ওর স্বভাব হচ্ছে একবার কোনো একটা কথা মুখ দিয়ে বলে ফেললে সেটা করতেই হবে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। এদিকে আমার ড্রাইভার কী করেছে জান? গত মঙ্গলবারের কথা। আমাকে বলল, চাকা পাংচার হয়েছে ঠিক করতে হবে। আমি এক শ টাকা দিলাম সে আর টাকা ফেরত দেয় না। বৃহস্পতিবারে তাকে ডেকে বললাম চাকা পাংচার সারাই করতে কুড়ি টাকা লাগে। বাকি আশি টাকা কোথায়? সে বলল, ম্যাডাম পকেটমার হয়ে গেছে। ওই আশি টাকা তো গেছেই আমার নিজেরও দু শ টাকা গেছে। এখন সে এডভান্স বেতন চায়। আমার অবস্থা দেখেছ?

'তোর তো কঠিন অবস্থা।'

'কঠিন অবস্থা তো বটেই। কাউকে যে তুমি বিশ্বাস করবে সে উপায় নেই। সবার দিকে চোখ রাখতে হয়। আমি তো আর মাছি না যে আমার পঞ্চাশ হাজার চোখ আছে। আমি একা কদিক সামলাব?'

'তা তো ঠিকই।'

'সন্ধ্যা হতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমোতে পারি না। ওর অভ্যাস হচ্ছে রাতে ছবি দেখা। আমাদের একটা LD প্লেয়ার আছে। LD নিয়ে আসে। রোজ ছবি দেখে। LD কী জান ভাইয়া?'

'না।'

'LD হল লেজার ডিস্ক। পুরো সিনেমাটা একটা গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো রেকর্ডে থাকে। কী সুন্দর ছবি যে আসে না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না। একদিন আমাদের বাসায় নিয়ে দেখাব। সরি বাসা বলে ফেললাম। বলা উচিত ছিল বাড়ি। বাসা তো না, আমরা তো আর ভাড়া বাড়িতে থাকি না যে বাসা। তাই না ভাইয়া? তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ?'

'না। চোখ বন্ধ করে আছি।'

'ঠিক আছে তুমি রেস্ট নাও। আর শোন ভাইয়া, বেশি চিন্তা করবে না। আমি রোজ এসে দেখে যাব। ও বলছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে। মাঝে মাঝে হোমিওপ্যাথি মিরাকলের মতো কাজ করে। ওর এক আত্মীয়ের তোমার মতো ব্রেইন টিউমার ধরা পড়েছিল। ডাক্তাররা সব জবাব দিয়ে দিয়েছে। তখন সে হোমিওপ্যাথি শুরু করে। আস্তে আস্তে টিউমার মিলিয়ে

যায়। যে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছিলেন তিনি আবার ইন্ডিয়া চলে গেলেন। আমি ওকে বলেছি— ইন্ডিয়াতেই যাক আর বিলাতেই যাক তুমি সেই ডাক্তারের খোঁজ বের করবে।'

'দেখ খুঁজে।'

'ভাইয়া আজ যাই?'

'আচ্ছা।'

হাসানের অসুখের খবর সে কাউকে দেয় নি। তারপরেও কেমন করে জানি সবাই জেনে গেছে। প্রতিদিনই কেউ না কেউ উপস্থিত হচ্ছে। হাসানকে বিস্মিত করে একদিন সুমি এসে উপস্থিত। তার গায়ে ধবধবে সাদা ফ্রক। হাতে অনেকগুলো গোলাপ। কী সুন্দরই না হয়েছে মেয়েটা! মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালো।'

'আপনাকে দেখতে এসেছি।'

'থ্যাংক য়্যু। খবর পেলে কোথায়?'

সুমি মুখ টিপে হেসেছে। খবর কোথায় পেয়েছে সে বলবে না।

'এত বড় অসুখ কী করে বাঁধালেন?'

'বুঝতে পারছি না সুমি। অসুখের কথা থাক। তুমি কেমন আছ বল?'

'ভালো আছি।'

'তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ?'

'হুঁ।'

'তোমার যে ই.এস.পি. ক্ষমতা ছিল এখনো কি আছে? ভবিষ্যৎ বলতে পারতে। এখনো কি পার?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বল দেখি আমি আর কতদিন বাঁচব?'

সুমি হাতের ফুলগুলো নাড়াচাড়া করছে। কিছু বলছে না। কিন্তু তার মুখ বিষণ্ন নয়।

'স্যার আপনার জন্যে একটা মজার জিনিস এনেছি।'

'মজার জিনিসটা কী?'

'এক ধরনের ক্যান্ডি। মুখে দিয়ে রাখবেন—এক সময় মুখের ভেতর পট পট শব্দ হতে থাকবে।'

'সে কী?'

'বাবা বাইরে থেকে নিয়ে এসেছেন। মুখে দিয়ে দেখুন।'

হাসান ক্যান্ডি মুখে দিয়েছে। এক সময় মুখের ভেতর সত্যি সত্যি পট পট শব্দ হওয়া শুরু করল। হাসান থু করে ক্যান্ডি ফেলে দিল। সুমি হাসছে খিলখিল করে। হাসান মুগ্ধ হয়ে হাসির শব্দ শুনছে।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে হাসানের অবস্থা খুব খারাপ হল। তাকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। হাসপাতালটাই হয়ে গেল তার ঘরবাড়ি। কেবিনের স্যাঁতস্যাঁতে ঘর। বিবর্ণ দেয়াল। ফেনাইলের গন্ধমাখা মেঝেতে তার জীবন আটকে গেল। মানুষের সঙ্গ তার অসহ্য বোধ হতে শুরু করল। কেবিনের জানালা খুলে আকাশ দেখতে তার ভালো লাগে না। তার ভালো লাগে কুণ্ডলী পাকিয়ে নিজেকে ছোট্ট করে শুয়ে থাকতে। নিজের মনে কথা বলতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে নিজের মনে কথা বলে। একেক সময় একেকজন এসে তার মাথায় উপস্থিত হয়। একদিন যেমন এলেন আম্বিয়া খাতুন।

'কী রে হাসান আমার মৃত্যু সংবাদ শুনেও তুই দেখতে এলি না। তুই এত বড় পাষণ্ড! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

'দাদিমা আমি অসুখ হয়ে পড়ে আছি।'

'অসুখ হবে না—রোদের মধ্যে টো-টো করে ঘোর। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। অসুখ হয়েছে ভালো হয়েছে।'

'আপনি এমন রেগে আছেন কেন দাদিমা?'

'জোয়ান ছেলে অসুখ বাঁধিয়ে বিছানায় পড়ে আছিস রাগব না? আমি খুবই রাগ করেছি। দরজা-জানালা বন্ধ করে পড়ে আছিস কেন? মরার আগেই তুই দেখি ঘরটাকে কবর বানিয়ে ফেলেছিস। জানালা খোল।'

'জানালা খুলতে ইচ্ছা করে না দাদিমা।'

'ইচ্ছা না করলেও খুলতে হবে। দাঁড়া আমি খুলে দিচ্ছি।'

আম্বিয়া খাতুন অনেক চেষ্টা করলেন। জানালা খুলতে পারলেন না। বৃদ্ধার প্রাণান্ত চেষ্টা দেখে হাসান নিজের মনে খুব হাসল। হাসান যতই হাসছে বৃদ্ধা ততই রাগছেন।

হাসানকে খুব অবাক করে দিয়ে হাসপাতালের কেবিনে উপস্থিত হল চিত্রলেখা। তার উপস্থিতি কল্পনায় নয়, বাস্তবে। চিত্রলেখা আগের চেয়ে রোগা হয়েছে। গায়ের রঙও খানিক কমেছে। কিন্তু সে আরো সুন্দর হয়েছে।

চিত্রলেখা হাসিমুখে বলল, আপনার অসুখের খবর আমি অনেক আগেই পেয়েছি—আসতে দেরি করলাম।

এই প্রথম হাসান লক্ষ্য করল কেউ একজন হাসপাতালে তার সঙ্গে দেখা করতে এসে হেসে হেসে কথা বলছে। যেন হাসানের অসুস্থতা কোনো ব্যাপারই না।

'দাড়িগোঁফ গজিয়ে একাকার করে ফেলেছেন। শেভ করেন না কেন?'

'রোজ করি না। দু-এক দিন পর পর করি।'

'রোজ শেভ করবেন। সকালবেলা শেভ করে আয়না দিয়ে চুল আঁচড়ে—আয়নার দিকে তাকিয়ে বলবেন, হ্যালো ইয়াংম্যান।'

'আচ্ছা বলব। আপনি আমাকে দেখতে আসবেন আমি ভাবি নি।'

'অন্যেরা ভাবতে পারে না—এমন সব কাণ্ডকারখানা আমি প্রায়ই করি। শুনুন হাসান সাহেব, আপনি বোধহয় জানেন যে আমি একজন ডাক্তার।'

'জ্বি জানি।'

'আপনার অসুখ সম্পর্কে যা খোঁজখবর নেবার আমি নিয়েছি। ডাক্তারদের ডায়াগনোসিস দেখেছি। ডায়াগনোসিস ভালো করেছেন। মনে হচ্ছে টিউমারটা শেকড় বসিয়ে দিয়েছে।'

'তার মানে কি এই যে আমার সময় শেষ?'

'হ্যাঁ মানে মোটামুটি তাই। তবে শুনুন হাসান সাহেব—অপারেশন এবং রেডিওথেরাপির সুযোগ আছে। অপারেশনটা খুবই জটিল। তবে জনস হবকিন্সে দুজন সার্জন আছেন যাঁদের হাত জাদুকরী হাত। তারপরেও রিকোভারির সম্ভাবনা কম। থার্টি পার্সেন্ট। তবে থার্টি পার্সেন্ট সম্ভাবনাও এক অর্থে অনেক সম্ভাবনা। তাই না?'

'জ্বি।'

'আমি সেই সম্ভাবনাটা যাচাই করতে চাই। আপনাকে বাইরে নিয়ে যাওয়া এবং সম্ভাবনাটুকু পরীক্ষা করার আমার ইচ্ছা। আপত্তি আছে?'

'আপনি এটা করতে চাচ্ছেন কেন?'

'দুটা কারণ আছে। প্রথমটা আপনাকে বলা যাবে। দ্বিতীয়টা বলা যাবে না। প্রথম কারণ হল, আমার বাবা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন—আপনার কোনো সমস্যা হলে দেখতে।'

'ও আচ্ছা।'

চিত্রলেখার দ্বিতীয় কারণটা অনেক জোরালো। হাসান নামের অতি দুর্বল এই মানুষটাকে হিশামুদ্দিন সাহেবের চেয়েও অনেক বেশি পছন্দ তার নিজের। অহংকারী মেয়েরা নিজের পছন্দের কথা সব সময়ই লুকিয়ে রাখে।

'হাসান সাহেব।'

'জ্বি।'

'আমি যদি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আপনার আপত্তি আছে?'

'জ্বি না।'

'থ্যাংক য়্যু।'

চিত্রলেখা হঠাৎ লক্ষ্য করল তার চোখে পানি চলে আসছে। সে জানালার কাছে সরে গেল।

'জানালা বন্ধ কেন? জানালা খুলে দি কেমন?'

'জ্বি আচ্ছা।'

চিত্রলেখা জানালা খুলে দিয়েছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা মেঘের স্তূপ ভেসে ভেসে আসছে। খুব সাবধানে চিত্রলেখা তার চোখ মুছল। তার কাছে মনে হল—মেঘের সঙ্গে মানুষের খুব মিল। মানুষ যেমন কাঁদে মেঘও কাঁদে। বৃষ্টি হচ্ছে মেঘের অশ্রু। চিত্রলেখা মুগ্ধ হয়ে মেঘের স্তূপের দিকে তাকিয়ে আছে।

লেখকরা কল্পনা করতে খুব ভালবাসেন। আমার কল্পনা করতে ভালো লাগছে—হাসপাতালের জানালা থেকে যে মেঘটা দেখা যাচ্ছে সেই মেঘই এক সময় ঢেকে দিয়েছিল তিতলী এবং শওকতকে।

মানুষের কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল খুব একটা হয় না। কল্পনা করতে ভালো লাগে হাসানের অসুখ সেরে গেছে। সে শুরু করেছে আনন্দময় একটা জীবন। বুড়িগঙ্গায় নৌকায় করে ঘুরতে গিয়েছে। নদীতে খুব ঢেউ উঠেছে। চিত্রলেখা ভয় পেয়ে বলছে, এ কোথায় নিয়ে এলে? আমি তো সাঁতার জানি না। নৌকা এমন দুলছে কেন? নৌকার মাঝি হাসিমুখে বলছে, টাইট হইয়া বহেন আফা আমি আছি কোনো চিন্তা নেই।

খুব সহজে কল্পনা করা যায়, তারেক ঘর গোছাতে গিয়ে হঠাৎ ড্রয়ারে খুঁজে পেয়েছে রীনার লেখা চিঠি—চিঠিটা খুব ছোট্ট। রীনা লিখেছে, "তুমি কোনোদিন জানবে না, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি।" চিঠি পড়েই তারেক বের হল। যে করেই হোক রাগ ভাঙিয়ে রীনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বাস্তব কখনো গল্পের মতো হয় না। বাস্তবের রীনা ফিরে আসে না। বাস্তবের হাসানদের সঙ্গে কখনো বুড়িগঙ্গার জলের উপর চিত্রলেখার দেখা হয় না। তবে বাস্তবেও সুন্দর সুন্দর কিছু ব্যাপার ঘটে। যেমন—লিটনের ফুটফুটে একটা মেয়ে হয়। লিটন তার বন্ধু হাসানের পাঠানো দুটি নাম থেকে একটি নাম তার মেয়ের জন্যে রাখে। দুটি নামের কোনোটাই তার পছন্দ না—তিতলী, চিত্রলেখা। তারপরেও সে মৃত বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মেয়ের নাম রাখল—"চিত্রলেখা"।

জীবন বয়ে চলবে। আবার এক নতুন গল্প শুরু হবে নতুন চিত্রলেখাকে নিয়ে। কোনো এক লেখক লিখবেন নতুন গল্প, আশা ও আনন্দের অপূর্ব কোনো সঙ্গীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমুর দ্বিতীয় প্রহর

১

ভিতু মানুষ বলতে যা বোঝায় আমি তা না। হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিকে অন্ধকার হয়ে গেলে আমার বুকে ধক করে ধাক্কা লাগে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যদি শুনি বাথরুমে ফিসফাস শোনা যাচ্ছে—কে যেন হাঁটছে, গুনগুন করে গান গাইছে, কল ছাড়ছে-বন্ধ করছে, তাতেও আতঙ্কগ্রস্ত হই না। একবার ভূত দেখার জন্যে বাদলকে নিয়ে শ্মশানঘরে রাত কাটিয়েছিলাম। শেষরাতে ধুপধাপ শব্দ শুনেছি। চারদিকে কেউ নেই অথচ ধুপধাপ শব্দ। ভয়ের বদলে আমার হাসি পেয়ে গেল। আমার বাবা তার পুত্রের মন থেকে 'ভয়' নামক বিষয়টি পুরোপুরি দূর করার জন্যে নানান পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন। পদ্ধতিগুলি খুব যে বৈজ্ঞানিক ছিল তা বলা যাবে না, তবে পদ্ধতিগুলি বিফলে যায়নি। কাজ কিছুটা করেছে। চট করে ভয় পাই না।

রাত-বিরেতে একা একা হাঁটি। কখনো রাস্তায় আলো থাকে, কখনো থাকে না। বিচিত্র সব মানুষ এবং বিচিত্র সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি—কখনো আতঙ্কে অস্থির হইনি। তিন-চার বছর আগে এক বর্ষার রাতে ভয়ংকর একটা দৃশ্য দেখেছিলাম। রাত দুটা কিংবা তারচে কিছু বেশি বাজে। আমি কাঁটাবনের দিক থেকে আজিজ মার্কেটের দিকে যাচ্ছি। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। চারপাশ জনমানব-শূন্য। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছি। খুবই মজা লাগছে। মনে হচ্ছে সোডিয়াম ল্যাম্পগুলি থেকে সোনালি বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি—প্যান্ট এবং শাদা গেঞ্জি-পরা একজন মানুষ আমার দিকে ছুটে আসছে। রক্তে তার শাদা গেঞ্জি, হাত-মুখ মাখামাখি—ছুরিতেও রক্ত লেগে আছে। বৃষ্টিতে সেই রক্ত ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছে। মানুষটা কি কাউকে খুন করে এদিকে আসছে? খুনি কখনো হাতের অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালায় না। ব্যাপার কী? লোকটা থমকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। স্ট্রিট-লাইটের আলোয় আমি সেই মুখ দেখলাম। সুন্দর শান্ত মুখ, চোখ দুটিও মায়াকাড়া ও বিষণ্ণ। লোকটির চিবুক বেয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। লোকটা চাপাগলায় বলল, কে? কে?

আমি বললাম, আমার নাম হিমু।

লোকটা কয়েক মুহূর্ত অপলক তাকিয়ে রইল। এই কয়েক মুহূর্তে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারত। সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। অস্ত্র-হাতে খুনি ভয়ংকর জিনিস। যে-অস্ত্র মানুষের রক্ত পান করে সেই অস্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। সে বারবার রক্ত পান করতে চায়। তার তৃষ্ণা মেটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকটি আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আমি একই জায়গায় আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আমি খবরের কাগজ পড়ি না—পরদিন সব ক'টা কাগজ কিনে খুঁটিয়ে পড়লাম। কোনো হত্যাকাণ্ডের খবর কি কাগজে উঠেছে? ঢাকা নগরীতে নিউ এলিফেন্ট রোড এবং কাঁটাবন এলাকার আশেপাশে কাউকে কি জবাই করা হয়েছে? না, তেমন কিছু পাওয়া গেল না। গতরাতে আমি যে-জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই জায়গায় আবার গেলাম। ছোপ ছোপ রক্ত পড়ে আছে কি না সেটা দেখার কৌতূহল। রক্ত দেখতে না পাওয়ারই কথা। কাল রাতে অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে। যেসব রাস্তায় পানি ওঠার কথা না সেসব রাস্তাতেও হাঁটুপানি।

আমি তন্নতন্ন করে খুঁজলাম—না, রক্তের ছিটেফোঁটাও নেই। আমার অনুসন্ধান অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বাঙালির দৃষ্টি বড় কোনো ঘটনায় আকৃষ্ট হয় না, ছোট ছোট ঘটনায় আকৃষ্ট হয়। একজন এসে অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন, ভাইসাহেব, কী খুঁজেন?

'কিছু খুঁজি না।'

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার অনুসন্ধান দেখতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে গেল। এরপর আর রক্তের দাগ খোঁজা অর্থহীন। আমি চলে এলাম। ঐ রাতের ঘটনা ভয় পাবার মতো ঘটনা তো বটেই—আমি ভয় পাইনি। বাবার ট্রেনিং কাজে লেগেছিল। কিন্তু ভয় আমি একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়ে রীতিমতো অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আমাকে হাসপাতালে ভরতি হতে হয়েছিল। ভয়াবহ ধরনের ভয় যা মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। যে-ভয়ের জন্ম এই পৃথিবীতে না, অন্য কোনো ভুবনে। ভয় পাবার সেই গল্পটি আমি বলব।

আমার বাবা আমার জন্যে কিছু উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। সেই উপদেশগুলির একটি ভয়-সম্পর্কিত।

> "একজন মানুষ তার একজীবনে অসংখ্যবার তীব্র ভয়ের মুখোমুখি হয়। তুমিও হইবে। ইহাই স্বাভাবিক। ভয়কে পাশ কাটাইয়া যাইবার প্রবণতাও স্বাভাবিক প্রবণতা। তুমি অবশ্যই তা করিবে না। ভয় পাশ কাটাইবার বিষয় নহে। ভয় অনুসন্ধানের বিষয়। ঠিকমতো এই অনুসন্ধান করিতে পারিলে জগতের অনেক অজানা রহস্য সম্পর্কে অবগত হইবে। তোমার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তোমাকে বলিয়া রাখি এই জগতের রহস্য পেঁয়াজের খোসার মতো। একটি খোসা ছাড়াইয়া দেখিবে আরেকটি খোসা। এমনভাবে চলিতে থাকিবে—সবশেষে দেখিবে কিছুই নাই। আমরা শূন্য হইতে আসিয়াছি, আবার শূন্যে ফিরিয়া যাইব। দুই শূন্যের মধ্যবর্তী স্থানে আমরা বাস করি। ভয় বাস করে দুই শূন্যে। এর বেশি এই মুহূর্তে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না।"

আমার বাবা মহাপুরুষ তৈরির কারখানার চিফ ইনজিনিয়ার সাহেব যদিও আমাকে বলেছেন ভয়কে পাশ না-কাটাতে, তবুও আমি ভয়কে পাশ কাটাচ্ছি। সব ভয়কে না—বিশেষ একটা ভয়কে। আচ্ছা, ঘটনাটা বলি।

আমার তারিখ মনে নেই। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হতে পারে। শীত তেমন নেই। আমার গায়ে সুতির একটা চাদর। কানে ঠাণ্ডা লাগছিল বলে চাদরটা মাথার উপর পেঁচিয়ে দিয়েছি। আমি বের হয়েছি পূর্ণিমা দেখতে। শহরের পূর্ণিমার অন্যরকম আবেদন। সোডিয়াম-ল্যাম্পের হলুদ আলোর সঙ্গে মেশে চাঁদের ঠাণ্ডা আলো। এই মিশ্র আলোর আলাদা মজা। তার উপর যদি কুয়াশা হয় তা হলে তো কথাই নেই। কুয়াশায় চাঁদের আলো চারদিকে ছড়ায়। সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো ছড়ায় না। মিশ্র আলোর একটি ছড়িয়ে যাচ্ছে, অন্যটি ছড়াচ্ছে না—খুবই ইন্টারেস্টিং!

সে-রাতে সামান্য কুয়াশাও ছিল। মনের আনন্দেই আমি শহরে ঘুরছি। পূর্ণিমার রাতে লোকজন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ে। অবিশ্বাস্য হলেও ব্যাপারটা সত্যি। অল্প কিছু মানুষ সারা রাত জাগে। তারা ঘুমুতে যায় চাঁদ ডোবার পড়ে।

ইংরেজিতে এই ধরনের মানুষদের একটা নাম আছে Moon Struck. এরা চন্দ্রাহত। এদের চলাফেরায় ঘোর-লাগা ভাব থাকে। এরা কথা বলে অন্যরকম স্বরে। এরা কিন্তু ভুলেও চাঁদের দিকে তাকায় না। বলা হয়ে থাকে চন্দ্রাহত মানুষদের চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ে না। এদের যখন আমি দেখি তখন তাদের ছায়ার দিকে আগে তাকাই।

অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলাম। একসময় মনে হল সোডিয়াম-ল্যাম্পের আলো বাদ দিয়ে জোছনা দেখা যাক। কোনো একটা গলিতে ঢুকে পড়ি। দুটা রিকশা পাশাপাশি যেতে পারে না এমন একটা গলি। খুব ভাল হয় যদি অন্ধগলি হয়। আগে থেকে জানা থাকলে হবে না। হাঁটতে হাঁটতে শেষ মাথায় চলে যাবার পর হঠাৎ দেখব পথ নেই। সেখানে সোডিয়াম ল্যাম্প থাকবে না—শুধুই জোছনা।

ঢুকে পড়লাম একটা গলিতে। ঢাকা শহরের মাঝখানেই এই গলি। গলির নাম বলতে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি না কৌতূহলী কেউ সেই গলি খুঁজে বের করুক। কিছুদূর এগুতেই কয়েটা কুকুর চোখে পড়ল। এরা রাস্তার মাঝখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল—আমাকে দেখে সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সব মিলিয়ে চারটা কুকুর। কুকুরদের স্বভাব হচ্ছে সন্দেহজনক কাউকে দেখলে একসঙ্গে ঘেউঘেউ করে ওঠা। ভয় দেখানোর চেষ্টা। এরা তা করল না। এদের একজন সামান্য একটু এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। বাকি তিনজন তার পেছনে। সামনের কুকুরটা কি ওদের দলপতি? লিডারশিপ ব্যাপারটা কুকুরদের আদিগোত্র নেকড়েদের মধ্যে আছে। কুকুরদের নেই। তবে সামনের কুকুরটাকে লিডার বলেই মনে হচ্ছে। আমি ভাব জমাবার জন্য বললাম, তারপর তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মনমরা হয়ে শুয়ে আছ? Is anything wrong?

কুকুরদের শরীর শক্ত হয়ে গেল। এরা কেউ লেজ নাড়ছে না। কুকুর প্রচণ্ড রেগে গেলে লেজ নাড়া বন্ধ করে দেয়। লক্ষণ ভাল না।

এদের অনুমতি না নিয়ে গলির ভেতর ঢুকে পড়া ঠিক হবে না। কাজেই বিনয়ী গলায় বললাম, যেতে পারি?

আমার ভাষা না বুঝলেও গলার স্বরের বিনয়ী অংশ বুঝতে পারার কথা। অধিকাংশ পশুই তা বোঝে।

এরা নড়ল না। অর্থাৎ এরা চায় না আমি আর এগুই। তখন একটা কাণ্ড হল—আমি স্পষ্টই শুনলাম কেউ একজন আমাকে বলছে—তুমি চলে যাও। জায়গাটা ভাল না—তুমি চলে যাও। চলে যাও।

অবচেতন মনের কোনো খেলা? কোনো কারণে আমি নিজেই গলিতে ঢুকতে ভয় পাচ্ছি বলে আমার অবচেতন মন আমাকে চলে যেতে বলছে? না, ব্যাপারটা তা না। আমি না-ভাবার কোনো কারণ নেই। আসলেই গলির ভেতর ঢুকতে চাচ্ছি। আমাকে গলির ভেতরের জোছনা দেখতে হবে। তারচে বড় কথা হচ্ছে আমি কোনো দুর্বল মনের মানুষ না যে অবচেতন মন আমাকে নিয়ে খেলবে। আর যদি খেলেও থাকে সেই খেলাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। ধরে নিলাম অবচেতন মনই আমাকে চলে যেতে বলছে—অবচেতন মনকে শোনানোর জন্যেই স্পষ্ট করে বললাম, আমার এই গলিতে ঢোকা অত্যন্ত জরুরি। কুকুরগুলি একসঙ্গে আমাকে কামড়ে না ধরলে আমি অবশ্যই যাব।

তখন একটা কাণ্ড হল। সব ক'টা কুকুর একসঙ্গে পেছনের দিকে ফিরল। দলপতি কুকুরটা এগিয়ে গিয়ে দলপতির আসন নিল। তাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতেও সামান্য পরিবর্তন লক্ষ করলাম। পরিবর্তনটা কী বোঝার চেষ্টা করছি তখন অস্পষ্টভাবে লাঠির ঠকঠক আওয়াজ কানে এল। লাঠি-হাতে কেউ কি আসছে? গ্রামের মানুষ সাপের ভয়ে লাঠি ঠকঠক করে যেভাবে পথে হাঁটে তেমন করে কেউ একজন হাঁটছে। পাকা রাস্তায় লাঠির শব্দ। কুকুরদের শ্রবণেন্দ্রীয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তারা কি শব্দের মধ্যে বিশেষ কিছু পাচ্ছে? এদের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা গেল।

অস্থিরতা সংক্রামক। আমার মধ্যেও সেই অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ল। আর তখনই আমি জিনিসটা দেখলাম। লাঠি ঠকঠক করে একনজন 'মানুষ' আসছে। তাকে মানুষ বলছি কেন? সে কি সত্যি মানুষ? সে কিছুদূর এসে থমকে দাঁড়াল। চারটা কুকুর একসঙ্গে ডেকে উঠে থেমে গেল। তারা একটু পিছিয়ে গেল।

আমি দেখলাম রাস্তার ঠিক মাঝখানে যে দাঁড়িয়ে আছে তার চোখ, নাক, মুখ, কান কিছুই নেই। ঘাড়ের উপর যা আছে তা একদলা হলুদ মাংসপিণ্ড ছাড়া আর কিছু না। সেই মাংসপিণ্ডটা চোখ ছাড়াও আমাকে দেখতে পেল, সে লাঠিটা আমার দিকে উঁচু করল। আমি দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা লক্ষ করলাম তা হচ্ছে চাঁদের আলোয় লাঠিটার ছায়া পড়েছে, কিন্তু 'মানুষটা'র কোনো ছায়া পড়েনি। ধক করে নাকে পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। বিকট সেই গন্ধ। পাকস্থলি উলটে আসার উপক্রম হল।

আমার মাথার ভেতর আবারও কেউ একজন কথা বলল, এখনও সময় আছে, দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও। এই জিনিসটা যদি তোমার দিকে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তুমি আর পালাতে পারবে না। কুকুরগুলি তোমাকে রক্ষা করছে। আরও কিছুক্ষণ রক্ষা করবে। তুমি দৃষ্টি না ফিরিয়ে নিয়ে পেছন দিকে হাঁটতে শুরু করো। খবর্দার, এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাবে না। এবং মনে রেখো কখনো এই গলিতে ঢুকবে না। কখনো না। এই গলি তোমার জন্যে নিষিদ্ধ।

আমি আস্তে আস্তে পেছন দিকে হাঁটছি—কুকুরগুলিও আমার হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে পেছন দিকে যাচ্ছে।

জিনিসটার কোনো চোখ নেই। চোখ থাকলে বলতাম— জিনিসটা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, চোখ ছাড়াও তা হলে দেখা যায়!

মাথার ভেতর আবারও কেউ একজন কথা বলল, তুমি জিনিসটার সীমার বাইরে চলে এসেছ। জিনিসটার ক্ষমতা প্রচণ্ড। কিন্তু তার ক্ষমতার সীমা খুব ছোট। এই গলির বাইরে আসার তার ক্ষমতা নেই। তুমি এখন চলে যেতে পার।

আমি চলে গেলাম না। জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে তার লাঠি নামিয়ে ফেলেছে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। তার গায়ে কাঁথার মতো একটা মোটা কাপড়। এই কাপড়টাই শরীরে জড়ানো। সে হাঁটছে হেলেদুলে। একবার মনে হচ্ছে বামে হেলে পড়ে যাবে, আবার মনে হচ্ছে ডানে হেলে পড়ে যাবে। জিনিসটাকে এখন আগের চেয়ে অনেক লম্বা দেখাচ্ছে। যতই সে দূরে যাচ্ছে ততই লম্বা হচ্ছে। জিনিসটা আমার দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। কুকুরগুলি ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে। ওদের দলপতি শুধু একবার আমার দিক তাকিয়ে ঘেউঘেউ করল। মনে হয় কুকুরের ভাষায় বলল, যাও, বাসায় চলে যাও।

ডিসেম্বর মাসের শীতেও আমার শরীর ঘামছে। হাঁটার সময় লক্ষ করলাম ঠিকমতো পা ফেলতে পারছি না। রাস্তা কেমন উঁচুনিচু লাগছে। নতুন নতুন চশমা পরলে যা হয় তা-ই হচ্ছে। বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। কাচের জগভরতি একজগ ঠাণ্ডা পানি এক চুমুকে খেতে পারলে হত। কার কাছে পানি চাইব? কিছুক্ষণ হাঁটার পর মনে হল আমার দিক-ভুল হচ্ছে। আমি কোথায় আছি বুঝতে পারছি না। কোনদিকে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রিকশা চোখে পড়ছে না যে কোনো একটা রিকশায় উঠে বসব। হোঁস হোঁস করে কিছু গাড়ি চলে যাচ্ছে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকলে এরা কেউ কি থামাবে? না, কেউ থামাবে না। ঢাকার গাড়ি-যাত্রীরা পথচারীর জন্যে গাড়ি থামায় না। নিয়ম নেই। আমি ফুটপাতেই বসে পড়লাম। আমার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। অনেক্ষণ ধরে বমি চেপে রেখেছিলাম। বসামাত্রই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল।

'আফনের কী হইছে?'

মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম। ফুটপাতে বস্তা মুড়ি দিয়ে যারা ঘুমায় তাদের একজন। বস্তার ভেতর থেকে মাথা বের করেছে। তার গলায় মমতার চেয়ে বিরক্তি বেশি।

আমি বললাম, শরীর ভাল না।

'মিরগি ব্যারাম আছে?'

'না। পানি খাওয়া যাবে—? পানি খাওয়া দরকার।'

'রাইতে পানি কই পাইবেন?'

'রাতে পানির পিপাসা পেলে আপনারা পানি কোথায় পান?'

লোকটা বস্তার ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দিল। আমার উদ্ভট প্রশ্নে সে হয়তো বিরক্ত হচ্ছে। প্রশ্নটা তেমন উদ্ভট ছিল না। এই যে অসংখ্য মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, রাতে পানির তৃষ্ণা পেলে তারা পানি পায় কোথায়?

ক'টা বাজছে জানা দরকার। রাত শেষ হয়ে গেলে রিকশা বেবিট্যাক্সি চলা শুরু করবে—তখন আমার একটা গতি হলেও হতে পারে। বিটের পুলিশও দেখছি না। পূর্ণিমারাতে বোধহয় বিটের পুলিশ বের হয় না।

আমি বস্তা মুড়ি দেয়া লোকটার দিকে তাকিয়ে ডাকলাম, ভাইসাহেব! এই যে ভাইসাহেব! এই যে বস্তা-ভাইয়া!

একা বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। বমি হয়ে যাওয়ায় শরীরটা একটু ভাল লাগছে, তবে ভয়টা মাথার ভেতরে ঢুকে আছে।

কারও সঙ্গে কথাটথা বলতে থাকলে হয়তো-বা তাকে ভুলে থাকা যাবে। আমি গলা উঁচিয়ে ডাকলাম, এই যে বস্তা-ভাই, ঘুমিয়ে পড়লেন?

লোকটা বিরক্ত মুখে বস্তার ভেতর থেকে মুখ বের করল।

'কী হইছে?'

'এটা কোন জায়গা? জায়গাটার নাম কী?'

'চিনেন না?'

'জি না।'

'বুঝছি, মাল খাইয়া আইছেন। আরেক দফা গলাতে আঙুল দিয়া বমি করেন—শইল ঠিক হইব। আরেকটা কথা কই ভাইজান, আমারে ত্যক্ত করবেন না।'

'রাত কত হয়েছে বলতে পারেন?'

'জে না, পারি না।'

লোকটা আবার বস্তার ভেতর ঢুকে গেল। লোকটার পাশে খালি জায়গায় শুয়ে পড়ব? গায়ে চাদর আছে। চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে বাকি রাতটা পার করে দেয়া যায়। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শুয়ে অনেক রাত কাটিয়েছি। গাছের তলায় ঘুমিয়েছি। ফুটপাথে ঘুমানো হয়নি।

বস্তা-ভাইয়ের পাশে শুয়ে পড়ার আগে কি তার অনুমতি নেয়ার দরকার আছে? ফুটপাথে যারা ঘুমোয় তাদের নিয়মকানুন কী? তাদেরও নিশ্চয়ই অলিখিত কিছু নিয়মকানুন আছে? ফুটপাতে অনেক পরিবার রাত কাটায়—স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের সোনার সংসার। সেইরকম কোনো পরিবারের পাশে নিশ্চয়ই উটকো ধরনের কেউ মাথার নিচে ইট বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারে না?

'বস্তা-ভাই। এই যে বস্তা-ভাই!

'আবার কী হইছে?'

'আপনার পাশের ফাঁকা জায়গাটায় কি শুয়ে পড়তে পারি? যদি অনুমতি দেন।'

বস্তা-ভাই জবাব দিলেন না, তবে সরে গিয়ে খানিকটা জায়গা করলেন। এই প্রথম লক্ষ করলাম—বস্তা-ভাই একা ঘুমাচ্ছেন না, তার সঙ্গে তার পুত্রও আছে। তিনি পুত্রকেও নিজের দিকে টানলেন এবং কঠিন গলায় বললেন, বস্তা-ভাই বস্তা-ভাই করতেছেন কেন? ইয়ারকি মারেন? গরিবরে লইয়া ইয়ারকি করতে মজা লাগে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না রে ভাই, ইয়ারকি করছি না। গরিব নিয়ে ইয়ারকি করব কী, আমিও আপনাদের দলে। মুখভরতি বমি। মুখ না ধুয়ে ঘুমুতে পারব না। পানি কোথায় পাব বলে দিন। একটু দয়া করুন।'

বস্তা-ভাই দয়া করলেন। আঙুল উঁচিয়ে কী যেন দেখালেন। আমি এগিয়ে গেলাম। সম্ভবত কোনো চায়ের দোকান। দোকানের পেছনে জালাভরতি পানি। মিনারেল ওয়াটারের একটা খালি বোতলও আছে। আমি পানি দিয়ে মুখ ধুলাম। দুই বোতলের মতো পানি খেয়ে ফেললাম। এক বোতল পানি ঢেলে দিলাম গায়ে। ভয় নামক যে-ব্যাপারটা শরীরে জড়িয়ে আছে—পানিতে তা ধুয়ে ফেলার একটা চেষ্টা। তারপর শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি শুয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে চোখ জড়িয়ে গেল। আমি তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে। কোনো এক পর্যায়ে কেউ একজন সাবধানে আমার গায়ের চাদর তুলে নিয়ে চলে গেল। তাতেও আমার ঘুম ভাঙল না। সারা রাত আমার গায়ে চাঁদের আলোর সঙ্গে পড়ল ঘন হিম। যখন ঘুম ভাঙল তখন আমার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। নিশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছি না। দিনের আলোয় রাতের ভয়টা থাকার কথা না, কিন্তু লক্ষ করলাম ভয়টা আছে। গুটিসুটি মেরে ছোট হয়ে আছে। তবে সে ছোট হয়ে থাকবে না। যেহেতু সে একটা আশ্রয় পেয়েছে সে বাড়তে থাকবে।

জ্বরে আমার শরীর কাঁপছে। চিকিৎসা শুরু হওয়া দরকার। সবচে ভাল বুদ্ধি হাসপাতালে ভরতি হয়ে যাওয়া। হাসপাতালে ভরতির নিয়মকানুন কী? দরখাস্ত করতে হয়? নাকি রোগীকে উপস্থিত হয়ে বলতে হয়—আমি হাসপাতালে ভরতি হবার জন্যে এসেছি? আমার রোগ গুরুতর। বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখুন। চিকিৎসার চেয়ে আমার যেটা বেশি দরকার তা হচ্ছে সেবা। ঘরে সেবা করার কেউ নেই। হাসপতালের নার্সরা নিশ্চয়ই সেবাও করবেন। গভীর রাতে চার্জ-লাইট হাতে নিয়ে বিছানায়-বিছানায় যাবেন, রোগের প্রকোপ কেমন দেখবেন। স্যার, দয়া করে আমাকে ভরতি করিয়ে নিন!

হাসপাতালে ভরতি হওয়া যতটা জটিল হবে ভেবেছিলাম দেখা গেল ব্যাপারটা মোটেই তত জটিল না। একজনকে দেখলাম দুটাকা করে কী একটা টিকিট বিক্রি করছে। খুব কঠিন ধরনের চেহারা। সবাইকে ধমকাচ্ছে। তাকে বললাম, ভাই, আমার এই মুহূর্তে হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। কী করতে হবে একটু দয়া করে বলে দিন।

সে বিস্মিত হয়ে বলল, হাসপাতালে ভরতি হবেন?

'জি।'

'নিয়ে এসেছে কে আপনাকে?'

'কেউ নিয়ে আসেনি। আমি নিজে নিজেই চলে এসেছি। আমি আর বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব।'

'আপনার হয়েছে কী?'

'ভূত দেখে ভয় পেয়েছি। ভয় থেকে জ্বর এসে গেছে।'

'ভূত দেখেছেন?'

'জি স্যার।'

'আমার কাছে এসেছেন কেন? আমি তো আউটডোর পেশেন্ট রেজিস্ট্রেশন স্লিপ দিই।'

'কার কাছে যাব তা তো স্যার জানি না।'

'আচ্ছা, আপনি বসুন ঐ টুলটায়।'

'টুলে বসতে পারব না। মাথা ঘুরে পড়ে যাব। আমি বরং মাটিতে বসি।'

'আচ্ছা বসুন।'

'থ্যাংক য়্যু স্যার।'

'আমাকে স্যার বলার দরকার নেই। যাদের স্যার বললে কাজ হবে তাদের বলবেন।'

'আপনাকে বলাতেও কাজ হয়েছে। আপনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।'

'আমি ব্যবস্থা করব কী? আমি দুই পয়সার কেরানি। আমার কি সেই ক্ষমতা আছে? যারা ব্যবস্থা করতে পারবেন তাদের কাছে নিয়ে যাব—এইটুকু।'

'স্যার, এইটুকুই-বা কে করে?'

এই লোক আমাকে একজন তরুণী-ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। খুবই ধারালো চেহারা। কথাবার্তাও ধারালো। আমি এই তরুণীর কঠিন জেরার ভেতর পড়ে গেলাম।

'আপনার নাম কী?'

'ম্যাডাম, আমার নাম হিমু।'

'আপনার ব্যাপার কী?'

'ম্যাডাম, আমি খুবই অসুস্থ। আমার এক্ষুনি হাসপাতালে ভরতি হওয়া দরকার। ভূত দেখে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছি।'

'আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসা হওয়া দরকার—আপনি হাসপাতালে ভরতি হতে চান—খুব ভাল কথা। দরিদ্র দেশের সীমিত সুযোগ-সুবিধার ভেতর যতটুকু করা যায়—আপনার জন্যে ততটুকু করা হবে। হাসপাতালে সিট নেই। আপনার কি ধারণা হোটেলের মতো আমরা বিছানা সাজিয়ে বসে আছি! আপনাদের জ্বর হবে, সর্দি হবে—আপনারা এসে বিছানায় শুয়ে পড়বেন। নার্সকে ডেকে বলবেন, কোলবালিশ দিয়ে যাও। এই আপনার ধারণা?'

'জি না ম্যাডাম।'

'আপনি কি ভেবেছেন উদ্ভট একটা গল্প বললেই আমরা আপনাকে ভরতি করিয়ে নেব? ভূত দেখে জ্বর এসে গেছে? রসিকতা করার জায়গা পান না!'

'ম্যাডাম, সত্যি দেখেছি। আপনি চাইলে আমি পুরো ঘটনা বলতে পারি।'

'আমি আপনার ঘটনা শুনতে চাচ্ছি না।'

'ম্যাডাম, আপনি কি ভূত বিশ্বাস করেন না?'

'আপনি দয়া করে কথা বাড়াবেন না।'

'শেকসপীয়ারের মতো মানুষও কিন্তু ভূত বিশ্বাস করতেন। তিনি হ্যামলেটে বলেছেন—There are many things in heaven and Earth. আমার ধারণা তিনি ভূত দেখেছেন। এদিকে আমাদের রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন—'

'স্টপ ইট।'

আমি 'স্টপ' করলাম।

তরুণী-ডাক্তার আমাকে যে-লোকটি নিয়ে এসেছিল (নাম রশীদ) তার দিকে কঠিন চোখে তাকালেন। রশীদ বেচারা জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো মিইয়ে গেল।

'রশীদ!'

'জি আপা?'

'একে এখান থেকে নিয়ে যাও। ফালতু ঝামেলা আমার কাছে আর কখনো আনবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে আছি। আমাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তরুণী-ডাক্তার আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছেন। চোখ মেলতেই তিনি বললেন, হিমু সাহেব, এখন কেমন বোধ করছেন?

'ভাল।'

এইটুকু বলে আমি দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারালাম, কিংবা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

হাসপাতালের তৃতীয় দিনে আমাকে দেখতে এলেন মেজো ফুপা—বাদলের বাবা। তাঁর হাতে এক প্যাকেট আঙুর। একটা সময় ছিল যখন মৃত্যুপথযাত্রীকে দেখতে যাবার সময় আঙুর নিয়ে যাওয়া হত। ফলের দোকানি আঙুর বিক্রির সময় মমতামাখা গলায় বলত—রুগির অবস্থা সিরিয়াস?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আঙুর একশো টাকা কেজি—বরই বরং এই তুলনায় দামি ফল।

মেজো ফুপা আমার পাশে বসতে বসতে বললেন, অবস্থা কী?

আমি জবাব দিলাম। কেউ রোগী দেখতে এসে যদি দেখে রোগী দিব্যি সুস্থ, পা নাচাতে নাচাতে হিন্দি গান গাইছে—তখন সে শকের মতো পায়। যদি দেখে রোগীর অবস্থা এখন-তখন, শ্বাস যায়-যায় অবস্থা, তখন মনে শান্তি পায়—যাক, কষ্ট করে আসাটা বৃথা যায়নি। কাজেই ফুপার প্রশ্নে আমি চোখমুখ করুণ করে ফেললাম, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে এরকম একটা ভাবও করলাম।

'জবাব দিচ্ছিস না কেন? অবস্থা কী?'

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভাল। এখন একটু ভাল।

তোকে খুঁজে বের করতে খুবই যন্ত্রণা হয়েছে, কোন ওয়ার্ড, বেড নাম্বার কী কেউ জানে না।

'ও আচ্ছা।'

'একবার তো ভেবেছি ফিরেই চলে যাই। নেহায়েত আঙুর কিনেছি বলে যাইনি। আঙুর খেতে নিষেধ নেই তো?'

'জি না।'

'নে, আঙুর খা।'

আমি টপাটপ আঙুর মুখে ফেলছি আর ভাবছি—ব্যাপারটা কী? আমি যে হাসপাতালে, এই খোঁজ ফুপা পেলেন কোথায়? কাউকেই তো জানানো হয়নি। আমি বিরাট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না যে খবরের কাগজে নিউজ চলে গেছে—

হিমুর সর্দিজ্বর

জনদরদি দেশনেতা প্রাণপ্রিয় হিমু সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে যান। কিছুক্ষণ তাঁর শয্যাপার্শ্বে থেকে তাঁর আশু আরোগ্য কামনা করেন। মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্যও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বনমন্ত্রী, তেল ও জ্বালানি মন্ত্রী, ত্রাণ উপমন্ত্রী। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন—হিমু সাহেবের শারীরিক অবস্থা এখন ভাল। হিমু সাহেবের ভক্তবৃন্দের চাপে হাসপাতালের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁরা যেন হিমু সাহেবকে বিরক্ত না করেন। হিমু সাহেবের দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। তাঁর শরীরের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বুলেটিন প্রতিদিন দুপুর বারোটায় প্রকাশ করা হবে।

আমি যে হাসপাতালে এই খবর তো আমার কাঁধের দুই ফেরেশতা ছাড়া আর কারোরই জানার কথা না! ধরা যাক খবরটা সবাই জানে, তার পরেও ফুপা হাসপাতালে চলে আসবেন এটা হয় না। এত মমতা আমার জন্যে বাদল ছাড়া আর কারোরই নেই। অন্য কোনো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা কী?

'ফুপা, আমি যে হাসপাতালে এটা জানলেন কীভাবে? পেপারে নিউজ হয়েছে?'

'পেপারে নিউজ হবে কেন? তুই কে? হাসপাতাল থেকে আমাকে টেলিফোন করেছে।'

'আপনার নাম্বার ওরা পেল কোথায়?'

'তুই দিয়েছিস।'

আমার মনে পড়ল কোনো এক সময় হাসপাতালে ভরতির ফরম তরুণী-ডাক্তার নিয়ে এসেছিলেন। তিনি নিজেই ফিলআপ করেছেন এবং আগ বাড়িয়ে অসুখের খবর দিয়েছেন।

'খুব মিষ্টি গলার একজন মেয়ে-ডাক্তার আপনাকে খবর দিয়েছে, তাই না?'

'হুঁ। তোর সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল।'

'কী জানতে চাচ্ছিল?'

'তুই কী করিস না-করিস এইসব। তোর হলুদ পাঞ্জাবি, উদ্ভট কথাবার্তা শুনে ভড়কে গেছে আর কি! তুই আর কিছু পারিস বা না পারিস মানুষকে ভড়কাতে পারিস।'

'ডাক্তাররা এত সহজে ভড়কায় না। তারপর বলুন ফুপা, আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'তোকে দেখতে এসেছি আর কি।'

'আমাকে দেখতে হাসপাতালে চলে আসবেন এটা বিশ্বাসযোগ্য না। ঘটনা কী?'

'বাদলের ব্যাপারে তোর সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

ফুপা ইতস্তত করে বললেন।

আমি শান্ত গলায় বললাম, বাদলকে নিয়ে তো আপনার এখন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সে কানাডায়। আমার প্রভাববলয় থেকে অনেক দূরে। আমার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হচ্ছে না। নাকি সে কানাডাতেও খালিপায়ে হাঁটা শুরু করেছে?

ফুপা চাপা-গলায় বললেন, বাদল এখন ঢাকায়।

'ও আচ্ছা।'

'মাসখানিক থাকবে। তোর কাছে আমার অনুরোধ এই এক মাস তুই গা-ঢাকা দিয়ে থাকবি। ওর সঙ্গে দেখা করবি না।'

'গা ঢাকা দিয়েই তো আছি। হাসপাতালে লুকিয়ে আছি।'

'হাসপাতালে তো আর এক মাস থাকবি না, তোকে নাকি আজকালেল মধ্যেই ছেড়ে দেবে।'

'আমাকে বাদলের কাছ থেকে একশো হাত দূরে থাকতে হবে, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'নো প্রবলেম।'

'শোন হিমু, আমরা চাচ্ছি ওর একটা বিয়ে দিতে। মোটামুটি নিমরাজি করিয়ে ফেলেছি। এখন তুই যদি ভুজং ভাজং দিস তা হলে তো আর বিয়ে হবে না। সে হলুদ পাঞ্জাবি পরে হাঁটা দেবে।'

'আমি কেন ভুজং ভাজং দেব?'

'তোকে দিতে হবে না। তোকে দেখলেই ওর মধ্যে আপনা-আপনি ভুজং ভাজং হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে তাকে নরম্যাল করেছি, সব জলে যাবে।'

'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

'কথা দিচ্ছিস?'

'হুঁ।'

'বাদল এয়ারপোর্টে নেমেই বলেছে—হিমুদা কোথায়? আমি মিথ্যা করে বলেছি, সে কোথায় কেউ জানে না।'

'ভাল বলেছেন।'

'মেসের ঠিকানা চাচ্ছিল—তোর আগের মেসের ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি।'

'খুবই ভাল করেছেন, আগের ঠিকানায় খোঁজ নিতে গিয়ে ঠক খাবে।'

'খোঁজ নিতে এর মধ্যেই গিয়েছে। ছেলেটাকে নিয়ে কী যে দুশ্চিন্তায় আছি! বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। আমাকে আর চিন্তা করতে হবে না। চিন্তা-ভাবনা যা করার বৌমা করবে।'

'বিয়ে ঠিকঠাক করে ফেলেছেন?'

'কয়েকটা মেয়ে দেখা হয়েছে—এর মধ্যে একটাকে তোর ফুপুর পছন্দ হয়েছে। মেয়ের নাম হল—চোখ।'

'মেয়ের নাম চোখ?'

'হ্যাঁ, চোখ। আজকাল কি নামের কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে! যার যা ইচ্ছা নাম রাখছে।'

'চোখ নাম হবে কীভাবে! আঁখি না তো?'

'ও হ্যাঁ, আঁখি। সুন্দর মেয়ে—ফড়ফড়ানি টাইপ। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তিনটা কথা বলে। বাদলের সঙ্গে মানাবে। একজন কথা বলে যাবে, একজন শুনে যাবে।'

'মেয়ে আপনার পছন্দ না?'

'তোর ফুপুর পছন্দ। পুরুষমানুষের কি সংসারে কোনো say থাকে? থাকে না। পুরুষরা পেপার-হেড হিসেবে অবস্থান করে। নামে কর্তা, আসলে ভর্তা। তুই বিয়ে না করে খুব ভাল আছিস। দিব্যি শরীরে বাতাস লাগিয়ে ঘুরছিস। তোকে দেখে হিংসা হয়। স্বাধীনতা কী জিনিস তার কী মর্ম সেটা বোঝে শুধু বিবাহিত পুরুষরাই। উঠিরে হিমু।'

'আচ্ছা।'

'বাদলের প্রসঙ্গে যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে।'

'ও আচ্ছা, তোর অসুখের ব্যাপারটাই তো কিছু জানলাম না। কী অসুখ?'

'ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'ঠাণ্ডা লাগল কীভাবে?'

'ফুটপাতে চাদর-গায়ে শুয়েছিলাম। চোর চাদর নিয়ে গেল।'

'ফুটপাতে ঘুমুচ্ছিলি?'

'জি'।

'ঘরে ঘুমুতে আর ভাল লাগে না?'

'তা না—'

'শোন হিমু, বাদলের কাছ থেকে দূরে থাকবি। মনে থাকে যেন।'

'মনে থাকবে।'

'টাকাপয়সা কিছু লাগবে? লাগলে বল, লজ্জা করিস না। ধর, পাঁচশো টাকা রেখে দে। অষুধপত্র কেনার ব্যাপার থাকতে পারে।'

আমি নোটটা রাখলাম। ফুপা চিন্তিত ভঙ্গিতে বের হয়ে গেলেন। ছেলে আমার ফাঁদে পড়ে যদি আবার ফুটপাতে শয্যা পাতে! কিছুই বলা যায় না।

হাসপাতাল আমার বেশ পছন্দ হল। হাসপাতালের মানুষগুলির ভেতর একটা মিল আছে। সবাই রোগী। রোগযন্ত্রণায় কাতর। ব্যাধি সব মানুষকে এক করে দিয়েছে। একজন সুস্থ মানুষ অপরিচিত একজন সুস্থ মানুষের জন্যে কোনো সহমর্মিতা বোধ করবে না, কিন্তু একজন অসুস্থ মানুষ অন্য একজন অসুস্থ মানুষের জন্যে করবে।

হাসপাতালে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে না। সকালে নাশতা আসছে। দুবেলা খাবার আসছে। দুনম্বরি ব্যবস্থাও আছে। জায়গামতো টাকা খাওয়ালে স্পেশাল ডায়েটের ব্যবস্থা হয়। ডাক্তারদের অনেক সংস্থা টংস্থা আছে। করুণ গলায় তরুণ ডাক্তারদের কাছে অভাবের কথা বলতে পারলে ফ্রি অষুধ তো পাওয়া যায়ই, পথ্য কেনার টাকাও পাওয়া যায়।

রোগ সেরে গেছে, তার পরেও কিছুদিন হাসপাতালে থেকে শরীর সারাবার ব্যবস্থাও আছে। খাতাপত্রে নাম থাকবে না—কিন্তু বেড থাকবে। এক-একদিন এক-এক ওয়ার্ডে গিয়ে ঘুমুতে হবে।

ছেলেমেয়ে নিয়ে গত সাত মাস ধরে হাসপাতালে বাস করছে এমন একজনের সন্ধানও পাওয়া গেল। নাম ইসমাইল মিয়া। স্ত্রীর ক্যানসার হয়েছিল, তাকে হাসপাতালে ভরতি করিয়ে মাসখানিক চিকিৎসা করাল। সেই থেকে ইসমাইল মিয়ার হাসপাতালের সঙ্গে পরিচয়। ধীরে ধীরে পুরো পরিবার নিয়ে সে হাসপাতালে পার হয়ে গেল। স্ত্রী মরে গেছে। তাতে অসুবিধা হয়নি। বাচ্চারা হাসপাতালের বারান্দায় খেলে। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ডে ঘোরে। কেউ

কিছু বলে না। ইসমাইল মিয়া দিনে বাইরে কাজকর্ম করে (মনে হয় দুনম্বরি কাজ—চুরি, ফটকাবাজি)। রাতে হাসপাতালে এসে ছেলেমেয়েদের খুঁজে বের করে। ঘুমানোর একটা ব্যবস্থা করে।

ইসমাইল মিয়ার সঙ্গে পরিচয় হল। অতি ভদ্র। অতি বিনয়ী। হাসিমুখ ছাড়া কথা বলে না। তার মধ্যে দার্শনিক ব্যাপারও আছে। আমি বললাম, হাসপাতালে আর কতদিন থাকবে?

ইসমাইল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, ক্যামনে বলি ভাইজান? আমার হাতে তো কিছু নাই।

'তোমার হাতে নেই কেন?'

'সব তো ভাইজান আল্লাহ্‌পাকের নির্ধারণ। আল্লাহ্‌পাক নির্ধারণ করে রেখেছে আমি বালবাচ্চা নিয়া হাসপাতালে থাকব—এইজন্যে আছি। যেদিন নির্ধারণ করবেন আর দরকার নাই—সেইদিন বিদায়।'

'তা তো বটেই।'

'আল্লাহ্‌পাকের হুকুম ছাড়া তো ভাইজান কিছুই হওনের উপায় নাই।'

'তাও ঠিক।'

'সামান্য যে পিপীলিকা আল্লাহ্‌পাক তারও খবর রাখেন। আপনার পায়ের তলায় পইরা দুইটা পিপীলিকার মৃত্যু হবে তাও আল্লাহ্‌পাকের বিধান। আজরাইল আলাইহেস সালাম আল্লাহ্‌পাকের নির্দেশে দুই পিপীলিকার জান কবজ করবে।'

'ও আচ্ছা।'

'এইজন্যেই ভাইজান কোনোকিছু নিয়া চিন্তা করি না। যার চিন্তা করার কথা সে-ই চিন্তা করতেছে। আমি চিন্তা কইরা কী করব।'

'কার চিন্তা করার কথা?'

'কার আবার, আল্লাহ্‌পাকের!'

ইসমাইল মিয়া খুবই আল্লাহ্‌ভক্ত। সমস্যা হচ্ছে তার প্রধান কাজ—চুরি। চুরির পক্ষেও সে ভাল যুক্তি দাঁড় করিয়েছে—

'চুরিতে আসলে কোনো দোষ নাই ভাইজান। ভালুক কী করে? পেটে খিদা লাগলে মৌমাছির মৌচাক থাইক্যা মধু চুরি করে। এর জন্যে ভালুকের দোষ হয় না। এখন বলেন মানুষের দোষ হইব ক্যান?'

বগার মা নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গেও পরিচয় হল। সে ঝাড়ফুঁক করে। ঝাড়ার কাঠি নিয়ে রোগীদের ঝাড়ে। তাতে নাকি অতি দ্রুত রোগ আরোগ্য হয়। হাসপাতালে সর্বাধুনিক চিকিৎসার সাথে সাথে চলে ঝাড়ফুঁক।

এই বৃদ্ধা দশটাকার বিনিময়ে আমাকেও একদিন ঝেড়ে গেলেন। আমি দশটাকার বাইরে আরও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ঝাড়ার মন্ত্র খানিকটা শিখে নিলাম।

"ও কালী সাধনা
বিষ্টু কালী মাতা।
উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম।
রাও নাও—ঈশানের যাও

বগার মা'র সঙ্গে অনেক গল্পগুজবও করলাম। জানা গেল বগা বলে তাঁর কোনো ছেলে বা মেয়ে নেই। তাঁর তিনবার বিয়ে হয়েছিল। কোনো ঘরেই কোনো সন্তান হয়নি। কী করে তাঁর নাম বগার মা হয়ে গেল তিনি নিজেও জানেন না।

আমি বললাম, মা, ঝাড়ফুঁকে রোগ সারে?

বগার মা অতি চমৎকৃত হয়ে বললেন, কী কও বাবা! ঠিকমতো ঝাড়তে পালে ক্যানসার সারে।

'আপনি সারিয়েছেন?'

'অবশ্যই—ত্রিশ বচ্ছর ধইরা ঝাড়তেছি। ত্রিশ বচ্ছরে ক্যানসার ম্যানসার কত কিছু ভাল করেছি। একটা কচকা ঝাড়া দশটা "পেনিসিলি" ইনজেকশনের সমান। বাপধন, তোমারে যে ঝাড়া দিলাম এই ঝাড়ায় দেখবা আইজ দিনে-দিনে সিধা হইয়া দাঁড়াইবা।'

হাসপাতালে আমি অনেককিছুই শিখলাম। হাসপাতালের ব্যাপারটা সম্ভবত আমার বাবার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। নয়তো তিনি অবশ্যই তাঁর পুত্রকে কিছুদিন হাসপাতালে রেখে দিতেন। এবং তাঁর বিখ্যাত উপদেশমালার সঙ্গে আরও একটি উপদেশ যুক্ত হত—

"প্রতি দুই বৎসর অন্তর হাসপাতালে সাতদিন থাকিবার ব্যবস্থা করিবে। মানুষের জরা-ব্যাধি ও শোক তাহাদের পার্শ্বে থাকিয়া অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যাধি কী, জীবজগৎকে ব্যাধি কেন বারবার আক্রমণ করে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে। তবে মনে রাখিও, ব্যাধিকে ঘৃণা করিবে না। ব্যাধি জীবনেরই অংশ। জীবন আছে বলিয়াই ব্যাধি আছে।"

'কেমন আছেন হিমু সাহেব?'

'জি ম্যাডাম, ভাল আছি।'

'আপনার বুকে কনজেশন এখনও আছে। অ্যান্টিবায়োটিক যা দেয়া হয়েছে—কনটিনিউ করবেন। সেরে যাবে।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'আপনাকে রিলিজ করে দেয়া হয়েছে, আপনি চলে যেতে পারেন।'

'থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।'

'প্রতিটি বাক্যে একবার করে ম্যাডাম বলছেন কেন? ম্যাডাম শব্দটা আমার পছন্দ না। আর বলবেন না।'

'জি আচ্ছা, বলব না।'

'আপনার হাতে কি সময় আছে? সময় থাকলে আমার চেম্বারে আসুন। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

'জি আচ্ছা।'

আমি তরুণী-ডাক্তারের পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তাঁর নাম ফারজানা। সুন্দর মানুষকেও সব সময় সুন্দর লাগে না। কখনো খুব সুন্দর লাগে, কখনো মোটামুটি লাগে। এই তরুণীকে আমি যতবার দেখেছি ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। অ্যাপ্রন ফেলে দিয়ে ফারজানা যদি ঝলমলে একটা শাড়ি পরত তা হলে কী হত? ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক, কপালে টিপ। হালকা নীল একটা শাড়ি—কানে ঝুলবে নীল পাথরের ছোট্ট দুল। এই মেয়ে কি বিয়েবাড়িতে সেজেগুজে যায় না? তখন চারদিকে অবস্থাটা কী হয়? বিয়ের কনে নিশ্চয়ই মন-খারাপ করে ভাবে—এই মেয়েটা কেন এসেছে। আজকের দিনে আমাকে সবচে সুন্দর দেখানোর কথা। এই মেয়েটা সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে। এটা সে পারে না।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'বসুন।'

আমি বসলাম। আমার সামনে পিরিচে ঢাকা একটা চায়ের কাপ। ফারজানার সামনেও তাই। চা তৈরি করে সে আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি তাঁর ভেতরে সামান্য হলেও কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে পেরেছি।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'কেউ দিলে খাই।'

'নিন, সিগারেট নিন। ডাক্তাররা সব রোগীকে প্রথম যে-উপদেশ দেয় তা হচ্ছে—সিগারেট ছাড়ুন। সেখানে আমি আপনাকে সিগারেট দিচ্ছি—কারণ কী বলুন তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

'কারণ, আমি নিজে একটা সিগারেট খাব। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সিগারেট ধরেছিলাম। ছেলেরা সিগারেট খাবে, আমরা মেয়েরা কেন খাব না? এখন এমন অভ্যাস হয়েছে। এর থেকে বেরুতে পারছি না। চেষ্টাও অবশ্যি করছি না।'

ফারজানা সিগারেট ধরাল। আশ্চর্য—সিগারেটটাও তার ঠোঁটে মানিয়ে গেল! পাতলা ঠোঁটের কাছে জ্বলন্ত আগুন। বাহ্ কী সুন্দর! সুন্দরী তরুণীদের ঘিরে যা থাকে সবই কি সুন্দর হয়ে যায়?

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'এখন গল্প করুন। আপনার গল্প শুনি।'

'কী গল্প শুনতে চান?'

'আপনি অস্বাভাবিক একটা দৃশ্য দেখে ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পেয়ে অসুখ বাঁধিয়েছেন। সেই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা কী আমি জানতে চাচ্ছি।'

'কেন জানতে চাচ্ছেন?'

'জানতে চাচ্ছি—কারণ এই পৃথিবীতে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটে না। পৃথিবী চলে তার স্বাভাবিক নিয়মে। মানুষ সেইসব নিয়ম একে একে জানতে শুরু করেছে—এই সময় আপনি যদি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখতে শুরু করেন তা হলে তো সমস্যা।'

'মানুষ কি সবকিছু জেনে ফেলেছে?'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সবকিছু না জানলেও অনেক-কিছুই জেনেছে। ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হল তাও জেনে গেছে।

আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে হাসিমুখে বললাম, ইউনিভার্স কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে?

'বিগ ব্যাং থেকে সবকিছুর শুরু। আদিতে ছিল প্রিমরডিয়েল অ্যাটম যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা কিছুই নেই। সেই অ্যাটম বিগ ব্যাং এ ভেঙে গেল—তৈরি হল স্পেস এবং টাইম। সেই স্পেস ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এক্সপানডিং ইউনিভার্সে।'

'সময়ের শুরু তা হলে বিগ ব্যাং থেকে?'

'হ্যাঁ।'

'বিগ ব্যাং-এর আগে সময় ছিল না?'

'না।'

'বিগ ব্যাং-এর আগে তা হলে কী ছিল?'

'সেটা মানুষ কখনো জানতে পারবে না। মানুষের সমস্ত বিদ্যা এবং জ্ঞানের শুরুও বিগ ব্যাং-এর পর থেকেই।'

'তা হলে তো বলা যেতে পারে—জ্ঞানের একটা বড় অংশই মানুষের আড়ালে রেখে দেয়া হয়েছে।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছেন?'

'না, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না। তারা যা বলে তা-ই হাসিমুখে মেনে নিই।'

'সস্তা ধরনের কনভারসেশন আমার সঙ্গে দয়া করে করবেন না। 'সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে আমি তর্ক করি না এটা বহু পুরাতন ডায়ালগ'। বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। শুনলেই গা-জ্বালা করে। আপনি খুব অল্প কথায় আমাকে বলুন—কী দেখে ভয় পেয়েছিলেন, তারপর রিলিজ অর্ডার নিয়ে বাসায় চলে যান।'

'আমি আপনাকে বলব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারাজানার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তার ঠোঁটের সিগারেট নিভে গিয়েছিল—সে আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, কেন বলবেন না?

আমি শান্তগলায় বললাম, আপনাকে আমি বলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারব না। আপনাকে দৃশ্যটা দেখাতে হবে। ঘটনাটা কী পরিমাণে অস্বাভাবিক তা জানার জন্যে আপনাকে নিজের চোখে দেখতে হবে। আমি বরং আপনাকে দেখাবার ব্যবস্থা করি।

'আপনি আমাকে ভূত দেখাবেন?'

'ভূত কি না তা তো জানি না—যে-জিনিসটা দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা দেখাব।'

'কবে?'

'কবে তা বলতে পারছি না। কোনো একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যাব।'

ফারজানা সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, আচ্ছা বেশ, নিয়ে যাবেন। আমি অপেক্ষা করে থাকব।

২

আমি গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে আছি।

ঢাকা শহরের অন্যসব গলির মতোই একটা গলি। একপাশে নোংরা নর্দমা। নর্দমায় গলা পিচের মতো ঘন-কালো ময়লা পানি। গলিতে ডাস্টবিন বসানো হয় না বলে দুপাশের বাড়ির ময়লা গলিতেই ফেলা হয়। সেই ময়লার বেশিরভাগ লোকের পায়ে-পায়ে চলে যায়। আর বাকিটা জমে থেকে থেকে একসময় গলিরই অংশ হয়ে যায়।

চারটা কুকুর থাকার কথা—এদের দেখলাম না। সেই জায়গায় ছোট ছোট কিছু বাচ্চাকে দেখলাম টেনিস-বল দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। খেলা আপাতত বন্ধ, কারণ বল নর্দমায় ডুবে গেছে। কাঠি দিয়ে বল খোঁজা হচ্ছে। ঘন ময়লা পানির নর্দমায় টেনিস-বলের ডুবে যাবার কথা না—আর্কিমিডিসের সূত্র অনুযায়ী ভেসে থাকার কথা। ডুবে গেল কেন কে জানে!

আমি গলির শেষ মাথা পর্যন্ত যাব কি যাব না ঠিক করতে পারছি না। এখন এই দিনের আলোয় শেষ মাথা পর্যন্ত যাওয়া না-যাওয়া অর্থহীন—মধ্যরাতের পরেই কোনো এক সময় আসতে হবে। আজ বরং কিছুক্ষণ বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা দেখে ফিরে আসা যাক। সাতদিন হাসপাতালে শুয়ে থেকে শরীর অন্যরকম হয়ে গেছে। শরীর ঠিক করতে হবে। হিমু-টাইপ জীবনচর্চা শুরু করা দরকার।

বাচ্চারা বল খুঁজে পেয়েছে। নর্দমা থেকে বল তুলতে গিয়ে ছ'টা বাচ্চা নোংরায় মাখামাখি হয়েছে। তাতে তাদের কোনো বিকার নেই। বল খুঁজে পাওয়ার আনন্দেই তারা অভিভূত। তারা তাদের খেলা শুরু করল।

আমি শুরু করলাম আমার খেলা—ঢাকা শহরের রাস্তায়-রাস্তায় হাঁটা। গত সাতদিন এদের কাউকে দেখিনি। রাস্তাগুলির জন্যে আমার মন কেমন করছে। রাস্তাদেরও হয়তো আমার জন্যে মন কেমন করছে। কথা বলার ক্ষমতা থাকলে ওরা নিশ্চয়ই আমাকে দেখে আনন্দিত গলায় জীবনানন্দের মতো বলত—হিমু সাহেব এত দিন কোথায় ছিলেন?

সন্ধ্যার দিকে আমি কাকরাইলের কাছাকাছি চলে এলাম। আমার পদযাত্রা কিছুক্ষণের জন্যে স্থগিত হল—কারণ আমার পায়ের কাছে মানিব্যাগ। পেট ফুলে মোটা হয়ে আছে। আমার কাছে মনে হল মানিব্যাগটা চিৎকার করে বলছে—এই গাধা, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আমাকে তুলে পকেটে লুকিয়ে ফেল। কেউ দেখছে না।

কালো পিচের রাস্তায় কালো রঙের মানিব্যাগ, চট করে চোখে পড়ে না। তা ছাড়া অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকারে লোকজন মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে না, সোজাসুজি তাকিয়ে হাঁটে।

এইজন্যেই কি কারও চোখে পড়েনি? তার পরেও পেটমোটা একটা মানিব্যাগ রাস্তায় পড়ে থাকবে আর তা কারও চোখে পড়বে না এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য না। আমি সাতদিন রাস্তায় ছিলাম না। এই সাতদিনে বাংলাদেশের রাজপথগুলিতে কি অবিশ্বাস্য কাণ্ডকারখানা ঘটতে শুরু করেছে?

আমি হাত বাড়িয়ে মানিব্যাগ তুললাম। অতিরিক্ত পেটমোটা মানিব্যাগে সাধারণত মালপানি থাকে না, কাগজপত্রে ঠাসা থাকে। এখানেও হয়তো তা-ই। তুলে ঠক খাব। আমার আগে অনেকেই এই ব্যাগ তুলে ঠক খেয়ে আবার ফেলে দিয়েছে। এমনও হতে পারে সে ঘাপটি মেরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে মজা দেখার জন্যে।

ব্যাগ খুললাম। গুপ্তধন পাওয়ার মতো আনন্দ হল। ব্যাগভরতি টাকা। রাবারের রিবন দিয়ে বাঁধা পাঁচশো টাকার নোটের স্তূপ। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার তো হবেই, বেশিও হতে পারে। ব্যাগটা ঝট করে পাঞ্জাবির পকেটে লুকিয়ে ফেলতে যাব তখন মনে হল আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুদের পাঞ্জাবির পকেট থাকে না। হিমুরা অন্যের মানিব্যাগ এমন ঝট করে লুকিয়েও ফেলতে চায় না। এখন কী করব? ব্যাগটা যেখানে ছিল সেখানে ফেলে রাখব? অসম্ভব! রাস্তায় পড়ে থাকা দশটাকার একটা নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায়, কিন্তু পাঁচশো টাকার নোট ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। নোটটা চুম্বক হয়ে মানবসন্তানদের আকর্ষণ করতে থাকে। অতি বড় যে সাধু তার ভেতরেও লুকিয়ে থাকে একটা ছিচকে চোর।

ব্রাদার, আপনার হাতে এটা কি মানিব্যাগ?

আমি পাশ ফিরলাম। ছুঁচালো চেহারার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ না ধুলে চেহারায় যেমন অসুস্থ ভাব লেগে থাকে তার মুখে সেই অসুস্থ ভাব। চোখ হলুদ। ঠোঁট কালচে মেরে আছে। নিচের ঠোঁট খানিকটা ঝুলে গেছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁত দেখা যায়। তবে কাপড়চোপড় বেশ পরিপাটি। শুধু জুতাজোড়া ময়লা। অনেক দিন কালি করা হয়নি, রঙ চটে গেছে। একটু দূরে আরও একজন। তার চেহারাও ছুঁচালো। তার মুখেও অসুস্থ ভাব এবং চোখ হলুদ। কোনো ডাক্তার দেখলে দুজনকেই বিলিরুবিন টেস্ট করতে পাঠাত। আমি এই জাতীয় যুবকদের চিনি। সামান্য চুরি থেকে শুরু করে মানুষের পেটে দশ ইঞ্চি ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দেয়ার মতো অপরাধ এরা খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে করতে পারে। এরা কখনো একা চলাফেরা করে না। আবার এদের দল বড়ও হয় না। দুজনের ছোট ছোট দল। দুজনের একজন (সাধারণত দুবলা-পাতলাজন) ওস্তাদ, তিনি হুকুম দেন। অন্যজন সেই হুকুম পালন করে।

এই দলটার যিনি ওস্তাদ তিনি আবার কথা বললেন, কী ব্রাদার, কথা বলছেন না কেন? হাতে কি মানিব্যাগ?

আমি হাই তোলার মতো ভঙ্গি করে বললাম, তাই তো মনে হয়।

'কুড়িয়ে পেয়েছেন?'

'কুড়িয়ে পাব কীভাবে? মানিব্যাগ তো আর ফুল না যে পড়ে থাকবে আর কুড়িয়ে নেব!'

'পেয়েছেন কোথায়?'

'ছিনতাই করেছি।'

দ্বিতীয় ছুঁচালো যুবক এবার হালকা চালে এগিয়ে আসছে। এ বেশ বলশালী হলেও হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার মুখভরতি পান। সে ঠিক আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমার পায়ের কাছে পানের পিক ফেলে অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, কী হইছে? প্রশ্নটা সে আমাকেই করল। তার পরেও আমি বিস্মিত হবার মতো করে বললাম, আমাকে বলছেন?

'জে আপনারে, প্রবলেমটা কী?'

'কোনো প্রবলেম নেই। আমার হাতে একটা মানিব্যাগ আছে, এটাই প্রবলেম। মানিব্যাগভরতি পাঁচশো টাকার নোট। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হবার কথা। দেখবেন? এই যে নিন দেখুন।'

তারা মুখ-চাওয়াচাউয়ি করল। দেখতে চাইল না। তার পরেও আমি ব্যাগ খুলে ভেতরটা দেখিয়ে দিলাম। তারা আবারও মুখ-চাওয়াচাউয়ি করল। আমার ব্যবহারে তারা মনে হল খানিকটা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছে। আমি মিষ্টি করে হাসলাম। তাদের বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে মধুর গলায় বললাম, মানিব্যাগ নিতে চান?

কাক মানুষের হাত থেকে খাবার নিয়ে উড়ে যায়। কিন্তু তাদেরকে যদি যত্ন করে থালায় খাবার বেড়ে ডাকা হয় 'আয় আয়' তখন তারা আর কাছে আসে না। দূর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। উড়ে চলেও যায় না, আবার কাছেও আসে না। যুবক দুটির মধ্যে কাকভাব প্রবল বলে মনে হল। তারা সরুচোখে মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে আছে। হাত বাড়াচ্ছে না। আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না। আমি আবারও বললাম, কী, মানিব্যাগ নিতে চান? নিতে চাইলে নেন।

পানমুখের যুবক আবারও পিক ফেলল। সে একটু চিন্তিতমুখে তার ওস্তাদের দিকে তাকাচ্ছে। ওস্তাদের নির্দেশের অপেক্ষা। ওস্তাদ নির্দেশ দিচ্ছেন না। সময় নিচ্ছেন। পরিস্থিতি তিনি যত সহজ ভেবেছিলেন এখন তত সহজ মনে হচ্ছে না। চট করে ডিসিশান নেয়া যাচ্ছে না।

জায়গাটা নির্জন নয়। ঢাকা শহরে নির্জন জায়গা নেই। তবে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সে-জায়গাটায় এই মুহূর্তে লোক-চলাচল নেই। ওস্তাদ এবং শাগরেদ আমার দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওস্তাদের বাঁ হাত তার প্যান্টের পকেটে। লোকটি সম্ভবত বাঁয়া। এবং সে তার বাঁ হাতে ক্ষুর ধরে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে ক্ষুর বের করবে। সেই মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা।

আমি হঠাৎ করেই লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা শুরু করলাম। তারা একটু হকচকিয়ে গেল, তবে তৎক্ষণাৎ আমার পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল। ওস্তাদ বিশেষ ভঙ্গিতে কাশলেন, সঙ্গে সঙ্গে শাগরেদ প্রায় দৌড়ে আমার সামনে চলে এল। এখন আমরা তিনজন হাঁটছি। শাগরেদ সবার আগে, মাঝখানে আমি এবং পেছনে ওস্তাদ। ওরা আমার হাত থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে দৌড় দিচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না। সবচে সহজ এবং যুক্তিযুক্ত কাজ হল মানিব্যাগ নিয়ে দৌড় দেয়া। অবশ্যি এদের নানান রকম টেকনিক আছে। এরা কোন টেকনিক ফলো করছে কে জানে!

কাকরাইলের আশেপাশের রাস্তার একটা নিয়ম হল কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ একদল তবলিগ জামাতি কোত্থেকে যেন উদয় হয়। এখানেও তা-ই হল। দশ-এগারো জনের একটা দল পোটলা-পুটলি, বদনা, ছাতা নিয়ে উপস্থিত। হাসিখুশি কাফেলা। তারা চলছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমি মাথা ঘুরিয়ে আমার পেছনের ওস্তাদের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখ হতাশায় মিইয়ে গেছে। নিচের ঠোঁট আরও নেমে গেছে। ভাল একটা শিকার পেয়েছিল। সেই শিকার হাসিমুখে তবলিগ জামাতিদের দলে ভিড়ে গেছে।

তবলিগের দল কাকরাইল মসজিদের দিকে চলে গেল। আমি ইচ্ছা করলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে পারতাম। তা করলাম না। আমি রওনা হলাম চায়ের দোকানের দিকে। ওস্তাদ এবং শাগরেদের মধ্যে নতুন উৎসাহ দেখা দিল। তারা চোখে-চোখে কিছু কথা বলল। দুজনই একসঙ্গে সিগারেট ধরাল। তারাও আসছে। আসুক। চা-টা একসঙ্গে খাই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মজাদার নাটকের ভেতর ঢুকে গেছি। ভাল লাগছে। নাটকের শেষটা রক্তারক্তি পর্যন্ত না গড়ালেই হয়।

চায়ের দোকানের মালিকের নাম কাওছার মিয়া। এক মধ্যরাতে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। কাওছার মিয়ার ধারণা সেই রাতে আমি তাকে ভয়ংকর বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। মধ্যরাতের পরিচিতজনরা সাধারণত সন্ধ্যারাতে কেউ কাউকে চেনে না। কাওছার মিয়া চিনল। "আরে হিমু ভাইয়া, আফনে!" এই বলে যে-চিৎকার দিল তাতে নামাজ ভঙ্গ করে কাকরাইল মসজিদের মুসুল্লিদের ছুটে আসার কথা। তাঁরা ছুটে এলেন না, তবে ওস্তাদ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাগরেদের আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল। কাওছার মিয়া চায়ের দোকানের মালিক হলেও তাকে দেখাচ্ছে ভীমভবানীর মতো। সে আদর করে কারও পিঠে থাবা দিলে সেই মানব-সন্তানের মেরুদণ্ডের বেশ কিছু হাড় খুলে পড়ে যাবার কথা।

কাওছার মিয়া চিৎকার দিয়েই থামল না, দোকান ফেলে ছুটে এসে পায়ে পড়ে গেল। যেন অনেকদিন পর শিষ্য তার গুরুর দেখা পেয়েছে। চরণধূলি না নেয়া পর্যন্ত শিষ্য-গুরুর সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ হবে না।

'আফনেরে যে আবার দেখুম ভাবি নাই। আল্লাহ্‌পাকের খাস রহমতে আফনেরে পাইছি। আছেন কেমুন হিমু ভাই?'

'ভাল।'

'আফনে একটা বড়ই আচায্য মানুষ। অখন কন কেমনে আফনের খেদমত করি।'

'চা খাওয়াও। পয়সা কিন্তু দিতে পারব না।'

কাওছার হতভম্ব গলায় বলল, পয়সার কথা তুললেন? এর থাইক্যা জুতা দিয়া দুই গালে দুইটা বাড়ি দিতেন।

আমি ওস্তাদ ও শাগরেদকে দেখিয়ে বললাম, আমার দুজন গেস্ট আছে। এদেরও চা দাও।

কাওছার মিয়া তার সবকটা দাঁত বের করে বলল, আর কী খাইবেন কন।

'আর কিছু লাগবে না।'

'ছিরগেট? ছিরগেট আইন্যা দেই?'

'দাও।'

কাওছার মিয়া দোকানের ছেলেটাকে পান-সিগারেট আনতে পাঠাল। তিনশলা বেনসন। তিনটা মিষ্টি পান, জরদা "আলিদা"।

ওস্তাদ ও শাগরেদ পুরোপুরি থমকে গেল। তবে চলে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। এখন তাদের চোখ আমার হাতে-ধরা মানিব্যাগের দিকে। আমি চায়ের কাপ তাদের দিকে বাড়িয়ে বললাম, ভাই, চা খান। অনেকক্ষণ আমার পিছনে পিছনে ঘুরছেন, নিশ্চয়ই টায়ার্ড।

ওস্তাদ বললেন, চা খাব না।

শাগরেদও সঙ্গে সঙ্গে বলল, চা খাব না।

কাওছার মিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, হিমু ভাইয়া চা সাধতেছে, আর চা খাইবেন না! কন কী আফনে? আচায্য ঘটনা! ধরেন, চা নেন।

ওস্তাদ ও শাগরেদ দুজনেই শুকনো মুখে চায়ের কাপ তুলল। কাওছার মিয়া তার বেনসন সিগারেট এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আফনাদের পরিচয়?

ওস্তাদ ও শাগরেদ মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। আমি তাদের পরিচয়দান থেকে রক্ষা করলাম। কাওছারকে বললাম, শোনো কাওছার মিয়া। আমি একটা মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছি। মানিব্যাগে টাকার পরিমাণ ভালই, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার তো বটেই! টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বলো তো!

কাওছারের মুখ হাঁ হয়ে গেল। সে বিড়বিড় করে বলল, খাইছে রে! আমি ওস্তাদ ও শাগরেদের দিকে তাকালাম। তারা মনে হচ্ছে দুঃখে কেঁদে ফেলবে। আমি তাদের দিকে মানিব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, ভাল করে দেখুন তো কোনো ঠিকানা-লেখা কাগজ আছে কি না। আর টাকাটাও গুনে দেখুন। ঠিকানা পাওয়া গেলে চলুন দিয়ে আসি। এতগুলি টাকা একা একা নিয়ে যাওয়া ঠিক না। আমার নাম হিমু, আপনাদের পরিচয়টা কী?

ওস্তাদ বিড়বিড় করে বললেন, আমার নাম মোফাজ্জল। আর এ জহিরুল।

'ঠিকানা পাওয়া গেছে?'

'টুকরা কাগজ অনেক আছে—কোনটা ঠিকানা কে জানে!'

'ঐ দেখে দেখে বের করে ফেলব। আপনাদের কাজ না থাকলে চলুন আমার সঙ্গে। কাজ আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'তা হলে মানিব্যাগটা আপনার পকেটে রাখুন। আমার পাঞ্জাবির পকেট নেই। আপনাদের পাওয়ায় আমার সুবিধাই হল।'

মোফাজ্জল আমার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসল। আমি তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে তার চেয়েও বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলাম। বিচিত্র হাসি বিচিত্র হাসিতে কাটাকাটি।

কাওছার উৎসাহের সঙ্গে বলল, টেকাটা আগে গনেন। কত টেকা?

জহিরুল টাকা গুনছে। বেশ আগ্রহের সঙ্গেই গুনছে। কাওছার বলল, আরেক দফা চা দিমু হিমু ভাই?

'দাও।'

'মোফাজ্জল ভাই, জহিরুল ভাই, আফনেরারে দিমু?'

জহিরুল টাকা গোনায় ব্যস্ত। সে কিছু বলল না। মোফাজ্জল উদাস গলায় বলল, দাও।

আমরা রাত দুটার দিকে ঝিকাতলার এক টিনের বাড়ির দরজায় প্রবল উৎসাহে কড়া নাড়তে লাগলাম। আমরা কড়া নাড়ছি বলা ঠিক হচ্ছে না। আমি কড়া নাড়ছি, বাকি দুজন চিমশামুখে দাঁড়িয়ে আছে। এরা আমাকে ছেড়ে চলেও যাচ্ছে না, আবার সঙ্গে থাকার কোনো কারণও বোধহয় খুঁজে পাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পর এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন। পঞ্চাশ–ষাট হবে বয়স। মাথার চুল ধবধবে সাদা। ভদ্রলোক মনে হয় অসুস্থ। কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। আমাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন, কিন্তু চোখের পালক ফেলছেন না। আমি বললাম, আপনার কি কোনো মানিব্যাগ হারিয়েছে?

ভদ্রলোক কিছু বললেন না, শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, মানিব্যাগে অনেকগুলি টাকা ছিল। আমার ধারণা আপনারই মানিব্যাগ।

ভদ্রলোক বাড়ির ভিতরের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত গলায় ডাকলেন, মীরা! মীরা!

মীরা বের হয়ে এল। আমি হিমু না হয়ে অন্য কেউ হলে তৎক্ষণাৎ মেয়েটির প্রেমে পড়ে যেতাম। কী মিষ্টি যে তার মুখ! মনে হচ্ছে এইমাত্র সে গোসল করে চোখে কাজল দিয়ে এসেছে। সব রূপবতী মেয়ের চোখ বিষণ্ন হয়। এই মেয়ের চোখও বিষণ্ন।

ভদ্রলোক বললেন, মা, তোকে আমি বলেছিলাম না টাকাটা পাওয়া যাবে? এখন বিশ্বাস হল?

মীরা তাকাল আমার দিকে। আমি বললাম, ভাল আছেন?

মীরা ভুরু কুঁচকে ফেলল। আমি মোফাজ্জলের দিকে তাকিয়ে বললাম, মানিব্যাগ দিয়ে দিন। মোফাজ্জল কঠিন গলায় বলল, মানিব্যাগ যে উনাদের তার প্রমাণ কী?

আমি উদাস গলায় বললাম, প্রমাণ লাগবে না। মীরা, তুমি টাকাটা গুনে নাও।

মীরার কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে গেল। আমার মতো অভাজন তাকে তুমি করে বলবে তা সে মেনে নিতে পারছে না। মানিব্যাগ–সংক্রান্ত জটিলতা না থাকলে সে নিশ্চয়ই শুকনো গলায় বলত, আমাকে তুমি করে না বললে খুশি হব।

মোফাজ্জল অপ্রসন্ন মুখে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল। এরকম অপ্রীতিকর কাজ সে মনে হয় তার জীবনে আর করেনি। মোফাজ্জলের চেয়েও বেশি মন খারাপ হয়েছে তার টেণ্ডল জহিরুলের। জহিরুল মনে হয় মনের দুঃখে কেঁদেই ফেলবে।

ভদ্রলোক আবারও মীরাকে বললেন, বলেছিলাম না সব টাকা ফেরত পাব, বিশ্বাস হল? তুই তো কেঁদে অস্থির হচ্ছিলি। নে, টাকাটা গুনে দেখ। সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো একুশ টাকা আছে।

মীরা বলল, গুনতে হবে না।

ভদ্রলোক বললেন, আহা গুনে দেখ–না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, মীরা, তুমি সাবধানে গুনতে থাকো। আমরা চললাম।

শুরুতেই তুমি বলায় মেয়েটা রেগে গেছে, তাকে আবারও তুমি বলে আরও রাগিয়ে দিয়ে বের হয়ে এলাম।

মোফাজ্জল ক্রুদ্ধ গলায় বলল, এতগুলা টাকা ফেরত পেয়েছে তার কোনো আলামত নাই। শালার দুনিয়া! লাথি মারি এমন দুনিয়ারে!

জহিরুল বলল, এক হাজার টাকা বখশিশ দিলেও তো একটা কথা ছিল! কী বলেন ওস্তাদ। বখশিশ না দেওয়াটা অধর্ম হয়েছে।

আমি বললাম, বখশিশ পেলে কী করতেন?

জহিরুল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, কী আর করতাম—মাল খাইতাম। গত চাইরদিনে তিন আঙুল পরিমাণ বাংলা খাইছি। তিন আঙুল বাংলায় কী হয় কন। তিন আঙুল মাল ইচ্ছা করলে একটা মশাও খাইতে পারে। মাল খাওয়া তো দূরের কথা, আজ সারা দিন ভাতও খাই নাই। আপনার পিছে পিছে বেফিকির হাঁটতেছি। আইজ যত হাঁটা হাঁটছি একটা ফকিরও অত হাঁটা হাঁটে না।

মোফাজ্জল বিরক্ত মুখে বলল, চুপ কর। এত কথার দরকার কী! হিমু ভাইয়া বিদায় দেন, আমরা এখন যাই।

'যাবেন কোথায়?'

'জানি না কই যাব।'

'আমার সঙ্গে চলেন, মাল খাওয়াব।'

মোফাজ্জল সরু চোখে তাকিয়ে রইল। সে আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করা খুবই কষ্টকর। মোফাজ্জল আছে সেই কষ্টে।

'কী, যাবেন?'

'সত্যি মাল খাওয়াবেন?'

'হুঁ।'

'কী খাওয়াবেন—বাংলা?'

'বাংলা ইংরেজি জানি না, তবে খাওয়াব।'

'চলেন যাই।'

মোফাজ্জল অনিচ্ছার সঙ্গে হাঁটছে। তবে জহিরুলের চোখ চকচক করছে। কিছু মানুষ আছে যাদের জন্মই হয় শিষ্য হবার জন্যে। জহিরুল হক সেই মানুষ। এরা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি বাস করে না। এরা বাস করে বিশ্বাসের জগতে। যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে।

জহিরুল বলল, হিমু ভাই, আপনেরে আমার পছন্দ হয়েছে।

'কেন?'

'জানি না কেন।'

'মাল খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছি এইজন্যে?'

'হইতে পারে। আপনের পকেটে সিগারেট আছে হিমু ভাই? একটা সিগারেট দেন ধরাই।'

'আমার পাঞ্জাবির পকেটই নেই, আবার সিগারেট!'

'সত্যই আপনের পাঞ্জাবির পকেট নাই!'

পাঞ্জাবির পকেট যে নেই তা আমি দেখালাম। মোফাজ্জল বলল, টাকাপয়সা কই রাখেন? পায়জামার সিক্রেট পকেটে?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমার কোনো সিক্রেট পকেট নেই। আমি সঙ্গে কখনো টাকাপয়সা রাখি না।

মোফাজ্জল আবারও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি জগতে চলে গেল। আগের অবস্থা, আমার কথা বিশ্বাসও করতে পারছে না, আবার অবিশ্বাসও করতে পারছে না। সে দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে। তবে জহিরুল আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

আমি তাদের নিয়ে বাদলদের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। এত রাতে কারোরই জেগে থাকার কথা না, কিন্তু আমি জানি তারা সবাই জেগে আছে।

আমার মন বলছে—প্রবল ভাবেই বলছে। কিছু-কিছু সময় আমার ইনটিউশন খুব কাজ করে।

আমি মেজো ফুপার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি বাদলের ত্রিসীমানায় থাকব না। নির্বিঘ্নে বাদলের বিয়ে হয়ে যাবে। এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে রাত আড়াইটায় দুই উটকো লোক নিয়ে উপস্থিত হলে ঘটনা কী ঘটবে কে জানে! মেজো ফুপা ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেবেন বলে মনে হয় না। তবে সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে তিনি ইতোমধ্যে বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছেন। কারণ আজ বুধবার। ফুপার মদ্যপান দিবস। বোতল নিয়ে বসার জন্যে সুন্দর অজুহাতও আছে—ছেলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। এই তো সেদিন ছোট্ট একটা ছেলে ছিল, শীতের দিনে বিছানায় পিপি করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলত, মা, কে যেন পানি ফেলে দিয়েছে। সে আজ বিয়ে করে বউ আনতে যাচ্ছে। এ তো শুধু আনন্দের ঘটনা না, মহা আনন্দের ঘটনা। সেই আনন্দটাকে একটু বাড়িয়ে দেবার জন্যে সামান্য কয়েক ফোঁটা দিয়ে গলা ভেজানো।

মেজো ফুপা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকলে কোনো সমস্যা হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল এরাও ভাগ পাবে। মদ্যপায়ীরা মদের ব্যাপারে খুব দরাজদিল হয়। দশটা টাকা ধার চাইলে এরা দেবে না, কিন্তু তিন হাজার টাকা দামের বোতলের পুরোটা আনন্দের সঙ্গে অন্যকে খাইয়ে দেবে।

যা ভেবেছি তা-ই।

বাড়ির সব বাতি জ্বলছে। হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আনন্দ উছলে পড়ছে। খোলা জানালায় সেই আনন্দ উছলে বের হয়ে আসছে। হাসির শব্দ, হৈচৈয়ের শব্দ, ছোট বাচ্চাদের কান্নাকাটির শব্দ। আমি কলিংবেলে হাত রাখার আগেই দরজা খুলে গেল। মেজো ফুপু দরজা খুললেন। তাঁর পরনে লাল বেনারসি, ইদানীংকার ফ্যাশানের মতো কপালে সিঁদুর। মেজো ফুপু হাসিমুখে বললেন, কী রে হিমু, তুই এত দেরি করলি? তোর জন্যে বাদল এখনও না খেয়ে বসে আছে।

আমি হাসলাম। "দেরি করার অপরাধে খুবই লজ্জিত" এই টাইপের হাসি। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছি না। বাদলের বিয়ে হয়ে গেল নাকি? বিয়ে বোধহয় না। মনে হচ্ছে গায়ে-হলুদ। ফুপুর কপালে হলুদ লেগে আছে।

'আশ্চর্য, একটা দিন সময়মতো আসবি না, আমি কি রোজই ছেলের বিয়ে দেব? গায়ে-হলুদের এমন জমজমাট অনুষ্ঠান—আর তুই নেই! বাদল অস্থির হয়ে আছে তোর জন্যে। ঝিম মেরে আছিস, ব্যাপার কী? কথা বলছিস না কেন?

'তোমাকে আসলে চিনতেই পারিনি। এইজন্যেই চুপ করে ছিলাম। মাই গড, তোমাকে তো দারুণ লাগছে! কে বলবে তোমার ছেলের বিয়ে! মনে হচ্ছে তোমারই বিয়ে হয়নি।'

'পাম-দেয়া কথা বলবি না তো! দরজায় দাঁড়িয়ে আছিস কেন? আয়, ভেতরে আয়।'

আমি গলা নিচু করে বললাম, ফুপু, আমার দুজন গেস্ট আছে, ওদের নিয়ে আসব?

'ওরা কোথায়?'

'রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বাড়িতে ঢুকতে দাও কি না-দাও জানি না তো!'

'তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি দিনদিন চলে যাচ্ছে নাকি? আমার ছেলের বিয়েতে তুই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবি না তো কি পাড়ার লোকের বিয়েতে আসবি! আর তোর আক্কেলটাই-বা কীরকম! রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কোন হিসাবে—ওরা নাজানি কী ভাবছে!'

'কিছুই ভাবছে না, আমি নিয়ে আসছি। ফুপা কি বাসায় আছেন?'

'বাসায় থাকবে না তো যাবে কোথায়? একটা অজুহাত পেয়েছে ছেলের বিয়ে—বোতল নিয়ে ছাদে চলে গেছে। বাড়িভরতি লোকজন। নাজানি কী ভাবছে!'

'তোমাকে কিন্তু দারুণ লাগছে ফুপু! শাড়ি কি কোনো নতুন কায়দায় পরেছ? মোটাটা অনেকটা ঢাকা পরেছে।'

'সত্যি বলছিস?'

'অবশ্যই সত্যি বলছি।'

'রীণাও বলছিল আমাকে নাকি স্লিম লাগছে। তুই কথা বলে সময় নষ্ট করিস না তো! তোর বন্ধুদের নিয়ে আয়, আমি খাবার গরম করছি।'

'বন্ধুরা কিছু খাবে না ফুপু। ওরা খেয়ে এসেছে। আমি বাদলের সঙ্গে খাব, ওরা ছাদে বসে ফুপার সঙ্গে গল্প করবে।'

ফুপা আমাকে দেখে আনন্দে অভিভূত হলেন। মাতালরা একটা পর্যায়ে যে-কোনো ব্যাপারে আনন্দে অভিভূত হয়। তাঁর এখন সেই অবস্থা চলছে। ফুপার মনেই নেই যে তিনি আমাকে আসতে নিষেধ করেছেন।

'আরে হিমু! হোয়াট এ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ! তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

'ফুপা, এরা হল আমার দুই বন্ধু, একজন মোফাজ্জল আর একজন জহিরুল।'

ফুপা মধুর গলায় বললেন, তোমরা কেমন আছ? তুমি করে বললাম। কিছু মনে কোরো না আবার! হিমু হচ্ছে আমার ছেলের মতো, সেই হিসেবে তোমরাও আমার ছেলে। হা হা হা, দাঁড়িয়ে আছ কেন, বসো। খুব ঠাণ্ডা তো, এইজন্যেই দুফোঁটা হুইস্কি খাচ্ছি। তার উপর ছেলের বিয়ে—মহা আনন্দের ব্যাপার! মেয়ের বিয়ে হলে কষ্টের ব্যাপার হত। মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের বিদায়। ছেলের বিয়ে মানে নতুন একটা মেয়েপ্রাপ্তি। এই উপলক্ষে সামান্য মদ্যপান করা যায়। ঠিক না?

জহিরুল বলল, এই দিনে যদি মদ না খান খাবেন কবে!

'এই ব্যাপারটাই তো তোমাদের ফুপুকে বোঝাতে পারছিলাম না! শরৎচন্দ্রের দেবদাস পড়ে মেয়েরা ধরেই নিয়েছে মদ একটা ভয়াবহ ব্যাপার। পরিমিত মদ্যপান যে হার্টের কত বড় অষুধ তা এরা জানে না। টাইম পত্রিকায় একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছে— সেখানে পরিষ্কার লেখা যারা পরিমিত মদ্যপান করে তাদের হার্ট অ্যাটাকের রিস্ক্ অর্ধেক কমে যায়। তোমরা কি একটু খেয়ে দেখবে?'

মোফাজ্জল বলল, জি না, জি না। আপনি মুরুব্বি মানুষ।

'লজ্জা করবে না তো, খাও। এত বড় একটা আনন্দ-উৎসবে আমি একা একা বসে আছি। তোমরা আসায় তাও কথা বলার লোক পাচ্ছি। হিমু যা তো দুটা গ্লাস এনে দে। বোতল আরেকটা লাগবে। আমার ঘরে চলে যা। বুকশেলফের তিন নম্বর তাকে বইগুলোর পেছনে একটা ব্লাক ডগের বোতল আছে। এইসব জিনিস একা খেয়ে কোনো আনন্দ নেই—তাই না তফাজ্জল?'

'স্যার, আমার নাম মোফাজ্জল।'

'স্যার বলছ কেন? আমি হিমুর ফুপা, তোমারও ফুপা। এই যে শুটকা ছেলেটা তারও ফুপা। তোমার নাম যেন কী?'

'জহিরুল।'

'শুটকা ছেলে বলায় রাগ করনি তো?'

'জি না।'

'তোমার ফুপুকে দেখার পর পৃথিবীর যে-কোনো মানুষকেই আমার কাছে শুটকা মনে হয়। একবার কী হয়েছে শোনো। প্লেনে করে চিটাগাং যাচ্ছি—সে দেখি প্লেনের সিটে ঢোকে না। হাস্যকর ঘটনা। এয়ার হোস্টেস, আমি দুজনে মিলে ঠেলাঠেলি। এখনও মনে করলে লজ্জায় মরে যাই।'

আমি নিচে চলে এলাম। মোফাজ্জল আর জহিরুলকে নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। তারা মনের সুখে ব্ল্যাক ডগ খেতে পারবে। ফুপা যত্ন করে মুখে তুলে তুলে খাওয়াবেন। বোতল শেষ

হলেও কোনো সমস্যা নেই। বিচিত্র সব জায়গা থেকে নতুন নতুন বোতল বের হবে। শেষের দিকে সিচুয়েশন আউট অব হ্যান্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অবশ্যি আছে। এক মাতাল হয় বিষণ্ন প্রকৃতির, দুই মাতাল হয় মিত্রভাবাপন্ন। তিন মাতাল সর্বদাই ভয়াবহ।

খাওয়া শেষ করে আমি বাদলের ঘরে গিয়ে বসেছি। বাদলের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, হাতে রাখি। চোখেমুখে লজ্জিত একটা ভাব। বিবাহ-নামক অপরাধ করতে যাচ্ছে এই কারণে সে যেন ছোট হয়ে আছে। তাকে দেখাচ্ছেও খুব সুন্দর। বিয়ের আগে-আগে শুধু যে মেয়েরাই সুন্দর হয়ে যায় তা না, ছেলেরাও সুন্দর হয়। আমি বাদলের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি।

'বাদল তোকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ের রঙও তো মনে হয় খোলতাই হয়েছে।'

বাদল হাসিমুখে বলল, হলুদ দিয়ে ডলাডলি করে গায়ের চামড়া তুলে ফেলেছে, রঙ তো খোলতাই হবেই।

'বিয়ে হচ্ছে যার সঙ্গে সেই মেয়েটার নাম কী?'

'পুরানো ধরনের নাম—আঁখি।'

'মেয়েটা কেমন?'

'জানি না কেমন। কথা হয়নি তো!'

'খুব সুন্দর?'

'সবাই তো তা-ই বলছে।'

'তুই বলছিস না?'

বাদল লজ্জা-লজ্জা গলায় বলল, আমিও বলছি।

'তোর খুব ভাল একটা দিনে বিয়ে হচ্ছে। ২২ ডিসেম্বর। অদ্ভুত!'

'২২ ডিসেম্বর কি খুব শুভদিন হিমুদা?

'বৎসরের সবচেয়ে লম্বা রাতটা হল ২২ ডিসেম্বরের রাত। তোরা দুজন গল্প করার জন্যে অনেক সময় পাবি। এই কারণেই শুভ।'

বাদল লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, আঁখির সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলব সেটাই বুঝতে পারছি না! বোকার মতো হয়তো কিছু বলব, পরে সে এটা নিয়ে হাসাহাসি করবে।

'করুক-না হাসাহাসি! তোর যা মনে আসে তুই বলবি। দুই-একটা-কবিতা টবিতা মুখস্থ করে যা।'

'কী কবিতা?'

'প্রেমের কবিতা।'

'প্রেমের তো অনেক কবিতা আছে, কোনটা মুখস্থ করব সেটা বলো।'

'কোনটা বলব, আমার তো দুই-তিন লাইনের বেশি কোনো কবিতা মনে থাকে না।'

'দুই-তিন লাইনই বলো। এক সেকেন্ড দাঁড়াও—আমি কাগজ-কলম নিয়ে আসি—লিখে ফেলি।'

বাদল গম্ভীর ভঙ্গিতে বলপয়েন্ট আর কাগজ নিয়ে বসেছে। আমি কবিতা বলব, সে লিখে মুখস্থ করবে, বাসররাতে তার স্ত্রীকে শোনাবে। হাস্যকর একটা ব্যাপার, কিন্তু আমার কেন জানি হাস্যকর লাগছে না। বাদল বলল, কই, চুপ করে আছ কেন, বলো!

আমি বললাম, লিখে ফেল—

এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
নদীর বুকে বৃষ্টি পড়ে পাহাড় তাকে সয় না।
এভাবে নয়, এভাবে ঠিক হয় না।
কীভাবে হয়? কেমন করে হয়?
কেমন করে ফুলের কাছে রয়

গন্ধ আর বাতাস দুই জনে...

এভাবে হয়, এমন ভাবে হয়।

বাদল বলল, এটা কার কবিতা, তোমার?

'পাগল হয়েছিস? আমি কবিতা লিখি নাকি? এই কবিতা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের।'

'কতদিন পর তোমাকে দেখছি, কী যে অদ্ভুত লাগছে!'

'অদ্ভুত লাগছে?'

'হুঁ, লাগছে। আঁখির সঙ্গে বেশি গল্প হবে তোমাকে নিয়ে।'

'ওকে নিয়ে আবার খালিপায়ে হাঁটতে বের হবি না তো।'

'অবশ্যই বের হব। আমি পরব হলুদ পাঞ্জাবি, ওকে পরাব হলুদ শাড়ি। তারপর...'

'তারপর কী?'

'সেটা বলতে পারব না, লজ্জা লাগছে। হিমুদা শোনো, তোমার জন্যে আমি খুব সুন্দর একটা গিফট এনেছি। আন্দাজ করো তো কী?'

'আন্দাজ করতে পারছি না।'

'একটা খুব দামি স্লিপিং-ব্যাগ নিয়ে এসেছি। তুমি তো যেখানে-সেখানে রাত কাটাও—ব্যাগটা থাকলে সুবিধা—ব্যাগের ভেতর ঢুকে পড়বে। স্লিপিং-ব্যাগের কালার তোমার পছন্দ হবে না। মেরুন কালার। অনেক খুঁজেছি—হলুদ পাইনি।'

বাদল স্লিপিং-ব্যাগ নিয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে—অনেক টাকা দিয়ে কিনেছে।

'হিমুদা পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ব্যাগটা থাকায় তোমার খুব সুবিধা হবে। ধরো তুমি জঙ্গলে জোছনা দেখতে গিয়েছ। অনেক রাত পর্যন্ত জোছনা দেখলে—ঘুম পেয়ে গেলে কোনো একটা গাছের নিচে ব্যাগ রেখে তার ভেতর ঢুকে গেলে।'

'আমার তো এখনই ব্যাগ নিয়ে জঙ্গলে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও ইচ্ছে করছে—হিমুদা চলো, কাছেপিছের কোনো একটা জঙ্গলে চলে যাই—জয়দেবপুরের শালবনে গেলে কেমন হয়?'

'বিয়ের আগে তোর কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। বিয়ে হয়ে যাক, তারপর তুই আর আঁখি, হিমু ও হিমি...'

আমি বাক্যটা শেষ করার আগেই রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ফুপু ঢুকলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে খরখরে গলায় বললেন, তুই কাদের নিয়ে বাসায় এসেছিস? বাঁদর দুটাকে জোগাড় করেছিস কোথায়?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, কেন, ওরা কী করেছে?

'দুটাই তো ন্যাংটো হয়ে ছাদে নাচানাচি করছে! তোর ফুপাও নাচছে।'

'বল কী!'

'তুই এক্ষুনি এই মুহূর্তে এদের নিয়ে বিদেয় হবি।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। আমার বগলে বাদলের আনা মেরুন রঙের স্লিপিং-ব্যাগ।

ফুটপাতে যারা ঘুমায় দেখা যাচ্ছে তাদের কিছু নীতিমালা আছে। তারা জায়গা বদল করে না। ঘুমুবার জায়গা সবারই নির্দিষ্ট। যে নিউমার্কেটের পাশে ঘুমায় সে যদি সন্ধ্যাবেলায় বাসাবোতে থাকে—সেও হেঁটে হেঁটে নিউমার্কেটের পাশে এসে নিজের জায়গায় ঘুমুবে।

কাজেই বস্তা-ভাইকে খুঁজে বের করতে আমার অসুবিধা হল না। দেখা গেল সাত দিন আগে তারা যেখানে ঘুমুচ্ছিল এখনও সেখানেই ঘুমুচ্ছে। পিতা এবং পুত্র চটের ভেতরে ঢুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরামে নিদ্রা দিচ্ছে। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম। বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের বয়স খুবই কম। চার-পাঁচ বছর হবে। কাঁচা ঘুম ভাঙায় সে খুবই ভয় পেয়েছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি বললাম, এই গাবলু, তোর নাম কী?

গাবলু জবাব দিল না। বাবার কাছে সরে গেল। বাবা বিরক্তমুখে বলল, আফনের কী বিষয়? চান কী?

আমি হাসিমুখে বললাম, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি হচ্ছি আপনাদের সহনিদ্রক। একসঙ্গে ঘুমালাম—মনে নেই? শেষরাতে জ্বর উঠে গেল। আপনি রিকশা ডেকে আমাকে ধরাধরি করে তুলে দিলেন।

'মনে আছে। আফনে চান কী?'

'কিছু চাই না। আপনাদের সঙ্গে ঘুমাব—অনুমতি চাচ্ছি।'

'অনুমতির কী আছে? গভমেন্টের জায়গা। ঘুমাইতে ইচ্ছা হইলে ঘুমাইবেন।'

আমি তাদের পাশে আমার স্লিপিং-ব্যাগ বিছালাম। পিতা এবং পুত্র দুজনেই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ব্যাগের জিপার খুলে আমি ভেতরে ঢুকে পড়লাম। তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই জিনিসটার নাম স্লিপিং-ব্যাগ। এর অনেক সুবিধা—ভেতরে ঢুকে জিপার লাগিয়ে দিলে—শীত লাগবে না, মশা কামড়াবে না। বৃষ্টির সময় ভিজতে হবে না। চোর এসে তুলে নিয়ে চলে যেতে পারবে না। চোর যদি নিতে চায় আমাকেসুদ্ধ নিতে হবে।

বস্তা-ভাই তার বিস্ময় সামলাতে পারল না। ক্ষীণস্বরে বলল, এই জিনিসটার দাম কীরকম ভাইজান?

আমি ঘুম-ঘুম গলায় বললাম, জানি না। বলেই জিপার লাগিয়ে দিলাম। স্লিপিং-ব্যাগটা আমি আসলে এনেছি এই দুজনকে উপহার হিসেবে দিয়ে দেবার জন্যে। হিমুরা স্লিপিং-ব্যাগ নিয়ে পথে হাঁটে না। আমি ঠিক করেছি বাকি রাতটা স্লিপিং ব্যাগে ঘুমুব। সকালে ব্যাগ থেকে বের হয়ে এক কাপ চা খাব। তারপর পিতা এবং পুত্রকে ব্যাগটা উপহার দিয়ে চলে যাব। আহা, এই দুজন আরাম করে ঘুমাক। ছেলেটার চেহারা খুব মায়াকাড়া। কী নাম ছেলেটার? আচ্ছা, নামটা সকালে জানলেও হবে। এখন ভাল ঘুম পাচ্ছে। সামান্য দুশ্চিন্তাও হচ্ছে, বাদলদের বাড়ি থেকে মোফাজ্জল এবং জহিরুলকে নিয়ে আসা হয়নি। এরা এতক্ষণে কী কাণ্ড করছে কে জানে? মনের আনন্দে ছাদ থেকে লাফিয়ে না পড়লেই হয়।

স্লিপিং-ব্যাগটা আসলেই আরামদায়ক। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।

'ভাইজান, ও ভাইজান!'

'কী?'

'আমার ছেলে আফনের এই জিনিসটা একটু হাত দিয়া ছুঁইয়া দেখতে চায়।'

'উঁহু, ময়লা হবে। হাত যেন না দেয়।'

'জে আচ্ছা।'

'ছেলের নাম কী?'

'সুলায়মান।'

'ছেলের মা কোথায়?'

'সেইটা ভাইজান এক বিরাট হিস্টুরি।'

'থাক বাদ দিন, বিরাট হিস্টুরি শোনার ইচ্ছা নেই, ঘুম পাচ্ছে।'

'ভাইজান!'

'হুঁ।'

'জিনিসটার ভিতরে কি দুইজন শোয়া যায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা যায়। বড় করে বানানো।'

'বালিশ আছে?'

'না, বালিশ নেই। বালিশের দরকার হয় না।'

'যদি কিছু মনে না নেন ভাইজান, সুলেমান জিনিসটার ভিতরে কী একটু দেখতে চায়। তার খুব শখ হইছে।'

আমি ভেতর থেকে বের হয়ে এলাম। পিতা এবং পুত্রের কাছে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলাম। তারা হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের হতভম্ব দৃষ্টি দেখে আমার চোখে পানি আসার উপক্রম হল। হিমুদের চোখে পানি আসতে নেই—আমি ওদের পেছনে ফেলে দ্রুত হাঁটছি। রাস্তার শেষ মাথায় এসে একবার পেছনে ফিরলাম। পিতা-পুত্র দুজনই ব্যাগের ভেতর ঢুকেছে। দুজনই মাথা বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কে জানে তারা কী ভাবছে।

৩

ঘুম ভেঙেই দেখি আমার বিছানার পাশের চেয়ারে বাদল বসে আছে। আমি চট করে চোখ বন্ধ করে ফেললাম। সাতসকালে বাদলের আমার পাশে বসে থাকার কথা না। আজ ২৩ ডিসেম্বর। কাল রাতে তার বিয়ে হয়েছে। বউ ফেলে ভোরবেলাতেই সে আমার কাছে চলে আসবে কেন? চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা একটু চিন্তা করা যাক।

আমি থাকি আগামসি লেনের একটা মেসে। মেসের ঠিকানা বাদল জানে না। শুধু বাদল কেন, আমার পরিচিত কেউই জানে না। বাদলকে সেই ঠিকানা খুঁজে বের করতে হয়েছে। সেটা তেমন জটিল কিছু না—আগে যে-মেসে ছিলাম সেই মেসের ম্যানেজার নিতাই কুণ্ডু বর্তমান মেসের ঠিকানা জানেন। তাঁকে যদিও বলা হয়েছে আমার ঠিকানা কাউকে দেবেন না—তার পরেও ভদ্রলোক দিয়েছেন। বাদল নিশ্চয়ই এমন-কিছু বলেছে বা করেছে যে ঠিকানা না দিয়ে ভদ্রলোকের উপায় ছিল না। খুব সম্ভব কেঁদে ফেলেছে। বাদল খুব সহজে কাঁদতে পারে।

একবার মেসে ঢুকে পড়ার পর আমার ঘরে ঢোকা অবিশ্যি খুবই সহজ। আমি দরজা এবং জানালা সব খোলা রেখে ঘুমাই। হিমুকে তা-ই করতে হয়। আমার বাবা আমার জন্যে যে-উপদেশনামা লিখে রেখে গেছেন তার সপ্তম উপদেশ হচ্ছে—

> নিদ্রা ও জাগরণের যে বাঁধাধরা নিয়ম আছে, যেমন দিবসে জাগরণ নিশাকালে নিদ্রা—এইসব নিয়ম মানিয়া চলার কোনো আবশ্যকতা নাই। কোনোরকম বন্ধনে নিজেকে বাঁধিও না। খোলা মাঠ বা প্রান্তরে নিদ্রা দিতে চেষ্টা করিবে। কোনো প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলে সেই প্রকোষ্ঠের দরজা-জানালা সবই খুলিয়া রাখিবে যেন নিদ্রাকালে খোলা প্রান্তরের সহিত তোমার নিদ্রাকক্ষের যোগ সাধিত হয়।
>
> নিদ্রাকালে তস্কর বা ডাকাত আসিয়া তোমার মালামাল নিয়া পলায়ন করিবে এই চিন্তা মাথায় রাখিও না, কারণ তস্কর আকর্ষণ করিবার মতো কিছু তোমার কখনোই থাকিবে না। যদি থাকে তবে তাহা তস্কর কর্তৃক নিয়া যাওয়াই শ্রেয়।

বাবার উপদেশ আমি অনেকদিন থেকেই মেনে চলছি। খোলা প্রান্তরে শোয়া সম্ভব হচ্ছে না—দরজা-জানালা খোলা ঘরে ঘুমুচ্ছি। তস্করের হাতে পড়েছি তিনবার। প্রথমবার সে একটা দামি জিনিসই নিয়ে গেছে—ওয়াকম্যান। সনি কোম্পানির ওয়াকম্যান আমাকে উপহার দিয়েছিল রূপা। রূপার উপহার দেয়ার পদ্ধতি খুব সুন্দর। গিফট-র‍্যাপে মুড়ে লাল রিবনের ফুল লাগিয়ে বিরাট শিল্পকর্ম। রূপা গিফট আমার হাতে দিয়ে বলল, নাও, তোমার জন্মদিনের উপহার।

আমি বললাম, আজ তো আমার জন্মদিন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে নিজের মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, তোমার কবে জন্মদিন সেটা তো আমি জানি না। তুমি আমাকে বলবেও না। কাজেই আমি ধরে নিলাম আজই জন্মদিন।

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা না, বলো থ্যাংক য়্যু। উপহার পেলে ধন্যবাদ দেয়া সাধারণ ভদ্রতা। মহাপুরুষরা ভদ্রতা করেন না, তা তো না।'

'ধন্যবাদ। কী আছে এর মধ্যে?'

'একটা ওয়াকম্যান। তুমি তো পথে-পথেই ঘুরে বেড়াও। মাঝে মাঝে এটা কানে দিয়ে ঘুরবে। আমার পছন্দের তেরোটা গান আমি রেকর্ড করে দিয়েছি।'

'আবারও ধন্যবাদ।'

আমি খুব যত্ন করে টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় রূপার উপহার সাজিয়ে রাখলাম। সাজিয়ে রাখা পর্যন্তই। ব্যাটারির অভাবে গান শোনা গেল না। রূপা মূল যন্ত্র দিয়েছে, ব্যাটারি দেয়নি। আমারও কেনা হয়নি। মাঝে মাঝে যন্ত্রটা শুধুশুধু কানে দিয়ে বসে থাকতাম। কানের ফুটো বন্ধ থাকার জন্যেই বোধহয় শোঁশোঁ শব্দ হত। সেই শব্দও কম ইন্টারেস্টিং ছিল না। যাই হোক, এক রাতে চোর (বাবার ভাষায়—তস্কর) এসে আমাকে ব্যাটারি কেনার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাল।

দ্বিতীয় দফায় তস্কর এসে আমার স্যান্ডেলজোড়া নিয়ে গেল। হিমুর স্যান্ডেল থাকার কথা না—খালিপায়ে হাঁটাহাটি করার কথা। তার পরও একজোড়া চামড়ার স্যান্ডেল কিনেছিলাম। দাম নিয়েছিল দুশো তেত্রিশ টাকা। সাতদিনের মাথায় স্যান্ডেল চলে গেল।

তৃতীয় দফায় চোরের হাতে আমার বিছানার চাদর এবং বালিশ চলে গেল। আমার ঘুমন্ত অবস্থায় চোর কী করে বিছানার চাদর এবং বালিশ নিয়ে গেল সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি।

চোর-বিষয়ক সমস্যা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কিছু নেই— আমার সামনে জটিল সমস্যা বসে আছে—বাদল। আমি চট করে দ্বিতীয়বার তাকে দেখে নিলাম। তার চোখেমুখে হতভম্ব ভাব। রাতে একফোঁটাও ঘুমায়নি তাও বোঝা যাচ্ছে। চোখের নিচে এক রাতেই কালি পড়ে গেছে। আনন্দময় নিশি-জাগরণে চোখের নিচে কালি পড়ে না। কাজেই গতরাতটা তার কাছে ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। তা হলে কি তার বিয়ে হয়নি?

আমি চোখ বন্ধ রেখেই বললাম, বাদল, তোর বিয়েটা কি কোনো কারণে ভেঙে গেছে?

বাদল বলল, হুঁ।

'চা খাবি?'

'হুঁ।'

'নিচে চলে যা। রাস্তা পার হলেই দেখবি তোলা উনুনে বাচ্চা একটা ছেলে চা বানাচ্ছে। ওর নাম মফিজ। মফিজকে বলে আয় দুকাপ চা পাঠাতে।

'আমার বিয়েটা যে ভেঙে যাবে সেটা কি তুমি আগে থেকেই জানতে?'

'আগে থেকে জানব কীভাবে? আমি কি পীর-ফকির নাকি?'

'আমার মনে হয় তুমি জানতে। জানতে বলেই বরযাত্রী হিসেবে তুমি বিয়েতে যাওনি।'

'বরযাত্রী হিসেবে যাইনি, কারণ আমাকে ফুপা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।'

'তোমাকে তো আমি কিছু বলিনি—তা হলে তুমি বুঝলে কী করে যে আমার বিয়ে হয়নি?'

'তোর চেহারা দেখে বুঝেছি। মানুষের সমগ্র অতীত তার চেহারায় লেখা থাকে। যারা সেই লেখা পড়তে পারে তারা মানুষকে দেখেই হড়হড় করে অতীত বলে দিতে পারে।'

'তুমি পার?'

বেশি পারি না—সামান্য পারি। যা, চা'র কথা বলে আয়।

বাদল উঠে দাঁড়াল। বাদলের চেহারা খুব সুন্দর। আজ এই সকালের আলোতে তাকে আরও সুন্দর লাগছে। ক্রিম কালারের এই শার্টটা তাকে খুব মানিয়েছে। যদি বিয়েটা হত তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে ভোরবেলায় বাদলকে দেখে আঁখি মেয়েটার মন ভাল হয়ে যেত। যতই মেয়েটা বাদলের কাছাকাছি যেত ততই সে বাদলকে পছন্দ করত। আমার ফুপা এবং ফুপুর চরিত্রের ভাল যা আছে তার সবই আছে বাদলের মধ্যে। ফুপা এবং ফুপুর অন্ধকার দিকের কিছুই বাদল পায়নি। বাদলের জন্যে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও হিমুর মন-খারাপ হতে নেই। বাবার উপদেশনামার তৃতীয় উপদেশ হচ্ছে—

> জগতের কর্মকাণ্ড চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া যাইবে। কোনোক্রমেই বিচলিত হইবে না। আনন্দে বিচলিত হইবে না, দুঃখেও বিচলিত হইবে না। সুখ দুঃখ এইসব নিতান্তই তুচ্ছ মায়া। তুচ্ছ মায়ায় আবদ্ধ থাকিলে জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না।

মুশকিল হচ্ছে, জগতের প্রধান মায়ার স্বরূপ বোঝার জন্যে কোনোরকম ব্যস্ততা এখনও তৈরি হয়নি। আমার আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মায়া আমাকে বড়ই বিচলিত করে।

মফিজ আমার জন্য যে চা বানায় তার নাম—ইসপিসাল, ডাবলপাত্তি। এই চায়ের বিশেষত্ব হচ্ছে ঘন লিকার, প্রচুর দুধ, প্রচুর চিনি। ইসপিসাল চা কাপে করে আসে না—প্রমাণ সাইজের গ্লাসভরতি হয়ে আসে। এক গ্লাস ইসপিসাল ডাবলপাত্তি খেলে সকালের নাশতা খেতে হয় না।

বাদল চায়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তার মুখ থমথম করছে। আমি বললাম, সিগারেট খাবি?

'না, সিগারেট তো খাই না।'

'চা খেতে খেতেই ঘটনা কী বল।'

'ঘটনা বলে কী হবে?'

'তা হলে ভোররাতে এসেছিস কেন?'

বাদল চুপ করে রইল। আমি বললাম, কিছু বলতে ইচ্ছে না করলে বলতে হবে না। চা খেয়ে চলে যা।

'দেখি একটা সিগারেট দাও, খাই।'

আমি সিগারেট দিলাম। বাদল সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে প্রফেশন্যালদের মতো টানছে। নাকে-মুখে ভোঁস-ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছে।

'হিমুদা!'

'বল।'

'বলার মতো কোনো ঘটনা না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। আমরা তো সবাই গেলাম—পনেরোটা গাড়ি, দুটো মাইক্রোবাসে প্রায় একশোজন বরযাত্রী। আগে থেকে কথা হয়ে আছে রাত আটটায় কাজি চলে আসবে। বিয়ে পড়ানো হবে। কাবিনের অ্যামাউন্ট নিয়ে যেন ঝামেলা না হয় সেজন্যে সব আগে থেকেই ঠিকঠাক করা। পাঁচ লক্ষ এক টাকা কাবিন।

কাজি চলে এল আটটার আগেই। উকিলবাবা কবুল পড়িয়ে মেয়ের সই নিতে যাবে। মেয়ের বাবা বললেন, একটু সবুর করুন। নয়টা বেজে গেল। মেয়েপক্ষ হঠাৎ বলল, আপনাদের খাওয়া হয়ে যাক। দুই-তিন ব্যাচে খাওয়া হবে, সময় লাগবে। তখন বাবা বললেন, বিয়ে হোক, তারপর খাওয়া। বিয়ের আগে কিসের খাওয়া! মেয়ের মামা বললেন—একটু সমস্যা আছে। সামান্য দেরি হবে।

কী ব্যাপার তারা কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক চাপাচাপির পর যা জানা গেল তা হল—মেয়ের নাকি সকালবেলায় তার মা'র সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে। মেয়ে রাগ করে তার কোনো এক বন্ধুর বাড়িতে চলে গেছে। সেখান থেকে টেলিফোন করেছিল, বলেছে চলে আসবে। কোথায় আছে তা কেউ জানে না বলে তাকে আনার জন্যেও কেউ যেতে পারছে না।

বাবা রাগ করে বললেন, মেয়ে কি তার প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে? এই কথায় মেয়ের মামা খুব রাগ করে বললেন, এইসব নোংরা কথা কী বলছেন? আমাদের মেয়ে সেরকম না। মা'র সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। টেলিফোনে কথা হয়েছে। চলে আসবে, একটু অপেক্ষা করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

আমরা রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। বাসায় এসেও বিরাট লজ্জায় পড়লাম। বাবা বাসায় ব্যান্ডপার্টির ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। বর-কনে আসবে, ব্যান্ড বাজা শুরু হবে। আমাদের ফেরত আসতে দেখে ব্যান্ড বাজা শুরু হল। উদ্দাম বাজনা। পাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। লজ্জায় আমার ইচ্ছা করছিল...'

'কী ইচ্ছা করছিল?'

বাদল চুপ করে গেল। সে আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় চোখের পানি সামলাচ্ছে। আমি বললাম, তুই আমার কাছে এসেছিস কেন?

'এম্নি এসেছি। মনটা ভাল করার জন্যে এসেছি।'

'মন ভাল হয়েছে?'

'না।'

'তা হলে চল আমার সঙ্গে, হাঁটাহাঁটি করবি। হাঁটাহাঁটি করলে মন ভাল হয়।'

'কে বলেছে?'

'আমি বলছি।'

বাদল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলো।

'চিড়িয়াখানায় যাবি?'

'চিড়িয়াখানায় যাব কেন?'

'জীবজন্তু দেখলে মন দ্রুত ভাল হয়। চল বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখে আসি। তারপর চল হাতির পিঠে চড়ি। পারহেড দশ টাকা নিয়ে ওরা হাতির পিঠে চড়ায়। তোর কাছে টাকা আছে তো?'

'আছে! আমরা মিরপুর পর্যন্ত কি হেঁটে যাব?'

'অবশ্যই! ভাল কথা—তোর "হতে পারত শ্বশুরবাড়ির" টেলিফোন নাম্বার কি তোর কাছে আছে? টেলিফোন করে দেখতাম আঁখি বাসায় ফিরেছে কি না। একটা মেয়ে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—সে ফিরেছে কি না সেটা জানা আমাদের দায়িত্ব না? আছে টেলিফোন নাম্বার?'

'হুঁ।'

'তুই ওদের টেলিফোন নাম্বার পকেটে নিয়ে ঘুরছিস কেন?'

'পকেটে করে ঘুরছি না—তোমার এখানে আসা যখন ঠিক করেছি তখন মনে হয়েছে তুমি ওদের টেলিফোন নাম্বার চাইতে পার, তাই মনে করে নিয়ে এসেছি।'

'ভাল করেছিস।'

'তুমি কি সত্যি মিরপুর পর্যন্ত হেঁটে যাবে?'

'হুঁ। ঘণ্টা দু-এক লাগবে—এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আমি হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম। মনে হচ্ছে আজকের দিনটি হবে আমার জন্যে কর্মব্যস্ত একটি দিন।

পথে নেমেই শুনি কোকিল ডাকছে। তার মানে কী? শীতকালে কোকিল ডাকছে কেন?

'বাদল!'

'হুঁ।'

'কোকিল ডাকছে শুনছিস?'

'হুঁ।'

'ব্রেইন ডিফেক্ট কোকিল—অসময়ের ডাকাডাকি করছে।'

'হুঁ।'

'তুই কি ঠিক করেছিস হুঁর বেশি কিছু বলবি না?'

'কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।'

'কোকিল সম্পর্কে একটা তথ্য শুনবি?'

'বলো।'

'কোকিলের গলা কিন্তু এম্নিতে খুব কর্কশ। সে মধুর গলায় তার সঙ্গীকে ডাকে মেটিং সিজনে। তখনই কোকিল-কণ্ঠশুনে আমরা মুগ্ধ হই।'

'ভাল।'

'তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছা করছে না?'

'না।'

'পথে হাঁটার নিয়ম জানিস?'

'হাঁটার আবার নিয়ম কী, হাঁটলেই হল।'

'সবকিছুর যেমন নিয়ম আছে—হাঁটারও নিয়ম আছে। হাঁটতে হয় একা একা। বল তো কেন?

'জানি না।'

'দুজন বা তারচেয়ে বেশি মানুষের সঙ্গে হাঁটলে কথা বলতে হয়। কথা বলা মানেই হাঁটার প্রথম শর্ত ভঙ্গ করা। হাঁটার প্রথম শর্ত হচ্ছে—নিঃশব্দে হাঁটা।'

'হুঁ।'

'হাঁটার দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে হাঁটার সময় চারদিকে কী হচ্ছে দেখা, কিন্তু খুব গভীরভাবে দেখার চেষ্টা না করা। ইংরেজিতে "Glance"—চট করে তাকানো, "Look" না।'

'হুঁ।'

'হাঁটার তৃতীয় শর্ত হচ্ছে পথে কোথাও থামা চলবে না। কাজেই তুই চট করে দাঁড়িয়ে পড়বি না।'

'আচ্ছা।'

'পেছন দিকে তাকানো চলবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোর কি একেবারেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, বাদল, তুই হাঁটার চতুর্থ শর্ত ভঙ্গ করছিস।

'চতুর্থ শর্তটা কী?'

'তুই মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটছিস। হাঁটার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটা চলবে না।'

'ও আচ্ছা।'

'তোর হাঁটতে কষ্ট হলে রিকশা নিয়ে নি।'

'কষ্ট হচ্ছে না।'

'আচ্ছা, তুই একটা প্রশ্নের জবাব দে। খুব সহজ প্রশ্ন। রিকশাওয়ালাদের রিকশায় প্যাডেল চাপতে হয়। এই কাজটা করার জন্যে তাদের সবচে ভাল পোশাক হচ্ছে ফুলপ্যান্ট কিংবা পায়জামা। পুরানো কাপড়ের দোকানে সস্তায় ফুলপ্যান্ট পাওয়া যায়। রিকশাওয়ালারা কিন্তু কেউই ফুলপ্যান্ট বা পায়জামা পরে না। তারা সব সময় পরে লুঙ্গি। এখন বল কেন? খুব সহজ ধাঁধা।'

'জানি না কেন। ধাঁধা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী নিয়ে ভাবতে ইচ্ছা করছে?'

'কোনোকিছু নিয়েই ভাবতে ইচ্ছা করছে না।'

'চোখের কতগুলি প্রতিশব্দ বল তো! প্রথমটা আমি বলে দিচ্ছি—আঁখি।'

'বললাম তো হিমুদা, ধাঁধার খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না।'

'আহা আয়-না একটু খেলি! বল দেখি চোখ, আঁখি... তারপর?'

'চোখ, আঁখি, নয়ন, নেত্র, অক্ষি, লোচন...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'গুড, ভালই তো বলেছিস!'

হিমুদা, খিদে লেগে গেছে।

'খিদে ব্যাপারটা কেমন ইন্টারেস্টিং দেখেছিস—তোর যত ঝামেলা, যত সমস্যাই থাকুক, খিদের সমস্যা সব সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

'ফিলসফি করবে না। ফিলসফি ভাল লাগছে না।'

'খিদের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় জানিস?'

'না।'

'খুব সহজ উপায়। বাহাত্তর ঘণ্টা কিচ্ছু না খেয়ে থাকা। পানি পর্যন্ত না। বাহাত্তর ঘণ্টা পর এক চামুচ বা দুচামুচ পানি খাওয়া যেতে পারে। বাহাত্তর ঘণ্টা পার করার পর দেখবি খিদেবোধ নেই—শরীরে ফুরফুরে ভাব। মাথার ভেতরটা অসম্ভব ফাঁকা। মাঝে মাঝে ঝনঝন করে আপনা-আপনি বাজনা বেজে ওঠে। আলোর দিকে তাকালে নানান রঙ দেখা যায়—তিনকোনা কাচের ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন রঙ দেখা যায় তেমন রঙ।'

'তুমি দেখেছ?'

'হুঁ।'

'কতদিন না খেয়ে ছিলে?'

'বাহাত্তর ঘণ্টা থাকার কথা, বাহাত্তর ঘণ্টা ছিলাম।'

'বাহাত্তর ঘণ্টা থাকার কথা তোমাকে কে বলল?'

'বাবা বলেছিলেন। আমার গুরু হচ্ছেন আমার পিতা। মহাপুরুষ বানাবার কারিগর। তোর কি খিদে বেশি লেগেছে?'

'হুঁ।'

'কী খেতে ইচ্ছে করছে?'

'যা খেতে ইচ্ছে করছে তা-ই খাওয়াবে?'

'আমি কি ম্যাজিশিয়ান নাকি, তুই যা খেতে চাইবি—মন্ত্র পড়ে তা-ই এনে দেব?'

'তুমি ম্যাজিশিয়ান তো বটেই। অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান। অন্যরা কেউ জানে না, আমি জানি। আমার বাসি পোলাও খেতে ইচ্ছে করছে।'

'বাসি পোলাও মানে?'

'গতরাতে রান্না করা হয়েছে। বেঁচে গেছে, ফ্রিজে রেখে দেয়া হয়েছে। সেই বাসি পোলাওয়ের সঙ্গে গরম গরম ডিমভাজা।'

'খুব উপাদেয় খাবার?'

'উপাদেয় কি না জানি না। একবার খেয়েছিলাম, সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে। মাঝে মাঝে আমার এই খাবারটা খেতে ইচ্ছা করে। বাসি পোলাও তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি চাইলে পাবে।'

'আমি চাইলে পাব কেন?'

'কারণ তুমি হচ্ছ মহাপুরুষ।'

'মহাপুরুষরা বুঝি চাইলেই বাসি পোলাও পায়?'

বাদল জবাব দিল না। আমি বললাম, আয় লাক ট্রাই করতে করতে যাই। রেসিডেনশিয়াল এরিয়ার ভেতর ঢুকে যাই। সব বাড়ির সামনে দাঁড়াব। কলিংবেল টিপব—বাড়ির মালিক বের হলে বলব, আমরা একটা সার্ভে করছি। সকালবেলা কোন বাড়িতে কী নাশতা হয় তার সার্ভে। ইনকাম গ্রুপ এবং নাশতার প্রফাইল।'

'কী যে তুমি বল!'

'আরে আয় দেখি!'

'তুমি কি সত্যি সিরিয়াস?'

'অবশ্যই সিরিয়াস। তবে সার্ভের কথা বলে শুধুহাতে উপস্থিত হওয়া চলবে না। কাগজ লাগবে, বলপয়েন্ট লাগবে। তুই বলপয়েন্ট আর কাগজ কিনে দে।'

'আমার ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা।'

'ভয়ের কিচ্ছু নেই, আয় তো!'

প্রথম যে-বাড়ির সামনে আমরা দাঁড়ালাম সেই বাড়ির নাম উত্তরায়ণ। বেশ জমকালো বাড়ি। গেটে দারোয়ান আছে। গেটের ফাঁক দিয়ে বাড়ির মালিকের দুটো গাড়ি দেখা যাচ্ছে। একটা গাড়ি মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে কেনা হয়েছে। ঝকঝক করছে।

দারোয়ান বলল, কাকে চান?

আমি বললাম, আমরা স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো থেকে এসেছি। বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

'আপনার নাম?'

'হিমু।'

'কার্ড দেন।'

'আমার সঙ্গে কার্ড নেই। আমরা ছোট কর্মচারী, আমাদের সঙ্গে তো কার্ড থাকে না। আপনি ভেতরে গিয়ে খবর দিন। বলবেন স্ট্যাটিসটিক্যাল ব্যুরো।'

দারোয়ান ভেতরে চলে গেল। বাদল বলল, ভয়-ভয় লাগছে হিমুদা। শেষে হয়তো পুলিশে দিয়ে দেবে। মারধোর করবে।

'ভয়ের কিচ্ছু নেই।'

'তোমার খালি পা। খালি পা দেখেই সন্দেহ করবে।'

'মানুষ চট করে পায়ের দিকে তাকায় না। তাকায় মুখের দিকে। তা ছাড়া আমাদের ভেতরে নিয়ে বসাবে। তখন খালিপায়ে বসলে ভাববে স্যান্ডেল বাইরে খুলে এসেছি।'

'তোমার মারাত্মক বুদ্ধি হিমুদা।'

'তোর মন-স্যাঁতসেঁতে ভাবটা কি এখন দূর হয়েছে?'

'হুঁ।'

'একটা উত্তেজনার মধ্যে তোকে ফেলে দিয়েছি যাতে আঁখি মেয়েটির চিন্তা থেকে আপাতত মুক্তি পাস।'

দারোয়ান এসে বলল, যান ভিতরে যাইতে বলছে।

আমরা রওনা হলাম। বাদল ভাল ভয় পেয়েছে। তার চোখেমুখে ঘাম। তবে সে আঁখির হাত থেকে এখন মুক্ত।

আমাদের বসাল ড্রয়িংরুমের পাশে ছোট একটা ঘরে। এটা বোধহয় গুরুত্বহীন মানুষদের বসার জন্যে ঘর। দেশ থেকে লোক আসবে—এখানে বসবে। বিল নিতে আসবে, বসবে এই খুপরিতে।

এক ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে ঢুকলেন। বয়স্ক লোক। সকালবেলায় হঠাৎ যন্ত্রণায় তিনি বিরক্ত। বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছেন, পারছেন না।

'আপনাদের ব্যাপারটা কী?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার, আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির সোসিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা সমীক্ষা চালাচ্ছি। সমীক্ষাটা হচ্ছে ঢাকা শহরের মানুষদের ব্রেকফাস্টের প্রোফাইল।

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কিসের প্রোফাইল?

'কোন পরিবারে কী ধরনের নাশতা খাওয়া হয় এর উপর একটা জেনারেল স্টাডি। আজ আপনাদের বাসায় কী নাশতা হয়েছে, আপনি কী খেয়েছেন?'

'সকালে তো আমি নাশতাই খাই না। একটা টোস্ট খাই আর এক কাপ কফি খাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি গম্ভীর মুখে কাগজে লিখলাম—টোস্ট, কফি।

'কফি কি ব্ল্যাক কফি?'

'না, ব্ল্যাক কফি না, দুধ কফি।'

'বাড়িতে নিশ্চয়ই অন্য সবার জন্যে কোনো একটা নাশতা তৈরি হয়েছে, সেটা কী?'

'দাঁড়ান, আমার ভাগ্নিকে পাঠাই। ও বলতে পারবে। এই জাতীয় স্টাডির কথা প্রথম শুনলাম। যেসব স্টাডি হবার সেসব হচ্ছে না—নাশতা নিয়ে গবেষণা!'

ভদ্রলোক চলে গেলেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যে-মেয়েটি ঢুকল সে মীরা। গভীর রাতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। কুড়িয়ে পাওয়া মানিব্যাগ এই মেয়েটির হাতেই দিয়েছি। তবে এমন জমকালো বাড়িতে নয়। মেয়েটি আমাকে চিনতে পারল না। সেও ভদ্রলোকের মতোই বিরক্ত মুখে বলল, আজ এ-বাড়িতে কোনো নাশতা হয়নি। গতরাতে বাড়িতে একটা উৎসব ছিল। বড়মামার পঞ্চাশতম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে পোলাও রান্না হয়েছে। অনেক পোলাও বেঁচে গেছে। ডিপ ফ্রিজে রাখা ছিল। সকালে সে-পোলাও গরম করে দেয়া হয়েছে।

আমি সহজ গরায় বললাম, আমরা দুজন কি সেই বাসি পোলাও খেয়ে দেখতে পারি? পোলাওয়ের সঙ্গে ডিমভাজা।

বাদল চোখমুখ শুকনো করে ফেলল। মীরা তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

আমি বললাম, তারপর মীরা, তুমি ভাল আছ?

মীরা এখনও তাকিয়ে আছে।

'আমাকে চিনতে পারছ তো? ঐ যে তোমাকে টাকা দিয়ে এলাম সাঁইত্রিশ হাজার নয়শো একুশ টাকা?'

মীরা পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। মেয়েরা হতচকিত অবস্থা থেকে চট করে উঠে আসতে পারে। মীরা পারছে না। মেয়েটি মনে হয় সহজ-সরল জীবনে বাস করে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তেমন যোগ নেই। তার জীবনে হকচকিয়ে যাবার ঘটনা তেমন ঘটেনি।

'মীরা, আমাকে চিনতে পারছ তো?'

'হুঁ।'

'ভেরি গুড! আমাদের নাশতা দিয়ে দাও, খেয়ে চলে যাই। স্ট্যাটিসটিক্যাল ডাটা সংগ্রহের জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব ধাপ্পাবাজি। আমরা আসলে নাশতা খেতে এসেছি।'

'ও আচ্ছা।'

'আসল কথা বলতে ভুলে গেছি, নাশতা একজনের জন্যে আনবে, শুধু বাদলের জন্যে। আমি একবেলা খাই। বাদলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়নি। এ হচ্ছে আমার ফুপাতো ভাই। পিএইচ. ডি. করার জন্যে কোথায় যেন গিয়েছে। জায়গাটা কোথায় রে বাদল?'

বাদল মাথা নিচু করে ছিল। সে মাথা নিচু করে ক্ষীণ স্বরে বলল, কানাডা।

অপরিচিত মানুষের সামনে বাদল একেবারেই সহজ হতে পারে না। মেয়েদের সামনে তো নয়ই। বিশেষ করে মেয়ে যদি সুন্দরী হয় তা হলে বাদলের জিহ্বা জড়িয়ে যায়। তোতলামি শুরু হয়। রাতে মীরা মেয়েটাকে যত সুন্দর দেখাচ্ছিল দিনে তারচেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে।

ভেতর থেকে ভারী গলায় কে যেন ডাকল—মীরা! মীরা!

মনে হয় শুরুতে যে-ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনিই ডাকছেন। সকালে কী নাশতা হয় তার তালিকা দিতে মীরার এত দেরি হবার কথা না। মীরা বলল, আপনারা বসুন। আমি আসছি।

বাদল মাথা তুলল। তার কানটান লাল হয়ে আছে। বিয়ে না হয়ে ভালই হয়েছে, বিয়ে হলে বাদল তো মনে হয় সারাক্ষণ কান লাল করে বসে থাকত। পার্মানেন্ট তোতলা হয়ে যেত। কেমন আছিস রে বাদল? জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত—ভা ভা ভা ল।

'হিমুদা!'

'হুঁ?'

'এই মেয়েটাকে তুমি চেন?'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য তো!'

'আশ্চর্যের কী আছে! সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকতে পারে না?'

'সেইজন্যে আশ্চর্য বলছি না। অন্য কারণে আশ্চর্য বলছি।'

'কী কারণ?'

'বাসি পোলাও খেতে চেয়েছি—তুমি এই বাড়িতে নিয়ে এলে। এই বাড়িতে আজই বাসি পোলাও নাশতা।'

'একে বলে কাকতালীয় যোগাযোগ।'

'কাকতলীয় না—এর নাম হিমুতালীয়। তোমার যে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে তা আমি গোড়া থেকেই জানি—তবে ক্ষমতাটা যে এত প্রবল তা জানতাম না।'

'আমিও জানতাম না।'

'হিমুদা!'

'হুঁ?'

'তুমি কাউকে দেখে তার ভবিষ্যৎ বলতে পার?'

'আমার নিজের ভবিষ্যৎ বলতে পারি—অন্যেরটা পারি না।'

'তোমার ভবিষ্যৎ কী?'

'বলা যাবে না।'

'হিমুদা!'

'হুঁ?'

'তুমি কি জানতে এ-বাড়িতে আজ নাশতা হচ্ছে বাসি পোলাও?'

'জানতাম না।'

মীরা ঢুকেছে। তার হাতে ট্রে। ট্রে ভরতি খাবার। মীরার পেছনে একটা কাজের মেয়ে—তার হাতেও ট্রে। শুধু যে বাসি পোলাও এসেছে তা না, পরোটা এসেছে, গোশত এসেছে। ছোট ছোট গ্লাসে কমলার রস। মীরা বলল, আপনারা চা খাবেন, না কফি খাবেন?

আমি বাদলকে বললাম, 'কী খাবি বল?'

'বাদল বলল, ক ক কফি।'

বাদলকে তোতলামিতে ধরে ফেলেছে।

মীরা আমার সামনে বসল। তার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে নিজেকে তৈরি করে এনেছে। কী কী বলবে সব ঠিক করা। নাশতা নিয়ে ঢোকার আগে সে নিশ্চয়ই মনে মনে রিহার্সেল দিয়েও এসেছে। মীরা বলল, আপনার নাম হিমু? উনি হিমুদা বলে ডাকছিলেন।

'আমার নাম হিমু।'

'ঐ রাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেয়া হয়নি। আসলে আমি আর বাবা আমরা দুজনেই ভেবেছিলাম টাকাটা কখনো পাওয়া যাবে না। বাবা অবিশ্যি বারবারই বলছিলেন টাকাটা ফেরত পাওয়া যাবে। তবে এটা ছিল নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কথার কথা। আপনি যখন সত্যি সত্যি মানিব্যাগ নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন আমরা এতই হতভম্ব হয়ে গেলাম যে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আপনি যেমন হুট করে উপস্থিত হলেন তেমনি হুট করেই চলেও গেলেন। তখন বাবা খুব হৈচৈ শুরু করলেন, মানুষটা গেল কোথায়, মানুষটা গেল কোথায়? বাবা খুব অল্পতে অস্থির হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ব্লাড প্রেশারও বেড়ে যায়। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। আপনাদের খুঁজে বের করার জন্যে রাত আড়াইটার সময় ঘর থেকে বের হলেন।

'বল কী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার বাবা খুব অস্থির প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সঙ্গে কথা না বললে বুঝতে পারবেন না। উনি রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত আপনাদের খুঁজে বেড়ালেন। আমি একা একা ভয়ে অস্থির।'

'একা কেন?'

'একা, কারণ আমাদের সংসারে দুজনই মানুষ। আমি আর আমার বাবা। যাই হোক, বাবা বাসায় ফিরেই বললেন, মীরা শোন, আমি নিশ্চিত টাকা নিয়ে যারা এসেছিল তারা মানুষ না, অন্যকিছু।'

আমি বললাম, অন্যকিছু মানে?

বাবা বললেন, অন্যকিছুটা কী আমি নিজেও জানি না। আমাদের দৃশ্যমান জগতে মানুষ যেমন বাস করে, মানুষ ছাড়া অন্য জীবরাও বাস করে। তাঁদের কেউ এসেছিলেন। বাবা এমনভাবে বললেন, যে আমি নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম। সেই কারণেই আপনাকে দেখে এমন চমকে উঠেছিলাম।

'ও আচ্ছা।'

'এখন আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বাবার সঙ্গে দেখা করুন। বাবার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করুন। আজ কি যেতে পারবেন?'

'বুঝতে পারছি না। আজ আমাদের অনেক কাজ।'

'কী কাজ?'

'বাঁদর দেখার জন্যে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে। হাতির পিঠে চড়তে হবে। এ জার্নি বাই এলিফেন্ট টাইপ ব্যাপার। আঁখি নামের একটা মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'বেশ, কাল আসুন।'

'দেখি পারি কি না।'

'আপনি আমার বাবার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না। একটা ভুল ধারণা তাঁর মনে ঢুকে গেছে। এটা বের করা উচিত।'

আমি হাসিমুখে বললাম, কোনটা ভুল ধারণা, কোনটা শুদ্ধ ধারণা সেটা চট করে বলাও কিন্তু মুশকিল। এই পৃথিবীতে সবকিছুই আপেক্ষিক।

'আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন না যে আপনি মানুষ না, অন্যকিছু?'

আমি আবারও হাসলাম। আমার সেই বিখ্যাত বিভ্রান্ত-করা হাসি। তবে বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অনেক চালাক, যত বিভ্রান্তির হাসিই কেউ হাসুক মেয়েরা বিভ্রান্ত হয় না। তা ছাড়া পরিবেশের একটা ব্যাপারও আছে। বিভ্রান্ত হবার জন্যে পরিবেশও লাগে। আমি যদি রাত দুটায় হঠাৎ করে মীরাদের বাসায় উপস্থিত হই এবং এই কথাগুলি বলি—কিছুক্ষণের জন্যে হলেও সে বিভ্রান্ত হবে।

এখন ঝলমলে দিনের আলো। আমাদের নাশতা দেয়া হয়েছে। কফি পট-ভরতি। কফির পট থেকে গরম ধোঁয়া উড়ছে। এই সময় বিভ্রান্তি থাকে না।

বাদল মাথা নিচু করে বাসি পোলাও খাচ্ছে। মনে হচ্ছে বাসি পোলাওয়ের মতো বেহেশতি খানা সে এই জীবনে প্রথম খাচ্ছে।

আমরা চিড়িয়াখানায় গেলাম।

বাঁদরদের বাদাম খাওয়ালাম। তাদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি দেখলাম। তারপর হাতির পিঠে চড়লাম। দশ টাকা করে টিকিট। তারপর গেলাম শিম্পাঞ্জি দেখতে। শিম্পাঞ্জি দেখে তেমন মজা পাওয়া গেল না। কারণ তার অবস্থা বাদলের মতো। খুবই বিমর্ষ। আমরা একটা কলা ছুঁড়ে দিলাম—সে ফিরেও তাকাল না। বাঁদরগোত্রীয় প্রাণী, অথচ কলার প্রতি আগ্রহ নেই—এই প্রথম দেখলাম। বাদলকে বললাম, চল জিরাফ দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদল শুকনো গলায় বলল, জিরাফ দেখে কী হবে!

'জিরাফের লম্বা গলা দেখে যদি তোর মনটা ভাল হয়।'

'আমার মন ভাল হবে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব।'

'যা, চলে যা। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সন্ধ্যাবেলা সব পশুপাখি একসঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে—ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার।'

'কোনো ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে আমি এখন আর আগ্রহ বোধ করছি না।'

'তা হলে যা, বাড়িতে গিয়ে লম্বা ঘুম দে।'

'তুমি আঁখিকে টেলিফোন করবে না?'

'করব।'

'এখন করো। চিড়িয়াখানায় কার্ডফোন আছে। আমার কাছে কার্ড আছে।'

'তুই কি ফোন-কার্ড সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? এ পর্যন্ত ঐ বাড়িতে ক'বার টেলিফোন করেছিস?'

'দুবার।'

'তোর সঙ্গে কথা বলেনি?'

'না।'

'তোর সঙ্গেই কথা বলেনি, আমার সঙ্গে কি আর বলবে?'

'তোমার সঙ্গে বলবে—কারণ তুমি হচ্ছ হিমু।'

'টেলিফোন করে কী বলব?'

বাদল চুপ করে রইল। আমি হাসিমুখে বললাম, তুই নিশ্চয়ই চাস না—কেমন আছ, ভাল আছি টাইপ কথা বলে রিসিভার রেখে দি? মেয়েটাকে আমি কী বলব সেটা বলে দে।

'তোমার যা ইচ্ছা তা-ই বলো।'

'আমি কী বলব—আঁখি শোনো, মগবাজার কাজি অফিস চেন? এক কাজ করো—রিকশা করে কাজি অফিসে চলে আসো। আমি বাদলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি এলে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। কোনো সমস্যা নেই।'

বাদল মাথা নিচু করে ফেলল। মনে হচ্ছে সে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। প্রায় ফিস-ফিস করে বলল, তুমি আসতে বললে আঁখি চলে আসবে।

'তোর তাই ধারণা?'

'হ্যাঁ।'

'তুই কিন্তু ভালই বোকা।'

'আমি বোকা হই যা-ই হই তুমি হচ্ছ হিমু। তুমি যা বলবে তা-ই হবে।'

'আচ্ছা পরীক্ষা হয়ে যাক—আমি আঁখিকে আসতে বলি। বলব?'

বাদল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, বলো।

বেশ কয়েকবার টেলিফোন করা হল। ওপাশ থেকে কেউ ফোন ধরছে না। বাদল শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বাদলকে দেখে খুবই মায়া লাগছে। মায়া লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে প্রতি পদে পদে মায়াকে তুচ্ছ করতে হয়।

৪

কোনো ভদ্রলোকের যদি বিয়ের দুবছরের মাথায় সন্তানপ্রসবজনিত জটিলতায় স্ত্রীবিয়োগ হয়, তিনি যদি আর বিয়ে না করেন এবং বাকি জীবন কাটিয়ে দেন সন্তানকে বড় করার জটিল কাজে তখন তাঁর ভেতর নানান সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যার মূল কারণ অপরাধবোধ। স্ত্রীর মৃত্যুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে তিনি নিজেকে দায়ী করেন। সন্তানের জন্ম না হলে স্ত্রী মারা যেত না। সন্তানের জন্মের জন্যে তাঁর ভূমিকা আছে এই তথ্য তাঁর মাথায় ঢুকে যায়। মাতৃহারা সন্তানকে মাতৃস্নেহবঞ্চিত করার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তাঁর নিজের নিঃসঙ্গতার জন্যেও তিনি নিজেকে দায়ী করেন। তিনি সংসারে বেঁচে থাকেন অপরাধীর মতো। যতই দিন যায় তাঁর আচার, আচরণ, জীবনযাপন পদ্ধতি ততই অসংলগ্ন হতে থাকে। স্ত্রী জীবিত অবস্থায় তাকে যতটা ভালবাসতেন, মৃত্যুর পর তারচে অনেক বেশি ভালবাসতে শুরু করেন। সেই ভালবাসাটা চলে যায় অসুস্থতা পর্যায়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেবকে দেখে আমার তা-ই মনে হল। মীরার বাবার নাম আশরাফুজ্জামান। একসময় কলেজের শিক্ষক ছিলেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দেন। এটাই স্বাভাবিক। অস্থিরতায় আক্রান্ত একটা মানুষ স্থায়ীভাবে কিছু করতে পারে না। বাকি জীবনে তিনি অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছেন—ইনসিউরেন্স কোম্পানির কাজ, ট্র্যাভেলিং এজেন্সির চাকরি থেকে ইনডেনটিং ব্যবসা, টুকটাক ব্যবসা সবই করা হয়েছে। এখন কিছু করছেন না। পৈতৃক বাড়ি ভাড়া দিয়ে সেই টাকায় সংসার চালাচ্ছেন। সংসারে দুটিমাত্র মানুষ থাকায় তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের প্রচুর অবসর। এই অবসরের সবটাই কাটাচ্ছেন মৃত মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি উদ্ভাবনে। ভদ্রলোক খুব রোগা। বড় বড় চোখ। চোখের দৃষ্টিতে ভরসা-হারানো ভাব। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এই বয়সে মাথায় কাঁচাপাকা চুল থাকার কথা। তাঁর মাথার সব চুলই পাকা। ধবধবে শাদা চুলে ভদ্রলোকের মধ্যে ঋষি-ঋষি ভাব চলে এসেছে। তাঁর গলার স্বর খুব মিষ্টি। কথা বলার সময় একটু ঝুঁকে কাছে আসেন। তাঁর হাত খুবই সরু। মৃত মানুষের হাতের মতো—বিবর্ণ। কথা বলার সময় গায়ে হাত দেয়ার অভ্যাসও তাঁর আছে। তিনি যতবারই গায়ে হাত দিয়েছেন, আমি ততবারই চমকে উঠেছি।

'আপনার নাম হিমু?'

'জি।'

'মানিব্যাগ নিয়ে রাতে আপনি যখন এসেছিলেন তখন আপনার চেহারা একরকম ছিল—এখন অন্যরকম।'

আমি বললাম, তাজমহল দিনের একেক আলোয় একেক রকম দেখা যায়—মানুষ তো তাজমহলের চেয়েও অনেক উন্নত শিল্পকর্ম, মানুষের চেহারাও বদলানোর কথা।

'আমার ধারণা ছিল আপনি মানুষ না।'

'এখন কী ধারণা, আমি মানুষ?

আশরাফুজ্জামান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখেমুখে একধরনের অস্বস্তি। মনে হচ্ছে তিনি আমার ব্যাপারে এখনও সংশয়মুক্ত না। আমি হাসিমুখে বললাম, একদিন দিনের বেলা এসে আপনাকে দেখাব—রোদে দাঁড়ালে আমার ছায়া পড়ে।

আশরাফুজ্জামান সাহেব নিচুগলায় বললেন, মানুষ না, কিন্তু মানুষের মতো জীবদেরও ছায়া পড়ে।

'তাই নাকি?'

'জি। এরা মানুষদের মধ্যেই বাস করে।'

'ও আচ্ছা।'

'আমি অনেককিছু জানি, কিন্তু কাউকে মন খুলে বলতে পারি না। কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। পাগল ভাববে। মীরাকেও আমি তেমন কিছু বলি না।'

'আমাকে বলতে চাচ্ছেন?'

'জি না।'

'বলতে চাইলে বলতে পারেন।'

'আচ্ছা, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয় আমি অসুস্থ?'

'না, তা মনে হচ্ছে না।'

'মীরার ধারণা আমি অসুস্থ। যতই দিন যাচ্ছে ততই তার ধারণা প্রবল হচ্ছে। অথচ আমি জানি আমি খুবই সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। আমার অস্বাভাবিকতা বলতে এইটুকু যে মীরার মা'র সঙ্গে আমার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়।'

'তাই বুঝি?'

'জি। মানিব্যাগ হারিয়ে গেল। আমি খুবই আপসেট হয়ে বাসায় এসেছি। আমি মোটামুটিভাবে দরিদ্র মানুষ—এতগুলি টাকা! মীরাকে খবরটা দিয়ে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছি—তখন মীরার মা'র সঙ্গে আমার কথা হল। সে বলল, তুমি মন-খারাপ কোরো না, টাকা আজ রাতেই ফেরত পাবে। আমি মীরাকে বললাম, সে হেসেই উড়িয়ে দিল।'

'হেসে উড়িয়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি। টাকা তো সেই রাতেই ফেরত পেয়েছিলেন। তাই না?'

'জি। মীরার মা সারা জীবন আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এখনও করছে।'

'ওনার নাম কী?'

'ইয়াসমিন।'

'উনি কি সরাসরি আপনার সঙ্গে কথা বলেন, না প্ল্যানচেটের মাধ্যমে তাঁকে আনতে হয়।'

তিনি নিচুগলায় বললেন, শুরুতে প্ল্যানচেট করে আনতাম। এখন নিজেই আসে। যা বলার সরাসরি বলে।

'তাঁকে চোখে দেখতে পান?'

'সব সময় পাই না—হঠাৎ হঠাৎ দেখা পাই। আপনি বোধহয় আমার কোনো কথা বিশ্বাস করছেন না। অবিশ্বাসের একটা হাসি আপনার ঠোঁটে।'

'আমি আপনার সব কথাই বিশ্বাস করছি। আমি তো মিসির আলি না যে সব কথা অবিশ্বাস করব। আমি হচ্ছি হিমু। হিমুর মূলমন্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।'

'মিসির আলি কে?'

'আছেন একজন। তাঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে তর্কে মিলায় বস্তু, বিশ্বাসে বহুদূর। তাঁর ধারণা জীবনটা অঙ্কের মতো। একের সঙ্গে এক যোগ করলে সব সময় দুই হবে। কখনো তিন হবে না।'

'তিন কি হয়?'

'অবশ্যই হয়—আপনার বেলায় তো হয়ে গেল। আপনি এবং মীরা—এক এক দুই হবার কথা। আপনার বেলায় হচ্ছে তিন। মীরার মা কোত্থেকে যেন উপস্থিত হচ্ছেন!'

'আপনি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। চা খাবেন?'

'চা কে বানাবে, মীরা তো বাসায় নেই।'

'চা আমিই বানাব। ঘর-সংসারের কাজ সব আমিই করি। চা বানানো, রান্না—সব করতে পারি। মোগলাই ডিশও পারি।'

'আপনার কোনো কাজের লোক নেই?'

'না।'

'নেই কেন? মীরার মা পছন্দ করেন না?'

'জি না। আপনি ঠিক ধরেছেন।'

'কোনো কাজের মানুষের সাহায্য ছাড়া মেয়েকে বড় করতে আপনার কোনো সমস্যা হয়নি?'

'সমস্যা তো হয়েছেই। তবে ইয়াসমিন আমাকে সাহায্য করেছে। যেমন ধরুন মেয়ে রাতে কাঁথা ভিজিয়ে ফেলেছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না, ঘুমে অচেতন। ইয়াসমিন আমাকে ডেকে তুলে বলবে—মেয়ে ভেজা কাঁথায় শুয়ে আছে।'

'বাহ্, ভাল তো!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মীরার একবার খুব অসুখ হল। কিছু খেতে পারে না, যা খায় বমি করে ফেলে দেয়—শরীরে প্রবল জ্বর। ডাক্তাররা কড়া কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছেন, জ্বর সারছে না। তখন ইয়াসমিন এসে বলল, তুমি মেয়েকে অষুধ খাওয়ানো বন্ধ করো। কাগজিলেবুর শরবত ছাড়া কিছু খাওয়াবে না।'

'আপনি তা-ই করলেন?'

'প্রথম দিকে করতে চাইনি। ভরসা পাচ্ছিলাম না—কারণ মেয়ের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। এরকম একজন রোগীর অষুধপত্র বন্ধ করে দেয়াটা কঠিন কাজ।'

'অর্থাৎ আপনি আপনার স্ত্রীর কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করেননি?'

'জি করেছি, কিন্তু সাহস হচ্ছিল না। মেয়ের অবস্থা আরও যখন খারাপ হল তখন প্রায় মরিয়া হয়েই অষুধপত্র বন্ধ করে লেবুর শরবত খাওয়াতে শুরু করলাম। দুদিনের মাথায় মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেল।'

'এরকম ভূত-ডাক্তার ঘরে থাকাটা তো খুব ভাল।'

'দয়া করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে কোনো রসিকতা করবেন না। আমি এম্নিতেই রসিকতা পছন্দ করি না। স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা একেবারেই পছন্দ করি না। চা খাবেন কি না তা তো বলেননি।'

'চা খাব।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চা আনতে গেলেন। সন্ধ্যা সাতটার মতো বাজে। পুরো রাত আমার সামনে পড়ে আছে। আশরাফুজ্জামান সাহেব চা বানাতে থাকুন, আর আমি বসে বসে গুছিয়ে ফেলি রাতে কী কী করব। অনেকগুলি কাজ জমে আছে।

ক) আঁখি নামের মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি। যোগাযোগ করতে হবে। টেলিফোন করলেই ওপাশ থেকে পোঁ পোঁ শব্দ হয়। বাদল কি টেলিফোন নাম্বার ভুল এনেছে?

খ) মেজো ফুপু জরুরি খবর পাঠিয়েছেন। আমার মনে হয় আঁখিসংক্রান্ত বিষয়েই আলাপ করতে চান।

গ) এক পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে—নাম ময়লা বাবা। সারা গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন। তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

ঘ) মিসির আলি সাহেবের ঠিকানা পাওয়া গেছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা। উনি কথা বলবেন কি না কে জানে! যুক্তিসংগত কারণ উপস্থিত না করলে উনি কথা বলবেন বলে মনে হয় না। এই ধরনের মানুষরা যুক্তির বাইরে পা দেন না। তাঁরা জানেন অ্যান্টিলজিক হচ্ছে লজিকেরই উলটো পিঠ।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনার চা নিন। চায়ে আপনি ক'চামচ চিনি খান?'

'যে যত চামচ দেয় তত চামচই খাই। আমার কোনোকিছুতেই কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।'

'আমি এক চামচ চিনি দিয়েছি।'

'খুব ভাল করেছেন। এবং চা অসাধারণ হয়েছে—গরম মশল্লা দিয়েছেন নাকি?'

'সামান্য দিয়েছি—এক দানা এলাচ, এক চিমটি জাফরান। ফ্লেভারের জন্যে দেয়া।'

'খুব ভাল করেছেন।'

'আমার স্ত্রী চা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত। কমলালেবুর খোসা শুকিয়ে রেখে দিত। মাঝে মাঝে চায়ে সামান্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে দিত। অসাধারণ টেস্ট! কমলালেবুর শুকানো খোসা আমার কাছে আছে, একদিন আপনাকে খাওয়াব।'

'জি আচ্ছা। একটা কথা—আপনার স্ত্রী কি এই বাড়িতেই থাকেন, মানে ভূত হবার পর আপনার সঙ্গেই আছেন?'

'ইয়াসমিন প্রসঙ্গে ভূত-প্রেত এই জাতীয় শব্দ দয়া করে ব্যবহার করবেন না।'

'জি আচ্ছা, করব না। উনি কি এখন আশেপাশেই আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর উপস্থিতি আপনি বুঝতে পারেন?'

'পারি।'

'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'আপনি কথা বললে সে শুনবে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে কি না তা তো জানি না। সে মীরার সঙ্গেই কথা বলে না। মীরা তার নিজের মেয়ে।'

'আমি আপনার স্ত্রীকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কীভাবে বলব? বাতি নিভিয়ে বলতে হবে?'

'বাতি নেভাতে হবে না। যা বলার বলুন, সে শুনবে।'

'সম্বোধন করব কী বলে? ভাবি ডাকব?'

'হিমু সাহেব, আপনি পুরো ব্যাপারটা খুব হালকাভাবে নেবার চেষ্টা করছেন। এটা ঠিন না। আমার স্ত্রীকে আপনার যদি কিছু জিজ্ঞেস করার থাকে জিজ্ঞেস করুন। আমি তার কাছ থেকে জবাব এনে দিচ্ছি।'

'চা শেষ করে নি। চা খেতে খেতে যদি ওনার সঙ্গে কথা বলি, উনি হয়তো এটাকে বেয়াদবি হিসেবে নেবেন।'

'আবারও রসিকতা করছেন?'

'আর করব না।'

আমি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, আমার ভাল নাম হিমালয়। ডাকনাম হিমু। সবাই এখন আমাকে এই নামে চেনে। আমাকে বলা হয়েছে মীরার মৃতা মা এই বাড়িতে উপস্থিত আছেন। আমি এর আগে কোনো মৃত মানুষের সঙ্গে কথা বলিনি। আমি জানি না তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। আমার কথাবার্তায় যদি কোনো বেয়াদবি প্রকাশ পায়—দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন। আমি আপনার কাছ থেকে একটা ব্যাপার জানতে চাচ্ছি। আমি একরাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। কী দেখে ভয় পেয়েছিলাম সেটা কি আপনি বলতে পারবেন?

কথা শেষ করে মিনিট পাঁচেক চুপচাপ বসে রইলাম। আশরাফুজ্জামান সাহেবও চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ। মনে হয় তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমন্ত মানুষের মতো তিনি ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলছেন। তাঁর ঘুম ভাঙাবার জন্য আমি শব্দ করে কাশলাম। তিনি চোখ মেললেন না, তবে নড়েচড়ে বসলেন। আমি বললাম, উনি কি আমার কথা শুনতে পেয়েছেন?'

'পেয়েছে।'

'উত্তরে কী বললেন?'

'সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চায় না।'

'আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। মীরাকে বলবেন আমি এসেছিলাম।'

'আরেকটু বসুন, মীরা চলে আসবে। তার বান্ধবীর জন্মদিনে গিয়েছে। বলে গেছে আটটার মধ্যে চলে আসবে। আটটা বাজতে আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, আজ মীরা আসতে অনেক দেরি করবে। বারোটা-একটা বেজে যেতে পারে। কাজেই অপেক্ষা করা অর্থহীন।

আশরাফুজ্জামান সাহেব ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, দেরি করবে বলছেন কেন?

'আমার মনে হচ্ছে দেরি হবে। একধরনের ইনটিউশন। আমার ইনটিউশন-ক্ষমতা প্রবল।'

ভদ্রলোক অবিশ্বাসীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন। আমি বললাম, আপনি ওভাবে তাকাচ্ছেন কেন? আপনি যা বলেছেন আমি বিশ্বাস করেছি। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করছেন না কেন?

'মীরা কখনো রাত আটটার পর বাইরে থাকে না। আমার এখানে টেলিফোন নেই। দেরি হলে টেলিফোনে খবর দিয়ে সে আমার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবে না বলেই কখনো দেরি করবে না। আপনি আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। কমলালেবুর খোসা দিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দি, খেয়ে দেখুন।'

'অন্য সময় এসে খেয়ে যাব। আমার খুব কিছু জরুরি কাজ আছে, আজ রাতের মধ্যেই সারতে হবে।'

আমি রাস্তায় নামলাম।

প্রথমে যাব মেজো ফুপুর কাছে। ছেলের বিয়েভাঙার শোক তিনি সামলে উঠেছেন কি না কে জানে! মেয়ের বিয়েভাঙার শোক সামলানো যায় না, ছেলের বিয়েভাঙার শোক ক্ষণস্থায়ী হয়। এইসব ক্ষেত্রে ছেলের মা একটু বোধহয় খুশিও হন—ছেলে আর কিছুদিন রইল তাঁর ডানার নিচে। ছেলের বিয়ে নিয়ে এত ভাবারও কিছু নেই। মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হয়ে যায়। ছেলেদের বিয়ের বয়স পার হয় না।

মেজো ফুপু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর মাথার নিচে রাবার ক্লথ। তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। বিভ্রান্ত হবার মতো কোনো দৃশ্য না। যারা মেজো ফুপুর সঙ্গে পরিচিত তারা জানে, মাথায় পানি ঢালা তাঁর হবিবিশেষ। তিনি খুব আপসেট, মাথায় পানি ঢেলে তাঁকে ঠিক করা হচ্ছে এটা তিনি মাঝেমধ্যেই প্রমাণ করতে চান। আমি ঘরে ঢুকেই বললাম, ফুপু, কী খবর?

ফুপু ক্ষীণস্বরে বললেন, কে?

এটাও তাঁর অভিনয়ের একটা অংশ। তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে তাঁর অবস্থা এতই খারাপ যে তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না।

'মাথায় পানি ঢাকা হচ্ছে, ব্যাপার কী ফুপু?'

'তুই কিছু জানিস না? আমাদের সবার তো কাপড় খুলে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়েছে!'

'কে?'

'বাদলের শ্বশুরবাড়ির লোকজন। রাত এগারোটা পর্যন্ত বসিয়ে রেখে মেয়ে দেয়নি।'

'ও, এই ব্যাপার!'

মেজো ফুপু ঝপাং করে উঠে বসলেন। যে পানি ঢালছিল তার হাতের এইম নষ্ট হওয়ায় পানি চারদিকে ছড়িয়ে গেল। মেজো ফুপু হুংকার দিয়ে বললেন, এটা সামান্য ব্যাপার? তোর কাছে এটা সামান্য ব্যাপার?

'ব্যাপার খুবই গুরুতর। মেয়ে মা'র সঙ্গে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে, এখন করা যাবে কী? আজকালকার মেয়ে, এরা কথায়-কথায় মা'দের সঙ্গে রাগ করে।'

'মেয়ে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে এই গাঁজাখুরি গল্প তুই বিশ্বাস করতে বলিস? তুই ঘাস খাস বলে আমিও ঘাস খাই! মেয়েকে ওরাই লুকিয়ে রেখেছে।'

'তাই নাকি?'

'অবশ্যই তাই।'

'শুধুশুধু লুকিয়ে রাখবে কেন?'

'সেটা তুই জেনে দে।'

'আমি কীভাবে জানব?'

'তুই ওদের বাসায় যাবি। মেয়ের সঙ্গে কথা বলবি, ব্যাপার কী সব জেনে আসবি। মেয়ের বাবাকে বলবি ঝেড়ে কাশতে। আমি সব জানতে চাই।'

'জেনে লাভ কী?'

'লাভ আছে। আমি ওদের এমন শিক্ষা দেব যে তিন জন্মে ভুলবে না।'

'শিক্ষা দিয়ে কী হবে, তুমি তো আর স্কুল খুলে বসনি।'

'তোর গা-জ্বালা কথা আমার সঙ্গে বলবি না। তোকে যা করতে বলছি করবি। এক্ষুনি চলে যা।'

'ওদের গোপন কথা ওরা আমাকেই বা শুধুশুধু বলবে কেন?'

'তুই ভুজুং ভাজুং দিয়ে মানুষকে ভোলাতে পারিস। ওদের কাছ থেকে খবর বের করে আন, তারপর দেখ আমি কী করি।'

'করবেটা কী?'

'মানহানির মামলা করব। আমি সাদেককে বলে দিয়েছি—এর মধ্যে মনে হয় করা হয়েও গেছে। মেয়ের বাপ আর মামাটাকে জেলে ঢোকাব। তার আগে আমার সামনে এসে দুজনে দাঁড়াবে। কানে ধরে দশবার উঠবোস করবে।'

'তোমার বেয়াই তোমার সামনে কানে ধরে উঠবোস করবে এটা কি ঠিক হবে? বিবাহ-সম্পর্কিত আত্মীয় অনেক বড় আত্মীয়।'

'তারা আমার আত্মীয় হল কখন?'

'হয়নি, হবে।'

'হিমু, তুই কি আমার সঙ্গে ফাজলামি করছিস?'

'না, ফাজলামি করছি না—কোনো একটা সমস্যায় বিয়ে হয়নি, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বিয়ে হতে আপত্তি কী? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে পড়ে আছে।'

'বাদলের মন ঐ মেয়ের কাছে, কী বলছিস তুই! যে-মেয়ে লাথি দিয়ে তাকে নর্দমায় ফেলে দিল, যে তাকে ন্যাংটো করে দিল এত মানুষের সামনে, তার কাছে—'

'যা পাওয়া যায় না তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।'

'বাদল যদি কোনোদিন ঐ মেয়ের নাম মুখে আনে তাকে আমি জুতাপেটা করব। জুতিয়ে আমি তার রস নামিয়ে দেব।'

'জুতাপেটা করেও লাভ হবে না ফুপু। আমি বরং দেখি জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যায় কি না। বাদল আঁখির টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে—যোগাযোগ করে দেখি।'

'বাদল তোকে ঐ মেয়ের টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে।'

'হ্যাঁ।'

'দুধকলা দিয়ে আমি তো দেখি কালসাপ পুষেছি!'

'তাই তো মনে হচ্ছে। যে-মেয়ে তোমাদের সবাইকে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিয়ে মজা দেখছে তার জন্যে এত ব্যাকুলতা! তার টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ছোটাছুটি!'

মেজো ফুপুর রাগ চরমে উঠে গিয়েছিল। তিনি বড় বড় কয়েকটা নিশ্বাস নিয়ে রাগ সামলালেন। থমথমে গলায় বললেন, হিমু শোন। বাদল যদি ঐ মেয়ের কথা মুখে আনে তাকে আমরা ত্যাজ্যপুত্র করব। এই কথাটা তাকে তুই বলবি।

'এক্ষুনি বলছি।'

'বাদল বাসায় নেই, কোথায় যেন গেছে। তুই বসে থাক, বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাবি না।'

'আচ্ছা যাব না। বাদল গেছে কোথায়?'

'জানি না।'

'আঁখিদের বাসায় চলে যায়নি তো?'

মেজো ফুপু রক্তচক্ষু করে তাকাচ্ছেন। এইবার বোধ হয় তাঁর ব্লাডপ্রেশার সত্যি সত্যি চড়েছে। অকারণে মানুষের চোখ এমন লাল হয় না।

'ফুপু তুমি শুয়ে থাকো। তোমার মাথায় পানিটানি দেয়া হোক। আমি বাদলের সঙ্গে কথা না বলে যাচ্ছি না। ফুপা কোথায়?'

'আর কোথায়, ছাদে।'

আমি ছাদের দিকে রওনা হলাম। আজ বুধবার—ফুপার মদ্যপান দিবস। তাঁর ছাদে থাকারই কথা। ফুপু অয়েলক্লথে মাথা রেখে আবার শুয়েছেন। বিপুল উৎসাহে তাঁর মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে।

ফুপা ছাদেই আছেন।

তাঁকে যেন আনন্দিত বলেই মনে হল। জিনিস মনে হয় পেটে পড়েছে। এবং ভাল ডোজেই পরেছে। তাঁর চোখেমুখে উদাস এবং শান্তি-শান্তি ভাব।

'কে, হিমু?'

'জি।'

'আছ কেমন হিমু?'

'জি ভাল।'

'কেমন ভাল—বেশি, কম, না মিডিয়াম?'

'মিডিয়াম।'

'আমার মনটা খুবই খারাপ হিমু।'

'কেন?'

'বাদলের বিয়েতে তো তুমি যাওনি। বিরাট অপমানের হাত থেকে বেঁচে গেছ। তারা বিয়ে দেয়নি। মেয়ে নিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে।'

'বলেন কী!'

'বানোয়াট গল্প ফেঁদেছে। মেয়ে নাকি রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে গেছে। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? যার বিয়ে সে রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি যাবে!'

'আজকালকার ছেলেমেয়ে, এদের সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না।'

'এটা তুমি অবিশ্যি ঠিক বলেছ। আমাদের সময় আর বর্তমান সময় এক না। সোসাইটি চেঞ্জ হচ্ছে। ঘরে-ঘরে এখন ভিসিআর, ডিশ অ্যান্টেনা। এইসব দেখেশুনে ইয়াং ছেলেমেয়েরা নানান ধরনের ড্রামা করা শিখে যাচ্ছে। বিয়ের দিন রাগ করে বান্ধবীর বাড়ি চলে যাওয়া সেই ড্রামারই একটা অংশ। ভাল বলেছ হিমু। well said. এখন মনে হচ্ছে মেয়েটা আসলেই রাগ করে বান্ধবীর বাড়িতে গেছে।'

'ছেলের বিয়ে হয়নি বলে আপনারা লজ্জার মধ্যে পড়েছেন। ওদের লজ্জা তো আরও বেশি। মেয়ের বিয়ে হল না।'

'অবশ্যই, অবশ্যই! ভাগ্যিস মুসলমান পরিবারের মেয়ে। হিন্দু মেয়ে হলে তো দুপড়া হয়ে যেত। এই মেয়ের আর বিয়েই হত না। হিমু, ছেলেরা হচ্ছে হাঁসের মতো, গায়ে পানি লাগে না। আর মেয়েরা হচ্ছে মুরগির মতো, একফোঁটা পানিও ওদের গায়ে লেপটে যায়। আঁখি মেয়েটার জন্যে খুবই মায়া হচ্ছে হিমু।'

'মায়া হওয়াই স্বাভাবিক।'

'ঐ দিন অবিশ্যি খুবই রাগ করেছিলাম। ভেবেছিলাম মানহানির মামলা করব।'

'আপনার মতো মানুষ মানহানির মামলা কীভাবে করে! আপনি তো গ্রামের মামলাবাজ মোড়ল না। আপনি হচ্ছেন হৃদয়বান একজন মানুষ।'

'ভাল কথা বলেছ হিমু। হৃদয়বান কথাটা খুব খাঁটি বলেছ। গাড়ি করে যখন আমি শেরাটন হোটেলের কাছে আসি ফুলওয়ালি মেয়েগুলি ফুল নিয়ে আসে, ধমক দিতে পারি না। কিনে ফেলি। ফুল নিয়ে আমি করব কী বলো। তোমার ফুপুকে যদি দিই সে রেগে যাবে, ভাববে আমার ব্রেইন ডিফেক্ট হয়েছে। কাজেই নর্দমায় ফেলে দি। একবার তোমার ফুপুকে ফুল দিয়েছিলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলেছিল—ঢং কর কেন?'

'তাই নাকি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এইসব দুঃখের কথা বলে কী হবে! বাদ দাও।'

'জি আচ্ছা, বাদ দিচ্ছি।'

'তোমার দুই বন্ধু এখনও আসছে না কেন বলো তো?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ওদের কি আসার কথা নাকি?

'আসার কথা তো বটেই। ওদের আমার খুব পছন্দ হয়েছে। প্রতি বুধবারে আসতে বলেছি। ভেরি গুড কোম্পানি। ওরা যে আমাকে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা করে সেটা না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'ফুপু বলছিলেন ওরা নাকি ন্যাংটা হয়ে ছাদে নাচানাচি করছিল।'

ফুপা গ্লাসে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'তোমার ফুপু বিন্দুতে সিন্ধু দেখে। কাশির শব্দ শুনে ভাবে যক্ষ্মা। ঐ রাতে কিছুই হয়নি। বেচারাদের গরম লাগছিল—আমি বললাম, শার্ট খুলে ফ্যালো। গরমে কষ্ট করার মানে কী! ওরা শার্ট খুলেছে। আমিও খুলেছি, ব্যস!'

'ও আচ্ছা।'

'হিমু, তোমার বন্ধু দুজন দেরি করছে কেন? এইসব জিনিস একা একা খাওয়া যায় না। খেতে খেতে মন খুলে কথা না বললে ভাল লাগে না। দুধ একা খাওয়া যায়, কিন্তু ড্রিংকসে বন্ধুবান্ধব লাগে।'

'আসতে যখন বলেছেন অবশ্যই আসবে।'

'তুমি বরং এক কাজ করো, ঘরের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো। ওরা হয়তো বাসার সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। বাসা চিনতে পারছে না বলে ঢুকতে পারছে না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে নিয়ে আসবে। তোমার ফুপুর জানার দরকার নেই। দুটো নিতান্তই গোবেচারা ভদ্র ছেলে—অথচ তোমার ফুপু ওদের বিষদৃষ্টিতে দেখছে। I don't know why. শাস্ত্রে বলে না, নারীচরিত্র দেবা না জানন্তি কুত্রাপি মনুষ্য—ঐ ব্যাপার আর কি! হিমু—Young friend, রাস্তায় গিয়ে ওদের জন্যে একটু দাঁড়াও।'

'জি আচ্ছা।'

আমি নিচে নেমে দেখি ফুপুর মাথায় পানি ঢালাঢালি শেষ হয়েছে। তিনি গম্ভীরমুখে বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে তাঁর চেয়েও তিন ডাবল গম্ভীর মুখে অন্য একজন বসে আছে। আমি দরজা খুলে রাস্তায় চুপিচুপি নেমে যাব ফুপু গম্ভীর গলায় বললেন, এই হিমু, শুনে যা। আমি পরিচয় করিয়ে দি, এ হচ্ছে সাদেক। হাইকোর্টে প্রাকটিস করে। আমার দূর সম্পর্কের ভাই হয়। ভয়ংকর কাজের ছেলে। মানহানির মামলা ঠুকতে বলেছিলাম, এখন মামলা সাজিয়েছে। কাল মামলা দায়ের করা হবে, তারপর দেখবি কত গমে কত আটা। সাদেক, তুমি হিমুকে মামলার ব্যাপারটা বলো।

সাদেক বিরক্তমুখে বললেন, ওনাকে শুনিয়ে কী হবে?

'আহা, শোনাও-না! হিমু আমাদের নিজেদের লোক। মামলাটা কী সাজানো হয়েছে সে শুনুক, কোনো সাজেশান থাকলে দিক। এই হিমু, বসে ভাল করে শোন। সাদেক, তুমি গুছিয়ে বলো।'

সাদেক সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শুধু মানহানি মামলা তো তেমন জোরালো হয় না। সাথে আরও কিছু অ্যাড করেছি।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী অ্যাড করেছেন?

সাদেক সাহেব ভারী গলায় বললেন, অ্যাড করেছি—কনেপক্ষ ভাড়াটে গুণ্ডার সহায়তায় কোনোরকম পূর্ব উসকানি ছাড়া ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, যেমন লোহার রড, কিরিচসহ বরযাত্রীদের উপর আচমকা চড়াও হয়। বরযাত্রীদের দ্রব্যসামগ্রী, যেমন মানিব্যাগ, রিস্টওয়াচ লুণ্ঠন করে। মহিলাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। পূর্বপরিকল্পিত এই আক্রমণে বরসহ তিনজন গুরুতর আহত হয়। তাহারা বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে। বরযাত্রীদের দুটি গাড়িরও প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হয়। একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই আর কি! সব ডিটেল দেয়া হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম , বলেন কী!

সাদেক সাহেব তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, সাজানো মামলা অরিজিন্যালের চেয়েও কঠিন হয়। অরিজিন্যাল মামলায় আসামি প্রায়ই খালাস পেয়ে যায়। সাজানো মামলায় কখনো পায় না। কথা হল এভিডেন্স ঠিকমতো প্লেস করতে হবে।

'এভিডেন্স পাবেন কোথায়?'

বাংলাদেশে এভিডেন্স কোনো সমস্যা না। মার খেয়ে পা ভেঙেছে চান? পা-ভাঙা লোক পাবেন। X-Ray- রিপোর্ট পাবেন। রেডিওলজিস্টের সার্টিফিকেট পাবেন। টাকা খরচ করলে দুনম্বরি জিনিস সবই পাওয়া যায়।

মেজো ফুপু বললেন, টাকা আমি খরচ করব। জোঁকের মুখে আমি নুন ছেড়ে দেব। সাদেক, মামলা শক্ত করার জন্যে তোমার যা যা করা লাগে করো। দরকার হলে আমি আমার গাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বলব ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে।

'তা লাগবে না। পুরানো গাড়ির দোকান থেকে ভাঙা একটা গাড়ি এনে আগুন লাগিয়ে দিলেই হবে। তবে গাড়ির ব্লু বুক লাগবে। এটা অবিশ্যি কোনো ব্যাপার না।

ফুপু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি থাকায় ভরসা পাচ্ছি। ওদের আমি তুর্কি নাচন নাচিয়ে ছাড়ব।

সাদেক সাহেব বললেন, বাদলকে একটু দরকার। ওকে ব্যাক ডেট দিয়ে একটা ভাল ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দিতে হবে। মার খাবার পর মাথায় আঘাত পেয়ে আন্ডার অবজারভেশনে আছে এটা প্রমাণ করার জন্যে দরকার। কিছু এক্সরে-টেক্সরে করা দরকার।'

ফুপু উজ্জ্বল মুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা করো। বাদল আসুক। আজই তাকে ক্লিনিকে ভরতি করিয়ে দেব। মাছ দেখেছে বঁড়শি দেখেনি।

ফুপু প্রবল উৎসাহে মামলার সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে সাদেক সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আমি "নাকটা ঝেড়ে আসি ফুপু" বলে বের হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে উধাও হলাম। সাদেক সাহেব ভয়াবহ ব্যক্তি! আমি উপস্থিত থাকলে পা-ভাঙা ফরিয়াদি হিসেবে আমাকেও হাসপাতালে ভরতি করিয়ে দিতে পারে। মামলা আরও পোক্ত করার জন্যে মুগুর দিয়ে পা ভেঙে ফেলাও বিচিত্র না।

পথে নেমেই মোফাজ্জল এবং জহিরুলের সঙ্গে দেখা। ওরা ঘোরাঘুরি করছে। আমাকে দেখে অকূলে কূল পাওয়ার মতো ছুটে এল—হিমু ভাইয়া না?

'হুঁ।'

'স্যারের বাসাটা ভুলে গেছি। স্যার আসতে বলেছিলেন।'

'এই বাড়ি। বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না। গেট দিয়ে সোজা ছাদে চলে যান।'

'স্যারের শরীর কেমন হিমু ভাইয়া?'

'শরীর ভাল।'

'ফেরেশতার মতো আদমি। ওনার মতো মানুষ হয় না। স্যারের জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি।'

'খুব ভাল করেছেন। দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। চলে যান।'

তারা গেটের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রাত দশটার মতো বাজে। মীরাদের বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে যাব কি না ভাবছি। মীরা ফিরেছে কি না দেখে যাওয়া দরকার।

মীরার বাবা ঘরের বাইরে বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে দেখে উঠে এলেন। আমি বললাম, মীরা এখনও ফেরেনি?

তিনি হাহাকার-মেশানো গলায় বললেন, জি না।

'চিন্তা করবেন না, চলে আসবে। এখন মাত্র দশটা চল্লিশ। বারোটা-সাড়ে বারোটার দিকে চলে আসবে।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। তিনি এখন পুরোপুরি বিভ্রান্ত। আমি আবারও পথে নামলাম।

৫

গা-ঘেঁষে কোনো গাড়ি যদি হার্ড ব্রেক করে তা হলে চমকে ওঠাই নিয়ম। শুধু চমকে ওঠা না, চমকে পেছন ফিরতে হবে। এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি আমি মাঝেমধ্যেই হই। রূপা এই কাণ্ডটা সবচে বেশি করে। গাড়ি নিয়ে হুট করে গা-ঘেঁষে দাঁড়াবে, এবং বিকট শব্দে হর্ন দেবে। ভেতরে ভেতরে চমকালেও বাইরে প্রকাশ করি না। কিছুই ঘটেনি ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকি যতক্ষণ গাড়ির ভেতর থেকে চেঁচিয়ে কেউ না ডাকে।

এবারও তা-ই করলাম। ঘ্যাস করে গা-ঘেঁষে গাড়ি থেমেছে। হর্ন দেয়া হচ্ছে। আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে সামনে এগুচ্ছি।

'হিমু সাহেব! এই যে হিমু সাহেব!'

আমি তাকালাম। স্টিয়ারিং হুইল ধরে অপরিচিত একটা মেয়ে বসে আছে। মেয়েটার মাথায় ইরানি মেয়েদের মতো রঙিন ঝলমলে স্কার্ফ। মেয়েটিকে দেখাচ্ছেও ইরানিদের মতো।

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'জি না।'

'সে কী! ভাল করে দেখুন তো!'

আমি ভাল করে দেখেও চিনতে পারলাম না। বাংলায় কথা বলে কোনো ইরানি তরুণীর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই।

'আমি ফারজানা।'

'ও।'

'ও বলছেন তার মানে এখনও চিনতে পারেননি। আমি ডাক্তার। আপনার চিকিৎসা করেছিলাম। ঐ যে ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হলেন—।'

'এখন চিনতে পেরেছি। আপনি ড্রেস অ্যাজ য়্যু লাইক প্রতিযোগিতা করছেন নাকি? ইরানি মেয়ে সেজেছেন।'

'ডাক্তাররা সাজতে পারবে না এমন কোনো আইন আছে?'

'না, আইন নেই।'

'আপনার যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে তা হলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়িতে উঠলাম। ফারজানা বলল, আমি খুবই আনাড়ি ধরনের ড্রাইভার। আজই প্রথম সাহস করে একা একা বের হয়েছি। আপনার কাজ হল সামনের দিকে লক্ষ করা, যথাসময়ে আমাকে ওয়ার্নিং দেয়া। পারবেন না?

'পারব। এক কাজ করলে কেমন হয়—ভিড়ের রাস্তা ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় চলে যাই।'

'ঢাকা শহরে ফাঁকা রাস্তা কোথায়?'

'হাইওয়েতে উঠবেন?'

'হাইওয়েতে কখনো উঠিনি।'

'চলুন আজ ওঠা যাক। ময়মনসিংহ-এর দিকে যাওয়া যাক। পথে ভদ্রটাইপের একটা জঙ্গল পড়বে। গাড়ি পার্ক করে আমরা জঙ্গলে ঢুকে পড়তে পারি।'

'জঙ্গলে ঢুকব কেন?'

'ঢুকতে না চাইলে ঢুকবেন না। আমরা জঙ্গল পাশে ফেলে হোঁস করে চলে যাব।'

'আপনার পায়ে স্যান্ডেল নেই। স্যান্ডেল কি ছিঁড়ে গেছে?'

'গাড়ি চালাতে চালাতে পায়ের দিকে তাকাবেন না। এম্নিতেই আপনি আনাড়ি ড্রাইভার।'

'খুব আনাড়ি কি মনে হচ্ছে?'

'না—খুব আনাড়ি মনে হচ্ছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি কি জানেন হাসপাতাল থেকে আপনি চলে যাবার পর বেশ কয়েকবার আপনার কথা আমার মনে হয়েছে? আপনার এক আত্মীয়ের টেলিফোন নাম্বার ছিল। বোধহয় আপনার ফুপা। তাঁকে একদিন টেলিফোনও করলাম। তিনি বেশ খারাপ ব্যবহার করলেন।'

'ধমক দিলেন?'

'ধমক দেয়ার মতোই। তিনি বললেন—আমাকে টেলিফোন করছেন কেন? হিমুর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। আর কখনো টেলিফোন করে বিরক্ত করবেন না। বলেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।'

আমি হাসলাম।

ফারজানা বলল, হাসছেন কেন?

'আপনার গাড়ি চালানো খুব ভাল হচ্ছে—এইজন্যে হাসছি।'

'আমরা কি ময়মনসিং-এর দিকে যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

'যে-জঙ্গলের কথা বলছেন সেখানে কি চা পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। পোষা জঙ্গল। সবই পাওয়া যায়। যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন পিকনিক করতে আসেননি।'

'আমি পড়াশোনা দেশে করিনি। আমার এম ডি ডিগ্রি বাইরের।'

'বাংলা তো খুব সুন্দর বলছেন।'

'আমার মা ছিলেন বাঙালি।'

'ছিলেন বলছেন কেন?'

'ছিলেন বলছি, কারণ—তিনি এখন নেই। তাঁর খুব শখ ছিল—তাঁর মেয়ে দেশে ফিরে দেশের মানুসের সেবা করবে। আমি বাংলাদেশে কাজ করতে এসেছি মা'র ইচ্ছাপূরণের জন্যে। আমি ভেবে রেখেছি—এদেশে পাঁচ বছর কাজ করব, তারপর ফিরে যাব।'

'ক' বছর পার করেছেন?'

'তিন বছর কয়েক মাস। দাঁড়ান, একজাক্ট ফিগার বলছি—তিন বছর চার মাস।'

'বাংলাদেশে কাজ করতে কেমন লাগছে?'

'মাঝে মাঝে ভাল লাগে। মাঝে মাঝে খুবই বিরক্ত লাগে। এদেশের কিছু মজার ব্যাপার আছে। বিনয়কে এদেশে দুর্বলতা মনে করা হয়, বদমেজাজকে ব্যক্তিত্ব ভাবা হয়। মেয়েমাত্রকেই অল্পবুদ্ধি ভাবা হয়। মেয়ে-ডাক্তার বললে সবাই ভাবে ধাত্রী, যারা বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আর কিছু জানে না।'

'বাচ্চা ডেলিভারি ছাড়া আপনি আর কী জানেন?'

'আমি একজন নিউরোলজিস্ট। আমার কাজকর্ম মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে। আপনার প্রতি আমার আগ্রহের এটাও একটা কারণ। যে-কোনো কারণেই হোক আপনি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। জ্বরের ঘোরে আপনি প্রলাপ বকতেন। সেইসব আমি শুনেছি। কিছু ম্যাগনেটিক ট্যাপে রেকর্ড করাও আছে।'

'রেকর্ড করেছেন?'

'জি। রেকর্ডও করেছি। খুবই ইন্টারেস্টিং। আসলে আপনার উচিত একজন ভাল কোনো সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলা। বাংলাদেশে ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট আছেন না?'

'আছেন একজন।'

'একজন কেন? অনেক তো থাকার কথা।'

'একজনের নাম খুব শুনি। মিসির আলি সাহেব।'

'ওনার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন। প্রয়োজন মনে করলে আমিও যাব।'

'আপনার এত আগ্রহ কেন?'

'আমার আগ্রহের কারণ আছে, সেটা আপনাকে বলা যাবে না। ভাল কথা, আপনার সেই বিখ্যাত জঙ্গল আর কতদূর?'

'এসে গেছি। মোড়টা পার হলেই জঙ্গল।'

'জঙ্গলে আরেকদিন গেলে কেমন হয়? আজ ইচ্ছা করছে না।'

'খুব ভাল হয়। শুধু একটা কাজ করুন, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যান— এসেছি যখন জঙ্গল দেখে যাই।'

'সত্যি নামতে চান?'

'হ্যাঁ চাই।'

'ফিরবেন কীভাবে?'

'ফেরা কোনো সমস্যা না। বাস পাওয়া যায়।'

ফারজানা দ্বিতীয় প্রশ্ন করল না। আমাকে নামিয়ে দিয়ে গেল।

আমি শালবনে ঢুকে পড়লাম। পিকনিক পার্টি এড়িয়ে আমি ঢুকে পড়লাম গভীর জঙ্গলে। জঙ্গল সম্পর্কে আমার বাবার দীর্ঘ উপদেশ আছে—

"যখনই সময় পাইবে তখনই বনভূমিতে যাইবার চেষ্টা করিবে। বৃক্ষের সঙ্গে মানবশ্রেণীর বন্ধন অতি প্রাচীন। আমার ধারণা আদি মানব এক পর্যায়ে বৃক্ষের সহিত কথোপকথন করিত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে। তবে সাধনায় ফল হয়। মন কেন্দ্রীভূত করিতে যদি সক্ষম হও—তবে বৃক্ষের সহিত যোগাযোগেও সক্ষম হইবে। বৃক্ষরাজি তোমাকে এমন অনেক জ্ঞান দিতে সক্ষম হইবে যে-জ্ঞান এম্নিতে তুমি কখনো পাইবে না।"

কড়া রোদ উঠেছে। শালবনে ছায়া হয় না। তবু মোটামুটি ছায়াময় একটি বৃক্ষ দেখে তার নিচে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লাম। শীতের রোদ আরামদায়ক। শুকনো পাতার চাদরে শুয়ে আছি। নড়াচড়া করলেই শুকনো পাতা মচমচ শব্দ করছে। যেন বলছে—নড়াচড়া করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকো। শালগাছের যে ফুল হয় জানতাম না। পীতাভ ধরনের অনাকর্ষণীয় কিছু ফুল চোখে পড়ছে। শালের ফুলে কি গন্ধ হয়? এত উঁচুতে যে, ছিঁড়ে গন্ধ শোঁকা সম্ভব না। প্রকৃতি নিশ্চয়ই এই ফুল মানুষের জন্যে বানায়নি। মানুষের জন্যে বানালে ফুল ফুটত হাতের নাগালের ভেতর।

ঘুমের ভেতর অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম—গাছ নিয়ে স্বপ্ন। গাছ আমার সঙ্গে কথা বলছে—। তবে উলটাপালটা কথা বলছে—কিংবা মিথ্যা কথা বলছে। যেমন গাছটা বলল, হিমু, তুমি কি জান এই পৃথিবীর সবচে প্রাচীন গাছটি বাংলাদেশে আছে—যার বয়স প্রায় ছ'হাজার বছর?

আমি বললাম, মিথ্যা কথা বলছ কেন? বাংলাদেশ উঠে এসেছে সমুদ্রগর্ভ থেকে। এমন প্রাচীন গাছ এদেশে থাকা সম্ভব নয়।

'তোমাদের বিজ্ঞানীরা কি সব জেনে ফেলেছেন?'

'সব না জানলেও অনেককিছুই জানেন।'

'গাছ যে একটি চিন্তাশীল জীব তা কি বিজ্ঞানীরা জানেন?'

'অবশ্যই জানেন। জগদীশচন্দ্র বসু বের করে গেছেন।'

'তা হলে বলো গাছের মস্তিষ্ক কোনটি। একটা গাছ তার চিন্তার কাজটি কীভাবে করে।'

'আমি জানি না, তবে আমি নিশ্চিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা জানেন।'

'কাঁচকলা! কেউ কিচ্ছু জানে না।'

'বিরক্ত করবে না, ঘুমুতে দাও।'

'সৃষ্টিরহস্য বোঝার ব্যাপারে তোমরা গাছের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর না কেন? আমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেই তো আমরা সাহায্য করতে পারি।'

'তোমরা সাহায্য করতে পার?'

'অবশ্যই পারি। আমাদের পাতাগুলি অসম্ভব শক্তিশালী অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনার সাহায্যে আমরা এই বিপুল সৃষ্টজগতের সব বৃক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই নাকি?'

'মনে করো সিরাস নক্ষত্রপুঞ্জের একটা গ্রহে গাছ আছে। আমরা সেই গাছের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। আমরা সেই গাছ থেকে তোমাদের জন্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এনে দিতে পারি।'

'বাহ্, ভাল তো!'

'পৃথিবীর মানুষরা অমর হতে চায়। কিন্তু অমরত্বের কৌশল জানে না। এই অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জেই একটা গ্রহ আছে যার অতি উন্নত প্রাণীরা অমরত্বের কৌশল জেনে গেছে। তোমরা চাইলেই আমরা তোমাদের তা দিতে পারি।'

'শুনে অত্যন্ত প্রীত হলাম।'

'তুমি কি চাও?'

'না, আমি চাই না। আমি যথাসময়ে মরে যেতে চাই। হাজার হাজার বছর বেঁচে থেকে কী হবে?'

'তুমি চাইলে আমি তোমাকে বলতে পারি।'

'না, আমি চাচ্ছি না। স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো ঔষধের আমার প্রয়োজন নেই। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। এখন বিদেয় হও। ভাল কথা, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম টারমেনালিয়া বেলেরিকা।'

'এমন অদ্ভুত নাম!'

'এটা বৈজ্ঞানিক নাম—সহজ নাম বহেরা। আমরা কিন্তু অদ্ভুত গাছ। শালবনের ফাঁকে গজাই এবং লম্বায় শালগাছকেও ছাড়িয়ে যাই। আমাদের বাকলের রঙ কী বলো তো? বলতে পারলে না। আমাদের বাকলের রঙ নীল। আচ্ছা যাও, আর বিরক্ত করব না। এখন ঘুমাও।'

আমার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যার আগে-আগে। জেগে উঠে দেখি সত্যি সত্যি একটা বহেরা গাছের নিচেই শুয়ে আছি। গাছভরতি ডিমের মতো ফুল। আমি খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেলাম। আমার পরিষ্কার মনে আছে—আমি শুয়েছিলাম শালগাছের নিচে। শালের ফুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঢাকায় যেতে হবে পায়ে হেঁটে। সেটা খুব খারাপ হবে না। শীতকালে হাঁটার আলাদা আনন্দ। তবে ঢাকায় কতক্ষণে পৌঁছাব কে জানে! মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা করা দরকার। দেখাটা আজ রাতেও হতে পারে। এক কাপ চা খাওয়া দরকার। বনের ভেতর কে আমাকে চা খাওয়াবে! আমি গলা উঁচিয়ে বললাম, আমার চারদিকে যেসব গাছ ভাইরা আছেন তাঁদের বলছি। আমার খুব চায়ের তৃষ্ণা হচ্ছে—আমি আপনাদের অতিথি। আপনারা কি আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন?

প্রশ্নটা করেই আমি চুপ করে গেলাম। উত্তরের জন্যে কান পেতে রইলাম। উত্তর পাওয়া গেল না, তবে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হচ্ছিল গাছরা উত্তর দেবে।

৬

দরজায় কোনো কলিংবেল নেই।

পুরানো স্টাইলে কড়া নাড়তে হল। প্রথমবার কড়া নাড়তেই ভেতর থেকে শ্লেষ্মা-জড়ানো গলায় জবাব এল—কে? আমি চুপ করে রইলাম। প্রথমবারের 'কে'-তে জবাব দিতে নেই। দ্বিতীয়বারে জবাব দিতে হয়। এই তথ্য আমার মামার বাড়িতে শেখা। ছোটমামা বলেছিলেন—

'বুঝলি হিমু, প্রথম ডাকে কখনো জবাব দিবি না। খবর্দার না! তুই হয়তো ঘুমুচ্ছিস, নিশুতি রাতে বাইরে থেকে কেউ ডাকল—হিমু! তুই বললি, জি? তা হলেই সর্বনাশ! মানুষ ডাকলে সর্বনাশ না। মানুষ ছাড়া অন্য কেউ ডাকলে সর্বনাশ। বাঁধা পড়ে যাবি। তোকে ডেকে

বাইরে নিয়ে যাবে। এর নাম নিশির ডাক। কাজেই সহজ বুদ্ধি হচ্ছে—যে-ই ডাকুক প্রথমবারে সাড়া দিবি না। চুপ করে থাকবি। দ্বিতীয়বারে সাড়া দিবি। মনে থাকবে?'

আমার মনে আছে বলেই প্রথমবারে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আবার কড়া নাড়লাম যাতে মিসির আলি সাহেব দ্বিতীয়বার বলেন—কে? আমি আমার পরিচয় দিতে পারি।

মিসির আলি দ্বিতীয়বার 'কে' বললেন না। দরজা খুলে বাইরে তাকালেন। খুব যে কৌতূহলী হয়ে তাকালেন তাও না। রাত একটার আগন্তুকের দিকে যতটুকু কৌতূহল নিয়ে তাকাতে হয় সে-কৌতূহলও তাঁর চোখে নেই। পরনে লুঙ্গি। খালিগায়ে শাদা চাদর জড়ানো। ভদ্রলোকের মাথাভরতি কাঁচাপাকা চুল। আমি ভেবেছিলাম টেকো মাথার কাউকে দেখব। আইনস্টাইন-মার্কা এত চুল ভাবিনি। আমি বললাম, স্যার স্লামালিকুম।

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

'আমার নাম হিমু।'

'আচ্ছা।'

'আপনার সঙ্গে কি কথা বলতে পারি?'

মিসির আলি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টি আগের মতো কৌতূহল-শূন্য। তিনি কি বিরক্ত? বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক কি ঘুম থেকে উঠে এসেছেন? না বোধহয়। ঘুমন্ত মানুষ প্রথমবার কড়া নাড়তেই কে বলে সাড়া দেবে না।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, কথা বলার জন্যে রাত দুটা খুব উপযুক্ত সময় না। আপনি জেগে ছিলেন তাই দরজার কড়া নেড়েছি। আপনি যদি বলেন তা হলে অন্য সময় আসব।

'আমি জেগে ছিলাম না, ঘুমুচ্ছিলাম। যাই হোক, আসুন, ভেতরে আসুন।'

আমি ভেতরে ঢুকলাম। মিসির আলি সাহেব দরজার হুক লাগালেন। দরজার হুকটা বেশ শক্ত, লাগাতে তাঁর কষ্ট হল। অন্য কেউ হলে দরজার হুক লাগাত না। যে-অতিথি কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাবে তার জন্যে এত ঝামেলা করে দরজা বন্ধ করার দরকারটা কী!

'বসুন। ঐ চেয়ারটায় বসুন। হাতলের কাছে একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। পাঞ্জাবিতে লাগলে পাঞ্জাবি ছিঁড়বে।'

মিসির আলি সাহেব পাশের ঘরে ঢুকে গেলেন। আমি বসে বসে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। উল্লেখ করার মতো কিছুই চোখে পড়ছে না। কয়েকটা বেতের চেয়ার। গোল একটা বেতের টেবিল। টেবিলের উপরে বাংলা ম্যাগাজিন। উপরের পাতা ছিঁড়ে গেছে বলে ম্যাগাজিনের নাম পড়া যাচ্ছে না। এক কোনায় একটা চৌকি। চৌকিতে বিছানা পাতা। এই বিছানায় কে ঘুমায়? মিসির আলি সাহেব? মনে হয় না। এই ঘরে আলো কম। বিছানায় শুয়ে বই পড়া যাবে না। মিসির আলি সাহেবের নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে বই পড়ার অভ্যাস। তাঁর শোবার ঘরটা দেখতে পারলে হত।

মিসির আলি ঢুকলেন। তাঁর দুহাতে দুটা মগ। মগভরতি চা।

'নিন, চা নিন। দুচামচ চিনি দিয়েছি—আপনি কি চিনি আরও বেশি খান?'

'জি না। যে যতটুকু চিনি দেয় আমি ততটুকুই খাই।'

তিনি আমার সামনের চেয়ারটায় বসলেন। এরকম বিশেষত্বহীন চেহারার মানুষ আমি কম দেখেছি। কে জানে বিশেষত্বহীনতাই হয়তো তাঁর বিশেষত্ব। চা খাচ্ছেন শব্দ করে। নিজের চায়ের স্বাদে মনে হয় নিজেই মুগ্ধ। আমি এত আরাম করে অনেক দিন কাউকে চা খেতে দেখিনি।

'তারপর হিমু সাহেব, বলুন আমার কাছে কেন এসেছেন।'

'আপনাকে দেখতে এসেছি স্যার।'

'ও আচ্ছা। এর আগে বলেছিলেন কথা বলতে এসেছেন। আসলে কোনটা?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দুটাই। চোখ বন্ধ করে তো আর কথা বলব না—আপনার দিকে তাকিয়েই কথা বলব।'

'তাও তো ঠিক। বলুন, কথা বলুন। আমি শুনছি।'

'মানুষের যে নানান ধরনের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার কথা শোনা যায় আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?'

'আমি সেরকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এখনও কাউকে দেখিনি, কাজেই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন আসে না। আমার মন খোলা, তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কাউকে দেখলে অবশ্যই বিশ্বাস করব।'

'আপনি কি দেখতে চান?'

'জি না। আমার কৌতূহল কম। নানান ঝামেলা করে কোনো এক পীর সাহেবের কাছে যাব, তাঁর কেরামতি দেখব, সেই ইচ্ছা আমার নেই।'

'কেউ যদি আপনার সামনে এসে আপনাকে কোনো কেরামতি দেখাতে চায় আপনি দেখবেন?'

মিসির আলি চায়ের মগ নামিয়ে রাখলেন। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন—সম্ভবত সিগারেট খুঁজছেন। এই ঘরে সিগারেট নেই। আমি ঘরটা খুব ভালমতো দেখেছি। মিসির আলি সাহেবের কাছে যেহেতু এসেছি স্বভাবটাও তাঁর মতো করার চেষ্টা করছি। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা। আমি লক্ষ করলাম, মিসির আলি সাহেবের চেহারায় সূক্ষ্ম হতাশার ছাপ পড়ল—অর্থাৎ শোবার ঘরেও সিগারেট নেই। নিকোটিনের অভাবে তিনি খানিকটা কাতর বোধ করছেন।

আমি বললাম, স্যার আমার কাছে সিগারেট নেই।

ভেবেছিলাম তিনি আমার কথায় চমকাবেন। কিন্তু চমকালেন না। তবে তাঁর ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির ছায়া দেখলাম। হাসিটা কি ব্যঙ্গের? কিংবা আমার ছেলেমানুষিতে তাঁর হাসি পাচ্ছে? না মনে হয়।

'স্যার, আমি নিজেও সামান্য ভবিষ্যৎ বলতে পারি। ঠিক আড়াইটার সময় কেউ একজন এসে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট দেবে।'

মিসির আলি এবারে সহজ ভঙ্গিতে হাসলেন। চায়ের মগে চুমুক দিতে দিতে বললেন, সেই কেউ একজনটা কি আপনি?'

'জি স্যার। আড়াইটার সময় আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আপনাকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে দিয়ে যাব।'

'দোকান খোলা পাবেন?'

'ঢাকা শহরে কিছু দোকান আছে খোলেই রাত একটার পর।'

'ভাল।'

আমি মিসির আলি সাহেবের দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললাম, আমি কিন্তু স্যার মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারি। সব সময় পারি না—হঠাৎ হঠাৎ পারি।

'ভাল তো!'

'আপনি কি আমার মতো কাউকে পেয়েছেন যে মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে?'

'সব মানুষই তো মাঝে মাঝে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। এটা আলাদা কোনো ব্যাপার না। ইনটিউটিভ একটা বিষয়। মাঝে মাঝে ইনটিউশন কাজে লাগে, মাঝে মাঝে লাগে না। মস্তিষ্ক ভবিষ্যৎ বলে যুক্তি দিয়ে। সেইসব যুক্তির পুরোটা আমরা বুঝতে পারি না বলে আমাদের কাছে মনে হয় আমরা আপনা-আপনি ভবিণ্যৎ বলছি।'

'আমার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা ইনটিউটিভ গেজ ওয়ার্কের চেয়েও সামান্য বেশি। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না বলে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা সম্পর্কে অন্যরা জানে?'

'যারা আমার কাছাকাছি থাকে, যারা আমাকে ভালমতো চেনে তারা জানে।'

'আপনার আশেপাশের মানুষদের এই ক্ষমতা দেখাতে আপনার ভাল লাগে, তাই না?'

'জি, ভালই লাগে। একজন ম্যাজিশিয়ান সুন্দর একটা ম্যাজিক দেখাবার পর যেমন আনন্দ পায়—আমিও সেরকম আনন্দ পাই।'

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমার ধারণা আপনি একধরনের ডিলিউশনে ভুগছেন। ডিলিউশন হচ্ছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। যে-কোনো কারণেই হোক আপনার ভেতর একটা ধারণা জন্মেছে আপনি সাধুসন্ত টাইপের মানুষ। আপনার খালি পা, হলুদ পাঞ্জাবি এইসব দেখে তা-ই মনে হচ্ছে। যে-কোনো ডিলিউশন মানুষের মাথায় একবার ঢুকে গেলে তা বাড়তে থাকে। আপনারও বাড়ছে। আপনি নিজে আপনার ভবিষ্যৎ বলার ক্ষমতা নিয়ে একধরনের অহংকার বোধ করছেন। আপনাকে যতই লোকজন বিশ্বাস করছে আপনার ততই ভাল লাগছে। এখন রাত দুটায় আপনি আমার কাছে এসেছেন—বিশ্বাসীর তালিকাবৃদ্ধির জন্যে। রাত দুটার সময় না এসে আপনি সকাল দশটায় আসতে পারতেন। আসেননি, কারণ, যে সাধু সেজে আছে সে যদি সকাল দশটায় আসে তা হলে তার রহস্য থাকে না। রহস্য বজায় রাখার জন্যেই আসতে হবে রাত দুটার দিকে। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনার সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আপনি আমাকে নিজের সম্পর্কে কিছু বলেননি। তবে আমি মোটামুটি নিশ্চিত নিজেকে অন্যের চেয়ে আলাদা প্রমাণ করার জন্যে আপনি অদ্ভুত আচার-আচরণ করেন। যেমন আপনার পায়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আপনি প্রচুর হাঁটেন। মনে হচ্ছে রাতেই হাঁটেন। কারণ দিনে হাঁটা তো স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে পড়ে। যেহেতু আপনি রাতে হাঁটেন-বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। আপনার ডিলিউশনকে পোক্ত করতে এরাও সাহায্য করে। এদের কেউ কেউ আপনাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা মানেই আপনাকে সাহায্য করা। আমার ধারণা এদের কেউ কেউ আপনাকে সাধুও ভাবে। আপনার পদধূলি নেয়।'

'মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই একজনকে সাধু হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করবে?'

'হ্যাঁ, তা করবে। মানুষ খুব যুক্তিবাদী প্রাণী হলেও তার মধ্যে অনেকখানি অংশ আছে যুক্তিহীন। মানুষ যুক্তি ছাড়াই বিশ্বাস করতে ভালবাসে। প্রাণী হিসেবে মানুষ সব সময় অসহায় বোধ করে। সে সারাক্ষণ চেষ্টা করে অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে। পীর-ফকির, সাধু-সন্ন্যাসী, হস্তরেখা, অ্যাস্ট্রলজি, নিউমারোলজির প্রতি এইসব কারণেই মানুষের বিশ্বাস।'

'আপনার ধারণা, মানুষ কোনো বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসেনি?'

'অবশ্যই মানুষ বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। একদিন যে-মানুষ সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডল জয় করবে তার ক্ষমতা অসাধারণ। তবে তার মানে এই না সে ভবিষ্যৎ বলবে। দুটা বেজে গেছে—আপনার কথা ছিল না আমার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দেয়ার?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মিসির আলি বললেন, চলুন আপনার সঙ্গে যাই। কোন দোকানটা রাত দুটার সময় খোলা থাকে আমাকে দেখিয়ে দিন। মাঝে মাঝে সিগারেটের জন্যে খুব সমস্যায় পড়ি।

মিসির আলি তাঁর ঘরের দরজায় তালা লাগালেন না। তালা খুঁজে পাচ্ছেন না। ঘর খোলা রেখে গভীর রাতে বের হচ্ছেন তার জন্যেও তাঁর মধ্যে কোনো অস্বস্তি লক্ষ করলাম না। ঘর খোলা রেখে বাইরে যাবার অভ্যাস তাঁর নতুন না এটা বোঝা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাঁর মধ্যেও খানিকটা হিমুভাব আছে।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনি আমার কথায় আপসেট হবেন না। আমি আপনাকে হিট করার জন্যে কিছু বলিনি।'

'আপনি যে এ-ধরনের কথা বলবেন তা আমি জানতাম।'

'সব জেনেশুনেই আমার কাছে এসেছেন?'

'জি স্যার।'

'আমার ধারণা আপনি আমার কাছে এসেছেন অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে—যা আপনি বলছেন না।'

'স্যার, আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

'কী জিনিস?'

'আমি কিছুদিন আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম। যা দেখে ভয় পেয়েছিলাম, সেই জিনিসটা আপনাকে দেখাতে চাই।'

'কেন? আপনি চান যে আমিও ভয় পাই?'

'তা না।'

'তবে?'

'আমার কাছে শুনে আপনি ব্যাপারটা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন না।'

'তবু শুনি।'

আমি ভয় পাবার গল্পটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বললাম। মিসির আলি গল্পের মাঝখানে একবারও কিছু জানতে চাইলেন না। হ্যাঁ হুঁ পর্যন্ত বললেন না।

সিগারেট কিনলাম। তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর বললেন, আপনি একটা কাজ করুন। গল্পটা আবার বলুন।

'আবার বলব?'

'হ্যাঁ, আবার।'

'কেন?'

'দ্বিতীয়বার শুনে দেখি কেমন লাগে।'

আমি আবারও গল্প শুরু করলাম। মিসির আলি সিগারেট টানতে টানতে তাঁর বাসার দিকে যাচ্ছেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি এবং গল্প বলছি। তিনি নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন। আমি তাঁর মুখে চাপা হাসিও লক্ষ করছি।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনার গল্পটা ইন্টারেস্টিং, আমি আপনার সঙ্গে পরে এই নিয়ে কথা বলব।'

'আপনি যদি চান, যে-জায়গাটায় আমি ভয় পেয়েছিলাম সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমি চাচ্ছি না।'

'তা হলে স্যার আমি যাই।'

'আচ্ছা। আবার দেখা হবে। ভাল কথা, যে-গলিতে আপনি ভয় পেয়েছিলেন—আপাতত সেই গলিতে না ঢোকা ভাল হবে।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'হঠাৎ ব্রেইনে চাপ সৃষ্টি না করাই ভাল। মানুষের একটা অসুখের নাম "এরিকনোফোবিয়া"—মাকড়সাভীতি। এই অসুখ থেকে মানুষকে মুক্ত করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে তার গায়ে মাকড়সা ছেড়ে দেয়া। মাকড়সা তার গায়ে কিলবিল করে হাঁটবে। এবং রোগী বুঝতে পারবে যে মাকড়সা অতি নিরীহ প্রাণী। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। এই চিকিৎসাপদ্ধতিতে মাঝে মাঝে রোগ ভাল হয়—তবে কিছু ক্ষেত্রে খুব খারাপ ফল হয়—রোগী তখন চারদিকে মাকড়সা দেখতে পায়। আমি চাই না—আপনার ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটুক।'

'স্যার যাই?'

'আচ্ছা।'

আমি চলে আসছি। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে ফিরে তাকালাম। মিসির আলি ঘরে ঢোকেননি। এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। কী দেখছেন, তারা? আমি একটু বিস্মিত হলাম—মিসির আলি ধরনের মানুষরা মাইক্রোসকোপ টাইপ। কাছের জিনিসকে তাঁরা সাবধানে দেখতে ভালবাসেন। ধরাছোঁয়ার বাইরের জগতের প্রতি তাঁদের আগ্রহ থাকার কথা না। তাঁরা অসীমের অনুসন্ধান করেন সীমার ভেতর থেকে।

মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। মনে হচ্ছে রাতটা হেঁটে হেঁটেই কাটিয়ে দিই। যদিও ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। পা ভারী হয়েছে। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বস্তা-ভাইয়ের পাশে গিয়ে কি শুয়ে থাকব? স্লিপিং-ব্যাগে তাদের জীবন কেমন কাটছে সেটাও দেখতে ইচ্ছা করছে। ছেলেটার নাম যেন কী? গাবুল? না গাবুল না। অন্যকিছু। নামটা কি সে আমাকে বলেছে? আচ্ছা, প্রতিটি গাছের কি মানুষের মতো নাম আছে? গাছ-মাকি তার গাছশিশুদের নাম রাখে? আমরা যেমন গাছের নামে নাম রাখি—শিমুল, পলাশ, বাবলা—ওরাও কি পছন্দের মানুষের নামে তাদের পুত্র কন্যাদের নাম রাখে? যেমন একজনের নাম রাখল হিমু, আরেকজনের সোলায়মান।

ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—বস্তা-ভাইয়ের পুত্রের নাম সুলায়মান। সুলায়মানকে দেখতে ইচ্ছা করছে।

স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর পিতাপুত্র দুজনই ঘুমুচ্ছিল। আমি তাদের ঘুম ভাঙালাম না। তাদের পাশে শুয়ে পড়লাম। এরা মনে হচ্ছে আমার জন্যে জায়গা রেখেছে। পাশের জায়গাটায় খবরের কাগজ বিছিয়ে রেখেছে। শুধু যে খবরের কাগজ তা না। খবরের কাগজের উপর বড় পলিথিনের চাদর। আমি শোয়ামাত্র স্লিপিং-ব্যাগের মুখ খুলে গেল। সুলায়মান তার মাথা বের করল।

'কী খবর সুলায়মান?'

সুলায়মান হাসল। তার সামনের দুটা দাঁত পড়ে গেছে।

দাঁত-পড়া সুলায়মানকে সুন্দর দেখাচ্ছে। সুলায়মান লাজুক গলায় বলল, আফনের জন্যে বাপজান জায়গা রাখছে।

'ভাল করেছে।'

'এখন থাইক্যা আফনের এই জাগা "রিজাভ"।'

'বাঁচা গেল! সব মানুষেরই কিছু-না-কিছু রিজার্ভ জায়গা দরকার। তুই কি পড়তে পারিস?'

'জে না।'

'পড়াশোনা তো করা দরকার রে ব্যাটা।'

'গরিব মানুষের পড়ালেখা লাগে না।'

'কে বলেছে?'

'কেউ বলে নাই—আমি জানি।'

'এখন থেকেই নিজে নিজে জানা শুরু করেছিস?'

সুলায়মান দাঁত বের করে হাসল। চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বলল, আফনেরে কী ডাকুম?

'যা ডাকতে ইচ্ছা হয় ডাক। কী ডাকতে ইচ্ছা করে?'

'মামা।'

'বেশ তো, মামা ডাকবি।'

'মামা—আফনে কিচ্ছা জানেন?'

'জানি—শুনবি?'

সুলায়মান হ্যাঁ না-কিছু বলল না। খুব সাবধানে স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বের হয়ে এল। সম্ভবত সে তার বাবার ঘুম ভাঙাতে চাচ্ছে না। সুলায়মান এসে শুয়ে পড়ল আমার পাশে। আমি গল্প শুরু করলাম—আলাউদ্দিনের চেরাগের গল্প, যে-চেরাগের ভেতর অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন দৈত্য ঘুমিয়ে থাকে। তার যদি ঘুম ভাঙানো যায় তা হলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। সব

মানুষকেই একটি করে আলাউদ্দিনের চেরাগ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অল্পকিছু মানুষই চেরাগে ঘুমিয়ে থাকা দৈত্যকে জাগাতে পারে।

'সুলায়মান!'

'জি মামা?'

'তোর মনের যে-কোনো একটা ইচ্ছার কথা বল তো দেখি! তোর যে-কোনো একটা ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

'আমার কোনো ইচ্ছা নাই মামা।'

'আচ্ছা, তা হলে স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর চলে যা। বাবার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাক।'

'আমি আপনের লগে ঘুমামু।'

সুলায়মান একটা হাত আমার গায়ে তুলে দিয়েছে। আমি চলে গেছি একটা অদ্ভুত অবস্থায়, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, অথচ ঘুম আসছে না। চোখ মেলে রাখতেও পারছি না, আবার বন্ধও করতে পারছি না। বিশ্রী অবস্থা!

'হ্যালো, আঁখি কি বাসায় আছে?'

'আপনি কে বলছেন?'

'আমার নাম হিমু?'

'হিমুটা কে?'

'জি, আমি নীতুর বড় ভাই। নীতু হল আঁখির বান্ধবী।'

'তুমি আঁখির সঙ্গে কথা বলতে চাও কেন?'

'নীতুকে গতকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আঁখিদের বাসায় যাচ্ছি বলে ঘর থেকে বের হয়েছে, আর ফিরে আসেনি। আমরা আঁখিদের বাসা কোথায়, টেলিফোন নাম্বার কী কিছুই জানতাম না। অনেক কষ্টে টেলিফোন নাম্বার পেয়েছি। মা খুব কান্নাকাটি করছেন। ঘনঘন ফিট হচ্ছেন...'

'কী সর্বনাশ! ফিট হওয়ারই তো কথা। শোনো হিমু, নীতু নামে কেউ এ-বাড়িতে আসেনি। নীতু কেন, কোনো মেয়েই আসেনি।'

'আপনি একটু আঁখিকে দিন। আঁখির সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত মা শান্ত হবেন না। মা কথা বলবেন।'

'তুমি ধরো, আমি আঁখিকে ডেকে দিচ্ছি। আজকালকার মেয়েদের কী যে হয়েছে! মাই গড—চিন্তাও করা যায় না!'

আমি ফোঁপানির মতো আওয়াজ করে নিজের প্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আঁখিকে টেলিফোনে কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না—এই অভিনয়টা সেই কারণেই দরকার হয়ে পড়েছিল।

আঁখি টেলিফোন ধরল। ভীত গলায় বলল, কে?

'আমি হিমু। নীতুর বড় ভাই।'

'আমি তো নীতু বলে কাউকে চিনি না।'

'আমি নিজেও চিনি না। নীতুর গল্পটা তৈরি করা ছাড়া উপায় ছিল না। কেউ তোমাকে টেলিফোন দিচ্ছিল না।'

'আপনি কে?'

'আমি হিমু।'

'হিমু নামেও তো আমি কাউকে চিনি না!'

'আমি বাদলের দূর সম্পর্কের ভাই। ঐ যে, যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে যাচ্ছিল! তুমি পালিয়ে চলে গেলে বলে বিয়ে হয়নি।'

'আপনি কী চান।'

'আমি কিছুই চাই না—বাদলের কারণে তোমাকে টেলিফোন করেছি। ও বোকা টাইপের তো, বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় নানান ধরনের পাগলামি করছে— আমরা অস্থির হয়ে পড়েছি। তুমি ওকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব ভাল কাজ করেছ। বোকা স্বামীর সঙ্গে সংসার করা ভয়াবহ ব্যাপার।'

'উনি বোকা?'

'বোকা তো বটেই। ও হল বোকান্দর। বোকা যোগ বান্দর— বোকান্দর। সন্ধি করলে এই দাঁড়ায়। বোকা মানুষদের প্রতি বুদ্ধিমানদের কিছু দায়িত্ব আছে। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে, তুমি যদি এই দায়িত্ব পালন কর।'

'আমি বুদ্ধিমতী আপনাকে কে বলল?'

'শেষ মুহূর্তে তুমি বাদলকে বিয়ে করতে রাজি হওনি—এটি হচ্ছে তোমার বুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। আঁখি শোনো—তুমি বাদলের পাগলামি কমাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

'সরি, আমি কিছু করতে পারব না।'

'ও কীসব পাগলামি করছে শুনলে তোমার মায়া হবে। একটা শুধু বলি—রাত বারোটার পর ও তোমাদের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করে। অন্য সময় করে না, কারণ অন্য সময় হাঁটাহাঁটি করলে তুমি দেখে ফেলবে। সেটা নাকি তার জন্যে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'শুনুন, ভাল একটা মেয়ে দেখে আপনারা ওনার বিয়ে দিয়ে দিন। দেখবেন পাগলামি সেরে যাবে।'

'সেটাই করা হচ্ছে। মেয়ে পছন্দ করা হয়েছে। মেয়ে খুব সুন্দর। শুধু একটু শর্ট–পাঁচ ফুট। হাইহিল পরলে অবশ্যি বোঝা যায় না। মেয়ে গান জানে—রেডিওতে বি গ্রেডের শিল্পী।'

'ভালই তো।'

'ভাল তো বটেই। ছাত্রীও খুব ভাল—এসএসসি-তে চারটা লেটার এবং স্টার পেয়েছে। চারটা লেটারের একটা আবার ইংরেজিতে। ইংরেজিতে লেটার পাওয়া সহজ না।'

'আজকাল অনেকেই পাচ্ছে।'

'যারা পাচ্ছে—তারা তো আর এম্নি এম্নি পাচ্ছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে চেম্বারস ডিকশনারি পুরোটা মুখস্থ।'

'আচ্ছা শুনুন—আপনার কথা শেষ হয়েছে তো? আমি এখন রেখে দেব।'

'তুমি কোনো সাহয্য করতে পারবে না, তাই না?'

'জি না—মেয়েটার নাম কী?'

'কোন মেয়েটার নাম?'

'যার সঙ্গে আপনার ভাইয়ের বিয়ে হচ্ছে।'

'তুমি সাহায্য না করলে তো বাদলের বিয়ে হবে না। আগে বাদলের ঘাড় থেকে আঁখি–ভূতকে নামাতে হবে। ঘাড় খালি হলেই "বাঁধন" ভূত চেপে বসবে।'

'মেয়েটার নাম বাঁধন?'

'হ্যাঁ।'

'খুব কমন নাম—।'

'কমনের ভেতরই লুকিয়ে থাকে আনকমন। আঁখি নামটাও তো কমন। কিন্তু তুমি তো আর কমন মেয়ে না।'

'আমিও কমন টাইপের মেয়ে।'

'অসম্ভব! কমন টাইপের কোনো মেয়ে বিয়ের দিন বিয়ে ভেঙে দিয়ে প্রেমিকের কাছে চলে যায় না। কমন টাইপের মেয়ে প্রেমিকের কথা ভুলে গিয়ে খুশিমনে বিয়ে করে ফেলে।'

'শুনুন, আপনি খুব অশালীন কথা বলছেন। আমি কোনো প্রেমিকের কাছে যাইনি। আমার কোনো প্রেমিক নেই।'

'ও আচ্ছা।'

'মা'র সঙ্গে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা শুনতে চান?'

'না।'

'না বললে হবে না, আপনাকে শুনতে হবে। আমাদের বাড়িতে খুব অদ্ভুত ব্যবস্থা। কখনোই কেউ নিজের ইচ্ছায় কিছু করে না। কখনোই না। মনে করুন, ঈদের জন্যে শাড়ি কেনা হবে। আমার একটা হলুদ শাড়ি পছন্দ। আমি সেটা কিনতে পারব না। মা বলবে—হলুদ শাড়ি তোমাকে মানায় না। ছোটবেলায় খুব শখ ছিল নাচ শিখব। আমাকে শিখতে দেয়া হয়নি। নাচ শিখে কী হবে? আমার শখ ছিল সায়েন্স পড়ব—জোর করে আমাকে হিউম্যানিটিজ গ্রুপে দেয়া হল। ধরুন আমার যদি কোনো টেলিফোন আসে—আমাকে সে-টেলিফোন ধরতে দেয়া হবে না। দফায়-দফায় নানান প্রশ্নের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। "কে টেলিফোন করল?" "বান্ধবী?" "বান্ধবীর বাসা কোথায়?" "বাবা কী করেন?" ধরুন, আমি কোনো বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলছি—হুট করে একসময় মা করবে কি, হাত থেকে রিসিভার নিয়ে কানে দিয়ে শুনবে আসলেই কোনো মেয়ে কথা বলছে, না কোনো ছেলে কথা বলছে। আমার গায়ে-হলুদের দিন কী হল শুনুন। আমি মাছ খেতে পারি না। গন্ধ লাগে। মাছের গন্ধে আমার বমি এসে যায়। না, তার পরেও খেতে হবে। গায়ে-হলুদের মাছ না খেলে অমঙ্গল হয়। মাছ খেলাম, তারপর বমি করে ঘর ভাসিয়ে দিলাম। তখন খুব রাগ উঠে গেল— আমি রিকশা নিয়ে পালিয়ে চলে গেলাম বান্ধবীর বাড়িতে। এই হচ্ছে ঘটনা।'

'তোমার তা হলে কোনো প্রেমিক নেই।'

'অপরিচিত কোনো ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত নেই—আর আমার থাকবে প্রেমিক! অথচ দেখুন, আমার সব বান্ধবী প্রেমবিশারদ। প্রেমিকের সঙ্গে সিনেমা দেখছে, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছে। জয়দেবপুরে শালবনে হাঁটতে যাচ্ছে। আমার এক বান্ধবী, নাম হল শম্পা। সে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছে। দেখুন-না, কীরকম রোমান্টিক। আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন কী ছিল জানেন? একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম হবে, তারপর গোপনে তাকে বিয়ে করব।'

'সেটা তো এখনও করতে পার। তবে তোমার মা-বাবা খুব কষ্ট পাবেন।'

'আমি চাই তারা কষ্ট পাক।'

'তা হলে একটা কাজ করলে হয়—তুমি বাদলকেই কোর্টে বিয়ে করে ফ্যালো। কেউ কিছু জানবে না। তোমার বাবা-মা শুরুতে প্রচণ্ড রাগ করবেন। তারপর যখন জানবেন তুমি তাদের পছন্দের পাত্রকেই বিয়ে করেছ তখন রাগ পানি হয়ে যাবে। আইডিয়া তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

আঁখি চুপ করে আছে। আঁখি পরিকল্পনা ধুম করে ফেলে দেয়নি। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, তোমায় যা করতে হবে তা হচ্ছে—বাবা-মা'কে কঠিন একটা চিঠি লেখ—মা, আমি সারা জীবন তোমাদের কথা শুনেছি। আর না। এখন আমি আমার নিজের জীবন নিজেই বেছে নিলাম। বিদায়। বিদায়টা লিখবে প্রথমে ইংরেজি ক্যাপিটেল লেটার B বাংলা দায়। B দায়।

'আপনি আমাকে থ্রি ফোর-এর বাচ্চা ভাবছেন?'

'ঠাট্টা করছি। তবে তোমাকে যা অবশ্যই করতে হবে তা হচ্ছে— বাসর করতে হবে অপরিচিত কোনো জায়গায়।'

'কোথায় সেটা?'

'আমার মেসেও হতে পারে। আমার অবিশ্যি খুবই দরিদ্র অবস্থা।'

'যাক, এই সব ছেলেমানুষি আমার ভাল লাগছে না।'

'তা হলে থাক।'

'তা ছাড়া আপনার ভাই বাদল, মি. রেইন—ও কি রাজি হবে? আমার কাছে আইডিয়াটা খুবই মজার লাগছে, কিন্তু তার কাছে লাগবে?'

'ও বিরাট গাধা। তুমি যা বলবে ও তাতেই রাজি হবে।'

'মানুষকে হুট করে গাধা বলবেন না।'

'সরি, আর বলব না।'

'বিয়েতে সাক্ষী লাগবে না?'

'সাক্ষী নিয়ে তুমি চিন্তা করবে না। তুমি চলে এসো।'

'কোথায় চলে আসব?'

'মগবাজার কাজি অফিসে চলে আসো। বাদল সেখানেই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আপনি পাগলের মতো কথা বলছেন কেন? মি. রেইন শুধু শুধু মগবাজার কাজি অফিসে বসে থাকবে কেন?'

'বাদল সেখানে আছে, কারণ আমি তাকে সেখানে পাঠিয়ে তারপর তোমাকে টেলিফোন করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম তোমার সঙ্গে কথা বললেই তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি হবে।'

'হিমু সাহেব, শুনুন। নিজের উপর এত বিশ্বাস রাখবেন না। আমি আপনার প্রতিটি কথায় তাল দিয়ে গেছি দেখার জন্যে যে আপনি কতদূর যেতে পারেন।'

'তুমি তা হলে কাজি অফিসে আসছ না?'

'অবশ্যই না। এবং আমি আপনার প্রতিটি মিথ্যা কথাও ধরে ফেলেছি।'

'কোন কোন মিথ্যা ধরলে।'

'এই যে আপনি বললেন, মি. রেইন মগবাজার কাজি অফিসে বসে আছে।'

'কীভাবে ধরলে?'

'এখনও ধরিনি। তবে ধরব। মগবাজার কাজি অফিস আমাদের বাসা থেকে দু-মিনিটের পথ। আমি এক্ষণই সেখানে যাচ্ছি।'

'শুধু দেখার জন্যে বাদল সেখানে আছে কি না?'

'হ্যাঁ।'

খট করে শব্দ হল। আঁখি টেলিফোন রেখে দিল। আমি মনে মনে হাসলাম। বাদলকে আমি আসলেই কাজি অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে একা না, সঙ্গে দুজন সাক্ষীও আছে। মোফাজ্জল এবং জহিরুল।

ওদের জন্যে সুন্দর একটা বাসরঘরের ব্যবস্থা করতে হয়। সবচে ভাল হত রাতটা যদি তারা দুজনে গাছের নিচে কাটাতে পারত। সেটা সম্ভব না। গল্পে-উপন্যাসে গৃহবিতারিত তরুণ-তরুণীর গাছতলায় জীবন কাটানোর কথা পাওয়া যায়। বাস্তব গল্প-উপন্যাসের মতো নয়।

রাত দশটায় ফুপুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে জানা দরকার।

বাসায় গিয়ে দেখি বিরাট গ্যাঞ্জাম। ফুপুর মাথায় আইসব্যাগ চেপে ধরা আছে। পাশেই ফুপা। তিনিও রণহুংকার দিচ্ছেন। ফুপু বললেন, খবর কিছু শুনেছিস হিমু?

'কী খবর।'

'হারামজাদাটা ঐ বদ মেয়েটাকে কোর্ট ম্যারেজ করেছে। ওর চামড়া ছিলে তুলে মরিচ লাগিয়ে দেয়া দরকার।'

'কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলেছে—বাদলের মতো নিরীহ ছেলে!'

নিরীহ ছেলে কি আর নিরীহ আছে? ডাইনির খপ্পরে পড়েছে না!'

ফুপা বললেন, আমি তো কল্পনাও করতে পারছি না! কী ইচ্ছা করছে জানিস হিমু?

'না। কী ইচ্ছা করছে?'

'ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে হারামজাদাটাকে গুলি করে মারতে।'

ফুপু কঠিনচোখে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব আবার কী ধরনের কথা! নিজের ছেলের মৃত্যুকামনা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আহা, কথার কথা বলেছি। গাধাটার তো দোষ নেই। ডাইনির পাল্লায় পড়েছে না!'

আমি বললাম, নিজের ছেলের বউকেও ডাইনি বলা ঠিক হচ্ছে না। দুজনই ছেলেমানুষ, একটা ভুল করেছে...এখন উচিত ক্ষমাসুন্দর চোখে...

ফুপু গর্জন করে উঠলেন, হিমু, তুই দালালি করবি না। খবর্দার বললাম! এই বাড়ি চিরদিনের জন্যে ওদের জন্যে নিষিদ্ধ।

'বেচারারা বাসররাতে পথে-পথে ঘুরবে!'

'কেউ যদি জায়গা না দেয় পথে-পথে ঘোরা ছাড়া গতি কী! আঁখি বাদলকে নিয়ে তার মা'র বাড়িতে গিয়েছিল। তিনি মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।'

'তা তো দেবেই। বদের ঝাড় না? আমার ছেলের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে, এতবড় সাহস! আমি এই বাড়িতেই আমার ছেলের বাসর করব।'

'এটা মন্দ না। লাইট-ফাইট নিয়ে আসি।'

'লাইট-ফাইট কেন?'

'আলোকসজ্জা করতে হবে না?'

'আলোকসজ্জা তো পরের ব্যাপার—বাসরঘর সাজাতে হবে। ফুল আনতে হবে। এত রাতে ফুল পাবি?'

'পাব না মানে?'

ফুপু মাথার আইস ব্যাগ ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন।

ফুপার চোখ চকচক করছে। মনে হয় ছেলের বিবাহ উপলক্ষে আজ তিনি বোতল খুলবেন। তাঁর সঙ্গীর অভাব হবে না। মোফাজ্জল এবং জহিরুল বাড়ির সামনেই ঘোরাঘুরি করছে। সিগন্যাল পেলেই চলে আসবে।

৭

সাদেক সাহেব শুকনোমুখে ফুপুদের বসার ঘরে বসে আছেন। তাঁর সামনে এক কাপ চা। নাশতার প্লেটে দুপিস কেক। দেখেই মনে হচ্ছে অনেকদিনের বাসি, ছাতাপড়া। আমাকে দেখে ভদ্রলোক হতাশ গলায় বললেন, বাড়ির সবাই কোথায় গেছে জানেন?

আমি বললাম, না। যদিও সুনসান নীরবতা দেখে কিছুটা আঁচ করতে পারছিলাম। বাদল এবং আঁখি হানিমুন করতে কক্সবাজারের দিকে রওনা হয়েছে। তাদের সঙ্গে এ বাড়ির সবাইও রওনা হয়েছে। ফুপা সম্প্রতি একটা মাইক্রোবাস কিনেছেন। মাইক্রোবাস ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন সুযোগ হয়েছে। হানিমুনে স্বামী-স্ত্রী একা থাকবে এটাই নিয়ম। এ-বাড়িতে সব নিয়মই উলটো দিকে চলে।

'বাড়ির সবাই কোথায় আপনি জানেন না?'

'জি না।'

'ওরা সবাই কক্সবাজার চলে গেছে।'

'ও আচ্ছা।'

'কাজের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আপনি মনে হয় কিছুটা আপসেট হয়েছেন।'

'আপসেট হওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? আপনার ফুপুর ঠেলাঠেলিতে মামলার সমস্ত ব্যবস্থা করে চারজনকে আসামি দিয়ে মামলা দায়ের করে বাসায় এসে শুনি সবাই কক্সবাজার।'

'মামলা দায়ের হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। পাঁচজন সাক্ষী জোগাড় করেছি। এর মধ্যে মারাত্মক আহত আছে দুজন। দুজনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আসামি করেছি তিনজনকে—মেয়ের বাবা, মেয়ের বড়মামা আর মেজোমামা। আজই ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে।'

'আপনি তো ভাই খুবই করিৎকর্মা মানুষ। ডায়নামিক পার্সেনিলিটি।'

প্রশংসায় সাদেক সাহেব খুশি হলেন না। তিনি আরও মিইয়ে গেলেন। বাসি কেক কচকচ করে খেয়ে ফেললেন।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আমার অবস্থাটা চিন্তা করুন। যাদের নামে মামলা করেছি তারা ফরিয়াদিদের সঙ্গে মিলেমিশে মেয়ে এবং মেয়ের জামাই-এর সঙ্গে হানিমুনে চলে গেছে।'

'ঐ পার্টিও গেছে নাকি?'

'জি, তারাও গিয়েছে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করে জেনেছি। তারা আরেকটা মাইক্রোবাস ভাড়া করেছে।'

'বাহ্, ভাল তো!'

সাদেক সাহেব রেগে গেলেন। হতভম্ব গলায় বললেন, ভাল তো মানে? ভাল তো বলছেন কেন?

'কিছু ভেবে বলছি না, কথার কথা বলছি।'

'আমার অবস্থাটা আপনি চিন্তা করছেন?'

'আসলে মামলার কথাতে নেচে ওঠাটা আপনার ঠিক হয়নি। সবুর করা উচিত ছিল। সবুরে "ফ্রুট" ফলে বলে একটা কথা আছে। সবুর করলে আপনাকে এই ঝামেলায় যেতে হত না। ফ্রুট ফল তো, আপনিও মাইক্রোবাসে করে হানিমুন পার্টিতে শামিল হতে পারতেন।'

'রসিকতা করছেন?'

'রসিকতা করছি না।'

'দয়া করে রসিকতা করবেন না। রসিকতা আমার পছন্দ না। আমি সিরিয়াস ধরনের মানুষ।'

'চা খাবেন?'

'না, চা খাব না। আচ্ছা দিতে বলুন। আমার মাথা আউলা হয়ে গেছে, এখন করবটা কী বলুন তো?'

'সাজেশান চাচ্ছেন?'

'না, সাজেশান চাচ্ছি না। আমি অন্যের সাজেশানে চলি না।'

'না চলাই ভাল। ফুপুর সাজেশান শুনে আপনার অবস্থাটা কী হয়েছে দেখুন। পুরোপুরি ফেঁসে গেছেন।'

সাদেক সাহেব সিগারেট ধরালেন। বেচারাকে দেখে সত্যি সত্যি মায়া লাগছে।

'সাদেক সাহেব!'

'জি?'

'আপনি মন-খারাপ করবেন না। আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'আপনি আমার সঙ্গে আছেন মানে কী?'

'ওরা যা ইচ্ছা করুক। ওদের মিল-মহব্বতের আমরা তোয়াক্কা করি না। আমরা আমাদের মতো মামলা চালিয়ে যাব।'

'আবার রসিকতা করছেন?'

'ভাই, আমি মোটেই রসিকতা করছি না। আমি সিরিয়াস। আঁখির বাবা এবং দুই মামাকে আমরা হাজতে ঢুকিয়ে ছাড়ব। পুলিশকে দিয়ে রোলারের ডলা দেওয়াব। কানে ধরে উঠবোস করাব।'

'হিমু সাহেব। আপনার কি মাথা খারাপ? আপনি উন্মাদ?'

'আমি উন্মাদের মতো কথা বলছি?'

'অবশ্যই বলছেন।'

'তা হলে আরেকটা সাজেশান দিই। আপনি নিজেও কক্সবাজার চলে যান। আসামি ফরিয়াদি দুই পার্টিকেই একসঙ্গে ট্যাকল করুন। দুপার্টিই আপনার চোখের সামনে থাকবে। আপনি বিচক্ষণ আইনবিদ। আইনের প্যাঁচে ফেলে হালুয়া টাইট করে দিন। ওরা বুঝুক হাউ মেনি প্যাডি, হাউ মেনি রাইস।'

'শুনুন হিমু সাহেব, আপনি আপনার মাথার চিকিৎসা করাবার ব্যবস্থা করুন। ইউ আর এ সিক পারসন।'

'আপনার চায়ের কথা বলা হয়নি। দাঁড়ান, চায়ের কথা বলে এসে আপনার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেব।'

সাদেক সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে দ্বিতীয় বাক্য বলার সুযোগ না দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে—ঝড়ের বেগে নিষ্ক্রমণ।

ফুপুর কাজের ছেলে রশীদ আমার খুব যত্ন নিল। আমাকে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। রশীদের বয়স আঠারো-উনিশ। শরীরের বাড় হয়নি বলে এখনও বালক-বালক দেখায়। ফুপার বাড়িতে সে গত দুবছর হল আছে। ফুপুর ধারণা রশীদের মতো এক্সপার্ট কাজের ছেলে বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা নেই। সে একা একশো না, একাই তিনশো। কথাটা মনে হয় সত্যি।

রশীদ দাঁত বের করে বলল, আইজ আর কই ঘুরবেন। শুইয়া বিশ্রাম করেন। মাথা মালিশ কইরা দিমু। দুপুরে আফনের জন্যে বিরানি পাকামু।

'বিরানি রাঁধতে পারিস?'

'আমি পারি না এমন কাম এই দুনিয়াতে পয়দা হয় নাই। সব কিসিমের কাম এই জীবনে করছি।'

'বলিস কী!'

'আমার ভাইজান আফনের মতো অবস্থা। বেশিদিন কোনো কামে মন টিকে না। চুরিধারি কইরা বিদায় হই।'

'চুরিধারি করিস?'

'পরথম করি না। শেষ সময়ে করি। বিদায় যেদিন নিমু তার একদিন আগে করি। ভাইজান, আপনের চুল বড় হইছে, চুল কাটবেন?'

'নাপিতের কাজও জানিস?'

'জানি। মডান সেলুনে এক বছর কাম করছি। কলাবাগানে। ভাল সেলুন। এসি ছিল। কারিগরও ছিল ভাল।'

'নাপিতের দোকান থেকে কী চুরি করেছিলি?'

'ক্ষুর, কেঁচি, চিরুনি, দুইটা শ্যাম্পু এইসব টুকটাক...'

'খারাপ কী? ছোট থেকে বড়। টুকটাক থেকে একদিন ধুরুমধারুম হবে। দে, চুল কেটে দে।'

আমি হাত-পা ছড়িয়ে বারান্দায় মোড়ায় বসলাম। রশীদ মহা উৎসাহে আমার চুল কাটতে বসল।

'মাথা কামাইবেন ভাইজান?'

'মাথা কামানোর দরকার আছে?'

'শখ হইলে বলেন। মাথা কামানিটা হইল শখের বিষয়।'

'মাথা কামাতে তোর যদি আরাম লাগে তা হলে কামিয়ে দে। সমস্যা কিছু নেই। আমার মাথায় চুল থাকাও যা, না-থাকাও তা।'

রশীদ গম্ভীরমুখে বলল, লোকের ধারণা মাথা কামানি খুব সহজ। আসলে কিন্তু ভাইজান বড়ই কঠিন কাজ।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জগতের যাবতীয় কঠিন কাজই আপতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হয়। সহজ কাজকে মনে হয় কঠিন। যেমন ধর সত্য কথা বলা। মনে হয় না খুব সহজ, ইচ্ছা করলেই পারা যাবে। আসলে ভয়ংকর কঠিন। যে মানুষ এক মাস কোনো মিথ্যা না বলে শুধুই সত্যি কথা বলবে, ধরে নিতে হবে সে একজন মহামানব।

'ভাইজান!'

'বল।'

'আপনার সঙ্গে আমার একটা পেরাইভেট কথা ছিল।'

'বলে ফেল।'

'আফনের কাছে আমি একটা জিনিস চাই ভাইজান—আফনে না বলতে পারবেন না।'

'কী জিনিস চাস?'

'সেইটা ভাইজান পরে বলতেছি। আগে আফনে ওয়াদা করেন দিবেন।'

'তুই চাইলেই আমি দিতে পারব এটা ভাবলি কী করে?'

'আফনে মুখ দিয়া একটা কথা বললেই সেইটা হয়—এইটা আমরা সবেই জানি।'

'তোকে বলেছে কে?'

'বলা লাগে না ভাইজান। বুঝা যায়। তারপরে বাদল ভাই বলছেন। বাদল ভাইয়ের বিবাহ গেছিল ভাইঙ্গা। বাদল ভাই আফনেরে বলল—সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক।'

'তুই চাস কী?'

'বিদেশ যাইতে খুব মন চায় ভাইজান। দেশে মন টিকে না।'

'আচ্ছা যা, হবে।'

রশীদ মাথা কামানো বন্ধ করে তৎক্ষণাৎ আমার পা ছুঁয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করল। আমি সিদ্ধপুরুষদের মতোই তার শ্রদ্ধা গ্রহণ করলাম। মানুষকে ভক্তি করতে ভাল লাগে না। মানুষের ভক্তি পেতে ভাল লাগে।

আমার মাথা কামানো হল। মাথা ম্যাসেজ করা হল। গা-মালিশ করা হল। দুপুরে হেভি খানাপিনা হল। খাসির বিরিয়ানি, মুরগির রোস্ট। অতি সুস্বাদু রান্না। ভরপেট খাবার পরেও মনে হচ্ছে আরও খাই।

'রশীদ, তুই তো ভাল রান্না জানিস!'

'চিটাগাং হোটেলে বাবুর্চির হেল্পার ছিলাম ভাইজান। বাবুর্চির নাম ওস্তাদ মনা মিয়া। এক নম্বর বাবুর্চি ছিল। রান্ধনের কাজ সব শিখছি ওস্তাদের কাছে।'

'ভাল শিখেছিস। খুব ভাল শিখেছিস।'

'রাতেই ভাইজান আফনেরে চিতলমাছের পেটি খাওয়ামু। এইটা একটা জিনিস।'

'কীরকম জিনিস?'

'একবার খাইলে মিত্যুর দিনও মনে পড়ব। আজরাইল যখন জান কবচের জন্যে আসব তখন মনে হইব—আহারে, চিতলমাছের পেটি! ওস্তাদ মনা মিয়া আমারে হাতে ধইরা শিখাইছে। আমারে খুব পিয়ার করত।'

'ওস্তাদের কাছ থেকে কী চুরি করলি?'

রশীদ চুপ করে রইল। আমি আর চাপাচাপি করলাম না। দুপুরে লম্বা ঘুম দিলাম। রাতে খেলাম বিখ্যাত চিতলমাছের পেটি। সেই রান্না শিল্পকর্ম হিসেবে কতটা উত্তীর্ণ বলতে পারলাম না—কারণ শুরুতেই গলায় কাঁটা বিঁধে গেল। মাছের কাঁটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু একে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রতিনিয়তই সে জানান দিতে থাকে। আমি আছি। আমি আছি। আমি আছি। ঢোক গেলার প্রয়োজন নেই, তার পরেও ক্রমাগত ঢোক গিলে যেতে হয়। কাঁটার প্রসঙ্গে আমার বাবার কথা মনে পড়ল। তাঁর বিখ্যাত বাণীমালায় কাঁটাসংক্রান্ত বাণীও ছিল।

কণ্টক

কাঁটা, কণ্টক, শলা, তরুনখ, সূচি, চোঁচ

বাবা হিমালয়, শৈশবে কইমাছের ঝোল খাইতে গিয়া একবার তোমার গলায় কইমাছের কাঁটা বিঁধিল। তুমি বড়ই অস্থির হইলে। মাছের কাঁটার যন্ত্রণা তেমন অসহনীয় নয়, তবে বড়ই অস্বস্তিকর। কণ্টক নীরবেই থাকে, তবে সে প্রতিনিয়তই সে তার অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়। কণ্টকের এই স্বভাব তোমাকে জানাইবার জন্যই আমি তোমার গলার কাঁটা তুলিবার কোনো ব্যবস্থা করি নাই। তুমি কিছুদিন গলায় কাঁটা নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে। বাবা হিমালয়, তুমি কি জান যে মানুষের মনেও পরম করুণাময় কিছু কাঁটা বিঁধাইয়া দেন? একটি কাঁটার নাম—মন্দ কাঁটা। তুমি যখনই কোনো মন্দ কাজ করিবে তখনই এই কাঁটা তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিবে। তুমি অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিবে। ব্যথাবোধ না—অস্বস্তিবোধ।

সাধারণ মানুষের জন্য এইসব কাঁটার প্রয়োজন আছে। সিদ্ধপুরুষদের জন্যে প্রয়োজন নাই। কাজেই কণ্টকমুক্তির একটা চেষ্টা অবশ্যই তোমার মধ্যে থাকা উচিত। যেদিন নিজেকে সম্পূর্ণ কণ্টকমুক্ত করিতে পারিবে সেইদিন তোমার মুক্তি। বাবা হিমালয়, প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে একটা কথা বলি, মহাপাষণ্ডরাও কণ্টকমুক্ত থাকে। এই অর্থে মহাপুরুষ এবং মহাপাষণ্ডের ভিতরে তেমন কোনো প্রভেদ নাই।

গলায় কাঁটা নিয়ে রাতে আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ভদ্রলোক মনে হচ্ছে কোনো ঘোরের মধ্যে আছেন। আমার মুণ্ডিত মস্তক তাঁর নজরে এল না। তিনি হাসিমুখে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

'ভাইসাহেব, আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন।'

'আজ কি বিশেষ কোনো দিন?'

'জি। আজ আমার মেয়ের পানচিনি হয়ে গেছে।'

'বলেন কী!'

'কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে ভাই! একটু পরপরই চোখে পানি এসে যাচ্ছে।'

তিনি চোখ মুছতে লাগলেন। চোখ মনে হয় অনেকক্ষণ ধরেই মুছছেন। চোখ লাল হয়ে আছে। আমি বললাম, আপনার মেয়ে কোথায়? এত বড় উৎসব, বাসা খালি কেন?

'মেয়ে খুব কান্নাকাটি করছিল। আমার কান্না দেখেই কাঁদছিল। শেষে তার মামাতো ভাইবোনরা এসে নিয়ে গেছে। আমাকেও নিতে চাচ্ছিল, আমি যাইনি।'

'যাননি কেন?'

'ইয়াসমিন একা থাকবে। তা ছাড়া মেয়ের বিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে একটু কথাবার্তাও বলব। আমার দায়িত্ব এখন শেষ।'

'ওনার দায়িত্বও তো শেষ। মেয়েকে আর চোখে-চোখে রাখতে হবে না। উনি আবার মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হবেন না তো? জীবিত শাশুড়িকেই জামাইরা দেখতে পারে না—উনি হলেন ভূত-শাশুড়ি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব করুণ গলায় বললেন, আমার স্ত্রী সম্পর্কে এই জাতীয় বাক্য ব্যবহার করবেন না ভাই। আমি খুব মনে কষ্ট পাই।

'আচ্ছা যান, আর করব না।'

'ভাই, আজ রাতটা আপনি আমার সঙ্গে থেকে যান। দুজনে গল্পগুজব করি।'

'আমি থাকলে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কীভাবে?'

'ওর সঙ্গে তো সারাক্ষণ কথা বলি না। কথাবার্তা সামান্যই হয়। ওর কথা বলতে কষ্ট হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও আচ্ছা।'

'হিমু সাহেব! ভাই, আমার অনুরোধটা রাখুন। থাকুন আমার সঙ্গে। বিছানায় ধোয়া চাদর দিয়ে দিচ্ছি।'

'চাদর-ফাদর কিছু লাগবে না। একটা বিড়াল লাগবে। আপনার বাসায় কি বিড়াল আছে?'

'জি না, বিড়াল লাগবে কেন?'

'আমার গলায় কাঁটা ফুটেছে। বিড়ালের পা ধরলে নাকি গলার কাঁটা যায়...'

'এইসব কথা একদম বিশ্বাস করবেন না। এইসব হচ্ছে কুসংস্কার। গরম লবণপানি দিয়ে গার্গল করেন, গলার কাঁটা চলে যাবে। আমি গরম পানি এনে দিচ্ছি। গলার কাঁটার খুব ভাল হোমিওপ্যাথি অষুধ আছে। কাল সকালে আমি আপনাকে জোগাড় করে দেব—অ্যাকোনাইট ৩স।'

'আপনি তা হলে হোমিওপ্যাথিও জানেন?'

'ছোট বাচ্চা মানুষ করেচি, হোমিওপ্যাথি তো জানতেই হবে। বই পড়ে পড়ে শিখেছি, স্বআহৃত জ্ঞান। আপনার যদি দীর্ঘদিনের কোনো ব্যাধি থাকে বলবেন, চিকিৎসা করব। তখন বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে একজন ভাল চিকিৎসক।'

'ভয়-পাওয়া রোগ সারাতে পারবেন?'

'ভয়-পাওয়া রোগ? আপনি ভয় পান?'

'একবার পেয়েছিলাম। সেই ভয়টা মনে গেঁথে ক্রনিক হয়ে গেছে। কিংবা এমনও হতে পারে—পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

'এই দুটি রোগেরই হোমিওপ্যাথিতে খুব ভাল চিকিৎসা আছে। ভূত-প্রেত দেখতে পেলে স্ট্রামোনিয়াম ৬, আর যদি মনে হয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন তা হলে খেতে হবে প্ল্যাটিনা ৩০, দুটাই মানসিক অসুখ।'

'মনে হচ্ছে হোমিওপ্যাথিতে মানসিক রোগের ভাল চিকিৎসা আছে।'

'অবশ্যই আছে। যেমন ধরুন কেউ যদি মনে করে সব বিষয়ে তার টনটনে জ্ঞান তাকে দিতে হবে কপিয়া ৬, অনবরত কথা বলা রোগের জন্যে ল্যাকেসিস ৬, লোকের সঙ্গ বিরক্তি এলে নাক্সভমিকা ৩, উদাসীন ভাব অ্যাসিড ফস-৩, খুন করার ইচ্ছা জাগলে হায়োসায়েমাস ৩, আত্মহত্যা করার ইচ্ছা—অরাম সেট ৩০, কথা বলার সময় কান্না পেলে—পালস ৬, অতিরিক্ত ধর্মচিন্তা—নাক্সভমিকা।'

'অতিরিক্ত কথা বলার ইচ্ছা কমে কোন অষুধে বললেন?'

'ল্যাকেসিস ৬'

'ঘরে আছে না?'

'জি আছে। গলার কাঁটার অষুধটা নেই। এইটা আছে।'

'আপনার তো মনে হয় ল্যাকেসিস ৬ অষুধটা নিয়মিত খাওয়া উচিত।'

'হিমু সাহেব, আমি কিন্তু কথা কম বলি। কথা বলার মানুষই পাই না। কথা বলব কী করে? আমার মেয়ে তো আমার সঙ্গে কথা বলে না। যখন ছোট ছিল তখন বলত। এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সে দূরে সরে যাচ্ছে। কথা কম বলা রোগেরও ভাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আছে—অ্যাসিড ফস ৬, উদাসীন ভাবের জন্যে অ্যাসিড ফস ৩, আর কথা কম-বলা রোগের জন্যে অ্যাসিড ফস ৬, কিন্তু আমার অষুধ খাবে না। ওর ধারণা হোমিওপ্যাথি হল চিনির দলা। কোনো একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। পরীক্ষা না করেই কেউ যদি বলে চিনির দলা, সেটা কি ঠিক?'

'জি না, ঠিক না।'

'আমাদের নিয়ম হচ্ছে পরীক্ষা ছাড়াই সিদ্ধান্ত। খারাপ না?'

'খুবই খারাপ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি কথা বেশি বলায় বিরক্ত হবেন না। অনেকদিন পর আপনাকে পেয়েছি বলে এত কথা বলছি। আপনি তো আর সাধারণ মানুষের মতো না যে আপনার সঙ্গে মেপে মেপে কথা বলতে হবে।'

'আমি সাধারণ মানুষের মতো না?'

'অবশ্যই না। ঐ দিন আপনি আমার কন্যার বাড়ি ফেরা সম্পর্কে যে-সময় বলে গিয়েছিলেন, সে ঠিক সেই সময় ফিরেছে। আমি খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট আমার বিস্ময়ভাব এখনও যায়নি। প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ তো আর আজকাল পাওয়া যায় না। যাঁদের এই ক্ষমতা আছে তাঁরা তা প্রকাশ করেন না। তাঁরা আড়ালে থাকতেই পছন্দ করেন। আপনার সঙ্গে নিশ্চিয়ই অনেকের যোগাযোগ আছে। আপনি যদি দয়া করে এমন লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন তা হলে খুব খুশি হব। আছে এমন কেউ?'

'আছে একজন—ময়লা বাবা। গায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন।'

'ময়লা মেখে বসে থাকেন কেন?'

'বলতে পারব না। জিজ্ঞেস করিনি।'

'জিজ্ঞেস করেননি কেন?'

'জিজ্ঞেস করিনি কারণ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাঁর ঠিকানা জোগাড় করেছি। একদিন যাব।'

'হিমু সাহেব, ভাই, যেদিন যাবেন অবশ্যই আমাকে নিয়ে যাবেন। ওনার ক্ষমতা কেমন?'

'লোকমুখে শুনেছি ভাল ক্ষমতা। মনের কথা হড়বড় করে বলে দেন। আপনার মনে কোনো খারাপ কথা থাকলে ওনার সঙ্গে দেখা না করাই ভাল। হড়বড় করে বলে দেবেন, আপনি পড়বেন লজ্জায়।'

'ওনার নাম কী বললেন, ময়লা বাবা?'

'জি, ময়লা বাবা।'

'কী ধরনের ময়লা গায়ে মাখেন?'

'এক-তৃতীয়াংশ নর্দমার পানির সঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ ডাস্টবিনের ময়লা, এক-ষষ্ঠমাংশ টাটকা গু প্লাস আরও কিছু হাবিজাবি দিয়ে সেমি সলিড একটা মিকশ্চার তৈরি করে তেলের মতো গায়ে মেখে ফেলেন।'

'সত্যি?'

'ভাই আমি রসিকতা করছি। সত্যি কি না এখনও জানি না। দেখা হলে জানব। ময়লার ফর্মুলা নিয়ে আসব। ইচ্ছা করলে আপনিও গায়ে মাখতে পারেন।'

একজন মানুষ যে অন্য একজনকে কী পরিমাণ বিরক্ত করতে পারে আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এই তথ্য জেনে গেলাম।

আমি পা গুটিয়ে বিছানায় বসে আছি। তিনি বসে আছেন আমার সামনে একটা বেতের চেয়ারে। তিনি ননস্টপ কথা বলে যাচ্ছেন। ঢাকা-চিটাগাং আন্তনগর ট্রেনও কিছু স্টেশনে থামে। উনি কোনো স্টেশনই ধরছেন না। ছুটে চলছে তুফান মেইল। তাঁর সব গল্পই তাঁর কন্যা এবং ভূত-স্ত্রী প্রসঙ্গে। আমি শুনে যাচ্ছি—মন দিয়েই শুনছি। অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার বিদ্যা আমার ভালই আয়ত্ত হয়েছে।

'বুঝলেন হিমু ভাই, আজ আমি একজন মুক্ত মানুষ। এ ফ্রি ম্যান। মানে এখনও ফ্রি না, তবে হয়ে যাচ্ছি। যেদিন আমার মেয়ে শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হবে, সেদিনই আমি হব একজন স্বাধীন মানুষ। মেয়েটা সুন্দর হওয়ায় নানান সমস্যা হচ্ছিল। কলেজে ওঠার পর থেকে শুধু বিয়ের সম্বন্ধ আসে। শুধু সম্বন্ধ এলে ক্ষতি ছিল না। তারা নানানভাবে চাপাচাপি করে। ভয় পর্যন্ত দেখায় এমন অবস্থা! বিয়ে না দিলে মেয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাব এই জাতীয় কথাবার্তা পর্যন্ত বলে। শুধু যে ওরা চাপাচাপি করেছে তাই না, আমার আত্মীয়স্বজনরাও চাপাচাপি করেছে। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একা মানুষ, মেয়ে মানুষ করতে পারছি না— এইসব উদ্ভট যুক্তি। যখন বিয়ে দিতে মন ঠিক করলাম তখন অন্য সমস্যা। বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়, ছেলে পছন্দ হয়, কথাবার্তা পাকা হয়, তখন বিয়ে ভেঙে যায়। ক'বার এরকম হল জানেন? পাঁচবার। এর মধ্যে তিনবার বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হয়ে গিয়েছিল। আপনাকে কার্ড দেখাব। সব যত্ন করে রেখে দিয়েছি।'

'বিয়ে ভেঙে যায় কেন?'

'দুষ্ট লোক কানভাঙানি দেয়। আমার মেয়ের নামে আজেবাজে কথা বলে, উড়ো চিঠি দেয়। টেলিফোন করে। সুন্দরী মেয়েদের প্রসঙ্গে আজেবাজে ধরনের কথা মানুষ খুব সহজে বিশ্বাস করে। বিয়ে ভেঙে যায়। আমার মেয়ে এতে খুব কষ্ট পায়। আমি তেমন পাই না, কারণ আমার স্ত্রী আগেই আমাকে জানিয়ে দেন বিয়ে ভেঙে যাবে। আমার ভেতর একধরনের মানসিক প্রস্তুতি থাকে। কিন্তু আমার মেয়ের ভেতর থাকে না বলে সে খুব কষ্ট পায়। বিয়ে হচ্ছে না এই জন্যে কষ্ট না, অপমানের কষ্ট।'

'কষ্ট হবারই কথা।'

'তারপর সে ঠিক করল কোনোদিন বিয়েই করবে না। কঠিনভাবে আমাদের সবাইকে বলল—তার বিয়ে নিয়ে আর একটি কথাও যেন না বলা হয়। আমার মেয়ে আবার খুব কঠিন ধরনের—একবার যা বলবে তা-ই। এর কোনো নড়চড় হবে না। আমরা বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা দীর্ঘদিন বলিনি। এতদিন পর হঠাৎ আবার কথা উঠল। অতি দ্রুত সব ফাইন্যাল হয়ে গেল।'

'ভাল তো।'

'ভাল তো বটেই। কী যে আনন্দ আমার হচ্ছে তা আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'আপনার স্ত্রী? তিনিও কি আপনার মতোই আনন্দিত?'

'হ্যাঁ, সেও খুশি। খুব খুশি।'

'আপনার সঙ্গে কথা হয়েছে?'

'জি, কথা হয়েছে।'

'তিনি আবার বলেননি তো যে এবারও বিয়ে ভেঙে যাবে?'

'না, বলেনি। অবশ্যি সে ভবিষ্যতের কথা খুব আগেভাগে বলতে পারে না। শেষ মুহূর্তে বলে। কে জানে এইবারও শেষ মুহূর্তে কিছু বলে কি না!'

'শেষ মুহূর্তে কিছু বলার সুযোগ না দিলেই হয়। বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। ধরো তক্তা মারো পেরেক অবস্থা। কেউ ভাঙানি দেবার সুযোগ পাবে না।'

'তা কি আর হয়! মেয়ের বিয়ে বলে কথা। এ তো আর চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ডিনার খাওয়ার মতো ঘটনা না যে রাত আটটায় ঠিক করা হবে রাত ন'টায় খেতে যাওয়া হবে!'

'তাও ঠিক।'

'মেয়ের ছবি দেখবেন?'

'নিশ্চয়ই দেখব।'

'সব ছবি দেখতে সময় লাগবে। শত শত ছবি আমি তুলেছি। একসময় ফটোগ্রাফির শখ ছিল। এখনও আছে। নিয়ে আসব?'

'আনুন।'

'সব মিলিয়ে পঁচিশটা অ্যালবাম।'

'পঁচিশটা অ্যালবাম?'

'জি, একেক বছরের জন্যে একেকটা। আসুন অ্যালবাম দেখি। আমি মেয়েকে বলেছি, মা শোন, এই বাড়ি থেকে তুই সবকিছু নিয়ে যা, শুধু অ্যালবামগুলি নিতে পারবি না।'

আমরা অ্যালবাম দেখা শুরু করলাম। ছবির উপর দিয়ে শুধু যে চোখ বুলিয়ে যাব সে উপায় নেই—প্রতিটি ছবি আশরাফুজ্জামান সাহেব ব্যাখ্যা করছেন—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যে-ফ্রকটা পরা দেখছেন, তার একটা সাইড ছেঁড়া আছে। মীরার খুব প্রিয় ফ্রক। ছিড়ে গেছে, তার পরেও পরবে। থুতনিতে কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন না। বাথরুমে পা-পিছলে পরে ব্যথা পেয়েছিল। রক্তারক্তি কাণ্ড। বাসায় গাঁদাফুল ছিল। সেই ফুল কচলে দিয়ে রক্ত বন্ধ করেছি।'

আমরা ভোর চারটা পর্যন্ত সাতটা অ্যালবাম শেষ করলাম। অষ্টম অ্যালবাম হাতে নিয়ে বললাম, আশরাফুজ্জামান সাহেব, কাপড় পরুন তো!

তিনি চমকে উঠে বললেন, কেন?

আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে।

'কী বলছেন এসব?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে উঠে গিয়ে পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন।

আমরা ভোর পাঁচটায় ধানমণ্ডিতে মেয়ের মামার বাড়িতে পৌঁছলাম। দেখা গেল আসলেই মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। রাত দশটায় কাজি এনে বিয়ে পড়ানো হয়েছে।

আমি বললাম, মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে বিয়ে, ব্যাপারটা কী?

মেয়ের মামা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি বাইরের মানুষ, আপনাকে কী বলব, না বলেও পারছি না—মেয়ের বিয়ে ভেঙে যেত তার বাবার কারণে। উনিই পাত্রপক্ষকে উড়ো চিঠি দিতেন। টেলিফোনে নিজের মেয়ের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলে বিয়ে ভাঙতেন। বিয়ের পর মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যাবে এটা সহ্য করতে পারতেন না। উনি খানিকটা অসুস্থ। আমরা যা করেছি উপায় না দেখেই করেছি।

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন। আমি তাঁকে রেখে নিঃশব্দে চলে এলাম। সকালবেলায় হাঁটার অন্যরকম আনন্দ।

AMARBOI.COM

৮

ময়লা বাবার আস্তানা কুড়াইল গ্রামে। বুড়িগঙ্গা পার হয়ে রিকশায় দু-কিলোমিটার যেতে হয়। তারপর হণ্টন। কাঁচা রাস্তা, ক্ষেতের আইল সব মিলিয়ে আরও পাঁচ কিলোমিটার। মহাপুরুষদের দেখা পাওয়া সহজ ব্যাপার না।

'বাবা' হিসেবে তাঁর খ্যাতি এখনও বোধহয় তেমন ছড়ায়নি। অল্পকিছু ভক্ত উঠোনে শুকনোমুখে বসে আছে। উঠোনে চাটাই পাতা, বসার ব্যবস্থা। উঠোন এবং টিনের বারান্দা সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। যে-বাবা সারাগায়ে ময়লা মেখে বসে থাকেন তাঁর ঘর-দুয়ার এমন ঝকঝকে কেন—এই প্রশ্ন সংগত কারণেই মনে আসে।

আমার পাশে একজন হাঁপানির রোগী। টেনে শ্বাস নিচ্ছে। দেখে মনে হয় সময় হয়ে এসেছে, চোখ মুখ উলটে এক্ষুনি ভিরমি খাবে। আমি তাতে বিভ্রান্ত হলাম না। হাঁপানি রোগীকে যত সিরিয়াসই দেখাক এরা এত সহজে ভিরমি খায় না। রোগী আমার দিকে চোখ-ইশারা করে বললেন, বাবার কাছে আইছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'আপনার সমস্যা কী?'

'সমস্যা কিছু না, ময়লা বাবাকে দেখতে এসেছি। আপনি রোগ সারাতে এসেছেন?'

'জি।'

'বাবার কাছে এই প্রথম এসেছেন?'

'জি।'

'আর কোনো বাবার কাছে যান নি? বাংলাদেশে তো বাবার অভাব নেই।'

'কেরামতগঞ্জের ন্যাংটা বাবার কাছে গিয়েছিলাম।'

'লাভ হয়নি?'

'বাবা আমার চিকিৎসা করেন নাই।'

'ইনি করবেন?'

'দেখি, আল্লাহ্‌পাকের কী ইচ্ছা।'

রোগীর হাঁপানির টান বৃদ্ধি পেল। আমি চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম। মানুষের কষ্ট দেখাও কষ্টের। হাঁপানি রোগীর দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সুস্থ মানুষেরও নিশ্বাসের কষ্ট হয়।

সকাল এগারোটার মতো বাজে। বাবার দেখা নেই। উঠোনে রোদ এসে পড়েছে। গা চিড়বিড় করছে। ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে। বাবার খাদেমদের তৎপরতা চোখে পড়ছে। তারা ছেলেদের এক জায়গায় বসাচ্ছে, মেয়েদের এক জায়গায় বসাচ্ছে। সবারই উঠোনে চাটাইয়ে বসতে হচ্ছে, তবে চাটাইয়ের মাঝামাঝি চুনের দাগ দেয়া। এই দাগ আগে চোখে পড়েনি। চোখে সুরমা-দেয়া মেয়ে-মেয়ে চেহারার এক খাদেমকে নিচু গলায় বললাম, ময়লা বাবা টাকা-পয়সা কী নেন?

খাদেম বিরক্তমুখে বলল, বাবা টাকাপয়সা নেন না।

'টাকাপয়সা না নিলে ওনার চলে কী ভাবে?'

'ওনার কীভাবে চলে সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না।'

'আপনাদেরও তো খরচপাতি আছে। এই যে চোখে সুরমা দিয়েছেন, সেই সুরমাও তো নগদ পয়সায় কিনতে হয়। বাবার জন্যে কিছু পয়সাকড়ি নিয়ে এসেছি, কার কাছে দেব বলেন।'

'বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন।'

'উনি দর্শন দেবেন কখন?'

'জানি না। যখন সময় হবে উনি একজন একজন করে ডাকবেন।'

'সিরিয়ালি ডাকবেন? যে আগে এসেছে সে আগে যাবে?'

'বাবার কাছে কোনো সিরিয়াল নাই। যাকে ইচ্ছা বাবা তাকে আগে ডাকেন। অনেকে আসে বাবা ডাকেনও না।'

'আমার ডাক তো তা হলে নাও পড়তে পারে। অনেক দূর থেকে এসেছি ভাই-সাহেব।'

'বাবার কাছে নিকট-দূর কোনো ব্যাপার না।'

'তা তো বটেই, নিকট-দূর হল আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জন্যে। বাবাদের জন্যে না।'

'আপনি বেশি প্যাচাল পাড়তেছেন। প্যাচাল পাড়বেন না, বাবা প্যাচাল পছন্দ করেন না। ঝিম ধরে বসে থাকেন। ভাগ্য ভাল হলে ডাক পাবেন।'

আমি ঝিম ধরে বসে রইলাম। আমার ভাগ্য ভাল, বাবার ডাক পেলাম। খাদেম আমার কানেকানে ফিসফিস করে বলল, বাবার হুজরাখানা থেকে বের হবার সময় বাবার দিকে পিঠ দিয়ে বের হবেন না। এতে বাবার প্রতি অসম্মান হয়। আপনার এতে বিরাট ক্ষতি হবে।

বাবাদের হুজরাখানা অন্ধকার ধরনের হয়। ধূপ-টুপ জ্বলে। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর বোঝাই থাকে। দরজা-জানালা থাকে বন্ধ। ভক্তকে একধরনের আধিভৌতিক পরিবেশে ফেলে দিয়ে হকচকিয়ে দেয়া হয়। এটাই নিয়ম। ময়লা বাবার ক্ষেত্রে এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেল। তাঁর হুজরাখানার দরজা-জানালা সবই খোলা। প্রচুর বাতাস। বাবা খালিগায়ে বসে আছেন। আসলেই গাভরতি ময়লা। মনে হচ্ছে ডাস্টবিন উপুড় করে গায়ে ঢেলে দেয়া হয়েছে। উৎকট গন্ধে আমার বমি আসার উপক্রম হল। একী কাণ্ড! বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে বাবার চোখে সোনালি ফ্রেমের

চশমা, এবং তাঁর মুখ হাসিহাসি। কুটিল ধরনের হাসি না, সরল ধরনের হাসি। তিনি চশমার ফাঁক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে টানা-টানা গলায় সুর করে বললেন, কেমন আছেন গো?

আমি বললাম, ভাল।

'দুর্গন্ধ সহ্য হচ্ছে না?'

'জি না।'

'কিছুক্ষণ বসে থাকেন—সহ্য হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ কষ্ট করেন।'

'গায়ে ময়লা মেখে বসে আছেন কেন?'

'কী করব বলেন, নাম হয়েছে ময়লা বাবা। নামের কারণে ময়লা মাখি। গু মেখে বসে থাকলে ভাল হত। লোকে বলত গু-বাবা। হি হি হি।'

তিনি হাসতে শুরু করলেন। এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না। অস্বাভাবিক হাসি। এবং খানিকটা ভয়-ধরানো হাসি।

'আপনার নাম কী গো বাবা?'

'হিমু।'

'বাহ্, ভাল নাম—সুন্দর নাম। পিতা রেখেছেন?'

'জি।'

'ভাল, অতি ভাল। গন্ধ কি এখনও নাকে লাগছে বাবা?'

'এখনও লাগছে।'

'সহ্য হয়ে যাবে। সব খারাপ জিনিসই মানুষের সহ্য হয়ে যায়। আপনার কি অসুখবিসুখ আছে?'

'না।'

'এত চট করে না বলবেন না। মানুষের অনেক অসুখ আছে যা ধরা যায় না। জ্বর হয় না, মাথা বিষ করে না—তার পরেও অসুখ থাকে। ভয়ংকর অসুখ। এই যে আমি ময়লা মেখে বসে আছি, এটা অসুখ না?'

'জি, অসুখ।'

'মনের ভেতরে আমরা যখন ময়লা নিয়ে বসে থাকি তখন সেটা অসুখ না, কারণ সেই ময়লা দেখা যায় না, সেই ময়লার দুর্গন্ধ নাই। তাই না বাবা?'

'জি।'

'বাইরের ময়লা পরিষ্কার করা যায়। এখন আমি যদি গরম পানি দিয়া গোসল দেই, শরীরে সাবান দিয়া ডলা দেই—ময়লা দূর হবে। হবে না?'

'হবে।'

'মনের ময়লা দূর করার জন্যে গোসলও নাই, সাবানও নাই।'

'ঠিক বলেছেন।'

'আপনি আমার কাছে কী জন্যে এসেছেন বলেন।'

'শুনেছি আপনার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। আপনি মানুষের মনের কথা ধরতে পারেন। সত্যি পারেন কি না দেখতে এসেছি।'

'পরীক্ষা করতে এসেছেন?'

'পরীক্ষা না। কৌতূহল।'

শুনেন বাবা, আমার কোনো ক্ষমতা নাই। ময়লা মেখে বসে থাকি বলে লোকে নানান কথা ভাবে। কেউ কেউ কি করে জানেন? আমার গা থেকে ময়লা নিয়ে যায়। তাবিজ করে গলায় পরে—এতে নাকি তাদের রোগ আরোগ্য হয়—

ডাক্তার কবিরাজ গেল তল
ময়লা বলে কত জল?

হি হি হি...।'

ময়লা বাবা আবারও অপ্রকৃতিস্থের মতো হাসতে শুরু করলেন। আমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললাম, শুধু শুধু পরিশ্রম করেছি। মানসিক দিক দিয়ে অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষ। এর কাছ থেকে বেশি কিছু আশা করা ঠিক না। জ্ঞানগর্ভ কিছু কথা এরা বলে। কিংবা সাধারণ কথাই বলে—পরিবেশের কারণে সেই সাধারণ কথা জ্ঞানগর্ভ কথা বলে মনে হয়।

'ময়লা নিবেন বাবা?'

'জি না।'

'ঢাকা শহর থেকে কষ্ট করে এসেছেন—কিছু ময়লা নিয়ে যান। সপ্তধাতুর কবচে ময়লা ভরবেন। কোমরে কালো ঘুনশি দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা শরীরে ধারণ করবেন—এতে উপকার হবে।'

'কী উপকার হবে?'

'রাতে-বিরাতে যে ভয় পান সেই ভয় কমতে পারে।'

'আমি মনে মনে খানিকটা চমকালাম। পাগলা বাবা কি থট রিডিং করছেন? আমার ভয় পাবার ব্যাপারটা তিনি ধরতে পেরেছেন? নাকি কাকতালীয়ভাবে কাছাকাছি চলে এসেছেন? বিস্তৃত ফাঁদ পাতা হয়েছে। আমি সেই ফাঁদে পা দিয়েছি—তিনি সেই ফাঁদ এখন গুটিয়ে আনবেন।

'ভয়ের কথা কেন বলছেন? আমি তো ভয় পাই না।'

'রাতে কোনোদিন ভয় পান নাই বাবা?'

'জি না।'

'উনারে তো একবার দেখলেন। ভয় তো পাওনের কথা।'

'কাকে দেখেছি?'

'সেটা তো বলব না। তাঁর হাতে লাঠি ছিল, ছিল না?'

আমি মোটামুটিভাবে নিশ্চত হলাম ময়লা বাবা থট রিডিং জানেন। কোনো একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তিনি আমার মনের কথা পড়তে পারছেন। এটি কি কোনো গোপন বিদ্যা—যে বিদ্যার চর্চা শুধুই অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? ময়লা বাবাকে প্রশ্ন করলে কি জবাব পাওয়া যাবে? মনে হয় না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। ময়লা বাবা বললেন, বাবা কি চলে যাচ্ছেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'পরীক্ষায় কি আমি পাস করেছি?'

'মনে হয় করেছেন। বুঝতে পারছি না।'

'বুঝেছেন বাবা, আমি নিজেও বুঝতে পারি না। খুব কষ্টে আছি। দুর্গন্ধ কি এখনও পাচ্ছেন বাবা?'

'জি না।'

'সুগন্ধ একটা পাচ্ছেন না? সুগন্ধ পাবার কথা। অনেকেই পায়।'

আমি অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম—সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার প্রিয় একটা ফুলের গন্ধ। বেলি ফুলের গন্ধ। গন্ধে কোনো অস্পষ্টতা নেই—নির্মল গন্ধ। এটা কি কোনো ম্যাজিক? আড়কের শিশি গোপনে ঢেলে দেয়া হয়েছে?

'গন্ধ পাচ্ছেন না বাবা?'

'জি পাচ্ছি।'

'ভাল। এখন বলেন দেখি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি?'

ময়লা বাবা আবার চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাচ্ছেন। ম্যাজিশিয়ান ভাল কোনো খেলা দেখানোর পর যে-ভঙ্গিতে দর্শকের বিস্ময় উপভোগ করে—অবিকল সেই ভঙ্গি। আমি বললাম, আমার ধারণা আপনার কিছু ক্ষমতা আছে।

'কিছু ক্ষমতাতো সবারই আছে। আপনারও আছে।'

'আমি যদি ঢাকা শহরে আপনাকে নিয়ে যেতে চাই আপনি যাবেন?'

'না।'

'না কেন?'

'অসুবিধা আছে। আপনি বুঝবেন না।'

'তা হলে আজ উঠি।'

'আচ্ছা যান। আপনারে যে খেলা দেখালাম তার জন্যে নজরানা দিবেন না? একশো টাকার নোটটা রেখে যান।'

'শুনেছিলাম আপনি টাকাপয়সা নেন না।'

'সবার কাছ থেকে নেই না। আপনার কাছ থেকে নিব।'

'কেন?'

'সেটা বলব না। সবেরে সবকিছু বলতে নাই। আচ্ছা এখন যান। একদিনে অনেক কথা বলে ফেলেছি—আর না।'

'আমি যদি কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি তাঁকে কি আপনি আপনার খেলা দেখাবেন?'

ময়লা বাবা আবারও অপ্রকৃতিস্থের হাসি হাসতে শুরু করলেন। আমি একশো টাকার নোটটা তাঁর পায়ের কাছে রেখে চলে এলাম। ময়লা বাবার ব্যাপারটা নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সবচে ভাল হত যদি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা যেত। সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না। মিসির আলি টাইপের মানুষ সহজে কৌতূহলী হন না। এঁরা নিজেদের চারপাশে শক্ত পাঁচিল তুলে রাখেন। পাঁচিলের ভেতর কাউকে প্রবেশ করতে দেন না। এ-ধরনের মানুষদের কৌতূহলী করতে হলে পাঁচিল ভেঙে ভেতরে ঢুকতে হয়—সেই ক্ষমতা বোধহয় আমার নেই।

তবু একটা চেষ্টা তো চালাতে হবে। ময়লা বাবার ক্ষমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলে দেখা যেতে পারে। লাভ হবে বলে মনে হয় না। অনেক সময় নিয়ে মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তিনি বিভ্রান্ত হবার মানুষ না, তবুও চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

AMARBOI.COM

৯

'কে?'

আমি জবাব দিচ্ছি না, চুপ করে আছি। দ্বিতীয়বার 'কে' বললে জবাব দেব। মিসির আলি দ্বিতীয়বার কে বলবেন কি না বুঝতে পারছি না। আগের বার বলেননি—সরাসরি দরজা খুলেছেন। আজ আমি মিসির আলি সাহেবের জন্যে কিছু উপহার নিয়ে এসেছি। এক পট ব্রাজিলিয়ান কফি। ইভাপোরোটেড মিল্কের একটা কৌটা এবং এক বাক্স সুগার কিউবস। কফি বানিয়ে চায়ের চামচে মেপে মেপে চিনি দিতে হবে না। সুগার কিউব ফেলে দিলেই হবে। একটা সুগার কিউব মানে এক চামচ চিনি। দুটা মানে দু-চামচ।

উপহার আনার পেছনের ইতিহাসটা বলা যাক। শতাব্দী স্টোরে আমি গিয়েছিলাম টেলিফোন করতে। এমনিতে শতাব্দী স্টোরের লোকজনদের ব্যবহার খুব ভাল, শুধু টেলিফোন করতে গেলে খারাপ ব্যবহার করে। টেলিফোন নষ্ট, মালিকের নিষেধ আছে, চাবি নেই—নানান টালবাহানা করে। শেষ পর্যন্ত দেয় তবে টেলিফোন শেষ হওয়ামাত্র বলে, পাঁচটা টাকা দেন। কল চার্জ। আজও তা-ই হল। আমি হাতের মুঠা থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট বের করলাম।

'ভাংতি দেন।'

'ভাংতি নেই। আর শুনুন, আপনাকে টাকা ফেরত দিতে হবে না। এখন যে-কলটা করেছি সেটা পাঁচশো টাকা দামের কল। আমার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলেছি, ওর নাম রূপা। আরেকটা

কথা শুনুন ভাই—আমি যতবার আপনাদের এখান থেকে রূপার সঙ্গে কথা বলব ততবারই আপনাদের পাঁচশো করে টাকা দেব। তবে অন্য কলে আগের মতো পাঁচ টাকা। ভাই যাই?'

বলে আমি হনহন করে পথে চলে এসেছি—দোকানের এক কর্মচারী এসে আমাকে ধরল। শতাব্দী স্টোরের মালিক ডেকেছেন। আমাকে যেতেই হবে, না গেলে তার চাকরি থাকবে না।

আমি মালিকের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ফিরে গেলাম। নিতান্ত অল্পবয়েসি একটা ছেলে। গোলাপি রঙের হাওয়াই শার্ট পরে বসে আছে। সুন্দর চেহারা। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক হিসেবে তাকে মানাচ্ছে না। তাকে সবচে মানাতো যদি টিভি সেটের সামনে বসে ক্রিকেট খেলা দেখতো এবং কোনো ব্যাটসম্যান ছক্কা মারলে লাফিয়ে উঠত।

শতাব্দী স্টোরের মালিক আমাকে অতি যত্নে বসাল। কফি খাওয়াল। আমি কফি খেয়ে বললাম, অসাধারণ! জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতোই অসাধারণ।

সে বলল, কোন কবিতা?

আমি আবৃত্তি করলাম—

"পুরানো পেঁচারা সব কোটরের থেকে
এসেছে বাহির হয়ে অন্ধকার দেখে
মাঠের মুখের পরে,
সবুজ ধানের নিচে—মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে—আঁটির ভিতর থেকে চ'লে গেছে চাষা,
শস্যের ক্ষেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা!"

শতাব্দী স্টোরের মালিক তার এক কর্মচারীকে ডেকে বলল, উনাকে সবচে ভাল কফি এক টিন দাও, ইভাপোরেটেড দুধের একটা টিন, সুগার কিউব দাও।

আমি থ্যাংকস বলে উপহার গ্রহণ করলাম। তারপর ছেলেটা বলল, এখন থেকে দোকানে উনি এলে প্রথম জিজ্ঞেস করবে ওনার কী লাগবে। যা লাগবে দেবে। কোনো বিল করতে পারবে না। উনি ঢোকামাত্র আমার ঘরে নিয়ে যাবে। সেখানে টেলিফোন আছে। উনি যত ইচ্ছা টেলিফোন করতে পারবেন।

ব্যবসায়ী মানুষ (তার বয়স যত অল্পই হোক) এমন ফ্রি পাস দেয় না। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। ছেলেটা বলল, আমি আপনাকে চিনি। আপনি হিমু। দোকানের লোকজন আপনাকে চিনেত পারেনি—ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। এখন বলুন আপনি কোথায় যাবেন। ড্রাইভার আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

ড্রাইভার আমাকে মিসির আলি সাহেবের বাসার সামনে নামিয়ে দিয়ে গেছে। আমি কড়া নেড়ে অপেক্ষা করছি কখন মিসির আলি সাহেব দরজা খোলেন। দ্বিতীয়বার কড়া নাড়তে ইচ্ছা করছে না। সাধারণ মানুষের বাসা হলে কড়া নাড়তাম, এই বাসায় থাকেন মিসির আলি। কিংবদন্তি পুরুষ। প্রথম কড়া নাড়ার শব্দেই তাঁর বুঝে যাবার কথা কে এসেছে, কেন এসেছে।

দরজা খুলল। মিসির আলি সাহেব বললেন, কে? হিমু সাহেব?

'জি স্যার।'

'মাথা কামিয়েছেন। আপনাকে ঋষি-ঋষি লাগছে।'

আমি ঋষিসুলভ হাসি হাসলাম। তিনি সহজ গলায় বললেন, আজ এত সকাল-সকাল এসেছেন, ব্যাপার কী? রাত মোটে ন'টা বাজে। হাতে কী?

'আপনার জন্যে সামান্য উপহার। কফি, দুধ, চিনি।'

মিসির আলি সাহেবের চোখে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। আমি বললাম, স্যার, আপনার রাতের খাওয়া কি হয়ে গেছে?

'হ্যাঁ, হয়েছে।'

'তা হলে আমাকে রান্নাঘরে যাবার অনুমতি দিন, আমি আপনার জন্যে কফি বানিয়ে নিয়ে আসি।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

আমি মিসির আলি সাহেবের সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকলাম। রান্নাঘরটা আমার পছন্দ হল। মনে হচ্ছে রান্নাঘরটাই আসলে তাঁর লাইব্রেরি। তিনটা উঁচু বেতের চেয়ার, শেলফভরতি বই। রান্না করতে করতে হাত বাড়ালেই বই পাওয়া যায়। রান্নাঘরে একটা ইজিচেয়ারও আছে। ইজিচেয়ারের পায়ের কাছে ফুটরেস্ট। বোঝাই যাচ্ছে ফুটরেস্টে পা রেখে আরাম করে বই পড়ার ব্যবস্থা।

মিসির আলি চুলা ধরাতে ধরাতে বললেন, রান্নাঘরে এত বইপত্র দেখে আপনি কি অবাক হচ্ছেন?

'জি না। আমি কোনোকিছুতেই অবাক হই না।'

'আসলে কী হয় জানেন? হয়তো চা খাবার ইচ্ছা হল। চুলায় কেতলি বসালাম। পানি ফুটতে অনেক সময় লাগছে। চুপচাপ অপেক্ষা করতে খুব খারাপ লাগে। তখন বই পড়া শুরু করি। চুলায় কেতলি বসিয়ে আমি একুশ পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে পানি ফুটে যায়। এই থেকে আপনি আমার বই পড়ার স্পিড সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন।'

আমরা কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বসার ঘরে এসে বসলাম। মিসির আলি বললেন, আপনার গলায় কি মাছের কাঁটা ফুটেছে? লক্ষ করলাম অকারণে ঢোক গিলছেন।

আমি বললাম, জি।

'শুধু শুধু কষ্ট করছেন কেন? কাঁটা তোলার ব্যবস্থা করেন—মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে গেলেই ওরা চিমটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলবে।'

'আমি কাঁটার যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছি। মানুষ তো ক্যানসারের মতো ব্যাধিও শরীরে নিয়ে বাস করে, আমি সামান্য কাঁটা নিয়ে পারব না?'

মিসির আলি হাসলেন। ছেলেমানুষি যুক্তি শুনে বয়স্করা যে-ভঙ্গিতে হাসে সেই ভঙ্গির হাসি। দেখতে ভাল লাগে।

'হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আমি আপনার ভয় পাবার ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।'

'রহস্যের সমাধান হয়েছে?'

'ভয়ের কার্যকারণ সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছি। এইটিই সঠিক ব্যাখ্যা কি না তা প্রমাণসাপেক্ষ। ব্যাখ্যা শুনতে চান?'

'বলুন।'

মিসির আলি কফির কাপ নামিয়ে সিগারেট ধরালেন। সামান্য হাসলেন। সেই হাসি অতি দ্রুত মুছেও ফেললেন। কথা বলতে শুরু করলেন শান্ত গলায়। যেন তিনি নিজের সঙ্গেই কথা বলছেন, অন্য কারোর সঙ্গে নয়। যেন তিনি যুক্তি দিয়ে নিজেকেই বোঝানোর চেষ্টা করছেন—

'হিমু সাহেব, আমার ধারণা যে-ভয়ের কথা আপনি বলছেন—এই ভয় অতি শৈশবেই আপনার ভেতর বাসা বেঁধেছে। কেউ একজন হয়তো এই ভয়ের বীজ আপনার ভেতর পুঁতে রেখেছিল যাতে পরবর্তী কোনো এক সময় বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। তীব্র ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে।

অতি শৈশবের তীব্র ভয় অনেক অনেক কাল পরে ফিরে আসে। এটা একটা রিকারিং ফেনোমেনা। মনে করুন তিন বছরের কোনো শিশু পানিতে ডুবে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গেল। তাকে শেষ মুহূর্তে পানি থেকে উদ্ধার করা হল। সে বেঁচে গেল। পানিতে ডোবার ভয়ংকর স্মৃতি

তার থাকবে না। সে স্বাভাবিকভাবে বড় হবে। কিন্তু ভয়ের এই অংশটি কিন্তু তার মাথা থেকে যাবে না। মস্তিষ্কের স্মৃতি-লাইব্রেরিতে সেই স্মৃতি জমা থাকবে। কোনো কারণে যদি হঠাৎ সেই স্মৃতি বের হয়ে আসে তা হলে তার সমগ্র চেতনা প্রচণ্ড নাড়া খাবে। সে ভেবেই পাবে না, ব্যাপারটা কী। আপনি কি শৈশবে কখনো পানিতে ডুবেছেন?'

'হ্যাঁ, চৌবাচ্চায় ডুবে গিয়েছিলাম।'

'ঘটনাটা বলুন তো!'

'ঘটনা আমার মনে নেই। বাবার ডায়েরি পড়ে জেনেছি। আমার বাবা আমাকে নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। মৃত্যুভয় কী এটা আমাকে বোঝানোর জন্যে তিনি একটা ভয়ংকর পরীক্ষা করেছিলেন। চৌবাচ্চায় পানি ভরতি করে আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল স্টপওয়াচ। তিনি স্টপওয়াচ দেখে পঁচাত্তর সেকেন্ড আমাকে পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিলেন।'

'আপনার বাবা কি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন?'

'একসময় আমার মনে হত তিনি মানসিক রোগী। এখন তা মনে হয় না। বাবার কথা থাক। আপনি আমার সম্পর্কে বলুন। আমি মানসিক রোগী কি না সেটা জানা আমার পক্ষে জরুরি।'

'অতি শৈশবের একটা তীব্র ভয় আপনার ভেতর বাসা বেঁধে ছিল। আমার ধারণা সেই ভয়ের সঙ্গে আরও ভয় যুক্ত হয়েছে। মস্তিষ্কের মেমোরি সেলে ভয়ের ফাইল ভারী হয়েছে। একসময় আপনি সেই ভয় থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করেছেন। তখনই ভয়টা মূর্তিমান হয়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়েছে। সে চাচ্ছে না আপনি তাকে অস্বীকার করুন।'

'স্যার, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন—ঐ রাতে আমি যা দেখেছি সবই আমার কল্পনা?'

'না। বেশির ভাগই সত্যি। তবে সেই সত্যটাকে কল্পনা ঢেকে রেখেছে।'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। ঐ রাতে আপনি ছিলেন খুব ক্লান্ত। আপনার স্নায়ু ছিল অবসন্ন।'

'খুব ক্লান্ত ছিলাম, স্নায়ু অবসন্ন ছিল বলছেন কেন?'

'আপনার কাছ থেকে শুনেই বলছি। সারা রাত আপনি হেঁটেছেন। জোছনা দেখেছেন। তারপর ঢুকলেন গলিতে। দীর্ঘ সময় কোনো একটি বিশেষ জিনিস দেখায় ক্লান্তি আসে। স্নায়ু অবসন্ন হয়।'

'ঠিক আছে, বলুন।'

'আপনাকে দেখে কুকুররা সব দাঁড়িয়ে গেল। একটি এগিয়ে এল সামনে, তাই না?'

'জি।'

'কুকুরদের দলপতি আবার ঐ ভয়ংকর মূর্তি যখন এল তখন কুকুররা তার দিকে ফিরল। দলপতি এগিয়ে গেল সামনে। দেখুন হিমু সাহেব, কুকুররা যা করেছে তা হচ্ছে কুকুরদের জন্যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড। তারা উদ্ভট কিছু করেনি। অথচ তাদের এই স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডই আপনার কাছে খুব অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। কারণ আপনি নিজে স্বাভাবিক ছিলেন না। আপনার মধ্যে একধরনের ঘোর কাজ করা শুরু করেছে। শৈশবের সমস্ত ভয় বাক্স ভেঙে বের হয়ে আসা শুরু করেছে।'

'তারপর?'

'আপনি শুনলেন লাঠি ঠকঠক করে কে যেন আসছে। আপনি যদি স্বাভাবিক থাকতেন তা হলে কিন্তু লাঠির ঠকঠক শব্দ শুনে ভয়ে অস্থির হতেন না। লাঠি ঠকঠক করে কেউ আসতেই পারে। আপনি খুবই অস্বাভাবিক অবস্থায় ছিলেন বলেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে। আপনার মস্তিষ্ক অসম্ভব উত্তেজিত। সে বিচিত্র খেলা শুরু করেছে। আপনার স্বাভাবিক দৃষ্টি সে এলোমেলো করতে শুরু করেছে। আপনি মানুষটা দেখলেন। চাদর-গায়ে একজন মানুষ যার চোখ নেই, মুখ নেই। ঠিক না?'

'জি।'

'আমার ধারণা আপনি অ্যাসিডে ঝলসে যাওয়া একজন অন্ধকে দেখেছেন। অন্ধ বলেই সে লাঠি-হাতে হাঁটাচলা করে। আপনাকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। লাঠি উঁচু করল আপনার দিকে। একজন অন্ধের পক্ষে আপনার উপস্থিতি বুঝতে পারা কোনো ব্যাপার না। অন্ধদের অন্যান্য

ইন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ থাকে। অবশ্যি অন্ধ না হয়ে একজন কুষ্ঠরোগীও হতে পারে। কুষ্ঠরোগীও এমন বিকৃত হতে পারে। আমি নিজে কয়েকজনকে দেখেছি।'

আমি বললাম, স্যার একটা কথা, আমি দেখেছি মানুষটা যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন তাকে খুব লম্বা দেখাচ্ছিল।

'আপনি যা দেখেছেন তা আর কিছুই না, লাইট অ্যান্ড শেডের একটা ব্যাপার। গলিতে একটা মানুষকে দাঁড় করিয়ে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে আলো তার গায়ে ফেলে পরীক্ষাটা করতে পারেন। দেখবেন আলো কোথেকে ফেলছেন, এবং সেই আলো ফেলার জন্যে তার ছায়া কতবড় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে তাকে কত লম্বা মনে হচ্ছে। একে বলে 'optical illusion'—ম্যাজিশিয়ানরা optical illusion-এর সাহায্যে অনেক মজার মজার খেলা দেখান।'

'পুরো ব্যাপারটা আপনার কাছে এত সহজ মনে হচ্ছে?'

'জি, মনে হচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত জটিল সূত্রগুলির মূল কথা খুব সহজ। আপনি যে আপনার মাথার ভেতর শুনলেন কে বলছে ফিরে যাও, ফিরে যাও—তার ব্যাখ্যাও খুব সহজ ব্যাখ্যা। আপনার অবচেতন মন আপনাকে ফিরে যেতে বলছিল।'

'আমি কি আপনার সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেব, না নিজে পরীক্ষা করে দেখব?'

'সেটা আপনার ব্যাপার।'

'আমার কেন জানি মনে হয় ঐ জিনিসটার মুখোমুখি দাঁড়ানো মানে আমার মৃত্যু—সে আমাকে ছাড়বে না।'

'তাহলে তো আপনাকে অবশ্যই ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হতে হবে।'

'যদি না হই?'

'তা হলে সে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে। আজ একটা গলিতে সে আছে। কাল চলে আসবে রাজপথে। একটি গলি যেমন আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি শুরুতে একটা রাজপথও আপনার জন্যে নিষিদ্ধ হবে, তারপর আরও একটা। তারপর একসময় দেখবেন শহরের সমস্ত পথঘাট নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আপনাকে শেষ পর্যন্ত ঘরে আশ্রয় নিতে হবে। সেখানেও যে স্বস্তি পাবেন তা না—মাঝরাতে হঠাৎ মনে হবে দরজার বাইরে ঐ অশরীরী দাঁড়িয়ে, দরজা খুললেই সে ঢুকবে...

আমি চুপ করে রইলাম।

মিসির আলি হাসিমুখে বললেন, আপনার বাবা বেঁচে থাকলে তিনি আপনাকে কী উপদেশ দিতেন?

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, আপনি যে-উপদেশ দিচ্ছেন সেই উপদেশই দিতেন। আচ্ছা স্যার, আজ উঠি।

'উঠবেন? আচ্ছা—কফির জন্যে ধন্যবাদ।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মানুষের কি থট রিডিং ক্ষমতা আছে?'

'থাকতে পারে। পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। তবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের এই ক্ষমতা সম্ভবত আছে। ডিউক ইউনিভার্সিটিতে একবার একটা গবেষণা করা হয়েছিল। পঞ্চাশটা ইঁদুরকে দুটা থালায় করে খাবার দেয়া হত। একটা থালার নম্বর ১ এবং অন্যটার নম্বর শূন্য। খাবার দেবার সময় মনে মনে ভাবা হত শূন্য নাম্বার থালার খাবার যে-ইঁদুর খাবে তাকে মেরে ফেলা হবে। দেখা গেল শূন্য নাম্বার থালার খাবার কোনো ইঁদুর স্পর্শ করছে না। অথচ একই খাবার।'

'আপনার ধারণা ইঁদুর মানুষের মনের কথা বুঝত বলেই এটা করত?'

'হতে পারে।'

'আপনি থট রিডিং-এর ক্ষমতা আছে এমন কোনো মানুষের দেখা পাননি?'

'পেয়েছি। তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারিনি। নিশ্চিত হতে ইচ্ছাও করেনি। থাকুক-না কিছু রহস্য!'

'স্যার যাই।'

'আচ্ছা।'

মিসির আলি সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

আমি রাস্তায় নেমে দেখলাম সুন্দর জোছনা হয়েছে—

কোথায় যাওয়া যায়?

কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না। পথে-পথে হাঁটতেও ভাল লাগছে না। ভ্রমণের নেশায় মাতাল ভূপর্যটকও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন হাঁটতে ভাল লাগছে না। পরম শ্রদ্ধেয় সাধু যিনি প্রতি সন্ধ্যায় মুণ্ডিত মস্তকে বৎসদের নানান জ্ঞানের কথা বলেন তিনিও কি একসময় ক্লান্ত হয়ে বলেন, আর ভাল লাগছে না। মানুষের শরীরযন্ত্রের দুটি তার। একটিতে ক্রমাগতই বাজে— "ভাল লাগছে", "ভাল লাগছে"। অন্যটিতে বাজে "ভাল লাগছে না", "ভাল লাগছে না"। দুটি তার একসঙ্গেই বাজতে থাকে। একটি উঁচুস্বরে তারায় অন্যটি মন্দ্রসপ্তকে। কারও কারও কোনো একটি তার ছিঁড়ে যায়। আমার বেলায় কী হচ্ছে? 'ভাল লাগছে' তারটি কি ছিঁড়ে গেছে?

ঘরে ফিরে যাব? চারদেয়ালে নিজেকে বন্দি করে ফেলব? সেই ইচ্ছাও করছে না। আমি আশরাফুজ্জামান সাহেবের সন্ধানে রওনা হলাম। তিনি কি কন্যার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছেন? মনে হয় না। অতি আদরের মানুষের অবহেলা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ বড়ই অভিমানী প্রাণী।

আশরাফুজ্জামান সাহেব বাসাতেই ছিলেন। আমাকে দেখে যন্ত্রের মতো গলায় বললেন, কেমন আছেন?

আমি বললাম, ভাল আছি। আপনি কী করছেন?

'কিছু করছি না। শুয়ে ছিলাম।'

'শরীর খারাপ?'

'জি না, শরীর খারাপ না। শরীর ভাল।'

'খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না। রান্না করিনি।'

'আপনার কন্যার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'জি না। ওরা চিটাগাং গেছে। ওর শ্বশুরবাড়ি চিটাগাং।'

'যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করে যায়নি?'

'আমাকে নেবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল, আমার যেতে ইচ্ছা করছিল না।'

'আমি আপনাকে নিতে এসেছি।'

'কোথায় নিয়ে যাবেন?'

'তেমন কোথাও না। পথে-পথে হাঁটব। জোছনারাতে পথে হাঁটতে অন্যরকম লাগে, যাবেন?'

'জি না।'

'পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি আপনার মেয়ের গল্প করবেন, আমি শুনব। তার সব গল্প শোনা হয়নি। যাবেন?'

'আচ্ছা চলুন।'

আমরা পথে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম তাঁকে নিয়ে প্রচুর হাঁটব। হাঁটতে হাঁটতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন—শরীর যতই অবসাদগ্রস্ত হবে মন ততই হালকা হবে।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি বোধহয় ভাবছেন আমি মেয়ের উপর খুব রাগ করেছি। আসলে রাগ করিনি। কারণ রাগ করব কেন বলুন, আমি তো আসলেই তার বিয়ে ভেঙেছি। উড়োচিঠি দিয়েছি, টেলিফোনে খবর দিয়েছি।'

'নিজের ইচ্ছায় তো করেননি। আপনার স্ত্রী আপনাকে করতে বলেছেন, আপনি করেছেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'খুবই সত্যি কথা, কিন্তু আমার মেয়ে বিশ্বাস করে না। তার মা'র সঙ্গে যে আমার কথাবার্তা হয় এটাও বিশ্বাস করে না।'

'অল্প বয়সে সবকিছু অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। বয়স বাড়লে ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই। আমার আত্মীয়স্বজনরা ক্রমাগত তার কানে মন্ত্রণা দেয়। আমি যে কী ধরনের মন্দলোক এটা শুনতে শুনতে সেও বিশ্বাস করে ফেলেছে।'

'আপনি মন্দলোক?'

'ওদের কাছে মন্দলোক। মেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে নিই না। নিজে নিজে হোমিওপ্যাথি করি। এইসব আর কি...'

'ওরা তো জানে না, আপনি যা করেন স্ত্রীর পরামর্শে করেন।'

'জানে। ওদের বলেছি, কিন্তু ওরা বিশ্বাস করে না।'

'মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?'

'জি না।'

'আশ্চর্য তো!'

'আমি নিজেও খুব আশ্চর্য হয়েছি। আজ সন্ধ্যা থেকে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে ছিলাম। সে থাকলে অবশ্যই কথা বলতো। সে নেই।'

'আশরাফুজ্জামান সাহেব, এমনও তো হতে পারে যে তিনি কোনোকালেই ছিলেন না। আপনার অবচেতন মন তাঁকে তৈরি করেছে। হতে পারে না?'

আশরাফুজ্জামান সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি?'

'খিদে লেগেছে?'

'জি।'

'আসুন খাওয়াদাওয়া করি।'

'আপনি খান। আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আমি এখন বাসায় চলে যাব। আপনার সঙ্গে ঘুরতে ভাল লাগছে না। আপনাকে আমি পছন্দ করতাম কারণ আমার ধারণা ছিল আপনি আমার স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করেন।'

'আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করি বা না-করি—আপনাকে তো করি। সেটাই কি যথেষ্ট না?'

'না।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হনহন করে এগুচ্ছেন। আমার খুব মায়া লাগছে। রাগ ভাঙিয়ে ভদ্রলোককে রাতের ট্রেনে তুলে দেয়া যায় না? তূর্ণা নিশিথায় তুলে দেব। সেই ট্রেন চিটাগাং পৌঁছায় ভোররাতে। আশরাফুজ্জামান সাহেব ট্রেন থেকে নেমে দেখবেন স্টেশনে তাকে নিতে মেয়ে এবং মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছে। বাস্তবের সব গল্পের সুন্দর সুন্দর সমাপ্তি থাকলে ভাল হয়। বাস্তবের গল্পগুলির সমাপ্তি ভাল না। বাস্তবের অভিমানী বাবারা নিজেদের অভিমান এত সহজে ভাঙে না। রূপকথার মতো সমাপ্তি বাস্তবে হয় না।

'আশরাফুজ্জামান সাহেব! এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়ান তো!'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দাঁড়ালেন। আমি দৌড়ে তাঁকে ধরলাম।

'চলুন আপনাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দি।'

'দরকার নেই। আমি বাসা চিনে যেতে পারব।'

'আপনার জন্যে বলছি না। আমি আমার নিজের জন্যে বলছি। আমার একটা সমস্যা হয়েছে, আমি একা একা রাতে হাঁটতে পারি না। ভয় পাই।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব শান্তগলায় বললেন, চলুন যাই।

আমরা হেঁটে হেঁটে ফিরছি, কেউ কোনো কথা বলছি না। আশরাফুজ্জামান সাহেবের গাল চকচক করছে। তিনি কাঁদছেন। কান্নাভেজা গালে চাঁদের ছায়া পড়েছে।

চোখের জলে চাঁদের ছায়া আমি এই প্রথম দেখছি। অদ্ভুত তো! ভেজা গালে চাঁদের আলো নিয়ে কি কোনো কবিতা লেখা হয়েছে? কোনো গান?

'আশরাফুজ্জামান সাহেব!'

'জি।'

'মেয়ের উপর রাগ কমেছে?'

'ওর উপর আমার কখনো রাগ ছিল না। আচ্ছা হিমু সাহেব, আজি কি পূর্ণিমা?'

'জি না। আজ পূর্ণিমা না। পূর্ণিমার জন্যে আপনাকে আরও তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, একা একা জীবনটা কীভাবে কাটাব বুঝতে পারছি না। বিষ খেয়ে মরে গেলে কেমন হয় বলুন তো!

'মন্দ হয় না।'

'মেয়েটা কষ্ট পাবে। মেয়েটা ভাববে তার উপর রাগ করে বিষ খেয়েছি।'

'তাকে সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখে যাবেন। ভালমতো সব ব্যাখ্যা করবেন, তা হলেই হবে। তার পরেও কষ্ট পাবে। সেই কষ্ট দীর্ঘস্থায়ী হবে না।'

'দীর্ঘস্থায়ী হবে না কেন?'

'আপনার মেয়ে তার সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। তার সংসারে ছেলেপুলে আসবে। কারও হাম হবে, কারোর হবে কাশি। ওদের বড় করা, স্কুলে ভরতি করানো, হোমওয়ার্ক করানো, ঈদে নতুন জামা কেনা, অনেক ঝামেলা। দোকানের পর দোকান দেখা হবে, ফ্রকের ডিজাইন পছন্দ হবে না। এত সমস্যার মধ্যে কে আর বাবার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামাবে!'

আশরাফুজ্জামান সাহেব হেসে ফেললেন। সহজ স্বাভাবিক হাসি। মনে হচ্ছে তাঁর মন থেকে কষ্টবোধ পুরোপুরি চলে গেছে।

'হিমু সাহেব!'

'জি?'

'আপনি মানুষটা খুব মজার।'

'মজার মানুষ হিসেবে আপনাকে মজার একটা সাজেশান দেব?'

'দিন।'

'চলুন আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনে চলে যাই। আপনি তূর্ণা নিশিথায় চেপে বসুন। অন্ধকার থাকতে থাকতে চিটাগাং রেলস্টেশনে নামবেন। নেমেই দেখবেন আপনার মেয়ে এবং মেয়ে–জামাই দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের চোখভরতি জল। সে ছুটে এসে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।'

আশরাফুজ্জামান শব্দ করে হাসলেন। আমি বললাম, হাসছেন কেন?

'আপনার উদ্ভট কথাবার্তা শুনে হাসছি।'

'পৃথিবীটা ভয়ংকর উদ্ভট। কাজেই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা—মাঝেমধ্যে করা যায়।'

'সবচে বড় কথা কী জানেন হিমু সাহেব? এখন বাজছে রাত বারোটা! তূর্ণা নিশিথা চলে গেছে।'

'আমার মনে হচ্ছে যায়নি। লেট করছে।'

'শুধু শুধু লেট করবে কেন?'

'লেট করবে—কারণ এই ট্রেনে চেপে এক অভিমানী পিতা আজ রাতে তাঁর কন্যার কাছে যাবেন। আমি নিশ্চিত আজ ট্রেন লেট।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত। কারণ আমি হচ্ছি হিমু। পৃথিবীর রহস্যময়তা আমি জানি। ট্রেন যে আজ লেট হবে এই বিষয়ে আপনি বাজি ধরতে চান?'

'হ্যাঁ চাই। বলুন কী বাজি?'

'ট্রেন যদি সত্যি সত্যি লেট হয় তা হলে আপনি সেই ট্রেনে চেপে বসবেন।'

আশরাফুজ্জামান সাহেব চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না কী করবেন। আমি বেবিট্যাক্সির সন্ধানে বের হলাম। দেরি করা যাবে না—অতি দ্রুত কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছতে হবে। আন্তঃনগর ট্রেন অনন্তকাল কারোর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না।

ট্রেন লেট ছিল।

আমরা যাবার পনেরো মিনিট পর ট্রেন ছাড়ল। চলন্ত ট্রেনের জানালা থেকে প্রায় পুরো শরীর বের করে আশরাফুজ্জামান সাহেব আমার দিকে হাত নাড়ছেন। তাঁর মুখভরতি হাসি, কিন্তু গাল আবারও ভিজে গেছে। ভেজা গালে স্টেশনের সরকারি ল্যাম্পের আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে চাঁদের আলো।

১০

ঘুম ভাঙতেই প্রথম যে-কথাটা আমার মনে হল তা হচ্ছে—'আজ পূর্ণিমা'। ভোরের আলোয় পূর্ণিমার কথা মনে হয় না। সূর্য ডোবার পরই মনে হয়—রাতটা কেমন হবে? শুক্লপক্ষ, না কৃষ্ণপক্ষ? আমি অন্যান্যদের মতোই দিনের আলোয় চাঁদের পক্ষ নিয়ে ভাবি না। কিন্তু আজ অন্য ব্যাপার। আজ রাতের চাঁদের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আজ মধ্যরাতে আমি সেই বিশেষ গলিটার সামনে দাঁড়াব। লাঠিহাতের ঐ মানুষটার মুখোমুখি হব। মিসির আলির ধারণা—সে আর কিছুই না সাধারণ রোগগ্রস্ত একজন মানুষ। কিংবা এক অন্ধ। চাঁদের আলোয় লাঠিহাতে যে বের হয়ে আসে। চাঁদের আলো তাকে স্পর্শ করে না।

আমার ধারণা তা না। আমার ধারণা সে অন্যকিছু। তার জন্ম এই ভুবনে না, অন্য কোনো ভুবনে। যে-ভুবনের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তার জন্ম আলোতে নয়—আদি অন্ধকারে।

জানালার কাছে একটা কাক এসে বসেছে। মাথা ঘুরিয়ে সে আমাকে দেখছে। তার চোখে রাজ্যের কৌতূহল। আমি দিনের শুরু করলাম কাকের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

'হ্যালো মিস্টার ক্রো, হাউ আর ইউ?'

কাক বলল—কা কা।

তার ধ্বনির অনুবাদ আমি মনে মনে করে নিলাম। সে বলছে, ভাল আছি। তুমি আজ এত ভোরে উঠেছ কেন? কাঁথাগায়ে শুয়ে থাকো। মানব সম্প্রদায়ে তোমার জন্ম। তুমি মহাসুখিজনদের একজন। খাবারের সন্ধানে সকাল থেকে তোমাকে উড়তে হয় না।

আমি বললাম, মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক দুঃখ আছে রে পাখি! অনেক দুঃখ।

'দুঃখের চেয়ে সুখ বেশি।'

'জানি না। আমার মনে হয় না।'

'আমার মনে হয়—এই যে তুমি এখন উঠবে, এক কাপ গরম চা খাবে, একটা সিগারেট ধরাবে—এই আনন্দ আমরা কোথায় পাব! আমাদেরও তো মাঝে মাঝে চা খেতে ইচ্ছে করে।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই।'

আমি বিছানা থেকে নামলাম। দুকাপ চায়ের কথা বলে বাথরুমে ঢুকলাম। হাতমুখ ধুয়ে নতুন একটা দিনের জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করা। আজকের দিনটা আমার জন্যে একটা বিশেষ দিন। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত আমি পরিচিত সবার সঙ্গে কথা বলব। দিনটা খুব আনন্দে কাটাব। সন্ধ্যার পর দিঘির পানিতে গোসল করে নিজেকে পবিত্র করব—তারপর চাঁদের আলোয় তার সঙ্গে আমার দেখা হবে। হাতে-মুখে পানি দিতে দিতে দ্রুত চিন্তা করলাম—কাদের সঙ্গে আমি কথা বলব—

রূপা

আজ তার সঙ্গে কথা বলব প্রেমিকের মতো। তাকে নিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটিও করা যেতে পারে। একগাদা ফুল কিনে তার বাড়িতে উপস্থিত হব। রক্তের মতো লাল রঙের গোলাপ।

ফুপা-ফুপু

তাঁরা কি কক্সবাজার থেকে ফিরেছেন? না ফিরে থাকলে টেলিফোনে কথা বলতে হবে। কক্সবাজারে কোন হোটেলে উঠেছেন তাও তো জানি না। বড় বড় হোটেল সব ক'টায় টেলিফোন করে দেখা যেতে পারে।

মিসির আলি

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। দুপুরের খাওয়াটা তাঁর সঙ্গে খেতে পারি। তাঁকে আজ রাতের অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা বলা যেতে পারে...

আচ্ছা, দিঘি কোথায় পাব? ঢাকা শহরে সুন্দর দিঘি আছে না? কাকের চোখের মতো টলটলে পানি।

'স্যার চা আনছি।'

আমি চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। এক কাপ চা জানালার পাশে রেখে দিলাম—মি. ক্রো যদি খেতে চান খাবেন।

আশ্চর্য, কাকটা ঠোঁট ডোবাচ্ছে গরম চায়ে। কক কক করে কী যেন বলল। ধন্যবাদ দিল বলে মনে হচ্ছে। পশুপাখির ভাষাটা জানা থাকলে খুব ভাল হত। মজার মজার তথ্য অনেক কিছু জানা যেত। পশুপাখির ভাষা জানাটা খুব কি অসম্ভব? আমাদের এক নবী ছিলেন না যিনি পশুপাখির কথা বুঝতেন? হযরত সুলাইমান আলায়হেস সালাম। তিনি পাখিদের সঙ্গে কথা বলতেন। কোরান শরীফে আছে—পিঁপড়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে। একটা পাখিও তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল, পাখির নাম হুদ হুদ। সূরা সাদে তার সুন্দর বর্ণনা আছে।

হুদ হুদ পাখি এসে বলল, "আমি এমন সব তথ্য লাভ করেছি, যা আপনার জানা নেই। আর আমি 'সেবা' থেকে আসল খবর নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে দেখলাম যে জাতির উপর রাজত্ব করছে। তার সবই আছে, এবং আছে এক বিরাট সিংহাসন।"

হুদ হুদ পাখি বলেছিল সেবার রানির কথা। কুইন অব সেবা—'বিলকিস'।

হুদ হুদ পাখিটা দেখতে কেমন? কাক নয় তো?

কাকটা চায়ের কাপ উলটে ফেলেছে। তার ভাবভঙ্গিতে অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ করছি। কেমন আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে— যেন বলার চেষ্টা করছে, Sir I am sorry, extremely sorry, I have broken the cup.

না, Broken the cup হবে না, কাপ ভাঙেনি, শুধু উলটে ফেলেছে। চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী হবে? রূপাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে। শতাব্দী স্টোর থেকে কিছু টেলিফোন করে দিনের শুরুটা করা যাক।

শতাব্দী স্টোরের লোকজন আমাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিনজন এসে জিজ্ঞেস করল, স্যার কেমন আছেন? একজন এসে অতি যত্নে মালিকের ঘরে নিয়ে বসাল। টেলিফোনের চাবি খুলে দিল। আমি বসতে বসতেই কফি চলে এল, সিগারেট চলে এল। পীর–ফকিররা যে কত আরামে জীবনযাপন করেন তা বুঝতে পারছি। শতাব্দী স্টোরের মালিক উপস্থিত নেই, কিন্তু আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

'হ্যালো, এটা কি রূপাদের বাড়ি?'

'কে কথা বলছেন?'

'আমার নাম হিমু।'

'রূপা বাড়িতে নেই। বান্ধবীর বাসায় গেছে।'

'এত সকালে বান্ধবীর বাড়িতে যাবে কীভাবে। এখনও ন'টা বাজেনি। রূপা তো আটটার আগে ঘুম থেকেই ওঠে না।'

'বলেছি তো ও বাসায় নেই।'

'আপনিতো মিথ্যা বলছেন। আপনার গলা শুনেই বুঝতে পারছি আপনি একজন দায়িত্বশীল বয়স্ক মানুষ—আপনি দিনের শুরু করেছেন মিথ্যা দিয়ে—এটা কি ঠিক হচ্ছে? আপনি চাচ্ছেন না, রূপা আমার সঙ্গে কথা বলুক—সেটা বললেই হয়—শুধু শুধু মিথ্যা বলার প্রয়োজন ছিল না।'

'স্টপ ইট।'

'ঠিক আছে স্যার, স্টপ করছি। রূপাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম—আমার মনে হয় আপনাকে জিজ্ঞেস করলেও হবে। আচ্ছা স্যার, চায়ের কাপ উলটে ফেলার ইংরেজি কী?'

খট করে শব্দ হল। ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। তিনি এখন যা করবেন তা হচ্ছে টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখবেন। এবং হয়তো বা মেয়েকে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ভদ্রলোককে প্রচুর মিথ্যা কথা আজ সারা দিনে বলতে হবে। মিথ্যা দিয়ে যিনি দিনের শুরু করেন, তাঁকে দিনের শেষেও মিথ্যা বলতে হয়।

আমি ফুপুর বাসায় টেলিফোন করলাম। ফুপুকে পাওয়া গেল। তিনি রাগে চিড়বিড় করে জ্বলছেন।

'কে, হিমু! আমার তো সর্বনাশ হয়ে গেছে, শুনেছিস কিছু?'

'না, কী হয়েছে?'

'রশীদ হারামজাদাটাকে বাসায় রেখে গিয়েছিলাম, সে টিভি, ভিসিআর সব নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। আমার আলমিরাও খুলেছে। সেখান থেকে কী নিয়েছে এখনও বুঝতে পারছি না।'

'মনে হয় গয়না-টয়না নিয়েছে।'

'না, গয়না নিতে পারবে না। সব গয়না ব্যাংকের লকারে। ক্যাশ টাকা নিয়েছে। তোর ফুপার একটা বোতলও নিয়েছে। খুব দামি জিনিস নাকি ছিল। তোর ফুপা হায়-হায় করছে।'

'এই দ্যাখো ফুপু, সব খারাপ দিকের একটা ভাল দিকও আছে। রশীদ তোমার চক্ষুশূল একটা জিনিসও নিয়ে গেছে।'

'ফাজলামি করিস না—পয়সা দিয়ে একটা জিনিস কেনা।'

'ফ্রিজে তোমাদের জন্যে চিতলমাছের পেটি রান্না করা ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল। তুই জানলি কী করে?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস। পরে বলব, এখন বলো কক্সবাজারে কেমন কাটল।'

'ভালই কাটছিল, মাঝখানে সাদেক গিয়ে উপস্থিত হল।'

'মামলা-বিষয়ক সাদেক?'

'হ্যাঁ। দেখ-না যন্ত্রণা! তাকে ঠাট্টা করে কী না কী বলেছি—সে সত্যি সত্যি মামলা টামলা করে বিশ্রী অবস্থা করেছে। বেয়াই বেয়ানের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি না। ছি ছি!'

'তোমার বেয়াই বেয়ান কেমন হয়েছে?'

'বেয়াই সাহেব তো খুবই ভাল মানুষ। অসম্ভব রসিক। কথায়-কথায় হাসছিলেন। তোর ফুপার সঙ্গে তাঁর খুবই খাতির হয়েছে। চারজনে মিলে নরক গুলজার করেছে।'

'চারজন পেলে কোথায়? ফুপা আর তাঁর বেয়াই দুজন হবে না?'

'এদের সাথে দুই ছাগলাও তো আছে—মোফাজ্জল আর জহিরুল।'

'এই দুইজন এখনও ঝুলে আছে?'

'আছে তো বটেই। তবে শোন, ছেলে দুটাকে যত খারাপ ভেবেছিলাম তত খারাপ না।'

'ভাল কাজ কী করেছে?'

'সাদেককে শিক্ষা দিয়েছে। আমি তাতে খুব খুশি হয়েছি। সাদেক সবার সামনে মামলা নিয়ে হৈচৈ শুরু করল, ওয়ারেন্ট নাকি বের হয়ে গেছে এইসব। আমি লজ্জায় বাঁচি না। কী বলব কিছু বুঝতেও পারছি না, তখন মোফাজ্জল এসে ঠাস করে সাদেকের গালে এক চড় বসিয়ে দিল।'

'সেকী!'

'খুবই আকস্মিক ঘটনা, আমি খুব খুশি হয়েছি। উচিত শিক্ষা হয়েছে। ছোট-লোকের বাচ্চা! আমাকে মামলা শেখায়!'

'মোফাজ্জল আর জহিরুল মনে হচ্ছে তোমাদের পরিবারে এন্ট্রি পেয়ে গেছে?'

'এন্ট্রি পাওয়ার কী আছে! সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, মায়া পড়ে গেছে এটা বলতে পারিস।'

'আমাদের সর্বনাশ করল এই মায়া। আমরা বাস করি মায়ার ভেতর আর চেঁচিয়ে বলি আমাদেরকে মায়া থেকে মুক্ত করো।'

'জ্ঞানের কথা বলিস না হিমু। চড় খাবি।'

'জ্ঞানের কথা না ফুপু। আমার সহজ কথা হচ্ছে মায়া সর্বগ্রাসী। এই যে রশীদ তোমার এত বড় ক্ষতি করল তার পরেও সে যখন মিডিল ইস্ট থেকে ফিরবে, জায়নামাজ, তসবি এবং মিষ্টি তেঁতুল নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তুমি কিন্তু খুশিই হবে। তুমি হাসিমুখে বলবে—কেমন আছিস রে রশীদ?'

'ঐ হারামজাদা কি মিডিল ইস্ট যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'তুই এতসব জানলি কী করে?'

'কী আশ্চর্য, আমি জানব না! আমি হচ্ছি হিমু।'

'তুই ফাজিল বেশি হয়েছিস। তোকে ধরে চাবকানো উচিত, হাসছিস কেন?'

'বাদল এবং আঁখি এরা কেমন আছে?'

'ভালই আছে। কক্সবাজারে ওরা যে-কাণ্ডটা করেছে—আমার তো লজ্জায় মাথা কাটা যাবার অবস্থা!'

'কী করেছে?'

'আরে, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হোটেলের দরজা বন্ধ করে বসা। আমরা এতগুলি মানুষ এসেছি কোনো লক্ষ্যই নেই। ডাইনিং হলে সবাই খেতে বসি, ও খবর পাঠায়—জ্বরজ্বর লাগছে। আসতে পারবে না। খাবার যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। আমার পেটের ছেলে যে এত নির্লজ্জ হবে ভাবতেই পারি না!'

'ফুপু!'

'বল কী বলবি?'

'সত্যি করে বলো তো ওদের এই ভালবাসা দেখে আনন্দে তোমার মন ভরে গেছে না? কী, কথা বলছ না কেন? তোমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল—তুমি এবং ফুপা—তোমরা কি একই কাণ্ড করনি?'

'আমরা এত বেহায়া ছিলাম না।'

'আমার তো ধারণা তোমরাও ছিলে।'

'তোর ফুপা অনেক বেহায়াপনা করেছে। বুদ্ধিকম মানুষ তো, বাদ দে ঐ সব।'

'না, বাদ দেব না। তোমরা কী ধরনের বেহায়াপনা করেছ তার একটা উদাহরণ দিতেই হবে। জাস্ট ওয়ান।'

'হিমু!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জি ফুপু?'

'তুই এত ভাল ছেলে হয়েছিস কেন বল তো?'

'আমি কি ভাল ছেলে?'

'অবশ্যই ভাল ছেলে। তুই আমার একটা কথা শোন—ভাল দেখে একটা মেয়েকে বিয়ে কর। তারপর তুই বৌমাকে নিয়ে নানান ধরনের বেহায়াপনা করবি—আমরা সবাই দূর থেকে দেখে হাসব।'

'ফুপু রাখি?' বলে আমি খট করে রিসিভার রেখে দিলাম। কারণ কথা বলতে বলতে ফুপু কেঁদে ফেলেছেন, এটা আমি বুঝতে পারছি—মাতৃশ্রেণীর মানুষের কান্নাভেজা গলার আহ্বান অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয়নি। সেই আহ্বান এই কারণেই শোনা ঠিক না।

মিসির আলি বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ?

আমি বললাম, জি না।

'দেখে মনে হচ্ছে খুব শরীর খারাপ। আপনি কি কোনো কারণে টেনশান বোধ করছেন?'

'স্যার, আজ পূর্ণিমা।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। আপনি তা হলে ভয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন?'

'জি স্যার।'

'আপনি যদি চান— আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি।'

'না, আমি চাচ্ছি না।'

'দুপুরে খাওয়াদাওয়া করেছেন?'

'জি না।'

'আমার সঙ্গে চারটা খান। খাবার অবিশ্যি খুবই সামান্য। খিচুড়ি আর ডিমভাজা। খাবেন?'

'জি খাব।'

'হাতমুখ ধুয়ে আসুন। আমি খাবার সাজাই।'

'দুজনের মতো খাবার কি আছে?'

'হ্যাঁ আছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আজ সকালে ঘুম ভেঙেই মনে হল—দুপুরে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আপনি আমার এখানে আসবেন। এইসব টেলিপ্যাথিক ব্যাপারের কোনো গুরুত্ব আমি দিই না—তার পরেও দুজনের খাবার রান্না করেছি। কেন বলুন তো?'

'বলতে পারছি না।'

'আমাদের মনের একটা অংশ রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন। আমরা অনেক কিছু জানি—তার পরেও অনেক কিছু জানি না। বিজ্ঞান বলছে— "Out of nothing, nothing can be created" তার পরেও আমরা জানি শূন্য থেকেই এই অনন্ত নক্ষত্রবীথি তৈরি হয়েছে—যা একদিন হয়তবা শূন্যেই মিলিয়ে যাবে। ভাবলে ভয়াবহ লাগে বলে ভাবি না।'

'স্যার, আপনার খিচুড়ি খুব ভাল হয়েছে।'

'ধন্যবাদ। হিমু সাহেব!'

'জি স্যার?'

'আপনি যদি মনে করেন ঐ জিনিসটার মুখোমুখি হওয়া ঠিক হবে না তা হলে বাদ দিন।'

'এই কথা কেন বলছেন?'

'বুঝতে পারছি না কেন বলছি। আমার লজিক বলছে—আপনার উচিত ভয়ের মুখোমুখি হওয়া, আবার এই মুহূর্তে কেন জানি মন সায় দিচ্ছে না। মনে হচ্ছে মস্ত কোনো বিপদ আপনার সামনে।'

আমি হাসিমুখে বললাম, এরকম মনে হচ্ছে কারণ আপনি আমার প্রতি এক ধরনের মায়া অনুভব করছেন। যখন কেউ কারও প্রতি মমতাবোধ করতে থাকে তখনই সে লজিক থেকে সরে আসতে থাকে। মায়া, মমতা, ভালবাসা যুক্তির বাইরের ব্যাপার।'

'ভাল বলেছেন।'

'এটা আমার কথা না। আমার বাবার কথা। বাবার বাণী। তিনি তাঁর বিখ্যাত বাণীগুচ্ছে তাঁর পুত্রের জন্যে লিখে রেখে গেছেন।'

'আমি কি সেগুলি পড়ে দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ পারেন। আমি বাবার খাতাটা নিয়ে এসেছি। আপনাকে দিয়ে যাব। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?'

'আমি যদি কোনোদিন ফিরে না আসি আপনি খাতার লেখাগুলি পড়বেন। আর যদি কাল ভোরে ফিরে আসি, আপনি খাতা না পড়েই আমাকে ফেরত দেবেন।'

'খুব জটিল শর্ত তো না।'

'না, শর্ত আপনার জন্যে জটিল না। আমার জন্যে জটিল।'

মিসির আলি হাসলেন। নরম গলায় বললেন, ঠিক আছে।

আমিও খাওয়া শেষ করে, খাতা তাঁর হাতে দিয়ে বের হলাম। ঘুম পাচ্ছে। পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে লম্বা ঘুম দেব। যখন জেগে উঠব তখন যেন দেখি চাঁদ উঠে গেছে।

১১

ঘুমভেঙে একটু হকচকিয়ে গেলাম। আমি কোথায় শুয়ে আছি? সবকিছু খুব অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে গহীন কোনো অরণ্যে শুয়ে আছি। চারদিকে সুনসান নীরবতা। খুব হাওয়া হচ্ছে—হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপছে। অসংখ্য পাতা এক-সঙ্গে কেঁপে উঠলে যে-অস্বাভাবিক শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় সেরকম শব্দ। ব্যাপারটা কী? আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। তাকালাম চারদিকে। না, যা ভাবছিলাম তা না।

আমি সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের একটা পরিচিত বেঞ্চিতেই শুয়েছিলাম। গাছের পাতার শব্দ বলে যা ভাবছিলাম তা আসলে গাড়ি চলাচলের শব্দ। এতবড় ভ্রান্তিও মানুষের হয়?

আকাশে চাঁদ থাকার কথা না? কই, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না তো! পার্ক অন্ধকার। পার্কের বাতি কখন জ্বলবে? ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি পূর্ণিমার রাতে শহরের সব বাতি জ্বালায় না। চাঁদই তো আছে—সব বাতি জ্বালানোর দরকার কী? এরকম ভাব।

পূর্ণিমার প্রথম চাঁদ হলুদ বর্ণের থাকে। আকারেও সেই হলুদ চাঁদটাকে খুব বড় লাগে। যতই সময় যায় হলুদ রঙ ততই কমতে থাকে। একসময় চাঁদটা ধবধবে শাদা হয়ে আবারও হলুদ হতে থাকে। দ্বিতীয়বার হলুদ হবার প্রক্রিয়া শুরু হয় মধ্যরাতের পর। আজ আমার যাত্রা মধ্যরাতে। আমি আবারও চাঁদ দেখার চেষ্টা করলাম।

'কী দেহেন?'

আমি চমকে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। ঝুপড়ির মতো জায়গায় মেয়েটা বসে আছে। নিশিকন্যাদের একজন। যে-গাছের গুঁড়িতে সে হেলান দিয়ে আছে সেটা একটা কদমগাছ। আমার প্রিয় গাছের একটি। রুবিয়েসি পরিবারের গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম—এনথোসেফালাস কাদাম্বা। গাছটা দেখলেই গানের লাইন মনে পড়ে—বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললাম, কী নাম?

সে 'থু' করে থুথু ফেলে বলল, কদম।

আসলেই কি তার নাম কদম? না সে রসিকতা করছে, কদমগাছের নিচে বসেছে বলে নিজের নাম বলছে কদম? বিচিত্র কারণে এ-ধরনের মেয়েরা রসিকতা করতে পছন্দ করে। পৃথিবী তাদের সঙ্গে রসিকতা করে বলেই বোধহয়, খানিকটা রসিকতা তারা পৃথিবীর মানুষদের ফেরত দেয়।

'তোমার নাম কদম?'

'হ।'

'যখন নারিকেল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বস তখন তোমার নাম কী হয়? নারকেল?'

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। এখন আর তাকে নিশিকন্যাদের একজন বলে মনে হচ্ছে না। পনেরো-ষোল বছরের কিশোরীর মতো লাগছে, যে সন্ধ্যাবেলা একা একা বনে বেড়াতে এসেছে। হাসি খুব অদ্ভুত জিনিস। হাসি মানুষের সব গ্লানি উড়িয়ে নিয়ে যায়।

'আমার নাম ছফুরা।'

'ছফুরার চেয়ে তো কদম নামটাই ভাল।'

'আচ্ছা যান, আফনের জন্যে কদম।'

'একেক জনের জন্যে একেক নাম? ভাল তো!'

'আফনের ভাল লাগলেই আমার ভাল।'

মেয়েটা গাছের নিচ থেকে উঠে এসে আমার পাশে বেঞ্চিতে বসে হাই তুলল। মেয়েটার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তার পরেও মনে হচ্ছে দেখতে মায়াকাড়া। কৈশোরের মায়া মেয়েটি এখনও ধরে আছে। বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। কদম শাড়ি পরে আছে। শাড়ির আঁচলে বাদাম। সে বাদাম ভেঙে ভেঙে মুখে দিচ্ছে।

'এট্টু পরে পরে আসমানের দিকে চাইয়া কী দেহেন?'

'চাঁদ উঠেছে কি না দেখি।'

'চাঁদের খোঁজ নিতাছেন ক্যান? আফনে কি চাঁদ সওদাগর?'

কদম আবারও খিলখিল করে হাসল। আমি মেয়েটির কথার পিঠে কথা বলার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হলাম।

'রাগ হইছেন?'

'রাগ হব কেন?'

'এই যে আফনেরে নিয়া তামশা করতেছি।'

'না, রাগ হইনি।'

'আমার ভিজিট পঞ্চাশ টেকা।'

'পঞ্চাশ টাকা ভিজিট?'

'হ।'

'ভিজিট দেবার সামর্থ্য আমার নেই। এই দ্যাখো পাঞ্জাবির পকেট পর্যন্ত নেই।'

'পঞ্চাশ টেকা আপনের কাছে বেশি লাগতেছে?'

'না। পঞ্চাশ টাকা বরং কম মনে হচ্ছে—
রমণীয় মন সহস্র বৎসরের সখা সাধনার ধন।'

'আপনের কাছে আসলেই টেকা নাই?'

'না।'

'সত্য বলতেছেন?'

'হ্যাঁ। আর থাকলেও লাভ হত না।'

'ক্যান, মেয়েমানুষ আফনের পছন্দ হয় না?'

'হয়। হবে না কেন?'

'আমার চেহারাছবি কিন্তু ভাল। আন্ধাইর বইল্যা বুঝতেছেন না। যখন চাঁদ উঠব—তহন দেখবেন।'

'তা হলে বসো অপেক্ষা করো। চাঁদ উঠুক।'

'আফনের কাছে ভিজিটের টেকা নাই। বইস্যা থাইক্যা ফয়দা কী?'

'কোনো ফয়দা নেই।'

AMARBOI.COM

'আফনে এইখানে কতক্ষণ থাকবেন?'
'বুঝতে পারছি না, ভালমতো চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত হয়তো থাকব।'
'তাইলে আমি এট্টু ঘুরান দিয়া আসি?'
'আসার দরকার কী?'
'আচ্ছা যান আসব না। আমার ঠেকা নাই।'
'ঠেকা না থাকাই ভাল।'
'বাদাম খাইবেন?'
'না।'
'ধরেন খান। ভাল বাদাম। নাকি খারাপ মেয়ের হাতের জিনিস খান না?'

কদম আঁচলের বাদাম বেঞ্চিতে ঢেলে দ্রুতপায়ে চলে গেল। আমি বসে বসে বাদাম খাচ্ছি। একটা হিসাবনিকাশ করতে পারলে ভাল হত—আমি আমার একজীবনে কত মানুষের অকারণ মমতা পেয়েছি, এবং কতজনকে সেই মমতা ফেরত দিতে পেরেছি। মমতা ফেরত দেবার অংশগুলি মনে থাকে। মমতা পাবার অংশগুলি মনে থাকে না। কিছুদিন পর মনেই থাকবে না কদম নামের একটি পথের মেয়ে নিজের অতি কষ্টের টাকায় কেনা বাদাম আমাকে খেতে দিয়েছিল। কিন্তু আমি যখন পথে নামব, ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষের দিকে তাকাব, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে—বস্তা-ভাই এবং বস্তা-ভাইয়ের পুত্রকে আমি একবার একটা স্লিপিং-ব্যাগ উপহার দিয়েছিলাম।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। হলুদ রঙের কুৎসিত একটা চাঁদ। চাঁদটাকে সাজবার সময় দিতে হবে। তার সাজ সম্পন্ন হোক, তারপর আমি বের হব। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠেছি, তার পরেও চোখ থেকে ঘুম যাচ্ছে না। বেঞ্চিতে আবার শুয়ে থাকা যাক। আমি শুয়ে পড়লাম। মশা খুব উৎপাত করছে, তবে কামড়াচ্ছে না। বনের মশারা কামড়ায় না। পার্কের সব বাতি জ্বলে উঠেছে। গাছপালার সঙ্গে ইলেকট্রিকের আলো একেবারেই যায় না। ইলেকট্রিকের আলোয় মনে হচ্ছে গাছগুলির অসুখ করেছে। খারাপ ধরনের কোনো অসুখ।

আমি অপেক্ষা করছি।

কিসের অপেক্ষা? আশ্চর্যের ব্যাপার, আমি অপেক্ষা করছি কদম নামের মেয়েটার জন্যে। সে আসবে, তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব। আলোর অভাবে তার মুখ ভাল করে দেখা হয়নি। এইবার দেখা হবে। সে কোথায় থাকে সেই জায়গাটাও তো দেখে আসা যায়। মেয়েটার নিজের কি কোনো সংসার আছে? পাইপের ভেতরের একার এক সংসার। যে-সংসার সে খুব গুছিয়ে সাজিয়েছে। পুরানো ক্যালেন্ডারের ছবি দিয়ে চারদিকে সাজানো। ছোট্ট ধবধবে শাদা একটা বালিশ। বালিশে ফুল তোলা। অবসরে সে নিজেই সুই সুতা দিয়ে ফুল তুলে নিজের নাম সই করেছে—কদম।

না, কদম না। মেয়েটার নাম হল ছফুরা। নামটা কি আমার মনে থাকবে? আজ মধ্যরাতে. পর আবারও যদি ফিরে আসি ছফুরা মেয়েটিকে খুঁজে বের করব। তাকে নিয়ে তার সংসার দেখে আসব। কথাগুলি মেয়েটাকে বলে যেতে পারলে ভাল হত। রাত বাড়ছে, মেয়েটা আসছে না। সে হয়তো আর আসবে না।

কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। কুয়াশা ক্রমেই ঘন হচ্ছে। আমি বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়ালাম।

এখন মধ্যরাত।

আমি দাঁড়িয়ে আছি গলির সামনে। ঐ তো কুকুরগুলি শুয়ে আছে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যই আগের মতো। কোনো বেশকম নেই। যেন আমি সিনেমা হলে বসে আছি। দেখা ছবি দ্বিতীয়বার আমাকে দেখানো হচ্ছে। ঐ রাতে কুকুরগুলির সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। কী কথা বলেছিলাম মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছে। মনে পড়েছে। আমি বলেছিলাম—তারপর তোমাদের খবর কী? জোছনা কুকুরদের খুব প্রিয় হয় বলে শুনেছি, তোমাদের এই অবস্থা কেন? মন-মরা হয়ে শুয়ে আছ।

না, এই বাক্যগুলি বলা যাবে না। কুকুররা এখন আর শুয়ে নেই। ওরা দাঁড়িয়ে আছে। তাদের শরীর শক্ত হয়ে আছে। তারা কেউ লেজ নাড়ছে না। তারা হঠাৎ চমকে উলটো দিকে ফিরল। এখন আর এদের কুকুর বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথরের মূর্তি। আমি যেন হঠাৎ প্রবেশ করেছি—প্রাণহীন পাথরের দেশে, যে-দেশে সময় থেমে গেছে। লাঠির ঠকঠক শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আসছে, সে আসছে।

মাথার ভেতরটা টালমাটাল করছে। ফিসফিস করে কে যেন কথা বলছে। গলার স্বর খুব পরিচিত, কিন্তু অনেক দূর থেকে শব্দ ভেসে আসছে বলে চিনতে পারছি না। চাপা ও গম্ভীর গলায় কে যেন ডাকছে, হিমু হিমু!

'বলুন, শুনতে পাচ্ছি।'

'আমি কে বল দেখি!'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমি তোর বাবা।'

'আপনি আমার বাবা নন। আপনি আমার অসুস্থ মনের কল্পনা। আমি প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছি বলেই আমার মন আপনাকে তৈরি করেছে। আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করছে।'

'এইগুলি তো তোর কথা না রে ব্যাটা! এগুলি মিসির আলির হাবিজাবি। তুই চলে আয়। চলে আয় বলছি।'

'না।'

'শোন হিমু। তুই তোর মা'র সঙ্গে কথা বল। এইবার আমি একা আসিনি। তোর মা'কে নিয়ে এসেছি।'

'কেমন আছ মা?'

অদ্ভুত করুণ এবং বিষণ্ন গলায় কেউ একজন বলল, ভাল আছি।

'মা শোনা—তোমার চেহারা কেমন আমি জানি না। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে তুমি দেখতে কেমন। তুমি কি জান আমার জন্মের পরপর বাবা তোমার সব ছবি নষ্ট করে ফেলেন, যাতে কোনোদিনই আমি জানতে না পারি তুমি দেখতে কেমন ছিলে?'

'এতে একটা লাভ হয়েছে না? তুই যে-কোনো মেয়ের দিকে তাকাবি তার ভেতর আমার ছায়া দেখবি।'

'মা, তুমি দেখতে কেমন?'

'অনেকটা কদম মেয়েটার মতো।'

'ওকে আমি দেখতে পাইনি।'

'জানি। হিমু শোন—তুই ঘরে ফিরে যা।'

'না।'

'তোর বাবা তোকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে—তার সব স্বপ্ন নষ্ট হয়ে যাবে।'

লাঠির ঠকঠক আরও স্পষ্ট হল। মা'র কথাবার্তা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। লাঠির শব্দ ছাড়া পৃথিবীতে এখন আর কোনো শব্দ নেই। দেখা যাচ্ছে—কুৎসিত ঐ জিনিসটাকে দেখা যাচ্ছে। সেও আমাকে দেখতে পেয়েছে—ঐ তো সে লাঠি উঁচু করল। চাঁদের আলোয় তার ছায়া পড়েনি। একজন ছায়াশূন্য মানুষ।

আমি পা বাড়ালাম। কুকুররা সরে গিয়ে আমার যাবার পথ করে দিল। আমি এগুচ্ছি। আর মাত্র কিছুক্ষণ, তার পরই আমি তার মুখোমুখি হব। আচ্ছা, শেষবারের মতো কি চাঁদের দিকে তাকিয়ে দেখব—আজ রাতের জোছনাটা কেমন?

রুমালী

১

'বকু তুই রোদে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

আমি পাশ ফিরে মা'কে দেখলাম। মা কোন ফাঁকে আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বিড়ালের চেয়েও নিঃশব্দে হাঁটতে পারেন। আশেপাশে কেউ নেই, আমি হয়ত নিজের মনে গল্পের বই পড়ছি, এক সময় হঠাৎ দেখব মায়ের মাথাটা আমার ঘাড়ের পাশে। তিনি আমাকে চমকে দিয়ে বলবেন, কী পড়ছিস? আমি যদি বলি গল্পের বই মা বলবেন, আজেবাজে গল্প নাতো? দেখি বইটা। মা বইটা হাতে নেবেন। বই এর নাম পড়বেন। নামের মধ্যে প্রেম ভালবাসা জাতীয় কিছু থাকলে তাঁর ভুরু কুঁচকে যাবে। আমি যে পাতাটা পড়ছি সেই পাতাটা পড়ে দেখবেন। এই হচ্ছে আমার মা—সাবিহা বেগম। বয়স আটত্রিশ। সেই বয়স তিনি নানান ভাবে কমানোর চেষ্টা করছেন। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। সেই ভাঁজ দূর করার অনেক চেষ্টা চলছে। তিনি কোথেকে একটা বই জোগাড় করেছেন। নজিবুর রহমান নামের এক ভদ্রলোকের লেখা—"যৌবন ধরে রাখুন"। সেই বই-এ মুখের চামড়ার ভাঁজ দূর করার যে সব প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা আছে তার কিছু কিছু প্রয়োগ করছেন। তেমন লাভ হচ্ছে না। আমার ধারণা খানিকটা ক্ষতি হচ্ছে। মা'র চোখ দু'টা ভিতরে ঢুকে চেহারায় খানিকটা ইঁদুর ভাব চলে এসেছে।

এখন বাজছে সকাল ন'টা। এর মধ্যেই মা গোসল করে ফেলেছেন। চোখে কাজল দিয়েছেন। ম্যাচ করে শাড়ি ব্লাউজ পরেছেন। হাতে একটা ভ্যানিটি ব্যাগও আছে। সেই ব্যাগের রঙও শাড়ির রঙের সঙ্গে মেলানো—সবুজ। মা বললেন, কিরে বকু রোদে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মার গলায় প্রবল উৎকণ্ঠা—যেন রোদে দাঁড়ানোর কারণে আমার শরীরে কিছুক্ষণের মধ্যে ফোসকা পড়ে যাবে। অথচ আমি মোটেই রোদে দাঁড়িয়ে নেই। আমি দাঁড়িয়ে আছি বিশাল একটা শিমুল গাছের নিচে। শিমুল গাছে কোনো পাতা নেই—শুধুই থোকা থোকা ফুল। এমন কড়া লাল রঙ যে—তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মনে হয় গাছে আগুন ধরে গেছে। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার মনে হচ্ছে আমার মাথার উপর আগুন জ্বলছে। দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে। গাছে হেলান দিতে পারলে আরো ভাল হত—কিন্তু হেলান দেবার উপায় নেই—গাছ ভর্তি বড় বড় কাঁটা। আমি মা'র দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলাম। এই মিষ্টি হাসি হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নকল মিষ্টি। অভিনয়ের মিষ্টি হাসি। আমি যখন তখন এই হাসি হাসতে পারি। মা আবারো বললেন, কিরে কথা বলছি জবাব দিচ্ছিস না কেন?

আমি বললাম, মা তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

মা এই প্রশংসাতেও টললেন না। প্রায় ধমকের গলায় বললেন—শুধু শুধু এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

'কারণ আছে বলেই দাঁড়িয়ে আছি।'

'কারণটা কী?'

'কারণটাতো মা তোমাকে বলা যাবে না।'

'ফাজলামি করবি না।'

'আমাকে ডিরেক্টর সাহেব থাকতে বলেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে মা'র মুখে তৃপ্তির হাসি দেখা গেল। মা খুশি। ডিরেক্টর সাহেব থাকতে বললেতো থাকতেই হবে। এই মুহূর্তে তিনিই সবকিছু—আমাদের সম্রাট। সম্রাটের প্রতিটি কথা পালন করতে হবে। তাঁকে খুশি রাখতে হবে। মা'র এখন প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্রাটকে খুশি রাখা। তাঁর আশেপাশে থাকা। সম্রাটের সস্তা ধরনের রসিকতায় হা হা হি হি করে হাসা। আমাদের এই সম্রাটের ধারণা তিনি খুব রসিক মানুষ। ডিরেক্টর সাহেবের নাম মঈন খান। বয়স ঠিক কত এখনো জানি না—চল্লিশের উপরতো বটেই। রোগা পাতলা মানুষ। ভদ্রলোকের মধ্যে এটা বহুরূপী ব্যাপার আছে। একেক দিন তাঁকে একেক রকম দেখা যায়। আমার মনে হয় ব্যাপারটা ঘটে তাঁর চশমার কারণে। ভদ্রলোকের অনেকগুলি চশমা। একেক দিন একেক রকমের চশমা পরেন। চশমার সঙ্গে মিলিয়ে চুল আচড়ানোর মতোও কিছু একটা নিশ্চয়ই করেন। তাঁর চেহারা পাল্টে যায়। চেহারার সঙ্গে সঙ্গে ভাবভঙ্গি পাল্টে যায়। আজ তিনি সোনালি ফ্রেমের চশমা পরেছেন।

মা বললেন, মঈন ভাই তোকে এখানে থাকতে বলেছেন?

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কাজ দেখতে বলেছেন।'

'তাতো বটেই—কাজ না দেখলে কাজ শিখবি কীভাবে?'

মা লম্বা লম্বা পা ফেলে ডিরেক্টর সাহেবের দিকে এগুচ্ছেন। আমি শঙ্কিত বোধ করছি। কারণ ডিরেক্টর সাহেব আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেননি। শিমুল গাছটা দেখে আমার এত ভাল লেগেছে যে আমি ইচ্ছা করে এখানে এসে দাঁড়িয়েছি। শুটিং এর কাজ হচ্ছে রাস্তার ঐ পাশে। ন'দশ বছরের একটা মেয়ে এবং চার পাঁচ বছরের একটা ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে সেই সকাল থেকে। মেয়েটার পরনে ফ্রক। ছেলেটা সম্পূর্ণ নগ্ন। শুধু তার কোমরে কালো সুতা বাঁধা। সুতার সঙ্গে তিনটা শাদা কড়ি।

যে দৃশ্যটা এখন নেয়া হবে সেই দৃশ্যটা এরকম—এই দুই ভাই-বোন পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছিল। হঠাৎ দেখতে পেল শহুরে কিছু মানুষ চারটা গরুর গাড়িতে করে যাচ্ছে। শহুরে মানুষদের গায়ে ঝলমলে পোশাক, তারা আনন্দ করতে করতে যাচ্ছে। এই দেখেই দুই ভাই-বোন পানি থেকে উঠে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াবে। কৌতূহলী চোখে গরুর গাড়ির ভেতরের মানুষগুলিকে দেখতে চেষ্টা করবে। গরুর গাড়ির ভেতরে সাব্বির নামের এক ভদ্রলোক ক্যামেরায় তাদের ছবি তুলতে যাবেন—ওমনি মেয়েটা হেসে ফেলবে, আর ছেলেটা দু' হাতে তার নেংটো ঢেকে ফেলবে।

খুব সহজ দৃশ্য। অন্য কেউ হলে ফট করে নিয়ে নিত। কিন্তু আমাদের ডিরেক্টর সাহেব এই দৃশ্যটাকে যথেষ্ট জটিল করে ফেলেছেন। রাস্তার পাশে ট্রলি পেতেছেন। দৃশ্যটা নেয়া হবে ট্রলিতে। রিফ্লেক্টর বোর্ড হাতে তিনজন লাইটম্যান দাঁড়িয়ে আছে। এরা একটু পরপর ধমক

খাচ্ছে। ট্রলিও বোধ হয় ঠিকমতো বসছে না—ক্যামেরা কাঁপছে। কোদাল দিয়ে রাস্তাটা সমান করে ট্রলি বসানো হয়েছে—তারপরেও বোধ হয় রাস্তা সমান হয়নি। ডিরেক্টর সাহেবের কাছ থেকে ক্যামেরাম্যানও ছোট্ট একটা ধমক খেলেন।

বাচ্চা দু'টি পুকুর থেকে উঠে এসেছে বলে তাদের গা ভেজা থাকার কথা। রোদে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের গা শুকিয়ে যাচ্ছে। তখন তাদের মাথায় বালতি ভর্তি পানি ঢালা হচ্ছে। এই কাজটিতে এরা দু'জনই খুব মজা পাচ্ছে। মনে হচ্ছে তাদের জীবনে এমন আনন্দময় মুহূর্ত আর আসেনি।

আমি লক্ষ্য করলাম মা ছুটতে ছুটতে যাচ্ছেন। আমি মা'র মুখ দেখতে পাচ্ছি না—কিন্তু আমি জানি তাঁর মুখ ভর্তি হাসি।

আজকের পরিস্থিতি মোটেই ভাল না। এখনো ক্যামেরা ওপেন হয়নি। এই অবস্থায় মা গিয়ে কী না কী বলবে কে জানে! তাদের কথাবার্তা এরকম হতে পারে। মা বলবেন, মঈন ভাই আমাদের কাজ কেমন হচ্ছে? (আপনার কাজ কেমন হচ্ছে, না-জিজ্ঞেস করে মা বলবেন—আমাদের কাজ কেমন হচ্ছে। মা প্রমাণ করতে চাইবেন যে উনার কাজটাকে মা নিজের কাজ ভাবছেন।)

মঈন সাহেব মা'র কথার জবাবে কোনো কথা বলবেন না, একটু হয়ত হাসবেন। মেজাজ ভাল থাকলে অবশ্যি মা'র সঙ্গে রসিকতা করে কিছু বলবেন। আজ মেজাজ ভাল নেই। মা তা ধরতে পারবেন না। কারণ মা অন্যের মেজাজ মর্জি কিচ্ছু বুঝতে পারেন না। নিজের মনে ছড়বড় করে কথা বলে যান।

আমার ধারণা মা এক পর্যায়ে বলবেন—মঈন ভাই, আমার মেয়ে আপনাকে কী চোখে যে দেখে—আপনি যা বলেন তাই তার কাছে একমাত্র সত্য। আপনি তাকে কাজ দেখতে বলেছেন—ঐ দেখুন সে রোদে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি তাকে ছায়ায় দাঁড়াতে বলুনতো। আপনি না বললে যাবে না। আশ্চর্য মেয়ে। কী সমস্যায় যে ভাই মেয়েটাকে নিয়ে আছি।

মঈন সাহেব তখন ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাবেন। কী হচ্ছে বুঝতে চেষ্টা করবেন। তিনি বলে ফেলতে পারেন—কই, আপনার মেয়ের সঙ্গেতো আজ আমার কোনো কথা হয়নি। তখন অবস্থাটা কী হবে! ডিরেক্টর সাহেবের কাছে মা'র ছুটে যাওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে—আমার কথা যাচাই করে নেয়া। মা'র স্বভাব হচ্ছে—যে যাই বলুক মা যাচাই করে নেবেন।

মা কাউকেই বিশ্বাস করেন না। কোনো ফেরেশতা এসে যদি মা'কে বলে—আপা শুনুন, আপনার মেয়েকে দেখলাম একা একা রিকশায় করে নিউ মার্কেটে যাচ্ছে। মা সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, ও কী রঙের সালোয়ার পরেছে বলুনতো?

আমার খুব অস্বস্থি লাগছে। কী বিশ্রী ব্যাপার হল। ডিরেক্টর সাহেব যখন বিরক্ত গলায় বলবেন, কই আমিতো আপনার কন্যাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলিনি তখন কী হবে! তিনি হয়ত হাত উঁচিয়ে আমাকে ডাকবেন।

এত দূর থেকেও হাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমার মা হেসে হেসে কী যেন বলছেন। মঈন সাহেব মায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখে হাসি নেই, তবে বিরক্তিও নেই। শুধু পাপিয়া ম্যাডাম বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছেন। বেশিরভাগ সময়ই তিনি বিরক্ত হয়ে থাকেন।

পাপিয়া ম্যাডাম বসে আছেন মঈন সাহেবের পাশে। তাঁর হাতে বড় একটা গ্লাসে হলুদ রঙের কী একটা জিনিস। তিনি চুক চুক করে খাচ্ছেন। মা'র অকারণ হাসিতে সম্ভবত তাঁর মাথা ধরে যাচ্ছে। পাপিয়া ম্যাডামের সব সময় মাথা ধরে থাকে।

পাপিয়া ম্যাডাম আমাদের এই ছবির নায়িকা। আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি। মোমের পুতুল বললেও কম বলা হবে। তাঁর ঠোট সুন্দর, চোখ সুন্দর, নাক সুন্দর, দাঁত সুন্দর। লম্বা সিল্কি চুল যা দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে। এবং কেঁচি দিয়ে এক গোছা চুল কেটে বাড়ির দেয়ালে সাজিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। তাকে দেখলে প্রথম যে কথাটা মনে হয়

তা হচ্ছে—মানুষ এত সুন্দর হয় কী করে? হেলেন অব ট্রয় কিংবা ক্লিওপেট্রা এরা কি তাঁর চেয়েও সুন্দর ছিল? মনে হয় না।

মা তরতর করে ছুটে আসছেন। তাঁর মুখ হাসি হাসি। মনে হচ্ছে জটিল কোনো মিশন সম্পন্ন করে ফিরছেন। মিশনের ফলাফল তাঁর পক্ষে।

'বকু, তোকে বেলের শরবত দিয়েছে?'

আমি কিছু বললাম না। মা হড়বড় করে বললেন, ইউনিটের সবাইকে বেলের শরবত দিয়েছে। তোকে দিচ্ছে না কেন? তুইতো ফেলনা না, তুই এই ছবির দুই নম্বর নায়িকা।

'মা চুপ করতো!'

'চুপ করব কেন? মঈন ভাইয়ের কানে আমি এক সময় কথাটা তুলব। সবাইকে সবকিছু সেধে সেধে দেয়া হয়—তোর বেলায় চেয়ে চেয়ে নিতে হয়। কেন তুই কি বন্যার জলে ভেসে এসেছিস? নাকি বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আকাশ থেকে পড়েছিস?'

'উফ মা—চুপ কর।'

'সব সময় চুপ করে থাকলে হয় না। জায়গা মতো কথা বলতে হয়। নিজের জিনিস আদায় করে নিতে হয়। বুদ্ধি খেলাতে হয়। তুই বুদ্ধি খেলাতে পারিস না। সবার মেয়ে হয় বুদ্ধিমতী, আর তুই হয়েছিস বোকামতী।'

মা চলে যাচ্ছেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, তবে নিশ্চিত হতে পারলাম না। মা সহজে কিছু ছেড়ে দেন না। বেলের শরবত প্রসঙ্গ এই খানেই চাপা পড়বে বলে মনে হয় না। যথাসময়ে ডিরেক্টর সাহেবের কানে উঠবে।

মা'র কথাগুলি মনে পড়ে এখন একটু হাসি পাচ্ছে—কেমন চোখ মুখ শক্ত করে বলছিলো—"সব সময় চুপ করে থাকলে হয় না। জায়গা মতো কথা বলতে হয়। নিজের জিনিস আদায় করে নিতে হয়।" ভাবটা এ রকম যেন মা সব সময় নিজের জিনিস নিজে আদায় করে নিয়েছেন। আসলে তিনি কিছুই নিতে পারেননি। বরং তাঁর নিজের যা সব ছেড়েছুড়ে দিতে হয়েছে।

আমি যখন ক্লাস ফাইভে পড়ি তখন আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমার বুদ্ধিমতী মা একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েন। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেননি—এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে। তিনি নানান ধরনের পাগলামি করার চেষ্টা করেন। গোলাপ গাছে স্প্রে করে দেয়ার যে বিষ ঘরে ছিল সেটা খাওয়ার চেষ্টা করেন, খানিকটা মুখে নিয়ে 'থু' করে ফেলে দেন। এতেই তাঁর মুখে ঘা-টা হয়ে একাকার। একবার পঞ্চাশটার মতো ঘুমের অষুধ খান। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যাওয়ায় সেই অষুধে টানা আঠারো ঘণ্টা ঘুম ছাড়া তাঁর আর কিছুই হয় না। তারপর উঠে-পড়ে লাগলেন, গুণ্ডা লাগিয়ে বাবাকে মারার ব্যবস্থা করবেন। সেই নিয়ে দিনরাত আমার সঙ্গে পরামর্শ—বুঝলি বকু, এমন মারের ব্যবস্থা করব যে প্রাণে মরবে না তবে হাত পা ভেঙে লুলা হয়ে বিছানায় পড়ে থাকবে। পিশাব পায়খানা বিছানায় করবে। আমাকে চিনে না? আমি তার বাপদাদা চৌদ্দগুষ্ঠির নাম ভুলিয়ে দেব। পাতলা পায়খানা করিয়ে ছাড়ব। কলসি ভর্তি ওরস্যালাইন খেয়েও কূল-কিনারা পাবে না।

ভাড়াটে গুণ্ডার পরিকল্পনা এক সময় বাতিল হয়—মা বিপুল উৎসাহে উকিলের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। দিনে উকিলের সঙ্গে কথা রাতে আমার সঙ্গে পরামর্শ—বুঝলি বকু, হুজুরকে আমি শ্রীঘরে নিয়ে ছাড়ব। আমার বিনা অনুমতিতে বিয়ে! সাত বৎসর শ্রীঘরে বসে ইট ভাঙতে হবে। ইট ভাঙতে ভাঙতে হাতে কড়া পড়ে যাবে। আমি সহজ জিনিস না। তুই শুধু দেখ—কী হয়।

শেষ পর্যন্ত কিছুই হয় না। মা কাঁদতে কাঁদতে আগামসি লেনে তাঁর বাবা-মা'র সঙ্গে থাকতে আসেন। আর আমার বাবা তাঁর অফিস সেক্রেটারিকে বিয়ে করে ফেলেন। আমার ধারণা তাঁদের এখন বেশ সুখের সংসার। দু'টা ছেলেমেয়ে আছে। বাবা থাকেন এলিফেন্ট রোডে একটা কেনা ফ্ল্যাটে। তাঁদের একটা মেরুন কালারের গাড়িও আছে। একদিন দেখি নতুন মা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। বাবা তাঁর পাশে বসে হাসি হাসি মুখে কী যেন বলছেন। নতুন মা'র মুখে হাসি। বাবা বেশ সুখেই

আছেন। তবে মা'র ধারণা বাবা আছেন হাবিয়া দোজখে। কারণ, যে মহিলাকে বিয়ে করেছেন—তিনি পর্বতের মতো। বসলে উঠে দাঁড়াতে পারেন না। টেনে তুলতে হয়।

'বুঝলি বকু, সারা গায়ে শুধু থলথলা চর্বি। পুতুল পুতুল দেখে তোর বাবা মজে গিয়ে বিয়ে করেছিল—সেই পুতুল এখন মৈনাক পর্বত। ট্রাকে তুললে ট্রাকের চাকার হাওয়া চলে যায় এই অবস্থা। আর মাগির মেজাজ কী! সারাক্ষণ খ্যাক খ্যাক করে।'

সবই মা'র বানানো কথা। মহিলা একটু মোটার দিকে—কিন্তু খুবই মায়াকাড়া চেহারা। মৃদুভাষী। কথা বলার সময় ঠোঁট টিপে টিপে হাসেন—দেখতে ভাল লাগে। আমার সঙ্গে তাঁর এই পর্যন্ত তিনবার দেখা হয়েছে। তিনবারই তিনি খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন। মা আমাদের এই দেখা হবার খবর জানেন না। খবর জানলে আবারো গোলাপ ফুলে দেয়ার কীটনাশক অষুধ খেয়ে ফেলতেন।

তবে এখন আর আমাদের গোলাপ গাছ নেই। এবং গাছে দেয়ার অষুধও নেই। নানাজানের দোতলা বাড়ির একটা অংশে আমরা থাকি। দোতলার অর্ধেকটা এবং একতলার পুরোটা ভাড়া দেয়া হয়। এই ভাড়ার টাকায় আমাদের এবং আমার মামার সংসার চলে। মামার বয়স পঞ্চাশ— এখনো বিয়ে করেননি। আমার বুদ্ধি হবার পর থেকে শুনে আসছি তিনি বিয়ে করছেন। সব ঠিকঠাক। সেই বিয়ে এখনো হয়নি। এতে অবশ্যি আমার মা খুশি। কারণ বিয়ে করলেই দোতলার অর্ধেকটা আর ভাড়া দেয়া যাবে না। মামা সেখানে তাঁর সংসার পাতবেন। বাড়ি ভাড়া থেকে আয় অর্ধেক হয়ে যাবে। সংসারের খরচও যাবে বেড়ে। মামাকে তখন আর সামান্য হাত খরচ দিয়ে মানানো যাবে না। এম্নিতেই মামা কিছুদিন পরপর গম্ভীর গলায় মা'কে ডেকে বলেন—সাবিহা শোন। তোর ভালর জন্যে বলছি। তোর মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে। এখন দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়ে দে। তারপর তুই মেয়ে জামাইয়ের বাড়িতে উঠে যা। কারণ এই বাড়ি আমার। বাড়ি ভেঙে আমি ফ্লাট বানাব। এক তলায় দোকান, উপরে ফ্লাট। মুফতে অনেক দিন থেকে গেলি। তোর কাছ থেকে এক পয়সা বাড়ি ভাড়া নেইনি। আর কত? সারা জীবন তোদের পালব এমন কথাতো না। আমিতো আর হাজি মোহাম্মদ মোহসিন না। আমি হলাম গিয়ে পাজি মোহাম্মদ কাসেম।

নানাজানের এই বাড়ি যে শুধু মামার একার তা না। মা'র অবশ্যই তাতে অংশ আছে। মা মামার সঙ্গে ঐ লাইনে কোনো কথা বলেন না। মা কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন—ভাইজান, এই বাড়ি অবশ্যই আপনার। আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই চলে যাব। আজ বললে আজ যাব। বিপদের সময় আপনি যে আমাকে থাকতে দিয়েছেন এই যথেষ্ট। আমার আর আমার মেয়ের চামড়া দিয়ে জুতা বানালেও আপনার ঋণ শোধ হবে না ভাইজান...

বলতে বলতে মা'র গলা ধরে যেত, তিনি বাক্য শেষ করতে না পেরে কেঁদে অস্থির হতেন। এতেই আমার কাসেম মামা বিচলিত হয়ে বলতেন—আরে কী শুরু করলি? তোদের আমি ফেলে দেব নাকি? আমার একটা বিচার আছে না? আমিতো নর-পিশাচ না। আমি নর-মানব। আমি যতদিন থাকব তোরাও থাকবি। চোখ মোছ।

চোখ মোছার বদলে মা আরো ব্যাকুল হয়ে কেঁদে উঠতেন। মামা হতেন বিচলিত। আমি আমার মায়ের অভিনয় প্রতিভায় হতাম মুগ্ধ।

মা অবশ্যই বুদ্ধিমতী। বাবার চলে যাওয়াকে একসময় তিনি সহজ ভাবে নিয়ে নিলেন—এবং বাস্তব স্বীকার করে বাঁচার চেষ্টা চালালেন। বাবার কাছে কান্নাকাটি করে তিনি মাসিক একটা বরাদ্দের ব্যবস্থা করলেন। এ ছাড়াও প্রায়ই—বকুলের শরীর খারাপ চিকিৎসা করাতে হবে, বকুলের কলেজে ভর্তি হবার খরচ, এইসব বলে বলে টাকা আদায় করতে লাগলেন। সেই টাকার একটা পয়সাও খরচ করলেন না। ব্যাংকে জমা করতে লাগলেন। বাড়ি ভাড়া বাবদ যে টাকা পেতেন তার পুরোটাও মা খরচ করতেন না। একটা অংশ ব্যাংকে জমা করতেন। ছোটাছুটি করার ব্যাপারে মা একজন এক্সপার্ট। নিজের জীবনের দুঃখের কাহিনী বলার ব্যাপারেও এক্সপার্ট। স্কুলে আমাকে কখনো বেতন দিতে হয়নি। ফ্রি শিপের জন্যে মা দরখাস্ত করতেন। যেখানে লেখা থাকত—

আমি স্বামী পরিত্যক্তা একজন মহিলা। বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছি। আমার বর্তমানে কোনো সহায় সম্বল নাই, আশ্রয় নাই। দুইবেলা অন্ন সংস্থানের পথ নাই। আমি তারপরও মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাই। তারপরেও আমি আমার কন্যা মালিহা রুমালীকে (বকুল) সুশিক্ষিত করতে চাই। আমার এই কন্যা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল। অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় সে মেধা তালিকায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে চতুর্থ হয়েছিল। আপনার দয়ার উপর আমি নির্ভর করছি। এই কঠিন জীবন সংগ্রামে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। মালিহা রুমালীর বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের খবর পত্রিকায় ছাপা হয়। আপনার অবগতির জন্যে পেপার কার্টিং এর ফটোকপি পাঠাইলাম।

বিনীতা
মালিহা রুমালীর দুর্ভাগা মাতা
সাবিহা বেগম মুক্তা।

মা'র এই জাতীয় দরখাস্তে কাজ হত। তিনি নানান ধরনের মহিলা সমিতিতেও ঘুরতেন। এক মহিলা সমিতি তাঁকে পায়ে চালানো একটি সেলাই মেশিন দিয়েছিল। তিনি মেশিন বিক্রি করে সেই টাকাও ব্যাংকে জমা করে রেখেছিলেন। এক এনজিওর কাছ থেকে তিনি আমার জন্যে একটা বৃত্তিও জোগাড় করেন। মাসে পাঁচশ' টাকা। এই টাকা নেবার জন্যে প্রতি মাসের তিন তারিখে আমাকে মা'র সঙ্গে এনজিও'র অফিসে যেতে হত এবং দীর্ঘ সময় করুণ মুখ করে একটা ঘরে বসে গরমে ঘামতে হত। সেই ঘরে ফ্যান ছিল, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার বনবন করে ফ্যান ঘুরলেও সেই ফ্যানে কোনো বাতাস হত না।

মা'র ভিক্ষাবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড শুরুতে অসহ্য লাগলেও শেষে সয়ে গিয়েছিল। মানুষের দয়া এবং করুণা পাবার নিত্য নতুন কলাকৌশল মা আবিষ্কার করতেন—আমি সে সব দেখতাম, এবং অবাক হতাম। মা'র কারণেই আমি প্রথম টিভি নাটকে সুযোগ পেলাম। নাটকের প্রযোজকের বাসার ঠিকানা বের করে তিনি একদিন আমাকে নিয়ে তাঁর বাসায় উপস্থিত। প্রযোজকের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তিনি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে বলতে যে কান্না শুরু করলেন—সেই কান্নায় পাথর গলে—প্রযোজকের স্ত্রীতো গলবেনেই। ভদ্রমহিলাও চোখ মুছতে লাগলেন। সেই মহিলার কল্যাণে আমি জীবনে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালাম। নাটকের নাম স্বপ্ন সায়র। স্বপ্ন সায়র নাটকে আমার অভিনয় নিশ্চয়ই খুব ভাল হয়েছিল—কারণ আমার মা'কে তারপর আর কখনো কোনো প্রযোজকের বাসায় গিয়ে তাঁদের স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে হয়নি। বছরের শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী হিসেবে আমি দু'বার রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারও পেলাম। আমাদের বসার ঘরে দু'টা ছবি বড় করে বাঁধাই করা আছে। একটাতে আমি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেবের হাত থেকে পদক নিচ্ছি, অন্যটায় প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের হাত থেকে পদক নিচ্ছি। এরশাদ সাহেবের একটা হাত আমার মাথায় রাখা। মা আমার গান শেখার ব্যবস্থা করলেন, নাচ শেখার ব্যবস্থা করলেন, সবই বিনা পয়সায়। একজন স্বামী পরিত্যক্তা আশ্রয়হীনা মহিলার প্রতি দয়া বশতই গানের এবং নাচের টিচার রাজি হলেন।

সোহরাব চাচা আমার দিকে আসছেন। তাঁর হাতে বড় একটা কাচের গ্লাস। সোহরাব চাচা হচ্ছেন কথাকলি ফিল্মসের প্রডাকশান ম্যানেজার। রোগা টিং টিং-এ একজন মানুষ। সব সময় হলুদ পাঞ্জাবি পরেন—এবং ক্রমাগত পান খান। ভাত খাবার আগেও তাঁর মুখ ভর্তি পান থাকে। ভাতের নলা মাখার সময় থু করে পান ফেলে কুলি করে নেন। অসাধারণ একজন মানুষ। মাছির যেমন হাজার হাজার চোখ থাকে তাঁরও তেমনি হাজার হাজার চোখ। চারপাশে কোথায় কী হচ্ছে তিনি সব জানেন। সমস্যা, তা যত জটিলই হোক—তাঁর কাছে সমাধান আছে। সমস্যার সমাধান তিনি এমন ভাবে করেন যে কেউ বুঝতেই পারে না—সমাধানটা তিনি করেছেন। রাগ

বলে কোনো বস্তু তাঁর ভেতর নেই। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে পারেন। তবে কাজের ফাঁকে গল্প করতেও খুব পছন্দ করেন। বিশেষ বিশেষ মানুষের সঙ্গে যে গল্প করেন তা না—সবার সঙ্গে গল্প। যার সঙ্গে গল্প করেন মনে হয় সেই তার প্রাণের বন্ধু, তিনি আমাকে ডাকেন রুমাল।

'রুমালের খবর কী?'

'খবর ভাল। আপনি কেমন আছেন চাচা?'

'আমি খুবই ভাল আছি—এই নাও তোমার বেলের শরবত।'

'বেলের শরবততো আমি খাব না।'

'সেকি, তোমার মা যে বলল তুমি বেলের শরবত খেতে চাচ্ছ?'

'চাচ্ছি না।'

'আচ্ছা না চাইলেও খেয়ে ফেল। জিনিসটা ভাল। আরেকটা কথা শোন—যদি কিছু খেতে ইচ্ছে করে আমাকে বলবে। পুরোদস্তুর নায়িকা যখন হবে তখন আর বলতে হবে না। আপনাতেই সব হয়ে যাবে।'

'চাচা আমি কি নায়িকা হতে পারব?'

'সেটা আমি বলতে পারব না। অভিনয় প্রতিভা কার কেমন তা জানি না, বুঝিও না। আমি হলাম জোগানদার। যার যা লাগবে—আমাকে বলবে আমি উপস্থিত করব।'

'আপনাকে যা আনতে বলা হবে নিয়ে আসবেন?'

'তুমি বললে আনব না। তবে ডিরেক্টর সাহেব বললে জোগাড় করব।'

'উনি যা বলবেন তাই এনে দেবেন?'

'এনে দেব। ফিল্ম লাইনের প্রডাকশান ম্যানেজার হতে হলে "চাহিবা মাত্র উপস্থিত" বিদ্যায় পারদর্শী হতে হয়। তবে শোন মিস রুমাল—উদ্ভট কিছু কোনো ডিরেক্টর চায় না। ডিরেক্টরও জানে কী জোগাড় করা যাবে কী যাবে না।'

'মঈন সাহেবকে আপনি খুব পছন্দ করেন তাই না চাচা?'

'হ্যাঁ।'

'কেন করেন?'

'তুমি যে কারণে কর—আমিও সেই কারণে করি।'

'কই, আমিতো পছন্দ করি না।'

'পছন্দ না করাই ভাল। বেলের শরবতটা কেমন লাগলগো মা?'

'ভাল।'

'রেসিপি লাগবে? রেসিপি লাগলে বল—আমি রেসিপি দিয়ে দিচ্ছি। কাগজে লেখা আছে। এই নাও।'

আমি অবাক হয়ে দেখি সত্যি একটা কাগজে বেলের শরবতের রেসিপি লেখা। সোহরাব চাচার হাত থেকে আমি কাগজটা নিলাম—

বেলের শরবত

পাকা বেল	১টি
ঠাণ্ডা পানি	৩ কাপ
দৈ	১/২ কাপ
চিনি	১ কাপ
গোলাপজল	১ টেবিল চামচ

১. বেলের আঁঠা ও বিচি ফেলে ১ কাপ পানিতে ভেজাতে হবে মোটা চালুনিতে ছেঁকে নিতে হবে।

২. চালবার পর ১ কাপ চিনি মেশাতে হবে।
৩. দৈ ফেটে মেশাতে হবে। গোলাপজল এবং বরফের কুচি দিয়ে পরিবেশন করতে হবে। চিনির বদলে ক্যারামেল সিরাপ দেয়া যেতে পারে।

আমি বললাম, চাচা আপনি রেসিপি নিয়ে ঘুরছেন কেন?

সোহরাব চাচা গলার স্বর নিচু করে বললেন, পাপিয়া ম্যাডামের জন্যে। ম্যাডামের এই শরবত এত পছন্দ হয়েছে যে রেসিপি চেয়েছেন। রেসিপি যখন লিখতেই হচ্ছে কার্বন পেপার দিয়ে তিন কপি করে ফেললাম—ছোট নায়িকা হিসেবে তুমি এক কপি রেখে দাও।

'থ্যাংক য়্যু।'

সোহরাব চাচা চলে গেলেন। এতক্ষণে শুটিং শুরু হল। তিনটা টেক নেয়া হল। টেক মনে হয় ভাল হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেবকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। তিনি সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিচ্ছেন। আনন্দের সময় তিনি ফস করে সিগারেট ধরান—লম্বা লম্বা কয়েকটা টান দিয়ে জ্বলন্ত সিগারেট দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। সেই সিগারেট কুড়িয়ে তুলে নেবার ব্যাপারে সমবেত জনতার মধ্যে এক ধরনের আগ্রহ দেখা যায়। এখানেও তাই হচ্ছে।

মুখভর্তি চাপদাড়ির মওলানা ধরনের একজন মানুষ আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি দেখেও না দেখার ভান করলাম।

ভদ্রলোকের কাঁধে চাদর। পাঞ্জাবি নেমে এসেছে পায়ের পাতা পর্যন্ত। পাঞ্জাবির উপর খোপখোপ প্রিন্টের চাদর। গা থেকে আতরের গন্ধ ভেসে আসছে। ভদ্রলোকের দিকে ভালমতো তাকালে দেখা যাবে চোখে সুরমাও দিয়েছেন। আমি ভালমতো তাকালাম না। এই জাতীয় মানুষরা কঠিন প্রকৃতির হয়ে থাকেন। শুটিং নিয়ে অকারণ হৈচৈ শুরু করে দিতে পারেন। হয়ত বলে বসবেন আজ জুম্মাবার—আজ এইসব কী হচ্ছে? ঢাকার আশেপাশের মানুষ শুটিং-এ অভ্যস্ত। জায়গাটা ঢাকা থেকে অনেক দূরে। ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা। সেখান থেকে দুর্গাপুর। দুর্গাপুর থেকে আরো তিন কিলোমিটার। জায়গাটার নাম চণ্ডিগড়। কে জানে হয়ত চণ্ডিগড়ের মানুষরা খুব ধর্মভীরু।

এত জায়গা থাকতে চণ্ডিগড়ে শুটিং হচ্ছে—কারণ চিত্রনাট্য এই ভাবে লেখা। ঢাকা থেকে গারো পাহাড়ের দেশ দুর্গাপুরে বেড়াতে এসেছে একটা পরিবার, রিটায়ার্ড পুলিশের বড় কর্তা এবং তাঁর দুই মেয়ে দিলশাদ ও নিশাত। ছুটি কাটানোর গল্প। তারা উঠল একটা ডাক বাংলোয়। অনেক মজা করল। আমি হচ্ছি ছোট বোন দিলু।

মওলানা সাহেব বিনীত গলায় বললেন, আসসালামু আলায়কুম।

আমি খুবই অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। বয়স্ক কোনো ভদ্রলোক আগ বাড়িয়ে সালাম দিলে খুব অস্বস্তি লাগে। আমি লজ্জিত গলায় বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম।

'শুটিং হচ্ছে নাকি মা?'

'জি।'

'দাঁড়ায়ে যদি দেখি কোনো অসুবিধা আছে?'

'জি না।'

'কেউ কিছু বলবে নাতো?'

'জি না।'

'আপনি কি শুটিং এর মেয়ে?'

'জি।'

'শুটিং এর কথা শুধু শুনেছি। দেখার সৌভাগ্য হয় নাই।'

'আজ দেখুন।'

'রাংতা লাগানো বোর্ডের মতো জিনিসগুলি কী?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এদেরকে বলে রিফ্লেক্টর। আয়নার মতো। গায়ের উপর আলো ফেলে।'

'বাহ্ চমৎকার। লাল শার্ট পরা ভদ্রলোক কে?'

'উনি মঈন খান। এই ছবির পরিচালক। ছবিটা উনি বানাচ্ছেন।'

'আলহামদুলিল্লাহ্। উনার সঙ্গে কি কথা বলা যাবে?'

'কেন যাবে না—অবশ্যই যাবে। তবে এখন কাজ করছেনতো এখন বিরক্ত না করাই ভাল।'

'জি আচ্ছা। জি আচ্ছা। বিরক্ত করব না। মঈন সাহেবের স্ত্রী মাশাল্লাহ্ দেখতে খুব সুন্দর।'

'উনি ডিরেক্টর সাহেবের স্ত্রী না। উনার নাম পাপিয়া—এই ছবির নায়িকা। খুব বড় অভিনেত্রী।'

ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল। পাপিয়া ম্যাডাম যেভাবে বসেছেন তাতে যে কোনো মানুষেরই ভুরু কুঁচকাবার কথা। দু'টা চেয়ার গায়ে গায়ে লেগে আছে। পাপিয়া ম্যাডাম তাঁর বাঁ হাত পাশের চেয়ারের হাতলে তুলে দিয়েছেন। দূর থেকে মনে হয় তিনি ডিরেক্টর সাহেবের কাঁধে হাত রেখে বসে আছেন।

কড়া রোদ উঠেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। সকালবেলা ঠাণ্ডা থাকে। কুয়াশা কুয়াশা ভাব থাকে। এগারোটার দিকে ঝাঁজালো রোদ উঠে যায়। এমন রোদ যে চোখ জ্বালা করতে থাকে।

'মা শুটিং কি শেষ হয়ে গেছে?'

'জি না—আজ সারা দিনই শুটিং হবে।'

'ঐ যন্ত্রটা কী?'

'এর নাম ক্রেন ট্রলি। ক্যামেরা ক্রেন ট্রলিতে বসিয়ে উপুর নিচ করা হয়। আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুটিং দেখুন আমি চলে যাচ্ছি।'

'আমি চণ্ডিগড় হাইস্কুলের শিক্ষক—ইসলামিয়াত পড়াই।'

'ও আচ্ছা। খুব ভাল।'

'আমিও চলে যাব—আজ জুম্মাবার। নামাজ আছে। আমার নাম মেরাজ উল্লাহ্। লোকে অবশ্য মেরাজ মাস্টার ডাকে। আমি আরো কিছুক্ষণ দেখি—আযান হয় বারোটার সময়। বারোটা বাজতে এখনো দেরি আছে।'

'আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা দেখুন।'

'মা, আপনার নামটা জানা হয় নাই।'

'আমার নাম বকুল।'

'মাশাল্লাহ অতি সুন্দর নাম।'

আমি জায়গা ছেড়ে চলে এলাম—মেরাজ মাস্টার সাহেব আমার জায়গায় দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহে চারপাশের কর্মকাণ্ড দেখছেন। আজ আমার কোনো সিকোয়েন্স হবে না। সাব্বিরের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন—তিনি এসে পৌছাননি, তাঁর গতকালই এসে পৌছানোর কথা। তাঁকে ছাড়া শুটিং শুরু করা যাচ্ছে না। ভদ্রলোক সবাইকে খুব বেকায়দায় ফেলে দিয়েছেন। তবে ডিরেক্টর সাহেবের মধ্যে এ নিয়ে কোনো দুঃশ্চিন্তা লক্ষ্য করছি না। কোনো কিছু নিয়েই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না হবার ক্ষমতা এই মানুষটার আছে। কেমন গা এলিয়ে সিগারেট টানছেন, মনে হচ্ছে তিনিই রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার—পরিবারের সবাইকে নিয়ে ছুটি কাটাতে স্বয়ং দুর্গাপুরের পাহাড়ে এসেছেন। ছুটি শুরু হয়েছে।

পাপিয়া ম্যাডামের দিকে চোখ পড়তেই দেখি তিনি হাত উঁচিয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি চাপা অস্বস্তি নিয়ে এগুচ্ছি। এই মহিলার সামনে কেন জানি আমি কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারি না। পাপিয়া ম্যাডাম গলায় লাল পাথরের নেকলেস পরেছেন। শিমুল ফুলের মতো পাথরগুলিও জ্বলছে। তাঁর চোখে এখন সানগ্লাস। কিছুক্ষণ আগেও সানগ্লাস ছিল না। তাঁকেতো সারাক্ষণই

লক্ষ্য করছি। কোন ফাঁকে সানগ্লাস পরে ফেললেন? পাপিয়া ম্যাডামের সামনে দাঁড়ানোর পর আমার প্রথম যে ইচ্ছাটা হল তা হচ্ছে—আমি অবিকল উনার মতো একটা লাল পাথর বসানো নেকলেস কিনব।

পাপিয়া ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, 'বকুল, তুমি ঐ মওলানার সঙ্গে গুটগুট করে কী কথা বলছিলে?'

'কী হচ্ছে না হচ্ছে উনি জানতে চাচ্ছিলেন।'

'পাবলিকের সঙ্গে কোনো রকম মেলামেশা করবে না। সে যদি কিছু জানতে চায়—ইউনিটের সঙ্গে কথা বলবে। তোমার ফড়ফড় করে এত কথা বলার দরকার কী? আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি।'

'জি আচ্ছা।'

'তুমি আমার উপর রাগ করছ নাতো?'

'জি না।'

'শো বিজনেসে যারা থাকে তাদের সবার উচিত মানুষজনের কাছ থেকে একটু দূরে থাকা। লোকজন আসবে, নানান কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। তুমি খোলা মনে উত্তর দেবে—তারপর সেগুলি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অন্যদের বলবে। মওলানা সাহেবকে আমার খুব কনসপিকিউয়াস মনে হচ্ছে। মওলানা মানুষ তিনি থাকবেন মসজিদে, শুটিং স্পটে কেন?'

মঈন সাহেব হাসি মুখে বললেন—মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল। বেচারা মওলানা বলে তার কৌতূহল থাকবে না?

পাপিয়া ম্যাডাম খুব ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, প্লিজ দয়া করে তুমি আহ্লাদী ধরনের কথা বলবে না। মওলানাকে বেচারা বলছ কেন? বেচারার ডেফিনেশন কী?

মঈন সাহেব বেচারার ডেফিনেশন শুরু করলেন—আর আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম ব্যাপারটা কী, পাপিয়া ম্যাডাম ইনাকে তুমি তুমি করে বলছেন কেন? তাঁকে ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে যতবার কথা বলতে শুনেছি ততবারই আপনি বলতে শুনেছি। আজ হঠাৎ তুমি কেন?

'পাপিয়া শোন, বেচারা মানে হচ্ছে নেই-চারা। বে হল নেই, কাজেই বে চারা—নেই চারা। চারা হল চারাগাছ। অর্থাৎ যার শিকর আছে। গাছ নেই মানে শিকড়ও নেই। কাজেই বেচারার অর্থ দাঁড়াচ্ছে—শিকড়হীন মানুষ।'

পাপিয়া ম্যাডাম কঠিন গলায় বললেন, মঈন ভাই শুনুন। যা কিছু একটা লজিক দাঁড়া করালেইতো হয় না। লজিক ব্যাপারটাকে আপনি খেলো করে ফেলছেন।

'তাই কি?'

'হ্যাঁ তাই। আমি আপনার লজিক লজিক খেলা দেখতে দেখতে ক্লান্ত। এবার ক্ষান্ত দিন। অনেকতো হল।'

'তুমি দেখি সত্যি সত্যি রাগ করছ—শোন পাপিয়া, আমি আসলে রসিকতা করছিলাম। তুমি মনে হচ্ছে আজকাল রসিকতাও নিতে পারছ না। তোমার কি শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ আমার শরীর খারাপ।'

'পাপিয়া শোন, তুমি একটা কাজ কর—নার্ভ রিলাক্স করে এ জাতীয় দু'টা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে থাক। বিশ্রাম নাও। আজ তোমার কোনো শট হবে না।'

পাপিয়া ম্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। দু'জনের কথা কাটাকাটির মধ্যে পড়ে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি। পাপিয়া ম্যাডাম এখন অবশ্যি ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আপনি আপনি করেই কথা বলছেন। মনে হয় উনার শরীর আসলেই ভাল না। কখন আপনি বলছেন, কখন তুমি বলছেন বুঝতে পারছেন না। উনি দ্রুত পা ফেলে এগুচ্ছেন আমি যাচ্ছি তাঁর পেছনে পেছনে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি এখনই বলবেন—এই মেয়ে, তুমি আমার পেছনে পেছনে আসছ কেন? আমি কেন উনার পেছনে পেছনে যাচ্ছি তাও বুঝতে পারছি না। রেগে

যাওয়া মানুষের সঙ্গে থাকতে নেই। রেগে যাওয়া মানুষ তার রাগ চারদিকে ছড়িয়ে দেয়। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই উনার রাগের খানিকটা আমার উপর এসে পড়বে।

'বকুল।'

'জি।'

'তোমার মা তোমাকে বকু ডাকে কেন?'

'আদর করে ডাকেন। বকুল থেকে বকু।'

'এইসব আদর ভাল না। তুমি শো বিজনেসের মেয়ে। তোমার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরবে—এইখানে বকু আবার কী? তা ছাড়া বকুল নামটাওতো ভাল না। শো বিজনেসে নাম হবে ফ্লাওয়ারি। বকুল ফুলের নাম হলেও ফ্লাওয়ারি নাম না। তোমার আর কোনো নাম নেই?'

'আমার ভাল নাম—মালিহা রুমালী।'

'রুমালী নামটাতো বেশ ইন্টারেস্টিং। তবে মালিহা না। মা দিয়ে যে সব নাম শুরু তার কোনোটাই আমার ভাল লাগে না। সেইসব নামে মা মা গন্ধ থাকে। শো বিজনেসের মেয়ের নামে মা মা গন্ধ থাকা ঠিক না। রুমালী নামটা অবশ্যি ভাল।'

'রুমালী নাম আমার বাবা রেখেছিলেন।'

'ভাল কথা মনে করেছ। তোমার বাবা প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। কথাটা তোমার বাবা প্রসঙ্গে না—তোমার মা প্রসঙ্গে। তুমি বাবার কথা বলায় মনে পড়ল।'

'বলুন।'

'তোমার মা সবচে অপছন্দের কাজ যেটা করেন সেটা হচ্ছে দুঃখের কাঁদুনি শুরু করেন। তোমার মা'র কাছ থেকে এই পর্যন্ত তিনবার আমি শুনেছি—তোমার বাবা তোমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তোমরা কী ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যে পড়েছিলে, খেয়ে না খেয়ে ছিলে। সবাইকে এইসব বলে বেড়ানোর অর্থ কী? এটাতো কোনো আনন্দের ঘটনা না যে পৃথিবী সুদ্ধ সবাইকে জানাতে হবে? সহানুভূতি পাবার জন্যে বলা? সহানুভূতির দরকার কী? আর শোন রুমালী, মানুষ সহানুভূতির বস্তা খুলে বসেনি যে দুঃখের কাঁদুনি শুনলেই সহানুভূতির বস্তা থেকে পাঁচ কেজি সহানুভূতি দিয়ে দেবে। সহানুভূতি হচ্ছে—খুবই ফাইনার ফিলিংস। একমাত্র মহাপুরুষদের মধ্যেই এই ফিলিংস আছে। বুঝতে পারছ কী বলছি?'

'জি।'

'তুমি কি তোমার মা'কে খুব পছন্দ কর?'

'জি।'

'তোমাকে জরুরি একটা কথা বলি—কাউকে খুব বেশি পছন্দ করবে না। খুব বেশি পছন্দ করলে কী হয় জান?'

'জি না।'

'খুব বেশি পছন্দ যাকে করবে সে তোমাকে গ্রাস করে ফেলবে। কখন যে গ্রাস করবে তুমি বুঝতেই পারবে না। মানুষের মধ্যে আছে ঝিনুক স্বভাব। ঝিনুক কী করে? মুখ খুলে হাঁ করে থাকে। ধরা যাক তুমি কোনো একটা ঝিনুককে খুব বেশি পছন্দ করে ফেললে—তুমি তখন করবে কী, তার পেটের ভেতর গিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়বে। ওম্নি ঝিনুক তার ডালা বন্ধ করে ফেলবে। সেই ডালা খুলে তুমি আর কখনো বের হতে পারবে না। চিরজীবনের জন্যে ঝিনুকের ভেতর আটকা পড়ে যাবে। তুমি কি আমার কথায় রাগ করছ?'

'জি না।'

'শোন রুমালী আমি কথা খুব কম বলি। আবার মাঝে মাঝে যখন মেজাজ খারাপ হয় তখন প্রচুর কথা বলি। প্রচুর কথা বলায় আমার নিজের লাভের মধ্যে লাভ এই হয়—যার সঙ্গে কথা বলি সে যায় রেগে।'

'আমি রাগিনি, রাগ করার মতো কোনো কথা আপনি বলেননি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এখন বলব—কথাটা হচ্ছে—তুমি আমার পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করবে না। বড় জাহাজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছোট্ট একটা নৌকা থাকে। জাহাজ যেখানে যায় নৌকা জাহাজের পেছনে পেছনে সেখানে যায়। এই নৌকাকে বলে 'গাধাবোট'। আমি জাহাজ কি না জানি না, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি—আমার সঙ্গে সব সময় চার পাঁচটা গাধাবোট থাকে। গাধাবোট আমার কাছে অসহ্য লাগে।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। পাপিয়া ম্যাডাম এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর শেষ কথাগুলিতে আমি কী রকম কষ্ট পেলাম তা দেখার জন্যেও একবার পেছনে ফিরলেন না। মজার ব্যাপার হল আমি একেবারেই কষ্ট পাইনি। বরং আমার একটু হাসি পাচ্ছে। কাউকে কষ্ট দেব এটা আগেভাগে ঠিক করে কেউ যখন কিছু করে তখন আর কষ্ট লাগে না। আরেকটা ব্যাপার হতে পারে—মা'র সঙ্গে থেকে থেকে আমার গায়ের চামড়াও হয়ত খানিকটা শক্ত হয়েছে।

'বকুল, শুনে যাও।'

আমি পেছন ফিরলাম। ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ডাকছেন। তিনি বেশ আয়েশ করে বসেছেন। পাপিয়া ম্যাডাম যে চেয়ারে বসেছিলেন সেই চেয়ারে পা তুলে দিয়েছেন। এতক্ষণ চোখে সানগ্লাস ছিল না, এখন চোখে সানগ্লাস। পাপিয়া ম্যাডামের ফেলে যাওয়া সানগ্লাসটাই তাঁর চোখে। তাঁর মুখ আকাশের দিকে ফেরানো। গা এলানো গা এলানো ভাব।

ক্রেন ট্রলিতে কোনো একটা সমস্যা হচ্ছে। ট্রলি খোলা হচ্ছে। মনে হয় সমস্যা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত শুটিং শুরু হবে না।

আমি ডিরেক্টর সাহেবের পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি চেয়ার থেকে পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, বোস। আমি বসলাম।

'তুমি কেমন আছ?'

'জি ভাল।'

'চণ্ডিগড় জায়গাটা সুন্দর না?'

'জি।'

'আমার কাছে তত সুন্দর লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে আউটডোর বান্দরবানে ফেললে ভাল হত। তুমি বান্দরবানে কখনো গিয়েছ?'

'জি না।'

'খুব সুন্দর। একটা পাহাড়ি নদী আছে। নদীর নাম—শংখ নদী। খুব সুন্দর

ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। কারণ তিনি সানগ্লাস পরে আছেন। সানগ্লাস পরা মানুষ কোন দিকে তাকিয়ে আছে তা বোঝা যায় না বলে কথা বলে ভাল লাগে না। তা ছাড়া ডিরেক্টর সাহেবও আমার সঙ্গে দায়সারা ভাবে কথা বলছেন। এই মুহূর্তে তাঁর কিছু করার নেই বলেই কথা বলে সময় কাটানো। কথা বলার জন্যে তাঁর সব সময় কাউকে না কাউকে দরকার। পাপিয়া ম্যাডাম নেই কাজেই আমাকে দরকার। আমি না থাকলে তিনি অন্য কাউকে ডেকে নিতেন। ফিল আপ দ্যা ব্ল্যাংক। শূন্যস্থান পূরণ।

'বকুল!'

'জি।'

'দেখি একটা প্রশ্নের জবাব দাও—তোমার বুদ্ধি কেমন পরীক্ষা করা যাক। ব্যাপারটা হচ্ছে কী—তিনটা পিঁপড়া সরি বেঁধে যাচ্ছে। একজনের পেছনে একজন। সবার প্রথম যে পিঁপড়াটা যাচ্ছে সে বলল, আমার পেছনে আছে দু'টা পিঁপড়া। মাঝখানের পিঁপড়াটা বলল, আমার সামনে আছে একটা পিঁপড়া, পেছনে আছে একটা পিঁপড়া। মজার ব্যাপার হচ্ছে সবচে পেছনে যে পিঁপড়াটা যাচ্ছে সে বলল—আমার সামনে কোনো পিঁপড়া নেই, আমার পেছনে আছে দু'টা পিঁপড়া। সে এ রকম বলছে কেন?'

আমি চুপ করে রইলাম। এই ধাঁধার উত্তর আমি জানি। এর উত্তর হচ্ছে—সবচে পেছনের পিঁপড়াটা চালবাজ এবং মিথ্যুক। সে মিথ্যা কথা বলছে। কেউ যদি ধাঁধা জিজ্ঞেস করে তার মনে মনে আশা থাকে ধাঁধার জবাব কেউ পারবে না। যদি কেউ পেরে যায় তাহলে প্রশ্নকর্তার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি ডিরেক্টর সাহেবের মন খারাপ করতে চাইলাম না। আমি এমন ভাব করলাম যে ধাঁধার জবাব আমার জানা নেই। আমি আকাশ পাতাল ভাবছি। ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না।

'পারছ না?'

'পারব। আমার একটু সময় লাগবে।'

'কোনো অসুবিধা নেই। সময় নাও। যত ইচ্ছা সময় নাও।'

'আচ্ছা পিঁপড়া তিনটা কি আসলেই একটার পর একটা যাচ্ছিল?'

'অবশ্যই।'

'এরা হঠাৎ উল্টো দিকে চলা শুরু করেনিতো?'

'না।'

'আমি পারছি না।'

'পারছ না? খুব সহজ, শেষের পিঁপড়াটা দারুণ মিথ্যুক। সে মিথ্যা কথা বলছিল। মানুষের মধ্যে যেমন মিথ্যুক আছে পিঁপড়াদের মধ্যেও আছে। হা হা হা হা।'

ডিরেক্টর সাহেব উচ্চ স্বরে হাসতে লাগলেন। উনার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে পানি এসে গেল। হঠাৎ করেই এসে গেল। উনি ভাবলেন—ধাঁধার জবাব দিতে না পারার কারণে লজ্জায় এবং অপমানে আমার চোখে পানি এসেছে। তিনি খুবই অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

'আরে বোকা মেয়ে কাঁদছে কেন? এটা একটা ফালতু ধরবেন ধাঁধা। তোমাকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। আচ্ছা যাও প্রতিজ্ঞা করছি—এই জীবনে তোমাকে আর ধাঁধা জিজ্ঞেস করব না। প্লিজ চোখ মোছ।'

আমি উড়নায় চোখ মুছলাম।

'যাও রেস্ট হাউসে চলে যাও। বিশ্রাম কর। গল্পের বই-টই পড়। আজ তোমার কোনো কাজ হবে না। আর শোন মেয়ে একটা কথা বলি—কিছু না পারলেই কেঁদে ফেলতে হবে এটা ঠিক না। তুমি তোমার এক জীবনে দেখবে অনেক কিছুই পারছ না। প্রতিবারই যদি কাঁদতে থাক তাহলে তোমার জীবন যাবে কাঁদতে কাঁদতে। এটা ঠিক না।'

আমি চলে যাচ্ছি। ডিরেক্টর সাহেব এখন যদি আমাকে দেখতেন— তাহলে অবাক হতেন। আমার চোখ শুকনা এবং ঠোঁটে হাসি। বিষাদের হাসি না, আনন্দের হাসি। হঠাৎ এত আনন্দ হচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না। আমার নিজের অনেক কিছুই আমি এখন বুঝতে পারি না। শিমুল গাছের নিচে আমি দীর্ঘসময় দাঁড়িয়েছিলাম। কেন দাঁড়িয়েছিলাম? শুটিং দেখার জন্যে? কাজ শেখার জন্যে? না, তা না। আমি দাঁড়িয়েছিলাম যাতে ডিরেক্টর সাহেবকে দেখতে পাই। এই মানুষটাকে আমার এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না। তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই আমার চোখে পানি আসে। এর মানেই বা কী? ভয়ংকর একটা ঘটনা আমার ভেতর ঘটে গেছে। কেন ঘটল, কীভাবে ঘটল, আমি জানি না। আমার জানতে ইচ্ছেও করে না। এই ভদ্রলোক আজ যদি আমাকে ডেকে বলেন—বকুল শোন, তুমি একটা কাজ কর। আমি একটা মৃত্যু দৃশ্যের শট নেব। তুমি ঐ যে পাহাড়টা দেখা যায়—পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঝাঁপ দিয়ে নিচে পড়।

আমি তখনই তা করব। কেন করব কী জন্যে করব তা আমি জানি না। কিন্তু আমি অবশ্যই করব। আমি আবার হাসলাম। আমি জানি হাসলে আমাকে খুব সুন্দর দেখায়। আমি কি কখনো আমার হাসি উনাকে দেখাতে পারব? না, পারব না। কারণ আমি তাঁকে কিছু দেখাতে চাই না। আমি কাউকেই কিছু দেখাতে চাই না। নিজেকেও না। আমি নিজেকে নিজের কাছে আড়াল করে রাখতে চাই।

রোদ আরো বেড়েছে। চারদিকে ঝকঝক করছে। গল্প উপন্যাসে মাটির গন্ধের কথা পড়েছি। আমি মাটির গন্ধ পাচ্ছি। কড়া গন্ধ। এই গন্ধে ঝিম ধরানো ভাব থাকে। কিছু গন্ধ থাকে যা গায়ে মাখতে ইচ্ছা করে। মাটির গন্ধ হল সে রকম গন্ধ। ফুলের গন্ধ গায়ে মাখতে ইচ্ছা করে না। সুন্দর কোনো কৌটায় জমিয়ে রাখতে ইচ্ছা করে।

আমি এলোমেলো পা ফেলে হাঁটছি। আমার মা বোধ হয় এখনো জানেন না যে আমি রোদের মধ্যে হাঁটছি। জানতে পেলে ছুটে আসতেন। গ্রামে আমার এই প্রথম আসা। যা দেখছি তাই ভাল লাগছে। মুগ্ধ হয়ে একটা বরই গাছের সামনে দাঁড়ালাম। বরই গাছতো কতই দেখেছি। বরই গাছ দেখে কখনো মুগ্ধ হইনি। এই গাছ দেখে মুগ্ধ হচ্ছি কারণ পুরো গাছ সোনালি রঙের চাদর দিয়ে ঢাকা। খুব সরু সোনালি লতা গাছটাকে ঢেকে ফেলেছে। রোদের আলোয় ঝলমল করছে। ক্যামেরা সঙ্গে থাকলে ছবি তুলতাম। ক্যামেরা সঙ্গে নেই—মা'র ব্যাগে আছে। ছোট্ট ভিভিটার ক্যামেরা হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা যায়। ছোট্ট হলেও দামি—খুব ভাল ছবি ওঠে।

এই ক্যামেরাও মা'র উপার্জন। তিনি একদিন বাবার কাছে গিয়ে বললেন—পরশু তোমার মেয়ের জন্মদিন। সে ষোল বছরে পড়ল। এই মেয়েতো পথে ফেলে দেয়া মেয়ে। তার জন্মদিনে তুমি আসবে এটা আমরা ভাবি না—তোমাকে আসতেও বলব না। তোমার মেয়ে তোমার কাছে একটা উপহার চেয়েছে, তাকে তুমি একটা দামি ক্যামেরা দেবে। অটোমেটিক ক্যামেরা। তোমার কাছেতো মেয়ে মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু চায়নি—এই প্রথম চাচ্ছে। তুমি কিনে এনে রাখবে আমি কাল এসে নিয়ে যাব। বায়তুল মোকাররমের দোকানে পাওয়া যায়। দেখে শুনে কিনবে— সেকেন্ড হ্যান্ড যেন না হয়। সিঙ্গাপুর মেড না, জাপান মেড।

বাবা ক্যামেরা কিনে দিলেন। মা ঝলমল মুখে ক্যামেরা নিয়ে এলেন।

আমি মা'কে বললাম, ক্যামেরা ভিক্ষা চাইতে তোমার লজ্জা লাগল না মা?

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, লজ্জা লাগবে কেন? তুই তার মেয়ে না? নাকি আমি অন্য মানুষের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে তোকে পেটে এনেছি!

'ছিঃ মা, এইসব কী ধরনের কথা?'

'তুই যে ধরনের কথা বলিস তার উত্তরে এইসব কথাই বলতে হয়। আমাদের যা দরকার আমরা আদায় করে নেব। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবে পারি আদায় করব।'

'এই ক্যামেরা আমি নেব না মা।'

'নিতে না চাইলে নিবি না। আমার কাছে থাকবে। তোর নাটক-টাটকের রেকর্ডিং যখন হবে তখন এই ক্যামেরায় আমি তোর ছবি তুলব।'

'এই ক্যামেরায় আমি কোনোদিন আমার ছবি তুলতে দেব না।'

'না দিলে না দিবি।'

মা খুব আনন্দিত। আমার কঠিন কথাতেও তাঁর আনন্দের কোনো কমতি হল না। তিনি হাসি মুখে ক্যামেরা গুছিয়ে রাখলেন। বুঝতে পারছি জিনিসটা তাঁর খুব পছন্দ হয়েছে। আমার যখন কোনো রেকর্ডিং থাকে—মা হাসিমুখে ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হন। আশেপাশে কে আছে না আছে কোনো খেয়াল না করে বলেন—দেখি বকু, আমার দিকে তাকা। মুখটা হাসি হাসি কর। ওমা ঠোঁটটা আরেকটু ফাঁক কর—এত অল্প ফাঁক না। দেখি, চুলগুলি সামনে এনে দে না। উঁহু ডান দিকে না, বাম দিকে। মুখটা একটু উঁচু কর। চোখে আলো পড়ছে না, চোখ অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। হয়েছে—এখন বল 'চিজ'।

'আমি বলি—চিজ।'

মানুষ যদি ঝিনুকের মতো হয় তাহলে আমি মায়ের ঝিনুকের ভেতর বসে আছি। মা ডালা বন্ধ করে রেখেছেন। ডালাবন্ধ ঝিনুকের ভেতরের গরমে আমার অসহ্য বোধ হলেও আমিতো জানি মা ভালবাসার রসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে আমাকে মুক্তা বানানোর চেষ্টা করছেন। পরিপূর্ণ মুক্তা

হবার পর ঝিনুক কী করে? ডালা খুলে মুক্তা উগরে ফেলে দেয়? না–কি চিরজীবন বুকের ভেতর ধরে রাখে?

'কী দেখছেন?'

আমি চমকে তাকিয়ে দেখি সেলিম ভাই। আমাকে প্রশ্নটা করে তিনি নিজেই যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছেন। সেলিম ভাই আমাদের ইউনিটের সঙ্গে আছেন। তাঁর কাজটা কী এখনো জানি না। তিনি অভিনেতাদের কেউ না। কারণ তিনি শিল্পীদের সঙ্গে থাকেন না, বা শিল্পীদের সঙ্গে খেতেও বসেন না। তিনি থাকেন ইউনিটের লোকদের সঙ্গে। খাওয়া দাওয়াও তাদের সঙ্গে করেন। তবে ইউনিটের কোনো কাজ করেন না। খুবই বিব্রত ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ান। যেন সিনেমার দলের সঙ্গে ঢুকে পড়ে খুব লজ্জায় পড়েছেন। আমি সেলিম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বললাম, বরই গাছটা কেমন সোনালি চাদর গায়ে দিয়ে জড়সড় হয়ে আছে তাই দেখছি। খুব সুন্দর না?

'জি সুন্দর। এই লতাটার নাম স্বর্ণলতা।'

'আপনি কি খুব গাছগাছড়া চেনেন?'

'গ্রামের ছেলেতো—গাছ চিনব না কেন?'

'আপনি গ্রামের ছেলে?'

'জি। স্কুল কলেজ সবই গ্রামে। গ্রামে থেকেই বিএ পাস করেছি।'

'এখন কী করছেন?'

'কিছু করছি না। এমএ পড়ার শখ ছিল। টাকা পয়সা নেই। বিএ পরীক্ষার রেজাল্টও ভাল হয়নি। এই রেজাল্টে এমএ ক্লাসে ভর্তি হওয়াও সমস্যা।'

'আপনার রেজাল্ট কী?'

'সেকেন্ড ক্লাস তাও খুব নিচের দিকে। থার্ড ক্লাস হতে হতে হয়নি।'

'সিনেমার দলের সঙ্গে ঘুরছেন কেন?'

'আমি মঈন স্যারের কাছে গিয়েছিলাম একটা চাকরির জন্য। উনি বিখ্যাত মানুষ—উনার কত জানাশুনা, উনি একটু বলে দিলেই আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই আশায় যাওয়া। উনি বললেন—আমার সঙ্গে দুর্গাপুরে চল। চলে এসেছি।'

'ভাল করেছেন।'

'না, খুব ভাল করিনি। এক কাপড়ে চলে এসেছি।'

'এক কাপড়ে এলেন কেন?'

'স্যারকে চাকরির কথা বলতেই উনি বললেন, চল আমার সঙ্গে দুর্গাপুরে। আমি বললাম, জি আচ্ছা। এই বলেই স্যার ঘর থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠলেন। উনি যে তখনই দুর্গাপুর যাচ্ছেন তাতো আমি জানি না। উনি জিপে উঠলেন, জিপের পেছনে ইউনিটের বাস। আমি বাসে উঠলাম।'

'দুর্গাপুরে পৌছে উনি আপনাকে কিছু বলেননি?'

'জি–না। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে উনি বোধ হয় আমার কথা ভুলেই গেছেন। আমাকে হয়ত ইউনিটের কেউ ভাবছেন। আমি যে নিজ থেকে তাঁকে কিছু বলব সেই সাহসও আমার নেই। আমি উনাকে খুবই ভয় পাই।'

'সবাই ভয় পায়। আমিও ভয় পাই। আচ্ছা, আপনিতো গাছপালা খুব চেনেন। এই গাছগুলির নাম কী? সাদা সাদা ফুল।'

'এই গাছের নাম দলকলস। ফুলে খুব মধু হয়। বাচ্চারা ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মধু খায়।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। খেয়ে দেখুন।'

সেলিম ভাই ফুল তুলে দিলেন। ঠোঁটে লাগিয়ে কীভাবে টানতে হয় দেখিয়ে দিলেন। আমি টান দিতেই সত্যি সত্যি মুখের ভেতর মধু চলে গেল। হালকা মিষ্টি মধু। আশ্চর্যতো।

'আরো মধু খাবেন? ফুল তুলে দেব?'

'দিন।'

সেলিম ভাই ফুল তুলছেন। আমি মুখে দিচ্ছি, টেনে টেনে মধু নিয়ে ফুল ফেলে দিচ্ছি— আমার খুবই মজা লগাছে।

'বকু! এই বকু!'

আমি তাকিয়ে দেখি মা ছুটতে ছুটতে আসছেন। সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আমাকে দেখে মা'র নিশ্চয়ই আত্মা কেঁপে গেছে। তিনি যেভাবে ছুটছেন তা দেখে যে কেউ বলবে এই মাত্র তিনি কোনো ভয়াবহ দুঃসংবাদ শুনেছেন। আমার হঠাৎ কেন জানি ইচ্ছে হল মা'কে আরো ঘাবড়ে দি। সেলিম ভাইকে কি বলব, সেলিম ভাই কিছু মনে করবেন না—আপনি ত্রিশ সেকেন্ডের জন্যে আমার হাতটা একটু ধরুন তো। হাতটা ধরবেন এবং হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন—আর কিচ্ছু লাগবে না। বললাম না, কারণ এই ঘটনায় মা যতটা না ঘাবড়াবেন তারচে বেশি ঘাবড়াবেন সেলিম ভাই।

থাক দরকার নেই। আমি মা'র দিকে তাকিয়ে আছি, তিনি উন্মাদিনীর মতোই ছুটে আসছেন। তিনি তাঁর ঝিনুক-কন্যাকে পেটের ভেতর ঢুকিয়ে ডালা বন্ধ করে দেবেন। অনেকক্ষণ ধরে মেয়ে ঝিনুকের বাইরে। আর সময় দেয়া যায় না।

আমি মা'র দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সেলিম ভাই বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দলকলস গাছের নামটা বলার জন্যে তাঁকে একটা ধন্যবাদ দেয়া উচিত। ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করছে না।

মা ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাওয়ার মতো করছেন। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছেন। ছুটে আসার ধকল কাটাচ্ছেন। তাঁর শরীরের অবস্থা যা ছোটাছুটি কমিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু মা সহজ স্বাভাবিকভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে পারেন না—তাঁকে কিশোরী মেয়েদের মতো ছুটে যেতে হবে এবং ফলস্বরূপ অনেকক্ষণ ধরে খাবি খেতে হবে।

'বকু পানি খাব।'

'এইখানে পানি কোথায় পাবে? তুমি অলিম্পিকের দৌড় দিলে, ব্যাপার কী মা? আচ্ছা থাক এখনি জবাব দিতে হবে না। তুমি সুস্থ হয়ে নাও। বসবে? ঘাসের উপর বসে পড়। শাড়ি নষ্ট হলে হবে।'

মা ঘাসের উপর বসে পড়লেন। আমি অপেক্ষা করছি কখন তিনি স্বাভাবিক হবেন।

'দারুণ এক ঘটনা বকু।'

'দারুণ ঘটনা শুনব, তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হোক।'

ঘটনা শুনলাম, আমার কাছে তেমন দারুণ কিছু মনে হল না। চণ্ডিগড় গ্রামে হাফিজ আলি বলে এক যুবক আছে। তার স্ত্রীর না-কি অদ্ভুত ক্ষমতা। যাকে যা বলে তাই হয়। সবাই এই মেয়েকে খুব মানে। মা বৌটির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। দেখা করে সেখান থেকেই দৌড়তে দৌড়তে আসছেন।

'মা, তোমার ধারণা বৌটার সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?'

'অবশ্যই আছে।'

'তোমাকে দেখে সে কী ভবিষ্যৎবাণী করল? ফড়ফড় করে কি বলে দিল—একদিন আপনার কন্যা বাংলাদেশের এক নম্বর নায়িকা হবে? তার এসি লাগানো গাড়ি থাকবে। গুলশানে বাড়ি থাকবে। বাড়িতে সুইমিং পুল থাকবে। সেই সুইমিং পুলে তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে সাঁতার কাটাবে।''

'সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা করিস না বকু। বৌটার ক্ষমতা আসলেই অস্বাভাবিক। আমি ওদের বাড়িতে গেলাম। বৌটা দরজা ধরে দাঁড়াল।'

'দেখতে কেমন মা?'

'দেখতে খারাপ না। সুন্দরই আছে। বয়স কমতো। কম বয়সের যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য।'

'তোমাকে কী বলল?'

'আমাকে দেখেই বলল, আপনার স্বামী দূর দেশে থাকেন। চিন্তা করবেন না উনি ফিরে আসবেন।'

'ভুয়া কথা। তোমার স্বামী দূর দেশে থাকে না, ঢাকা শহরেই থাকে, এবং সেই স্বামী কখনো ফিরে আসবে না।'

'তুই সব জেনে ফেলেছিস এই ভাবটা দূর করতো। এই দুনিয়ার তুই কিছুই জানিস না।'

'যা জেনেছি তাই আমার জন্যে যথেষ্ট। আর জানতে চাই না।'

'তুই আমার সঙ্গে চলতো বকুল। বৌটার কাছে তোকে নিয়ে যাই। দেখি বৌটা তোকে দেখে কী বলে।'

'আমি এইসব বিশ্বাস করি না মা। আমি মরে গেলেও ঐ মহিলা পীরের কাছে যাব না।'

'পীর না। খুব সাধারণ মেয়ে তবে খুব ক্ষমতা—কার মনের ভেতর কী আছে সব বলে দিতে পারে।'

'তাহলেতো আরো যাব না। আমার মনের ভেতর ভয়ংকর সব জিনিস আছে। এইসব জেনে ফেললে অসুবিধা আছে।'

'তোর মনের ভেতর কী আছে?'

'তোমাকেতো মা আমি বলব না। আর যদি মনের ভুলে কোনোদিন বলে ফেলি তুমি গলা টিপে আমাকে মেরে ফেলবে। আমি এখনি মরতে চাই না। আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই। মা দেখ দেখ জীবন বাবুর চিল। আকাশে উড়ছে।'

'জীবন বাবুর চিল মানে?'

'কবি জীবনানন্দ দাশের চিল—সোনালি ডানার চিল। কী অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঘুরপাক খাচ্ছে দেখেছ মা?'

'তুই আমার সঙ্গে বৌটার কাছে যাবি না?'

'না। এবং আমার একটা উপদেশ শোন মা, তুমিও যেও না। আগেভাগে ভবিষ্যৎ জানা খুবই ভয়ংকর ব্যাপার।'

'ভয়ংকর ব্যাপার কেন?'

'তুমি বাবার সঙ্গে সুন্দর কিছু সময় কাটিয়েছ না? তুমি যদি গোড়া থেকেই জানতে একদিন বাবা তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে তাহলে কি এত সুন্দর সময় কাটাতে পারতে?'

'তুই বেশি জ্ঞানী হয়ে যাচ্ছিস বকু। এত জ্ঞানী হওয়া ভাল না।'

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে আছি। আকাশে জীবন বাবুর চিল উড়ছে। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে চিলগুলি। হায় চিল, সোনালি ডানার চিল। এই ভিজে মেঘের দুপুরে...।

২

অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা মিলিয়েছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি—শত শত জোনাকি পোকা, জ্বলছে নিভছে। কী যে আশ্চর্য হচ্ছি। জোনাকি পোকা আগে দেখি নি তা না। অনেক দেখেছি। কিন্তু এত জোনাকি পোকা এক সঙ্গে কখনো দেখিনি। মনে হচ্ছে থোকায় থোকায় আলোর ফুল ফুটেছে। ফুলগুলি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। চঞ্চল অস্থির কিছু ফুল। পৃথিবীতে কত অদ্ভুত দৃশ্যই না আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জীবনের প্রথম জোনাকি পোকা দেখার দৃশ্যটাও খুব অদ্ভুত ছিল। বাবা-মা'র সঙ্গে ট্রেনে কোথায় যেন যাচ্ছি। রাতের ট্রেন। ট্রেনের বাতি হঠাৎ নিভে গেল। মা বিরক্ত হয়ে নানান কথা বলতে লাগলেন— "ছাতার এক দেশে ছাতার এক ট্রেন। এখন ডাকাত পড়বে জানা কথা"— এই সব। মায়ের কথা শুনে আমার ভয় ভয় করতে লাগল। মনে হচ্ছিল এই বুঝি দরজা জানালা দিয়ে হুড়মুড় করে একদল ডাকাত ঢুকে পড়বে। ডাকাত ঢুকল না। কীভাবে জানি একটা জোনাকি পোকা ঢুকে পড়ল। বাবা বললেন—রুমালী দেখ একটা জোনাকি পোকা। আমি অবাক হয়ে দেখছি কী সুন্দর আলো। এই জ্বলছে, এই নিভছে। বাবা বললেন—বেচারা জোনাকি একা একা ট্রেনে করে কোথায় যাচ্ছে কে জানে। আমারো মনে হল তাইতো—এর বন্ধু বান্ধব, সঙ্গী সাথী সব কোথায় পড়ে আছে। আর সে একা একা চলে যাচ্ছে। বাবা জোনাকি পোকাটা ধরে আমার হাতে দিয়ে বললেন— মুঠি বন্ধ করে ধরে থাক। আঙুলের ফাঁক দিয়ে আলো আসবে। আমি মুঠি বন্ধ করে ধরে আছি। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছে। মা বললেন, বকু এখনই জোনাকি পোকা জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দে। ফেলে দে বললাম।

আমি বললাম, কেন?

মা চাপা গলায় বললেন, গাধা মেয়ে, জোনাকি পোকা ধরে রাখলে রাতে বিছানা ভিজানো রোগ হয়।

আমি বললাম, বিছানা ভিজানো রোগটা কী?

মা আরো গলা নামিয়ে বললেন—প্রতি রাতে বিছানায় পেচ্ছাব করবি। গাধা মেয়ে। বিয়ের পরেও এই অভ্যাস যাবে না।

কী সর্বনাশের কথা। আমি জোনাকি পোকাটাকে জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম। সে যতক্ষণ উড়ে গেল আমি তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। যে হাতে পোকাটা ধরেছিলাম শুঁকে দেখি সেই হাতে কেমন অদ্ভুত দুর্বা ঘাসের গন্ধের মতো গন্ধ।

'মিস রুমাল!'

আমি চমকে দেখি সোহরাব চাচা। তাঁর হাতে প্রকাণ্ড বড় একটা বালতি। ফিল্ম লাইনের সবকিছুই খানিকটা উদ্ভট। এত বড় বালতি আমি আগে দেখিনি।

'কী করছ গো মা?'

'জোনাকি পোকা দেখি চাচা।'

'জংলা জায়গা। জোনাকি-ফোনাকি কত কিছু দেখবে। চা কফি কিছু খাবে?'

'জি না।'

'কিছু লাগলে বল—আমি বাজারে যাচ্ছি। পাপিয়া ম্যাডামের সবুজ কালির বল পয়েন্ট দরকার। এখন আমি সবুজ কালির বল পয়েন্ট কোথায় পাব কে জানে। নেত্রকোনা ছাড়া পাওয়া যাবে না।'

'নেত্রকোনা যাবেন?'

'এখানে না পেলে যাব।'

'আমি পাপিয়া ম্যাডাম হলে আপনাকে একটা জিনিস দিতে বলতাম।'

'জিনিসটা কী?'

'ফুলের মালার মতো একটা জোনাকি পোকার মালা। মালা গলায় দিয়ে বসে থাকতাম— মালা জ্বলতো নিভতো।'

'সোহরাব চাচা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় বললেন, আচ্ছা দেখি কী করা যায়। মৌমাছির মোম জোগাড় করতে পারলে জোনাকির মালা বানানো যাবে।

আমি বললাম, আমি ঠাট্টা করছিলাম চাচা। আপনাকে জোনাকির মালা বানাতে হবে না। আপনি ভারি বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বালতিটা রাখুন, তারপর কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করুন।

সোহরাব চাচা বালতি নামিয়ে রাখলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, বল কী গল্প শুনতে চাও।

তাঁর ভাবটা এ রকম যে—আমি যে গল্পই শুনতে চাই, তিনি সেই গল্পের রেকর্ড বাজিয়ে দেবেন।

'মহিলা পীরের গল্প বলুন।'

সোহরাব চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, মহিলা পীরটা কে?

'এই অঞ্চলে একজনের সন্ধান পাওয়া গেছে যে নিমিষের মধ্যে মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিতে পারে।'

'ও আচ্ছা—হাফিজ আলির বৌ এর কথা বলছ?'

'বৌটাকে আপনি দেখেছেন?'

'না, তাকে দেখিনি। হাফিজ আলিকে দেখেছি। সকালবেলা সে ছিলতো। কাঠ ফাড়াই করে দিল। ফাঁকিবাজের শেষ। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সারা দিনের জন্যে নিয়েছি। দুপুরের পর থেকে নেই।'

'তার বৌ যে ভবিষ্যৎ বলতে পারে এটা কি সত্যি!'

'আরে দূর দূর। গ্রামাঞ্চলে প্রায়ই এই জাতীয় খবর শুনবে। কারো এই ক্ষমতা, কারো সেই ক্ষমতা। সব বোগাস। আর মানুষের স্বভাব এরকম যে সে আসল জিনিস বিশ্বাস করে না। বোগাস জিনিস বিশ্বাস করে।'

'চাচা, ঐ মহিলার কাছে কি আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন?'

'কেন?'

'গ্রামের অল্পবয়েসী একটা মেয়ে কোন কৌশলে মানুষকে ধোকা দেয় এটা আমার দেখার শখ।'

সোহরাব চাচা বালতি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন—তুমি তো ভাল পাগলী আছ। বারান্দায় মশার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকো না। জংলি মশা। কামড় খেয়ে ম্যালেরিয়া ফ্যালেরিয়া বাঁধাবে। ঘরে চলে যাও। ঘরে ঘরে মসকুইটো কয়েল জ্বালিয়ে দিয়েছি।

আমি লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে চলে এলাম।

এমন কোনো রাত হয়নি কিন্তু চারদিক কেমন নিঝুম হয়ে গেছে। এই অঞ্চলের লোকরা মনে হয় সন্ধ্যা সাতটা বাজতেই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কেমন অস্বস্তি লাগছে। গাড়ির হর্নের শব্দ নেই, রিকশার শব্দ নেই। আমি বিছানায় উপুর হয়ে পড়লাম। ডাইরি লেখা যাক। পাপিয়া ম্যাডামের মতো সবজু কালির একটা বল পয়েন্ট আমার জন্যে আনতে বললে হত। ডাইরিতে ইন্টারেস্টিং কিছু কথা সবুজ কালিতে লিখতাম।

আমাদের আজ রান্না হতে দেরি হবে। রান্না কিছুক্ষণ আগে চড়ানো হয়েছে। পাপিয়া ম্যাডাম সন্ধ্যাবেলায় বলেছেন তাঁর খাসির মাংসের রেজালা খেতে ইচ্ছে করছে। বিরিসিরি থেকে খাসি কিনে আনা হয়েছে। এই মাত্র রান্না বসানো হল। আমাদের বাবুর্চির নাম কেয়ামত মিয়া। কেয়ামত কারো নাম হতে পারে? শুরুতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল নামটার কোনো সমস্যা আছে। একদিন জিজ্ঞেস করে দেখি আসলেই তাই। তাঁর নাম আসলে নেয়ামত। সবাই ঠাট্টা করে কেয়ামত ডাকতে ডাকতে এখন নাম গেছে কেয়ামত। এখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কী, তিনি স্বাভাবিক গলায় বলেন—আমার নাম কেয়ামত, কেয়ামত মিয়া।

কেয়ামত মিয়া রান্না খুব ভাল করেন। অতি সামান্য জিনিস এত যত্ন করে রাঁধেন যে শুধু খেতেই ইচ্ছে করে। প্রতিদিনই একটা না একটা অদ্ভুত আইটেম থাকবে। আজ দুপুরে ছিল শজনেপাতা ভাজি। শজনে গাছের কচিপাতা প্রচুর পেঁয়াজ আর সামান্য টক দিয়ে এমন একটা বস্তু বানালেন যে সবাই একবার করে বলল—কেয়ামত মিয়া এই ভাজিটা রোজ করবে।

আমি নিজে ডাইরিতে লিখলাম, আজ আমরা নতুন একটা খাবার খেলাম—শজনেপাতা ভাজি। খাবারটা এত ভাল হয়েছে যে আমার ধারণা এখন থেকে আমরা রোজই এই খাবার খাব। এবং যখন আমাদের শুটিং শেষ হবে তখন দেখা যাবে দুর্গাপুরের সব শজনে গাছ আমরা খেয়ে ফেলেছি। শজনেপাতা ভাজি রান্নার রেসিপি আমরা পেয়ে গেছি। পাপিয়া ম্যাডাম রেসিপি চেয়েছিলেন তাঁকে দেয়া হয়েছে, এবং ছোট ম্যাডাম হিসেবে আমাকেও দেয়া হয়েছে।

শজনেপাতা ভাজি

পেঁয়াজ দুই কাপ
রশুন আধা কাপ
তেঁতুলের রস আধা কাপ
কাঁচা মরিচ আধা কাপ
শুকনো মরিচ দশটা
শজনেপাতা এক গামলা

বসন্তের নতুন শজনেপাতা কুচি কুচি করে কেটে তেঁতুল পানিতে সারা দিন ডুবিয়ে রাখতে হবে। ভাজার আগমুহূর্তে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে। লবণ পানিতে ধুয়ে কষ ফেলে দিতে হবে। এক কাপ পেঁয়াজ তেলে ভাজবে। পেঁয়াজ বাদামি বর্ণ হয়ে যাবার পর শজনেপাতা,. এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এবং আধা কাপ রশুন কুচি তেলে ফেলে দিয়ে অল্প আঁচে ভাজতে হবে। শজনেপাতা তেল টেনে নেবার পর আরো আধা কাপ পানি দিয়ে দমে বসিয়ে দিতে হবে। পরিবেশনের আগে মুচমুচে করে ভাজা শুকনো মরিচ খাবারের উপর দিয়ে দিতে হবে। গরম ভাতের সঙ্গে শজনেপাতা ভাজি অতি উপাদেয়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই রেসিপিটা মিথ্যা রেসিপি। সোহ্‌রাব চাচা বিকেলে আমাকে এসে বললেন—মিস রুমাল আমাকে একটু সাহায্য করতো—একটা কাগজে শজনেপাতা ভাজির রেসিপি লিখে দাও। পাপিয়া ম্যাডাম বড় যন্ত্রণায় ফেললেন—কিছু একটা রান্না হলেই রেসিপি।

আমি বললাম, কীভাবে রান্না হয় আপনি বলুন, আমি লিখে দিচ্ছি।

'বানিয়ে বানিয়ে একটা কিছু লিখে দাওতো। তোমার কি ধারণা রেসিপি দেখে উনি জীবনে কখনো রান্না করবেন?'

'রান্না না করলে চাচ্ছেন কেন?'

'কেন চাচ্ছেন তা একমাত্র আল্লাহ্ পাকই জানেন। মা লক্ষ্মী তুমি সুন্দর করে একটা রেসিপি লিখে দাও।'

'যা ইচ্ছা লিখে ফেলব?'

'লিখে ফেল।

আমি রান্নার বইয়ের মতো করে রেসিপি লিখে ফেললাম। যখন লিখছি তখন ঘাড়ের উপর মা ঝুঁকে এসে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন—বকু কী লিখছিস। ডাইরি? আমাকে কোনো কিছু লিখতে দেখলেই মা উদ্বিগ্নবোধ করেন। ভাবেন নিষিদ্ধ কিছু বোধ হয় লিখছি।

আমি দু'হাতে লেখাটা ঢেকে বললাম, আমার যা মনে আসছে লিখছি তুমি পড়বে না।

'উপুর হয়ে লেখালেখি করবি নাতো—ফিগার খারাপ হয়ে যায়।'

'প্লিজ, তুমি যাওতো মা।'

মা মুখ কালো করে চলে গেলেন। তবে তাঁর মন পড়ে রইল ডাইরিতে। না জানি তাঁর কন্যা কী গোপন কথা লিখে ফেলেছে। এই গোপন কথা জানার জন্যে মা কোনো না কোনো সময়ে তাঁর কন্যার ডাইরি পড়বেন। আমার ধারণা আজ রাতেই এই কাজটা করবেন। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর চাবি দিয়ে আমার সুটকেস খুলে অতি দ্রুত পড়ে ফেলবেন। উত্তেজনায় এই সময় তাঁর নাক ঘামতে থাকবে। কাণ্ডটা করে তিনি যেন একটা শক পান সেই ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। দলকলস গাছ প্রসঙ্গে লিখতে লিখতে এক ফাঁকে কিছু নিষিদ্ধ গোপন কথা জুড়ে দিয়েছি। তার একটা লাইন খুব ভাল করে কাটা যাতে মা কিছুতেই সেই লাইনের পাঠোদ্ধার করতে না পারেন। মা জানবেন না কী লেখা হয়েছিল, ছটফট করতে থাকবেন। আমি লিখেছি—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দলকলস মধু

আজ ভোমরার মতো ফুল থেকে মধু খেয়েছি। দুপুরের দিকে একা একা হাঁটছিলাম তখন সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল। খুব চমৎকার একজন মানুষ। হ্যান্ডসাম, বুদ্ধিমান। আমরা দু'জন অনেক গল্প করলাম। উনিই গল্প করলেন, আমি শুধু শুনে গেলাম। উনি আবার গাছপালা খুব ভাল চেনেন। আমাকে স্বর্ণলতা চিনিয়ে দিলেন—তারপর চিনিয়ে দিলেন দলকলস গাছ। এই গাছ থেকে কীভাবে মধু পান করতে হয় তাও শেখালেন। তারপর নিজেই একগাদা ফুল এনে দিলেন। আমি ফুল থেকে মধু খাচ্ছি উনি হঠাৎ বললেন—রুমালী তোমাকে ঠিক ভোমরার মতো লাগছে। ভোমরা যেমন ফুলের মধু খায় তুমিও খাচ্ছ—তাই। উনি আমাকে রুমালী ডাকেন। তবে সবার সামনে না, আড়ালে। সবার সামনে আমাকে বকুল বলেন এবং আপনি করে ডাকেন। আমি তাঁকে বলেছি—সবার সামনে আমাকে আপনি বলার দরকার কী? আমিতো সিনিয়ার কোনো ম্যাডাম না, আমার বয়স মাত্র সতেরো। উনি বললেন, আঠারো হোক তখন সবার সামনে তুমি বলব। কে জানে এই কথাটার মানে কী? আমি বড়দের সব কথা বুঝতে পারি না। দেখি একবার কায়দা করে মা'কে জিজ্ঞেস করব। মাকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞেস করা যাবে না। তিনি অনেক কিছু সন্দেহ করবেন।

এইটুক লিখে আরো দু'টা লাইন লিখে খুব ভালমতো কালি দিয়ে কেটে দিয়েছি। পরিষ্কার বুঝতে পারছি পড়ার পর মা'র ঘাম দিয়ে জ্বর এসে যাবে। বুক ধড়ফড় করতে থাকবে। এমনও হতে পারে তাঁর জিবের নিচে এনজিস্টও দিতে হতে পারে। আমি চাচ্ছি আজ রাতেই মা ডাইরিটা পড়ুক। কাজেই আমি আজ যা করব তা হচ্ছে ডাইরিটা সুটকেসে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে রাখতে ভুলে যাব।

মা এখন কফি খাচ্ছেন এবং আড়ে আড়ে আমাকে দেখছেন। কফি নিশ্চয়ই পাপিয়া ম্যাডামের জন্যে বানানো হয়েছিল। রাতের খাবারের দেরি হবে সে জন্যেই কফি। খবর পেয়ে মা নিজের কন্যার জন্যে নিয়ে এসেছেন। আমি যেহেতু কফি খাই না—তিনি নিজেই চুকচুক করে খাচ্ছেন। ইউনিটে কোনো একটা খাবার রান্না হলে—মা তা খাবেন না—তা কখনো হবে না। মা কফি খেতে খেতে জালালের মা'র সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছেন।

জালালের মা একজন এক্সট্রা। তিনি আমাদের ছবিতে কাজের বুয়ার চরিত্রে অভিনয় করবেন। রিটায়ার্ড পুলিশের বড় কর্তার বাসায় এই বুয়া ছোটবেলা থেকে আছে। ছুটি কাটাতে সবাই যখন এসেছে বুয়াকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

জালালের মা রাতে আমাদের ঘরে থাকেন। আমরা সবাই থাকি দুর্গাপুর পিডাবলিউডি রেস্ট হাউসে। আমাদের ঘরে দু'টা খাট। একটা খাটে আমি আর মা—আরেকটা খাটে জালালের মা। রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, মা এবং জালালের মা সহজে ঘুমান না, তাঁদের গল্প চলতেই থাকে। ফিসফিস গুজগুজ। জালালের মা ছবির জগতের সব স্ক্যান্ডালের গল্প জানেন। বলার সময় এমন ভাবে বলেন যেন ঘটনাটা তার নিজের চোখের সামনে ঘটেছে। মা প্রতিটি গল্প খুব আগ্রহের সঙ্গে শোনেন এবং প্রতিটি গল্পই বিশ্বাস করেন। অবিশ্বাস্য গল্পগুলিই বেশি বিশ্বাস করেন।

এখন যে গল্প হচ্ছে আমি তা শুনতে পাচ্ছি। যদিও গল্প ফিসফিস করে বলা হচ্ছে—আমার কান খুব পরিষ্কার। মশারা যদি কথা বলতে পারত তাহলে মশাদের গুনগুন কথাও শুনতে পেতাম।

'বুঝছেন আপা—টেকনাফে আউটডোর পড়ছে। চিত্রা প্রডাকশানের ছবি 'ডাকু সর্দার'। নায়িকা হলেন মহুয়া ম্যাডাম। ম্যাডামের প্রথম ছবি। প্রথম ছবি যখন করে তখন ম্যাডামদের মাথার ঠিক থাকে না। কী করে না করে নিজেও বুঝে না। মাথার মধ্যে থাকে ছবির জগতে যখন আছি তখন উল্টা পাল্টা কাজ করাই লাগবে। বুঝছেন আপা, মনে হলে এখনো গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়— ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালালের মা গলা আরো নিচু করে ফেলল। আমি দেখি মায়ের মুখ হা হয়ে গেছে, চোখ বড় বড়। যেন এমন আনন্দময় গল্প তিনি কখনো শোনেননি। তাঁর কর্ণ আজ স্বার্থক।

সন্ধ্যাবেলা ম্যাডাম চা খেতে গিয়েছেন, ব্লাউজের দু'টা হুক খোলা, ইচ্ছা করে খোলা। ব্লাউজের নিচে 'ইয়েও' নেই। গরম বেশি বলে পরেননি। কারণ ছাড়াই ম্যাডামের হাহা হিহি হাসি। একেকবার হাসেন আর কাঁধ থেকে শাড়ির আঁচল পড়ে যায়।

গল্পে বাধা পড়ল। সোহরাব চাচা এসে বললেন, মিস রুমাল—যাও, স্যার ডাকছেন।

আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই মা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সোহরাব চাচা বললেন, ভাবী আপনার যাবার দরকার নেই। স্যার কালকের শুটিং কী হবে বুঝিয়ে দেবেন।

মা বললেন, সর্বনাশ, আমাকে থাকতেই হবে। বকু কিছু মনে রাখতে পারে না। আমাকেই সব মনে রাখতে হবে।

'আসুন তা হলে। দেরি করবেন না।'

মা বললেন, দেরি হবে না। এখনই আসছি।

সোহরাব চাচা ঘর থেকে বের হতেই মা বললেন, বকু চুল আচড়ে চট করে কপালে একটা টিপ দিয়ে নে।

আমি বললাম, আমিতো শুটিং এ যাচ্ছি না মা। স্ক্রিপ্ট বুঝতে যাচ্ছি।

'ফকিরনীর মতো যাবি? উনি কী ভাববেন?'

'সেজেগুজে গেলেই তো অনেক কিছু ভাবার কথা।'

'তার মানে?'

'উনি ভাবতে পারেন আমি তাঁর সঙ্গে প্রেম করতে চাচ্ছি। তাঁকে ভুলাতে চাচ্ছি।'

মা হতভম্ব হয়ে গেলেন। চোখ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জালালের মা যেখানে বসেছিলেন সেদিকে তাকালেন। কিছুটা স্বস্তি পেলেন। জালালের মা নেই। সোহরাব চাচাকে ঢুকতে দেখেই তিনি চলে গেছেন। এই মহিলা সোহরাব চাচাকে যমের মতো ভয় করেন। মা বললেন, এ রকম কথা তুই কীভাবে বললি?

আমি বললাম, ভুলতো মা বলিনি। মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার দিকে তোমার মঈন ভাইয়ের ঝোঁক আছে। দেখ না এখন পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে প্রেম করছেন

'তুই এমন কুৎসিত কথা বলছিস কীভাবে!'

'প্রেম কুৎসিত হবে কেন মা?'

'আর একটা কথা বলবি তো টেনে জিভ ছিড়ে ফেলব। বাঁদরামি যথেষ্ট করেছিস।'

আমি কথা বাড়ালাম না। চুল আঁচড়ালাম, কপালে টিপ দিলাম। মা অতি দ্রুত তাঁর শাড়ি পাল্টালেন। মুখে পাউডার দিলেন। ঠোঁটে লিপস্টিক দিলেন।

'এই বকু আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?'

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, খুব ভাল দেখাচ্ছে। উনি যদি তোমার প্রেমে পড়ে যান আমি মোটেও অবাক হব না। তোমাকে রানীর প্রিয় সখীর মতো দেখাচ্ছে।

মা আচমকা আমার গালে চড় বসালেন। তারপর বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমাকে নিয়ে রওনা হলেন যেন কিছুই হয়নি।

ডিরেক্টর সাহেব তাঁর ঘরে একা বসে আছেন। পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছেন বলে তাঁকে প্রফেসর প্রফেসর লাগছে। তাঁর চুল সুন্দর করে আঁচড়ানো। মনে হয় কিছুক্ষণ আগে গোসল করে চুলটুল আঁচড়ে ভদ্র হয়েছেন। গা থেকে হালকা মিষ্টি গন্ধও আসছে। আফটার শেভ এর গন্ধ হতে পারে। মুখে মাখা ক্রিমের গন্ধ হতে পারে। আবার সাবান দিয়ে গোসল করা হলে সাবানের গন্ধও হতে পারে। আমার নাক কুকুরের নাকের মতো—খুব তীক্ষ্ণ।

আজ তাঁকে অল্প বয়স্ক মনে হচ্ছে, কারণ চুলে কলপও দিয়েছেন। চুলে কলপ দেয়া স্টেজে যারা চলে যান তাদের দেখতে খুব মজা লাগে। বুড়োটে ধরনের মানুষ হঠাৎ একদিন দেখা যায় কুচকুচে কালো চুলের একজন মানুষ। হাবভাব যুবকের মতো। এরা আবার রঙচঙে শার্ট পরতেও ভালবাসে। চুলে যেমন কলপ লাগায়—মনেও খানিকটা লাগায়।

'বকুল এবং বকুল মাতা গেট সিটেড। বসে পড়ুন।'

আমরা সামনের খাটে বসলাম। মা বললেন, ভাই সাহেব কেমন আছেন? ইস্, আপনার উপর খুব কাজের চাপ যাচ্ছে। আপনাকে দেখি আর অবাক হই। একটা মানুষ এত কাজ কীভাবে করে। আমি বকুলকে বলছিলাম—তোর চাচাকে দেখে শেখ, কর্মযোগী কাকে বলে। সকাল বিকাল দু'বেলা উনার পায়ের ধুলা নিয়ে কপালে ঘষবি এতে যদি কপালের উনিশ বিশ হয়। যে কপাল নিয়ে জন্মেছিস সে কপালে কিছু হবে না। তোর বাবা থেকেও নেই। এখন ওর মুরুব্বি বলতেও আপনি, বাবা বলতেও আপনি।

ডিরেক্টর সাহেব শান্ত ভঙ্গিতে শুনে যাচ্ছেন। উনি রাগ করছেন কি-না বুঝতে পারছি না। মনে হয় রাগ করছেন না। মা'র স্বভাব তিনি জেনে গেছেন। এই স্বভাবের মানুষের উপর রাগ করা যায় না। আমি ডিরেক্টর সাহেব হলে রাগ করতাম না। বরং মনে মনে হাসতাম।

মা কথা বলেই যাচ্ছেন। থামছেন না। "মা চুপ করতো"—বলে মা'কে আমি থামাতে পারি। ইচ্ছে করছে না। যার থামাবার সে থামাবে—আমার কী?

'মঈন ভাই, আমার মেয়ের গলায় একটা গান কিন্তু আপনার ছবিতে রাখতে হবে। আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট। দুই লাইনের একটা গান হলেও তার গলায় রাখবেন। সবচে ভাল হয় নিজের গান সে যদি নিজে গায়। আপনি ওর গান শুনে দেখুন। যদি পছন্দ না হয় তখন প্লে ব্যাক সিঙ্গার নেবেন। ভাই আমার মেয়ের একটা গান আপনি শুনে দেখুন। পথহারা পাখি গানটা সে কী সুন্দর যে গায়। বকু, চাচাকে গানটা গেয়ে শোনা।'

ডিরেক্টর সাহেব হাসলেন। আমি ভদ্রলোকের ধৈর্য দেখে অবাক হলাম। ভদ্রলোকের হাসি দেখে মনে হতে পারে উনি এখনই বলবেন— বকুল শোনাও তোমার পথ হারা পাখি গান। আমি জানি তিনি তা করবেন না। আমার গানের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। আমার গান এই ছবির জন্যে প্রয়োজন নেই। চিত্রনাট্যে কোথাও নেই দিলু গান করছে।

'মঈন ভাই—পান খাবেন?'

'জি না, পান খাব না। আপনার কন্যার গানও আজ শুনব না। অন্য একসময় শুনব।'

'কতক্ষণ আর লাগবে। ছোট গান, একটা মাত্র অন্তরা।'

'গান হচ্ছে মুডের ব্যাপার। আজ মুড নেই। কাল সকাল থেকে শুটিং হবে—আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে সেই বিষয়ে কিছু কথা বলি।'

মা হতাশ গলায় বললেন, জি আচ্ছা বলুন। কিন্তু মঈন ভাই ওর গান কিন্তু আপনাকে শুনতে হবে। মশলা খাবেন? পানের মশলা?

'না, মশলাও খাব না। আপনি এক কাজ করুন—নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন, কিংবা রান্নাবান্না কেমন এগুচ্ছে একটু দেখুন। আমি একা আপনার কন্যার সঙ্গে কথা বলব।'

মা'র মুখ শুকিয়ে গেল। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি অতি দ্রুত কিছু যুক্তি দাঁড়া করাবার চেষ্টা করছেন, যে যুক্তিতে মেয়ের সঙ্গে থাকতে পারেন। কোনো যুক্তি তাঁর মাথায় আসছে না। মা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, আচ্ছা। মা বের হয়ে যাচ্ছেন—তাঁর হতাশ ভঙ্গিতে চলে যেতে দেখে আমার খারাপ লাগছে। ডিরেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই এমন কোনো কথা বলবেন না যা আমার মায়ের সামনে বলা যায় না। তিনি থাকলে কোনো ক্ষতি ছিল না। মা বেশি কথা বলেন তা ঠিক—মা'কে চুপ করে থাকতে বললেই তিনি চুপ করে যেতেন।

'বকুল।'

'জি।'
'কেমন আছ তুমি বল।'
'ভাল আছি।'
'গ্রাম কেমন লাগছে?'
'ভাল লাগছে।'
'চিত্রনাট্যটা কি মন দিয়ে পড়েছ?'
'জি।'
'চিত্রনাট্য তোমার কাছে কেমন লেগেছে?'
'ভাল।'
'এই ছবি কি বাংলাদেশের মানুষ দেখবে?'
'না।'
'না কেন? ছবিতে নাচ-গান নেই এই জন্যে?'
'ছবির গল্পটা খুব জটিল।'
'ছবির গল্প তোমার কাছে জটিল মনে হয়েছে?'
'জি।'
'তোমার নিজের চরিত্রটা কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'
'জি।'
'দিলুকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'
'জি হয়েছে।'
'তুমি কি দিলুর মতো?'
'না, আমি দিলুর মতো না।'
'এখন তুমি বল—দিলু কেমন?'
'দিলু খুব নিঃসঙ্গ একটা মেয়ে। একা একা থাকে। তার কিছুই ভাল লাগে না—খুব দুঃখী মেয়ে।'

'না, ঠিক হল না। আর দশটা পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে যেমন দিলুও তেমন। দিলু আলাদা কেউ না। দিলুর শেষ পরিণতিটা খুব দুঃখময় বলে তুমি তাকে দুঃখি মেয়ে ভাবছ। সে সবার সঙ্গে হাসছে, খেলছে, গল্প করছে—ছুটি কাটাতে এসে মজা করছে। তারপর এক সময় তার জীবনে ভয়াবহ এটা দুর্গটনা ঘটে গেল। এমন একজনের প্রেমে পড়ে গেল যে বয়সে তারচে অনেক অনেক বড়। যাকে তার প্রেমের কথাটা সে বলতেও পারছে না। এইটাই তার সমস্যা। এর বাইরে তার কোনো সমস্যা নেই। ঠিক বলছি?'

'জি।'

'দিলু মেয়েটার যে সহজ স্বাভাবিক জগৎ ছিল, প্রেমে পড়ার পর তার সেই জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। তাই না?'

'জি।'
'বকুল তুমি কি কখনো প্রেমে পড়েছ?'
'জি না।'
'প্রেমে পড়লে আমাদের জন্যে সুবিধা হত। তোমার জন্যেও অভিনয় করতে সুবিধা হত।'

ডিরেক্টর সাহেব মিটিমিটি হাসছেন। কেন হাসছেন আমি বুঝতে পারছি না। তিনি সিগারেট ধরালেন। কয়েকটা টান দিয়ে সিগারেট ছুঁড়ে ফেলবেন, আমি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি সিগারেট ফেললেন না। সহজ ভঙ্গিতে টেনে যেতে লাগলেন। সম্ভবত আজ তিনি আর সিগারেট ফেলবেন না। মনে হচ্ছে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাঁর কর্মকাণ্ড নির্ভর করে। তাঁকে এখন কেউ দেখছে না—তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে নেই, কাজেই তিনি সিগারেট ফেলছেন না।

'বকুল।'

'জি স্যার।'

'মেয়েটা এমন বয়স্ক একজন মানুষের প্রেমে কেন পড়ল?'

'জানি না। চিত্রনাট্যে সেটা উল্লেখ করা হয়নি।'

'তোমার কী ধারণা সেটা বল?'

'আমার কোনো ধারণা নেই।'

'বয়ঃসন্ধির পর মেয়েরা হঠাৎ খানিকটা অসহায় বোধ করতে থাকে। তাদের মধ্যে লতা ধর্ম প্রবল হয়ে ওঠে...

'লতা ধর্মটা কী?'

'লতা ধর্ম হচ্ছে—লতানো গাছের ধর্ম। লতানো গাছ কী করে? আশেপাশে শক্ত কোনো গাছের খোঁজ করে। পনেরো-ষোল বছরের মেয়েদের মধ্যে লতা ধর্ম যখন প্রবল হয়ে দেখা দেয়, প্রেমটা তখনি আসে। কার প্রেমে পড়ল, তখন সে আর ভেবে দেখে না।'

আমি হেসে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলাম। প্রেম সম্পর্কে এমন সহজ ব্যাখ্যা এর আগে কেউ বোধ হয় দেয়নি।

'হাসছ কেন?'

'এম্নি হাসছি।'

'আমার ব্যাখ্যা খুব বেশি সরল বলে হাসছ? যে ব্যাপারটা বাইরে থেকে যত জটিল মনে হয় তার ব্যাখ্যা কিন্তু তত সহজ। পনেরো-ষোল বছরের মেয়েরা কাদের প্রেমে পড়ছে সেই স্ট্যাটিসটিকস যদি নাও তাহলে অনেক মজার ব্যাপার দেখবে। এই সময়ে তারা যাদের সংস্পর্শে আসছে তাদেরই প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। প্রাইভেট মাস্টারের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে কারণ সে তাকে পড়াতে আসছে। গানের মাস্টারের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে, তার সঙ্গে তার যোগাযোগ হচ্ছে। বড় ভাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে প্রেম হচ্ছে। এমনকি বাবার বন্ধুর সঙ্গেও প্রেম হচ্ছে। কারণ বাবার বন্ধু মাঝে মাঝে বাসায় আসেন। তার সঙ্গে কথা হয়। সেই সময়কার প্রেমটা অন্য রকম। হিসাব নিকাশের বাইরের প্রেম।'

আমি কিছু বলব না, বলব না করেও বলে ফেললাম—হিসাব নিকাশের বাইরের প্রেম মানে কী?

'প্রেমের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা মানেই হিসাব নিকাশ। পরিণতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা ছাড়া প্রেম মানে হিসাব নিকাশহীন প্রেম। বুঝতে পারছ?'

'না।'

'না বোঝার মতো কিছু না। আমাদের ছবির মেয়ে দিলুর প্রেম হিস্যাব নিকাশহীন প্রেম। প্রেমের পরিণতি নিয়ে সে কখনো ভাবেনি। সে অন্ধের মতো প্রেমে পড়েছে।'

'পরিণতি নিয়ে না ভাবলে সে আত্মহত্যা করে কেন?'

'আত্মহত্যাটাও তার প্রেমেরই একটা অংশ। সে তার আবেগের তীব্রতাটা সবাইকে দেখাতে গিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে। এই বয়সের প্রেমে একটা দেখানোর ব্যাপারও থাকে। দেখ আমি কী করে ফেললাম—এই ভাব।'

আমি বললাম, স্যার, আমার সে রকম মনে হচ্ছে না।

তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার কী মনে হচ্ছে?

'আমার মনে হয়—মেয়েটা হঠাৎ তার নিজের ভেতরের প্রেম ভাল মতো লক্ষ্য করে। তার তীব্রতা দেখে সে হকচকিয়ে যায়। সে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে।'

তিনি একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসলেন। প্রশ্রয়ের হাসি। ছোট বাচ্চারা হঠাৎ জ্ঞানীর মতো কথা বলে উঠলে বড়রা যেমন হাসে তেমন হাসি। তবে আমার কথার তেমন গুরুত্ব দিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বকুল!'

'জি স্যার।'

'চিত্রনাট্যর কোন অংশটা তোমার কাছে খুব সুন্দর মনে হয়েছে?'

'দিলু যে মাঝে মাঝে খুব সুন্দর করে সাজে তারপর পুকুরের কাছে যায়, পুকুরের জলে নিজেকে দেখে এবং নিজের সঙ্গে কথা বলে এই দৃশ্যটা।'

'সেই দৃশ্যটা আমরা কাল করব। এই দৃশ্য দিয়ে শুরু। তুমি দৃশ্যগুলি আজ রাতে খুব ভাল মতো পড়বে। শোবার আগে ভাববে। আমি দৃশ্যগুলি কীভাবে নেব ভেবে রেখেছি—তোমার মাথায় যদি কিছু থাকে তাও আমাকে বলবে।'

'জি আচ্ছা।'

'এই ছবির আসল নায়িকা কে তুমি কি জান?'

'জানি, দিলু।'

'হ্যাঁ, এই কিশোরী মেয়েটিই ছবির নায়িকা। পাপিয়া ব্যাপারটা জানে না। তার ধারণা সেই ছবির নায়িকা। তাকে সে রকম বলাও হয়েছে। চিত্রনাট্য সে পড়েনি। তাকে চিত্রনাট্য পড়তেও দেইনি। চিত্রনাট্য পড়লে সে খুব হৈ চৈ করত। আচ্ছা তুমি যাও—'

তিনি যাও বললেন কিন্তু আমি আগের জায়গাতেই বসে রইলাম। আমার কেন জানি উঠতে ইচ্ছা করছে না। তিনি বললেন—কিছু বলবে?

'জি না।'

তিনি আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তাঁকে হঠাৎ খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তিনি অন্য কিছু ভাবছেন। আমি যে তাঁর সামনে বসে আছি তা আর তাঁর মনে নেই। ঘরে মসকুইটো কয়েল জ্বলছে। ধোঁয়ায় নাক জ্বালা করছে।

'বকুল!'

'জি।'

'আচ্ছা, দেখি তোমার বুদ্ধি।'

তিনি নড়েচড়ে বসলেন এবং হাসি মুখে তাকালেন। তাঁর চোখে চাপা আনন্দ। ম্যাজিশিয়ান মজাদার কিছু করার আগে মনে হয় এই ভাবেই দর্শকদের দিকে তাকায়।

'গল্পটা মন দিয়ে শোন—একটা হাতি এবং একটা পিঁপড়ার গল্প। একটা পিঁপড়া মোটর সাইকেলে করে যাচ্ছিল। একটা হাতি আসছিল উল্টা দিক থেকে। পিঁপড়া ব্যালেন্স হারিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে হাতির গায়ে পড়ল। বিরাট অ্যাকসিডেন্ট। মজার ব্যাপার হচ্ছে অ্যাকসিডেন্টে পিঁপড়ার কিছু হল না—শুধু হাতিটা আহত হল। এখন বল কেন অ্যাকসিডেন্টে পিঁপড়ার কিছু হল না?'

আমি বললাম, জানি না।

'খুব সহজ উত্তর। পিঁপড়াটার মাথায় হেলমেট পরা ছিল। পিঁপড়া ছোট প্রাণী হলেও, ট্রাফিক রুল মেনে চলে। হেলমেট ছাড়া মোটর সাইকেল নিয়ে বের হয় না।'

আমি ভেবেছিলাম জবাবটা দিয়ে তিনি তাঁর স্বভাব মতো হো হো করে হাসবেন। তিনি হাসলেন না বরং খানিকটা গম্ভীর হয়ে গেলেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন—

আহত হাতিকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। দেখা গেল আহত হাতি এবং পিঁপড়া পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছে।

এখন তুমি বল—পিঁপড়াটারতো কিছু হয়নি। সে কেন হাতির বেডের পাশে শুয়ে আছে?

'জানি না।'

'পিঁপড়া শুয়ে আছে কারণ পিঁপড়াটা হাতিকে রক্ত দিচ্ছিল। তাদের দুজনের একই গ্রুপের রক্ত—'ও পজিটিভ'।

তিনি এবারে গলা খুলে হাসছেন। আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর ছেলেমানুষি হাসি দেখছি। আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে—তাঁর হাসি আমার শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আমার শরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝমঝম করছে। শরীরের ভেতরটা কাঁপছে। আমার ইচ্ছা করছে ছুটে চলে যাই। কিন্তু উঠতে পারছি না। এমন সময় সোহরাব চাচা ঢুকলেন। ডিরেক্টর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন— আমি নেত্রকোনা যাচ্ছি। আপনার কিছু লাগবে?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, নেত্রকোনায় এক ধরনের মিষ্টি পাওয়া যায় নাম হচ্ছে বালিস। মিষ্টিটার শুধু নাম শুনেছি খেয়ে দেখিনি। যদি পাও নিয়ে এসো।

'রান্নাও হয়েছে, খাবার দিতে বলি?'

ডিরেক্টর সাহেব বললেন—দিতে বল। পাপিয়াকে জিজ্ঞেস কর—সে কি সবার সঙ্গে খাবে, না তার খাবার আলাদা দেয়া হবে?

'ম্যাডাম বলেছেন উনি রাতে কিছু খাবেন না।'

'সেকী!'

'ম্যাডাম খেতে চেয়েছেন বলেই খাসি কিনে এনে রেজালা করা হয়েছে। পোলাওয়ের চালের ভাত করা হয়েছে। স্যার, আপনি একটু বলে দেখবেন?'

'খাবে না কেন কিছু বলেছে?'

'উনার নাকি শরীর ভাল না। উনি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছেন।'

'ভাল যন্ত্রণা হল দেখি।'

'ফরহাদ সাহেবও এখনো এসে পৌঁছালেন না। উনাকে ছাড়া শুটিং শুরু হবে কীভাবে? কাউকে কি পাঠিয়ে দেব? রাতে খেয়ে গাড়ি নিয়ে ঢাকা চলে যাবে—উনাকে নিয়ে চলে আসবে।'

'না।'

ডিরেক্টর সাহেব চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেলেন। কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে তিনি পাপিয়া ম্যাডামের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। আমার কেন জানি খুব ইচ্ছা করছে পাপিয়া ম্যাডামের রাগ কীভাবে ভাঙানো হয় সেই দৃশ্য দেখি। ডিরেক্টর সাহেবের পেছনে পেছনে যাই।

সোহরাব চাচা বললেন, মিস রুমাল চল খেতে চল। আমি বললাম, চলুন।

মা নিশ্চয়ই মুখ গম্ভীর করে তাঁর ঘরে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি যাওয়া মাত্র ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে আমার কী কী কথা হল সব শুনবেন। কোনো কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। কোনো কোনো জায়গা দু'বার তিনবার করেও শুনাতে হবে। মা'র সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি সোহরাব চাচার সঙ্গে সরাসরি ডাইনিং রুমে চলে গেলাম।

খাওয়া শুরু হয়ে গেছে। গণ খাবারের কায়দা কানুন অন্য রকম—প্লেট হাতে যেতে হয় বাবুর্চির কাছে। বাবুর্চি তার লোকজন নিয়ে বসে থাকেন। তাঁর সামনে বিরাট বিরাট ডেকচিতে ভাত, তরকারি, ভাজি, সালাদ। বড় বড় চামুচে প্লেটের উপর খাবার তুলে দেয়া হয়। থালা উপচে আগুন গরম খাবার পড়ে যেতে থাকে। সেই খাবার গবাগব করে খাওয়া হয়। পুরো ব্যাপারটায় পিকনিক পিকনিক ভাব থাকে। আমার খুব ভাল লাগে।

ডাইনিং রুমে সবাই আছেন—শুধু মা আর জালালের মা নেই। মা নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন—আর জালালের মা, মা'কে এই ফাঁকে কয়েকটা ভয়ংকর টাইপ গল্প শুনিয়ে ফেলছে। আমাদের এই ডিরেক্টর সাহেবকে নিয়েও অনেক গল্প নিশ্চয়ই জালালের মা জানেন। তার কাছ থেকে কিছু গল্প শুনতে হবে। মা'কে না জানিয়ে শুনতে হবে।

তরকারির রঙ খুব সুন্দর হয়েছে। আমি প্লেট হাতে খাবার নিয়ে নিলাম। ধোঁয়া ওঠা পোলাওয়ের চালের ভাত—সুন্দর গন্ধ আসছে ভাত থেকে। খাসির গোসতের রেজালা। রেজালা দেখেই বোঝা যাচ্ছে—খেতে খুব ভাল হবে। পাপিয়া ম্যাডাম যদি খেতেন, রেজালার রেসিপি চাইতেন।

কেয়ামত ভাই হাসি মুখে বললেন—আপা, মা কই?

আমি বললাম, মা আসবে। আমার খুব ক্ষিধে লেগেছে আমি আগে খেয়ে নেব!

'আজ এক তরকারির খানা। সালাদ নেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, সালাদ নেব না।'

ডাইনিং রুমে চেয়ার টেবিল আছে। চেয়ার টেবিলে সবার জায়গা হয় না। অলিখিত নিয়ম হচ্ছে শিল্পীরা চেয়ার টেবিলে বসবেন—বাকিরা প্লেট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে খাবেন—বুফে সিস্টেম। তবে আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এই দেখা যায় তিনি চেয়ার টেবিলে বসেছেন—আবার দেখা যায় দাঁড়িয়ে খাচ্ছেন। একবার দেখি ফকিরদের মতো মাটিতে ল্যাপচা মেরে বসে খাচ্ছেন। সোহরাব চাচা কোত্থেকে পুরানো খবরের কাগজ এনে বললেন—স্যার, এর উপর বসুন। তিনি বললেন—লাগবে না। লাগবে না। সোনার বাংলার স্বর্ণ ধূলি গায়ে মেখে নিচ্ছি। তাঁর এই কথায় আশেপাশের সবাই হাসল। ডিরেক্টর সাহেব যাই বলেন তাতেই মজা পেয়ে সবাই হাসে। তিনি রসিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। আমার নিজের ধারণা তিনি পদাধিকার বলে রসিক। ডিরেক্টর না হয়ে তিনি যদি ক্যামেরা ম্যানের এসিসটেন্ট হতেন তাহলে তাঁর রসিকতায় কেউ হাসত না। বরং তাঁর কাজ কর্মে সবাই বিরক্ত হত।

আমি প্লেট নিয়ে খাবার টেবিলের দিকে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি ঘরের এক কোনায় সেলিম ভাই দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে খাবারের প্লেট। তিনি মাথা নিচু করে খাচ্ছেন। আজ তাঁর গায়ে পাঞ্জাবি। তিনি একটামাত্র শার্ট প্যান্ট নিয়ে এসেছিলেন। আজ পাঞ্জাবি পেলেন কোথায়? আমি হাসিমুখে ডাকলাম—সেলিম ভাই।

তিনি এমনভাবে চমকে উঠলেন যে আরেকটু হলে হাত থেকে প্লেট পড়ে গিয়ে বিশ্রী কাণ্ড হত। নায়িকার হাত থেকে প্লেট পড়ে ভেঙে যাওয়া মজার ব্যাপার। সবাই তাতে মজা পায়। প্রোডাকশান ম্যানেজার আনন্দে হেসে ফেলেন। এক্সট্রা মেয়ের হাত থেকে প্লেট পড়ে গেলে সবাই কটমট করে তাকায়। প্রোডাকশান ম্যানেজার চাপা গলায় ধমক দেন। ধমক চাপা গলায় হলেও সবার কানে যায়। আমি হাসি মুখে ডাকলাম, সেলিম ভাই এদিকে আসুন। প্লেট হাতে সেলিম ভাই বিব্রত ভঙ্গিতে আসছেন। তাঁর অস্বস্তি দেখে মনে হচ্ছে বেচারারকে না ডাকলেই হত। নিজের মনে আরাম করে খেতে পারতেন।

'বসুন। আসুন আমরা গল্প করতে করতে খাই।'

সেলিম ভাই অসহায়ভাবে চারদিকে একবার দেখলেন। আমার পাশে বসে খাওয়াটা ঠিক হবে কি–না বুঝতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বসলেন আমার পাশে। সব দ্বিধা অবশ্যি ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। তাঁর খানিকটা চোখে মুখে লেগে রইল।

'সেলিম ভাই, কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'কী রকম ভাল? অল্প ভাল না অনেকখানি ভাল?'

'অল্প ভাল।'

'এক বস্ত্রে এসেছিলেন—আজ দেখি গায়ে পাঞ্জাবি।'

'শার্ট প্যান্ট ধুয়ে দিয়েছি।'

'ভাল করেছেন। ডিরেক্টর সাহেব কী জানেন যে আপনি তাঁর কথামতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন?'

'জি। আগে মনে করেছিলাম কিছু জানেন না। এখন বুঝেছি জানেন।'

'কথা হয়েছে তাঁর সঙ্গে?'

'জি।'

'কখন কথা হল?'

'আজ সন্ধ্যায়।'

'কী কথা হল?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেলিম ভাই বিব্রত স্বরে বললেন, আমি একটা বিরাট ঝামেলায় পড়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী ঝামেলা?'

'আপনাকে আমি বলব।'

'বলুন শুনি।'

'এখন বলব না। এখানে অনেক লোকজন।'

'কখন বলবেন?'

'আজই বলব। আমি মস্তবড় একটা ঝামেলায় পড়েছি। জীবনে এতবড় ঝামেলায় পড়িনি।'

'খুব চিন্তিত?'

'জি।

'আচ্ছা ঠিক আছে—আপনার ঝামেলার কথা শুনব—এখন চুপচাপ খেয়ে যান। খাবারটা ভাল হয়েছে না!'

'জি হয়েছে।'

'রেসিপি লাগবে? লাগলে বলুন।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

আমি হেসে ফেললাম—আর তখনি মা ঢুকলেন। তিনি আমাকে খেতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমার পাশে সেলিম ভাইকে দেখে তাঁর মাথায় প্রায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হল। তিনি নিশ্চয়ই এর মধ্যেই আমার ডাইরি পড়ে ফেলেছেন। দুইয়ে দুইয়ে চার বানিয়ে বসে আছেন। মা খাবার নিয়ে আমার দিকে আসছেন। আমার কাছে তিনি বসতে পারবেন না, কোনো চেয়ার খালি নেই। তাঁকে অনেকটা দূরে বসতে হবে। তবে তিনি অন্য একটা কাজও করতে পারেন—হয়ত সেলিম ভাই এর কাছে এসে বলবেন, এই শোন তোমার নাম যেন কী? তুমি ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বোসো।

মা সামাজিক অবস্থান মাথায় রেখে তুমি আপনি বলেন। তিনি তাঁর রাডারের মতো চোখ দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে ফেলেন মানুষটার সামাজিক অবস্থান কী। তখন তুমি আপনি নির্ধারিত হয়ে যায়। সেলিম ভাইকে তিনি শুরু থেকেই তুমি বলছেন। শুধু যে তুমি বলছেন তাই না—ছোটখাট কাজকর্মও তাকে দিয়ে করাচ্ছেন। গতকাল সকালেই তিনি সেলিম ভাইকে ডেকে বললেন—এই যে ছেলে শোন, আমার জন্যে একটা হাত পাখা নিয়ে এসো। প্রোডাকশানের কাউকে বললেই হাত পাখা দিয়ে দেবে।

মা আমার পাশে এসে দাঁড়াতেই সেলিম ভাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি বসুন।

মা বিনাবাক্যব্যয়ে বসে পড়লেন। সেলিম ভাই প্লেট হাতে আগের জায়গায় চলে গেলেন। মনে হল তিনি হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছেন।

মা রাগে কাঁপছেন। আমি তাঁর রাগ টের পাচ্ছি। রাগের প্রকাশ কীভাবে হবে বুঝতে পারছি না। ঘটনাটা বাসায় ঘটলে প্লেট ছুঁড়ে মারতেন আমার দিকে। আমার শরীর রেজালার ঝোলে মাখামাখি হয়ে যেত। প্লেটের কোনা লেগে কপাল কেটে রক্ত পড়ত। এখানে এ জাতীয় কিছু করা সম্ভব না। মা কাঁপা গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললেন—মঈন ভাইয়ের সঙ্গে কথা শেষ হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন?'

'প্রেম কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করলেন।'

মা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। আমি সহজ ভঙ্গিতে ভাত মাখতে মাখতে বললাম—উনিতো প্রেম বিশারদ। প্রেমের সবকিছু তিনি জানেন।'

'ফাজলামি করছিস কেন?'

'ফাজলামি করছি না, যা সত্যি তাই বললাম।'

'আমি তোর জন্যে বসে আছি—তুই আমাকে না নিয়ে একা একা খেতে চলে এলি কী মনে করে?'

'ক্ষিধে লেগেছিল চলে এসেছি।'

'তোর হয়েছে কী?'

'কিছু হয়নি।'

'এই গাধাটা তোর সঙ্গে খাচ্ছে কেন?'

'আমি ডেকে এনেছি বলে আমার সঙ্গে বসে খাচ্ছিলেন। কারো সঙ্গে গল্প না করে আমি খেতে পারি না।'

'গাধাটার সঙ্গে কী গল্প করছিলি?'

'বারবার উনাকে গাধা বলছ কেন?'

'যে গাধা আমি তাকে কী বলব? হাতি বলব?'

'মা তুমি খাচ্ছ না। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তুমি খেয়ে মজা পাবে না। খাসির রেজালাটা খুব ভাল হয়েছে। খাঁটি সরিষার তেলে রান্না হয়েছেতো এই জন্যে। খেয়ে তোমার যদি ভাল লাগে আমাকে বলবে— আমি রেসিপি দিয়ে দেব।'

মা আগুন চোখে তাকাচ্ছেন। আমি তাকিয়ে আছি হাসি মুখে। আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। মা কিছুক্ষণ থাকুক একা একা। রেগে অস্থির হোক। রেগে অস্থির হয়ে এক সময় মা ড্রাগনের মতো হয়ে যাবে—তার নাক মুখ দিয়ে আগুনের হলকা বের হতে থাকবে। সেই পর্যায়ে আসুক তখন ঠাণ্ডা পানি ঢেলে মা'র রাগ কমানোর ব্যবস্থা করা যাবে।

'বকুল!'

'হুঁ।'

'মঈন ভাইয়ের সঙ্গে তোর কী কী কথা হয়েছে বল। কোনো কিছু বাদ দিবি না।'

'হাতি এবং পিঁপড়া সম্পর্কে অনেক কথা বললেন।'

'হাতি এবং পিঁপড়া মানে?'

'একটা হাতি এবং পিঁপড়া ছিল—তাদের হচ্ছে একই ব্লাড গ্রুপ, ও পজিটিভ।'

'তোকে এখন আমি সবার সামনে চড় মারব।'

'হাত ধুয়ে তারপর চড় মার মা। নয়ত গালে ঝোল লেগে যাবে।'

মা তাকিয়ে আছেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং মা'র চোখের সামনেই সেলিম ভাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। মা'কে দেখিয়ে দেখিয়ে সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করব। মা'কে আমি আজ ড্রাগন বানিয়ে ফেলব।

সেলিম ভাই আমাকে দেখে বিব্রত ভঙ্গিতে তাকালেন। মা যেমন আমার কাণ্ডকারখানা বুঝতে পারছেন না, মনে হয় তিনিও পারছেন না।

'সেলিম ভাই!'

'জি।'

'আপনি বলেছেন—আপনি ভয়ংকর বিপদে পড়েছেন। আমার ধারণা আমি বুঝতে পারছি আপনার বিপদটা কী?'

'বুঝতে পারছেন?'

'হ্যাঁ। আমার ধারণা ডিরেক্টর সাহেব আপনাকে ডেকে বলেছেন— সেলিম তুমি মন দিয়ে আমার কথা শোন, ফরহাদ সাহেবের যে চরিত্রটি করার কথা ছিল সেই চরিত্রটা তুমি করবে। কাল তোমার শুটিং।'

সেলিম ভাই চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখ বড় করা দেখেই বুঝতে পারছি আমার অনুমান সত্যি। তবে এই অনুমান করার জন্যে শার্লক হোমস বা মিসির আলি হবার দরকার নেই। সাধারণ বুদ্ধি যার আছে সেই এই অনুমান করবে। আগামীকাল শুটিং শুরু হচ্ছে অথচ ফরহাদ সাহেব আসেননি। সেলিম নামের এই মানুষটিকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেবের মাথায় কোনো একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। উদ্দেশ্য ছাড়া তিনি

কিছু করেন না। সাব্বিরের চরিত্রে সেলিম ভাইকে খুব মানাবে। ডিরেক্টর সাহেব স্ট্যান্ডবাই হিসেবেই সেলিম ভাইকে নিয়ে এসেছেন।

আমি বললাম, আমার কথা কি ঠিক হয়েছে সেলিম ভাই?

'হুঁ।'

'খুব ভয় লাগছে?'

'হুঁ।'

'ভয় লাগছে কেন?'

'আমি আমার জীবনে কখনো অভিনয় করিনি। স্কুলে কলেজে কোথাও না।'

'আপনি কখনো অভিনয় করেননি?'

'জি না।'

'কথাটাতো সেলিম ভাই ঠিক বলেননি। মানুষ হয়ে জন্ম নিলেই অভিনয় করতে হয়। সংসারে অভিনয়। কখনো খুশি হবার অভিনয় করতে হয়, কখনো দুঃখিত হবার অভিনয় করতে হয়। প্রেমে না পড়েও প্রেমে পড়ার অভিনয় করতে হয়। আবার প্রেম লুকিয়ে রাখার অভিনয় করতে হয়। আসলে প্রতিটি মানুষই জন্মসূত্রে পাকা অভিনেতা।

'আপনি খুব গুছিয়ে কথা বলেন।'

'শুনুন সেলিম ভাই—আপনার মুখ থেকে আপনি আপনি শুনতে আমার ভাল লাগছে না। আপনি দয়া করে আমাকে তুমি তুমি করে বলবেন। পারবেন না?'

সেলিম ভাই চুপ করে আছেন। আমি মাথা ঘুরিয়ে মা'র দিকে তাকালাম। মা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু খাচ্ছেন না। আমার মনে হয় তিনি পুরোপুরি ড্রাগন হয়ে গেছেন। মা'র জন্যে আমার এখন মায়া লাগছে। আমি তাঁর রাতের খাবার নষ্ট করলাম। ইউনিটের খাওয়া মা'র খুব পছন্দের জিনিস। ইউনিটের ফ্রি খাওয়া যত তুচ্ছই হোক মা সোনামুখ করে খান।

৩

রাত কত হয়েছে কে জানে?

শোবার সময় হাতে ঘড়ি পরে শুইনি বলে বলতে পারছি না। অবশ্যি ঘড়ি থাকলেও ঘড়ি দেখা যেত না। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে আছি। ঘুমের ভান যে করছে সে নিশ্চয়ই চট করে এক ফাঁকে ঘড়ি দেখবে না।

মা আমার গা ঘেঁষে শুয়েছেন। জালালের মা'র খাটটা ফাঁকা। তাঁকে আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। ব্যবস্থাটা সোহরাব চাচার করা। তিনি সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন জালালের মা'কে এই ঘরে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আমি মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছি। এই ঘরের দু'টা খাট এখন আমার জন্যে আর মা'র জন্যে। মা কখনো আমাকে একা রেখে শোবেন না। দু'জন চাপাচাপি করে শুয়ে আছি। তাঁর ঘুম আসছে না। ঘুম আসছে না বলেই ঘরে বাতি জ্বলছে। মা'র অভ্যাস হচ্ছে ঘুমে যখন তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে আসবে তখন তিনি বাতি নিভিয়ে এলোমেলো করে পা ফেলে বিছানায় আসবেন। তিনি খুব নড়াচড়া করছেন। এরমধ্যে দু'বার পানি খেলেন। একবার গেলেন বাথরুমে। ডাকবাংলোয় আমাদের ঘরের বাথরুমটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয় না। যে ভেতরে যায় সে খুব অস্বস্তি বোধ করে। সারাক্ষণই খুট খাট শব্দ করে তার উপস্থিতি জানান দেয়। সোহ্‌রাব চাচাকে বললেই তিনি ঠিক করে দেবেন। তাঁকে বলা হচ্ছে না। বাথরুম থেকে একবার বের হলে দরজা বন্ধের সমস্যা কারোর মনে থাকছে না। আমরা বোধ হয় সমস্যার

স্থায়ী সমাধানের চেয়ে সাময়িক সমাধানকেই বেশি গুরুত্ব দি। একটা সমস্যা হয়েছে, সমস্যাকে পাশ কাটাতে পারলেই হল। আর কিছু লাগবে না।

শুয়ে শুয়ে শিয়ালের ডাক শুনছি। শিয়ালের ডাকে ভয় ধরানো ভাব থাকে—মনে হয় এই শিয়ালের পালে একবার পড়লে এরা ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে নেবে। আমরা যখন আজিমপুরের নয়া পল্টনে থাকতাম তখনো গভীর রাতে শিয়ালের ডাক শুনতাম। আজিমপুর কবরস্থানে শিয়াল থাকতো। শিয়াল প্রহর গুনে ডাকে—আজিমপুর কবরস্থানের শিয়াল যখন তখন ডেকে উঠত। শহরে থেকে থেকে এরা বোধ হয় শহুরে হয়ে গেছে। পুরানো নিয়ম কানুন ভুলে গেছে।

আমি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি। আমার গায়ে ভারী কম্বল। তারপরেও শীত মানছে না। দিনে এমন গরম পড়েছিল, রাতে ঝপ করে শীতে নেমে গেল। পাহাড়ি অঞ্চলের এই নাকি নিয়ম। রোদ উঠলে প্রচণ্ড গরম। রোদ নিভে গেলেই হাড় কাঁপুনি শীত। মোটা কম্বলটাতেও শীত মানছে না। এই কম্বলটা মা'র খুব প্রিয়। তিনি যেখানে যাবেন কম্বলটা সঙ্গে থাকবে। চৈত্র মাসের প্রচণ্ড গরমের সময়ও দেখা যাবে তিনি কোথাও যাবার আগে কম্বল প্যাক করছেন। সেই প্যাকিংয়েরও অনেক কায়দা। প্রথমে কম্বলটা ভরা হবে পলিথিনের একটা ব্যাগে। তারপর সেই পলিথিনের ব্যাগ ঢুকানো হবে মা'র নিজের বানানো মার্কিন কাপড়ের থলিতে। কম্বলের মাপে মাপে এই থলি বানানো। সেই থলি ঢুকানো হবে সুটকেসে।

মা'র এই প্রিয় কম্বলের একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। তিনি একবার বাবার সঙ্গে নিউমার্কেটে গিয়েছিলেন বিছানার চাদর কিনতে। চাদর কিনতে গিয়ে কোনো চাদরই তাঁর পছন্দ হল না, এই কম্বলটা তাঁর খুব পছন্দ হল। দাম চার হাজার টাকা। দাম শুনে বাবা-মা দু'জনেরই আক্কেল গুড়ুম। মা চাদর না কিনে ফিরে এলেন। তাঁর মন পরে রইল কম্বলে। কথায় কথায় বলেন—কী মোলায়েম কম্বল। কী সুন্দর ডিজাইন—হালকা সবুজ রঙ। দেখেই মনে হয় ওম ওম গরম। তার মাস চারেক পরের কথা। মা'র বিবাহবার্ষিকীতে বাবা বিরাট একটা প্যাকেট এনে মা'র হাতে দিলেন। প্যাকেটের গায়ে লেখা—

খুকুকে
শুভ বিবাহবার্ষিকী

মা প্যাকেট দেখে খুব বিরক্ত হলেন। ঝাঁজালো গলায় বললেন, কী এনেছ তুমি বলতো? উপহার তোমাকে কে আনতে বলেছে? আমাদের বিয়েটা এমন কিছু না যে উৎসব করে পোলাও-কোরমা খেতে হবে, উপহার-টুপহার দিতে হবে, আমি খুবই রাগ করছি। কী আছে এর মধ্যে?

বাবা হাসিমুখে বললেন, খুলে দেখ।

মা বললেন, আমি খুলতে পারব না। বকু, খুলে দেখতো।

আমি বললাম, মা তুমিই খোল। তোমার জিনিস।

মা বললেন, হ্যাঁ আমার জিনিস। আমার জিনিস নিয়ে আমি স্বর্গে যাব।

বলতে বলতে উপহারের প্যাকেট খোলা হল এবং মা যে কী খুশি হলেন! দেখতে দেখতে মা'র চোখে পানি এসে গেল। তিনি এই হাসেন, এই কাঁদেন। সামান্য একটা কম্বলে মানুষ এত খুশি হয়। মে মাসের তীব্র গরমে মা সেই কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমুলেন।

মা'র সঙ্গে এইখানেই আমার তফাৎ। আমি হলে বাবা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেদিনই কম্বল ছিঁড়ে কুটি কুটি করে আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে দিতাম। সিন্দাবাদের ভূতের মতো ঘাড়ে চাপিয়ে রাখতাম না। মা'কে সেই কথা বলেছিলাম—মা অবাক হয়ে বললেন, তোর বাবার সঙ্গে এই কম্বলের সম্পর্ক কী? সে যেখানে গেছে যাক। ধুমসিকে নিয়ে নাচাকুদা যা ইচ্ছা করুক। আমার তাতে কী? যখন সে কম্বলটা দিয়েছিল ভালবেসে দিয়েছিল। মানুষটা নষ্ট হয়ে গেছে, তার ভালবাসা নষ্ট হবে কেন?

আমি রাগি গলায় বললাম, মা তোমার ধারণা ভালবাসা নষ্ট হয় না?

'ভালবাসা কি কোনো খাবার যে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে?'

'ভালবাসাটা তাহলে কী মা?'

'এক সময় নিজেই জানতে পারবি—আমাকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে না। সময় হোক, সময় হলে জানবি।'

'ভালবাসা কি চার হাজার টাকা দামের কম্বল?'

'ফাজলামি করবি না। চুপ কর।'

আমি চুপ করে গেলাম। তবে চুপ করে গেলেও আমি এইসব নিয়ে ভাবি। খুব ভাবি। অন্য মেয়েরা এত ভাবে কি–না জানি না। হয়ত ভাবে না। তাদের এত সময় কোথায়? তাদের খেলাধুলা আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। পিকনিক আছে, জন্মদিন আছে। আমার কী আছে? কিছুই নেই। শুধু মা আছেন। বাসায় আমরা দু'জন যতক্ষণ থাকি—মা অনবরত কথা বলেন। আমি বেশিরভাগ সময়ই কিছু শুনি না। মা'র দিকে তাকিয়ে থাকি। তবে মা কী বলছেন তা আমার কানে ঢোকে না। মা মাঝে মাঝে বলেন—কী–রে তুই এমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছিস কেন? আমি বলি—মা, আমার চোখ দু'টাতো অদ্ভুত কাজেই অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছি।

'আমার সঙ্গে ফাজিলের মতো কথা বলবি না বকু।'

'ফাজিলের কী হল—আমার চোখ অদ্ভুত না?'

'বুক, তুই দিন দিন অসহ্য হচ্ছিস।'

'মা, তুমিও দিন দিন অসহ্য হচ্ছ।'

'আমি অসহ্য হচ্ছি?'

'হুঁ। এবং যতই দিন যাচ্ছে ততই আমার বাবার জন্যে সহানুভূতি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বাবা তোমাকে ছেড়ে গিয়ে খুব ভুল করেনি। আমি বাবা হলে অনেক আগেই তোমাকে ছেড়ে চলে যেতাম।'

কথাবার্তা এই পর্যায়ে চলে এলে মা যা করেন তাকে পুরোপুরি কিশোরীসুলভ আচরণ বলা যেতে পারে। তিনি শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন। খাওয়া বন্ধ। ভাত–রাগ। ভাত খাবেন না। মাঝে মাঝে শোনা যায় বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে তিনি কাঁদছেন—"ও বাবু। বাবু। তুমি কই বাবু। বাবু তুমি আমাকে একটু আদর করে দিয়ে যাও।"

বাবু হলেন আমাদের নানাজান। মা'র বয়স যখন সাত তখন তিনি মারা যান। মা তাঁর বাবাকে বাবা বা আব্বু ডাকতেন না। ডাকতেন—বাবু।

আমার পানির পিপাসা হচ্ছে। পানি খাবার জন্যে উঠে বসলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, মা আমাকে ধরে বসবেন। বাকি রাত মা'র বক্তৃতা শুনে কাটাতে হবে। সকালে আমার শুটিং। রাত জাগলে তার ছাপ পড়বে চেহারায়। সিনেমার শক্তিশালী ক্যামেরাকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। ক্যামেরা সব ধরে ফেলবে।

কাল সকালের সিকোয়েন্সটা খুব সুন্দর। আমি পানির তৃষ্ণা ভুলে থাকার জন্যে আমার সিকোয়েন্স নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলাম। দৃশ্যটা এ রকম—

দিলু শখ করে শাড়ি পরেছে। কপালে টিপ দিয়ে নিজের মতো করে সেজেছে। দিলুর বাবা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে গল্পের বই পড়ছিলেন। দিলু তাঁকে বলল, বাবা আমাকে কেমন দেখাচ্ছে? তিনি বই থেকে চোখ না তুলেই বললেন—খুব সুন্দর লাগছেরে মা। বিউটিফুল। তোর মা'কে বলতো চা দিতে। দিলুর মনটা খারাপ হল। বাবা একবার তাকিয়ে তার রূপবতী কন্যাকে দেখলেনও না? সে তার মা'কে চা দেবার কথা না বলে ডাকবাংলো থেকে বের হল। তার দেখা হল জামিলের সঙ্গে। জামিল বলল, পরী সেজে কোথায় যাচ্ছিস? দিলু লজ্জিত গলায় বলল—জামিল ভাই, আমাকে সত্যি সুন্দর লাগছে?

জামিল বললেন, সুন্দর লাগছে মানে—তোকেতো কুইন অব শেবার মতো লাগছে। কপালের টিপটা ঠিকমতো দিতে পারিসনি। একপেশে হয়ে গেছে। যা কলম নিয়ে আয় আমি টিপ একে দিচ্ছি।

এই কথায় দিলু খুব লজ্জা পেয়ে গেল। সে চোখ মুখ লাল করে বলল—থাক আপনাকে টিপ আঁকতে হবে না। এই বলেই সে ছুটে বের হয়ে গেল। সে থামল পুকুরের কাছে গিয়ে। পুকুরের জলে নিজের ছায়া দেখল। সেই ছায়া দেখে তার লজ্জা আরো যেন বেড়ে গেল। একটা ঢিল ছুঁড়ে পুকুরের ছায়াটা ভেঙে দিল। তারপর লজ্জায় শাড়ির আঁচলে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। এইখানেই প্রথম প্রকাশ পেল মেয়েটি জামিল নামের মানুষটিকে পাগলের মতো ভালবাসে।

কাল কোন অংশটি হবে ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলেননি। আমার ধারণা পুকুরের অংশটা হবে। কোন শাড়ি পরব—তাও ঠিক হয়নি। তবে শাড়ি নিয়ে আমাকে চিন্তা করতে হবে না। এই সব ব্যবস্থা ডিরেক্টর সাহেব করে রেখেছেন। প্রতিটি পোশাক দু'সেট করে কেনা আছে। একটা সেট আলাদা করা। ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত সেই সেটে হাত দেয়া হবে না। যদি হঠাৎ কোনো প্যাচ ওয়ার্কের প্রয়োজন হয়। এইসব ব্যাপারে ডিরেক্টর সাহেবের কাজকর্ম নিখুঁত।

পুকুরের পাড়ে আমি কীভাবে বসব? চিত্রনাট্যে বসার কথা থাকলেও আমার ধারণা আমাকে বসতে হবে না। একটা মেয়ে দৌড়ে এসে পুকুর পাড়ে হঠাৎ করে বসে যেতে পারে না। তা ছাড়া সুন্দর করে বসতে হলে হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। শাড়ি নষ্ট করে কোনো মেয়ে কি হাঁটু গেড়ে বসবে? সবচে ভাল হয় পুকুরের যদি শান বাঁধানো ঘাট থাকে। আমি শুনেছি যে পুকুরে শুটিং হবে সেখানে বাঁধানো ঘাট নেই। জংলি ধরনের পুকুর। চারদিক গাছপালা ঝোপঝাড় গজিয়ে জঙ্গলা হয়ে আছে। অবশ্যি জংলি পুকুরেরও আলাদা সৌন্দর্য আছে। গাছপালায় ঢাকা ছায়াময় একটা পুকুর। সেই পুকুরের শান্ত নিস্তরঙ্গ টলটলে জল। পুকুরের জলের কথা ভেবে ভেবে আমার পানির পিপাসা আরো বাড়ল। আমি কম্বল ফেলে দিয়ে উঠে বসলাম। মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, কী হয়েছে-রে বকু?

আমি বললাম, খুব পেট ব্যথা করছে মা।

পেট ব্যথার কথা বললাম যাতে মা আমাকে বিরক্ত না করেন। যদি বলতাম—তৃষ্ণা পেয়েছে পানি খাব তাহলে মা বাকি রাতটা কথা বলে বলে আমাকে বিরক্ত করে মারতেন। পেটে ব্যথা শুনলে অসুস্থ মেয়েকে হয়ত ততটা বিরক্ত করবেন না। শুয়ে থাকতে বলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন।

'হঠাৎ পেট ব্যথা করছে কেন?'

'আমি কী করে বলব কেন? ব্যথায় মরে যাচ্ছি। দেখি মা, একগ্লাস পানি দাওতো।'

'বাথরুমে যাবি?'

'না।'

'বাথরুম করলে পেট ব্যথা কমবে।'

'বললামতো বাথরুম পায়নি।'

'আয়, আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কী অদ্ভুত কথা তুমি যে মা বল! বাথরুম পায়নি, তারপরেও তুমি আমাকে জোর করে বাতরুমে নিয়ে যাবে। তারপর কী করবে কমোডে বসিয়ে রাখবে? পানি চাচ্ছি পানি দাও।'

মা পানি এনে দিলেন। আমি পানি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। মা বললেন, বকু ব্যথা কি বেশি?

আমি বললাম, হুঁ।

'পেটে তেল মালিশ করে দেব?'

'কিচ্ছু মালিশ করতে হবে না।'

'পেটের নিচে বালিশ দিয়ে উপুর হয়ে শুয়ে থাক।'

'ডাক্তারি ফলিও না মা।'
'তুই আমার সঙ্গে এত বিশ্রী ব্যবহার করছিস কেন?'
'বিশ্রী ব্যবহার কী করলাম?'
'তোর স্বভাব চরিত্র বদলে যাচ্ছে বকু।'
'দয়া করে চুপ করে থাকবে মা। পেটের ব্যথায় বাঁচি না। তোমার বকবকানি এখন অসহ্য লাগছে।'
'মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?'
'আমার যন্ত্রণা পেটে—তুমি মাথায় হাত বুলাবে কেন?'
'ডাইনিং রুমে তুই ঐ ফাজিলটার সঙ্গে এত কী কথা বলছিলি?'
'কার কথা বলছ, সেলিম ভাই?'
'আদুরে গলায় সেলিম ভাই বলবি নাতো—রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।'
'সেলিম ভাই না বলে যদি শুধু সেলিম বলি তাহলে কি তুমি খুশি হবে?'
'ফাজিল ধরনের এইসব ছেলের সঙ্গে তোর এত কথা বলার দরকারটাই বা কী?'
'আচ্ছা যাও আর কথা বলব না। পেটের ব্যথায় মরে যাচ্ছি তুমি এর মধ্যেও প্যাঁচাল শুরু করলে? দয়া করে চুপ কর।'
'ব্যথা খুব বেশি?'
'হুঁ।'
'মঈন ভাইয়াকে খবর দেব?'
'মঈন ভাইয়াকে খবর দেব মানে? উনাকে কেন খবর দেবে? উনি কি ডাক্তার?'
'ডাক্তার না হোক দলের মাথা। বিপদ আপদ হলে তাকেইতো সবার আগে জানাতে হবে, প্রয়োজন হলে ডাক্তারের ব্যবস্থা করবে। তুইতো ফেলনা না। তুই এই ছবির সেকেন্ড নায়িকা।'
'তোমার ধারণা নায়িকার পেট ব্যথা শুনে উনি ছুটে এসে নায়িকার পেটে হাত দিয়ে বসে থাকবেন?'
'তুই কী ধরনের কথা বলছিস! নোংরা ধরনের কথা শিখলি কোথায়?'
'তোমার কাছ থেকে শিখেছি।'
'আমার কাছ থেকে শিখেছিস? আমি নোংরা কথা বলি?'
'অবশ্যই বল। তুমি আর জালালের মা—তোমরা কর কী? সময় পেলেই গুজগুজ গুজগুজ। তোমরা কি ধর্মীয় আলাপ কর? তোমার কি ধারণা তোমাদের গল্প আমার কানে যায় না?'
'জালালের মা গল্প বলে আমি শুধু শুনে যাই।'
'গল্পগুলি কী রকম? কোন নায়িকা কী নষ্টামি করল, কাকে রাতে কার ঘরে পাওয়া গেল।'
'একজন কেউ আগ্রহ করে গল্প করলে আমিতো তার মুখ চাপা দিতে পারি না।'
'না পারলে নাই। তুমি ঘুমুতে এসোতো মা। আর কথা না। তুমি নিজে ঘুমাও আমাকেও ঘুমুতে দাও।
মা সঙ্গে সঙ্গে মশারির ভেতর ঢুকলেন। মাঝে মাঝে মা আমাকে ভয় পান। এই মুহূর্তে তিনি আমাকে ভয় পাচ্ছেন। মা আমার ভয়ে ভীত, এই দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগে।
'বকু তোর পেট ব্যথাটা কমেছে?'
'হ্যাঁ।'
'মঈন ভাইয়ার কাছে তোর ব্যাপারে নালিশ করতে হবে।'
'আদুরে গলায় মঈন ভাইয়া মঈন ভাইয়া বলবে নাতো মা। বিশ্রী লাগে। মনে হয় তুমি উনার প্রেমে পড়ে গেছ।'
'আমি প্রেমে পড়ে গেছি মানে?'
'চুপ করে ঘুমাওতো মা। আমার আবার পেট ব্যথা করছে। মনে হয় এপেনডিসাইটিস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা আর কথা বললেন না। আমি ঘুমুবার চেষ্টা করছি। মনে হচ্ছে আজ রাতটা নির্ঘুম কাটবে। হয়ত সকালে দেখা যাবে চোখের নিচে কালি পড়েছে। সেই কালি ঢাকতে মেকাপম্যানের কষ্ট হবে।

'মা। জেগে আছ?'

'হুঁ।'

'সেলিম ভাইয়ের ব্যাপারে তুমি কি আপসেট?'

মা জবাব দিলেন না। আমি হালকা গলায় বললাম, আপসেট হয়ো না। সেলিম ভাই কিন্তু সহজ মানুষ না। ভ্যাবলার মতো ঘুরে বেড়ালেও তিনি মোটেই ভ্যাবলা না।

'তোকে সে যা বুঝিয়েছে তুই তাই বুঝেছিস।'

'সেলিম ভাই একজন বিখ্যাত অভিনেতা। তিনি এই ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন। ফরহাদ সাহেবের যে চরিত্রটা করার কথা সেটা উনি করছেন।'

'পাগলের মতো কথা বলবি না বকু।'

'মোটেই পাগলের মতো কথা বলছি না। পুরো ব্যাপারটা সিক্রেট। কাল যখন সেলিম ভাইয়ের উপর ক্যামেরা ওপেন হবে তখনই জানতে পারবে, তাঁর অভিনয় দেখেও তোমাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। তোমাদের সময়কার হিট নায়ক উত্তমকুমারকে তিনি কোঁৎ করে গিলে ফেলতে পারেন।'

মা কম্বল ফেলে উঠে বসলেন। কিশোরীদের মতো কৌতূহলী গলায় বললেন— সত্যি?

'সত্যিতো বটেই। তিনি যে সে লোক না। তিনি হলেন—সেলিমকুমার।'

অদ্ভুত শব্দে একটা পাখি ডাকছে। কেমন ভয় ধরানো গলার স্বর। আমি পাখির ডাক শুনছি। কী পাখি ডাকছে মা'কে জিজ্ঞেস করে জানা যাবে না। মা এইসব জানেন না। সেলিম ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেত।

'মা!'

'কিরে, ব্যথা আবার বেড়েছে?'

'উঁহু। ঘুম আসছে না, একটা গল্প বলতো মা। ভূতের গল্প।'

'ভূতের গল্প আমি জানি নাকি?'

'ছোটবেলায় কিংবা বড় বেলায় ভূতটূত কিছু দেখনি?'

মা হালকা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ভূত একটাই দেখেছি—তোর বাবাকে।

'বেশতো, বাবা ভূতের গল্পই বল।'

মা চুপ করে গেলেন। আমি বললাম, ভূতের সঙ্গে তোমার বিয়ের গল্পটা বলতো মা।

'নিজের বাবাকে ভূত বলছিস, লজ্জা লাগছে না?'

'তুমি বলছ বলেই আমি বলছি।'

'আমার কথা ভিন্ন।'

'ভিন্ন হবে কেন? তুমিও যা, আমিও তা—বল মা, তোমাদের গল্প শুনি। প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল না বিয়ের পর প্রেম?'

'প্রেম-ফ্রেম আমাদের জীবনে ছিল না।'

'শুরুতে নিশ্চয়ই ছিল—সেটা বল।'

'আচ্ছা শোন—একটা ভূতের গল্প শোন, মনে পড়েছে। আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছি—আমার মায়ের বাড়ি ছিল কলসহাটি। মা তখন খুব ছোট, তিন চার মাস বয়স। হয়েছে কী তাঁকে তেল মাখিয়ে রোদে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমার নানি গিয়েছেন পাকঘরে কী একটা আনতে। ফিরে এসে দেখেন মেয়ে নেই। নেই তো নেই। কোথাও নেই। চারদিকে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কেউ বলল শিয়ালে নিয়ে গেছে, কেউ বলল বাঘডাসায় নিয়ে গেছে।'

'আসলে কি ভূতে নিয়ে গেছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'দিনে দুপুরে ভূত এসে তোমার মা'কে নিয়ে গেল? এই গল্প শুনব না মা। থুক্কু, তোমার সঙ্গে খেলব না।'

'তুই এমন অদ্ভুতভাবে কথা বলিস কেন?' 'থুক্কু তোমার সাথে খেলব না।' তুই কি আমার সঙ্গে খেলছিস?'

'খেলছিতো বটেই। আমরা সবাই সবার সঙ্গে খেলি। কারো খেলা ভাল হয়। কারো খেলা ভালো হয় না। খেলার মধ্যে ঝগড়া হয়। খামচাখামচি হয়। কেউ খেলা ফেলে রাগ করে উঠে চলে যায়।'

'পাগলের মতো কথা বলবি নাতো বকু। তোর পাগলের মতো কথা শুনতে অসহ্য লাগছে।'

'আচ্ছা কথা বলব না। তুমি কি আমার কাছ থেকে একটা ভূতের গল্প শুনতে চাও?'

'তোর কাছ থেকে ভূতের গল্প শুনব? তুই ভূতের গল্প জানিস না-কি?'

'হ্যাঁ জানি। শোন—অনেককাল আগে আমাদের দেশের ধনবান মানুষরা তাদের ধনরত্ন কী করতেন জান? ধনরত্নের একটা অংশ মাটির নিচে গর্ত করে রেখে দিতেন, যেন দুঃসময়ে ব্যবহার করা যায়। কিংবা তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানসন্ততিরা ব্যবহার করতে পারে। তখনতো আর ব্যাংক ছিল না। মাটির নিচের গুপ্ত ঘরই হল ব্যাংক।

'কী হাবিজাবি শুরু করলি? ঘুমোতো।'

'আহা শোন না—ঐসব ধনরত্ন টাকা পয়সা পাহারা দেয়ার জন্যে থাকতো যখ।'

'যখ কী?'

'যখ হচ্ছে যক্ষ। শোননি—যক্ষের ধন? যখ বানানো হত কীভাবে জান মা? যখ বানানোর প্রক্রিয়াটা মজার। নয় থেকে দশ বছর বয়সের একটা ছেলেকে যখ বানানো হতো। তাকে গোসল করিয়ে নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে সাজানো হত। চোখে সুরমা দিয়ে চুল আচড়ে দেয়া হত। কোলে বসিয়ে দুধ ভাত খাওয়ানো হত। তারপর নিয়ে যাওয়া হত গুপ্ত ঘরে। সেখানকার ধনরত্ন তার সামনে রাখা হত। একজন পুরোহিত মন্ত্র পড়তে পড়তে ধনরত্ন তার হাতে জিম্মা করে দিতেন। পুরোহিত বলতেন—হে যখ, তোমার হাতে এইসব রত্ন-রাজি তুলে দিলাম। তোমার দায়িত্ব হল এর রক্ষণাবেক্ষণ করা। আইনানুগ উত্তরাধিকারী ছাড়া তুমি এই ধনরত্ন কখনো হস্তান্তর করবে না। যে ছেলেটা যখ হবে সে সারা দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে একসময় কোলেই ঘুমিয়ে পড়ত। তখন তাকে সেখানে শুইয়ে সবাই চুপি চুপি উঠে আসত। গুপ্ত ঘরে জ্বলতো একটা ঘিয়ের প্রদীপ। তারা উপরে উঠে এসেই ঘরের মেঝের গুপ্ত কুঠুরি চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিত। এক সময় ছেলেটির ঘুম ভাঙতো। আতঙ্কে অস্থির হয়ে সে ছোটাছুটি করত। মা'কে ডাকতো, বাবাকে ডাকত। তার কান্না তার আর্ত চিৎকার কেউ শুনতে পেত না। ছেলেটার মৃত্যু হত সেই ধনরত্নপূর্ণ গুপ্ত কুঠুরিতে।'

আমি থামলাম। মা হতভম্ব হয়ে বললেন—এই ভয়ংকর গল্প তুই কোথায় শুনলি!

আমি বললাম, এটা কোনো ভয়ংকর গল্প না মা। পুরানো ভারতের সাধারণ একটা গল্প। ভারতবর্ষের যেখানেই মাটির নিচে ধনরত্ন পাওয়া গেছে সেখানেই ছোট বালকের কংকাল পাওয়া গেছে।

'কে বলেছে তোকে?'

'ঘুমাও মা। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'এইসব আজেবাজে গল্প কখনো বলবি না।'

'আচ্ছা আর বলব না।'

'এই গল্পটা তোকে কে বলেছে?'

আমি জবাব দিলাম না। ঘুমের ভান করলাম। মা আরো কয়েকবার এই বকু, এই বকু বলে আমার গায়ে ধাক্কা দিলেন। আমি চমৎকার ঘুমের অভিনয় করলাম। মা চুপ করে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঘুম আসছে না। আমি জেগে আছি। গল্পটা আমাকে বলেছেন আমাদের ডিরেক্টর মঈন সাহেব।

যখ বানানোর প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর ছবি বানানোর শখ। ছবিটি কেমন হবে তাই তিনি পাপিয়া ম্যাডামকে বুঝাচ্ছিলেন। আমি দূর থেকে শুনছিলাম। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, এই ছবি বানিয়ে লাভ কী?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, মানুষ যে কত ভয়ংকার হতে পারে তা দেখানো।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, এখনতো আর কেউ যখ বানাচ্ছে না। সেই ভয়ংকর মানুষরাতো নেই।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, যারা যখ বানাতো তারা কিন্তু ভয়ংকর ছিলেন না। সাধারণ মানুষই ছিলেন। তাদের সংসার ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল। তাঁরা ধর্ম-কর্ম করতেন, দান ধ্যান করতেন। তার পরেও ভয়ংকর ব্যাপারটা কোনো না কোনোভাবে তাদের চরিত্রে ছিল। ছিল না?

'হ্যাঁ ছিল।'

'যদি তখন থাকে তাহলে এখনো আছে। মানুষ জন্মসূত্রে তার চরিত্রে এই ভয়ংকর ব্যাপারটি নিয়ে এসেছে। আমার ছবিটা মানুষের মনের ঐ দিকটাই দেখাবে।'

'ছবির নাম কী হবে?'

'নাম ঠিক করিনি।'

'ছবিটা কি সত্যি সত্যি বানানো হবে?'

'তাও জানি না। অনেক কিছু করতে ইচ্ছা করে। করতে পারি কোথায়? টাকা নেই। টাকা নেই।'

'আপনার স্ত্রী টাকা দেয়া বন্ধ করেছে?'

ডিরেক্টর সাহেব জবাব দিলেন না। হঠাৎ মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বকুল যখের গল্পটা তোমার কাছে কেমন লাগল। প্রশ্নটা এমন আচমকা করা হল যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। আমি যে গল্পটা এত আগ্রহের সঙ্গে শুনছি তা তিনি লক্ষ্য করবেন আমি ভাবিনি। এক পলকের জন্য আমার মনে হল আসলে গল্পটা তিনি আমাকেই শুনাতে চাচ্ছিলেন। পাপিয়া ম্যাডাম উপলক্ষ মাত্র। তার পরেই মনে হল—আরে না।

বিছানায় এপাশ ওপাশ করছি—ঘুম আসছে না। এক সময় আমার নিজেকেই যখের মতো মনে হল। আমি যেন একটা যখ—পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে। অথচ এই সৌন্দর্য আমি উপভোগ করতে পারছি না। আমি শুধু পাহারা দিচ্ছি।

আচ্ছা সব মানুষই কি খানিকটা যখের মতো না? তাদের কাজ অন্যের ধনরত্ন পাহারা দেয়া। মা যেমন আমার ধনরত্ন পাহারা দিচ্ছেন, আমি অন্য একজনেরটা পাহারা দিচ্ছি। দূর, পাগলের মতো কী ভাবছি! আমার ঘুমিয়ে পড়া দরকার। মানুষের ইচ্ছা-ঘুমের ক্ষমতা থাকার খুব প্রয়োজন ছিল। ইচ্ছা করা মাত্র আনন্দময় ঘুম চোখে নামবে—আর কী শান্তি। তা-না, ঘুমের জন্যে অন্য একজনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সেই অন্য একজন ঘুম পাড়িয়ে দিলে ঘুম আসবে। ঘুম পাড়াতে না চাইলে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে হবে। মওলানা মেরাজ মাস্টার সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হবে—ঘুম আসার কোনো দোয়া তাঁর জানা আছে কি-না।

মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। আজ তিনি বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন। উঠে গিয়ে বাতি নিভিয়ে আসব—না বাতি জ্বালানোই থাকবে? বুঝতে পারছি না। ডাইরি লেখা যেতে পারে। মাঝে মাঝে আমি যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে যাই—আর ঘুম আসবে না, তখন ডাইরি লিখতে বসি। আজ সারা দিনে লেখার মতো অনেক কিছুই ঘটেছে।

মনে মনে রাফ করে ফেললে কেমন হয়। রাফ করতে করতে এক সময় হয়ত ঘুম এসে যাবে। আমি মনে মনে ডাইরি লেখা শুরু করলাম।

হাতি ও পিঁপড়া সংবাদ

হাতি এবং পিঁপড়া বিষয়ক একটা গল্প ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলেছেন। গল্পটা আমি আগেও শুনেছি—তবে তিনি অনেক মজা করে বলেছেন। এই মানুষটার গল্প বলার ক্ষমতা ভাল। তবে তিনি যে খুব ভাল গল্প বলেন তা তিনি জানেন। একজন যখন জেনে ফেলে সে খুব ভাল গল্প করতে পারে তখন তার গল্প বলায় ওস্তাদি একটা ভাব এসে পড়ে। উনার মধ্যেও তা এসেছে। আমার মামাও খুব ভাল গল্প বলতে পারেন। তবে তিনি তাঁর এই ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন না। জানেন না বলেই নিজের মনে মজা করে গল্প করেন। শুনতে অসম্ভব ভাল লাগে। হাতি এবং পিঁপড়ার এই গল্পটা মামাকে বললে তিনি আরো অনেক বেশি মজা করে এই গল্প অন্যদের করবেন। তবে সমস্যা হচ্ছে কী, যারা খুব ভাল গল্প করতে পারে তারা শুধু নিজেরা গল্প করতে চায়। অন্যদের গল্প শুনতে চায় না। আমি নিজেও খুব ভাল গল্প করতে পারি। ডিরেক্টর সাহেবকে আমি একদিন আমার গল্প শুনাব। সেই একদিনটা কবে আমি জানি না। আজ উনাকে গল্প শুনাবার একটা সুযোগ আমার ছিল। আমি সেই সুযোগ গ্রহণ করিনি।

হাফিজ আলির স্ত্রী

হাফিজ আলির স্ত্রীর নাম আমি এখনো জানি না। আমি কেন কেউই জানে না। এই মহিলা না-কি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। ইউনিটের সবাই এই মহিলার ব্যাপারে উৎসাহী। আমি উৎসাহী বোধ করছি না—তবে ভদ্রমহিলাকে আমার খুব দেখার শখ। একটা কাজ করলে কেমন হয়—একদিন চুপি চুপি ভদ্রমহিলার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে যদি বলি, শুনুন আমার নাম রেশমী। আমি ভবিষ্যৎ বলতে পারি। আজ আমি এসেছি আপনার ভবিষ্যৎ বলতে। আপনি কি আপনার নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চান? তাহলে ভদ্রমহিলার মুখের ভাব কেমন হবে? তিনি কি নিজের ভবিষ্যৎ জানতে আগ্রহী হবেন?

সেলিম ভাই

আমার ধারণা সেলিম ভাই খুব ভাল অভিনয় করবেন। তাঁকে ভাল অভিনয় করার ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি। তাঁর ভেতরে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তুললেই হবে, আর কিছু লাগবে না। একজন যুবক ছেলের আত্মবিশ্বাস মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তখনই যখন সে হঠাৎ দেখে একটা তরুণী রূপবতী মেয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তখন সমস্ত পৃথিবীটা মনে হয় তার হাতের মুঠোয়। আমি অনায়াসেই সেলিম ভাইয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাবার অভিনয় করতে পারি। তবে এখন এই অভিনয় করলে লাভ হবে না। কারণ সেলিম ভাই নিজে আমার প্রেমে হাবুডুবু খেতে শুরু করেছেন। আমার দিকে তাঁর তাকানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি সবই পালটে গেছে। এখন আমি আর তাঁকে সাহায্য করতে পারব না।

মা ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে বললেন, “বাবু ও বাবু। বাবু।” তিনি তাঁর বাবাকে ডাকছেন। আহা বেচারি। আমি মা'র গায়ে হাত রাখলাম, কোমল গলায় ডাকলাম, মা মা। মা ঘুমের মধ্যেই বললেন, হুঁ। আমি বললাম, তুমি আরাম করে ঘুমাও। আমি কখনো, কোনোদিনও তোমাকে ছেড়ে যাব না। আমি তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করি, তোমাকে রাগিয়ে দেই, কাঁদাই। কিন্তু তোমাকে যে আমি কত ভালবাসি তা তুমি জান না। জানলে তোমার খুব ভাল লাগতো।

মা পাশ ফিরলেন। মনে হচ্ছে ঘুমের মধ্যেও তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

মাঝে মাঝে খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙে। কোনো কারণ ছাড়াই হঠাৎ জেগে উঠে দেখি ঘরের ভেতর অন্ধকার নরম একটা ভাব। ঘন অন্ধকারকে কেউ যেন তরল করে দিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ঘন করে ফেলবে। ধক করে বুকে ধাক্কা লাগে—হচ্ছে কী? ভয়ংকর কিছু কি হচ্ছে? এটাই কি সেই ভয়ংকর মুহূর্ত?

ভয়ংকর মুহূর্তের একটা ইতিহাস আছে। আমি যখন খুব ছোট তখন দাদিজান আমাদের সঙ্গে থাকতেন। মাঝে মাঝে দাদিজানের সঙ্গে আমি রাতে ঘুমুতাম। তাঁর কাছে গল্প শুনতে চাইতে হত না। তিনি নিজের মনেই একের পর এক গল্প বলে যেতেন। তাঁর সব গল্পই ভয়ংকর টাইপের। ইসরাফিল শিঙা ফুঁকছে—পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সেই শিঙার কী ভয়ানক আওয়াজ। সেই আওয়াজ কানে যাওয়া মাত্র সমস্ত গর্ভবতী মা'দের পেটের সন্তান 'খালাস' হয়ে যাবে। শিঙাটা ফোঁকা হবে—আধো আলো আধো অন্ধকার সময়। তখন দিনও না, রাতও না।

খুব ভোরে যতবার ঘুম ভাঙতো ততবারই মনে হত এই কি সেই শিঙা ফোঁকার সময়? নিজেকে সামলাতে সময় লাগত। আমি এলোমেলো পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম। বাড়ির সামনের রাস্তাটা ফাঁকা। একটা মানুষ নেই। মানুষজন যেমন ঘুমুচ্ছে, রাস্তাটাও যেন ঘুমুচ্ছে। কোনো একজন জীবন্ত মানুষ রাস্তায় এসে না দাঁড়ানো পর্যন্ত রাস্তার ঘুম ভাঙবে না।

আমি ঠিক করে ফেলি রাস্তার ঘুম না ভাঙা পর্যন্ত আমি বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকব। যে মানুষটা রাস্তার ঘুম ভাঙাবে তাকে দেখে ঘরে ঢুকব। তখন মনে এক ধরনের উত্তেজনা হতে থাকে। কাকে দেখব? কে সেই ঘুম ভাঙানিয়া?

বেশিরভাগ সময়ই নামাজি মানুষদের দেখি। ফজরের নামাজ পড়তে মস্‌জিদের দিকে যাচ্ছেন। একবার শুধু বাচ্চা একটা মেয়েকে দেখেছিলাম। তার পরনে লাল ফ্রক, খালি পা, হাতে একটা কঞ্চি। সে নির্বিকার ভঙ্গিতে কঞ্চি দুলাতে দুলাতে যাচ্ছে। আমার মনটা খানিকক্ষণের জন্যে অন্যরকম হয়ে গেল—মেয়েটা এত ভোরে কোথায় যাচ্ছে? তার মনে এত আনন্দইবা কিসের? পৃথিবী কি সত্যিই এত আনন্দময়? আমি বারান্দা থেকে ডাকলাম, "এই মেয়ে, এই।" সে মাথা ঘুরিয়ে আমাকে দেখে ফিক্ করে হাসল তারপর আগের মতোই কঞ্চি দুলাতে দুলাতে এগুতে লাগল। এরপর থেকে ভোরে ঘুম ভাঙলেই মেয়েটার মুখ আমার মনে আসে। কী সুন্দর মায়া মায়া মুখ। কেমন টুকটুক করে হাঁটছিল।

দুর্গাপুর ডাকবাংলোয় আজ আবার আধো অন্ধকার আধো আলোয় ঘুম ভাঙল। আমি পুরানো অভ্যাসমতো বারান্দায় চলে এলাম। পাখিদের চিৎকারে কান পাতা যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষরা যে খুব ভোরে জেগে ওঠে তার প্রধান কারণ বোধ হয় পাখিদের হৈচৈ। পাখিরা বড্ড বিরক্ত করে।

বারান্দা থেকে উঠোনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। পাপিয়া ম্যাডাম হাঁটছেন। তাঁর হাতে কফির মগ। মাঝে মাঝে কফিতে চুমুক দিচ্ছেন (কফি না হয়ে চা–ও হতে পারে। আমি ধরে নিচ্ছি কফি। তিনি চা খান না)। তিনি নিজের মনে হাঁটছেন। ছবির মতো একটা দৃশ্য। তাঁর পরনে শাদা শাড়ি। লাল একটা চাদর মাথার উপর দিয়ে রেখেছেন। তাঁকে জীবন্ত একটা ফুলের মতো লাগছে। আমার কাছে মনে হল আমি অনেকদিন এমন সুন্দর দৃশ্য দেখিনি। পাপিয়া ম্যাডাম কোনোদিকে তাকাচ্ছেন না। তিনি আছেন আপন মনে। আমি যদি কখনো ছবি বানাই এমন একটা দৃশ্য অবশ্যই রাখব। ছবির নায়িকা খুব ভোরে বাগানে একা একা হাঁটছে। তার হাতে কফির মগ। মাঝে মাঝে সে মাথা উঁচু করে আকাশ দেখার চেষ্টা করছে। আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ছে। আমার খুব ইচ্ছা করছে উঠোনে নেমে যাই। পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলি। উনি হয়ত খুব রাগ করবেন। কিছু সময় আছে যখন মানুষ একা থাকতে চায়, অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রিয়জনের সঙ্গও তার অসহ্য বোধ হয়। উনার হয়ত এখন ঐরকম সময় যাচ্ছে। আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। নিচে নামলাম। ঠিক করে ফেললাম, উঠোনে এমনভাবে যাব যাতে মনে হবে উনি যে উঠোনে আছেন আমি জানতাম না। আমি যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে উনাকে দেখেছি উনি তা জানেন না। আমি হঠাৎ উঠোনে উনাকে দেখে চমকে উঠেছি এমন একটা অভিনয়। আমার জন্যে সহজ অভিনয়।

আমি আমার অভিনয়ের অংশটা সুন্দরভাবে করলাম। উনাকে দেখে চমকে উঠে বললাম, ও আল্লা আপনি! কী আশ্চর্য!

উনি হাসি মুখে বললেন, রুমালী তুমি কেমন আছ?

'জি ভাল।'

'আমাকে দেখে চমকে ওঠার ভান করলে কেন? তুমিতো দোতলার বারান্দা থেকেই আমাকে দেখেছ।'

চট করে কোনো জবাব আমার মাথায় এল না। আমি অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছি। কাউকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারার মধ্যে তীব্র একটা আনন্দ আছে। বেশিরভাগ মানুষ এই আনন্দ অনেকক্ষণ ধরে পেতে চান। উনিও কি তা চাইবেন? না-কি আমার কাছ থেকে কোনো জবাবের জন্যে অপেক্ষা করবেন না, অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবেন?

পাপিয়া ম্যাডাম অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন—সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, তুমি কি রোজই এত ভোরে ওঠ?

'জি না। আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে।'

'আমি খুব আর্লি রাইজার। যত রাতেই আমি ঘুমুতে যাই না কেন—পাঁচটা সাড়ে পাঁচটার দিকে আমার ঘুম ভাঙবেই। তখন আমি নিজের জন্যে এক মগ কফি বানাই। কফি খেতে খেতে টুকটুক করে হাঁটি।'

কিছু বলতে হয় বলেই আমি বললাম, খুব ভাল অভ্যাস।

তিনি বললেন, মোটেই ভাল অভ্যাস না। কারণ সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পরই আমি আবার ঘুমুতে চলে যাই। শুটিং না থাকলে—দশটা এগারোটা পর্যন্ত ঘুমুই।

'আজ ঘুমুতে পারবেন না। আজতো শুটিং।'

'আজো পারব। আজ শুটিং হবে না।'

'শুটিং হবে না? প্যাক আপ হয়ে গেছে?'

'না। তবে হবে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে হবে। আমার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল।'

'আপনি কি সবকিছু আগেভাগে বলতে পারেন?'

'আরে না। হঠাৎ কোনো একদিন একটা কিছু মনে হয় তারপর দেখি তাই হয়েছে। আজ ঘুম থেকে উঠেই মনে হল শুটিং হবে না। এবং আমি জানি হবে না।'

আমি বললাম, এই গ্রামে একটা বৌ আছে। সেও না-কি ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

তিনি হালকা গলায় বললেন, ও আচ্ছা, জাহেদা। তার কথা শুনেছি। একদিন যাব, দেখে আসব। অবশ্যি পীর-ফকির, ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার খুব আগ্রহ নেই। তুমি ঘুরে বেড়াও—আমি যাচ্ছি।

'এখন ঘুমুতে যাবেন?'

'হুঁ।'

'আপনার মেয়েকে সবুজ বলপয়েন্টে একটা চিঠি লিখবেন বলে ঠিক করেছিলেন, সেই চিঠি লেখা হয়েছে?'

পাপিয়া ম্যাডাম হেসে ফেলে বললেন, আমার সবুজ বল পয়েন্টের খবর মনে হয় দিকে দিকে ছড়িয়ে গেছে। হ্যাঁ, চিঠি লেখা হয়েছে। এখনো পোস্ট করিনি। আচ্ছা ঠিক আছে চিঠি পোস্ট করার আগে তোমাকে পড়াব। পড়লে তোমার মজা লাগবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালে নাশতা খাবার সময় সোহরাব চাচা বললেন, মিস রুমাল তুমি মেকাপে বসে যাও। দেরি করবে না। আমি বললাম, চাচা, শুটিং কি হবে? সোহরাব চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন, শুটিং হবে না কেন?

'এম্নি বললাম।'

'শুটিং অবশ্যই হবে। স্যার বলে দিয়েছেন—হেয়ার স্টাইল তোমাকে মনে রাখতে। যেদিন যেদিন শাড়ি পরবে, চুল খোলা থাকবে। শাড়ি ছাড়া আর যাই পরবে—দু'বেণী করবে।'

'জি আচ্ছা, মনে রাখব। মেকাপ কোথায় দেয়া হবে?'

'তাওতো জানি না—আচ্ছা দাঁড়াও জেনে এসে বলছি। এই ফাঁকে দ্রুত চা শেষ করে ফেল। তুমি টুকটুক করে চা খাও কেন? এক চুমুক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা, আবার আরেক চুমুক।'

চা শেষ করার আগেই সোহরাব চাচা ফিরে এসে বিরক্ত মুখে বললেন, আজ শুটিং প্যাক আপ হয়েছে।

ছবির জগতে 'প্যাক আপ' বাক্যটি আনন্দময়। স্কুলে উপস্থিত হবার পর হেড স্যার যদি এসেম্বলিতে বলেন, তোমাদের জন্যে দুঃখের খবর আছে—ক্লাস এইটের একজন ছাত্রী মায়া হালদার যে দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিল, আজ খবর এসেছে সে মারা গেছে। আজ তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করা হবে। এবং আজ আর কোনো ক্লাস হবে না। তখন ছাত্রীরা খুব চেষ্টা করে চোখে মুখে মনখারাপ ভাব ফুটিয়ে রাখতে। শেষ পর্যন্ত পারে না। মৃত্যুর শোকের চেয়ে ক্লাস হবে না এই আনন্দই বড় হয়ে ওঠে। প্যাক আপেও তাই হয়—সবাই ভাব করে—আহা একটা দিন মাটি হল, কিন্তু সবাই খুশি। সবচে খুশি আমার মা। তিনি আনন্দ ঝলমল গলায় বললেন, বকু! আমার সঙ্গে চল এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, চল।

'কোথায় যাচ্ছি না জেনেই বললি—'চল'।'

'তুমি যেখানেই নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। তুমি যদি লাযাতে নিয়ে যাও, সেখানেও যাব।'

'লাযাটা কোথায়?'

'লাযা হচ্ছে একটা দোজখের নাম। সাতটা দোজখের একটার নাম লাযা।'

'আমি তোকে লাযাতে নিয়ে যাব কেন? এটা কী ধরনের কথা। পাগলামি ছাগলামি কথা আমার সাথে বলবি না। আমার কাছে জ্ঞান ফলাবি না। আমি তোর পেটে জন্মাইনি, তুই আমার পেটে জন্মেছিস।'

মা রাগে গরগর করতে লাগলেন, আমি মিষ্টি মিষ্টি হাসি হাসছি। এই হাসিতে মা'র রাগ আরো বাড়বে। তবে রাগটা কনট্রোলের ভেতর থাকবে। লাগামছাড়া হবে না। এই হাসি উনুনে অল্প অল্প তুষ ছড়িয়ে দেয়া হাসি। আমার আরেকটা হাসি আছে পেট্রল ঢেলে দেয়া টাইপ। ধুম করে আগুন।'

'বকু!'

'জি মা।'

'কাপড় বদলা, ভাল কিছু পর।'

'তুমি যা বলবে তাই পরব। তুমি আগে সেজেগুজে আস। তারপর আমি। আমার চেয়ে তোমার সাজটা বেশি দরকার।'

'তার মানে?'

'না সাজলেও আমাকে সুন্দর দেখাবে মা। বয়সের সৌন্দর্য। তোমার সেই সৌন্দর্যতো নেই। সাজগোজ করে সেটা কাভার দিতে হবে। তবে মা শোন, আল্লাহ্‌র দোহাই লাগে তুমি ঠোঁটে এত কড়া করে লিপস্টিক দিও না।'

আমি আবারো মিষ্টি মিষ্টি করে হাসলাম। মা রাগে কাঁপতে কাঁপতেই দোতলায় উঠে গেলেন। সেজেগুজে তাঁর নিচে নামতে এক ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। এই এক ঘণ্টা আমি

নিজের মনে ঘুরতে পারি। হাফিজ আলির বাড়ি যদি আশেপাশে হয় তাহলে চট করে তার বৌকেও দেখে আসা যায়। তার কাছ থেকে ভবিষ্যৎটা জেনে আসা যায়। যিনি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন তার অতীতও বলতে পারার কথা। আমি তার কাছ থেকে ভবিষ্যৎ জানতে চাইব না। আমি জানতে চাইব অতীত। আমার প্রশ্নগুলি হবে এ রকম—

বলুনতো ছোটবেলায় আমি কার সঙ্গে ঘুমুতাম? মার সঙ্গে না বাবার সঙ্গে? না-কি দু'জনের সঙ্গেই—মাঝখানে আমি, এক পাশে বাবা আর এক পাশে মা।

উত্তরটা হল আমি দু'জনের কারোর সঙ্গেই ঘুমুতাম না। আমি ঘুমুতাম আমার দাদিজানের সঙ্গে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—বলুনতো আমি এই পর্যন্ত ক'বার পানিতে ডুবেছি?

উত্তর হচ্ছে তিনবার। প্রতিবারই মরতে মরতে বেঁচে উঠেছি। প্রথমবার পানিতে ডুবি আমাদের দেশের বাড়ি নেত্রকোনায়। পানি থেকে যখন আমাকে তোলা হয় তখন না-কি আমার সমস্ত শরীর নীল হয়ে গিয়েছিল। চোখের মণি উলটে গিয়েছিল। চোখেল মণি উলটে যাওয়ার মানে কী আমি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর আগে আগে কিংবা মৃত্যুর সময় চোখের এই ঘটনাটা হয়ত ঘটে। যাই হোক আমাকে উঠোনে শুইয়ে রেখে সবাই যখন মরাকান্না শুরু করে তখন হঠাৎ করে আমি সামান্য নড়ে উঠে ছোট্ট করে শ্বাস ফেলি। আমাকে নিয়ে ছোটাছুটি পড়ে যায়। এবং গ্রামের এক কবিরাজ আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন। এই ঘটনার পর আমার পানি-ভীতি হবার কথা। তা হয়নি। উলটোটা হয়েছে। পানি দেখলেই ছুটে কাছে যেতে ইচ্ছা করে। পানি হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই কারণে আরো দু'বার আমাকে পানিতে ডুবতে হল, প্রতিবারই জীবন সংশয়ের মতো অবস্থা। আমাকে সাঁতার সেখানোর জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি সাঁতার শিখলাম না। কারণ আমার মনে হল—সাঁতার শিখে ফেললেই আমার আর পানি ভাল লাগবে না। শান্ত সুন্দর কোনো দিঘি দেখলে তার কাছে যেতে ইচ্ছা করবে না। কেন এই আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব? আমার চারপাশে আনন্দময় ব্যাপারতো খুব কম। আচ্ছা দিলু যেমন দিঘির নীল জলে ডুবে মারা গেছে আমার বেলাতেও কি তাই হবে? শুটিং এর শেষ পর্যায়ে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে আমি সাঁতার না নেজেও দিঘিতে ভাসছি। দিঘির চারপাশের গাছের অসংখ্য পাখি অবাক হয়ে আমাকে দেখছে আর ভাবছে—ব্যাপারটা কী? একটা হলুদ রঙের পাখি হয়ত আমার ভাসন্ত শরীরটার উপর দিয়ে কয়েকবার উড়ে উড়ে যাবে। তার চোখে থাকবে বিস্ময়।

'কেমন আছেন?'

আমি তাকালাম। সেলিম ভাই। উনিও কি আমার মায়ের মতো নিঃশব্দে হাঁটা প্র্যাকটিস করছেন? কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন বুঝতেই পারিনি। সেলিম ভাইকে দেখে চমকে ওঠার কোনো মানে হয় না। কাজেই চমকালাম না। হাসি হাসি মুখে বললাম, আপনার খবর কী সেলিম ভাই?

'জি ভাল।'

'চোখ লাল হয়ে আছে কেন? রাতে ঘুম হয়নি?'

'জি না। টেনশনে ঘুম হয়নি। আজ শুটিং, স্যার কী করতে বলবেন আর কী করব এই টেনশনে...।'

'শুটিং যে প্যাক আপ হয়েছে সেই খবর নিশ্চয়ই পেয়েছেন।'

'জি পেয়েছি।'

'তাহলেতো টেনশন কমে যাবার কথা।'

'জি না, টেনশন কমেনি আরো বেড়েছে, আজ সকালে নাশতা খেতে পারি নি। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম ঘুম থেকে উঠেই কাউকে কিছু না বলে ঢাকা চলে যাব।'

'সেটা করলেন না কেন? যেটা ভাববেন সেটা করবেন। শেষ মুহূর্তে পিছিয়ে পড়বেন না। ঢাকায় পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা কি এখনো আপনার মাথায় আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জি আছে।'

'তাহলে এক কাজ করুন, আগামীকাল ভোরে ঢাকায় চলে যান। আজ খোঁজ নিয়ে আসুন ঢাকার দিকের প্রথম বাস কখন ছাড়ে। বাস ভাড়া কত। আপনার কাছে কি ঢাকায় ফিরে যাবার মতো টাকা আছে?'

'জি না।'

'আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন।'

'জি আচ্ছা।'

'এখন আমার সঙ্গে একটু চলুন।'

'কোথায়?'

'তেমন কোথাও না, একটু হাঁটাহাঁটি করব। একটু পরেই মা দোতলা থেকে নামবেন। নেমে শুনবেন আমি আপনার সঙ্গে কোথাও গেছি। মা'র ব্রেইন ডিফেক্টের মতো হয়ে যাবে। তিনি ভাব দেখাবেন যে খুব নরম্যাল আছেন। আসলে থাকবেন খুব এবনরম্যাল অবস্থায়। খুব মজা হবে।'

'মজা হবে কেন?'

'আপনি বুঝবেন না। চলুনতো যাই। কথা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। মা যদি এখন হুট করে নেমে যায় তাহলে পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

'দাঁড়ান, একটা ছাতা নিয়ে আসি—খুব রোদ।'

'আপনাকে ছাতা আনতে হবে না। চলুনতো।'

আমি গেটের দিকে এগুচ্ছি—সেলিম ভাই আসছেন আমার পেছনে পেছনে। খুব যে উৎসাহের সঙ্গে আসছেন তা মনে হচ্ছে না। মানুষ অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, উনাকে দেখে মনে হচ্ছে উনি অনুরোধে রাইস-মিল গিলে ফেলেছেন। বেচারার মন থেকে অস্বস্তি ভাবটা কাটানো দরকার। কী করে কাটাব বুঝতে পারছি না। হালকা ধরনের গল্পটল্প করা যেতে পারে।

'সেলিম ভাই!'

'জি।'

'বলুনতো দেখি চণ্ডিগড় গ্রামটার বিশেষত্ব কী?'

'কোনো বিশেষত্ব নেই। বাংলাদেশের সব গ্রাম একরকম।'

'হয়নি। এই গ্রামের একটা আলাদা বিশেষত্ব আছে। দেখবেন এই গ্রামে একটু পরপর শিমুল গাছ। গাছে ভর্তি কড়া লাল রঙের ফুল। মনে হয় যে পুরো গ্রামটায় আগুন ধরে গেছে। ধিক ধিক করে আগুন জ্বলছে।'

'জি।'

'চণ্ডিগড় গ্রামটা দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আপনি শুনে দেখুনতো আইডিয়াটা কেমন? আইডিয়াটা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে যদি একটা করে শিমুল গাছ লাগিয়ে দি তাহলে কেমন হয়? যখন ফুল ফুটবে তখন মনে হবে পুরো বাংলাদেশে আগুনের ফুল ফুটেছে। কোনো বিদেশি বাংলাদেশে এলে হতভম্ব হয়ে বলবে—একী? কোন দেশে এলাম? আমার আইডিয়া কেমন?'

'অদ্ভুত আইডিয়া।'

'খুব কি অদ্ভুত?'

'না, খুব অদ্ভুত না, তবে শিমুল গাছ না, লাগাতে হবে কৃষ্ণচূড়া গাছ আর রাধাচূড়া গাছ।'

'এমন কোনো গাছ আছে যার ফুল নীল।'

'জারুল গাছ। থোকা থোকা নীলচে ফুল ফোটে।'

'তাহলে আসুন আমরা একটা কাজ করি—বাংলাদেশের গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে একটা করে কৃষ্ণচূড়া গাছ আর একটা করে জারুল গাছ লাগিয়ে দি। পাঁচ ছ' বছর পর গাছগুলি যখন বড় হবে তখন একটা ভয়ংকর কাণ্ড ঘটে যাবে।'

সেলিম ভাই কিছু বলছেন না। অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছেন। মনে মনে হয়ত ভাবছেন—আচ্ছা এক পাগলি মেয়ের হাতে পড়লাম।

বৈজ্ঞানিকরা কত অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্কার করেন, এমন একটা আবিষ্কার করতে পারেন না যাতে অন্যের মনের কথা পরিষ্কার শোনা যাবে? ক্যালকুলেটারের মতো ছোট্ট যন্ত্র। পকেটে লুকানো থাকবে। যন্ত্রের বোতাম টিপে দিলেই পাশের মানুষটার মনের কথা শোনা যাবে।

'সেলিম ভাই।'

'জি।'

'কথা বলুন। এত চুপচাপ কেন? না-কি আমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না।'

সেলিম ভাই কিছু বললেন না। মাথা আরো নিচু করে ফেললেন। মনে হচ্ছে লজ্জা পাচ্ছেন।

'কাল ভোরে ঢাকা চলে যাবার প্রোগ্রামটা কি আপনার ঠিক আছে?'

'জি ঠিক আছে।'

'ঢাকা গিয়ে কী করবেন কিছু ঠিক করেছেন?'

'জি-না। প্রাইভেট নিউশনি করব।'

'প্রাইভেট টিউশনিই ভাল। স্বাধীন ব্যবসা। চেষ্টা করবেন বড়লোক কোনো মেয়ের প্রাইভেট টিউটার হতে। মেয়েটার বয়স চৌদ্দ পনেরো হলে ভাল হয়। এই বয়সের মেয়েরা দ্রুত প্রেমে পড়ে। কোনো রকমে বঁড়শি দিয়ে একটা প্রেম গেঁথে ফেলতে পারলে আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আপনি আমার কথায় বিরক্ত হচ্ছেন নাতো?'

'জি-না।'

'আপনি কেমন কাজের মানুষ এইবার দেখি—হাফিজ আলির বাড়িটা খুঁজে বের করুন।'

'কোন হাফিজ আলি? যার স্ত্রী ভবিষ্যৎ বলতে পারে? জাহেদা?'

'আপনি তাহলে জানেন?'

'জি। ইউনিটের সবাই জানে!'

'আপনি কি তার কাছ থেকে আপনার ভবিষ্যৎ জেনে এসেছেন?'

'উনি পুরুষদের সঙ্গে কথা বলেন না।'

'তাহলে ভবিষ্যৎ জানতে পারেননি?'

'জি না।'

'এইসব কি বিশ্বাস করেন?'

'জি করি। আমাদের গ্রামেও এ রকম একটা ছেলে আছে। যা বলে লেগে যায়। তার নাম মতিন। কানা মতিন। কঞ্চির খোঁচা লেগে তার একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।'

'এ রকম মানুষ সব গ্রামেই থাকে। বাংলাদেশের যে গ্রামেই যাবেন সে গ্রামেই একজন পাগল থাকবে, একজন জিনে ধরা মানুষ থাকবে, একজন নজর খারাপ মানুষ থাকবে, নজর খারাপ মানুষের শুধু নজর লাগবে। সবই ভুয়া। ভুয়া পাগল, ভুয়া জিন, ভুয়া নজর। পৃথিবীটা চলছেই ভুয়ার উপরে। জাহেদা মেয়েটাও বিরাট ভুয়া। ভুয়া ভাব মেয়েদের মধ্যে কম থাকে। হাফিজ আলির স্ত্রীর মধ্যে কীভাবে চলে এল সেটাই আমার দেখার ইচ্ছা। সেলিম ভাই, আপনি কি জানেন জাহেদা কী কী ভবিষ্যৎ বাণী করেছে? আমি সব ক'টা লিখে রাখব। পরে মিলিয়ে দেখব।'

'উনি বলেছেন—চণ্ডিগড়ে ছবির শুটিং কোনোদিন হবে না। বিরাট গণ্ডগোল লাগবে। পানিতে ডুবে একটা মানুষ মারা যাবে।'

'এই কথা বলেছে?'

'জি। খুব জোর দিয়ে বলছে।'

'আপনি কি এই ভয়েই পালিয়ে যাচ্ছেন? শুটিং করতে এসে পানিতে ডুবে মরার চেয়ে ঢাকায় প্রাইভেট টিউশনি করা ভাল। তাই না? প্রাইভেট টিউশনি এম্নিতে খুব বোরিং ব্যাপার

কিন্তু কোনো মতে পড়া পড়া খেলার সঙ্গে যদি প্রেম ঢুকিয়ে দিতে পারেন তাহলে পুরো ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং হয়ে যাবে।'

সেলিম ভাই মাথা নিচু করে হাঁটছেন, মাঝেমধ্যে চিন্তিত মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। পৃথিবীর সব মেয়েদের ভেতর অলৌকিক একটা ক্ষমতা থাকে। কোনো পুরুষ তার প্রেমে পড়লে মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝতে পারে। এই ক্ষমতা পুরুষদের নেই। পুরুষদের কানের কাছে মুখ নিয়ে কোনো মেয়ে যদি বলে—শোন আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। আমি মরে যাচ্ছি। তারপরেও পুরুষ মানুষ বোঝে না। সে ভাবে মেয়েটা বোধ হয় অ্যাপেনডিসাইটিসের ব্যথায় মরে যাচ্ছে। সেলিম ভাইকে দেখে এখন মনে হচ্ছে—তাঁর খবর হয়ে গেছে। কাল ভোরে তিনি কিছুতেই ঢাকা যেতে পারবেন না। তাঁকে থেকে যেতে হবে—শুধু মাত্র আমার আশেপাশে থাকার আনন্দের জন্যে।

হাফিজ আলির বাড়ির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। মাটির দু'টা ঘর। জরাজীর্ণ অবস্থা। বাইরের উঠোন খুবই নোংরা। ঝোপঝাড়ে একাকার। কেউ কোনোদিন উঠোন ঝাঁট দেয়নি। একটা মুরগি মরে পড়ে আছে। তার উপর রাজ্যের মাছি। বাড়ির সামনে খুঁটিতে একটা ছাগল বাঁধা আছে। সেই ছাগলটাও মনে হচ্ছে অসুস্থ। হাফিজ আলি উঠোনে বসে আছে। সে যে হাফিজ আলি তা বুঝলাম কারণ সেলিম ভাই বললেন, হাফিজ ভাল আছ? হাফিজ আলি তার জবাব দিল না। ছাগলটার মতো হাফিজ আলিও মনে হল অসুস্থ। চোখ টকটকে লাল। খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে বসে আছে—পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে আছে। তার দৃষ্টি মরা মুরগিটার দিকে। এই মুরগিটা বোধ হয় তার প্রিয় ছিল। কিংবা পচাগলা মুরগির উপর মাছি ওড়ার দৃশ্যে সে মুগ্ধ। বিকট গন্ধে আমার নাড়িভুঁড়ি উলটে আসার মতো হচ্ছে।

সেলিম ভাই বললেন, হাফিজ আলি তোমার কি শরীর খারাপ?

'না।'

'ইনি এসেছেন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দু'টা কথা বলার জন্যে।'

'যান, কথা বলেন। আপনে এইখানে থাকেন। পুরুষ মানুষের অন্দরে যাওয়া নিষেধ। পর্দা পুশিদার বিষয় আছে।'

'আমি যাব না। আমি এইখানেই থাকব।'

সেলিম ভাই দাঁড়িয়ে রইলেন, আমি ভেতরে চলে গেলাম। বাড়ির ভেতরটা বাইরের মতো নয়। ঝকঝক তকতক করছে। মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগে ঝাঁট দেয়া হয়েছে। সবচে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে উঠোনে গম্ভীর মুখে একটা বক হাঁটাহাঁটি করছে। বক খালে বিলে ধানের ক্ষেতে থাকে। মানুষ দেখলে উড়ে যায়। এ দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশ দিয়ে হাঁস চলে গেল। মুরগি তার বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে চলে গেল সে ঘাড় ঘুরিয়ে শুধু দেখল। আমি মুগ্ধ হয়ে বকের কাণ্ডকারখানা দেখছি তখনই হাফিজ আলির স্ত্রী জাহেদার গলা শুনলাম—'ভইনডি, পালা বক পাখি।'

আমি পোষা বক পাখি দেখে যেমন বিস্মিত হলাম, জাহেদাকে দেখেও তেমনি বিস্মিত হলাম। নিতান্তই কিশোরী একটা মেয়ে। গায়ের রঙ কালো। কালো রঙ যে কত মিষ্টি হতে পারে মেয়েটাকে না দেখলে আমার জানা হত না। কী মায়াকাড়া মুখ। মনে হচ্ছে শাড়ি পরাও ঠিকমতো শেখেনি। শাড়ি গা থেকে নেমে নেমে যাচ্ছে। পান খেয়ে সে ঠোঁট লাল করেছে। পায়ে আলতা।

আমি বললাম, বক পোষ মানে?

'জে ভইনডি, মানে। খুব ছোটবেলায় বকের বাসা থাইক্যা ধইরা আনতে হয়। চউখ ফুটনের আগেই ধইরা আনতে হয়। চউখ ফুইট্যা হে দেখে মানুষ। তহন হে মানুষরেই জানে তার বাপ-মা।'

'এই বক কে ধরে এনেছে, আপনি?'

'জে না। মায়ের বুক খালি কইরা বকের বাচ্চা আনা মেয়েছেলের কাম না ভইনডি।'

'বক যে পোষ মানে মানুষের সঙ্গে থাকে এই প্রথম দেখলাম।'

'ভইনডি, মানুষ পারে না এমন কাম নাই। মানুষ সব পারে।'

'এই বকটার কি কোনো নাম আছে?'

'এর নাম ধলা মিয়া। ধলামিয়া কইয়া ডাক দেন অফনের বগলে আসব।'

আমি ধলামিয়া বলে ডাক দিলাম। আশ্চর্য কাণ্ড—বকটা গম্ভীর মুখে হেঁটে হেঁটে আমার কাছে আসছে। আমি চমকে দু'পা পেছনে গেলাম। জাহেদা কিশোরীর মতোই খিলখিল করে হেসে উঠল। এই মেয়ে ভবিষ্যৎ বলবে কী—নিতান্তই সহজ সরল গ্রাম্য বধূ।

'ভইনডি পান খাইবেন?'

'হ্যাঁ খাব। আর আপনার সঙ্গে অনেক গল্প করব।'

'আমি কোনো গল্প জানি নাগো ভইনডি।'

'আপনি না জানলেও আমি জানি। আমি গল্প বলব আপনি শুনবেন।'

'মেয়েটা আমার এই কথাতেও খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাসির মধ্যে সামান্য অস্বাভাবিকতা আছে। গ্রামের মেয়ে এত শব্দ করে হাসে না। আমি তার হাসির মাঝখানেই বললাম, আপনি নাকি ভবিষ্যৎ বলতে পারেন?

'গেরামের মানুষ এইগুলোন বানাইছে। আমি কিচ্ছু বলতে পারি না।'

'আপনি না-কি বলেছেন—এখানে শুটিং হবে না। একটা মানুষ মারা যাবে।'

'জে বলেছি।'

'কেন বলেছেন?'

জাহেদা আবারো শব্দ করে হাসছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে মেয়েটা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ। অপ্রকৃতিস্থ একজন মানুষ বানিয়ে অনেক কিছু বলতে পারে। মেয়েটার হাসির শব্দে বক উড়ে গেল—দু'টা চক্কর দিয়ে বসল জাহেদার মাথায়। জাহেদা খুব স্বাভাবিক। এই ব্যাপারটায় সে যেন অভ্যস্ত। আমি অবাক হয়ে দেখছি, একটা মেয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে তার মাথায় গম্ভীর মুখে একটা বক বসে আছে।

ঢাকায় ফিরে গিয়ে যদি এই গল্প বলি—কেউ বিশ্বাস করবে না। এটা কোনো কথা হল—একটা তরুণী মেয়ে ঘরের কাজকর্ম করছে তার মাথায় গম্ভীর মুখে একটা বক বসে আছে! বকটার নাম ধলামিয়া।

জাহেদা আমাকে পাটি এনে দিল। পান সুপারি এনে দিল। আমি পা ছড়িয়ে এমনভাবে বসলাম যেন কত দিনের পরিচিত এই বাড়ি। জাহেদা আমার পাশে বসল না। সে ঘরের কাজকর্ম করে যাচ্ছে এবং আমার কাছে তা খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। অতিথি এসে অতিথির মতো আরাম করে বসে থাকবে। গৃহকর্ত্রী তার কাজ করতে থাকবে। ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কথা বলবে।

'ভইনডি, আমার পুরুষ মানুষটারে দেখছেন?'

'হাফিজ আলির কথা বলছেন? যে বাইরে বসে আছে?'

'হ। গাঞ্জা খাইয়া শরীরটা কী বানাইছে। বেশি দিন বাঁচব না। তার মৃত্যু ঘনাইছে।'

'গাজা খায়?'

'নিশার জিনিস সব খায়। চরস খায়, ভাঙ্গের শরবত খায়। যখন খাওনের কিছু পায় না তহন কেরোসিন খায়। তয় গাঞ্জাটা খায় বেশি।'

জাহেদা আবারো হাসছে। আমি বললাম, স্বামী নেশা করে বেড়াচ্ছে এটাতো কোনো মজার কথা না। আপনি এ রকম করে হাসছেন কেন?

'ভইনডি আমার হাসি রোগ আছে। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার পিতা মারা গেল। সন্ন্যাস রোগে ধড়ফড় কইরা মৃত্যু। হে উঠানে ধড়ফড় করে আর আমি হাসি। হাসি থামে না। কত মাইর যে হাসির কারণে খাইছি। এখন আর কেউ মারে না, কিছু কয়ও না। স্বামী গাঞ্জাখোর—তার সামনে হাসলেও যা কানলেও তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার ধারণা এই গ্রামে শুটিং হবে না?'

'এম্নে এম্নে বলছি। এইটা নিয়া চিন্তা কইরেন না। আল্লাহপাক মানুষরে অধিক চিন্তা করতে নিষেধ করছেন। অবশ্য মানুষ অধিক চিন্তা করেও না—ভাব দেখায় হে অধিক চিন্তা করে। হি হি হি।'

আমি মুগ্ধ হয়ে জাহেদার হাসি দেখছি। তার মাথার উপর বসে থাকা বকটা উড়ে গাছের দিকে চলে গেছে। হাসতে হাসতে জাহেদার চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখের পানি শাড়ির আঁচলে মুছছে। বকটা গাছে গিয়ে বসল না। জাহেদার মাথার উপর চক্কর খেতে লাগল। আচ্ছা, এরা এই বকটার নাম ধলামিয়া রাখল কেন? বকটা কি পুরুষ?

আমাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে মায়ের কী অবস্থা হবে তা আন্দাজ করেছিলাম। আন্দাজের চেয়েও বেশি হয়ে গেল। মা'কে দেখলাম বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর মুখ নীল। বুকে নিশ্চয়ই ব্যথা হচ্ছে—বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। হার্ট অ্যাটাকের প্রাথমিক লক্ষণ সবই দেখা যাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আমি সহজ ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকলাম। মা'র দিকে না তাকিয়ে বাথরুমে ঢুকে—চোখে-মুখে পানি দিলাম। আমি জানি ব্যস্ত হবার কিছু নেই। মা আমাকে দেখতে পেয়েছেন এখন দ্রুত তাঁর শারীরিক সমস্যা কেটে যেতে শুরু করবে। তিনি বিছানায় উঠে বসে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করবেন। কঠিন কঠিন সব কথা হাউইয়ের মতো মার মুখ থেকে বের হয়ে আমার দিকে ছুটে আসবে। যুদ্ধ প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই আমি চোখে মুখে পানি দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে রাখছি।

'কোথায় গিয়েছিলি?'

'কাছেই একটা বাড়িতে।'

'আমিতো পুরো এলাকা চষে ফেলেছি—তোকেতো দেখিনি।'

'ভাল মতো চষনি। চষলে পেতে।'

'তোর সঙ্গে ঐ হারামজাদাটা ছিল—সেলিম?'

'হ্যাঁ, এই হারামজাদাটা অবশ্যি ছিল।'

'তুই কি জানিস ইউনিটে তোকে নিয়ে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে।'

'ছিঃ ছিঃ পড়ার কী আছে? আমি একজনকে নিয়ে বেড়াতে বের হতে পারব না?'

'যার তার সঙ্গে বের হয়ে যাবি? একটা জোয়ান ছেলের সঙ্গে তোর বয়সী একটা মেয়ে যদি বের হয় তাহলে সবাই কী ভেবে নেয় তুই জানিস?'

'কী ভেবে নেয়?'

'যা ভাবার তাই ভাবে?'

'সেই তাইটা কী?'

মা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে বললেন, সবাই ভাবে ছেলেটা তোকে নিয়ে গেছে পাট ক্ষেতে।'

'পাট ক্ষেত দেখতে নিয়ে যাওয়াটা কি মা খুব দোষনীয় কিছু?

'ন্যাকা সাজবি না। আমার সঙ্গে ন্যাকা সেজে পার পাবি না। বদ মেয়ে কোথাকার।'

'এত জোরে চিৎকার করো না মা ভোকাল কর্ড নষ্ট হয়ে যাবে। বাকি জীবন হাঁসের মতো ফ্যাস ফ্যাস করতে হবে।'

'তুই এতক্ষণ ধরে মুখ ধুচ্ছিস কেন?'

আমি হাসলাম। বেসিনের উপরে পারা নষ্ট হয়ে যাওয়া আয়না বসানো। সেই আয়নায় সব কিছুই ঢেউ খেলানো দেখায়। আমি আয়নায় দেখলাম একটা মেয়ে ঢেউ খেলানো হাসি হাসছে। আয়নাতেই দেখা যাচ্ছে মা নেমে আসছেন। তিনি ধাক্কা দিয়ে আয়নায় আমার মাথা ঠুকে দেবেন। ঝনঝন শব্দে আয়না ভাঙবে। ভাঙা কাচ ঢুকে যাবে কপালে। অভিনয় করতে হবে

কপালে কাটা দাগ নিয়ে। না-কি তিনি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। ফাঁসির আসামিকে ছোট্ট ঘরে আটকে রাখলে তার কী হয় আমি জানি। আমার যদি কখনো ফাঁসি হয়—তাহলে সলিটারি কনফাইনমেন্টে থাকার সময়টা আমার খুব খারাপ কাটবে না।

মা ঈগলের মতো ছুটে আমার কাঁধ ধরে ফেললেন আর তখনি ঘরে ঢুকলেন পাপিয়া ম্যাডাম। মা'র মুখ সঙ্গে সঙ্গে হাসি হাসি হয়ে গেল। তাকে দেখে এখন মনে হবে তিনি তার অতি আদরের কন্যার সঙ্গে বাথরুমে কিছু অন্তরঙ্গ আলাপ করছেন। মা বললেন, কেমন আছেন?

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ভাল।

মা বললেন, মেয়ের মাথার চুল ঠিক করে দিচ্ছিলাম। এমন পাগলি মেয়ে, সারা সকাল কোথায় কোথায় ঘুরেছে—দেখেন না চুলের অবস্থা। একা একাই রওনা হয়েছিল, আমি বললাম, একা যাবি না। সেলিমকে সঙ্গে করে নিয়ে যা।

আমি মা'র স্ট্র্যাটিজি দেখে হাসলাম। তিনি সবাইকে বলে বেড়াবেন সেলিমকে আমার সঙ্গে পাহারাদার হিসেবে তিনিই পাঠিয়েছেন। আমি নিয়ে যাইনি।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, বকুল একটু বারান্দায় এসো। আমি বারান্দায় চলে এলাম।

মেয়েকে লেখা চিঠি তোমাকে পড়াব বলেছিলাম—নাও পড়ে দেখ।

বড় বড় অক্ষরে লেখা চিঠি।

মা,

ও আমার মা। আমার সোনা মা, ময়না মা, গয়না মা। কত দিন তোমাকে দেখি না। রাতে যখন ঘুমুতে যাই, আমার পাশে তোমার বালিশটা রেখে দিই। বালিশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘুমুতে যাই। আমার মনে হয় বালিশে মাথা রেখে তুমি ঘুমুচ্ছ। মা তোমাকে না দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। আবার আমি তোমাকে কবে দেখব?

তোমার

মা।

চিঠি পড়তে পড়তে কেন জানি আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি তাকিয়ে দেখি পাপিয়া ম্যাডাম আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন।

AMARBOI.COM

৫

রাজকীয় ব্যাপার। প্রায় শ'খানেক মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে আছি। আমার মাথার উপর শুটিং-এর বিশাল রঙ বেরঙের ছাতা। আমি মেকাপ নিচ্ছি। মেকাপম্যান সুবীরদা আমার মুখে প্যানকেক ঘষছেন। মেকাপের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার এই হল শুরু। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—শুটিং এর সবচে খারাপ অংশ কোনটি? আমি বলব, মেকাপ নেয়া। ক্লান্তিকর, বিরক্তিকর এবং মাঝেমধ্যে গ্লানিকরও। একজন পুরুষ মানুষ মুখে হাত ঘষছে—ব্যাপারটা কেমন না?

তবে সুবীরদার কাছে মেকাপ নিতে কোনো গ্লানিবোধ হয় না। তিনি শুরুই করেন 'মা' ডেকে। মেকাপের পুরো সময়টা টুকটুক করে গল্প করেন। যখন মেকাপ শেষ হয়ে যায় তখন মনে হয়—আহা এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল কেন? আরও খানিকক্ষণ থাকলে কী হত! মজার মজার গল্প শোনা যেত।

আমি মেকাপ নিচ্ছি গাছতলায়। ঘরের ভেতর নেয়া যাচ্ছে না—ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি আপাতত নেই। যখন আসে তখন বাল্বগুলি এমন মিটিমিটি করে জ্বলে যে মনে হয় ইলেকট্রিসিটি না থাকাটাই ভাল ছিল।

গাছের নিচে রানী রানী ভাব ধরে মেকাপ নিতে আমার ভালই লাগছে। সুবীরদা মাথার উপর ছাতা দিয়ে ভাল করেছেন। পাখিরা এখন আর মাথায় বাথরুম করতে পারবে না। পরশু বিকেলে পাপিয়া ম্যাডাম গাছের নিচে বসে কফি খাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার মাথায় পাখি বাথরুম করে দিল। আমি খুব ভদ্র ভাষা ব্যবহার করলাম। আসলে আমার বলা উচিত—পাখি 'গু' করে দিল। তিনি পাখিদের কাণ্ডে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কফি খাওয়া তাঁর মাথায় উঠল। সাবান শ্যাম্পু নিয়ে ছোটাছুটি পড়ে গেল। মাথা ধোয়া হল কয়েকবার। মাথায় আয়না ধরা হলো। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন—এখনো পরিষ্কার হয়নি।

ম্যাডামের শুচিবায়ুর মতো আছে। যতবার ধোয়া হচ্ছে ততবারই বলছেন—পরিষ্কার হয়নিতো—এখনো দুর্গন্ধ আসছে। আমার বমি এসে যাচ্ছে।

পাপিয়া ম্যাডামের কাণ্ডকারখানা দেখে সবাই ভাবল এটা আর কিছুই না—নায়িকার নখরা। বড় নায়িকা হলেই নখরামি করতে হয়। তিনি খানিকটা করছেন—এর বেশি কিছু না। কিন্তু আমি জানি উনার এটা নখরামি না। কিছু কিছু মানুষ এরকম থাকে।

আমি নিজেওতো এরকম। শুঁয়োপোকা দেখলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। আমার সবচে ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন হচ্ছে গায়ের উপর দিয়ে শুঁয়োপোকা হেঁটে যাচ্ছে। গোঁফওয়ালা পুরুষ মানুষ এই কারণেই আমার অপছন্দ। গোঁফটাকে আমার শুঁয়োপোকার মতো মনে হয়। নাকের নিচে একটা শুঁয়োপাকা নিয়ে একজন পুরুষের মুখ আমার মুখের দিকে এগিয়ে আসছে। ভাবতেই আমার শরীর যেন কেমন করতে থাকে।

সমস্যা হচ্ছে—আমাদের এই ছবির যিনি জামিল হয়েছেন তাঁর পুরুষ্টু গোঁফ আছে। আমাকে এই গোঁফো মানুষটার প্রেমে পড়তে হবে। আমি জানি তিনি কাছাকাছি এলেই আমার চোখমুখ শক্ত হয়ে আসবে। সহজ স্বাভাবিক অভিনয় আমার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। আজ যদি আমার পাপিয়া ম্যাডামের মতো ক্ষমতা থাকতো আমি বলতাম—গোঁফ আছে এমন কারোর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব না। হয় উনাকে গোঁফ ফেলে দিতে হবে কিংবা গোঁফ নেই এমন অভিনেতা আমার জন্যে আনতে হবে। আমার মা'র ধারণা একদিন এরকম ক্ষমতা আমার হবে। অটোগ্রাফের জন্যে পাগল হয়ে লোকজন আমার পেছনে পেছনে ছুটবে। আমাকে নিউ মার্কেটে কিছু কিনতে গেলে বোরকা পরে যেতে হবে। মা আনন্দে ঝলমল করতে করতে বললেন—বুঝলি বকু, আমরা দু'টা সৌদি বোরকা কিনে ফেলব। তোর জন্যে একটা, আমার জন্যে একটা। সারা শরীর ঢাকা, শুধু চোখ বের হয়ে আছে। চোখ দেখেতো আর আমাদের চিনতে পারবে না। বোরকার জন্যে আমরা পার পেয়ে যাব। মজা করে শপিং করব।

আমি বললাম, তোমার বোরকার দরকার কী মা? তোমাকেতো কেউ চিনবে না।

'চিনবে না কেন? তোকে চিনলেই আমাকে চিনবে। তোর ইন্টারভ্যুর পাশাপাশি আমার ইন্টারভ্যুও ছাপা হবে।'

'আমার সুন্দর শান্তির সংসার হোক এটা তুমি চাও না মা?'

'চাব না কেন? অবশ্যই চাই। আমার সংসার হলো না বলে তোরও হবে না, এটা কেমন কথা! তোর বাবুগুলিকে কে মানুষ করবে? আমিই করব। তুই তোর মতো অভিনয় করে যাবি আমি দেখব তোর সংসার...।'

আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, ও আচ্ছা।

সুবীরদা মেকাপের প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন। এখন যে কাজটা তিনি করবেন সেটা আমার খুব পছন্দের। একটা ভেজা টাওয়েল আমার মুখের উপর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলবেন। ফাউন্ডেশন বসার ব্যবস্থা। আমাকে ভেজা টাওয়েলের আড়ালে রেখে সুবীরদা এক কাপ চা খাবেন। সিগারেট খাবেন। দশ মিনিট এইভাবে যাবে তারপর শুরু হবে ফিনিশিং কাজ। সুবীরদার মেকাপের হাত অসাধারণ। তিনি যখন কাজ শেষ করে আমার হাতে আয়না ধরিয়ে দিয়ে বলবেন—মা দেখতো। তখন আয়নার দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠব। কারণ আয়নাতে

যে বসে আছে তাকে আমি চিনি না। সে অন্য কোনো মেয়ে। পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে সে রাঙা রাজকন্যাদের মতো বসে আছে।

'বকুল।'

'জি সুবীরদা।'

'আমি তোমাকে মা ডাকি আর তুমি আমাকে সুবীরদা ডাক এটা কেমন কথা মা?'

'আর ডাকব না। এখন থেকে আপনাকে চাচা ডাকব।'

'মা, তোমার যা ইচ্ছা ডাকবে। আমার তোমাকে মা ডাকতে ইচ্ছে করে আমি মা'ই ডাকব।'

আমি আকাশে দিকে মুখ করে বসে আছি। আমার মুখের উপর ভেজা টাওয়েল। মুখটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। সুবীরদা শব্দ করে চা খাচ্ছেন। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে চা-টা খুব মজা হয়েছে। আমার নিজেরো চা খেতে ইচ্ছে করছে। যদিও আমার এত চায়ের তৃষ্ণা নেই। কাউকে মজা করে কিছু খেতে দেখলে আমারো খেতে ইচ্ছে করে। কাউকে পান খেতে দেখলে আমার পান খেতে ইচ্ছা করে।

চোখ বন্ধ করেই টের পেলাম পাপিয়া ম্যাডাম এসেছে। সুবীরদা চা খাওয়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি মিষ্টি সুবাস পাচ্ছি। পাপিয়া ম্যাডামের গা থেকে এই সুগন্ধ আসছে। তিনি নিশ্চয়ই খুব দামি কোনো পারফিউম ব্যবহার করেন।

'বকুল!'

'জি।'

'তুমি কি ঘটনা শুনেছে?'

আমি শঙ্কিত গলায় বললাম, কোন ঘটনার কথা বলছেন?

'আমাদের ডিরেক্টর সাহেব রাস্তার একটা ছেলেকে এত বড় রোলে দাঁড়া করিয়ে দিচ্ছেন।'

'উনি যা করছেন—নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তে করছেন।'

'না। ও সবকিছু ভেবে চিন্তে করে না। ঝোঁকের মাথায় হুট-হাট ক'রে করে। ও এখন যা করছে রাগের মাথায় করছে। ফরহাদ আসেনি—রাগে ডিরেক্টর সাহেবের ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে। কাজেই হাতের পাশে রাম-শ্যাম-যদু-মধু-কদু যা পেয়েছে—দাঁড়া করিয়ে দিয়েছে। সবাই অভিনয় জানলেতো কাজই হত।'

'উনি নিশ্চয়ই অভিনয় আদায় করে নেবেন।'

'কাঁচকলা আদায় করে নেবে।'

সুবীরদা আমার মুখের উপর থেকে ভেজা তোয়ালে স'রিয়ে দিলেন। পাপিয়া ম্যাডাম সুবীরদার দিকে তাকিয়ে বললেন—সুবীরদা আপনি একটু যানতো আমি বকুলের সঙ্গে দু'টা কথা বলব। সুবীরদা সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনি বসুন।

পাপিয়া ম্যাডাম বিরক্ত গলায় বললেন, আমি বসব না। যা বলার বলে যাচ্ছি। তুমি মন দিয়ে শোন।

আমি ভীত গলায় বললাম, বলুন। পাপিয়া ম্যাডামের ভাব ভঙ্গি দেখে আমার কেন জানি ভয় লাগছে। রাগে উনার শরীর কাঁপছে। উনাকে এত রাগতে আমি কখনো দেখিনি।

'শোন বকুল—রাস্তার একজন মানুষের সঙ্গে আমি অভিনয় করব না। আমার বাছ বিচার আছে। ও ক্যামেরা ওপেন করছে করুক। আমি কিচ্ছু বলছি না। আজ বিকেলে নাকি ঐ গাধাটার সঙ্গে আমার কাজ হবে। সেই কাজ আমি করব না। আমি বিকেলে চলে যাব। আমার গাড়ির চাকা লিক হয়েছে। ড্রাইভারকে চাকা সারিয়ে আনতে বলেছি?'

'ডিরেক্টর সাহেবকে বলেছেন?'

'না, বলি নি। বলার দরকার দেখছি না।'

'আগে থেকে উনাকে বলে রাখলে—উনি হয়ত শুটিং বন্ধ রেখে বিকল্প ব্যবস্থা করবেন। নয়ত শুধু শুধু ফিল্ম নষ্ট হবে।'

'হোক ফিল্ম নষ্ট।'

'আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমিও উনাকে বলতে পারি।'

'তোমাকে বলতে হবে কেন? কথা বলার জন্যে আমার পীর ধরার দরকার নেই।'

পাপিয়া ম্যাডাম হন-হন করে চলে গেলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। তাঁর রাগ কমেনি। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন রাগ কমানোর জন্যে—রাগ না কমিয়েই চলে যাচ্ছিলেন—আবার এসেছেন। আমি কি তাঁর রাগ কমানোর চেষ্টা করব না আরো রাগ বাড়িয়ে দেব? দু'টা কাজই আমি পারি। ভালভাবেই পারি। মা'র সঙ্গে থেকে শিখেছি—কী করে কত দ্রুত কাউকে রাগানো যায়। কিংবা রাগ কমানো যায়। আমি ঠিক করলাম পাপিয়া ম্যাডামের রাগ বাড়িয়ে দেব।

'বকুল!'

'জি।'

'ইডিওটিক কাজ আমার পছন্দ না। একটা কাজ হবে তার পেছনে কোনো প্ল্যানিং থাকবে না, হোয়াট ইজ দিস?'

'আমি কি উনার পক্ষ হয়ে একটা কথা বলব?'

পাপিয়া ম্যাডাম তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমি বুঝতে পারছি তাঁর চোখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠেছে। মনে মনে খানিকটা ভয়ও পাচ্ছি। আমি যার পক্ষ হয়ে কথা বলব তাঁর উপরের রাগের ভাগটা আমাকেই নিতে হবে।

'মঈনের পক্ষ হয়ে তুমি কথা বলবে?'

'জি।'

'কী কথা?'

'নতুনদের যদি ছবিতে না নেয়া হয় তাহলে তারা সুযোগ পাবে কীভাবে? এখন যারা অভিনয় করছেন তাঁরা সবাইতো এক সময় নতুন ছিলেন।'

'নতুনদের নেয়ার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। তাই বলে তুমি একটা প্রোডাকশান বয়কে ছবির নায়ক বানিয়ে দেবে? হাউ কাম! সেলিম বলে যে ছেলেটাকে নেয়া হয়েছে—তুমি কি জান সে একজন প্রোডাকশান বয়।'

'ও।'

'সে সেদিন পর্যন্ত ফুট-ফরমাশ খেটেছে—আমাকে চা এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে হঠাৎ করে প্রেমের ডায়লগ আমি বলব কী করে? আমরা কেউ রোবট না যে ডিরেক্টর সাহেব যা বলবেন তাই করে যাব। অভিনয় পেশা হিসেবে নিয়েছি বলেই অভিনয়ের স্বার্থে আমার বাসার কাজের ছেলেটিকে আমি জড়িয়ে ধরে চুমু খাব না-কি?'

আমি অবাক হয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম—পাপিয়া ম্যাডামকে আমি রাগাতে চাচ্ছিলাম—এখন দেখি উল্টোটা হচ্ছে, তাঁর রাগ পড়ে যাচ্ছে। মা'কে দিয়ে সবাইকে বিচার করলে হবে না, একেকজন মানুষ একেক রকম।

'বকুল!'

'জি।'

'সরি, তোমার অনেক সময় নষ্ট করলাম। তুমি মেকাপ শেষ কর। আমি যাচ্ছি।'

'আপনার মেয়েকে লেখা চিঠি কি পোস্ট করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে।'

'ওর নাম কী?'

'ওর ডাক নাম খুব ইন্টারেস্টিং—এক অক্ষরে নাম—'নি'। আমি ইচ্ছা করে রেখেছি যেন আর কেউ এই নাম রাখতে না পারে। আমি চাচ্ছি যেন পৃথিবীর কেউ আমার মেয়ের নামে তার নাম না রাখে।'

'নি নাম আর কেউ রাখবে বলে মনে হয় না।'

পাপিয়া ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেমন আলাদা, তাদের নামও সে রকম আলাদা, হওয়া উচিত।

'এত নাম পাওয়াওতো মুশকিল।'

'কোনো মুশকিল না, ইচ্ছা থাকলেই হয়। কম্পিউটারে সব নাম ঢুকানো থাকবে। কেউ তার ছেলেমেয়ের নাম রাখার আগে কম্পিউটার সার্চের ব্যবস্থা করবে।'

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, পাপিয়া ম্যাডামের চোখে মুখে রাগ, বিরক্তি কিছুই নেই। শান্ত মা মা একটা ভাব। মেয়ের প্রসঙ্গ আসতেই তাঁর মুখ বদলে গেছে। একজন মায়ের কাছে তাঁর মেয়ে কি এত প্রিয়?

'বকুল, আমি যাচ্ছি। ডিরেক্টর সাহেবের নতুন অভিনেতার শট নেবার সময় আমি উপস্থিত থাকব। দেখব নতুন অভিনেতার কাণ্ড কারখানা।'

ম্যাডাম চলে গেলেন। সুবীরদা আবার মেকাপ শুরু করেছেন। আর কতক্ষণ লাগবে কে জানে। আমি চাচ্ছি—দ্রুত শেষ হোক। সেলিম ভাইয়ের প্রথম শটের সময় আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

সেলিম ভাইয়ের শট নেয়া হচ্ছে। তাঁর জীবনের প্রথম শট। কে জানে হয়তোবা শেষ শটও। তিনি যেমন নার্ভাস, ডিরেক্টর সাহেবও নার্ভাস। আমি পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। গাছটা হল কাঠবাদামের গাছ। আমি একজনকে নাম জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি। এই কাঠবাদাম কিন্তু খাওয়া যায় না।

পাপিয়া ম্যাডাম মাথায় স্কার্ফ বেঁধে নিয়েছেন যেন মাথায় পাখি 'গু' করতে না পারে। ডিরেক্টর সাহেবও গাছের নিচেই আছেন। এতক্ষণ ছিলেন না, এই মাত্র এসেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী খবর? কাকে বললেন, আমাকে না পাপিয়া ম্যাডামকে বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় কাউকেই না। জিজ্ঞেস করার জন্যে জিজ্ঞেসা করা। প্রচণ্ড টেনশনে তাঁর ভুবন ছোট হয়ে গেছে। তিনি হাত ইশারা করে সেলিম ভাইকে ডাকলেন।

সেলিম ভাইকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। কাঠবাদামের বাদাম খাওয়া যায় না কেন? এই বাদাম গাছটার পাতা এত ঘন যে সূর্যের আলোর ছিটেফোঁটাও নিচে আসছে না। পিন পিন শব্দে মশা উড়ছে। খুব ছোট মশা—চোখে দেখা যায় না এমন। ছোট হলেও এরা কামড়াতে ওস্তাদ। কামড় দেবার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ফুলে যায়। আমি একটু শঙ্কিত বোধ করছি। মশার কামড়ের ভয়ে শঙ্কিত না। মশা যদি মুখে কামড়ায়—মুখ ফুলে উঠবে। ক্যামেরায় তা ধরা পড়বে। ডিসকনটিনিউটি হয়ে যাবে। দেখা যাবে একই দৃশ্যে একবার থুতনির কাছটা মশার কামড়ে ফুলে আছে—আরেকবার ফুলে নেই।

সেলিম ভাইকে দেখে মায়া লাগছে। মনে হচ্ছে উনি পুরোপুরি দিশা হারিয়ে ফেলছেন। নৌকায় করে শান্ত হ্রদ পার হচ্ছিলেন। হঠাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে হ্রদে ফেলে দিয়ে নৌকা উধাও হয়ে গেছে। ভদ্রলোক সাঁতার জানেন না, তারপরেও প্রাণপণে চেষ্টা করছেন ভেসে থাকতে। ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন ঠিকই কিন্তু মনে মনে ভাবছেন—ভেসে থাকার দরকার কী ডুবে গেলেই হয়। সেলিম ভাইয়ের গেটাপ খুব ভাল হয়েছে। জিনসের প্যান্ট। প্যান্টের উপর স্ট্রাইপ দেয়া হাফ হাওয়াই শার্ট। শার্টে বেমানান সাইজের দু'টা প্রকাণ্ড পকেট। পকেট ভর্তি জিনিসপত্র। কাঁধে ক্যামেরার ব্যাগ। পায়ে কাপড়ের জুতা। কোমড়ে চামড়ার বেল্টে একটা হালকা নীল রঙের ফেস টাওয়েল গুঁজে দেয়া হয়েছে। তার চুলগুলিকে কিছু একটা করা হয়েছে—ফুলে ফেঁপে আছে। প্রাম করা হয়েছে কি? সুবীরদাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। চুলের এই কায়দাটা দরকার ছিল। সুবীরদা আরেকটা খুব ভাল কাজ করেছেন—সেলিম ভাইয়ের গালে নীলচে আভা নিয়ে এসেছেন। যাদের মুখ ভর্তি ঘন দাড়ি তারা শেভ করলে মুখে নীলচে আভা দেখা যায়। পুরুষের ফরসা মুখ থেকে নীলচে জ্যোতি বের হয়ে আসছে—এই দৃশ্যটা আমার খুব ভাল লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিরেক্টর সাহেব সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন। দৃশ্য বুঝিয়ে দেবেন। বুঝিয়ে দেবার এই কাজটি ভদ্রলোক ভাল করেন। শুধু ভাল না, খুব ভাল। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। ডিরেক্টর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন—কেমন আছ সেলিম?

'জি স্যার ভাল।'

'জি স্যার ভাল—এমন মিনমিন করে বলছ কেন? শক্ত করে বল। এমনভাবে বল যেন ইউনিটের সবাই শুনতে পায়।'

সেলিম ভাই আবারো বললেন—জি স্যার ভাল।

এবার আগের চেয়েও নিচু গলায়।

'হয়নি। আরো ফোর্সফুলি বলতে হবে। তুমি এক কাজ কর—নাও মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে বল—'জি স্যার ভাল।'

তিনি সেলিম ভাইয়ের হাতে ডিরেক্টরের হ্যান্ড মাইক্রোফোন ধরিয়ে দিলেন।

'সেলিম বটগাছটার দিকে তাকাও। বটগাছে কয়েকটা হরিয়াল পাখি বসে আছে দেখতে পাচ্ছ? তুমি হ্যান্ড মাইক্রোফোনটা পাখিদের দিকে তাক করে বলবে—"জি স্যার ভাল।" তোমার কথা শুনে যদি একটা পাখিও আকাশে ওড়ে তাহলে তুমি পাস।'

সেলিম ভাই বটগাছের দিকে হ্যান্ড মাইক্রোফোন তাক করলেন। উপস্থিত সবার মধ্যে চাপা কৌতূহল এবং উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। সবাই আগ্রহ নিয়ে বটগাছের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি উড়বে কি উড়বে না? সেলিম ভাই তার বাক্য শেষ করতেই এক সঙ্গে চারটা পাখি গাছ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল। আমরা সাবাই হাততালি দিতে শুরু করলাম। শুধু পাপিয়া ম্যাডাম হাততালি দিচ্ছেন না। তাঁর হাতে কফির মগ। তিনি কফিতে চুমুক দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বকুল একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছ। আমাদের ডিরেক্টর সাহেব মানুষ হিসেবে অসম্ভব শার্প। তিনি কী সহজ উপায়ে এই ছেলেটার ইনহিবিশন কাটিয়ে দিয়েছেন দেখলে। এখন সে পুরোপুরি ফ্রি। অভিনয় ভাল করবে। আমি কিছু বললাম না। আমি কান পেতে আছি ডিরেক্টর সাহেব দৃশ্যটা কীভাবে বুঝান তা শোনার জন্য।

'সেলিম দৃশ্যটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি কে তা–কি তুমি জান?'

'সেলিম ভাই প্রায় বিড়বিড় করে বললেন, আমি একজন ফটোগ্রাফার। দেশের বাইরেই জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে। এখন কিছুদিনের জন্যে দেশে এসেছি। আবার চলে যাব।

'দ্যাটস রাইট। তুমি দিলু–নিশাতের ফ্যামিলির সঙ্গে সুসং দুর্গাপুরে বেড়াতে এসেছ। এই পরিবারটির সঙ্গে তোমার তেমন কোনো পরিচয় নেই। তারাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছে। কেন বলতো? না লজ্জার কিছু নেই, বল।'

'তারা চাচ্ছে এই পরিবারের বড় মেয়েটিকে আমি যেন পছন্দ করি।'

'ভেরি গুড। বড় মেয়েটি কে?'

'আমাদের পাপিয়া ম্যাডাম।'

'দ্যাটস রাইট। পছন্দ করলে তারা মেয়েটিকে বিয়ে দিতে পারেন। নিশাতের স্বামী রোড অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। তাদের ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে। নিশাত যদি অতীত ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে করে তাহলে তার জীবন আবার নতুন করে শুরু হতে পারে। সেই শুরুটা আমেরিকার মতো বিশাল দেশে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বুঝতে পারছ?'

'জি স্যার।'

'তুমি একজন ফটোগ্রাফার। সামান্য কোনো ফটোগ্রাফার না। তুমি আমেরিকার মতো দেশে নামকরা ফটোগ্রাফার। তোমার তোলা ছবি দিয়ে দু'টা ফটোগ্রাফির বই প্রকাশিত হয়েছে, একজন লেখক এবং একজন ফটোগ্রাফারের মধ্যে পার্থক্য কী জান?'

'জি না।'

'একজন লেখক সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন এবং সেই সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেন। একজন ফটোগ্রাফারও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেন না। ক্যামারায় বন্দি করে ফেলার চেষ্টা করেন। বেশিরভাগ সময়ই তাঁরা তা পারেন না। কারণ সৌন্দর্য কখনো বন্দি করা যায় না। ফটোগ্রাফাররা এই তথ্য জানেন না বলে ক্রমাগত ছবি তুলে তুলে এক সময় হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। একজন লেখক বা একজন কবি কখনো হতাশাগ্রস্ত হন না, কারণ তাঁরা কখনো সৌন্দর্য বন্দি করতে চান না। তাঁদের আগ্রহ ব্যাখ্যায়। আমার বক্তৃতা কেমন লাগছে সেলিম?'

সেলিম ভাই কিছু বলার আগেই পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, তোমার বক্তৃতা খুব ভাল হচ্ছে। I am impressed.

ডিরেক্টর সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, শোন পাপিয়া, ইচ্ছা করলেই আমি যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নন্দন তত্ত্বের শিক্ষক হতে পারতাম। পৃথিবীর সেরা পাঁচজন ডিরেক্টরের একজন হতে পারতাম, ঔপন্যাসিক হতে পারতাম, কবি হতে পারতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হয়েছি— হাতির লাদ। হাতির বিশাল বড় বিষ্ঠা। সাইজে যত বড়ই হোক —'শিট ইজ শিট।' আচ্ছা ঠিক আছে—সেলিম এসো, মূল দৃশ্যটি তোমাকে বুঝিয়ে দি। কাছে আস।

সেলিম ভাই কাছে গেলেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁর বাঁ হাতটা তুলে দিলেন সেলিম ভাইয়ের কাঁধে। হাত কাঁধে তুলে দিয়ে তিনি আসলে নিঃশব্দে বলার চেষ্টা করছেন—ভয় পেও না, আমি আছি তোমার সঙ্গে। আমি তোমাকে যেভাবে খেলাব—তুমি সেইভাবে খেলবে। আর কিচ্ছু লাগবে না। সেলিম ভাই কি না-বলা কথাগুলি বুঝতে পারছেন?

'সেলিম!'

'জি স্যার।'

'তুমি ক্যামেরা হাতে ঘুরতে বের হয়েছ। হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল বটগাছটা। বিশাল গাছ ঝুড়ি নামিয়ে দিয়েছে। দেখে তোমার ভাল লাগল। একবার ভাবলে দৃশ্যটার ছবি তুলবে, তারপর ঠিক করলে—না। ছবি তোলার দরকার নেই। আবার মত পরিবর্তন করলে—ছবি তোলার জন্যে এগুলে। কোন অ্যাংগেলে ছবিটা তুলবে, একটু ভাবলে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যের পজিশন চট করে দেখে নিলে। তারপর ছবিটা তুললে। ছবি তোলার আগমুহূর্ত পর্যন্ত দৃশ্যটির প্রতি তোমার ছিল সীমাহীন মমতা। যেই ছবিটা তোলা হয়ে গেল, ওমনি তোমার সমস্ত আগ্রহের অবসান হল। তুমি চলে যাচ্ছ। যে অপূর্ব দৃশ্যটির ছবি তুমি তুললে তার প্রতি এখন তোমার আর কোনো মমতা নেই। বুঝতে পারছ?'

'জি।'

'তোমার আরো সহজে ব্যাখ্যা করি—মনে কর যে দৃশ্যটি তুমি দেখছিলে সেটা আসলে কোনো দৃশ্য না। রক্ত মাংসের একজন মানুষ। ধরা যাক অপূর্ব রূপবতী কোনো তরুণী। মেয়েটি তোমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। তোমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সে আছে আপন মনে। তুমি প্রচণ্ড অস্থিরতায় ভুগছ। তুমি ভেবে পাচ্ছ না, কেন সে তোমার দিকে তাকাচ্ছে না। দুঃখে কষ্টে তোমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। এমন সময় ম্যাজিক্যাল একটা ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি গভীর আবেগ এবং গভীর ভালবাসায় তোমার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তোমার সব আগ্রহ শেষ হয়ে গেল। তুমি হেঁটে চলে এলে। মেয়েটির দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকানোর ইচ্ছা পর্যন্ত হল না।'

সেলিম ভাই কিছু বলছেন না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আমি তাকালাম পাপিয়া ম্যাডামের দিকে। তিনি চাপা গলায় বললেন, রুমালী, তুমি আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের সব কথা বিশ্বাস করবে না। ভালবাসার দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাবার ক্ষমতা কোনো পুরুষকে দেয়া হয়নি। সে তখন যেতে পারে যখন তাকে যেতে দেওয়া হয়। মেয়েরা তাদের চলে যেতে দেয় বলেই তারা যেতে পারে। অথচ পুরুষরা ভাবে নিজের ইচ্ছায় চলে এসেছি। এতে তারা এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আমরা তাদের সেই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে দেই।

ডিরেক্টর সাহেব সেলিম ভাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। তাঁর একটা হাত এখনো সেলিম ভাইয়ের কাঁধে। তিনি কী বলছেন—আমি শুনতে পাচ্ছি, আমার কান খুব তীক্ষ্ণ।

'সেলিম শোন—তুমি কোথায় দাঁড়াবে, কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যাবে সব মার্ক করা আছে। কখন তুমি সূর্যের দিকে তাকিয়ে সূর্যের পজিশন দেখবে—সব বলে দেয়া হবে। একটা ফুল রিহার্সেল হবে। তারপর হবে ক্যামেরা রিহার্সেল। আমরা ট্রলি এবং জুম লেন্স ব্যবহার করছি। শট কাটব না। নার্ভাস বোধ করছ নাতো? নার্ভাস বোধ করার কিছু নেই।'

সোহরাব চাচা ছুটতে ছুটতে আসছেন। ভদ্রলোক সাধারণভাবে হাঁটতে পারেন না। যেখানে যাবেন দৌড়ে যাবেন। তাঁর দৌড়ে আসার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে ভয়ংকর কিছু ঘটেছে। আমি নিশ্চিত আসলে কিছু ঘটেনি।

'মিস রুমাল!'

'জি চাচা।

আজ তোমার শট হবে না। স্যার তোমাকে মেকআপ তুলে ফেলতে বলেছেন।'

'জি আচ্ছা।'

পাপিয়া ম্যাডাম কঠিন গলায় বললেন, প্ল্যানিংগুলি ঠিকঠাক মতো করলে হয় না? দু'ঘণ্টা নষ্ট করে মেকাপ নেবার পর বলা হল শট হবে না!

সোহরাব চাচা অমায়িক ভঙ্গিতে হাসলেন। ভাবটা এরকম যেন মজার একটা গল্প হচ্ছে। আনন্দময় পরিবেশে—আনন্দময় গল্প। গল্প শুনে তৃপ্তির হাসি হাসছেন।

'ম্যাডাম, তরমুজের শরবত খাবেন?'

'না।'

'একটু খেয়ে দেখুন, আমার ধারণা খুব ভালো হয়েছে। এক চুমুক খেয়ে দেখুন ভাল না লাগলে ফেলে দেবেন। আমি নিয়ে আসছি।'

সোহরাব চাচা আবার ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছেন। পাপিয়া ম্যাডাম এখন বটগাছটার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ভুরু কুঁচকানো। কে জানে তিনি কী ভাবছেন। আজ বিকেলে তাঁর ঢাকা চলে যাবার কথা। সেই পরিকল্পনা কি এখানো আছে? তাঁর গাড়ির লিক কি সারানো হয়েছে?

'বকুল!'

'জি আপা।'

'তোমার মা'কে দেখছি না কেন? তুমি আছ অথচ মা নেই এটাতো ভাবা যায় না।'

'মা'র শরীর ভাল না। শুয়ে আছেন।'

'শরীর ভাল না কেন? কী হয়েছে?'

'কাল রাতে এক ফোঁটা ঘুমাননি—সকালে শরীর খারাপ করেছে। তাঁর হাঁপানির মতো আছে। অনিয়ম করলেই হাঁপানি বাড়ে।'

'তুমি যাও মেকাপ তুলে মা'র কাছে গিয়ে বস। ও শোন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাস করি, মেকাপম্যান সুবীর বোধহয় তোমাকে খুব পছন্দ করে, তাই না?'

'জি, আমাকে মা ডাকেন।'

'সে যে তোমাকে খুব পছন্দ করে এটা তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে। সে তোমাকে যত্ন করে মেকাপ দিয়েছে। তোমাকে সুন্দর লাগছে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'সব মানুষের চেহারায় লুকানো সৌন্দর্য থাকে। মেকাপম্যানের প্রধান দায়িত্ব সেই সৌন্দর্য বের করে আনা। সবাই তা পারে না। সুবীর পারে। তোমাকে সত্যি সত্যি অপূর্ব লাগছে।'

আমার লজ্জা লাগছে। কী বলব বুঝতে পারছি না। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ও আচ্ছা—তোমাকে দেখানোর জন্যে আমি আমার মেয়ের ছবি এনেছি। এই দেখ ছবি। তার ফিফথ বার্থডের ছবি।

আমি আগ্রহ নিয়ে ছবিটা নিলাম। এবং ছবিটার দিকে মন খারাপ করে তাকিয়ে রইলাম। কী বিশ্রী চেহারা মেয়েটির। উঁচু কপাল, পুতিপুতি চোখ, গায়ের রঙ মিশমিশে কালো। সব বাচ্চাদের চোখে মুখে বুদ্ধির ঝলক থাকে—এই মেয়েটার চেহারার ভেতরও হাবা হাবা ভাব। মাথাভর্তি নিগ্রোদের মতো কোঁকড়ানো চুল। মোটা মোটা ঠোঁট।

পাপিয়া ম্যাডাম ক্ষীণ গলায় বললেন, আমার মা দেখতে ভাল হয়নি কিন্তু ওর খুব বুদ্ধি। তোমাকে একদিন তার বুদ্ধির গল্প বলব।

'এখনি বলুন।'

'না, এখন না। অন্য একদিন। এখন আমি তোমাকে একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশনের কথা বলি। মঈন যখন দৃশ্য বুঝাচ্ছিল তুমি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলে। একবারও তুমি সেলিমের দিকে তাকাওনি। তুমি মঈনের দিকে তাকিয়ে ছিলে। আমি দেখলাম তোমার ঠোঁট এবং হাতের আঙুল কাঁপছে। ব্যাপার কী?'

আমি চুপ করে আছি। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ঠিক করে বলতো তুমি কি এই মানুষটির প্রেমে পড়েছ?

আমি হকচকিয়ে বললাম, জি না। জি না।

'মাটির দিকে তাকিয়ে জি না জি না করছ কেন, আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে অসুবিধা কোথায়? তাকাও আমার দিকে।'

আমি তাকালাম, এবং দীর্ঘ কিছু সময় দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উনিও কিছু বললেন না, আমিও না।

সোহরাব চাচা জগ এবং গ্লাস নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছেন। এই সব কাজ প্রোডাকশন বয়দের করার কথা। সোহরাব চাচার তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। জগে গাঢ় লাল রঙের শরবত দেখতে এত সুন্দর লাগছে।

সোহরাব চাচা একটা মাত্র গ্লাস এনেছেন। তরমুজের শরবত আমার জন্যে আসেনি—শুধু ম্যাডামের জন্যে। মা থাকলে তাঁর ভুরু কুঁচকে যেত। উনি ম্যাডামের সামনে কিছু বলতেন না, কিন্তু সোহরাব চাচাকে ঠিকই ধরতেন—আমার মেয়ে বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে আকাশ থেকে পড়েনি। সে ফেলনা না। সে এই ছবির দু'নম্বর নায়িকা। তার জন্যেও তরমুজের শরবত লাগবে।

পাপিয়া ম্যাডাম শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন— 'বাহ্, ভাল হয়েছেতো। লেবু লেবু গন্ধ আসছে কেন?'

'সামান্য লেবু দেয়া হয়েছে।'

'ভাল। বেশ ভাল। আমি আরেক গ্লাস খাব।'

'জি ম্যাডাম—এই জগটা আপনার জন্যে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

সোহরাব চাচা নিচু গলায় বললেন, একটা প্রবলেম হয়েছে?

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, কী প্রবলেম? ফরহাদ সাহেব এসে পৌছেছেন?

সোহরাব চাচা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। আমি পাপিয়া ম্যাডামের অনুমান শক্তি দেখে মুগ্ধ হলাম। সোহরাব চাচা যেই বললেন, একটা প্রবলেম হয়েছে উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রবলেম ধরে ফেললেন। আমি কখনো পারতাম না।

'শুটিং কি হচ্ছে, না বন্ধ?'

'ক্যামেরা এখনো ওপেন হয়নি।'

'ডিরেক্টর সাহেব কী জানেন যে ফরহাদ সাহেব এসেছেন?'

'জি জানেন। আমি আসামাত্র খবর দিয়েছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ডিরেক্টর সাহেব এখন কী করবেন? সেলিমকে নিয়ে কাজ করবে, না ফরহাদ সাহেবকে নিয়ে?'

'আমি জানি না ম্যাডাম—আমি হলাম আদার ব্যাপারি। এসব বড় বড় ব্যাপার।'

পাপিয়া ম্যাডামের গ্লাস শেষ হয়ে গেছে। তিনি খালি গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখি আরেকটু দিন।

সোহরাব চাচা গ্লাস ভর্তি করে দিলেন।

ম্যাডাম শান্ত গলায় বললেন, আমি আর খাব না। জগের শরবত অন্য কাউকে দিয়ে দিন।

'জি আচ্ছা।'

ম্যাডাম গ্লাস হাতে এগিয়ে যাচ্ছেন। একটু আগে যে মগ দিয়ে কফি খাচ্ছিলেন সেই মগটা গাছের নিচে পড়ে আছে। সেই দিকে ফিরেও তাকালেন না। মগটা খুব সুন্দর। নিশ্চই বিদেশ থেকে আনানো। ধবধবে শাদা মগে টকটকে লাল অক্ষরে লেখা—KISS ME

আমি মগটা তুলে সোহরাব চাচার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, চাচা একটু শরবত দিয়ে মগটা ধুয়ে আমাকে দিনতো। আমার খুব লোভ লাগছে।

'তোমার খাওয়ার দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন?'

'এটা প্লেইন শরবত না। এখানে ভদকা মেশানো আছে।'

'ভদকা মেশানো শরবতই খেয়ে দেখি কেমন লাগে। বেশি না—সামান্য।'

সোহরাব চাচা বললেন, না।

তাঁকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে। ফরহাদ সাহেব হঠাৎ এসে পড়ায় তিনি মনে হয় দারুণ চিন্তায় পড়ে গেছেন। এতটা চিন্তিত হবার মতো কিছু ঘটেছে কি?

'মিস রুমাল!'

'জি চাচা?'

'শুধু শুধু গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘরে চলে যাও। মেকাপ উঠিয়ে বিশ্রাম কর। তোমার মা তোমর খোঁজ করছিলেন। তাঁর জ্বরতো ভাল বেড়েছে। একশ তিন। মাথায় পানি দিয়ে জ্বর কমাতে বলেছি। সিটামল খাওয়ানো হয়েছে। একজন ডাক্তার খবর দিয়েছি—সন্ধ্যাবেলা আসবেন।'

'ভাল। আপনি কাজকর্ম ফেলে আমার সঙ্গে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? কিছু বলবেন?'

'হু।'

'উপদেশ?'

'উপদেশ না—আদেশ। তুমি ফরহাদ সাহেবের কাছ থেকে সব সময় একশ হাত দূরে থাকবে।'

'কেন, উনি কি ঘাতক ট্রাক?'

'কেন টেনো না, তোমাকে দূরে থাকতে বলছি—তুমি দূরে থাকবে।'

'আচ্ছা—জামিল আহমেদের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করছেন, মিজানুর রহমান। উনার কাছ থেকে কত দূরে থাকব?'

'উনার কাছ থেকে দূরে থাকার দরকার নেই। উনি দিন রাত মদ খান। এইটাই তার একমাত্র দোষ। মদ খাওয়ার দোষটা না থাকলে তাকে ফেরেশতা বলা যেত। আল্লাহপাকতো মানুষকে ফেরেশতা বানিয়ে পাঠান না—দোষ ত্রুটি দিয়েই পৃথিবীতে পাঠান। মিজান সাহেবকে নেশারু বানিয়ে পাঠিয়েছেন।'

'একজন মদ খাচ্ছে সেই দোষও আল্লাহ্‌র ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আল্লাহ্‌ নেশারু বানিয়ে পাঠিয়েছেন বলে নেশা করছে!'

'আচ্ছা বাবা যাও আল্লাহ্‌ বানিয়ে পাঠায়নি। সে নিজে নিজে হয়েছে।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমাদের ডিরেক্টর সাহেব সম্পর্কে বলুন, উনার কাছ থেকে কত হাত দূরে থাকতে হবে তাতো বললেন না। মজার ব্যাপার কী জানেন চাচা—উনার কাছ থেকে কত দূরে থাকতে হবে তা আপনি জানেন। তাঁর ভেতরে মন্দ কী আছে তাও আপনি খুব ভাল জানেন। জানলেও আপনি কোনোদিন মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারবেন না। কারণ আপনার সেই ক্ষমতা নেই।

সোহরাব চাচা বিস্মিত হয়ে বললেন—ব্যাপারটা কী? হড়বড় করে এত কথা বলছ কেন? এত তর্ক কোথায় শিখলে?

'আমি তর্ক শিখেছি আমার মা'র কাছে। মা যে কথাই বলেন আমি তার উল্টোটা বলি। উল্টো যুক্তি দাঁড় করাই। এমনও হয়েছে যে শেষটায় এসে হাল ছেড়ে দিয়ে মা কাঁদতে বসেছেন। তাই বলে আমি কথা থামাইনি। আমি আমার কথা বলেই গিয়েছি।'

আমার হঠাৎ আক্রমণে সোহরাব চাচা হকচকিয়ে গিয়েছেন। কেঁদে ফেলার আগমুহূর্তে মা'কে যেমন দেখায় তাকে এখন তেমনই দেখাচ্ছে। কাজেই আমি থাকলাম না। আমি আমার কথা বলেই যেতে লাগলাম—

'সোহরাব চাচা শুনুন। আপনি আমাকে তরমুজের শরবত খেতে দিলেন না। কারণ এখানে ভদকা মিশানো। আপনি পিতৃসুলভ একটা ভাব ধরলেন। আপনাদের ডিরেক্টর সাহেব যদি এখন একটা গ্লাসে এই শরবত ঢেলে আমার দিকে এগিয়ে বলেন—"বকুল নাও খাও।" আর তখন যদি আপনি সামনে থাকেন আপনি কি বলতে পারবেন, মিস রুপাল শরবত খেও না। এর মধ্যে ভদকা মেশানো আছে।'

'স্যার এই জাতীয় কথা কখনো বলবেন না।'

'কখনো বলবেন না?'

'না, কখনো বলবেন না। তুমি তাঁকে কতদিন ধরে দেখছ? এই অল্প কিছু দিন। আমি বৎসরের পর বৎসর তাঁর সঙ্গে কাজ করছি। আমি তাঁকে চিনি।'

'আপনার ধারণা তিনি একজন মহাপুরুষ?'

'আমার কাছে অবশ্যই মহাপুরুষ।'

'সোহরাব চাচা শুনুন। মহাপুরুষ টুরুষ কিছু না, উনি একজন প্রতিভাবান মানুষ, তবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। মাঝে মাঝে খুব নিম্নশ্রেণীর মানুষও অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। উনার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।'

'এইসব কী বলছ?'

'সত্যি কথা বলছি।'

'আমার কাছে বলছ ভাল কথা, আর কারো কাছে এই জাতীয় কথা ভুলেও বলবে না।'

'বললে কী হবে? ডিরেক্টর সাহেব আমাকে শাস্তি দেবেন? নীল-ডাউন করে রাখবেন? কানে ধরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে?'

'তোমার হয়েছেটা কী বলতো?'

'আমার খুব খারাপ লাগছে?'

'কেন খারাপ লাগছে?'

আমি নিঃশ্বাস ফেলে সহজ ভঙ্গিতে প্রায় হাসি হাসি মুখে বললাম, ফরহাদ সাহেব এসে পড়েছেন এই জন্যেই আমার খারাপ লাগছে।

'তোমার খারাপ লাগার কী আছে?'

'যেহেতু বিখ্যাত অভিনেতা মেগাস্টার, গ্যালাক্সিস্টার মিস্টার ফরহাদ চলে এসেছেন—সেহেতু সেলিম নামের মানুষটি এখন বাদ পড়ে যাবে। আপনার মহাপুরুষ ডিরেক্টর সাহেবের এত ক্ষমতা নেই যে ফরহাদ সাহেবকে বাদ দিয়ে পথের মানুষটাকে দিয়ে অভিনয় করাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও ইচ্ছা করলেই তিনি তা পারেন। সেলিম নামের এই পথের ছেলেটিকে মেগাস্টার, গ্যালাক্সিস্টার বানানো তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই না।'

সোহ্‌রাব চাচা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—ও আচ্ছা, এই ব্যাপার। যেন তাঁর বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। আমি বললাম, সোহ্‌রাব চাচা শুনুন, সেলিম নামের মানুষটাকে উনি বাদ দিয়ে দেবেন। বেচারা এম্নিতেই ছোট হয়ে থাকে—এখন আরো ছোট হয়ে আমাদের সঙ্গেই থাকবে—আমাদের সঙ্গেই ঘুরবে। ভাবতেই খারাপ লাগছে।

'খারাপ লাগার কিছু নেই মা। সবই ভাগ্য। ভাগ্য ব্যাপারটা যে কী তা ছবির লাইনের লোক ছাড়া কেউ বুঝবে না। দু'শ টাকা শিফটের এক্সট্রা মেয়েকে আমি নিজে কোটিপতি হতে দেখেছি। আবার দেখেছি কোটিপতি থেকে দু'শ টাকা দামের এক্সট্রা হয়েছে। সবই ভাগ্য। সেলিমের ভাগ্যে যে জিনিস নাই সে জিনিস তার হবে না।'

'সবই ভাগ্য?'

'অবশ্যই ভাগ্য। তোমার নিজের কথাই ধর। দিলু চরিত্র তোমার করার কথা ছিল না। অন্য একজনকে সাইনিং মানি দেয়া হয়েছিল। হঠাৎ স্যার একদিন কোনো এক ম্যাগাজিনে তোমার ছবি দেখলেন। আমাকে বললেন, তোমাকে খবর দেওয়ার জন্যে। আমি তোমাকে খবর দিলাম। স্যারের পছন্দ হল না। তোমরা চলে গেলে। যেদিন দুর্গাপুর রওনা হব তার একদিন আগে—বললেন, বকুল মেয়েটাকে খবর দাও। এটা ভাগ্য না?'

আমি চুপ করে রইলাম। সোহ্‌রাব চাচা গম্ভীর গলায় বললের, আমরা নিজের মনে খেলে যাচ্ছি। খুব আনন্দ, ভাল খেলা হচ্ছে। সুতা কিন্তু অন্যের হাতে।

আমি ঘরের দিকে রওনা হলাম। সোহ্‌রাব চাচা আমার পেছনে পেছনে আসছেন। হঠাৎ আমার মনে হল—সোহ্‌রাব নামের এই মানুষটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তার ছেলেমেয়ে কয়জন। কার কী নাম—কিছুই জানা নেই। অথচ কত ঘনিষ্টভাবে মিশছি। ছবি শেষ হয়ে যাবে আর তার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ থাকবে না।

'সোহ্‌রাব চাচা?'

'মা বল।'

'যে গাছটার নিচে আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেই গাছটার নাম কী?'

'ছাতিম গাছ। গাছের নাম দিয়ে কী হবে?'

'এম্নি। জানতে ইচ্ছে করল। একজন অবশ্যি বলেছে—কাঠবাদাম গাছ। আপনারটা ঠিক, না তাঁরটা ঠিক কে জানে।'

সোহ্‌রাব চাচা গাছ প্রসঙ্গে কিছু বললেন না, চিন্তিত গলায় বললেন—রোদের মধ্যে হেঁটে যেও না। আমি লোক দিয়ে দিচ্ছি। মাথায় উপর ছাতি ধরবে।

'কিচ্ছু ধরতে হবে না।'

আমি সোহ্‌রাব চাচাকে পেছনে ফেলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। হাঁটার গতি আরো বাড়ালাম। আমাকে এইভাবেই দৌড়ে পুকুর ঘাটে যেতে হবে। তারপর হঠাৎ পুকুরের পানিতে নিজের ছায়া দেখে চমকে যেতে হবে। শাড়ি পরে দৌড়ানো মুশকিল। দৌড়টা ভাল হচ্ছেতো? নকল দৌড় মনে হচ্ছে নাতো? স্যান্ডেল পায়ে দৌড়ানো যাচ্ছে না। খালি পায়ে দৌড়াতে হবে। খালি পা হব কীভাবে? পা থেকে স্যান্ডেল ফেলে দেয়ার পেছনে কী যুক্তি দাঁড় করাব?

আশ্চর্য, ফরহাদ সাহেব মেকাপে বসেছেন। সুবিরদা গম্ভীর মুখে কাজ করে যাচ্ছেন। ফরহাদ সাহেব টেবিলে পা তুলে প্রায় আধশোয়া হয়ে আছেন। তার চোখ বন্ধ। টেবিলের উপর বিয়ারের ক্যান। ক্যানের উপর মাছি উড়ছে। বিয়াব খেতে কি মিষ্টি? মিষ্টি না হলে মাছি উড়বে কেন? সেলিম ভাইকে তাহলে বাদ দেয়া হয়েছে। সাব্বিরের চরিত্র করছেন—মেগাস্টার ফরহাদ

খাঁন। যার যা ইচ্ছা করুক। আমাদের খেলার কথা আমরা খেলছি। কেউ ভাল খেলছি, কেউ মন্দ খেলছি। সুতাতো আমাদের হাতে নেই।

মা শরীর এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর চোখ বন্ধ, মাথার চুল ভেজা। মাথায় পানি ঢালা মনে হয় কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। আমি পাশে দাঁড়াতেই চোখ মেললেন। মা'র প্রথম বাক্যটা হল—ঠোঁটের লিপিস্টিক ভাল হয়নিতো।

আমি বললাম, তোমার শরীর এখন কেমন?

মা বললেন, শরীর কেমন সেটা পরের কথা। মেকাপ কেমন হল তুই আমাকে দেখিয়ে যাবি না? মেকাপ শেষ হল আর তুই চলে গেলি?

'আমি এসেছিলাম, তুমি ঘুমুচ্ছিলে বলে জাগাইনি।'

'আবার মিথ্যা কথা। মিথ্যা কথা বলতে তোর মুখে একটু আটকাল না—ফাজিল মেয়ে—'

মা উঠে বসলেন এবং আমি বোঝার আগেই প্রচণ্ড চড় বসালেন। চড়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না বলে বিছানায় কাত হয়ে পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলাম। কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বসলাম, সকালে কিছু খেয়েছ মা?

'না। তুই কি আয়না দিয়ে দেখেছিস তোকে কেমন বিশ্রী মেকাপ দিয়েছে? নাকটা মোটা লাগছে।'

'মোটা নাকতো মা মেকাপ দিয়ে চিকন করা যাবে না। ব্লেড দিয়ে কেটে ঠিক করতে হবে।'

'আমার কাছে জ্ঞান ফলাবি না। নাকে শেড দিয়ে মোটা নাকও চিকন করা যায়। তুই এক নম্বর নায়িকা হলে ঠিকই করত। দুই নম্বর নায়িকাতো, নাক মোটা থাকলেই বা কী, চিকন থাকলেই বা কী? কী ব্যাপার, তুই যাচ্ছিস কোথায়?'

'মেকাপ তুলতে যাই।'

'শট হবে না?'

'না।'

'আমি জানতাম আজ তোর শট হবে না।'

'কীভাবে জানতে?'

'আজ মঙ্গলবার না? মঙ্গলবার তোর জন্যে অশুভ। আমি সব সময় দেখেছি মঙ্গলবার হলেই তোর কোনো একটা সমস্যা হয়।'

'তোমার জন্যে কোনবারটা অশুভ মা?'

'তোর জন্যে যে বার অশুভ, আমার জন্যেও সে বার অশুভ। তুই আর আমি—আমরাতো আলাদা না।'

আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। মেকাপ দেয়া যেমন কষ্টের মেকাপ তোলাও তেমন কষ্টের। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। গ্লিসারিন দিয়ে ঘষে ঘষে তুলতে হয়। জোরে ঘষা লাগলে চামড়া উঠে যায়—যন্ত্রণা হয়। সবচে কষ্ট চোখের মেকাপ তোলা। চোখ জ্বালা করে।

মেকাপ তোলার পর আয়নায় নিজেকে দেখলাম। বাহ্, সুন্দর লাগছেতো। মিষ্টি একটা মুখ সহজ সুন্দর এবং সরল। এই মুখের দিকে তাকিয়ে কারোর কি কোনো দিন বলতে ইচ্ছে করবে—

'আমি এনে দেব
তোমার উঠোনে সাতটি অমরাবতী।'

ডান গাল লাল হয়ে আছে। মা'র চড় গালে বসে গেছে। আগে ব্যথা করেনি এখন চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। ব্যথাটা কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথায় উঠে যাবে।

আমি খুব শিগগিরই একদিন কঠিন গলায় মা'কে বলব—মা তুমি আর কখনো আমার গালে হাত দেবে না। কখনো না। সেই শিগগিরটা কবে?

'বকু! বকু!'

AMARBOI.COM

আমি বাথরুম থেকেই মিষ্টি গলায় বললাম, কী হয়েছে মা?

'তুই নিজে নিজে মেকাপ তুলছিস কেন? সুবীরকে বল। তুই দুই নম্বর নায়িকা হয়েছিস বলেই সব কাজ নিজে নিজে করবি?'

'সুবীরদা ব্যস্ত। ফরহাদ সাহেবকে মেকাপ দিচ্ছেন।'

'ও আচ্ছা, ভুলেই গেছি ফরহাদ সাহেবতো চলে এসেছেন। সেলিম গাধাটা গালে জুতার বাড়ি খেয়েছে। উচিত শিক্ষা হয়েছে। পিপীলিকার পাখা উঠলে যা হয়।'

'মা, এইসব তুমি কী বলছ?'

'ঠিকই বলছি। যে চামড়া দিয়ে জুতার শুকতলা বানানো হয়—সেই চামড়া দিয়ে কখনো মানিব্যাগ হয় না।'

আমি বাথরুম থেকে বের হলাম। মা'র দিকে তাকিয়ে হাসলাম। মিষ্টি করে হাসলাম। ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় 'দেখি হাসতো' বললে যে ভঙ্গিতে দাঁত বের না করে মুখ টিপে হাসা, সেই ভঙ্গির হাসি। তারপর মা'কে কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

জালালের মা আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসছে। তার এগিয়ে আসার মধ্যে কেমন ভিজে বিড়াল ভাব। গোপন কোনো ঘটনা সে বোধ হয় জেনে ফেলেছে। গোপন ঘটনায় নতুন কিছু ডালপালা লাগিয়ে সে এখন বলবে।

'বকুল আপা!'

'হুঁ।'

'শরবত খাবেন?'

'কিসের শরবত?'

'তরমুজের শরবত।'

'হ্যাঁ খাব।'

'এর মধ্যে একটু ইয়ে দেওয়া আছে। শরবত মিজান ভাই বানিয়েছেন। উনি আবার ইয়ে ছাড়া কিছু বানাতে পারেন না।'

'ইয়েটা কী?'

'ভদকা। খুবই সামান্য দিয়েছেন যাতে মেয়েরাও খেতে পারে। নেশা হবে না। খাবেন আপা?'

'হুঁ খাব।'

'ভদকার মজাটা কী জানেন আপা?'

'না, জানি না—কী মজা?'

'খেলে মুখে গন্ধ হয় না।'

'তাহলেতো খুবই ভাল। চলুন যাই ভদকা খাই।'

'ছিঃ ছিঃ ভদকা না। শরবত। পাঞ্চ। সামান্য ইয়ে দেওয়া'

'চলুন আজ মজা করে সামান্য ইয়ে মেশানো শরবত খাব। মা জানবে নাতো?'

'পাগল হয়েছেন আপা? কাকপক্ষী জানব না। আপনি পুকুর ঘাটে যান—আমি আসতেছি।'

আমি পুকুরঘাটের দিকে রওনা হলাম। পুকুরটা বিশাল। তবে পুকুরের পানির দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়। ময়লা পানি। নানান জায়গায় বাঁশ পোঁতা হয়েছে। মাছের চাষ করলে নাকি সারা পুকুরে বাঁশ পুঁততে হয়। একটা ঘাট আছে—সেই ঘাটও ভাঙা। তবে পুকুরের চারদিকে গাছপালা। পুকুরের মালিক আসলাম খাঁ। পীর মানুষ। তাঁর কথা পরে বলব। তিনি খুব আনন্দিত গলায় অদ্ভুত ধরনের শুদ্ধ ভাষায় বলেছিলেন—আপা দেখেন এমন কোনো গাছ নাই যাহা আমি 'রুপন' করি নাই। যেখানে যত বৃক্ষ পেয়েছি 'রুপন' করিয়াছি।

আমি বললাম, কী কী গাছ রুপন করেছেন একটু বলুনতো। ভদ্রলোক গড়গড় করে পড়া মুখস্ত করার মতো বললেন—কাঁঠাল, আম, জলফই, জামরুল, জাম্বুরা, কৎবেল, আতা, লেচু।

বসতবাড়িতে লেচু গাছ রুপন করা ঠিক না। নির্বংশ হয়, তারপরেও শখ করে লাগিয়েছি। লেচু যখন পাকে তখন খুবই বাদুড়ের উৎপাত হয়।'

'লিচু কখন পাকে?'

'জ্যৈষ্ঠমাসের আগে। এখন ফুল ফুটেছে এই দেখেন ফুল।'

আমি মুগ্ধ চোখে লিচু গাছের ফুল দেখলাম। সবুজ ফুল। গাছ ছেয়ে আছে সবুজ রঙের ফুলে। আমের মুকুলও সবুজ হয় কিন্তু সবুজের মধ্যেও হলুদ ভাব থাকে। লিচু ফুলে সেই হলুদ ভাব নেই।

আমি লিচু গাছের নিচে বসলাম। বসার জায়গাটা সুন্দর। ঘাস আছে। গাছে হেলান দিয়ে পা ছাড়িয়ে বসা যায়। পুকুরের পানি আরো পরিষ্কার হলে বসে থাকতে খুব ভাল লাগত। জালালের মা টিনের একটা জগ এবং দু'টা চায়ের কাপ নিয়ে উপস্থিত হল। তার চোখ চকচক করছে। কথা বলার ধরনও পাল্টে গেছে। ফিসফিস করে কথা বলছে। আমি এক চুমুকে কাপ শেষ করলাম। তিতকুটে একটা ভাব আছে কিন্তু খেতে ভাল।

'আফা কেমন লাগতাছে?'

'খুব ভাল। নেশা হচ্ছে।'

'কী যে কন আফা এক কাপে কী হইব।'

'দাও, আরেক কাপ দাও।'

জালালের মা খুব আগ্রহ করে আরেক কাপ দিল। তারপর আরেক কাপ, আবার আরেক কাপ।

'আফা, আর খাইয়েন না।'

'কেন আর খাবো না কেন?'

'আচ্ছা, মনে চাইলে খান। সিগারেট খাবেন? মদের উপর সিগারেটের ধোঁয়া পড়লে নিশা ভাল হয়।'

'সিগারেট? হুঁ খাব।'

শাড়ির আঁচলের ভাঁজ থেকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট বের হল। দেয়াশলাই বের হল। আমি সিগারেট ধরিয়ে আরেক কাপ শরবত নিলাম। মাথা সামান্য ঝিমঝিম করছে। এর বেশিতো কিছু হচ্ছে না। এই ঝিমঝিমটা সিগারেটের ধোঁয়ার জন্যেও হতে পারে। আমি পুরোপুরি মাতাল হতে চাচ্ছি। মাতাল হলে কেমন লাগে দেখতে চাই। মাতাল কি হব?

'আফা!'

'হুঁ।'

'কাল রাতের ঘটনা কিছু শুনেছেন?'

'না, কী ঘটনা?'

'খুব লইজ্জার ব্যাপার।'

জালালের মা এম্নিতে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। এখন ভদকার ঝোঁকেই হয়ত 'গেরাইম্যা' ভাষা বের হচ্ছে। লজ্জাকে বলছে—লইজ্জা। আমি বললাম লইজ্জার ব্যাপারটা কী?

'বাদ দেন। সব শোনা ভাল না।'

'তাহলে বাদই থাক।'

আমি মনে মনে হাসছি। জালালের মা 'লইজ্জার' ব্যাপারটা বলার জন্যে মরে যাচ্ছে। আমি বাদ দিতে বললেও সে বাদ দেবে না।

'ফিলিম লাইনে সুখ নাই আফা।'

'কোন লাইনে সুখ?'

'সব লাইনে সুখ—ফিলিম লাইন বাদ। কাল রাতে যে লইজ্জার ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনা ফিলিম লাইন ছাড়া ঘটে না। আপনের বয়স অল্প আপনেরে বলা ঠিক না।'

'থাক তাহলে বলবেন না।'

'ঘটনা ঘটেছে রাত তিনটায়।'

'থাক থাক বলবেন না।'

জালালের মা'র মনটা খারাপ হয়ে গেল। জগের শরবত শেষ হয়ে গেছে। সে আরো শরবত আনতে গেছে। আমার ঘুম পাচ্ছে। ভদকার নেশায় কি ঘুম পায়? শরীরও কেমন অবশ অবশ লাগছে। ভ্যাপসা গরমটাও আরামদায়ক মনে হচ্ছে। দূরের গারো পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগছে। পাহাড় খুব উঁচু না—তারপরও মনে হচ্ছে শাদা শাদা মেঘ পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। নজরুলের একটা গান আছে না? পাহাড়ে হেলান দিয়ে আকাশ ঘুমায় ঐ। গানটা ঠিক হয়নি। পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে আকাশ ঘুমুচ্ছে না—আসলে আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমুচ্ছে। জালালের মা আসছে না। আমি কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছি। রোদ আমার গায়ে পড়ছে। আমার নড়তে ইচ্ছে করছে না। রোদটাও ভাল লাগছে। ভদকা খেলে কি সবই ভাল লাগে? আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমার কেন জানি মনে হল—ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখব আমি অন্য এক মানুষ। আমার নাম রুমালী না—অন্য কিছু। আমি দুর্গাপুরের এক গণ্ডগ্রামে লিচু গাছের নিচে শুয়ে নেই। আমি শুয়ে আছি ঝাউ গাছের নিচে—একটু দূরেই সমুদ্র। সমুদ্র খুব অশান্ত। বড় বড় ঢেউ উঠছে। আমার চারপাশে কেউ নেই। সমুদ্রে প্রবল জোয়ার এসেছে। পানি বাড়ছে। পানি এগিয়ে আসছে আমার দিকে। যে কোনো মুহূর্তে প্রবল একটা ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যাক, ভাসিয়ে নিয়ে যাক। আমি কেয়ার করি না। I don't care.

৬

আমি বিছানায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছি। আমার চুল ভেজা—অর্থাৎ মাথায় প্রচুর পানি দেয়া হয়েছে। মা পায়ে গরম তেল মালিশ করে দিচ্ছেন। অচেতন রুগিদের ক্ষেত্রে এই কাজটি করা হয়। যা চলছে তার নাম জ্ঞান আনানোর প্রক্রিয়া।

আমার জ্ঞান আছে। ভালই আছে। অনেকক্ষণ হল মটকা মেরে পড়ে আছি। ঘটনাটা কী বোঝার চেষ্টা করছি। দুর্বোধ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি। নানান ধরনের কথাবার্তা শুনে যে ছবিটি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে—জালালের মা ছুটে এসে খবর দেয়, বকুল আপা অজ্ঞান হয়ে লিচু গাছের নিচে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে অজ্ঞান হবার আগের অংশ—'শরবত অংশ' বাদ দিয়ে যায়। আমাকে লিচু গাছের নিচে থেকে ধরাধরি করে আনা হয়। তখন সাময়িকভাবে আমার জ্ঞান ফেরে এবং আমি ভূতে ধরা রুগির মতো কিছুক্ষণ হাসাহাসি করে প্রচুর বমি করতে থাকি। তখনই শরবত অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এখন আমি বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরে বাতি জ্বলছে, কাজেই রাত। কত রাত জানি না। একজন ডাক্তার এসে আমাকে দেখে গেছেন। ডাক্তার বলে গেছেন—ভয়ের কিছু নেই। ইউনিটের লোকজন আমাকে দেখতে আসছে। মা তাদের অতি দ্রুত ঘর থেকে বের করে দিচ্ছেন। সেলিম ভাই যখন এলেন তখন আমি পুরোপুরি জেগে। সেলিম ভাই ক্ষীণ গলায় বললেন, এখন ওর অবস্থা কেমন? মা বললেন, অবস্থা ভাল, ঘুমুচ্ছে। তুমি এখন যাওতো, কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে গেলে অসুবিধা। ডাক্তার বলেছে প্রচুর ঘুম দরকার।

আমি বুঝতে পারছি সেলিম ভাই যাচ্ছেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

'বকুলের হয়েছি কী?'

'সারা দিন রোদে ঘোরাঘুরি করেছে। রোদ মাথায় চড়ে গিয়ে এই অবস্থা। ডাক্তার বলেছেন সর্দি গর্মি, যাই হোক এখন ভাল। তুমি যাওতো।'

আমি বুঝতে পারছি শরবতের অংশ প্রকাশিত হলেও পুরোপুরি প্রকাশিত হয়নি। সবাই জানে না। আমার বুদ্ধিমতী মা ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর মেয়ে ভদকা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে এটা জীবন থাকতে তিনি প্রকাশিত হতে দেবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় টুক টুক শব্দ হল। মা যেভাবে আমাকে ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তা থেকেই বুঝলাম ডিরেক্টর সাহেব এসেছেন। আমি এখন বিছানায় উঠে বসব কি-না বুঝতে পারছি না।

ডিরেক্টর সাহেব ঘরে ঢুকলেন। চেয়ার টেনে আমার মাথার কাছে বসলেন।

'এখন অবস্থা কী?'

মা কান্না কান্না গলায় বললেন, বুঝতে পারছি না।

'জ্ঞানতো ফিরেছে?'

'জি জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার সাহেব ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। এখন ঘুমুচ্ছে।'

'জ্বর আছে?'

'একটু মনে হয় আছে।'

তিনি হাত বাড়িয়ে আমার কপালে রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ একটা ব্যাপার হল। আমার সমস্ত শরীর জমে গেল। মনে হল আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমার মাথার ভেতরটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেছে। কান্না আটকে রাখলে গলার কাছে শক্ত ডেলার মতো জমে থাকে— তেমনি কিছু একটা জমে আছে।

'জ্বরতো নেই।'

তিনি হাত সরিয়ে নিলেন। আমার শরীর স্বাভাবিক হল—শুধু গলার কাছে শক্ত ডেলাটা থেকে গেল। চিৎকার করে কিছুক্ষণ না কাঁদলে এটা মনে হয় যাবে না।

'হয়েছিল কী?'

মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, মঈন ভাই আমি কিছুই জানি না। জালালের মা হঠাৎ এসে বলল, লিচু গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। শুনেই আমার হা পা ঠাণ্ডা।

'শুধু শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকবে কেন? ওর কি মৃগী রোগ আছে?'

'ছি! ছি! মঈন ভাই কী বলেন, মৃগী রোগ থাকবে কেন? রোদে সারা দিন ঘুরেছে...। মনে হয় রোদ মাথায় চড়ে কিছু একটা হয়েছে।'

'ঘুম ভাঙলে আমাকে খবর দেবেন আমি কথা বলব।'

'জি আচ্ছা।'

'আরেকটা কথা, ভয় পাবেন না। ভয়ের কিছু নেই। ডাক্তার যদি বলেন আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে দেব।'

'সেটা আমি জানি মঈন ভাই। আপনি আছেন বলেইতো আমি নিশ্চিন্ত।'

মা তাঁর বিখ্যাত তেলতেলানি হাসি হাসছেন। ডিরেক্টর সাহেব বের হয়ে গেলেন। আমি বুঝতে পারছি—আমার অজ্ঞান হবার খবর সবাই জানলেও শরবত বিষয়ক জটিলতার খবর জানে না। এই অংশটা ভালমতোই গোপন করা হয়েছে, মা, জালালের মা, সোহরাব চাচা এবং সুবীরদা হয়ত জানেন। যখন বমি করছিলাম সুবীরদা পাশে ছিলেন। তিনি হতভম্ব গলায় বলছিলেন—একী, রক্ত বমি করছে নাকি? সোহরাব চাচা বলেন, রক্ত না। তরমুজের শরবত বের হয়ে আসছে। যত বের হয় ততই ভাল। তারপরই শুনলাম সোহরাব চাচা জালালের মা'কে বলছেন, একে শরবত কে খাইয়েছে?

জালালের মা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমারে জিগান ক্যান? কে খাওইছে আমি জানি না।

'আচ্ছা ঠিক আছে। খাওয়াওনি ভাল করেছ। চেঁচিও না। চেঁচানোর কিছু হয়নি।'

'আমার দিকে এমন গরম চোখে চাইবেন না। জালালের মা গরম চোখের ধার ধারে না।'

সোহরাব চাচার সঙ্গে জালালের মা'র কথাবার্তা এই পর্যন্তই আমার কানে গেছে তারপর হঠাৎ মাথা ঘুরে জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অনুভূতিটা খুব যে খারাপ ছিল তা না।

আমি বিছানায় উঠে বসে সহজ গলায় বললাম, মা পানি খাব। মা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছেন। তিনি সম্ভবত ভাবতেই পারেননি—আমি এত সহজে বিছানায় ওঠে বসে পানি খেতে

চাইব। মা তাকিয়ে আছেন আমার দিকে, দ্রুত ভাবছেন—মেয়ের উপর কঠিন আক্রমণ এখনই শুরু করবেন, না দেরি করবেন। আমি বললাম, মা, দেখতো ক'টা বাজে।

'ন'টা বাজে?'

'তোমার রাতের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'না।'

'খাওয়ার ডাক পড়েছে?'

'না।'

'চল যাই খোঁজ নিয়ে আসি আমার খুব ক্ষিধে লেগেছে।'

মা কঠিন গলায় বললেন, তুই সন্ধ্যাবেলা কী খেয়েছিলি?

আমি আগের মতোই সহজ স্বাভাবিক গলায় বললাম, ভদকা খেয়েছিলাম। তরমুজের শরবতের সঙ্গে মেশানো ভদকা।

'কেন খেয়েছিলি?'

'ওমা, খাবার জিনিস খাব না? আমি হচ্ছি ছবির দু'নাম্বার নায়িকা। এক নাম্বর নায়িকা খেতে পারলে দু'নম্বর নায়িকা পারবে না কেন? কী ব্যাপার মা কতক্ষণ আগে তোমাকে পানি দিতে বললাম, এখনোতো দিচ্ছ না।'

মা পানি আনতে গেলেন। তাঁর শুকনো মুখ দেখে আমারই মায়া লাগছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি কেঁদে ফেলবেন। আমার মনে হচ্ছে অনেকদিন তাঁকে কাঁদানো হয় না, আজ কাঁদিয়ে দিলে কেমন হয়?

'বকু নে পানি নে।'

পানির গ্লাস হাতে নিলাম। ইচ্ছা করছে মাতালের ভূমিকায় কিছুক্ষণ অভিনয় করি। উল্টো পাল্টা কথা বলি। মা'র আক্কেলগুড়ুম করে দেবার এটাই হবে সহজ বুদ্ধি। একটু টেনে টেনে কথা বলতে হবে। বেশিরভাগ কথাই হবে অর্থহীন তবে কথা যা বলা হবে তার সবটাই হতে হবে সত্যি। মাতালরা মিথ্যা কথা বলতে পারে না। মিথ্যা বলার জন্যে মস্তিষ্কের যে নিয়ন্ত্রণ দরকার মাতালের তা থাকে না। এটা আমার শোনা কথা। সোহরাব চাচার কাছ থেকে শুনেছি।

পানির গ্লাসে একটা চুমুক দিলাম। পানিটা খেলাম না। মুখের ভেতর রেখেই গার্গলের মতো করে বললাম, কেমন আছ মা?

মা থমথমে গলায় বললেন, তুই মুখে পানি নিয়ে কথা বলছিস কেন?

'গার্গল করতে করতে কথা বলছি। কথা বোঝা যাচ্ছে না?'

'পানি গিলে ফেলে স্বাভাবিকভাবে কথা বল।'

'ডিরেক্টর সাহেবকে তুমি এখনো খবর দিচ্ছ না কেন? উনি না বলে গেলেন জ্ঞান ফিরলেই তাঁকে খবর দিতে হবে?'

'তুই জানলি কীভাবে?'

'আমিতো জেগেই ছিলাম। মটকা মেরে পড়েছিলাম। তোমরা কে কী বলছ সবই শুনতে পাচ্ছিলাম।'

'তোর সঙ্গে আমার কথা আছে বকু।'

'কথাতো বলছি, কথা বলছি না?'

'তোর কাণ্ডকারখানা আমার একেবারেই ভাল লাগছে না। আমার মনে হচ্ছে তোর সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।'

'সর্বনাশের সবে শুরু। তুমি শুরু দেখেই ঘাবড়ে গেলে? আসল যখন হবে তখন কী করবে?'

'আসল মানে?'

'এখনতো মদ খেয়েছি নির্জনে। পুকুর পাড়ে লিচু গাছের নিচে। তখন মদ খাব ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে। দরজা থাকবে ভেজানো। ঘর আধো আলো, আধো অন্ধকার।'

আমি খিলখিল করে হাসছি এবং প্রতি মুহূর্তেই ভাবছি এই বুঝি মা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মা তা করলেন না। তিনি তাকিয়েই আছেন। তাঁর চোখে পানি জমছে, কিন্তু কেঁদে ফেলার স্তরে এখনো আসেননি। হয়ত ভাবছেন তাঁর আদরের কন্যা এখনো মাতাল।

'বকু তুই শুয়ে থাক। সকালে কথা বলব।'

'ওমা ভাতটাত না খেয়ে শুয়ে পড়ব কেন? রাতে ভাত না খেলে এক চড়ুইয়ের রক্ত কমে যায়, তাছাড়া আমার মোটেই ঘুম পাচ্ছে না। আজ আমি সারা রাত জেগে থাকব।'

'বকু।'

'হুঁ।'

'তোর ছবিতে কাজ করার দরকার নেই। চল আমরা চলে যাই।'

'খুব ভাল কথা। চল তাই করি। তুমি যাও ডিরেক্টর সাহেবকে বুঝিয়ে বল—বুঝিয়ে বললে তিনি বুঝবেন। আর তুমি যদি বুঝিয়ে বলতে না পার, আমি বলছি।'

আমি বিছানা থেকে নামার উপক্রম করতেই মা এসে আমাকে ধরে ফেললেন। অসম্ভব আদুরে গলায় বললেন, বকু শুয়ে থাক। আয় আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

আমি শুয়ে পড়লাম। মা আমার মাথায় হাত বুলুচ্ছেন। চুলে বিলি কেটে দিচ্ছেন। মনে হচ্ছে দ্রুত আমার বয়স কমে যাচ্ছে। এই কাজটা আর কেউ পারে না শুধু মায়েরা পারেন। সন্তানের বয়স আদর করে করে কমিয়ে দিতে পারেন। আমার এখন ইচ্ছে করছে গুটিসুটি মেরে মায়ের বুকের কাছে শুয়ে থাকি।

'বকু!'

'হুঁ।'

'তোর মধ্যে একটা অস্থির ভাব চলে এসেছে। তুই একদণ্ড স্থির থাকতে পারছিস না। কারণটা কী বলতো?'

'আমার মনে হয় আমি কারো প্রেমে পড়েছি।'

মা হাসি মুখে বললেন, কার প্রেমে পড়েছিস?

'ঠিক বুঝতে পারছি না, মনে হয় ডিরেক্টর সাহেবের।'

মা হো হো করে হেসে ফেললেন। আমি মা'র সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছি—যেন এমন হাস্যকর কথা এর আগে আমরা কেউ শুনিনি।

'ডিরেক্টর সাহেবের প্রেমে কেন পড়েছি শুনতে চাও মা?'

মা হাসি চাপতে চাপতে বললেন, কেন?

উনার জ্ঞানী ধরনের কথাবার্তা শুনে। হিরোশিমায় বোমা পড়েছিল আটই আগস্ট সকাল আটটা পনেরো মিনিটে এই জ্ঞানের কথা উনি না থাকলে আমি শুনতেই পেতাম না। উনাকে দেখলে কী মনে হয় জান মা?

'কী মনে হয়?'

'মনে হয় জ্ঞান ঘামের মতো টপটপ করে পড়ছে।'

মা হাসি চাপতে চাপতে বললেন, খবর্দার এইসব বাইরে আলোচনা করবি না। উনার কানে গেলে উনি মনে কষ্ট পাবেন।

'পাগল হয়েছ এইসব আমি আলোচনা করব? আমার ৪৬টা ক্রমোজমের ২৩টা আমি পেয়েছি তোমার কাছ থেকে। এই ২৩টা ক্রমোজম ভর্তি বুদ্ধি। সেই বুদ্ধি আমার আছে না? উনাকে দেখলে আমি কী করি জান? আমি হতাশ একটা ভাব ধরে এক দৃষ্টিতে উনার দিকে তাকিয়ে থাকি। যাতে উনি মনে করেন আমি উনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'এ রকম করিস কেন?'

'মজা লাগে এই জন্যে করি।'

মা আমাকে আরো কাছে টানলেন। তাঁর মুখে কেমন শান্তি শান্তি ভাব। মেয়ে সম্পর্কে তাঁর মনে যে দুঃশ্চিন্তা ছিল তা ঝড়ের মতো উড়ে গেছে।

'বকু!'

'বল মা।'

'ভদকা মেশানো শরবতটা তুই কী মনে করে খেলি বলতো মা?'

'রাগ করে খেয়েছি। সোহরাব চাচা পাপিয়া ম্যাডামকে এই শরবত দিলেন, আমাকে দিলেন না, তখনই রাগ লাগছিল। তাছাড়া মাতাল হয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল কেমন লাগে।'

'আর কখনো এরকম করবি না।'

'আচ্ছা করব না। মা শোন, আমার ক্ষিধে লেগেছে।'

'আমাদের খাবার ঘরে দিয়ে যাবে।'

'ইউনিটের খাবার সবার সঙ্গে মিলে খেতে ইচ্ছা করে—চল নিচে গিয়ে হৈ হৈ করে খেয়ে আসি।'

'সত্যি যেতে চাস?'

'হুঁ চাই।'

'তারপর সেখানে গিয়ে তুই যদি উল্টোপাল্টা কোনো কথা বলিস?'

'কোনো উল্টোপাল্টা কথা বলব না।'

মা বিছানা থেকে নামলেন। তিনি চুল আঁচড়াবেন, শাড়ি পাল্টাবেন। হয়তোবা ঠোঁটে হালকা লিপস্টিকও দেবেন। আমরা মা-মেয়ে হাসি মুখে নিচে খেতে যাব। মা খেতে খেতেই জেনে নেবেন আজ সারা দিনে কোথায় ইন্টারেস্টিং কী ঘটনা ঘটল।

আমাদের খেতে যাওয়া হল না। সোহরাব চাচা দু'জনের খাবার নিয়ে এলেন। আমি আহ্লাদী গলায় বললাম, কী খবর সোহরাব চাচা?

সোহরাব চাচা হাসি মুখে বললেন, খবর খুবই ভাল। তুমি আছ কেমন?

'আমি ভাল আছি।'

'তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আগামীকাল শুটিং আছে। সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়। লম্বা একটা ঘুম দাও।'

মা কৌতূহলী গলায় বললেন, আজকের শুটিং কেমন হয়েছে?

'ভাল হয়েছে বলেইতো শুনেছি।'

'সেলিমকে কি রাখা হচ্ছে, নাকি ফরহাদ সাহেব অভিনয় করবেন?

'এখনো জানি না। স্যার স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না।'

মা গম্ভীর মুখে বলছেন, ছবি চলে স্টারদের নামের উপর। ফরহাদ সাহেবকে ছবির স্বার্থেই রাখা উচিত। আপনি মঈন ভাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

'কিছু বলতে হবে না। এইসব ব্যাপার স্যার খুব ভাল জানেন।'

রাতের খাবার আমি আরাম করেই খেলাম। মুরগির গোশত, ভাজি, ডাল আর কালিজিরা ভর্তা। কয়লার মতো কালো একটা বস্তু। ভাত মাখলেই কালো হয়ে যাচ্ছে। খেতেও ভাল না, তিতকুটে ভাব।

মা বললেন, এই ভর্তাটা তোর বাবার খুব প্রিয়। তোর বাবা খুব আগ্রহ করে খেত। এখন আর খেতে পারে না।

আমি বললাম, এখনো নিশ্চয়ই খায়। নতুন মা রেঁধে রেঁধে যত্ন করে খাওয়ান।

মা বললেন, ঐ ধুমসি সেজেই কূল পায় না, রেঁধে খাওয়াবে কী? তোর বাবার কী পছন্দ, কী অপছন্দ ঐ ধুমসি তার কিছুই জানে না।

'তুমি জানলে কী করে?'

'একদিন ঐ বাসায় গিয়েছি, ধুমসি নাস্তা দিয়েছে নুডলস। নুডলস তোর বাবার দু'চোক্ষের বিষ। তার কাছে না-কি দেখতে কৃমির মতো লাগে। বাসায় আমি কোনোদিন এই কারণে নুডলস রান্না করিনি। ধুমসি সমানে রাঁধছে।'

'নতুন মা'র নুডলসই হয়ত এখন বাবার কাছে অমৃতের মতো লাগছে। বাবা সোনামুখ করে খাচ্ছেন। বাটিরটা শেষ হয়ে গেলে বলছেন, ওগো কৃমি ভাজা আরেকটু দাও খেতে মজা হয়েছে।'

মা কঠিন গলায় বললেন, তুই নতুন মা নতুন মা করছিস কেন?

আমি বললাম, বাবার স্ত্রীকে মা ডাকব না? তাছাড়া তিনি নতুনতো বটেই। তুমি পুরানো মা উনি নতুন মা।

মা থালা সরিয়ে উঠে পড়লেন। আমি সাধ্য সাধনা করলাম না, কারণ তাতে লাভ হবে না। মা'র "ভাত-রাগ" কঠিন রাগ। সহজে এই রাগ ভাঙে না।

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় বললেন, তুই দূরে সরে ঘুমো গায়ের উপর এসে পড়বি না। গরম লাগে।

আমি বললাম, গরম কোথায় তুমিতো কম্বল গায়ে দিচ্ছ।

'সরে ঘুমুতে বললাম, সরে ঘুমো।'

আমি সরে গেলাম। খুব ভাল করেই জানি আমাকে দূরে সরিয়ে মা বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেই আমার কাছে সরে আসবেন। আমি যেমন মায়ের গায়ের গন্ধ ছাড়া ঘুমুতে পারি না, মা'র বেলাতেও তাই। তিনিও আমার গায়ের গন্ধ ছাড়া ঘুমুতে পারেন না।

'বকুল'

'কী মা।'

'আমি একজন দুঃখী মহিলা। দুঃখী মহিলাকে কি আরো বেশি দুঃখ দিতে আছে?

'দুঃখী মহিলা বলেইতো তোমাকে দুঃখ দি।'

'ও আচ্ছা।'

'মা ঘুম আসছে না। একটা গল্প বল। গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'আমি গল্প জানি না।'

'নিজের জীবনের গল্প বল।এইগুলি শুনতে আমার ভাল লাগে।'

মা জবাব দিলেন না। ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি মা'র কাছে এগিয়ে এলাম। তাঁর গায়ে একটা হাত তুলে দিলাম। মা ঝটকা মেরে সেই হাত সরিয়ে দিলেন না।

'মা!'

'কী?'

'তোমার বিয়ের গল্প বলতো মা। এই গল্প আমি যতবার শুনি ততবার ভাল লাগে।'

'আজ থাক আরেকদিন বলব। আজ শরীরটা ভাল লাগছে না। মনে হয় জ্বর আসছে।'

'জ্বর নেই মা, তোমার গা ঠাণ্ডা। গল্পটা বল—রিকশা থেকে ধুপ করে পড়ে গেলে—সেখান থেকে শুরু কর। জায়গাটা যেন কোথায়? কাওরান বাজার না?'

'বকু, ঘুমো। আমার শরীরটা আসলেই ভাল লাগছে না।'

'অসাধারণ এই গল্পটা তুমি বলবে না?'

মা আবারো নিঃশ্বাস ফেললেন। আজ আর গল্প হবে না। আমি ঘুমুবার আয়োজন করছি। আয়োজন মানে চোখ বন্ধ করে ফেলা। চোখ বন্ধ করে মজার মজার কিছু দৃশ্য কল্পনা করা।

'বকু!'

'কী মা?'

'ঘটনাটা কাওরান বাজারে ঘটেনি। কাকরাইলে ঘটেছে। ট্রাফিক সিগন্যাল আছে না—ঐ জায়গায়।'

'তুমি যাচ্ছিলে রিকশা করে তাইতো? সময় যেন কত?'

'দুপুর। নিউমার্কেটে স্যান্ডেল কিনতে গিয়েছিলাম। কোনোটাই পছন্দ হয় না। বলতে গেলে সব একই ডিজাইন। থোর বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোর। সেখান থেকে গেলাম নিউ এলিফেন্ট রোড, এইভাবে দেরি হয়ে গেল।'

'তারপর?'

'একটা রিকশা নিলাম।'

'রিকশা নিলে কেন মা। তোমার উচিত ছিল বেবিটেক্সি নেয়া।'

'বেবিটেক্সিই নিয়েছিলাম। বেবিটেক্সিতে বসে আছিতো বসেই আছি—টেক্সি আর স্টার্ট নেয় না। শেষে বিরক্ত হয়ে নেমে পড়েছি। বেবিটেক্সি থেকে নেমে যেই রিকশায় উঠেছি—ওমনি বেবিটেক্সিটা স্টার্ট নিল।'

'মা একেই বলে ভবিতব্য। তুমি ধৈর্য ধরে আর দু'মিনিট অপেক্ষা করলে ঘটনাটা ঘটত না। তারপর কী হল বল।'

মা গল্প থামিয়ে ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীরটা আসলেই ভাল লাগছে না। ভালমতো দেখতো জ্বর আছে না-কি।

আমি কপালে হাত দিলাম। হ্যাঁ, জ্বর আসছে। দ্রুতই আসছে। কপাল গরম।

মা'র জ্বর রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব বাড়ল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। কাল আমার শুটিং। শুটিং এর দৃশ্য মা দেখতে পাবেন না। জীবনে প্রথম তাঁর কন্যা ছবিতে অভিনয় করবে। তিনি জ্বর গায়ে বিছানায় ছটফট করবেন।

'মা, মাথায় পানি ঢালব?'

'না।'

'মাথা টিপে দেব মা?'

'না। বাতিটা জ্বালিয়ে রাখ। কেমন জানি ভয় ভয় লাগছে।'

'কিসের ভয়?'

'জানি না কিসের ভয়। বাতি জ্বালাতে বললাম, বাতি জ্বালা।'

আমি বাতি জ্বালিয়ে থার্মোমিটারে মা'র জ্বর মাপলাম। একশ তিন পয়েন্ট পাঁচ। তবে জ্বর মনে হয় কমছে। গা ঘামছে।

'কাল তোর শুটিং আছে না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দেখতে পারব না।'

'তুমি খুব ভালই দেখতে পাবে। সকালের মধ্যে তোমার জ্বর সেরে যাবে। পানি খাবে মা? পানি এনে দি?'

'না।'

'ঘরের বাতি নিভিয়ে বাথরুমের বাতি জ্বেলে দি। আলো চোখে লাগছে।'

'না না, ভয় লাগে। তুই আমার আরো কাছে আয়।'

আমি মা'র বুকের কাছে চলে এলাম। তাঁর শরীরের গরমে মনে হয় সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুম আনানোর চেষ্টা করছি। কাল সারা দিন শুটিং হবে, আমার ভাল ঘুম দরকার। চোখের নিচে যেন কালি না পড়ে। মা জ্বরে ছটফট করছেন। আমাকে ঘুমুতে হলে সুন্দর একটা স্বপ্ন তৈরি করতে হবে। এই অবস্থায় সুন্দর কোনো স্বপ্ন তৈরি করা সম্ভব হবে কি? আচ্ছা চেষ্টা করা যাক।

নৌকায় করে আমরা যাচ্ছি। আমি, আমার স্বামী এবং আমাদের ছোট্ট বাবু। বাবুটার জ্বর উঠেছে। আমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছি। আকাশে খুব মেঘ করেছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। বাবুর গায়ে জ্বর না থাকলে আমরা বৃষ্টিতে ভিজতাম। আহা বেচারা হঠাৎ জ্বর এসে গেল। মুখ শুকিয়ে কী হয়েছে! ব্যাটা, পানি খাবি?

'উঁহু। বাবার কোলে যাব।'

'বাবার কোলে যাবি কী? তুই থাকবি আমার কোলে।'
'গল্প বল না।'
'ওমা শখ কত। জ্বর গায়ে গল্প শুনতে চায়। কিসের গল্প শুনতে চাস?'
'ভূতের গল্প।'
'দিনে-দুপুরে ভূতের গল্প কিরে বোকা ছেলে?'
'ভূতের গল্প বল।'
'কুণি ভূত আর বুনি ভূতের গল্প শুনবি?'
'হুঁ শুনব।'
'ঘরের কোনায় যে ভূত থাকে তাকে বলে কুণি ভূত। আর যে ভূত থাকে বনে তার নাম বুনি ভূত।'
গল্প বলা হল না, বৃষ্টি এসে গেল। আমি বাবুকে নিয়ে নৌকার ছইয়ের নিচে চলে গেলাম। বাবুর বাবা এখনো নৌকার পাটাতনে বসে আছে। মনে হয় ভদ্রলোকের বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছা।
'রুমালী, বাবুকে শুইয়ে চলে এসতো, আমরা বৃষ্টিতে ভিজি।'
আচ্ছা মানুষটার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? বাচ্চাটার এমন জ্বর—তাকে একা একা বিছানায় শুইয়ে আমার মজা করব! বৃষ্টিতে ভিজব! বৃষ্টিতো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। সবে শ্রাবণ মাসের শুরু। সারা মাসতো পড়েই আছে।
'কই রুমালী এসো।'
'উঁহু। বাবুকে একা ফেলে কীভাবে আসব?'
'ওকে নিয়েই এসো। বৃষ্টিতে ভিজলে ওর জ্বর সেরে যাবে। একে বলে জল চিকিৎসা।'
'লাগবে না আমার জল চিকিৎসা।'
বাবু কোলের ভেতর নড়েচড়ে উঠল। ওর মতলব ভাল মনে হচ্ছে না। বাবার কথা কানে গেছে, এখন কি আর আমার কথা শুনবে। এমন নিমকহারাম ছেলে। এত আদর করি—তারপরেও শুধু বাবা, বাবা, বাবা।
বাবু ঠোঁট ফুলিয়ে ডাকল, মা।
আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কী হল আবার?
'বৃষ্টিতে ভিজব মা।'
'অসম্ভব—এই বৃষ্টিতে ভিজলেই নিউমোনিয়া হবে।'
'হবে না।'
'তুই জানলি কী করে, তুই কি ডাক্তার?'
'আমি ডাক্তার না হলেও বাবাতো ডাক্তার।'
কল্পনার গল্প এইখানে থেমে গেল। হঠাৎ যেন ছন্দপতন হল—কারণ বাবুর বাবাতো ডাক্তার নন। বাবুর বাবা হলেন...।
আশ্চর্য, কল্পনাতেও মানুষটার কথা ভাবতে লজ্জা লাগছে কেন? এত লজ্জা করলেতো আমার চলবে না। কল্পনার এই গল্পটা আপাতত বাদ থাক। আমি বরং অন্য কোনো গল্প শুরু করি। যে গল্পে বাবুর বাবার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হবে। বাবুর বাবা প্রথম আমার হাত ধরে বলবেন—ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসি।
আচ্ছা জাহেদাকে জিজ্ঞেস করে একবার কি জেনে নেব আমার বর কী হবে, ডাক্তার না অন্য কেউ? ভবিষ্যৎ জানতে পারার সত্যি সত্যি কোনো ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। বিশাল একটা যন্ত্র থাকবে। সেই যন্ত্রে কম্পিউটারের পর্দার মতো পর্দা। টিকিট কেটে যন্ত্রটার কাছে যেতে হবে। ভবিষ্যতে কী হবে প্রশ্ন করা মাত্র যন্ত্রটা জবাব দিয়ে দেবে। প্রশ্ন উত্তরের ধরনটা কেমন হবে?
'স্যার, বলুনতো আজ আমি রিকশা করে নিউমার্কেটে যাব। যাওয়া এবং ফেরার পথে কোনো ঘাতক ট্রাকের সঙ্গে কলিশন হবে?'

'না।'
'আজ রাতে আমি কী দিয়ে ভাত খাব?'
'এক পিস ইলিশ মাছ ভাজা, আলু ভর্তা আর ডাল।'
'কোনো তরকারি থাকবে না?'
'থাকবে। তবে তুমি খাবে না।'
'খাব না কেন?'
'দুপুরে রান্না করা তরকারি। জ্বাল দেয়া হয়নি, টকে গেছে এই জন্যে খাবে না।'
'থ্যাংক য়্যু স্যার।'
'ইউ আর ওয়েল কাম ইয়াং লেডি।'
'স্যার, একটা শেষ প্রশ্ন।'
'বল।'

'একটা ভয়ংকর ব্যাপার আমার জীবনে ঘটে গেছে। আমি একজন বুড়ো মানুষের প্রেমে পড়ে গেছি। ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারছি না। যতই দিন যাচ্ছে আমি ততই অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছি। আমার মাথা কি কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ খারাপ হয়ে যাবে?'

'না। তোমার ঘোর কেটে যাবে। অল্প দিনের ভেতর ঘোর কেটে যাবে।'
'সেই অল্প দিন মানে কত দিন?'
'এক মাস।'
'মাত্র একমাস?'
'ঘোর যত প্রবল হয়, তত দ্রুত কাটে।'
'ও আচ্ছা ধন্যবাদ।'
'তোমাকেও ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি।'

আমি ঘুমুতে চেষ্টা করছি। ঘুম আসছে না। ভয়ংকর একটা খারাপ ইচ্ছা করছে। পৃথিবীর সবচে খারাপ মেয়েদের মনেই বোধ হয় এরকম ইচ্ছা হয়। মনে হচ্ছে আমি পৃথিবীর সবচে খারাপ একটা মেয়ে। আমার ইচ্ছা করছে—চুপিচুপি মায়ের পাশ থেকে উঠে একতলায় নেমে যেতে। তারপর ডিরেক্টর সাহেবের ঘরের দরজায় আলতো করে নক করতে। উনি জেগে উঠে ঘুম জড়ানো গলায় বলবেন, "কে?" আমি বলব—"রুমালী।"

হঠাৎ ঘুম ভাঙলে মানুষের জগৎ এলোমেলো থাকে। তাঁর জগৎটাও তখন থাকবে এলোমেলো। "রুমালী" শব্দটার মানে তিনি ধরতে পারবেন না। তিনি বলবেন, রুমালী কে? আমি বলব, রুমালী হল মিস হ্যান্ডকারচিফি কিংবা মিস ন্যাপকিনি। তিনি অবাক হয়ে দরজা খুলে বলবেন, ও তুমি। এত রাতে কী ব্যাপার?

'আমার জ্ঞান ফিরলে আপনাকে খবর দেয়ার কথা বলেছিলেন। খবর দেয়া হয়নি। এখন খবর দিতে এলাম।'

'ও আচ্ছা।'

'আমার ঘুম আসছে না। আমি যদি কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে গল্প করি তাহলে কি আপনি রাগ করবেন?'

'না, রাগ করব না।'

আমি তখন আহ্লাদী গলায় বলব, কেউ দেখে ফেললে খুব সমস্যা হবে। এত রাতে আপনার সঙ্গে গল্প করছি। দুষ্টু লোক নানান কথা ছড়াবে।

'তাহলে কি গল্প করার পরিকল্পনা বাতিল?'

'না, বাতিল না। আমরা বাতি নিভিয়ে গল্প করব। বাতি নেভানো থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না।'

'তা ঠিক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবশ্যি কথা বলতে হবে ফিসফিস করে।'

'হুঁ।'

'হুঁ বলে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান। এবং দয়া করে বাতি নিভিয়ে দিন।'

তিনি দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াবেন এবং বাতি নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে দেবেন।

ছিঃ আমি এসব কী ভাবছি? আমার মাথা কি সত্যি সত্যি খারাপ হয়ে গেছে? আমি বিছানায় উঠে বসলাম এবং মা'কে ডেকে তুললাম। মা উঠে বসে ভয় ধরানো গলায় বললেন, কে? কে?

আমি বললাম, কেউ না মা। আমি। মিস ন্যাপকিনি।

'কী হয়েছে?'

'গল্পটা শেষ কর মা?'

'কিসের গল্প?'

'ঐ যে কাকরাইল ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে তুমি ধপাস করে রিকশা থেকে পড়ে গেলে।'

'কী বলছিস তুই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাবার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হবার বিখ্যাত গল্পটা। তুমি শুরু করেছিলে; শেষ করনি। আমি শেষটা শুনতে চাই।'

মায়ের চোখ থেকে ঘুম এখনো কাটেনি। তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

৭

AMARBOI.COM

আমি বসে আছি শিমুল গাছের নিচে। আগুনরাঙা ফুলে গাছ ঢেকে আছে। আমার চারদিকেও রাশি রাশি ফুল। আমার হাতে একটা কাগজ এবং কলম। কাগজে আমি চিঠি লিখছি। তিন লাইনের চিঠি।

জামিল ভাই,
আমি আপনাকে ভালবাসি।
ভালবাসি ভালবাসি ভালবাসি।

আমার চোখ ভর্তি পানি। চিঠি শেষ হওয়া মাত্র গাল বেয়ে এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল। এবং আমি ভয়ানক চমকে উঠলাম কারণ জামিল ভাই চুপিচুপি আমার পেছন এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি হাতের কাগজটা মুঠোর ভেতর লুকিয়ে ফেললাম।

না, বাস্তব কোনো ব্যাপার না। এই আমি রুমালী নই—এই আমি হচ্ছি ছবির দিলু, যে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্র লিখেছে। যে প্রেমপত্র সে তার প্রেমিককে দিতে পারছে না। সে তার গোপন ভালবাসার কথা পৃথিবীর কাউকেই জানাবে না। জানানো সম্ভব নয়।

জামিল ভাইয়ের সঙ্গে দিলুর কিছু কথা হবে। কথা শেষ হবার পর দিলু ছুটে চলে যাবে। চিত্রনাট্যটা এরকম।

শট ওয়ান।

(টপ শট। ক্যামেরা প্যান করবে।)

শিমুল গাছের শিমুল ফুল থেকে দিলু। দিলু কাগজে চিঠি লিখছে।

দিলুর চারপাশে শিমুল ফুল।

শট টু।

(ক্যামেরা চার্জ করে দিলুর মুখের উপর। ক্লোজ শট।)

দিলুর চোখে জল। জল গড়িয়ে গালে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

শট থ্রি।

(ও এস শট। ক্যামেরা দিলুর পেছনে। ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে চিঠির লেখাগুলি পড়া যাচ্ছে। ক্যামেরা ওয়াইড হবে। ফ্রেমে ঢুকবে জামিল। দিলুর পাশে দাঁড়াবে। দিলু চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়বে।)

শট ফোর।

(টু শট। মিড ক্লোজ। দিলু ও জামিল।)

জামিল : তুই এখানে? চারদিকে তোকে খোঁজা হচ্ছে। কী করছিলি?

দিলু : কিছু করছিলাম না।

জামিল : কাগজ–কলম নিয়ে বসে আছিস, চোখ ভেজা...ব্যাপার কী? কবিতা লিখছিলি?

দিলু : হুঁ।

জামিল দেখি কী লিখলি?

দিলু : না।

জামিল না কেন? তুই সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে গোপনে মহিলা কবি হয়ে যাবি আমরা কেউ জানব না, তা হবে না। দেখি। একী, কাগজটা কচলাচ্ছিস কেন?

শট ফাইভ।

(ক্লোজ শট। দিলুর হাত। হাতের মুঠোয় কাগজ। কাগজটা সে কচলাচ্ছে। জামিল কাগজটা নিতে হাত বাড়াল।)

শট সিক্স।

(লং শট। দিলু জামিলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে। বাতাসে দিলুর চুল উড়ছে। শাড়ির আঁচল উড়ছে।)

শট সেভেন।

(মিড ক্লোজ শট। বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে আছে জামিল।)

শট এইট।

(দিলু নদীর পার ঘেঁষে দৌড়াতে দৌড়াতে কাশবনের ভিতর ঢুকে গেল। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে শুধু কাশবনের ফুল কাঁপছে।)

সাত নম্বর শট পর্যন্ত নেয়া হয়ে গেল। আট নম্বর শট—কাশবনের দৃশ্য বাকি রইল। কাশবনের জন্যে যেতে হবে সোমেশ্বরী নদীর পারে। কাশবন যেখানে পাওয়া গেছে সেই জায়গাটাও অনেক দূরে। হেঁটে যেতে হবে। দু'তিন ঘণ্টা লাগবে যেতে। এই শটটা অন্যদিন নেবার কথা। কিন্তু ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আজই শটটা নিয়ে নেব। পরে কনটিনিউইটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। ক্যামেরা চলে যাক। আমরা একটু পরে যাই।

ক্যামেরা ইউনিট সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। ক্যামেরাম্যান আজিজ আংকেল আমাকে বললেন, বকুল শুনে যাও।

আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি কী বলবেন তা আমি জানি বলে মনে হচ্ছে। অবশ্যি যে কথাগুলি মানুষ বলবে বলে ভেবে রাখে সময়ে তা বলতে পারে না। শেষ মুহূর্তে অন্য কথা বলে। আজিজ আংকেলের ব্যাপারে এই সমস্যা হবার কথা না।

'বকুল আজ গরমটা কেমন পড়েছে বল তো?'

'খুব গরম।'

'শেষ বিচারের দিন সূর্য যেমন মাথার উপর চলে আসবে—মনে হচ্ছে আজও সূর্য মাথার উপর চলে এসেছে।'

'জি।'

'খুব বেশি করে পানি খাবে। শরীর ঠিক রাখার একটামাত্র পথ, বেশি করে পানি খাওয়া। সারা দিনে মাঝারি সাইজের এক কলসি পানি খেলে তুমি শরীর নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'আচ্ছা, এখন থেকে সারা দিনে এক কলসি পানি খাব। আর কোনো উপদেশ?'

'না, আর কোনো উপদেশ না। তোমার অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। মঈন ভাই তোমাকে নিশ্চয়ই বলবেন। আমি আগেই বললাম। তোমার অভিনয় তো আমি আগে দেখিনি—এই প্রথম দেখছি। যতবার তুমি আসবে—ততবার পর্দা ঝলমল করে উঠবে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'তোমাকে ছোট্ট একটা টিপস্ দেই। তোমার চোখ যেই মুহূর্তে ক্যামেরা লেভেলের সঙ্গে চলে আসবে সেই মুহূর্তে তুমি তোমার থুতনি একটু ভেতর দিকে টেনে নেবে। নেবে খুব আস্তে। ঝট করে না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

'একটু করে দেখাও তো!'

আমি দেখালাম। আজিজ আংকেল বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন যাও। এক জগ ঠাণ্ডা পানি খেয়ে ফেল।

আমি যাচ্ছি আমার মা'র দিকে। মা'র জ্বর নেই তবে শরীর এখনো সারেনি। ঠাণ্ডা লেগে গেছে। সারাক্ষণ কাশছেন। বুকের ভেতর থেকে কেমন ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। তাঁর বিছানায় শুয়ে থাকার কথা, কিন্তু তিনি শুটিং দেখতে এসেছেন। বড় ছাতার নিচে আছেন। গরমে ঘেমে চপচপ করছেন। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটু পরে পরে কাশছেন। তাঁর চোখমুখ লালচে হয়ে আছে। আবার বোধহয় জ্বর আসছে।

মা'র হাতে পাখা। তিনি প্রবল বেগে নিজেকে হাওয়া করছেন। তাতে লাভের মধ্যে লাভ এই হচ্ছে যে তিনি আরো ঘামছেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়ানো মাত্র মা গলা নিচু করে বললেন—বকু, তুই যখন দৌড়াচ্ছিলি তখন তোর শাড়ি উঠে গিয়েছিল।

'তাই?'

'হ্যাঁ, একেবারে হাঁটু পর্যন্ত উঠে গেছে।'

'পায়ের বড় বড় লোম সব দেখা গেছে?'

'উদ্ভট কথা বলছিস কেন? তোর পায়ে লোম আছে নাকি?'

'ও আচ্ছা, আমি ভুলেই গেছি আমার পায়ে লোম নেই।'

'বকু, তুই ফাজিল ধরনের হয়ে যাচ্ছিস।'

'কী করব মা বল—ছবির লাইনের এই সমস্যা। একটা ভাল মেয়ে ঢোকে, ফাজিল মেয়ে হয়ে বের হয়ে যায়। তোমার শরীর কেমন মা?'

'ভাল।'

'তুমি কি যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে?'

'কোথায় যাব?'

'কাশবনে। এখন কাশবনের শুটিং হবে। এখান থেকে সাত কিলোমিটার দূর। নদীর পার ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে যেতে হবে, পারবে?'

'কাশবনের শুটিংতো আজ হবার কথা না।'

'হবে, আজই হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা রওনা হব।'

'তোকে আমি একা ছাড়ব কীভাবে?'

'একা ছাড়তে তো বলছি না। তুমি সঙ্গে চল। পালকি তো পাওয়া যাবে না—ডিরেক্টর সাহেবকে বল উনি একটা খাটিয়া জোগাড় করে আনবেন। তুমি খাটিয়াতে শুয়ে শুয়ে আমার সঙ্গে যাবে। আমরা তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যাব।'

'তোর কী হয়েছে বকু?'

'কিছু হয়নি তো!'

'তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বল।'

'এখন বলব না—রাতে বলব।'

মা উঠে দাঁড়িয়েছেন। আমি দেখলাম তিনি উত্তেজিত ভঙ্গিতে ডিরেক্টর সাহেবের দিকে যাচ্ছেন। তিনি তাঁকে কী বলবেন কে জানে! তাঁর প্রধান চেষ্টা থাকবে আজ যেন কাশবনের শুটিংটা না হয়। কারণ তিনি সুস্থ না—তিনি অতদূর যেতে পারবেন না। তবে তিনি নিজের কথা বলবেন না, অন্য কোনো অজুহাত বের করবেন। আমি ছাতার নিচে বসলাম। তৃষ্ণা পেয়েছে। আজিজ আংকেলের কথা মতো সারা দিনে এক কলসি পানি খাওয়া দরকার। আমার ইচ্ছা করছে এখনি এক কলসি পানি খেয়ে ফেলতে। টেবিলের উপর জগ আছে, গ্লাস আছে। আমি ইচ্ছা করলেই পানি খেতে পারি। কিন্তু খাচ্ছি না, তৃষ্ণাটা আরো বাড়ুক। তৃষ্ণা বাড়তে বাড়তে যখন সারা শরীরে হাহাকারের মতো ছড়িয়ে পড়বে তখন পানি খাব।

মা ডিরেক্টর সাহেবের কাছে পৌঁছেছেন, কিন্তু কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। ডিরেক্টর সাহেব গভীর মনোযোগে চিত্রনাট্যের পাতা ওল্টাচ্ছেন। তাঁর পাশে গম্ভীর মুখে ফরহাদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ধারণা ডিরেক্টর সাহেব ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন না বলেই এত মনোযোগ দিয়ে চিত্রনাট্য দেখছেন। এইবার ফরহাদ সাহেব কী যেন বলছেন। হাত-পা নেড়ে নেড়ে বলছেন। ডিরেক্টর সাহেব একবার শুধু তাকালেন, তারপর আবার চিত্রনাট্য পড়া শুরু করলেন। এখন মনে হচ্ছে মা কিছু বলবেন। মা বললেন ফরহাদ সাহেবকে। মা'র সঙ্গে ফরহাদ সাহেবের কী কথা থাকতে পারে? ফরহাদ সাহেব আবার কী যেন বললেন। এখন মা চলে আসছেন। মা'র মুখ হাসিহাসি। মনে হয় ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে ডিরেক্টর সাহেবের ঝগড়া হচ্ছে। ঝগড়া না হলে মা'র মুখ এমন হাসিহাসি হত না।

ছুটে আসার কারণে মা হাঁপাচ্ছেন। হাঁপানি সামলে উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকালেন।

'বকু।'

'বল।'

'ফরহাদ সাহেব অশ্রাব্য গালাগালি করছে। আমি দেখলাম এর মধ্যে থাকা ঠিক না। চলে এসেছি।'

'চলে এলে কেন? ইন্টারেস্টিং ঝগড়া সবটা শোনা উচিত ছিল।'

'তুই এরকম করে কথা বলছিস কেন?'

'রোদে মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে বলে যা মনে আসছে বলছি। মা, তুমি কি যাচ্ছ আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। তোকে কি আমি একা ছাড়ব?'

'ভাল।'

'তুই কি চাস আমি সঙ্গে যাই না?'

'না, না, তোমাকে যেতেই হবে। তুমি না গেলে কে দেখবে আমার শাড়ি হাঁটু পর্যন্ত উঠল কি উঠল না?'

মা তাকিয়ে আছেন। আমিও হাসি মুখে তাকিয়ে আছি। মা কাশতে শুরু করেছেন। কাশি কিছুক্ষণের জন্যে থামতেই আমি বললাম, কাশি থামিও না তো মা, চালিয়ে যাও। ঝগড়ার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে কাশির কোনো তুলনা হয় না।

মা কিছু একটা বলতে গেলেন, বলতে পারলেন না। তাঁর কাশি আবারো শুরু হল।

ডিরেক্টর সাহেব এবং ফরহাদ সাহেবের ঝগড়া মনে হয় ভালই জমেছে। সোহরাব চাচা দৌড়ে যাচ্ছেন। তিনি চোখে ইশারা করলেন—ইউনিটের আরো একজন দৌড়াচ্ছে। তারা ডিরেক্টর সাহেবকে গার্ড দিয়ে রাখবে। ফরহাদ সাহেব একটা ব্যাপার বোধহয় বুঝতে পারছেন না—তিনি এখন বাস করছেন ডিরেক্টর সাহেবের জগতে। এখানে কোনো উনিশ-বিশ করা যাবে না। ইউনিটের প্রতিটি মানুষ ডিরেক্টর সাহেবের মহাভক্ত। এরা তাঁর জন্যে জীবন দিয়ে দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুত। ডিরেক্টর সাহেব একবার যদি বলেন—ফরহাদ নামের এই বেয়াদবটাকে মেরে সোমেশ্বরী নদীতে ফেলে দাও, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুকুম তালিম হবে। ইউনিটের আরো একজন ছুটে যাচ্ছে। পাপিয়া ম্যাডামকে কোথাও দেখছি না। তিনি আজ শুটিং স্পটে আসেননি।

'বকু!'

'হুঁ।'

'চল, কাছে গিয়ে শুনি কথাবার্তা কী হচ্ছে।'

'তুমি যাও মা, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি গিয়ে সব মন দিয়ে শোন—পরে আমাকে রিপোর্ট করবে।'

'এরকম করছিস কেন, আয় না! সব বিষয়ে তোর কৌতূহল এত কম কেন? আয় না।'

আমি নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এগুচ্ছি। অনিচ্ছার প্রধান কারণ হচ্ছে ফরহাদ সাহেবের কুৎসিত গালাগালি শুনে ডিরেক্টর সাহেব যদি কোনো কুৎসিত গালি দিয়ে বসেন তা হলে আমার খুব খারাপ লাগবে। ভদ্রলোক এখনো অবশ্যি মোটামুটি শান্ত ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে আছেন। এই শান্ত ভঙ্গি কতক্ষণ থাকবে সেটাই কথা। এক সময় হয়তো তাঁর ধৈর্যচ্যুতি হবে, তিনি বস্তির মানুষের মুখের কোনো নোংরা গালি দিয়ে বসবেন। তাঁর মুখে সেই গালি শুনে মা খুব মজা পেতে পারেন—আমি পাব না।

এদের দু'জনকে ঘিরে এখন অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম দিন যে মওলানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তিনিও আছেন। মেরাজ মাস্টার। এই ভদ্রলোকের আগ্রহই মনে হচ্ছে সবচে বেশি। তিনি চোখ বড় বড় করে প্রতিটি কথা শুনছেন এবং মনে হয় বিমল আনন্দ পাচ্ছেন। আমরা দু'জন কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। যেসব কথাবার্তা শুনলাম তা হচ্ছে—

ফরহাদ (রাগে তাঁর মুখে থুথু চলে এসেছে। ঠোঁটের কোনায় থুথু। তিনি মনে হয় মদ খেয়ে এসেছেন। গন্ধে টেকা যাচ্ছে না।) বাইচলামি? আমার সঙ্গে বাইচলামি! সারা দিন মেকাপ নিয়ে বসায়ে রেখে আরেকজনকে দিয়ে শুটিং করায়। সম্বুন্ধির বাচ্চা তুমি ভাব কী?

ডিরেক্টর সাহেব (তাঁর মুখভঙ্গির সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি। তিনি পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। নিজে একটা ধরালেন। প্যাকেট এগিয়ে দিলেন।) ফরহাদ সাহেব, নিন সিগারেট খান। সিগারেট খেয়ে মেজাজ ঠিক করুন।

ফরহাদ সিগারেট। শালা সিগারেট আমি তোর ইয়ে দিয়ে ঢুকায়ে দিব।

ডিরেক্টর (একটু মনে হল বিস্মিত হয়েছেন।) তাই নাকি?

ফরহাদ : (রাগ এখন চরমে উঠেছে) আবার বলে তাই নাকি? আমি দুইশ টাকা শিফটের এক্সট্রা না, আমি মেগাস্টার।

ডিরেক্টর মেগাস্টার—আমার কথা শুনুন। আপনার গালাগালি যা দেবার দ্রুত দিয়ে শেষ করুন। আমার কাজ আছে। আপনার গালাগালি আমি অনেক আগেই বন্ধ করতে পারতাম, বন্ধ করছি না কারণ সবাই আগ্রহ নিয়ে শুনছে এবং খুব আনন্দ পাচ্ছে, তাদের এই আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত করতে চাচ্ছি না।

ফরহাদ শুওরের বাচ্চা, আমি তোর মুখে পিশাব করে দি।

ডিরেক্টর কখন করতে চান, এখন? করুন।

মা এই পর্যায়ে খামচি দিয়ে আমার হাত ধরলেন—কারণ ফরহাদ সাহেব সত্যি সত্যি তাঁর প্যান্টের জিপারে হাত দিয়েছেন। টেনশনে মা'র কাশি ভাল হয়ে গেছে। তিনি এতক্ষণে একবারও কাশেননি। মা ফিসফিস করে বললেন—বকু ও তো সত্যি সত্যি প্যান্ট খুলছে। চল চলে যাই।

আমি ফিসফিস করে বললাম, না। শেষটা দেখব। তোমার লজ্জা বোধ করার কোনো কারণ নেই মা। ভেবে নাও রাস্তার কোনো নগ্ন পাগল। তাছাড়া ফরহাদ সাহেব নগ্ন হবার আগেই কোনো ব্যবস্থা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী ব্যবস্থা হবে?'

'কী ব্যবস্থা হবে আমি জানি না, কিন্তু একটা কিছু ব্যবস্থা হবে।'

ফরহাদ সাহেব টান দিয়ে জিপার পুরোপুরি খুলে ফেলেছেন। জিপারের ফাঁক দিয়ে তার লাল আন্ডারওয়ার দেখা যাচ্ছে। ছেলেরা এমন লাল টুকটুক আন্ডার ওয়ার পরে আমি জানতাম না। আমি ডিরেক্টর সাহেবের দিকে তাকালাম। ঘটনাটা তিনি অনেক দূর এগুতে দিয়েছেন। এতদূর এগুতে দেয়া ঠিক হয়নি। আমি হলে দিতাম না।

ডিরেক্টর সাহেব সিগারেট ধরালেন। তারপর সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে মওলানা সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন—মওলানা সাহেব একটু শুনুন তো। কাছে আসুন।

মওলানা সাহেব এগিয়ে গেলেন।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আপনি কি আমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে পারবেন?

মওলানা বললেন, অবশ্যই পারব জনাব।

'ফরহাদ নামের এই বদ মানুষটাকে আমি এমন এক শাস্তি দিতে চাই যা তার দীর্ঘদিন মনে থাকবে। আপনি এর কানে ধরে পুরো মাঠের চারদিকে একবার চক্কর দেওয়াবেন। এই দৃশ্যটা আমরা ক্যামেরায় ধরে রাখব। পারবেন না?'

'জনাব, আপনি হুকুম দিলে পারব। ইনশাল্লাহ।'

ফরহাদ সাহেব হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছু বলতে গেলেন—বলতে পারলেন না। আমি তাকালাম ডিরেক্টর সাহেবের দিকে—তাঁর মুখ হাসিহাসি। তাঁর চোখ কঠিন হয়ে আছে। এমন কঠিন চোখ সচরাচর দেখা যায় না। মা আমার হাত খামচে ধরে বললেন, কী হবে রে? আমি জবাব দিলাম না। লক্ষ্য করলাম সোহরাব চাচা এগিয়ে এসে ফরহাদ সাহেবের কানে–কানে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরহাদ সাহেবের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। জোঁকের মুখে নুন পড়ার অবস্থা। এতক্ষণ যে মানুষটা হৈচৈ চিৎকার করছিল সে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল।

বেঁটেখাটো মেরাজ মাস্টার এগিয়ে যাচ্ছে। সত্যি সত্যি কি এই মানুষটাকে কান ধরে মাঠের চারপাশে চক্কর খাওয়ানো হবে?

ফরহাদ সাহেব তাঁর প্যান্টের খোলা জিপার টান দিয়ে তুলে বিড়বিড় করে বললেন—মঈন ভাই, আমার ভুল হয়েছে। মাফ করে দেন। সকাল থেকে বিয়ার খাচ্ছি—যা করেছি নেশার ঝোঁকে করেছি।

ডিরেক্টর সাহেব গলা উঁচিয়ে বললেন—স্টিল ক্যামেরাম্যান কোথায়? কানে ধরে দৌড়ানোর ছবি তুলে রাখ। ক্যামেরা ইউনিট কি কাশবনে চলে গেছে?

সোহরাব চাচা বললেন, জি স্যার।

'আর্টিস্ট? আর্টিস্ট গিয়েছে?'

বলেই তিনি আমাকে দেখলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন—চল যাই, দেরি হয়ে গেল তো। মেকাপম্যান কোথায়? তাকেও যেতে হবে।

ফরহাদ সাহেবের সামনে এসে মেরাজ মাস্টার দাঁড়িয়েছেন। কানে হাত দেবেন কি দেবেন না মনস্থির করতে পারছেন না। তিনি আবারো তাকালেন ডিরেক্টর সাহেবের দিকে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, মওলানা সাহেব বাদ দিন। একে এই জংলা মাঠের চারদিকে কানে ধরে ঘোরালে কিছু হবে না। একে ঘোরাতে হবে এফডিসির চারদিকে। এই কাজটা আমি ঢাকায় গিয়ে করব।

মেরাজ মাস্টার বললেন, স্যার, আমি কি শুটিং দেখার জন্যে আপনাদের সঙ্গে আসব?

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, অবশ্যই আসবেন। আপনি বিসমিল্লাহ বলে ক্যামেরায় ফুঁ দিয়ে দেবেন, তারপর ক্যামেরা ওপেন হবে। তার আগে না।

চারপাশের পরিবেশ স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। শুধু ফরহাদ সাহেব ঘামছেন। খুব ঘামছেন। তিনি যে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছে। সোহরাব চাচা কানে–কানে কথা বলার পর থেকে পরিবর্তনটা হয়েছে। কানে–কানে বলা কথাগুলি কী? সোহরাব চাচা

কি আমাকে বলবেন? মনে হয় না। তিনি হড়বড় করে সারাক্ষণ কথা বলেন ঠিকই, কিন্তু গোপন কথা গোপনই রাখেন। মানুষটাকে হয়তো এই কারণেই সবার ভাল লাগে। যে কথাগুলি ম্যাজিকের মতো কাজ করল, সেই কথা সোহরাব চাচা আগে কেন বললেন না!

আমারা কাশবনে দিকে রওনা হয়েছি। মা যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে। তাঁর এমন অসুস্থ শরীর—আমি জানি আজ শুটিং শেষে তিনি পুরোপুরি শয্যাশায়ী হবেন। না গেলে চলত, কিন্তু তিনি যাবেনই। মা লেফট রাইটের ভঙ্গিতে দ্রুত পা ফেলছেন। প্রমাণ করার চেষ্টা যে তিনি মোটেই অসুস্থ না। খুব সুস্থ। তিনি হাঁটছেন ডিরেক্টর সাহেবের পাশে পাশে। আমি পিছিয়ে পড়েছি। আমার পাশে পাশে আসছেন মেরাজ মাস্টার। ভদ্রলোক আজ সেজেগুজে এসেছেন। চোখে সুরমা। পায়জামা ইস্ত্রি করা। আমাদের সঙ্গে দু'জন ছত্রধর যাচ্ছে। একজনের হাতে সবুজ রঙের বিশাল ছাতি। এই ছাতি ডিরেক্টর সাহেবের মাথায় ধরার কথা। ডিরেক্টর সাহেব ইশারায় নিষেধ করেছেন বলে ছাতা ধরা হয়নি। ছাতাটা ধরলে ভাল হত, মা খানিকটা ছায়া পেতেন। আমার মাথার উপর ছাতা ধরা আছে। আমি ভদ্রতা করে নিষেধ করিনি। ছায়া আমার প্রয়োজন। কড়া রোদে মেকাপ নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্যি আমার ধারণা মেকাপ নষ্ট হলেও ক্ষতি নেই।পুরো দৃশ্যটা লং শটে ধরা থাকবে। এতদূর থেকে পরিষ্কার কিছু দেখতে পাওয়ার কথা না।

'মা, আপনি কি আমাকে চিনেছেন?'

'জি চিনেছি। আপনি মেরাজ মাস্টার।'

'আপনাদের সঙ্গে যে যাচ্ছি খুবই ভাল লাগছে। সবাই কেমন হৈচৈ করতে করতে যাচ্ছেন। দলের সঙ্গে থাকার মজাই আলাদা।'

'জি।'

'আপনাদের ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কয়েকবার আলাপ হয়েছে—বিশিষ্ট ভদ্রলোক। এরকম বিশিষ্ট ভদ্রলোক সচরাচর দেখা যায় না। অতি অমায়িক।'

'জি।'

'স্যারের সঙ্গে কফি খেয়েছি। নানান বিষয় নিয়ে আলাপও হয়েছে। ধর্ম বিষয়েও স্যারের জ্ঞান অতি উচ্চ শ্রেণীর।'

'ধর্ম নিয়ে আপনারা আলাপ করলেন?'

'উনিই আলাপ করলেন, আমি শুধু শুনলাম, আমার জ্ঞানবুদ্ধিও কম, পড়াশোনাও কম।'

'ও আচ্ছা।'

'শৈশবকালে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলাম। পাক কোরান মুখস্থ করেছিলাম।'

'করেছিলাম বলছেন কেন? এখন মুখস্থ নাই?'

'জি না। স্মৃতি শক্তির গোলমাল হয়—এক সুরা থেকে আরেক সুরায় চলে যাই—আল্লাহর কাছে গুনাহগার হই। তবে আম্মা এখনো চালায়ে যাচ্ছি। রোজ এক-দেড় ঘণ্টা পড়ি। আল্লাহ পাকের যদি দয়া হয় ইনশাল্লাহ আবার মুখস্থ হবে। উনার বিশেষ দয়া ছাড়া কোরানে হাফেজ হওয়া সম্ভব না।'

'তাই না-কি?'

'জি। উনার পাক কালাম—রাম শ্যাম যদু মধু মুখস্থ করে ফেলল, আর হয় গেল তা না। উনার হুকুম লাগবে।'

'উনার হুকুম ছাড়া কিছু হয় না?'

'অবশ্যই না।'

'আচ্ছা ধরুন খুব সুখি একটা পরিবার স্বামী স্ত্রী এবং কন্যা। তারা সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করছে। হঠাৎ একদিন স্বামীটি সবাইকে ছেড়ে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে চলে গেল। এই ঘটনাও কি আল্লাহ্‌র হুকুমেই ঘটল?'

'অবশ্যই মা। অবশ্যই।'

'মানুষকে তো বিচার-বিবেচনার শক্তি দেয়া হয়েছে। ভাল এবং মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না?'

'অবশ্যই করবে, কিন্তু মা শেষ পর্যন্ত সেই কাজই সে করবে যে কাজের হুকুম তাকে করা হয়েছে।'

'ও আচ্ছা। আপনি কি বিয়ে করেছেন?'

জি না।'

'বিয়ে করেন নি কেন? আপনার তো বয়স ভালই হয়েছে।'

'সংসারধর্ম পালন করার মতো অর্থের সংস্থান নাই আম্মা। প্রাইভেট স্কুল, বেতন নামমাত্র। তাও সব মাসে পাওয়া যায় না। এক বাড়িতে জায়গির থাকি। এতে দুই বেলা খাওয়াটা হয়।'

'বিয়ে করা তো ফরজ, বিয়ে না করে আপনি গুনাহ করছেন না?'

'জি না। রসুলে করিমের একটা হাদিস আছে। স্ত্রীর ভরণপোষণের ক্ষমতা যাদের নাই তাদের তিনি বিবাহ না করার পরামর্শ দিয়েছেন।'

'আপনি কি সবকিছু হাদিস কোরান মেনে করেন?'

'জি আম্মা চেষ্টা করি। তবে আমার জ্ঞান সীমিত। সব হাদিস জানিও না।'

'নিজের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন না কেন? নাকি হাদিসে নিষেধ আছে।'

'কোনো নিষেধ নাই। চেষ্টা করতেছি আম্মা।'

'কীভাবে চেষ্টা করছেন? দোয়া করে? প্রতিদিন নামাজ শেষ করে দোয়া করছেন?'

'জি করি। তার উপর লোকজনদেরকেও বলি আমার একটা চাকরির খোঁজ দিতে। ডিরেক্টর সাহেবকেও বলেছি। উনি বলেছেন—দেখবেন।'

'উনি তো আপনাকে ছবির লাইনে একটা কাজ জোগাড় করে দিয়ে দেবেন। নায়িকাদের পোশাকের কনটিনিউইটি ঠিক রাখার কাজ। সেই কাজ আপনি করবেন?'

'আল্লাহপাক যদি নির্ধারণ করে রাখেন আমাকে তো করতেই হবে।'

'আপনি খুব আল্লাহভক্ত মানুষ।'

'জি আম্মা। তবে উনাকে ভক্তির চেয়ে ভয় বেশি করি।'

'দোজখের আগুনে আপনাকে পোড়াবেন সেই ভয়?'

'দোজখে শুধু যে আগুন থাকে তা না—খুব ঠাণ্ডা দোজখও আছে। বড়ই শীতল।'

'সেকী—জানতাম না তো!'

'দোজখের একটা জায়গা আছে নাম হল "জামহারীর"—বড়ই শীতল স্থান। মানুষের কল্পনাতেও আসবে না এমন শীতল। তবে সবচে ভয়ংকর হয়—জুব্বুল হুযন।'

'জুব্বুল হুযনটা কী?'

'জুব্বুল হুযনের অর্থ হল আম্মা—বিষাদের ঘাঁটি। এই জায়গাটা জাহান্নাম দোজখের অতি ভয়ংকর স্থান। আমাদের নবী-এ করিম বলেছেন জুব্বুল হুযন প্রধান দোজখ—অতি ভয়ংকর সেই স্থান।'

মওলানা সাহেবের গা থেকে আতরের গন্ধ আসছে। আতরের গন্ধ সাধারণত তীব্র হয়ে থাকে। গন্ধ নাকে এলেই মৃত মানুষের কথা মনে আসে। মওলানা সাহেবের আতরের গন্ধ সেরকম না। মিষ্টি গন্ধ।

কাশবনের কাছে পৌছতে পৌছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। দু'টা লং শট নেয়া হবে দু'দিক থেকে—সময় লাগল পুরো দু'ঘণ্টা। ডিরেক্টর সাহেব একটা বাড়তি শটও নিলেন—ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ক্যামেরাম্যান কাশবনে শুয়ে পড়লেন। কাশফুলের ভেতর দিয়ে আকাশ ধরা হল। বাতাসে কাশফুল ক্যামেরার লেন্স ঢেকে দিচ্ছে আবার সরে যাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, এই শটটা ব্যবহার করতে পারব না। তবু নিয়ে রাখলাম। আকাশে শাদা মেঘ থাকলে ভাল হত। শাদা কাশফুল থেকে শাদা মেঘ। White to white.

এতদূর হেঁটে এসে মা'র অবস্থা কাহিল। তিনি একটা গাছে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন। একটু পরপর পানি খাচ্ছেন। তাঁর চোখের নিচ কালো হয়ে আছে। সাধারণত রাতে ঘুম না হলে চোখের নিচে কালি পড়ে। মা'র চোখের নিচে কালি পড়েছে রোদে হেঁটে। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসতেই তিনি বিরক্ত মুখে বললেন, ঐ মওলানার সঙ্গে কী নিয়ে এত গুজগুজ করছিলি?

'ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলাপ করছিলাম মা। দোজখের শ্রেণীবিভাগ শিখছিলাম। গরম দোজখ ঠাণ্ডা দোজখ এইসব। তোমার তো মনে হচ্ছে অবস্থা কাহিল। ফিরবে কীভাবে?'

'ফিরব কীভাবে মানে? যেভাবে এসেছি সেইভাবে ফিরব।'

'তোমার পা ফুলে গেছে মা। ফোলা পা নিয়ে হাঁটতে পারবে না। তোমাকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে। কে তোমাকে কোলে নেবে সেইটা হচ্ছে কথা। দেখি তোমার হাতটা। জ্বর এসেছে কি না দেখি।'

'দূরে থাক। খবর্দার আমায় গায়ে হাত দিবি না!'

'আমার দৌড় দিয়ে কাশবনে ঢোকার দৃশ্যটা কেমন হয়েছে মা?'

'জানি না কেমন হয়েছে। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না?'

আমি মা'র পাশে বসে আছি। তাকিয়ে আছি কাশবনের দিকে। বাতাসে কাশফুল দুলছে। অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য। ডিরেক্টর সাহেব দূর থেকে হাত ইশারায় ডাকছেন। বুকে ধক করে একটা ঝাঁকুনি লাগল। কাকে তিনি ডাকছেন? আমাকে নাতো? আমার হাত-পা শক্ত হয়ে গেল। মা বললেন, একী কাণ্ড! তুই বসে আছিস কেন? মঈন ভাই তোকে ডাকছেন।

ইচ্ছে করছে ঠিক যেভাবে দৌড়ে কাশবনে ঢুকেছি সেভাবে ছুটে যাই। আশ্চর্য, আমি হাঁটতেও পারছি না। আমি তাঁর কাছে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, খুব টায়ার্ড?

এইসব ক্ষেত্রে বলতে হয়—না, টায়ার্ড না। এই বলে মিষ্টি করে হাসতে হয়। আমি তা করলাম না। আমি বললাম—হ্যাঁ, টায়ার্ড।

'তোমার অভিনয় খুব ভাল হচ্ছে।'

'দৌড় দিয়ে কাশবনে ঢুকে যাওয়া—এর মধ্যে অভিনয়ের কী আছে?'

'অনেক কিছুই আছে। একজন বড় অভিনেতা কী করেন? ইমপ্রোভাইজেশন করেন। খুব সচেতনভাবে যে করেন তা না—সাবকনশাসলি করেন। তুমি কাশবনে ঢোকার মুখে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেলে—তারপর পলকের জন্যে পেছনে ফিরে বনে ঢুকে গেলে। তোমাকে দাঁড়াতেও বলা হয়নি, পেছনে ফিরতেও বলা হয়নি। কাজটা তুমি করলে তোমার মতো। আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

আমি বিড়বিড় করে কিছু একটা বললাম। থ্যাংক য়্যু জাতীয় কিছু। তবে পরিষ্কার শোনা গেল না।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, তুমি আগেভাগে বলনি কী করবে। আমরাও জানতাম না কী করবে। কাজেই আগের শট এন জি হয়ে গেল। নতুন করে ক্যামেরা ঠিকঠাক করতে হল। আগে ক্যামেরা ফিক্সড ছিল—এখন ক্যামেরা তোমাকে অনুসরণ করেছে। আসল যে কথা সেটা মন দিয়ে শোন—আসল কথা হচ্ছে, তোমার অভিনয় আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'সেলিম ভাইয়ের অভিনয় কেমন হচ্ছে?'

'ওকে যা বলা হচ্ছে সে তা করতে পারছে। যে-কোনো ভাল পরিচালক সেলিমকে দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে পারবেন, এর বেশি কিছু না। তুমি যে-কোনো পরিচালকের সঙ্গে অভিনয় করতে পারবে। সে পারবে না।'

'এক সময় হয়তো শিখে ফেলবেন। তখন পারবেন।'

'না, তাও পারবে না। অভিনয়কলা একটা পর্যায় পর্যন্ত শেখা যায়। মিডিওকার অভিনেতা হবার জন্যে যতটুকু অভিনয় জানতে হয় ততটুকু অভিনয় শেখানো যায়। তার বেশি শেখানো যায় না।'

'আমরা রওনা হব কখন?'

'এখনই রওনা হব। আমি চা করতে বলেছি—চা-টা হোক, চা খেয়েই রওনা দেব।'

আমি প্রোডাকশানের কাউকে চা বানাতে দেখলাম না। ইউনিটের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট আউটডোর কিচেন যায়। এখানে আসেনি। তবে ডিরেক্টর সাহেব চা খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন চা আসবে। আসতেই হবে। আমি মায়ের দিকে তাকালাম—তিনি দূর থেকে একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের মধ্যে কী কথা হচ্ছে তা জানার জন্যে তিনি কৌতূহলে ছটফট করছেন। মায়ের পাশে মওলানা মেরাজ মাস্টার। তিনিও নিজ মনে কথা বলে যাচ্ছেন। হয়ত দোজখ কত প্রকার ও কী কী তা বোঝাচ্ছেন।

চা চলে এসেছে। সুন্দর দু'টা কাপে চা। টি ব্যাগের সুতা বের হয়ে এসেছে। কিচেন সঙ্গে না এলেও চায়ের সরঞ্জাম এসেছে। গ্রামের কোনো বাড়ি থেকে গরম পানি এনে চা করা হয়েছে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, বকুল, এখন তোমাকে খুব জরুরি একটা কথা বলব। কী বলব, মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু মন খারাপ করবে না।

'মন খারাপ করার মতো কোনো কথা?'

'না, মন খারাপ করার মতো কোনো কথা না। তারপরেও মন খারাপ হতে পারে। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন?'

'ভয় পাচ্ছি না তো।'

'পাচ্ছ। তোমার হাত কাঁপছে।'

'সরি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার, তুমি কি আমাকে ভয় পাও?'

'জি পাই।'

'কেন?'

'জানি না কেন।'

'আমি কখনো উঁচু গলায় কাউকে ধমক দিয়েছি বলেও তো মনে পড়ে না।'

'সেই জন্যেই হয়তো ভয় পাই। আপনার উঁচু গলা একবার শুনে ফেললে—ভয় ভেঙে যেত। তা ভাঙেনি।'

'তুমি স্বাভাবিক হও তো! এখনো তোমার হাত কাঁপছে। আমি কখনো তোমাকে এমন কিছু বলব না যে ভয়ে তোমার আত্মা উড়ে যাবে।'

'কী বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।'

'না থাক, বাদ দাও।'

'বাদ দিতে পারবেন না, আপনি বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।'

'তুমি এমন করছ কেন বকুল? হোয়াট হ্যাপেনড?'

আমি চোখমুখ শক্ত করে বললাম, আপনি কী বলতে চাচ্ছিলেন বলুন।

'ব্যাপারটা খুবই সাধারণ—যেহেতু তুমি অভিনয় করছ তোমার জন্যে ব্যাপারটা জানা জরুরি। যারা লম্বা মেয়ে তাদেরই এই সমস্যাটা বেশি হয়, তারা যখন হাঁটে তখন কুঁজো ভাব দেখা যায়। এরা হাঁটে মাটির দিকে তাকিয়ে—দৃষ্টি থাকে পায়ের কাছে। তুমি মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁট ক্ষতি নেই, তবে দৃষ্টিটা যদি পা থেকে খুব কম হলেও দশফুট দূরে রাখ তা হলে কুঁজো ভাবটা চলে যাবে। এখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখ। হেঁটে হেঁটে মায়ের কাছে যাও। দু'ভাবে হাঁটবে—পায়ের কাছে চোখ রেখে এবং পা থেকে দশফুট দূরে চোখ রেখে।'

'আমার চা শেষ হয়নি। চা খাওয়া শেষ হোক তারপর যাব।'

'বকুল, তুমি আমার কথায় রাগ করনি তো?'

'রাগ করব কেন?'

'মানুষমাত্রই তার ত্রুটি ধরিয়ে দিলে রাগ করে। পাপিয়াকে তো তুমি কাছ থেকে দেখছ—তার মস্তবড় ত্রুটি কী বল তো?'

'জানি না। মানুষের ত্রুটি দেখে বেড়ানো আমার স্বভাব না'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি দেখি ভালই রেগেছ।'

'আপনি ভুল করেছেন। আমি রাগিনি। এই দেখুন আমি এখন হেঁটে হেঁটে দু'ভাবে মা'র কাছে যাব। এবং আর কখনোই আপনি আমার মধ্যে কুঁজো ভাব দেখবেন না।'

'একসেলেন্ট! তা হলে আমি এক কাজ করি—গতদিন তোমার যতগুলি শট নিয়েছিলাম সেগুলি আবার নেই?'

'নিন। আজকেরটা নেবেন না?'

'না, আজকেরটা নেব না। আজকের দৃশ্যটি ঠিকই আছে। মাথা নিচু করে দৌড়াচ্ছিলে, দেখতে ভাল লেগেছে।'

'আমি যাই।'

'তুমি আরো কিছুক্ষণ থাক তারপর যাও। বি নরম্যাল।'

'আমি নরম্যাল আছি।'

'এসো অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলি।'

'কোন প্রসঙ্গ?'

'ফরহাদকে নিয়ে যে নাটকটা হল, সেই নাটকটা তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল লাগেনি।'

'নাটকটা যখন শুরু হল তখন কি তার শেষ কী হবে তুমি আঁচ করতে পারছিলে?'

'জি না। তবে বুঝতে পারছিলাম যে ভয়াবহ কিছু হবে না। আপনি তা হতে দেবেন না।'

'আমি হতে দিতাম না তা ঠিক না, আমি হতে দিতাম। আমাদের জীবনে নাটকীয় মুহূর্ততো খুব বেশি তৈরি হয় না। অল্প অল্প হয়। যখনই হয় আমি মজা করে লক্ষ্য করি।

'ও।'

'ব্যাপারটা মনে হয় তোমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'আমার পছন্দ-অপছন্দেতো কিছু যাচ্ছে আসছে না।'

'তারপরেও আমাদের পছন্দ-অপছন্দ থাকে। কদম ফুল অনেকের পছন্দ, অনেকের পছন্দ না। তারপরেও কিন্তু কদম গাছ থাকে এবং বর্ষায় কদম ফুল ফোটে। কদম ফুল মানুষের পছন্দ-অপছন্দের তোয়াক্কা করে না। ঠিক বলেছি?'

'জি বলেছেন।'

'ফরহাদ যখন তার প্যান্টের জিপার খোলার উপক্রম করল তখন তোমার কী মনে হয়েছিল বল।'

'জানাটা কি খুব প্রয়োজন?'

'হ্যাঁ প্রয়োজন।'

'আমার মনে হচ্ছিল জাহেদার কথাই বোধ হয় ফলে যাচ্ছে। এখানে অভিনয় হবে না। ছবি বন্ধ হয়ে যাবে এবং একজন মারা যাবে।'

'তার মানে কী? জাহেদা কে?'

'জাহেদার ব্যাপার আপনি জানেন না?'

'না।'

'জাহেদা হচ্ছে হাফিজ আলির স্ত্রী। এই গ্রামের একটা বৌ। তার অসাধারণ ক্ষমতা। জেন ডিক্সনের মতো সে ভবিষ্যৎ বলতে পারে। সে আমাদের সম্পর্কে একটা ভবিষ্যৎবাণী করেছে।'

'কী ভবিষ্যৎবাণী?'

'এখানে শুটিং শেষ পর্যন্ত হবে না। আমাদের মধ্যেই একজন কেউ মারা যাবে। সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যাবে।'

ডিরেক্টর সাহেব আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে সামান্য চিন্তিত মনে হচ্ছে। গ্রামের সামান্য একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ বাণীতে তিনি চিন্তিত হবেন কেন আমি বুঝতে পারছি না। আমি বললাম, "এখন যাই?" তিনি হ্যাঁ-না কিছু বললেন না।

আমি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মায়ের কাছে চলে এলাম। মওলানা সাহেব এখন নেই। আছর নামাজের সময় হয়েছে, তিনি হয়তো মসজিদের খোঁজে গেছেন। মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, মঈন ভাই তোর সঙ্গে কী এত কথা বলছিলেন?

'আমার খুব প্রশংসা করছিলেন মা।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, তিনি বললেন—আমি যে কুঁজো হয়ে হাঁটি এটা দেখতে খুব ভাল লাগে।'

মা হতভম্ব হয়ে বললেন, তুই আবার কখন কুঁজো হয়ে হাঁটিস? কী অদ্ভুত কথা!

'অদ্ভুত হলেও কথা সত্যি।'

'আর কী কথা হল?'

'আর কোনো কথা হয়নি।'

'বল না! বলতে অসুবিধা কী?'

'বললাম তো মা, আর কোনো কথা হয়নি। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না উনি আমাকে প্রেমের কথাবার্তা বলছেন—লক্ষ্মীসোনা, চাঁদের কণা, কুটুস কুটুস, পুটুস পুটুস।'

'ছি বকুল! এইসব কী ধরনের কথা!'

'ফাজলামি ধরনের কথা, গুরুত্ব দিও না মা।'

'একবার দেখলাম মঈন ভাই কী একটা কথা বলে খুব হাসছেন। কথাটা কী?'

'মা শোন, আমার মনে নেই। উনি হেসেছেন কি না তাও মনে নেই। তুমি আমাকে আর বিরক্ত করো না। উনি আমাকে কুঁজো বলেছেন, আমার মন খুবই খারাপ। তুমি অকারণ কথা বলে সেই মন খারাপ ভাবটা আর বাড়িও না।'

'তোকে কুঁজো বলবে কেন?'

'কুঁজোকে তো কুঁজোই বলবে, অন্ধ বলবে না।'

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। আমরা মনে হচ্ছে এখন রওনা হব। মা'র পাশাপাশি আমি হাঁটতে চাচ্ছি না। মা'র পাশে থাকলেই তিনি ঘুরেফিরে জানতে চাইবেন ডিরেক্টর সাহেব সঙ্গে আমার কী কথা হল।

'বকুল!'

'হুঁ।'

'কোত্থেকে এই মওলানা জুটেছে বল তো! ক্রমাগত আমার কানের কাছে বকবক করছিল। কয়টা দোজখ আছে, দোজখের নাম কী এইসব হাবিজাবি—'

'তাই নাকি?'

'হুঁ। জাহান্নাম, হাবিয়া, জাহিম, লাযা...এইগুলি হচ্ছে দোজখের নাম।'

'ভাল তো, দোজখের সব নাম জেনে গেলে।'

'তুই চোখমুখ এমন শক্ত করে রেখেছিস কেন?'

'আমার খুবই কান্না পাচ্ছে। কান্না আটকে রেখেছি বলে চোখমুখ শক্ত হয়ে গেছে।'

'কান্না পাচ্ছে কেন?'

'উনি আমাকে কুঁজো বলবেন, আমার কান্না পাবে না?'

মা কোমল গলায় বললেন—নদীর পারে চলে যা। লোকজন নেই, কেউ দেখবে না। সেখান থেকে কেঁদে আয়।

আমি নদীর কাছে যাচ্ছি। মাথা সোজা করে যাচ্ছি। সত্যি সত্যি কাঁদার জন্যে যাচ্ছি, আমার চোখে পানি নেই। জানি পানি আসবে না। আয়োজন করে কাঁদা যায় না। নির্জন একটা জায়গায় কাঁদব বলে গেলাম। সঙ্গে রুমাল নিয়ে গেলাম—এইভাবে কি আর কেউ কাঁদে?

সোমেশ্বরী নদী—নাম শুনলে মনে হয় বিশাল ব্যাপার, বিশাল নদী। আসলে ছোট্ট ফিতার মতো নদী। হেঁটে এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে যাওয়া যায়। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভেজে।

বর্ষায় এই নদী নাকি প্রমত্ত হয়। পাহাড়ি পানি নেমে ভয়াবহ কাণ্ড করে বসে। সোমেশ্বরী নদীর ভয়ে মানুষজন আতঙ্কগ্রস্ত থাকে। কোনো এক বর্ষায় এসে নদীটা দেখে গেলে হত।

নদীর বুক জুড়ে বিশাল চর। ধবধবে শাদা বালি চকচক করছে। এরকম কোনো নদী দেখেই কি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে—বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে...।

৮

ফরহাদ সাহেব ঢাকা চলে গেছেন। যাবার আগে সবার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেছেন। নিজের কাজ কর্মের জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন। সেলিম ভাইকে বইয়ের ভাষায়, কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছেন, ছবির ভুবনে তোমার আগমন সুন্দর হোক, শুভ হোক। এখানেই শেষ না, সেলিম ভাইকে পাশে নিয়ে ছবি তুলেছেন। ছবি তোলার সময় বাঁ হাত তুলে দিয়েছেন সেলিম ভাইয়ের কাঁধে। সেলিম ভাই বেচারার বিব্রত মুখ দেখার মতো ছিল।

ইউনিটের গাড়ি তাঁকে ঢাকা পৌঁছে দেবার জন্যে যাচ্ছিল। তিনি তা নিলেন না। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, এখানে কত কাজ, শুধু শুধু একটা গাড়ি আমি ঢাকা নিয়ে যাব কেন? বাসে উঠে চলে যাব। জনগণের সঙ্গে মেশাও হবে। মেশা তো হয় না। রাজনৈতিক নেতারা যেমন গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন আমরা ছবির জগতের মানুষরাও তেমনি গণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এটা ঠিক না। আমি ঠিক করেছি যখনই সুযোগ পাব—জনগণের সঙ্গে মেশার চেষ্টা করব।

ফরহাদ সাহেব জনগণের সঙ্গে মেশার তেমন সুযোগ পেলেন না। সোহরাব চাচা ভাড়া করা মাইক্রোবাস এনে ফরহাদ সাহেবের কানে কানে কী যেন বললেন। ফরহাদ সাহেব হাসি মুখে মাইক্রোবাসে উঠে বসলেন। জনতার সঙ্গে মিশে যাবার কথা আর তাঁর মনে রইল না। সোহরাব চাচা কী বলেন যে এমন মন্ত্রের মতো কাজ করে? জোঁকের মুখে লবণ পড়ার অবস্থা হয়। আমি সোহরাব চাচাকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, মা শোন, মানুষও জোঁকের মতোই। তাদেরও লবণ আছে। একেক মানুষের জন্যে একেক ধরনের লবণ। ফরহাদ সাহেবের জন্যে যে লবণ সেই লবণ কিন্তু অন্য কোনো সাহেবের জন্যে কাজ করবে না। আমি বললাম, আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের জন্যে কী লবণ?

সোহরাব চাচা হাসলেন। আমি বললাম, আপনি জানেন, না-কি জানেন না?

'আমি জানি।'

'আমাকে বলবেন?'

'না।'

'ফরহাদ সাহেবের লবণটা কী তা বলবেন?'

'উঁহু'

'কোন মানুষের কী লবণ তা বের করা কি আপনার হবি?'

'হবি নারে মা, যে লাইনে কাজ করি এই লাইনে লবণ জানা থাকলে খুব সুবিধা হয়।'

'চাচা, বলুনতো আমার লবণটা কী?'

সোহরাব চাচা হাসলেন। হাসার ভঙ্গি দেখেই মনে হচ্ছে তিনি জানেন। আমি বিস্মিত হলাম। আমারো যে লবণ আছে আমি তা জানতাম না। সোহরাব চাচা কি আসলেই জানেন?

আমাদের শুটিং আপাতত বন্ধ।

ফিল্মের ভাষায় প্যাক আপ হয়ে গেছে। কখন বা কবে শুরু হবে কেউ বলতে পারছে না। পাপিয়া ম্যাডাম হুট করে ঢাকা চলে গেছেন। তাঁর মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পা পিছলে পড়ে দাঁত ভেঙে ফেলেছে। খবরটা যখন এল তখন তাঁর শট নেয়া হচ্ছে। আমি, পাপিয়া ম্যাডাম এবং মিজান সাহেব। দৃশ্যটা এ রকম—ডাকবাংলোর বাইরে আমরা তিনজন ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছি। দূরে গারো পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আমার হাতে একটা পিরিচ। পিরিচে আচার। আমি আচার খেতে খেতে জামিল ভাইয়ের কথা শুনছি। আমার হাতে আচার থাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে। কনটিনিউইটির সমস্যা। কখন মুখে আচার থাকবে, কখন হাতের আঙুলে, লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। জামিল ভাই (মিজান সাহেব) ভূতের গল্প করছেন। মূল চিত্রনাট্যে দৃশ্যটি রাতের। কিন্তু এখন করা হচ্ছে সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় দূরের গারো পাহাড় আবছা হলেও দেখা যায়।

জামিল ভাই হাত-টাত নেড়ে খুব মজা করে গল্প করছেন। আমি চোখ বড় বড় করে শুনছি। গল্পের খুব সিরিয়াস অবস্থা, হঠাৎ নিশাত আপা (পাপিয়া ম্যাডাম) উঠে দাঁড়াবেন এবং কাউকে কিছু না বলে ডাকবাংলোয় চলে যাবেন। জামিল ভাই বিস্মিত হয়ে বলবেন, দিলু ও এমন হুট করে চলে গেল কেন?

আমি বলব, "মনে হয় গল্প শুনে ভয় পেয়েছে। জামিল ভাই আপনি বলতে থাকুন। আমি শুনছি।" জামিল ভাই বলবেন, আজ থাক আরেক দিন বলব।

আমি আহ্লাদী গলায় বলব, "না এখন বলতে হবে।" জামিল ভাই মোটামুটি রুক্ষ গলায় বলবেন, "বিরক্ত করো নাতো।" বলেই তিনি উঠে চলে যাবেন।

জামিল ভাইয়ের কঠিন আচরণে আমার চোখে পানি চলে আসবে। দৃশ্যটা শেষ হবে চোখের জলে।

পাপিয়া ম্যাডামের মেয়ের দাঁত ভাঙার খবরটা দৃশ্যের শুরুতেই এল। পাপিয়া ম্যাডামের চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেন, দৃশ্যটা শেষ হলে আমি ঢাকায় চলে যাব। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আচ্ছা। টেক শুরু হল। খুব সুন্দর অভিনয় করলেন পাপিয়া ম্যাডাম। মিজান সাহেবের অভিনয় আমার তত ভাল লাগল না। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, মিজান তোমার অভিনয় ঠিক জমছে না। কারণটা কী?

মিজান সাহেব বললেন, আমিতো বুঝতে পারছি না।

'টোন ডাউন করবে?'

'আপনি বললে করি।'

'তাহলে টোন ডাউন কর। তোমার গল্প শুনে মনে হচ্ছে তুমি ছোট ছোট বাচ্চাদের ভূতের গল্প বলছ—আসলে তোমার টার্গেট শ্রোতা হচ্ছে একজনই, নিশাত। তুমি গল্পটা বলছ দিলুর দিকে তাকিয়ে কিন্তু মন পড়ে আছে নিশাতের কাছে। নিশাতের গাছে গল্পটা কেমন লাগছে এটা নিয়েই তুমি কনসার্নড।'

টেক আবার শুরু হল। মিজান সাহেব আগের মতোই অভিনয় করলেন তবে হাত নাড়াটা একটু কমল। সব শেষ করে আমরা রেস্ট হাউজে ফিরলাম সন্ধ্যা পার করে। পাপিয়া ম্যাডাম সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা রওনা হলেন। কবে ফিরবেন কাউকে কিছু বলে গেলেন না। আমাকে শুধু বললেন, তোমার জন্যে কি ঢাকা থেকে কিছু আনতে হবে?

আমি বললাম, না।

'গল্পের বই? গল্পের বই কি আনব?'

'আনতে পারেন। সবচে ভাল হয় যদি আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন।'

'ওকে আমি শুটিং স্পটে আনি না।'

পাপিয়া ম্যাডামের গাড়ি রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কেন জানি মনে হল জাহেদার কথা ফলে যাবে। দুর্গাপুরে আর কখনো শুটিং হবে না। উনি ফিরে আসবেন না। আমরা দু'চারদিন অপেক্ষা করে ঢাকায় ফিরে যাব।

মা'র শরীর খুবই খারাপ করেছে। নানান ধরনের অসুখ বিসুখ তাঁর হয়। একটা কমলে আরেকটা শুরু হয়। অসুখ ছাড়া অবস্থায় তিনি কখনো থাকেন না। যে সব অসুখ তাঁর সারা বছরই থাকে সেগুলি হচ্ছে—

বুক ধড়ফড়
শ্বাসকষ্ট
আধকপালি মাথা ধরা
মাথা ঘোরা
বমি ভাব
বুক জ্বালা
কাশি
টনসিলের ব্যথা
জ্বর।

আজ তাঁর পুরোনো অসুখের কোনোটা তাঁকে ধরেনি—তাঁর পা ফুলে গেছে। তিনি বিছানা থেকে নামতেও পারছেন না। কাশবনের শুটিং দেখতে যাওয়ায় তাঁকে আট কিলোমিটারের মতো হাঁটতে হয়েছে। আমার ধারণা এই হাঁটাই তাঁর কাল হয়েছে। শারীরিক কষ্ট তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। অসুখ বিসুখের সময় কাউকে না কাউকে তাঁর পাশে থাকতে হবে। পাশে থাকার এই অংশটা আমার কাছে অসহ্য লাগে। মা অনবরত কথা বলতে থাকেন। সেইসব কথাবার্তার বেশিরভাগই অর্থহীন। দু'তিন মিনিট পরপর তিনি অস্থির হয়ে ডাকবেন—বকু, বকু ও বকু। ভাবটা এ রকম যেন ভয়ংকর কিছু ঘটে যাচ্ছে। আমি ছুটে যাব, তিনি বলবেন—মাথার নিচের বালিশটা ঠিক করে দেতো মা। বালিশ ঠিক করার এই কাজটা তিনি নিজেই পারেন—নিজে করবেন না। অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন।

পাপিয়া ম্যাডাম চলে যাওয়ায় আমার কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আমি জোনাকি পোকার আলো জ্বলা দেখার জন্যে বারান্দায় বসে আছি এবং মজার একটা কাজ করার চেষ্টা করছি—জোনাকি পোকার ঝাঁকে মোট কতগুলি জোনাকি পোকা আছে তা গোনার চেষ্টা করছি। কাজটা যত কঠিন মনে হচ্ছে আসলে তত কঠিন না। ঝাঁকের জোনাকি পোকারা জায়গা বদল করে না। তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ওড়ে ঠিকই কিন্তু একজনের সঙ্গে অন্যজনের দূরত্ব ঠিকই রাখে। আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম আলো জ্বলা-নেভা একেক জোনাকির একেক সময়ে হলেও যখন তারা স্থির হয়ে থাকে তখন আলো জ্বলা-নেভার মধ্যে এক ধরনের শৃঙ্খলা চলে আসে। সবাই এক সঙ্গে আলো জ্বালে এক সঙ্গে নেভায়।

'বকু বকু বকু।'

আমি বিরক্ত মুখে উঠে গেলাম। জোনাকি গোনা হল না। মা নিতান্ত অকারণে ডাকছেন। তাঁর মহা উদ্বিগ্ন গলার স্বরই বলে দিচ্ছে—অকারণে ডাকাডাকি।

'বকু মা, দেখতো আমার পায়ে পানি এসেছে কি-না।'

'পানি আসা বুঝব কী করে?'

'পায়ে আঙুল দিয়ে শক্ত করে চাপ দে। দেখবি গর্ত হয়ে যাবে। আঙুল সরিয়ে দে। গর্ত যদি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে পানি আসেনি। আর যদি সময় বেশি নেয় তাহলে পানি এসেছে।'

আমি টিপাটিপি করে বললাম, পানি আসেনি মা। মনে হয় বরফ এসেছে। গর্তই করতে পারছি না।

মা কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। কন্যার রসিকতা তাঁর ভাল লাগছে না। আমি বললাম, মা যাই, আমি জরুরি একটা কাজ করছি।

'জরুরি কাজটা কী?'

'জোনাকি পোকা গুনছি।'

'এইটা তোর জরুরি কাজ?'

'হুঁ।'

'অসুস্থ মায়ের কাছে বসে ভাল মন্দ দু'একটা কথা বলা জরুরি না?'

'আচ্ছা যাও বসলাম। তুমি ভালমন্দ কথা বল আমি শুনি।'

'পাপিয়া চলে গেছে?'

'হুঁ।'

'যাবার আগে দেখলাম গুজগুজ করে তোকে কী সব বলছে। কী বলেছে?'

'গোপন একটা কথা বলে গেছেন মা। তোমার না জানলেও চলবে।'

'যন্ত্রণা করিস না, কী বলেছে বল।'

'ম্যাডাম বললেন—বকুল ডিয়ার, আমি আমার কৃষ্ণকে তোমার হাতে আপাতত দিয়ে গেলাম। তুমি তাকে দেখে শুনে রাখবে। সঙ্গ দেবে।'

'আমি তোর মা না? আমার সঙ্গে অশ্লীল কথা বলতে তোর মুখে আটকায় না?'

'অশ্লীল কথাতো মা কিছু না। তাছাড়া তোমার কাছে অশ্লীল লাগলেও কিছু করার নেই। পাপিয়া ম্যাডাম আমাকে যাই বলেছেন আমি তাই তোমাকে বললাম। তুমি যদি শুনতে না চাইতে তাহলে আর অশ্লীল কথাগুলি তোমাকে শুনতে হত না।'

'পাপিয়া এ রকম কোনো কথাই বলেনি। সে জিজ্ঞেস করছিল—তোর জন্যে গল্পের বই আনবে কি-না।'

'তাহলেতো তুমি জানই কী জিজ্ঞেস করেছিল—তারপরে জানতে চাচ্ছ কেন?'

'খুব দোষ করেছি। এখন কী করতে হবে? পা ধরতে হবে?'

মা রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেললেন। কাজেই হাসি মুখে আমি বসলাম তাঁর পাশে। এখন মা'র সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায়। আদুরে ভঙ্গি করা যায়। তাঁর গায়ে-মুখে নাক ঘষা যায়। আমি আদুরে গলায় বললাম, কেমন আছ মা?

'যা, ঢং করিস না।'

'ও আল্লা তোমার সঙ্গে ঢং করব নাতো কার সঙ্গে ঢং করব? সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে?'

'আবার ফাজলামি? ঐ বাঁদরটার নামও মুখে আনবি না।'

'আচ্ছা যাও মুখে আনব না। পা ব্যথা করছে? টিপে দেব?'

'বললাম না ঢং করবি না।'

মা'র রাগ পড়ে গেছে। তাঁর মন ভর্তি হাসি। সেই হাসি এখনো মুখ পর্যন্ত আসেনি—তবে এসে যাবে।

'বকু!'

'কি-কু?'

'উফ, আবার ঢং। এত ঢং তোকে কে শিখিয়েছে?'

'বেশিরভাগই নিজে নিজে শিখেছি। কিছু শিখেছি পাপিয়া ম্যাডামের কাছ থেকে।'

'কী রকম বদ মেয়ে দেখলি?'

'পাপিয়া ম্যাডামের কথা বলছ?'

'আর কার কথা বলব? সামান্য চক্ষুলজ্জাও মেয়েটার নেই। মানুষের চোখে সাত পর্দা লজ্জা থাকে। তার এক পর্দাও নেই। তার মেয়ের কী না কী হয়েছে, সব ফেলে-ফুলে ছুটে চলে গেছে।'

'নিজের মেয়ের বিপদে ছুটে যাবে না? তুমি ছুটে যেতে না?'

'এতদিন পর নিজের মেয়ে বলছে কেন? শুরুতে পত্রিকায় কত ইন্টারভ্যুয়ে বলেছে—এ আমার মেয়ে না। পালক কন্যা। তখন সে ভয়ে অস্থির, লোকজন যদি জানে মেয়ে হয়ে গেছে তখন নায়িকার ইমেজ নষ্ট হবে। লোকজন সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখবে না।'

'এই মেয়ে তাঁর নিজের না—তিনি পত্রিকায় এমন ইন্টারভ্যু দিয়েছিলেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ৫০১ www.amarboi.com ~

'অবশ্যই দিয়েছে। আমি নিজে পড়েছি। বুঝলি বকু, ফিল্ম-লাইন বড়ই জটিল।'

'তুমি এই জটিল লাইনে তোমার মেয়েকে ঢুকাচ্ছ কেন? এখনো কিন্তু সময় আছে।'

'কী সময় আছে?'

'তুমি তোমার মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও। ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দাও। চাকরিজীবী স্বামী। দশটা পাঁচটা অফিস করবে। ভেড়ুয়া টাইপ। মাঝে মধ্যে লোভে পড়ে বন্ধুর সঙ্গে তাশ-টাশ খেলতে যাবে। তখন আমি খুব বকাঝকা করব। ঈদের বোনাস যেদিন পাবে তার পরদিনই তাকে নিয়ে ঈদের শাড়ি কিনতে যাব। কেনাকাটা শেষ হবার পর কোনো একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়ে দু'জন মিলে এক বাটি থাই সুপ খাব। ফুল কোর্স খাবার মতো পয়সাতো আমাদের থাকবে না কাজেই শুধু সুপ।'

'তুই ভ্যার ভ্যার করে এইসব কী বলছিস?'

'কেন, তোমার কি শুনতে ভাল লাগছে না?'

'অসহ্য লাগছে।'

'কফি খাবে মা?'

'এখন কফি কোথায় পাবি?'

'ইউনিটকে বলব কফি দিতে। এক নম্বর নায়িকার অনুপস্থিতিতে আমিইতো এক নম্বর। খাবে কফি?'

'তুই কফির কথা বলবি তারপর ওরা দেবে না, সেটাতো খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।'

'তুমি চুপ করে শুয়ে থাক, আমি কফি নিয়ে আসছি। তারপর আমরা মা-মেয়ে দু'জন কফির কাপ হাতে পরচর্চা করব। পাপিয়া ম্যাডামকেতো ধরা হয়েছে, কফি খেতে খেতে আমরা ডিরেক্টর সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করব। উনাকে তুলোধোনা করে ছাড়ব।'

'বকুল, ফাজলামি ধরনের কথা তুই একদম বলবি না।'

'আচ্ছা যাও বলব না, তুমি ঝিম ধরে পড়ে থাক, আমি কফি নিয়ে আসছি।'

'চিনি কম দিতে বলবি, গাদাখানিক চিনি যেন না দেয়।'

আমি মা'র ঘর থেকে বের হয়ে আবার কিছুক্ষণ জোনাকি গোনার চেষ্টা করলাম। গোনা যাচ্ছে না—যতবার গুনতে শুরু করি ততবারই ওরা গাছের আড়ালে চলে যায়। এরা কি কোনোভাবে বুঝতে পারছে আমি এদের গুনতে চেষ্টা করছি? টেলিপ্যাথিক কোনো যোগাযোগ? কফির কথা বলার জন্যে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছি, সোহরাব চাচার সঙ্গে দেখা। তিনি মন খারাপ করে বসে আছেন। আমাকে দেখেই হাত ইশারা করলেন। আমি হাসি মুখে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, চাচা মন খারাপ কেন?

'মন খারাপ না, ব্যথা উঠেছে।'

'ব্যথা উঠেছে মানে! কিসের ব্যথা উঠেছে?'

'আমার একটা কলিক ব্যথা আছে—ডান পেটে হয়। মাঝে মধ্যে হয়।'

'আলসার নাকি?'

'না—আলসার না, ডাক্তার দেখিয়েছি—তারা আলসার না এটাই শুধু বলে আর কিছু বলে না। তুমি রান্নাঘরে ঘুরঘুর করছ কেন?'

'কফির সন্ধানে এসেছি চাচা—কফি কি পাওয়া যাবে?'

'অবশ্যই পাওয়া যাবে। কেন পাওয়া যাবে না!'

'তিন কাপ কফি লাগবে।'

'তিনজন কে?'

'মা'র জন্যে এক কাপ, আমার জন্যে এক কাপ এবং আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের জন্যে এক কাপ।'

'স্যার কি কফি চেয়েছেন? তিনি তো এই সময় কফি খান না।'

'না, উনি কফি চাননি—তবু আমি ভাবছি এক কাপ কফি তাঁর কাছে নিয়ে বলব, আপনার জন্যে কফি এনেছি।'

'কেন?'

'উনি আমার খুব প্রশংসা করেছেন। আমার প্রশংসা মানে আমার অভিনয়ের প্রশংসা। যখন প্রশংসা করছিলেন—তখন লজ্জায় কথা বলতে পারিনি। এখন লজ্জা একটু কমেছে। এখন ঠিক করেছি—কফির কাপটা উনার হাতে দিয়ে বলব—'থ্যাংক য়্যু।'

তাঁর কোনো দরকার নেই। স্যারের সঙ্গে আমার যখন দেখা হবে তখন আমি বলে দেব।'

'কী বলে দেবেন?'

'বলব যে মিস রুমালী আপনার প্রশংসায় খুব খুশি হয়েছে।'

'আমি কতটা খুশি হয়েছি সেটাতো আপনি বলতে পারবেন না। কাজেই কফির কাপ নিয়ে আমাকেই যেতে হবে। তবে আপনি যদি মনে করেন উনার কাছে একা একা যাওয়া বিপজ্জনক তাহলে ভিন্ন কথা।'

'বিপজ্জনক হবে কেন?'

'আমারওতো সেটাই কথা, তবে উনার কাছে কফি নিয়ে যাচ্ছি শুনে আপনি যেভাবে চমকে উঠলেন সেখান থেকে ধারণা হল—হয়ত উনার কাছে যাওয়া বিপজ্জনক। উনি হয়তোবা ঘাতক ট্রাক। আমার মতো মেয়েদের একশ' হাত দূরে থাকা দরকার।'

সোহরাব চাচা শুকনো মুখে বললেন, তুমি অপেক্ষা কর। কফি বানানো হোক তুমি নিয়ে যাবে।

'থ্যাংক য়্যু।'

'তোমার মা'র শরীরের অবস্থা কী?'

'অবস্থা বেশি ভাল না, মানুষের আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়, মা'র পা ফুলে বটগাছ হয়ে গেছে।'

'যাও মা'র কাছে গিয়ে বোসো। কফি তৈরি হলে তোমাকে খবর দেব।'

'আমি মা'র কাছে বসব না। উঠানে হাঁটাহাঁটি করব। আপনি মা'র কফি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

আমি উঠোনে নেমে এলাম। জোনাকি পোকার ঝাঁকের দিকে এগুচ্ছি। হাতে একটা টর্চ লাইট থাকলে হত। ওদের গায়ে আলো ফেলে দেখতাম ওরা কী করে। সব অন্ধকারের পোকাই আলোকে ভয় করে। ওরা কী করবে—আলো নিয়ে যাদের চলা ফেরা তারা আলোকে ভয় করবে কেন?

ডিরেক্টর সাহেবের ঘরের দরজা খোলা। আমি দু'কাপ কফি হাতে দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ আগে খুব ছেলেমানুষি একটা কাজ করেছি—"আই লাভ ইউ" "আই লাভ ইউ" বলে উনার কফির কাপে ফু দিয়ে দিয়েছি। ভাবটা এ রকম যেন এই কফি খেলেই উনি বুঝতে পারবেন রুমালী নামের একটা মেয়ে তাঁর জন্যে অস্থির হয়ে আছে। ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না, আবার চলেও যেতে পারছি না। হাতের কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিলে তাঁর নিশ্চয়ই মেজাজ খারাপ হবে। আমি তাঁর মেজাজ খারাপ করতে চাই না। ঘরের ভেতর গান হচ্ছে—ইংরেজি গান। সুরটা সুন্দর, কথাগুলি পরিষ্কার। এই গানটা তাঁর ঘরে আগেও বাজতে শুনেছি। নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় গান। গানটা গলায় তুলে নিতে পারলে ভাল হয়। তাঁর আশেপাশে যখন থাকব তখন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দু'লাইন গেয়ে ফেলব। তিনি চমকে বলবেন—আরে, তুমি এই গান কোথায় শিখলে? আমি জবাব দেব না, মুখ টিপে হাসব। হাসার সময় আমার থুতনিটা ভেতরের দিকে রাখব। কারণ ক্যামেরাম্যান বলেছেন আমাকে সবচে সুন্দর দেখা যায় যখন আমার থুতনি ভেতরের দিকে থাকে। মুশকিল হচ্ছে ইংরেজি গানগুলি সহজে গলায় বসতে চায় না। মনে হয় গানগুলিরও নিজস্ব জীবন আছে। এরাও গাছের মতো। এক মাটির গাছ অন্য মাটিতে বাঁচে না। এক দেশের গান অন্য দেশের মেয়ের গলায় বসে না। আমি কান পেতে আছি—গানের কথাগুলি ধরতে পেরেও পারছি না।

Down thy way
Where the nights are gay
And Sun Shines daily on the mountain top.
I took a trip
On a sailing ship
And When I reached Jamaica I made a stop.
But I am sad to say
I am on my way
won't be back for many a day

আমি দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি চেয়ারে বসে। তাঁর হাতে কী একটা বই। মনে হচ্ছে বইটা খুব মন দিয়ে পড়ছিলেন। মাথা বই-এ ঝুঁকে আছে। তিনি মাথা তুলে আমাকে দেখে বললেন—"এই যে বকুল। এসো।" যেন তিনি জানতেন আমি কফি নিয়ে আসছি। কফির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমি জানি তিনি খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার হাত থেকে কফির কাপ নেবেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির স্বরে বললেন—Excellent কফি। মানুষটা সব সময় স্বাভাবিক, এইটাই তাঁর বিশেষত্ব। কিংবা কে জানে এটা হয়ত কোনো বিশেষত্ব না। আমি মানুষটার উপর বিশেষত্ব আরোপ করতে চাইছি বলে এরকম ভাবছি।

তিনি হাত থেকে কফির কাপ নিয়ে বললেন, দেখেই মনে হচ্ছে কফিটা চমৎকার। তিনি আগ্রহের সঙ্গে চুমুক দিলেন এবং তৃপ্তির স্বরে বললেন, Excellent. তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমিও কফির কাপে চুমুক দিলাম। মোটেই Excellent কিছু না। ঠাণ্ডা তিতকুটে একটা বস্তু।

'বকুল তোমার খবর কী?'

'জি, খবর ভাল।'

তিনি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করতে করতে বললেন, আমার মেজাজ যে কী রকম খারাপ সেটা কি বোঝা যাচ্ছে?

'জি না।'

'খুবই খারাপ। শুটিং পুরোপুরি বন্ধ করে বসে আছি। আবার কবে শুরু হবে সেটাও বুঝতে পারছি না। ফরহাদ আমাকে একটা চিঠি লিখে গেছে—সেই চিঠি পড়লে যে-কোনো স্বাভাবিক মানুষের ব্রেইন ডিফেক্ট হবার কথা...।'

'আপনার হচ্ছে না?'

'মানুষ হিসেবে আমি বোধ হয় খুব স্বাভাবিক না। ফরহাদের চিঠি একবার পড়েছি—পড়ে ফাইলে রেখে দিয়েছি।'

আমার চিঠিটা খুব পড়তে ইচ্ছ' করছে। পড়তে চাইলে তিনি আমাকে পড়তে দেবেন কি-না তা বুঝতে পারছি না। মানুষটাকে আমি এখনো তত ভালভাবে জানি না। আমি কেন তাঁর ঘরে এসেছি তিনি কি তা জানেন? আমার অস্থিরতা কি তিনি বুঝতে পারছেন? তাঁকে কিছুই জানতে দেয়া যাবে না। কাজেই আমাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে অতি দ্রুত কোনো একটা অজুহাত বের করতে হবে। তাঁর ঘরে আসার পেছনে বিশ্বাসযোগ্য কো অজুহাত। কিছু মাথায় আসছে না। সবচে বড় সমস্যা হবে তিনি নিজে থেকে যদি জিজ্ঞে করে ফেলেন—"বকুল আমার কাছে কেন এসেছ?" এটা জিজ্ঞেস করা মানেই হল তাঁর মনে খটকা লেগেছে। আর তখন যদি আমি কোনো জবাব দিতে না পারি তখন সেই খটকা আরো বাড়বে।

'বকুল!'

'জি।'

'আমার কাছে কি কোনো কাজে এসেছ না এম্নি গল্প করতে এসেছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি মাথা নিচু করে বললাম, আমাকে মা পাঠিয়েছে।

'ও আচ্ছা।'

'মা'র ধারণা কফি নিয়ে আপনার কাছে যদি আসি আপনি খুব খুশি হবেন। আপনি খুশি হলে আমার জন্যে খুব সুবিধা হবে। আপনার পরের ছবিতেও হয়ত আমি সুযোগ পাব। সুযোগ সুবিধার ব্যাপারগুলি মা খুব ভাল বোঝেন।'

তিনি হাসছেন। যাক, আমার কথাটা তাহলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছে। অবশ্যি আমি যা বলার বিশ্বাসযোগ্যভাবেই বলেছি।

'মা'কে কি তুমি অপছন্দ কর?'

'না, উনাকে খুবই পছন্দ করি। উনার কিছু কিছু বোকামি আমার কাছে অসহ্য লাগে।'

'কিছু কিছু বোকামিতো সবার মধ্যে থাকবে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুদ্ধিমান বলে কিছু নেই। সব বুদ্ধিতেই খাদ মেশানো থাকে। কারও হচ্ছে আঠারো ক্যারেট বুদ্ধি, কারো বাইশ ক্যারেট।'

'আমি যে বসে আছি আপনার কি বিরক্তি লাগছে?'

'না, বিরক্তি লাগবে কেন?'

'লাগলেও কিচ্ছু করার নেই। মা বলে দিয়েছে আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে।'

'গল্প কর শুনি।'

'আমি গল্প করতে পারি না। আপনি গল্প করুন আমি শুনি। আপনার গল্প করতে ইচ্ছা না করলে গল্প করতে হবে না। আপনি আপনার কাজ করুন, বই পড়ুন। আমি কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে যাব—মা'কে গিয়ে বলব, মা অনেক গল্প করেছি, উনাকে গানও শুনিয়েছি। গান শুনে উনি খুব খুশি হয়েছেন।'

'তুমি গান জান?'

'জি, জানি।'

'তাহলে শোনাও একটা গান।'

'জি না, আমি গান শুনাব না। আমি মোটামুটি ধরনের গান জানি। যে আমার গান শোনে সে খুশিও হয় না আবার বিরক্তও হয় না। কাজেই আমার শুনাতে ইচ্ছা করে না।'

'ও আচ্ছা, তাহলে থাক।'

তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। আমি আমার মিথ্যা বলার ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। একবার মিথ্যা বলা শুরু করলে সত্যি বলা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমার বেলায় তাই হচ্ছে—আমি একের পর এক মিথ্যা বলে যাচ্ছি। আমার গান প্রসঙ্গে আমি যা বললাম তা পুরোপুরি মিথ্যা। গান আমি ভাল জানি—শুধু ভাল না, খুব ভাল। আমি জানি আমার গান শুনলেই তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। গানকে আমি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাই না।

'বকুল!'

'জি।'

'চুপ করে আছ কেন? কথা বল।'

'কথা খুঁজে পাচ্ছি না।'

'পাপিয়া, পাপিয়ার সঙ্গে তোমার কেমন পরিচয়?'

'মোটামুটি পরিচয়। উনি আমাকে পছন্দ করেন কি-না আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'তুমি পছন্দ কর?'

'না।'

'তুমি পছন্দ কর না কেন?'

'আমি জানি না। হিংসার কারণে হতে পারে।'

'তাকে হিংসা কর?'

'হুঁ।'

AMARBOI.COM

'কেন?'

'তিনি এত সুন্দর এই জন্যেই বোধ হয়। তাঁকে দেখলে আমার মোমবাতির কথা মনে হয়।'

'মোমবাতি কেন?'

'মোমবাতির মতো ধবধবে সাদা শরীর। মুখটা জ্বলজ্বল করছে। ঠিক যেন মোমবাতির শিখা।'

'মোমবাতির শিখা যত জ্বলে মোমবাতি ততই কিন্তু ক্ষয়ে যেতে থাকে, সেটা জান?'

'জানি। কিন্তু মানুষতো আসলে মোমবাতি না, সেই কারণে মানুষ ক্ষয় হয় না।'

'ভাল বলেছতো!'

'আপনি উনাকে খুব পছন্দ করেন?'

'হুঁ।'

'কেন, সুন্দর বলে?'

'সে যত-না সুন্দর, তার মন কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুন্দর। যেমন ধর, তার মেয়েটা ব্যথা পেয়েছে এই খবর শুনেই সে ছুটে চলে গেছে। মেয়েটা কিন্তু তার নিজের না।'

'নিজের না?'

'না, নিজের না, সে রফিক নামের একটা ছেলেকে বিয়ে করল। রফিক তখন মেরিল্যান্ডের একটা কোম্পানিতে কাজ করে। ছুটি কাটাতে দেশে এসেছিল। একটা পার্টিতে পরিচয়। পরিচয় থেকে দ্রুত বিয়ে। বিয়ের পর জানা গেল রফিক আমেরিকায় একটা ব্ল্যাক মেয়েকে বিয়ে করেছিল। তাদের একটি বাচ্চাও আছে। সেই বিয়ে টেকেনি। ডিভোর্স হয়ে গেছে। বাচ্চা মেয়েটিকে মা নেয়নি। বাবাও নিচ্ছে না। মেয়েটি দারুণ কষ্টে তার গ্রান্ডমা'র সংসারে আছে। মেয়েটিকে পাপিয়া নিজের কাছে নিয়ে এল। রফিকের সঙ্গেও তার বিয়ে টিকল না। রফিক তৃতীয় আরেকজনকে বিয়ে করল। রফিকের মেয়েটি রয়ে গেল পাপিয়ার কাছেই। কী আদর যে পাপিয়া মেয়েটিকে করে তা তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।'

'আর রফিক সাহেবের কাজ কি শুধু বিয়ে করে বেড়ানো?'

'ব্যাপারটা মোটামুটি সে রকমই দাঁড়াচ্ছে।'

'উনি কি খুব হ্যান্ডসাম—তাঁকে দেখামাত্রই কি মেয়েদের মাথা আউলা হয়ে যায়?'

'রফিক মোটেই হ্যান্ডসাম না। কাঠখোট্টা ধরনের চেহারা। তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললে মেয়েদের মনে একটা ঘোর অবশ্যই তৈরি হয়।'

'কেন?'

'আমি জানি না কেন। মেয়েরা বলতে পারে।'

'আপনার জানতে ইচ্ছা করে না!'

'না, আমার জানতে ইচ্ছা করে না।'

'আমি এখন উঠি?'

'আচ্ছা যাও। আশা করি তোমার মা মোটামুটি খুশিই হবেন যে বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়েছে।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবং কোনোরকম দ্বিধা ছাড়াই বললাম, আমি আপনার সঙ্গে সামান্য মিথ্যা কথা বলেছি। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কী মিথ্যা কথা?

'মা আমাকে আপনার কাছে পাঠাননি। আমি নিজেই এসেছি। আমার খুব একা একা লাগছিল—মন খারাপ লাগছিল। আমার মনে হচ্ছিল আপনার সঙ্গে কথা বললে মন খারাপ ভাব কমবে।'

'কমেছে?'

'জি না, কমেনি।'

'তাহলে বস আরো কিছুক্ষণ।'

'না।'

আমি উঠে চলে এলাম। দরজার ওপাশে এসে থমকে দাঁড়ালাম। আমার ধারণা ছিল আমার কাণ্ডকারখানায় উনি মোটামুটি স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। দেখা গেল আমার ধারণা ঠিক না। আমি ঘর থেকে বেরুবার সঙ্গে তাঁর ঘরের ক্যাসেট প্লেয়ার চলতে শুরু করল। দরজার ভেতর দিয়ে এক পলকের জন্যে তাকালাম—তিনি গভীর মনোযোগে বই পড়ছেন। কী এমন বই? উনার সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন বইটার নাম আমি পড়েছি—বইটার নাম 'Sula', লেখকের (না-কি লেখিকার?) নাম টনি মরিসন। বইটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললে আমার ভাল লাগত। একটা কাজ করলে কেমন হয়? আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি—উনি এক সময় কিছুক্ষণের জন্যে বই রেখে বাথরুমে যাবেন বা অন্য কোথাও যাবেন এই ফাঁকে আমি বই ছিঁড়ে কুচি কুচি করে চলে আসব। উনি ফিরে এসে হতভম্ব গলায় বলবেন—'একী?' আমার পক্ষে তা করা সম্ভব না। আমরা এমন জগতে বাস করি যে জগতে যে কাজটা খুব করতে ইচ্ছে করে সেই কাজটা কখনো করা যায় না। অনন্ত নক্ষত্র বীথিতে এমন কোনো গ্রহ কি আছে যে গ্রহের মানুষরা যা করতে চায় তাই করতে পারে?

আমি আবার উঠোনে চলে এলাম। জোনাকি গোনা যাক। মা'র কী অবস্থা কে জানে? তিনি নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমার অতি আদরের ঝিনুক মা। যিনি তাঁর ডানা খুলে রেখেছেন—আমি সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে যাব। ডালা যাবে বন্ধ হয়ে। আমি পরম নিশ্চিন্তে গুটিসুটি মেরে ঘুমিয়ে পড়ব। জগতের কোনো সমস্যাই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আশ্চর্য, একটাও জোনাকি পোকা নেই। বৃষ্টি হয় নি কিন্তু মাটির ভেতর থেকে ভেজা গন্ধ আসছে। এই গন্ধে শরীর ঝিমঝিম করে।

ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। এক একা হাঁটতেও ইচ্ছা করছে না, আবার অন্য কারো সঙ্গে ঘুরতেও ইচ্ছা করছে না। এই অবস্থাটাকে কী বলে? একা থাকতে ইচ্ছা করে না, আবার দোকা থাকতেও ইচ্ছা করে না। আমি মনে মনে গুনগুন করছি—

Down the way
Where the nights are gay...

সুরটা সুন্দর, একবার শুরু করলে মাথায় চলতে থাকে—

I took a trip
On a sailing ship.

নিজের গান শুনে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছি। নিজেকেই বলতে ইচ্ছা করছে—এই মেয়ে, তোমার গলা এত মিষ্টি কেন? খবর্দার মুখ হাঁ করে কখনো ঘুমুবে না। মুখ হাঁ করে ঘুমুলে মুখের ভেতর দিয়ে পিঁপড়া ঢুকে তোমার গলা খেয়ে ফেলবে।

কেউ একজন আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পারছি না, কিন্তু হাঁটার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে উনি সেলিম ভাই। সেলিম ভাইয়ের সাহস ভালই বেড়েছে। একটা মেয়ে একা একা হাঁটছে তিনি কেমন তার কাছে চলে আসছেন। এইভাবে ঘন ঘন আসতে থাকলে উনি বিরাট সমস্যায় পড়ে যাবেন। আরো ভালভাবে বললে বলতে হয়, যে সমস্যায় পড়েছেন তা আরো বাড়বে। দেখা যাবে সোমেশ্বরী নদীতে তিনিই ঝাঁপ দিলেন।

'বকুল কেমন আছ?'

'ভাল।'

'এখানে হাঁটাহাঁটি করা ঠিক না, ঘরে এসো।'

'হাঁটাহাঁটি করা ঠিক না কেন? ভূত আছে?'

'ভূত না, সাপ আছে। পাহাড়ি জায়গায় সাপ খুব ভয়ংকর হয়।'

'ঘরে যেতে ইচ্ছা করছে না। আপনি কেমন আছেন সেলিম ভাই?'

'ভাল।'

'আপনার অভিনয়তো শুনেছি খুব সুন্দর হচ্ছে।'

'সুন্দর-টুন্দর কিছু না। স্যার যা করতে বলছেন—করছি।'

'যা করতে বলছেন তা করতে পারছেন, এটাই হল অভিনয়।'

'আমার কারণে ফরহাদ সাহেবের সঙ্গে স্যারের এমন ঝামেলা হল এই জন্যও খারাপ লাগছে।'

খারাপ লাগার কিচ্ছু নেই। গণ্ডগোল হবার কথা ছিল হয়েছে। সবই কপালের লিখন। কপালের লেখা বদলানো যায় না। মওলানা সাহেব বলেছেন। মওলানা মেরাজ মাস্টার।'

'তাঁর সঙ্গে তোমার মনে হয় খুব খাতির?'

'আমার সঙ্গে সবারই খুব খাতির। মওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার খাতিরটা খুব কাজে লাগছে।'

'কী রকম?'

'ধর্মের অনেক ব্যাপার তাঁর কাছ থেকে শিখছি—যেমন ধরুন, আমরা যখন বেহেশতে যাব তখন আমাদের বয়স কত থাকবে বলুনতো।'

'যে যে বয়সে মারা গেছে সেই বয়স।'

'আপনি যে কী বলেন—যে মহিলা নব্বুই বছর বয়সে মারা গেছেন তিনি বুঝি বেহেশতে থুড়থুড়ি বুড়ি হয়ে লাঠি হাতে ঘুরবেন? বেহেশতে সব মেয়ের বয়স হবে ষোল। আমার এখন বয়স যে তারচে এক বছর কম।'

'তোমার বয়স সতেরো?'

'আশ্চর্য, আপনারতো খুব বুদ্ধি। চট করে আমার বয়স বের করে ফেললেন। আচ্ছা এখন বলুন দেখি বেহেশতে সব মেয়েদের বয়স যদি ষোল হয় তাহলে ছেলেদের বয়স কত হবে?'

'পঁচিশ।'

'কিছুই হয়নি। ছেলেদের বয়স হবে চল্লিশ।'

'মওলানা সাহেব তোমাকে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, তাঁর কথা কী আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? উনি তো আর না জেনে বলছেন না। জেনেশুনেই বলছেন।'

'আচ্ছা সেলিম ভাই, ইংরেজি গান আপনার কেমন লাগে?'

'ইংরেজি গানতো বেশি শুনি না।'

'বেশি শোনেন না?'

'বেশি মানে কী—একেবারেই শুনি না।'

'হিন্দি পছন্দ করেন?'

'হ্যাঁ করি। হিন্দিতে সুন্দর সুন্দর গান আছে।'

'সব ভাষাতেই সুন্দর সুন্দর গান আছে। আচ্ছা শুনুন আমি এখন আপনাকে একটা ইংরেজি গান শুনাব। আপনি শুনে বলবেন, কেমন লাগল।'

'তুমি ইংরেজি গান জান?'

'শুনলেই বুঝবেন জানি কি-না। গানের কথাগুলি আগে শুনে নিন তাহলে বেশি ভাল লাগবে—ব্যাপারটা হচ্ছে কী একজন যুবক। না না যুবক না—মধ্যবয়স্ক মানুষ ধরুন চল্লিশ বছর বয়স। সে জাহাজে করে দূর দেশে রওনা হয়েছে। কিন্তু তার মন পড়ে রয়েছে নিজের ছোট্ট শহরে—সে তার খুব আদরের একজনকে ফেলে এসেছে Kingstone শহরে—

I left a little gril in Kingstone town.

আমি গাইতে শুরু করেছি। জায়গাটা অন্ধকার। আকাশে প্রচুর মেঘ জমেছে বলে নক্ষত্রের আলোও নেই। সেলিম ভাইয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন। সম্ভাবনা খুব বেশি যে তিনি তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে আজকের রাতের এই ঘটনা স্থান দেবেন। আর দেয়াইতো উচিত। অন্ধকার রাত। তাঁর পাশাপাশি সতেরো বছরের একজন তরুণী হাঁটছে। তরুণীর চুলের গন্ধ লাগছে তাঁর নাকে। তরুণী গান করছে কিন্নর কণ্ঠে।

আমি গান শেষ করলাম। সেলিম ভাই গান প্রসঙ্গে কোনো কথা না বলে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললেন, ঘরে চল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।

আমি বললাম, পড়ুক। আপনি বরং ঘরে চলে যান। আমি একা একা বৃষ্টিতে ভিজব।

সেলিম ভাই আগের চেয়েও ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তুমি কি এই গানটা আরেকবার গাইবে?

আমি বললাম, না।

বৃষ্টি বেশ ভালই নেমেছে। কিছুক্ষণ থাকলে ভিজে চুপসে যেতে হবে। মা খুব রাগ করবেন। আমি ঘরের দিকে রওনা হলাম। সেলিম ভাই কিন্তু উঠোনেই রইলেন। কে জানে তিনি হয়ত একা একা বৃষ্টিতে ভিজে দেখবেন ব্যাপারটা কী?

মা'কে একগাদা কৈফিয়ত দিতে হবে। কী বলব ঠিক করা আছে। যা বলব সব সত্যি বলব। কিন্তু সেই সত্যের মাঝখানে ধূলির কণার মতো একদানা মিথ্যা থাকবে। সত্য দিয়ে সেই মিথ্যা ঢাকা ব'লে মিথ্যাটা কারো চোখ পড়বে না। মা জনতে চাইবেন, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

আমি বলব, সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে?

'তার সঙ্গে কী?'

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলব, আমি তাঁকে গান শুনাচ্ছিলাম মা। উনি খুব গান পাগল মানুষ। উনিতো আগেই খানিকটা পাগল ছিলেন, গান শুনিয়ে আমি তাঁকে আরো পাগল করে দিয়েছি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ—একা একা বৃষ্টিতে ভিজছে।

AMARBOI.COM

৯

পাহাড়ি অঞ্চলের বৃষ্টি না-কি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। "এই ঝুপঝুপ বৃষ্টি—এই নেই—" পাহাড়ি বৃষ্টির এটাই না-কি ধরন। অথচ কাল সারা রাতই বৃষ্টি হয়েছে। যতবার ঘুম ভেঙেছে ততবারই শুনেছি বৃষ্টির শব্দ। পাকা দালানে বৃষ্টি বোঝা যায় না। এখানে বেশ বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও হচ্ছে। পায়ের কাছের জানালা খোলা। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাট আসছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ছোটখাটো ঝড়ের মতো হচ্ছে। গাছের পাতায় শোঁ শোঁ গর্জন। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার, ইলেকট্রিসিটি নেই। টেবিলের ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। বাতাসের যে মাতামাতি, মোমবাতি জ্বলবে না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানোয় ঘরের ভেতরটা আলো হয়ে উঠছে। বিদ্যুৎ চমকানো শেষ হওয়া মাত্র অন্ধকার আরো বেড়ে যাচ্ছে। বাজ পড়ছে প্রচণ্ড শব্দে। মনে হচ্ছে বাজগুলি মাথার উপর পড়ার উপক্রম করছে। এই পৃথিবীতে তিনটি জিনিস আমি প্রচণ্ড ভয় পাই। শুঁয়োপোকা, মাকড়সা এবং বজ্রপাতের শব্দ। শুঁয়োপোকা এবং মাকড়সার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কাউকে বললেই ঝাঁটা এনে মেরে দূর করে দেবে, কিন্তু বজ্রপাতের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। ছোটবেলায় দু'হাতে শক্ত করে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে থাকতাম এবং একটু পরপর জিজ্ঞেস করতাম—"বাজ পড়া শেষ হয়েছে?" ভয়ে কাতর হওয়া একটা বালিকার প্রশ্ন, কিন্তু বাবা এই প্রশ্ন শুনে খুবই মজা পেতেন। হাসি মুখে বলতেন, আমি কি করে বুঝব বাজ পড়া বন্ধ হয়েছে কি-না? বাজগুলি কি আমার কারখানায় তৈরি হচ্ছে?

আজো আমি ভয়ে অস্থির। শরীর গোল করে শুয়ে আছি। দু'হাতে কান ঢেকে আছি। তাতে কোনো লাভ হচ্ছে না। মা'কে জড়িয়ে ধরে থাকলে লাভ হত। সেটা করা যাচ্ছে না কারণ আমি অন্য বিছানায় শুয়েছি। ইচ্ছা করে শুইনি—মা সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি কঠিন গলায় বলেছেন, তুই আমার সঙ্গে শুবি না। ঐ খাটে যা। আমি কথা বাড়াইনি। পাশের খাটে শুয়েছি। তখন যদি জানতাম শেষ রাতে এমন ঝড় বৃষ্টি হবে তাহলে মা'কে রাজি করিয়ে তাঁর সঙ্গেই ঘুমুতাম।

'বকু বকু!'

আমি দু'হাতে কান চেপে রাখলেও মা'র গলা শুনলাম। একবার ভাবলাম জবাব দেব না, তারপরেও বললাম, কী?

'আয়, আমার কাছে চলে আয়।'

'না।'

'বকু কথা শোন, আয়।'

'আমার ভয় লাগছে না মা।'

'আমার ভয় লাগছে।'

আমি বললাম, তোমার যদি ভয় লাগে তুমি আমার খাটে আসবে। আমি কেন যাব?

মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বালিশ এবং তাঁর বিখ্যাত ভালবাসা–কম্বল নিয়ে চলে এলেন। এমনভাবে লাফিয়ে খাটে উঠলেন যে মনে হল সত্যি ভয় পাচ্ছেন।

'বকু! খুবই ভয় পেয়েছি।'

আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম মা সত্যি ভয় পাচ্ছেন। তাঁর হাত পা কাঁপছে। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। ছোট বাচ্চারা আতঙ্কে অস্থির হয়ে যা করে তিনি তাই করছেন। গুটিসুটি মেরে একেবারে ছোট হয়ে গেছেন।

'মা কী হয়েছে?'

'ভয় পেয়েছি।'

'ঝড় দেখে ভয় পেয়েছ?'

'না অন্য কিছু দেখেছি।'

'অন্য কিছুটা কী?'

'সকালে বলব।'

'সকালে না, এখনই বল।'

মা ভীত গলায় বললেন, যখন ঝড় শুরু হল—ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেল। তখন...

'তখন কী?'

'আমি জানালাটার দিকে তাকিয়ে আছি। বৃষ্টির ছাট আসছে। উঠে গিয়ে বন্ধ করব কি-না ভাবছি তখন হঠাৎ মনে হল জানালা ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে কিছু বোঝা যায় না—কিন্তু একটা মেয়েমানুষ যে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে সেটা বোঝা যায়। বেঁটে খুব রোগা একটা মানুষ। শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর অল্প অল্প মাথা দুলাচ্ছে। ছোট বাচ্চারা যেমন শিক ধরে মাথা দুলায় সে রকম।

'বাঁদর নাতো মা? এই অঞ্চলে বাঁদর আছে। পরশু রাতে জাম গাছে আমি একটা বাঁদর দেখেছি।'

'আমিও বাঁদর ভেবেছিলাম কিন্তু...'

কী?

'হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল তখন দেখলাম, বাঁদর না মানুষ।'

'মানুষ কীভাবে হবে মা? দোতলার জানালা। নিচে দাঁড়াবার জায়গা নেই।'

'বকু কথা বলিস না চুপ করে থাক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মা, তোমার কি ধারণা তুমি ভূত দেখেছ?'

'চুপ করে থাকতে বলেছি—চুপ করে থাক।'

আশ্চর্য, মা থরথর করে কাঁপছেন। শুধু যে কাঁপছেন তাই না। তাঁর ঘাম হচ্ছে। আমি বললাম, পানি খাবে মা? পানি এনে দেব?

'না।'

'ভূতটা কেমন ছিল বলতো?'

মা বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। আমি দু'হাতে শক্ত করে মা'কে জড়িয়ে ধরে বললাম, তুমি নিশ্চিত মনে ঘুমাওতো মা আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরে আছি।

আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে থাকলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। ঘুম ভেঙে দেখি ঘর ভর্তি আলো—ঝলমল করছে। রোদ উঠে এসেছে বিছানায়। মা বিছানায় নেই। আমি ঠিক করলাম রাতের প্রসঙ্গে মা'র সঙ্গে আলাপ করব না। তিনি লজ্জা পাবেন। আমার বিছানা থেকে নামতে ইচ্ছা করছে না। আজ সারা দিন বিছানায় গড়াগড়ি করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? মাসের মধ্যে একটা দিন থাকা দরকার বিছানায় গড়াগড়ি খাবার জন্যে। সেই বিশেষ দিনগুলিতে কেউ বিছানা ছেড়ে নামবে না। বাচ্চারা বিছানায় হুটোপুটি খাবে, বড়রা শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়বে কিংবা গল্পের বই পড়বে।

'মিস রুমাল!'

সোহরাব চাচা টিপট হাতে ঘরে ঢুকলেন। হাসিমুখে বললেন, তোমার মা কই?

আমি বললাম, জানি না চাচা। আমার এই মাত্র ঘুম ভেঙেছে।

'কাল রাতে ঝড় কেমন দেখলে?'

'খুব ভালো দেখলাম।'

'বিরাট ঝড় হয়েছে। গাছপালা, কাঁচা বাড়ি-ঘর ভেঙে একাকার হয়েছে। সোমেশ্বরী নদীতে বান ডেকেছে।

'বা! কী ইন্টারেস্টিং।'

'স্যার সোমেশ্বরী নদীর বান দেখতে যাবেন। তুমি যাবে কি-না জানতে চেয়েছেন।'

'অবশ্যই যাব।'

'তাহলে চা খেয়ে তৈরি হয়ে নাও।'

'নাশতা খাব না?'

'নাশতা নদীর পারে খাওয়া হবে।'

সোহরাব চাচা চায়ের পট টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। আমি বললাম, আপনি নিজে সব সময় চা নিয়ে আসেন আমার খুবই লজ্জা লাগে চাচা।

'লজ্জার কিছু নাই মা। হাত মুখ ধুয়ে চা খাও। খালি পেটে খেও না। টোস্ট বিসকিট আছে।'

'থ্যাংক য়্যু চাচা। থ্যাংক য়্যু ভেরি মাচ।'

সোহরাব চাচা চলে গেছেন। আমি খাটে পা ঝুলিয়ে বসে চা খাচ্ছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে কী অসাধারণ একটা দিনই না আজ শুরু হতে যাচ্ছে। সোমেশ্বরী নদীতে বান ডেকেছে। আমি এবং তিনি নদীর বান দেখতে যাচ্ছি—

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান"

খুব সুন্দর একটা শাড়ি পরতে ইচ্ছা করছে। আমার কোনো শাড়ি নেই। মা আমাকে শাড়ি কিনে দেন না। তাঁর ধারণা, শাড়ি পরলেই আমাকে বড় বড় লাগবে। চারদিকে থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকবে। গুণ্ডা ছেলেরা পেছনে লাগবে। সেইসব গুণ্ডাদের কেউ খালি হাতে ঘুরবে না। ওদের হাতে থাকবে বোতল ভর্তি এসিড। প্রেম করতে রাজি না হলেই বোতল ছুঁড়ে মারবে।

শাড়ি পরলে মা'র শাড়ি পরতে হবে। বিশ্রী জবর জং সব শাড়ি। কড়া রঙ। উদ্ভট ডিজাইনের ছাপ। মা'র সবচে প্রিয় শাড়ির একটায় বাঘ, ভালুক, সিংহের ছবি। শাড়ির নাম কাহিনী–কাতান। শাড়ির গায়ে বাচ্চাদের রূপকথা। কোনো সুস্থ মাথার মহিলার এই শাড়ি পরার কথা না, মা পারবেন। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে পরবেন। সম্ভবত এই শাড়ির সঙ্গে তাঁর কিছু সুখ স্মৃতি আছে। হয়ত কোনো এতদিন বাবা বলেছিলেন, (নিশ্চয়ই ঠাট্টা করে বলা, কিংবা মা'কে খুশি করার জন্যে বলা) আরে বাঘ–ভালুক মার্কা শাড়িতে তোমাকেতো দারুণ লাগছে।

মা'কে ভজিয়ে ভাজিয়ে সিম্পল কোনো শাড়ি বের করার জন্যে মা'র খোঁজে নিচে নেমে মন খারাপ হয়ে গেল। ইউনিটের সবাই সোমেশ্বরী নদীর বান দেখার জন্যে যাচ্ছে। আজ নাকি সবাই নদীর পারে বসে নাশতা করবে। আমি বললাম, মা আমার শরীর ভাল লাগছে না, আমি যাব না।

মা বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই যাবি না মানে? সবাই যাচ্ছে তুই যাবি না কেন?

'আমার শরীর ভাল না, এই জন্যে আমি যাব না।'

'অবশ্যই তুই যাবি। তোকে একা এখানে রেখে যাব? তোর কি মাথাটা খারাপ হয়েছে! যা কাপড় বদলে আয়।'

'না, কাপড় বদলাব না, যে কাপড়ে আছি সেই কাপড়ে যাব।'

'রাতের বাসি কাপড় পরে যাবি?'

'হুঁ।'

'এমন একটা চড় লাগাব না...!'

'লাগাও।'

আমি মুখ গোঁজ করে বসে আছি। কিছুই আমার মনে ধরছে না। একা একা শুয়ে থাকতে পারলে ভালো লাগত। সবাই রেস্ট হাউস ছেড়ে চলে যাবে—আমি একা থাকব এর আনন্দ আলাদা।

'বকুলের কী হয়েছে? মুখ অন্ধকার কেন?'

ডিরেক্টর সাহেব কখন এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন বুঝতে পারিনি। আমি চট করে উঠে দাঁড়ালাম, বিনীত ভঙ্গিতে হাসলাম। আশ্চর্য কাণ্ড আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমার পা কাঁপছে।

'কাল রাতের ঝড় কেমন দেখলে?'

'ভাল।'

'কী প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ছিল শুনেছ? আমি ভয়ে অস্থির। এই বুঝি মাথায় পড়ল। বজ্রঘাতে মৃত্যু খুব খারাপ।

'খারাপ কেন?'

'লোক প্রবাদ হচ্ছে ভয়াবহ পাপীরা বজ্রঘাতে মারা যায়। সিরাজদ্দৌলাকে যে খুন করেছিল—মিরণ, সে বজ্রাঘাতে মারা যায়।'

'এইসব আপনি বিশ্বাস করেন?'

'আরে দূর, এইসব বিশ্বাস করব কেন। কত ছোট ছোট অবোধ শিশু বজ্রাঘাতে মারা পড়ে। এরা কী পাপ করবে? এদের সবচে বড় পাপ সম্ভবত ছোট ভাইয়ের লজেন্স কেড়ে নেয়া। সোমেশ্বরী নদীর বান দেখতে তুমি যাচ্ছ না?'

'যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'সব সময় নিজের ইচ্ছাকে দাম দিও না। কালেক্টিভ ইচ্ছাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে, যদি গুরুত্ব না দাও তাহলে হঠাৎ দেখবে তুমি দল থেকে আলাদা হয়ে পড়েছো। তখন ভয়াবহ সমস্যা হবে।'

'কী সমস্যা?'

'মানুষের ডিএনএ-এর ভেতর একটা ইনফরমেশন ঢুকিয়ে দেয়া আছে। ইনফরমেশনটা হচ্ছে—কখনো একা থেকো না। সব সময় দলে থাকবে। এবং দলের একজনকে মান্য করবে। মানুষ যখন এই পদ্ধতিতে কাজ করতে অস্বীকার করে তখনই তার মাথা আউলা হতে থাকে।'

'ও।'

'আচ্ছা দেখি তোমার কেমন বুদ্ধি, বলতো—কেন মানুষের ডিএনএ তে এই তথ্য ঢুকানো যে মানুষকে দলে থাকতে হবে, একা থাকা যাবে না। দলের একজনকে মান্য করতে হবে?'

'জানি না।'

'খুব সহজ কারণ। প্রাচীন মানুষকে বনে জঙ্গলে থাকতে হত। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ভয়ে দলবদ্ধভাবে চলতে হত। সেই কারণে প্রকৃতি মানুষের মাথার ভেতর ইনফরমেশনটা দিয়ে দিয়েছে।'

'ও।'

'মানুষের সমস্যা হচ্ছে সে একই সঙ্গে দলে থাকতে চায় আবার একই সঙ্গে দল থেকে আলাদা হয়ে বাস করতে চায়।'

'প্রকৃতি ডিএনএতে ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছে বলেই কি দলপতি হিসেবে আমরা সবাই আপনাকে মান্য করছি?'

'হতে পারে। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একজন দলপতি ঠিক করে ফেলা। আমরা যে এত রাজা ভক্ত জাত তা কী জন্যে? একই কারণে। পশুদের মধ্যেও এই দলপতি ব্যাপারটা আছে। মানুষের সঙ্গে পশুদের তেমন কোনো প্রভেদ নেই।'

মা সেজেগুজে নেমে আসছেন। তাঁর মুখ ভর্তি হাসি। তিনি খুকিদের মতো আহ্লাদী গলায় বললেন—বকু আমি কাহিনী-কাতানটা পরলাম। মা ডিরেক্টর সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, মঈন ভাই আমাকে কেমন লাগছে? ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আপনাকে সুন্দরবন সুন্দরবন লাগছে।

'কেন?'

'বাঘ ভালুক আপনাকে ঘিরে রেখেছে এই জন্যে।'

'উফ মঈন ভাই, আপনি যে কী রসিকতা করতে পারেন। এই শাড়িটা আমাকে বকুলের বাবা কিনে দিয়েছিল। অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার থেকে যেদিন প্রমোশন পেয়ে সেলস ম্যানেজার হল সেদিন।'

'খুব সুন্দর শাড়ি। চলুন রওনা হওয়া যাক। পাহাড়ি ঢলের পানি নাকি বেশিক্ষণ থাকে না।'

সোমেশ্বরী নদীর কাছে গিয়ে আমরা হতভম্ব। কী কাণ্ড! নদী ফুলে ফেঁপে একাকার। সমুদ্রের গর্জনের মতো শোঁ শোঁ গর্জন আসছে। মাঝে মাঝে প্রবল স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি হয়ে কড় কড় আওয়াজ হচ্ছে। বড় বড় গাছ নদীতে ভেসে আসছে। সেই সব গাছ ধরার জন্যে গ্রামের মানুষজন জড় হচ্ছে। যে গাছের ডালে প্রথম দড়ি পরিয়ে দিতে পারবে সেই হবে গাছটার মালিক। দড়ি পরানোর কর্মকাণ্ড মোটেই সহজ না, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদীতে নামতে হচ্ছে।

'বকুল আম্মা!'

তাকিয়ে দেখি মওলানা সাহেব আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। আজ তিনি আচকান পড়েছেন। চুল কেটেছেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। তাঁকে খুব উৎসাহী বলে মনে হচ্ছে।

'বুঝছেন আম্মা, একবার এক হাতি পানিতে ভেসে এসেছিল। হাতির সঙ্গে হাতির বাচ্চা। মা হাতিটা তার বাচ্চাটাকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিল।'

'তারপর!'

'এই অঞ্চলের মানুষজন আম্মা খুব সাহসী, তারা দড়ি, চেইন, কাঠ দিয়ে হাতি আর তার বাচ্চাটাকে উদ্ধার করে ফেলে।'

'বলেন কী!'

'দু'টা হাতিই গুরুতর জখম হয়েছিল। বাচ্চাটা মার যায়। মা হাতি বনে চলে যায়। তবে আম্মা অদ্ভুত ব্যাপার, প্রতি বৎসর ঠিক যেদিন বাচ্চাটা মারা গিয়েছিল সেদিন মা হাতিটা বন থেকে নেমে আসত। বাচ্চাটা যে জায়গায় মারা গিয়েছিল সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থেকে কাঁদত।'

'বাচ্চাটা কবে মারা গিয়েছিল?'

'১৯শে চৈত্র।'

'আপনি নিজে দেখেছেন?'

'জি আম্মা, দেখেছি।'

'এখনো আসে?'

'গত তিন বৎসর ধরে আসতেছে না। সম্ভবত মারা গেছে, কিংবা অন্য সন্তানাদি হয়েছে।'

মওলানা সাহেব খুব ব্যস্ত হয়ে ইউনিটের কাজে লেগে গেলেন। নাশতা তৈরি হয়েছে। সেই নাশতা হাতে হাতে পৌঁছে দেয়া। চায়ের কাপ তুলে দেয়া। তাঁর ব্যস্ততার সীমা নেই। নাশতা হচ্ছে পরোটা, ডালভাজি, একটা সিদ্ধ ডিম, একটা কলা। মা তাঁর এবং আমার কলাটা বদলাবার জন্যে গিয়েছেন। দাগ ধরা কলা তিনি বদলে নেবেনই।

আমি খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম ডিরেক্টর সাহেব একটু দূরে চায়ের একটা মগ হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে আশ্চর্য ধরনের বিষণ্নতা। তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নদীর দিকে। তিনি এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন না। এক পলকের জন্যে দৃষ্টি ফেরালেও তিনি দেখতে পেতেন আমি নদী দেখছি না, আমি তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে।

নাশতা খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র সোহরাব চাচা বললেন, একটা অত্যন্ত জরুরি ঘোষণা। পাহাড়ি নদীর পাড়ে একটা শট নেয়া হবে, আগে যেখানে শট নেয়া হয়েছিল সেখানে, কাশবনের কাছে। কাজেই ইউনিট চলে যাবে, দৃশ্যটায় আর্টিস্ট থাকবে শুধু একজন—বকুল। বকুল তুমি যাও স্যারের কাছ থেকে দৃশ্যটা বুঝে নাও। মেকাপম্যান ইউনিটের সঙ্গে চলে যাবে। মেকাপ হবে অন লোকেশন।

আমি ডিরেক্টর সাহেবের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, বকুল একটু কষ্ট করতে হবে। অনেক দূর হাঁটতে হবে। পারবে না?

'জি পারব।'

'নদীতে হঠ্যাৎ যৌবন দেখে দৃশ্যটা আমার মাথায় এসেছে। দিলুতো আগেও এই নদীর কাছে এসেছে। তারপর হঠাৎ একদিন এসে দেখে নদীর এই অবস্থা। তার নিজের জীবনের সঙ্গে দৃশ্যটি মিলে যাচ্ছে। সে অবাক হয়ে নদী দেখবে। নিজের অজান্তেই সে নদীর পাড়ের খুব কাছকাছি চলে যাবে। দৃশ্যটা এভাবে নেয়া হবে যেন মনে হয় এই বুঝি সে পড়ে গেল নদীতে।

'আমার পোশাক কী হবে?'

'এখন যা পরে আছ তাতেই চলবে। শুধু গায়ে শাদা একটা চাদর জড়িয়ে নেবে।'

মা'র খুব ইচ্ছা ছিল সঙ্গে যাবার। তিনি শেষ পর্যন্ত সাহস করলেন না। তবে মওলানা সাহেব আমাদের সঙ্গে রওনা হলেন। আজ শুক্রবার। তাঁর জুম্মার নামাজ আছে—সেটা নিয়ে তাঁকে তেমন চিন্তিত মনে হল না।

সকাল বেলা রোদ ছিল। আমরা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। প্রকৃতি কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেব বারবার চিন্তিত এবং বিরক্ত মুখে মেঘের দিকে তাকাচ্ছেন। মেঘ হলে শট নেয়া সমস্যা হবে। ভাল শটের জন্যে সানলাইট চাই। তবে হাইস্পিড ফিল্ম ব্যবহার করলে এই সমস্যার সমাধান হবে। অল্প আলোয় কাজ করার জন্যে

হাইস্পিড ফিল্ম নিশ্চয়ই আনা হয়েছে। আমি নিজের মনে হাঁটছি—অল্প কিছুদিন কাজ করেই অনেক ফিল্মের কথা শিখে ফেলেছি। কেমন যেন হাসি পাচ্ছে।

শট নেয়া হল।

কেমন হল আমি কিছুই জানি না। ভয়ে আমার আত্মা কেঁপে যাচ্ছিল। এমন একটা জায়গায় আমাকে দাঁড়া করানো হল যার ঠিক নিচ দিয়ে শোঁ শোঁ করে স্রোত যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল এই বুঝি পাড় ভেঙে আমি নিচে পড়লাম। মওলানা সাহেব বললেন, আম্মা কোনো ভয় নাই আমি আল্লাহপাকের পাক নাম ইয়া আহাদু পড়ে ফুঁ দিয়ে দিয়েছি। তিনি আপনাকে রক্ষা করবেন।

আমার কাজ হল নদীর পানির দিকে বিস্ময়, ভয় এবং আনন্দ নিয়ে তাকিয়ে থাকা। আমি হাসিমুখে ডিরেক্টর সাহেবকে বললাম, বিস্ময় ভয় এবং আনন্দ এই তিন জিনিস একসঙ্গে কীভাবে দেখাব? তিনি বললেন, খুব সহজ। ঐ জায়গাটায় যখন তুমি দাঁড়াবে তখনই একসঙ্গে বিস্ময় এবং ভয় চলে আসবে। আর তখন আনন্দময় কিছু ভাববে তাহলেই আনন্দও চোখে ছায়া ফেলবে।

'এত সহজ?'

'হ্যাঁ এত সহজ।'

আমি দাঁড়ালাম। শট নেয়া হল। ক্যামেরা পজিশন এমন যে একসঙ্গে আমাকে দেখা যাচ্ছে, নদীর জলের ঘূর্ণি দেখা যাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আরেকটা শট নেয়া হবে। তুমি কাশফুল হাতে নিয়ে দাঁড়াও। এক পর্যায়ে কাশফুল নদীতে ছুঁড়ে মারবে। তারপর ক্যামেরা চলে যাবে তোমার মুখ থেকে কাশফুলে। তারপর দেখা যাক কী হয়। আমি তাই করলাম এবং অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল, ফুলটা পড়ল ঠিক জলের ঘূর্ণির মাঝখানে। জলের ঘূর্ণির সঙ্গে ঘুরছে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠে আবার ডুবে যাচ্ছে। ক্লোজ শটে ক্যামেরা ফুলকে ধরে আছে। ফুল নানান কাণ্ডকারখানা করছে আমরা সবাই মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি। মওলানা বললেন, মাশাল্লাহ বড়ই আচানক দৃশ্য।

এই দৃশ্য নিয়ে আমরা এতই অভিভূত, বৃষ্টি যে শুরু হয়েছে তাও বুঝতে পারিনি। যখন বোঝা গেল তখন প্রচণ্ড ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। ক্যামেরা ভেজানো যাবে না। চল্লিশ লক্ষ টাকা দামের এরিফ্লেক্স ক্যামেরা। এক ফোঁটা পানিও পড়তে দেয়া যাবে না। বড় বড় ছাতা ক্যামেরার উপর ধরে দৌড়ে কোনো একটা বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা সবাই ছুটছি। আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নেই তবু ছুটছি।

শেষ পর্যন্ত বাড়ি একটা পাওয়া গেল। মাটির বাড়ি উপরে খড়ের ছাউনি। ক্যামেরাম্যান হাঁফ ছেড়ে বললেন, আল্লা বাঁচিয়েছেন। মওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মানুষের বিপদে আল্লাহ্ পাক সব সময় সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমি বললাম, তাই নাকি?

মওলানা সাহেব বললেন, জি আম্মা। আল্লাহ্ পাক মানুষের বিপদের সময় পাশে থাকেন, মানুষের আনন্দের সময়ও পাশে থাকেন।

'কখন তিনি পাশে থাকেন না?'

'তাতো আম্মা বলতে পারি না। আমার জ্ঞান বুদ্ধি অল্প।'

বৃষ্টি জোরে-শোরে শুরু হয়েছে। দমকা বাতাসও দিচ্ছে। সন্ধ্যা এখনো হয়নি কিন্তু ঝেঁপে অন্ধকার নামছে। বৃষ্টি সহজে থামবে এ রকম মনে হচ্ছে না।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, ঝাল মুড়ি দিয়ে চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। তেলে ভাজা ঝাল মুড়ি, শুকনো মরিচ আর সিগারেটসহ আগুন গরম চা।

ইউনিটের একটা ছেলে ছাতা হাতে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যে মুড়ি এবং চায়ের ব্যবস্থা হবে। ডিরেক্টর সাহেব কোনো কিছু চেয়েছেন আর তা তাঁকে দেয়া হয়নি এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, পাহাড়ি বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। তোমরা এক কাজ কর, বৃষ্টি কমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি ভিজতে ভিজতে রওনা হচ্ছি।

মওলানা সাহেব বললেন, ঠাণ্ডা লেগে জ্বরে পড়বেন।

'বৃষ্টির পানিতে ঠাণ্ডা লাগে না, জ্বরও হয় না। চা খেয়ে শরীর গরম করে আমি নামব বৃষ্টিতে।'

মওলানা বললেন, স্যারের সঙ্গে আমিও যেতাম কিন্তু আচকানটা ভিজে যাবে। আচকান ভিজলে নষ্ট হয়ে যাবে।

'আচকান নষ্ট করা ঠিক হবে না। আপনি থাকুন ক্যামেরা ইউনিটকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসুন।'

'জি আচ্ছা।'

চা চলে এল। চায়ের সঙ্গে মুড়ি ভাজা। শুকনো মরিচ ভাজা।

ডিরেক্টর সাহেব বৃষ্টিতে নামার প্রস্তুতি নিলেন। জুতা খুলে ফেললেন, প্যান্ট গুটিয়ে নিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললাম, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, তুমি যাবে? ভাল বৃষ্টি হচ্ছেতো।

'হোক। আমি একা একা এখানে থাকব না।'

'একা কোথায়, সবাইতো আছে।'

'আপনি চলে গেলে আমিও চলে যাব।'

'বেশতো চল। তোমার ঠাণ্ডার ধাত নেইতো? বৃষ্টিতে ভিজে জ্বরে পড়বে না?'

'আপনি বোধ হয় ভুলে গেছেন যে বৃষ্টির পানিতে ঠাণ্ডা লাগে না।'

'আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'চল বৃষ্টিতে নামা যাক। শোন একটা কাজ করা যাক। তুমি বরং হাতে একটা ছাতা নাও। আমি ভিজতে ভিজতে যাই তুমি ছাতা হাতে পেছনে পেছনে আস।'

'না আমি ছাতা নেব না।'

আমরা বৃষ্টিতে নেমে পড়লাম। আমি ভেবেছিলাম সবাই খুব অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাবে। কেউ তাকাল না। যেন ঘটনাটা খুব সহজ ও স্বাভাবিক। ডিরেক্টর সাহেব নিশ্চয়ই এর আগেও অনেক বৃষ্টিতে ভিজেছেন। আমার মতো আরো অনেকেই তাঁর সঙ্গী হয়েছে।

বৃষ্টির ফোঁটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। আরেকটু ঠাণ্ডা হলেই বরফ হয়ে যেত এমন অবস্থা। ফোঁটাগুলিও সাইজে বড়। পাহাড়ি বৃষ্টির এই বুঝি ধরন।

'বকুল, বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'তুমি কি প্রায়ই বৃষ্টিতে ভেজ?'

'আমার খুব ইচ্ছা করে কিন্তু মা দেয় না। আমি আবার মা'র সব কথা শুনি। আমি খুব মাতৃভক্ত মেয়ে।'

'মাতৃভক্তি খুব ভাল, কিন্তু একটা কথা খেয়াল রাখবে—প্রকৃতি মানুষের জন্যে কিছু সহজ আনন্দের ব্যবস্থা করে রেখেছে—মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি কোনো ভক্তির কারণেই নিজেকে এই সব সহজ আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে না।'

'আচ্ছা যান করব না।'

'বৃষ্টির ফোঁটাগুলি কেমন সুচের মতো গায়ে বিঁধছে দেখছ?'

'জি দেখছি।'

'বৃষ্টিতে নামলেই আমার কী করতে ইচ্ছা করে জান?'

'না, জানি না।'

'সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে। সেটা সম্ভব না। ওয়াটার প্রুফ সিগারেট থাকলে ভাল হত, ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সিগারেট টানতে টানতে হাঁটতাম।'

'একটা কাজ করুন—কোনো একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিগারেট শেষ করুন। তারপর আমরা হাঁটব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'থাক বাদ দাও। বৃষ্টি মনে হয় আরো জোরে আসছে।'

'হুঁ।'

'আমার বেলা সব সময় কী হয় জান—যখন দেখি জোর বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টি দেখে ভিজতে ইচ্ছে হল, যেই নামলাম—ওম্নি বৃষ্টি শেষ।'

'আজকেরটা শেষ হবে না। আজ সারা রাত বৃষ্টি হবে।'

'তোমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে নাতো?'

'না।'

'মাটি পিছল হয়ে আছে, সাবধানে হাঁট।'

'সাবধানেই হাঁটছি। কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে দেখছেন। কিছুক্ষণ পর আর চোখে কিছু দেখতে পাবেন না।'

'তাইতো মনে হচ্ছে।'

'পথ চিনে যেতে পারেবেন?'

'তা পারব। জোড়া তালগাছ দেখতে পাচ্ছ?'

'হুঁ।'

'প্রথম যেতে হবে জোড়া তালগাছ পর্যন্ত। সেখানে দু'টা রাস্তা। আমরা সেই রাস্তা নেব যেটা গেছে পারোদের শ্মশানের দিকে। বৃষ্টিতে ভিজতে কেমন লাগছে?'

'ভাল লাগছে।'

'ঝড় আসছে এটা বুঝতে পারছ?'

'না।'

'ঝড় আসছে। ভাল ঝড় আসছে। আমাদের প্রধান কাজ এখন হবে কোনো একটা পাকা দালানে আশ্রয় নেয়া।'

'পাকা দালান পাবেন কোথায়?'

'তাইতো দেখছি। শ্মশান পর্যন্ত যেতে পারলে হত। শ্মশানে মরা রাখার একটা ঘর আছে।'

'আমি মরে গেলেও শ্মশানের ঐ ঘরে যাব না।'

দেখতে দেখতে ঝড় শুরু হয়ে গেল। শোঁ শোঁ শব্দ হতে লাগল। ঝড় আসছে উল্টো দিক থেকে। পিঠে বাতাসের ঝাপটা লাগছে। আমাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্যান্ডেল পায়ে রওনা দিয়েছিলাম, স্যান্ডেল অনেক আগেই খুলে ফেলেছি। হাঁটছি খালি পায়ে। বাঁ পায়ে কাঁটা ফুটেছে। কাঁটা ফোটার যন্ত্রণাও সুখের মতো লাগছে।

'ভয় লাগছে?'

'উঁহু। শুধু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'ধর, আমার হাত ধর।'

আমি কোনো রকম দ্বিধা ছাড়া তাঁর হাত ধরলাম আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল এ জীবনে আমার আর কিছু পাওয়ার নেই, চাওয়ারও নেই। আমি এখন বাস করছি সব পেয়েছির ভুবনে। আমার চোখে পানি এসে গেল।

ঝড় বাড়ছে। পৃথিবীতে প্রলয় নেমে আসুক। কিচ্ছু যায় আসে না। আমি এখন ভাল মতোই কাঁদতে শুরু করেছি। ভাগ্য ভাল আমার চোখের জল তিনি দেখবেন না। চোখের জলের কারণও কোনোদিন জানবেন না।

'বকুল!'

'জি।'

'মনে হচ্ছে আমরা একটা বিপদে পড়েছি।'

'কেন?'

'তালগাছ দেখতে পাচ্ছি না।'

'মনে হয় ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

'গাছ ভাঙার মতো জোরালো ঝড় হচ্ছে না।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বড় একটা গাছের ডাল ভেঙে পড়ল।

'বকুল!'

'জি।'

'গাছ চাপা পড়ে মারা যাব বলেতো মনে হচ্ছে। কী করা যায় বলতো?'

'চলুন ফাঁকা মাঠে চলে যাই।'

'ফাঁকা মাঠেতো মাথায় বাজ পড়ার সম্ভাবনা।'

আমি হেসে ফেললাম। তিনি বিস্মিত গলায় বললেন, হাসছ কেন?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, ভয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে এই জন্যে হাসছি।

'আমিতো চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও দেখতে পাচ্ছি না।'

তিনি চিন্তিত গলায় বললেন, হেল্প হেল্প বলে চিৎকার করলে কেমন হয়?

'খুব ভাল হয়।'

'চিৎকার করলেই বা কে দেখবে। কোনো মানুষজনওতো দেখছি না।'

'চলুন আমরা হাঁটতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় না একসময় কাউকে পাব। কিংবা বাড়ি ঘর পাব।'

মাটির দেয়ালের লম্বাটে ধরনের একটা ঘর শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। বিরান মাঠের মাঝে ঘর। প্রাইমারি স্কুল বা মক্তব জাতীয় কিছু হবে। ঘরের দরজা জানালা সবই খোলা। ভেতরে কিছু বেঞ্চ আছে। চাটাই আছে। ঘরটার টিনের চালের একটা অংশ ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। অন্য অংশটিও হয়ত কিছুক্ষণের মধ্যেই উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আমরা দু'জন রাত কাটাব এমন একটা জায়গায় যে জায়গাটা কেউ কোনোদিন খুঁজে পাবে না। এমন অসাধারণ রাত আমি আর কখনোই ফিরে পাব না। কখনো না, কোনোদিনও না।

তিনি ভেজা দেয়াশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছেন। যেভাবে সব ভিজেছে দেয়াশলাই জ্বালার কোনো কারণ নেই। তবু তিনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আহা, বেচারার বোধ হয় খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। আচ্ছা এখন একটা ভয়ংকর কাজ করলে কেমন হয়? তাকে তুমি তুমি করে বললে কেমন হয়? আমি যদি বলি, মঈন শোন, তুমি সিগারেট ধরাবে কীভাবে? ভিজে গেছে না? পাপিয়া ম্যাডাম যদি মাঝে-মধ্যে তুমি বলতে পারেন—আমি বললে অসুবিধা কী? না, কোনো অসুবিধা নেই। এই সুযোগ আমার জীবনে আর আসবে না। তিনি খুব চমকে উঠবেন। কিংবা কে জানে হয়ত চমকাবেন না। মানুষ একেক পরিবেশে একেক রকম আচরণ করে।

আমি তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার? আমি বললাম, আমার কেন জানি খুব ভয় ভয় লাগছে।

'কিসের ভয়?'

'জানি না কিসের ভয়। আমি আপনার হাত ধরে বসে থাকব।'

'বেশতো বসে থাক। ঝড় কিন্তু কমে গেছে।'

'না, কমেনি।'

'তুমি কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন যেন আমার খুব কান্না পাচ্ছে। আপনি কি আমাকে একটু আদর করে দেবেন? প্লিজ প্লিজ প্লিজ।'

আর ঠিক তখনই মওলানা সাহেবের গলা শোনা গেল। চিন্তিত গলায় মওলানা ডাকছেন, স্যার কি আছেন? স্যার?

টর্চ লাইটের আলো পড়ছে স্কুলের বারান্দায়।

'স্যার! স্যার।'

তিনি বের হয়ে গেলেন। সহজ স্বাভাবিক গলায় বললেন, কে মওলানা সাহেব?

'জি স্যার। গজব হয়ে গেছে। গাছপালা ভেঙেছে, বাড়িঘর কত যে গেছে কে জানে। আমি আপনার চিন্তায় অস্থির হয়েছি। আপনার খোঁজে নানান দিকে লোক গেছে।'

'আমি ভাল আছি।'

'বকুল আম্মা। উনি কোথায়?

'সেও ভাল আছে। তার পায়ে কাঁটা ফুটেছে। হাঁটতে পারছে না। মওলানা সাহেব?'

'জি।'

'কোনোখান থেকে একটা সিগারেট এনে দিতে পারবেন? মনে হচ্ছে সিগারেট না খেলে মরে যাব।'

'এনে দিচ্ছি স্যার। টর্চ লাইটটা আপনার কাছে রাখেন।'

তিনি টর্চ লাইট হাতে স্কুল ঘরে ঢুকলেন। বসলেন আমার পাশে। আমার মনে হল—এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখি কোনো মেয়ে কোনোদিন জন্মায়নি। কখনো জন্মাবেও না।

১০

ঘুম আসছে না।

আমি চোখ বন্ধ করে হাত পা এলিয়ে পড়ে আছি। আমার গায়ে মা'র বিখ্যাত ভালবাসা কম্বল। বাইরের পৃথিবী হিম হয়ে গেছে। বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে আকাশে গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে—হয়ত শেষ রাতের দিকে আবারো বৃষ্টি নামবে। ঘুমুবার জন্যে সুন্দর একটা রাত। ঘুম আসছে না। মা এর মধ্যে দু'বার কপালে হাত রেখে জ্বর দেখলেন। চুলে বিলি কাটার মতো করলেন। অকারণে কিছুক্ষণ কাশলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য আমাকে ঘুম থেকে তুলে গল্প করা। শুটিং কেমন হল, ঝড়ের সময় কোথায় ছিলাম এইসব খুঁটিনাটি। মা শ্রোতা হিসেবে খুব মনোযোগী। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ভাল। আমি যা বলব তিনি খুব মন দিয়ে শুনবেন। কিছুই ভুলবেন না। বেশ অনেকদিন পর তাঁর যখন ধারণা হবে আমি প্রথমবার কী বলেছিলাম তা এখন আর মনে নেই তখন আবারো জানতে চাইবেন। একই গল্প আমি আবারো বলব। দু'টি গল্পে যদি কোনো মিল পাওয়া না যায় তখন অমিলের জায়গাগুলিতে জেরা করতে বসবেন। সেই জেরা থেকে বের হয়ে যাবে আমি মিথ্যা কিছু বলেছিলাম কি-না। গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করলে মা খুব ভাল করতেন। অপরাধীর মুখ থেকে সত্যি কথা তিনি অতি দ্রুত বের করে ফেলতে পারতেন।

'বকু। ও বকু।'

আমি জবাব দিলাম না। ঘুমে তলিয়ে গেছি এমন ভঙ্গিতে গাঢ় নিঃশ্বাস ফেললাম।

'তুইতো জেগে আছিস। কথা বলছিস না কেন?'

আমি চোখ মেলে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বললাম, অসম্ভব টায়ার্ড লাগছে মা। চোখ মেলে রাখতে পারছি না।

'তোদের শুটিং কেমন হল রে?'

'ভাল।'

'ঝড় কেমন দেখলি?'

'ভাল।'

'ঝড়ের সময় ভয় পেয়েছিলি?'

'হুঁ।'

'ভয় পাওয়ারই কথা। আমারতো একেবারো আত্মা উড়ে গিয়েছিল।'

'মা আমাকে ঘুমুতে দাও। কথা বলো না। চুলে বিলি কাটবে না, সুড়সুড়ি লাগছে।'

মা চুলে বিলি কাটা বন্ধ করলেন না, তবে কথা বন্ধ করলেন। এই কথা বন্ধও সাময়িক। তিনি আবারে শুরু করবেন। দম নিচ্ছেন।

'বকু।'

'হুঁ।'

'তোরাতো চলে গেলি তার কিছুক্ষণের মধ্যে বিরাট এক পাজেরো জিপ এসে উপস্থিত। আমি ভাবলাম—পাপিয়া ফিরে এলো বুঝি। তাকিয়ে দেখি জিপের ভেতর একজন মহিলা বসে আছেন। তাঁর কোলে পাঁচ ছ' বছরের একটা মেয়ে ঘুমিয়ে আছে। মহিলা কে বলত? দেখি তোর অনুমান?'

আমি জবাব দিলাম না। মা'র সঙ্গে এই মুহূর্তে অনুমান অনুমান খেলা খেলতে ইচ্ছা করছে না। আমি কিছু সময় একা থাকতে চাই। নিজের জীবনটার উপর চোখ বুলিয়ে নিতে চাই। খুব সহজ সাদামাটা জীবন আমার না। নানান ধরনের জটিলতার জীবন। জীবনটা যদি লম্বা দড়ির মতো হয় তাহলে আমার সেই দড়ির নানান জায়গায় গিঁট লেগে গেছে। কিছু গিঁট আপনাতেই লেগে আছে, কিছু গিঁট আমি লাগাচ্ছি।

মা চাপা গলায় বললেন, মহিলার নাম নীরা। আমাদের মঈন ভাইয়ের স্ত্রী। আর মেয়েটার নাম কী জানিস? খুবই অদ্ভুত নাম—এন্টেনা। টিভির এন্টেনা থাকে। মানুষের নামও যে এন্টেনা হয় এই প্রথম শুনলাম। মঈন ভাইয়ের স্ত্রীকে দেখে আমি খুবই আপসেট হয়েছি। সাদা তেলাপোকার মতো ফর্সা গা—আর খুব অহংকারী চেহারা। কপাল না কুঁচকে তাকাতে পারে না। ভুরু কুঁচকে থাকতে থাকতে কপালে দাগ পড়ে গেছে। উনার মেয়েটার চেহারা অবশ্যি সুইট আছে। বড় হলে থাকবে কি-না কে জানে। ছোটবেলায় যাদের চেহারা সুইট থাকে—বড় হলে তারা ঘোড়ামুখি হয়ে যায়।

আমি মা'র কথায় মনে মনে হাসলাম।

বোঝাই যাচ্ছে নীরা নামের মহিলা অসম্ভব রূপবতী। রূপবতী মহিলাদের প্রসঙ্গে মা বলবেন—চেহারা অহংকারী। দেমাগ ঝরে ঝরে পড়ছে, চোখের রঙ কটা। ভুরু কুঁচকানো।

'বকু'

'হুঁ।'

'মহিলার সঙ্গে আমিই আগ বাড়িয়ে কথা বললাম। এলেবেলে টাইপ কথা। শুটিং কী হচ্ছে না হচ্ছে এইসব।'

'ভাল করেছ। ক্ষমতাবান মানুষের স্ত্রীর সঙ্গে খাতির রাখা ভাল।'

'খাতির করার জন্যে বলিনি। কথা বলে উনাকে একটু বাজিয়ে নিলাম। কী বুঝলাম জানিস! কথা বলে বুঝলাম ভদ্রমহিলা খুব পাকা অভিনেত্রী। হাসি খুশি একটা ভাব মুখে ধরে রেখেছে। যেই আসছে তার সঙ্গেই হাসিমুখে কথা বলছে। বুড়ি বয়সে খুকি সাজার চেষ্টা।'

'যত অভিনয়ই করুক তোমার কাছেতো ধরা পড়ে গেছে।'

'তুই বাঁকা ধরনের কথা বলছিস কেন?'

'প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছেতো মা, এই জন্যেই আমার সোজা কথাগুলি বাঁকা হয়ে বের হচ্ছে। তুমি কি তোমার একটা পা আমার দিকে এগিয়ে দেবে?'

'কেন?'

'তোমার পা ধরব।'

'পা ধরবি কেন?'

'পা ধরে বলব আজকের রাতটার মতো আমাকে ক্ষমা কর। ঘুমুতে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভাত খাবি না?'

'না।'

'তুই শুয়ে থাক, আমি মুখে তুলে খাইয়ে দি।'

'তোমাকে মুখে তুলে খাওয়াতে হবে না মা। আমার বমি বমি লাগছে। সরে বোস, নয়তো তোমার গায়ে বমি করে দেব।'

'এক গ্লাস দুধ এনে দি। দুধ খা আর একটা কলা খা।'

'আমিতো কালসাপ না যে আমাকে দুধ কলা দিয়ে পুষতে হবে। তুমি যথেষ্ট বিরক্ত করেছো, দয়া করে আর বিরক্ত করো না।'

'আচ্ছা ঘুমো। মাঝখানে শুয়ে আছিস কেন? সাইড করে ঘুমো—আমার জন্যে জায়গা রাখ।'

'তুমি অন্য বিছানায় ঘুমাও মা। আজ আমি একা শোব। তোমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে না।'

'আমার সঙ্গে ঘুমতে অসুবিধা কী?'

'তুমি ঘুমের মধ্যে খুব নাড়াচড়া কর। বিড়বিড় করে কথা বল। আমার অসুবিধা হয়। তাছাড়া তোমার গায়ে রশুনের গন্ধ।'

মা কথা বললেন না, বিছানা ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। আমি তাঁর খুব দুর্বল একটা জায়গায় ঘা দিয়েছি। আঘাত সামলাতে তাঁর সময় লাগবে। তিনি আজ আলাদা বিছানায় ঘুমুবেন। এবং আমি নিশ্চিত বাকি রাতটা আমাকে বিরক্ত করবেন না।

মা'র গায়ে রশুনের গন্ধ এই কথাটা বাবা শেষের দিকে বলতে শুরু করেছিলেন। মা'র ঘর এবং আমার ঘর ছিল পাশাপাশি। ঐ ঘরে একটু চড়া গলায় কোনো কথা হলেই আমি শুনতে পেতাম। বাবা কখনোই চড়া গলায় কোনো কথা বলতেন না, তবে অল্পতেই মা'র গলা চড়ে যেত। মা কী বলছেন সেখান থেকেই বাবার জবাব কী হচ্ছে বোঝা যেত। এক রাতে শুনি মা চড়া গলায়, এবং একই সঙ্গে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলছেন—"কী বললে, আমার গায়ে রশুনের গন্ধ?" বাবা কী একটা জবাব দিলেন। সেই জবাব শোনা গেল না। মা'র পরবর্তী কথা শোনা গেল—আমার গায়ে রশুনের গন্ধ বলে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারব না? আমার স্বামী থাকবে এক ঘরে, আমি থাকব আরেক ঘরে? আর রশুনের গন্ধটা তুমি পাচ্ছ কীভাবে? আমি কী ক্ষেতে রশুন বুনে এসেছি? মা'র ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শোনা গেল। তার কিছুক্ষণ পর মা আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলেন। আমি সদ্য ঘুম ভেঙে উঠে এসেছি এমন ভাব করে দরজা খুলে বিরক্ত গলায় বললাম, রাত দুপুরে কী এমন দরজা ধাক্কাধাক্কি শুরু করেছ। মা ধরা গলায় বললেন—বকু, ভাল মতো শুঁকে দেখতো—আমার গায়ে কি কোনো গন্ধ পাস? কোনো বাজে টাইপ গন্ধ?

আমি অনেক শুঁকেটুকে বললাম, হুঁ পাচ্ছি। বেশ বাজে ধরনের একটা গন্ধ পাচ্ছি মা।

'বাজে ধরনের গন্ধ মানে কী?'

'রশুন রশুন টাইপ।'

'সত্যি পাচ্ছিস?'

'হুঁ।'

মা তখনই সাবান নিয়ে গোসলখানায় ঢুকলেন। গোসল করে গায়ে একগাদা সেন্ট মেখে ঘুমুতে এলেন। আমাকে বললেন, বকু এখনো গন্ধ পাচ্ছিস? আমি বললাম, এখন সেন্টের পচা গন্ধ পাচ্ছি। এরচে রশুনের গন্ধ ভাল ছিল। মাথা ধরে গেছে। তুমি আরেকবার গোসল করে আস। তুমি পাশে শুলে আমি ঘুমতে পারব না। মা রাগ করে চাদর পেতে মেঝেতে ঘুমতে গেলেন।

আমি কী মা'র চেয়ে বাবাকে বেশি পছন্দ করি? এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি প্রায়ই ভাবি। এবং এক সময় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে বাবার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাড়া আমার মনে কিছুই নেই। এটাও

খুব আশ্চর্য ব্যাপার। একটা বড় ধরনের ভুলের জন্যে মানুষের সারা জীবনের সঞ্চিত 'শুদ্ধ' কাজগুলিও ভুল হয়ে যায়।

আজ আমি যে ভুল করেছি তার জন্যে আমারও সারা জীবনের শুদ্ধ কাজগুলি কি ভুল হয়ে গেছে? না নিজের কথা আমি এখন ভাবব না। এখন নিজেকে নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। বরং বাবাকে নিয়ে ভাবি। আমার বাবা সৈয়দ আনোয়ারের অনেক গুণ ছিল, এখনো নিশ্চয়ই আছে। তিনি শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী, হাসি খুশি মানুষ। চোখে পড়ার মতো বিশেষ কোনো গুণ নেই। যাদের বিশেষ কোনো গুণ থাকে না, তাদের বিশেষ কোনো দোষও থাকে না। তাঁর কোনো দোষ ছিল না। তিনি গল্প বলতে পারতেন না, তবে গল্প শুনতে পছন্দ করতেন। আমি আমার স্কুলের সব গল্প বাবাকে বলতাম। অতি সাধারণ গল্প শুনেও তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হতেন। তাঁর মুগ্ধতা ও বিস্ময় বোধে কোনো খাদ ছিল না। অবাক হয়ে তিনি আমার গল্প শুনছেন, এই দৃশ্য এখনো আমার চোখে লেগে আছে।

'বাবা শোন আজ কী হয়েছে—আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে—নাম দিলরুবা, সে পা পিছলে ধপাস করে পড়ে গিয়েছিল।'

'বলিস কী?'

'মাথা ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছিল।'

'তারপর?'

'মিস দৌড়ে এসেছেন। দিলরুবার বাবা মা'কে খবর দিয়েছেন। তার মা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। এসেই মিসের সাথে কী চিৎকার—কী চেঁচামেচি।'

'মিসের দোষ কী? তিনিতো আর ধাক্কা দিয়ে ফেলেননি।'

'তবু উনি ভেবেছেন মিসের দোষ। মিসকে অনেক বকাঝকা করে দিলরুবাকে নিয়ে চলে গেলেন। উনি বলেছেন দিলরুবাকে আর এই স্কুলে রাখবেন না।'

'আমার মনে হয় এই স্কুলেই রাখবে।'

'আমারো তাই মনে হয়।'

স্কুলের এই তুচ্ছ গল্প আমি মা'কেও বললাম। মা গল্প শুনে বলেছেন—মিসেরইতো দোষ। সে দেখবে না মেয়েগুলি কী করছে না করছে? মিসগুলি কী করে আমিতো জানি। ক্লাসে এসে ঘুমায়। মাসের শেষে বেতন নিয়ে হাসিমুখে বাসায় যায়।

দিলরুবার প্রসঙ্গে পরে মা আর কিছুই জিজ্ঞাস করেননি। কিন্তু বাবা ঠিকই পরের দিন জিজ্ঞেস করলেন, রুমালী দিলরুবা কি ক্লাসে এসেছিল? আমি বললাম, না বাবা। বাবা চিন্তিত গলায় বললেন, তাহলেতো সমস্যা। সত্যি সত্যি কি স্কুল বদলে দেবে?

'বোধ হয়।'

'আরো দু'একটা দিন দেখা যাক।'

তিন দিনের দিন কপালে ব্যান্ডেজ নিয়ে দিলরুবা ক্লাসে এল। আমি বাবাকে খবর দিতেই তিনি খুবই নিশ্চিন্ত হলেন বলে মনে হল। মনে হল তাঁর বুক থেকে পাষাণ নেমে গেছে।

আমাকে স্কুল থেকে আনা নেয়ার কাজ মা-ই সব সময় করতেন। হঠাৎ হঠাৎ বাবা এসে উপস্থিত হতেন। সেদিন আমার আনন্দের কোনো সীমা থাকত না। বাবার সঙ্গে স্কুল থেকে ফেরা, আমার জীবনের আনন্দময় ঘটনাগুলোর একটি। রিকশা করে ফিরছি হঠাৎ দেখা গেল এক জায়গায় কিছু লোক জটলা পাকিয়ে আছে। আমি বললাম—এখানে কী হচ্ছে বাবা?

বাবা সঙ্গে সঙ্গে রিকশা থামিয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন জটলার কাছে। দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরবেন—যাতে কী হচ্ছে আমি দেখতে পাই।

হয়ত রিকশার পাশ দিয়ে আইসক্রিমের গাড়ি যাচ্ছে, বাবা বলবেন, আমার কেন জানি আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা করছে। কী করা যায় মা?

'আইসক্রিম খাও।

'আমি একা একা খাব তুই বসে বসে দেখবি এটা কেমন কথা!'

'কিচ্ছু হবে না বাবা—তুমি খাও।'

'একটা কাজ করলে কেমন হয়—আমার আইসক্রিম থেকে তুই দু'এক কামড় দে।'

'আচ্ছা।'

বাড়িতে আইসক্রিম খাওয়া আমার জন্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। আমার ঠাণ্ডার দোষ আছে। আইসক্রিম খেলেই আমার টনসিল ফুলে যায়।

আইসক্রিম কেনা হয়। বাবা একটা কামড় দিয়েই বলেন, একী খেতে এমন বিশ্রী কেন, টাকাটা মনে হচ্ছে জলে গেল। রুমালী তুই খেয়ে দেখতো তোর কাছে কেমন লাগছে। আমি খেয়ে বলি, বাবা আমার কাছেতো খুব ভাল লাগছে।

'তাহলে বরং তুই খেয়ে ফেল। নষ্ট করে লাভ কী? মা'কে না বললেই হল।'

আমি মহানন্দে আইসক্রিম খাই। আমাকে আইসক্রিম খাওয়ানোর বাবার এই ছেলেমানুষি কৌশল আমি চট করে ধরে ফেলি। আমার এত ভাল লাগে। এক একদিন আনন্দে চোখে পানি এসে যায়।

এখন আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। কেন পড়ছে আমি জানি না। আমার চোখ দিয়ে পানি পড়া রোগ হয়েছে। একা একা কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেই আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

আবার কি বৃষ্টি শুরু হল? শহরের বৃষ্টি এবং গ্রামের বৃষ্টিতো এক না। শহুরে বৃষ্টির ভেতর শহুরে ভাব আছে। যেন হিসেব কষা বৃষ্টি। গ্রামের বৃষ্টি লাগামছাড়া।

শহরের দালানকোঠা বৃষ্টির সঙ্গে নাচে না। গ্রামের গাছপালা, ঝোপঝাড় বৃষ্টিতে নাচতে থাকে।

আমার জীবনের বড় বড় সব ঘটনার সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক আছে। যে দিন আমি মারা যাব সেদিনও নিশ্চয়ই খুব ঝড় বৃষ্টি হবে। আমার ডেডবডি নিয়ে মা পড়বেন বিরাট সমস্যায়। লোকজনকে কীভাবে খবর দেবেন? কে আসবে? কোন কবরখানায় কবর হবে? গোর খোদকদেরও হয়তো খবর দিয়ে পাওয়া যাবে না। তবে মা সব ম্যানেজ করে ফেলবেন। দেখা যাবে ঝড় বৃষ্টির কারণেও কিছু আটকাচ্ছে না।

আমার জীবনের সঙ্গে ঝড় বৃষ্টির সম্পর্কের একটা গল্প বলি। স্কুল ছুটি হয়েছে। আমরা ক্লাস থেকে বের হয়ে দেখি খুব বৃষ্টি। রাস্তায় পানি জমে গেছে। আমাদের খুব মজা হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করে বৃষ্টিতে ভিজছি। একজন মিস বকা দিতে এসে নিজেও খানিকক্ষণ ভিজলেন। আমি তেমন করে ভেজার সাহস পাচ্ছি না, কারণ মা আমাকে নিতে আসবেন। তিনি যদি দেখেন আমার গা ভেজা তাহলে সব মেয়েদের সামনেই চড় থাপ্পড় মারা শুরু করবেন। হঠাৎ অবাক হয়ে দেখি মা না, বাবা আমাকে নিতে এসেছেন। আমার আনন্দের কোনো সীমা রইল না। বাবা বললেন, তোর মা'র শরীর খারাপ। সে আসতে পারল না।

আমি বললাম, ভালই হয়েছে আসতে পারেনি। বাবা আজ আমি সরাসরি বাসায় যাব না, তোমার সঙ্গে রিকশা করে বৃষ্টিতে ঘুরব। বাবা বললেন, আচ্ছা। তাঁর গলা কেমন যেন শুকনো অন্যমনস্ক শুনাল। যেন তিনি কী বলছেন নিজেই জানেন না এবং তাঁর মন ভাল নেই। আমি বললাম, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ? বাবা বললেন, হুঁ।

'কী হয়েছে, জ্বর?'

এই বলে আমি তাঁর হাতে হাত রাখলাম। না জ্বর না, শরীর ঠাণ্ডা।

'তোমার ভাল না লাগলে চল বাসায় চলে যাই।'

'বৃষ্টিতে ঘুরতে মন্দ লাগছে না—চল খানিকক্ষণ ঘুরি। তবে শহরের বৃষ্টি হল ভুয়া বৃষ্টি। আসল বৃষ্টি দেখতে হলে গ্রামে যেতে হয়। আইসক্রিম খাবি?'

'না। বৃষ্টির মধ্যে আইসক্রিম খেলে লোকজন হাসবে।'

'তাহলে চল কোথাও বসে কফি খাই। এক্সপ্রেসো কফি। খাবি?'

'চল যাই।'

বাবা আমাকে একটা কফি শপে নিয়ে গেলেন। কফি শপটা মনে হয় বাবার চেনা। ম্যানেজার হাসিমুখে বলল, "ভাল আছেন?" বাবা শুকনো গলায় বললেন, হুঁ।

'এ কে?'

বাবা বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, "আমার মেয়ে।" এটা বলতে গিয়ে তিনি কেন বিব্রত বোধ করছেন তাও বুঝলাম না। কফি শপটা প্রায় ফাঁকা। বাবা কোনার দিকের একটা চেয়ারে আমাকে নিয়ে বসালেন। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়।

'মা, আর কিছু খাবি?'

'না।'

'এরা খুব ভাল বার্গার বানায়। একটা খেয়ে দেখ।'

বাবা আমাকে বসিয়ে রেখে ম্যানেজারের কাছে চলে গেলেন। সেখান থেকে কোথায় জানি টেলিফোন করলেন। আমাকে বার্গার দিয়ে গেছে, সস দিয়ে গেছে। আমি বার্গার খেতে খেতে বাবাকে লক্ষ্য করছি। তাঁর টেলিফোন শেষই হচ্ছে না। মগ ভর্তি কফি দিয়ে গেছে, এখন নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা হচ্ছে।

এক সময় টেলিফোন শেষ হল। বাবা কফি শপের ঐ লোকটার কাছ থেকে চেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার সামনের চেয়ারে বসেই বললেন—

রুমালী, কী বলছি মন দিয়ে শোন।

বাবার সব কথাই আমি খুব মন দিয়ে শুনি। তারপরেও তিনি আমাকে মন দিয়ে কথা শুনতে বলছেন কেন? ভয়ংকর কিছু কি ঘটেছে? মা বেবিটেক্সি অ্যাক্সিডেন্ট করে এখন হাসপাতালে আছেন? ভয়ংকর অবস্থা? তাঁকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। রক্ত দেয়া হচ্ছে। বাবা এই খবরটা আমাকে দিতে পারছেন না বলে কফি খাওয়াতে নিয়ে এসেছেন? এতক্ষণ যে টেলিফোনে কথা হল তা নিশ্চয়ই হাসপাতালের কারো সঙ্গে। তারাও ভাল কোনো খবর দিতে পারেনি। হয়ত আরো খারাপ দিয়েছে। নয়তো বাবার মুখ এমন শুকনো হয়ে যাবে কেন?

'রুমালী!'

'হুঁ।'

'কফিটা কেমন, খেতে ভাল না?'

'হুঁ।'

'তবে চিনি খুব বেশি। এক্সপ্রেসো কফির এই নিয়ম। চিনি বেশি দিতে হয়।'

'হুঁ।'

বাবা কফির মগে চুমুক দিতে দিতে অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন—রুমালী মা শোন, আমি একটা ভয়ংকর অন্যায় করে ফেলেছি। মানুষ যখন বড় ধরনের কোনো অন্যায় করে তখন সে বুঝতে পারে না যে সে অন্যায় করছে। বুঝতে পারলে অন্যায়টা সে করতে পারত না। তখন তার কাছে অন্যায়টাকে ন্যায় মনে হয়। যখন সে অন্যায়টাকে অন্যায় বলে মনে করে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আমি সহজ গলায় বললাম, তুমি কী অন্যায় করেছ?

বাবা প্রায় বিড়বিড় করে বললেন, আমি আমার অফিসের একজন কলিগকে বিয়ে করে ফেলেছি। তার নাম ইসমত আরা। ব্যাপারটা কীভাবে কীভাবে যেন ঘটে গেছে।

'বিয়ে কবে করেছ?'

'প্রায় তিন মাসের মতো হয়েছে। তোর মা'কে এখনো কিছু বলিনি। কীভাবে বলব তাও বুঝতে পারছি না। তোকেই প্রথম বললাম।'

'আমি কি মা'কে বলব?'

'না, তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার আমিই বলব। কীভাবে বলব সেটাই ভাবছি।'

আমি খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কফির মগে চুমুক দিচ্ছি। বাবার হয়তো ধারণা হল—

তিনি কী বলছেন তা আমি বুঝতেই পারিনি। বুঝতে না পারারই কথা, আমার বয়স তখন মাত্র এগারো, ক্লাস ফাইভে উঠেছি।

বাসায় ফেরার পথে বাবা কী মনে করে জানি দশ টাকা দিয়ে একগাদা কদম ফুল কিনলেন। কদম ফুলতো আর গোলাপ বা রজনীগন্ধার মতো দামি ফুল না। সস্তা ধরনের ফুল। টোকাইরা নিজেদের খেলার জন্যে গাছ থেকে পেড়ে আনে। কেউ সেই ফুল কিনতে চাইলে তারা যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি আনন্দিতও হয়। দু'টা ফুল চাইলে দশটা দিয়ে দেয়।

মা কদমফুল দেখে খুবই আনন্দিত হলেন তবে চোখে মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে বললেন, কী যে তোমার কাণ্ড। গন্ধ নেই, কিছু নেই এক গাদা ফুল নিয়ে এলে। জঞ্জাল দিয়ে ঘর ভরতি। কোনো মানে হয়? তাও যদি ঘরে কোনো ফুলদানি থাকত। এই ফুল আমি রাখব কোথায়, বালতিতে?

মা সেই জঞ্জাল গভীর আনন্দের সঙ্গে সাজিয়ে রাখলেন। এক ফাঁকে নিচু গলায় আমাকে বললেন, তোর বাবার এই এক বিশ্রী স্বভাব। ভাল ফুলটুল কিছু দেখলেই আমার জন্যে নিয়ে আসবে। আমি কি দেবী না-কি যে আমাকে ফুল দিয়ে অর্চনা করতে হবে?

ভালবেসে করে। আমি কখনো প্রশ্রয় দেই না। ভাব দেখাই যে রাগ করেছি। মা আনন্দের হাসি হাসছেন। তিনি জানতেও পারছেন না যে তাঁর জীবনে ভয়াবহ ধস নেমে গেছে। 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' তার জন্যে কেউ আর কোনো দিন আনবে না।

মা ব্যাপারটা জানতে পারেন আমার জানার দু'মাস পর। এই দু'মাসে আমি মা'কে কিছুই বলিনি। বাবাকেও না। আমি আমার নিজের মনে ক্লাস করেছি, গল্পের বই পড়েছি, ডাইরি লিখেছি। কে জানে আমি হয়ত খুব অদ্ভুত একটা মেয়ে।

AMARBOI.COM

১১

কী সুন্দর ঝকঝকে সকাল!

অঞ্চলটাকে যেন আগের রাতে সাবান দিয়ে মাজা হয়েছে। চকচক করছে চারদিক। চারদিক থেকে আভা বের হচ্ছে। কেউ যেন প্রতিটি গাছের পাতার আড়ালে সবুজ বাতি জ্বেলে দিয়েছে। আমি একতলায় নেমে দেখি—কেমন উৎসব উৎসব ভাব। সবাই এক সঙ্গে কথা বলছে। কেউ কারো কথা শুনছে বলে মনে হল না। সেলিম ভাই শুধু এক কোনায় একা একা বসে আছেন। মনে হচ্ছে তাঁর মন খুব খারাপ। তিনি আমাকে দেখেই চোখ নামিয়ে নিয়ে কেমন শক্ত হয়ে গেলেন। ডিরেক্টর সাহেব বা তাঁর স্ত্রী কাউকেই দেখলাম না। তাঁরা বোধ হয় ঘুম থেকে ওঠেননি। উনার স্ত্রীকে দেখার শখ ছিল।

মা খুব উৎসাহের সঙ্গে মওলানা সাহেবের সঙ্গে গল্প করছেন। মা'র মুখ হাসি হাসি। হাদিস কোরানের গল্প শুনে মা'র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হবার কথা না। নিশ্চয়ই অন্য কোনো গল্প। মওলানা সাহেবের কাণ্ড কারখানাও অদ্ভুত—দিব্যি সিনেমার দলের সঙ্গে মিশে গেছেন। সকালবেলাতেই উপস্থিত। মা আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন।

'বকুল, তোর ঘুম ভেঙেছে?'

'না, ভাঙে নি। এখনো ঘুমুচ্ছি। ঘুমুতে ঘুমুতে নিচে নেমে এসে এখন তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

'সব সময় বাঁকা কথা বলিস কেন? মাঝে মাঝে সোজা কথা বললে কী হয়?'

'ভাল হয়।'

'এখন ক'টা বাজে জানিস? দশটা।'

'তাই না-কি!'

'আজ নাশতা তেহারি। এক একজন দুই প্লেট তিন প্লেট করে খেয়ে নাশতা শর্ট ফেলে দিয়েছে। তোরটা আমি আলাদা করে রেখেছি। দাঁড়া গরম করে দিতে বলি।'

'তোমাকে এমন খুশি খুশি লাগছে কেন মা?'

'খুশির তুই কী দেখলি?'

মা রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেলেন। তাঁর আদরের কন্যার নাশতা যেন মিস না হয়। মওলানা সাহেব আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারেই কি তাঁর আগ্রহ? আমি তাঁকে খুব কম সময়ই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। সব সময় লক্ষ্য করেছি তিনি মেয়েদের আশেপাশেই আছেন এবং গুট গুট করে মেয়েদের সঙ্গেই কথা বলছেন।

'আম্মা কেমন আছেন?'

'জি ভাল আছি। আপনি ভাল?'

'আল্লাহপাকের অসীম রহমতে ভাল আছি।'

'আপনি দেখি একেবারে সিনেমার লোক হয়ে গেছেন।'

'সবই আম্মা আল্লাহপাকের হুকুম। স্যার আমাকে চাকরি দিয়েছেন। মাসিক বেতন দুই হাজার টাকা। আমার জন্য যথেষ্ট। চণ্ডিগড় স্কুলে বেতন ছিল বার শ। হাতে পেতাম ছয় শ। তাও সব মাসে না।'

'আপনার জন্যেতো ভালই হল। তবে মওলানা মানুষ হয়ে সিনেমার লাইনে চাকরি এইটাই যা কথা।'

'যে কোনো কাজই আম্মা সৎভাবে সৎ নিয়মে করা যায়। আল্লাহপাক নিয়তটা দেখেন। আর কিছু দেখেন না।'

'তা যায়। আপনার কাজটা কী?'

'স্যার এখনো কিছু বলেন নাই। স্যারের সঙ্গে এইটা নিয়েই কথা বলতে এসেছি। শুনলাম স্যারের শরীর ভাল না। জ্বর এসেছে। জ্বর আসারই কথা, কাল যে ভিজা ভিজেছেন। আম্মা আপনার জ্বর আসেনিতো?'

'জি না।'

'আলহামদুলিল্লাহ্।'

মা প্লেটে করে তেহারি এবং চামচ নিয়ে এসেছেন। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হয় মুখে তুলে খাইয়ে দেবেন। লোকজনের সামনে মা খানিকটা আহ্লাদী হয়ে যান। মেয়েকে মুখে তুলে খাইয়ে দিয়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন যে তাঁর মেয়ে অন্তপ্রাণ। আমি মা'র হাত থেকে প্লেট নিয়ে নিলাম।

'বকুল আস্তে আস্তে খা। কেয়ামতকে বলেছি শুকনা মরিচ ভেজে দিতে। পেঁয়াজ আর শুকনা মরিচ ভাজা মাখিয়ে খেয়ে দেখ খুব ভাল লাগবে।'

'আমার এম্নিতেই ভাল লাগছে।'

মা খুশি খুশি গলায় বললেন, কেয়ামত আসলেই ভাল রাঁধে, আমি তিন প্লেট খেয়ে ফেলেছি।

'সেকী?'

'কেউ বুঝতে পারেনি যে তিন প্লেট খেয়েছি।'

'বুঝতে পারলেই বা কী—তুমি দু'নম্বর নায়িকার মা, তুমি তিন প্লেট খাবে নাতো কে খাবে?'

'সব সময় ফাজলামি করবি না বকু। নাশতা খেয়ে মঈন ভাইকে দেখে আয়।'

'উনার আবার কী হয়েছে?'

'খুব জ্বর। কাল বৃষ্টিতে ভিজেছেনতো। পায়ে আবার কাঁটাও ফুটেছে। আমি গিয়ে দেখে এসেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাঁর স্ত্রীর কী অবস্থা মা, স্বামীর সেবাযত্ন করছেন?'

'সেজে কূল পায় না স্বামীর সেবা করবে কী! সকাল বেলাতেই লিপস্টিক-টিপস্টিক দিয়ে পরী সেজে বসে আছে। তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'আমার কথা জিজ্ঞেস করবে কেন? আমার কথা তাঁকে কে বলেছে?'

'বলতে হবে কেন? তুই ছবির নায়িকা তোকে চিনবে না? বকু শোন, মঈন ভাইয়ের ঘরে যাবার আগে সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে যাবি। আউলা ঝাউলা অবস্থায় যাবি না।'

'গেলে ক্ষতি কী?'

'ভদ্রমহিলা তোকে প্রথম দেখবেন। ফার্স্ট ইমপ্রেশনের একটা গুরুত্ব আছে না? কথায় বলে না, পহেলা দর্শনধারী তারপরে গুণবিচারি।'

আমি নাশতা শেষ করলাম। পরপর দু'কাপ চা খেলাম। ঘরে গিয়ে কাপড় পাল্টালাম, চুল বাঁধলাম। ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে কিন্তু গেলাম না। একা একা হাঁটতে বের হলাম। আজ আমি সারা দিন হাঁটব। দুপুরে ফিরব না। গেটের কাছে এসে এক ঝলকের জন্যে পেছন দিকে ফিরলাম। মা আমার পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা দেখছেন কি-না জানা দরকার। মা'কে দেখলাম না—অন্য একজনকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। ইনিই কি নীরা? আমি এত সুন্দর মানুষ আমার জীবনে দেখিনি। লম্বা ছিপছিপে একজন তরুণী। মাথা ভর্তি কোকড়ানো চুল। হালকা হলুদ রঙের শাড়িতে তাঁকে অবিকল হলুদ পাখির মতো লাগছে। তিনি হাত ইশারায় আমাকে থামতে বললেন। তিনি ইশারা না করলেও আমি থামতাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি—তিনি এগিয়ে আসছেন। হাঁটার ভঙ্গিটাও অন্য রকম। প্রাচীন কালের রাজকন্যারা কি এমন করে হাঁটতেন? যেন বাতাসের উপর দিয়ে ভেসে আসছেন।

'তুমি রুমালী না?'

'জি।'

'কী অদ্ভুত নাম—রুমালী।'

'আপনার মেয়ের নামওতো খুব অদ্ভুত—এন্টেনা।'

'ওর নাম কিন্তু আসলে এরিয়েল। ওর বাবা রেখেছিলো। যে নৌকায় করে কবি শেলী সমুদ্রে বেড়াতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছিলেন সেই নৌকাটার নাম ছিল এরিয়েল। এ রকম অপয়া নামতো রাখা যায় না কাজেই এরিয়েল বদলে কাছাকাছি একটা নাম রাখলাম—এন্টেনা।'

কী সহজ ভঙ্গিতেই-না মহিলা কথা বলছেন—যেমন আমার সঙ্গে তাঁর কতদিনের পরিচয়। পুরানো দুই অসম বয়সের বান্ধবী একসঙ্গে গল্প করছি।

'তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'একটু হাঁটব।'

'আশেপাশের লোকজনদের বাড়িঘরে গিয়েছ?'

'জি না একটা বাড়িতেই শুধু গিয়েছি। সেই বাড়িতে অনেক গাছ আছে। বিরাট একটা পুকুরও আছে।'

'ঐ বাড়িতেই কি যাচ্ছ?'

'এখনো ঠিক করিনি। যেতে পারি।'

'আমি যদি সঙ্গে যাই—তোমার কি আপত্তি আছে?'

'ছিঃ ছিঃ কী বলেন—আপত্তি থাকবে কেন? আপনি সঙ্গে গেলে আমার খুব ভাল লাগবে। এন্টেনাকে সঙ্গে নেবেন না?'

'না, ও থাকুক। ও গল্প করুক তার বাবার সঙ্গে। চল আমরা দু'জন যাই।'

আমরা পথে নামলাম। আমি আরেকবার পেছন দিকে তাকালাম। দলের সবই তাকিয়ে আছে। যেন বিরাট কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সেই ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছি আমরা দু'জন। বাকি

সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। এটি যদি সিনেমার কোনো দৃশ্য হত তাহলে ক্যামেরা আমাদের মুখ থেকে প্যান করে অপেক্ষমান ইউনিটের লোকজনদের মুখে পড়ত। তখন সাসপেন্স জাতীয় আবহসংগীত হত।

'রুমালী!'

'জি।'

'অভিনয় করতে কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'সবার কাছেই শুনেছি তুমি না-কি অসম্ভব ভাল অভিনয় কর।'

'আমি বুঝতে পারি না।'

'মঈন তোমার অভিনয়ের প্রশংসা করছিল। আমি অবশ্যি সব সময় ওর প্রশংসাকে গুরুত্ব দেই না। ওর রুচির সঙ্গে আমার রুচি প্রায়ই মেলে না। মঈনকে ডিরেক্টর হিসেবে তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল?'

'খুব ভাল। অবশ্যি আমি ডিরেক্টরতো বেশি দেখিনি।'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব সাবধানে কথা বলার চেষ্টা করছ। বি ইজি। সহজ হয়ে কথা বল। মানুষ হিসেবে মঈন কেমন?'

'তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাইনি।'

নীরা হেসে ফেললেন। সুন্দর সরল হাসি। শুরু থেকেই আমি সাবধান ছিলাম। এখন আরো সাবধান হয়ে গেলাম। নীরা খুব সহজ মেয়ে না। মনের দরজা জানালা বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে না। আবার মনের দরজা জানালা খোলা রেখেও কথা বলা যাবে না।

'রুমালী!'

জি।'

'তুমি তার সঙ্গে ভাল মতো মেশার সুযোগ পাওনি কথাটা কি ঠিক বললে? তুমিতো ভালই সুযোগ পেয়েছ। তুমি নিজে সুযোগ তৈরি করে নিয়েছ।'

'আপনি কী বলতে চাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি না।'

তিনি শান্ত গলায় বললেন, তোমরা কাশবনের শুটিং করতে গেলে। বৃষ্টি নামল। মঈন তার স্বভাবমতো বৃষ্টিতে রওনা হল। অসম্ভব বৃষ্টিপ্রীতির কারণে যে সে কাজটা করল তা কিন্তু না। তার মধ্যে প্রচুর লোক দেখানোর ব্যাপার আছে। তাকে দেখাতে হবে যে সে আর দশজনের মতো না। সে আলাদা। বুঝতে পারছ কী বলছি?

'জি।'

'সে বৃষ্টিতে নেমে গেল, ভিজতে ভিজতে ক্যাম্পে ফিরবে এই হল তার পরিকল্পনা। সে কি তোমাকে বলেছিল, এসো আমার সঙ্গে। আমরা দু'জন এক সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘরে ফিরি। বলেছিল?'

'জি না।'

'কিন্তু তুমি তার সঙ্গে চলে এলে। কাজটা কি তুমি নিজের ইচ্ছেয় করলে?'

'জি।'

নীরা আবারো আগের ভঙ্গিতে হাসলেন। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমাকে উনি অতল জলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। কাজটা করছেন খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তাঁর গলায় কোনো রাগ নেই। তিনি ছোট ছোট পায়ে হাঁটছেন। একবার দাঁড়াচ্ছেনও না।

'রুমালী।'

'জি।'

'তোমার ধারণা তুমি নিজের ইচ্ছেয় বৃষ্টিতে ভেজার জন্যে তার সঙ্গে রওনা হয়েছ। এই ধারণা ঠিক না। তুমি নিজের ইচ্ছায় আসনি। সে তোমাকে আসতে বাধ্য করেছে। সে পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি করেছে যে তোমার এ–ছাড়া দ্বিতীয় পথ ছিল না।'

'আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি। কাশবনের ওখানে আর কোনো মেয়ে ছিল না। আমি একা ছিলাম। যারা ছিলেন তাদের কারো সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। একা থাকতে আমার ভয় ভয় লাগছিল।'

'তুমি কাউন্টার আর্গুমেন্ট ভাল দাঁড় করিয়েছ। মঈনের সঙ্গে ঝড় এবং বৃষ্টিতে হাত ধরাধরি করে আসতে তোমার কি ভাল লাগছিল?'

'ভাল লাগছিল। তবে আমরা হাত ধরাধরি করে আসিনি। আপনি কোথাও একটা ভুল করছেন। আমি উনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। এর বেশি কিছু না।'

'তুমি তার প্রেমে পড়নি?'

'আপনি খুবই অদ্ভুত কথা বলছেন।'

'আমি মোটেই অদ্ভুত কথা বলছি না। তুমি অদ্ভুত কথা বলছ। তুমি খুব বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। বেশি বুদ্ধিমতী মেয়েদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে—তারা অন্যের বুদ্ধি খাটো করে দেখে। তারা সব সময় ভাবে পুরো পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে। সব সময় তা হয় না। খুব বুদ্ধিমানরাই বড় ধরনের বোকামি করে। তুমি একটা বড় ধরনের বোকামি করেছ।'

'কোন বোকামি?'

'এসো ঐ ছাতিম গাছটার নিচে বসি। বসে গল্প করি। হেঁটে টায়ার্ড হয়ে গেছি। মাথায় রোদও লাগছে। ছাতা নিয়ে আসা দরকার ছিল। আমার চায়ের পিপাসা হচ্ছে। তোমার কি হচ্ছে?'

'জি।'

'খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেয়ে তারপর চা খেতে পারলে ভাল হত। তাই না?'

'জি।'

'ঠাণ্ডা পানি এবং চা এখনই চলে আসবে।'

আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। নীরা হাসি মুখে বললেন, আমি কোনো ভবিষ্যৎ বাণী করছি না। ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা আমার নেই। তোমার সঙ্গে রওনা হবার আগে আমি সোহরাবকে বলে এসেছি যে ছাতিম গাছের নিচে আমি রুমালী মেয়েটিকে নিয়ে বসব, তার সঙ্গে গল্প করব। তুমি ঠাণ্ডা পানি এবং চা পাঠাবে।'

আমি চুপ করে আছি। ভদ্রমহিলা আমাকে ভালই চমকে দিয়েছেন। তিনি এগুচ্ছেন তাঁর পরিকল্পনা মতো। কী করবেন, কী বলবেন সবই মনে হয় ঠিক করা। আমার সঙ্গে যখন বের হয়েছেন তখন বুঝতেই পারিনি তিনি পুরো ব্যাপারটা ছকে ফেলে রেখেছেন। আমরা গাছের নিচে বসে আছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি সোহরাব চাচা আসছেন। তাঁর কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ। সেই ব্যাগে নিশ্চয়ই ফ্লাস্কভর্তি বরফ শীতল পানি। এবং অন্য ফ্লাস্কে চা। সুন্দর চায়ের কাপ। চিনির পটে চিনি। কয়েকটা নোনতা বিসকিটও থাকতে পারে।

'রুমালী'

'জি।'

'মঈনের চরিত্রের কোন দিকটি তোমাকে আকর্ষণ করেছে?'

'আমি সেই ভাবে কখনো বিচার করতে চেষ্টা করিনি।'

'যাকে তুমি এত পছন্দ কর তাকে তুমি নানান ভাবে বোঝার চেষ্টা করবে না? পছন্দের পেছনের কারণগুলি দেখবে না?'

আমি কিছু বললাম না, চুপ করে রইলাম। নীরা হালকা গলায় বললেন, ওর সবচে ভাল দিক হচ্ছে ওর ছেলেমানুষি। একটা বাচ্চা ছেলে ওর ভেতর বাস করে। বাচ্চারা কী করে জান? ওদের কিছু খেলনা থাকে। প্রিয়জনদের দেখা পেলেই সে তার খেলনাগুলি বের করে

দেখায়। নিজের খেলনায় সে মুগ্ধ হয়ে থাকে এবং চেষ্টা করে অন্যদের মুগ্ধ করতে। তোমাকে করেনি?

'কী খেলনার কথা বলছেন?'

'তার খেলনার বেশিরভাগই হচ্ছে গল্প। যেমন ধর তিনটা পিঁপড়ার গল্প। একজনের পেছনে একজন যাচ্ছে। এই গল্পটি তোমাকে বলেনি?'

'বলেছেন।'

'একটা পিঁপড়া এবং হাতির গল্প—এই গল্পটি করেছে?'

'জি।'

'যখের গল্প করেছে? যখ নিয়ে সে ছবি বানাতে চায় এই গল্প?'

'জি করেছেন।'

'এইসব হচ্ছে তার খেলনা। আশেপাশের মানুষদের মুগ্ধ করার জন্যে এই খেলনা সে ঝুমঝুমির মতো বাজায় এবং সবাই মুগ্ধ হয়। এক সময় আমিও হয়েছিলাম।'

'আপনার মুগ্ধতা কি কেটে গেছে?'

'মুগ্ধতা কেটে গেছে। মুগ্ধতার জায়গায় এখন যা আছে তার নাম করুণা। আমি তার প্রতি প্রবল করুণা বোধ করি। ও সেটা জানে। অন্যের ভালবাসা যেমন টের পাওয়া যায়, করুণাও টের পাওয়া যায়। অবশ্যি মঈন তেমন বুদ্ধিমান নয়। বুদ্ধিমান নয় বলেই কী পরিমাণ করুণা তাকে করি তা সে বুঝতে পারে না। ওর যে বুদ্ধি কম তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'যারা নিজের কাজে ডুবে থাকে বাইরে থেকে তাদের বোকা মনে হয়।'

'মনে হচ্ছে তুমি তাকে বোকা বলতে রাজি নও।'

সোহরাব চাচা পানি এবং চা নিয়ে এসেছেন। দৌড়ে এসেছেন বলে তিনি হাঁপাচ্ছেন। নীরা বললেন, তোমার স্যারের ঘুম ভেঙেছে?

'জি।'

'কী করছে?'

'কিছু করছেন না, শুয়ে আছেন। স্যারের জ্বর মনে হয় বেড়েছে। একজন ডাক্তার আনতে যাব।'

'যাও, ডাক্তার নিয়ে এসো। চা ঢালতে হবে না আমরা ঢেলে নেব।'

সোহরাব চাচা চলে গেলেন। নীরা চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, তুমি আমাকে ভয় পেও না। আমার সঙ্গে সহজভাবে কথা বল। আমি ভয়ংকর কেউ না। আমি ভাল মেয়ে। কী পরিমাণ ভাল মেয়ে তা তুমি জান না।

আমি বললাম, আমি সহজ হতে পারছি না। আমার নিজেকে একজন আসামির মতো মনে হচ্ছে। যেন আমি কোনো ভয়ংকর অপরাধ করেছি। আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো হয়েছে। আর আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন।'

'তুমি কোনো অপরাধ করনি?'

'জি না।'

'আমার নিজের ধারণা তুমি ভয়ংকর একটা অপরাধ করেছ। ঝড় বৃষ্টিতে তোমরা দৌড়ে একটা স্কুল ঘরে আশ্রয় নিলে। তাই না?'

'জি।'

'কতক্ষণ ছিলে সেখানে?'

'খুব অল্প সময় ছিলাম। মওলানা সাহেব প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের খুঁজে পেলেন।'

নীরা হাসি মুখে বললেন, আচ্ছা মওলানা সাহেব যদি আরেকটু দেরি করে আসতেন তাহলে কী হত?

আমি চুপ করে আছি। তাকিয়ে আছি তাঁর দিকে। তিনি চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। দূর থেকে দেখে যে কেউ বলবে আমরা দু'জন চা খেতে খেতে মজা করে গল্প করছি।

'তুমি কি তার হাত ধরতে? কিংবা আরো কিছু? চুপ করে আছ কেন? চা খাও। চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। চা-টা ভাল হয়েছে। তাই না?'

'জি।'

'সিলেটে আমার চাচার একটা চায়ের বাগান আছে। সেই বাগানের চা। কী সুন্দর ফ্লেভার। রুমালী?'

'জি।'

'শুনেছি তুমি খুব ভাল গান জান।'

'গান গাইতে পারি। ভাল কি-না জানি না।'

'শুনাও, একটা গান শুনাও।'

আলোচনা কি অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে? মোড় নিলেও লাভ হবে না, তিনি আবারো মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসবেন। এটা সাময়িক বিরতি। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কী ধরনের গান শুনতে চান?

'এরকমভাবে বলছ যেন সব ধরনের গানই তুমি জান। "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না"। এটা জান?'

'জি না।'

'তাহলে তোমার ইচ্ছামতো একটা গান কর।'

আমি দেরি করলাম না, সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম—

Down the way
Where the nights are gay
I took a trip
On a sailing ship
And when I reached Jamica I made a stop.

আমি গান করছি, নীরা তীক্ষ্ণচোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর ঠোঁটে বিচিত্র হাসি। এখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছেন। তিনি তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। চারদিক কী অপূর্ব সুন্দর। আকাশ ঘন নীল। আমার গান গাইতে ভাল লাগছে।

এই গানের যদি অনেকগুলি অন্তরা থাকত খুব ভাল হত। আমি গেয়ে যেতাম গান ফুরাতো না। আমি আপন মনে গাইছি। একবারও নীরার দিকে তাকাচ্ছি না। না তাকিয়েও বুঝতে পারছি—তিনিও আমার দিকে তাকাচ্ছেন না। না দেখেও আমি বলতে পারি কেউ আমার দিকে তাকাচ্ছে কি তাকাচ্ছে না।

এক সময় গান শেষ হল, আমি নীরার দিতে তাকিয়ে হাসলাম। উনি এখন কী করবেন? আমাকে কি বলবেন, চল ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া যাক। না-কি পুরানো প্রসঙ্গ আবার শুরু করবেন। মহামান্য আদালত একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকবেন। নানান দিক থেকে আক্রমণ করে দুর্গে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করবেন। নীরা যত বুদ্ধিমতীই হোন না কেন—আমার দুর্গে ফাটল ধরাতে পারবেন না। ইট-কাঠ-লোহার দুর্গে ফাটল ধরানো যায়—ভালবাসার দুর্গে ফাটল ধরানো যায় না।

'রুমালী!'

'জি।'

'তোমার গানের গলা ভাল।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'শুধু ভাল বলে ভুল করেছি—খুব ভাল। তুমি কি মঈনকে তোমার গান শুনিয়েছ?'

'জি না।'

'শোনাওনি কেন? সে যেমন তেমাকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করছে, তুমিও করবে। সেটাই নিয়ম।'

'উনি শুনতে চাননি।'

'কেউ শুনতে না চাইলে তুমি গান শোনাও না?'

'জি না। কথা নেই, বার্তা নেই আমি হুট করে গান শুরু করব কেন? এইসবতো শুধু সিনেমাতেই হয়।'

'তুমিতো সিনেমা করতেই এসেছ!'

নীরা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কথার পিঠে কথা জুড়ে তিনি এগুচ্ছেন। আমার ক্লান্তি লাগছে। আমি কি তাঁকে বলব—কথা কথা খেলা খেলতে ইচ্ছে করছে না। অন্য কোনো খেলা খেলতে চাইলে বলুন। পশু-পাখি-ফুল-ফল খেলা খেলবেন? আসুন আমরা পশু-পাখি-ফুল-ফল খেলা খেলি।

'রুমালী!'

'জি।'

'মঈনের সঙ্গে আমার বিয়ে কীভাবে হল এই গল্প কি শুনবে? খুব ইন্টারেস্টিং গল্প। শুনলে তোমার ভাল লাগবে।'

'বলুন শুনব।'

নীরা ফ্লাস্ক থেকে আবারো চা নিলেন। তাঁর চা খাবার ব্যাপারটা মজার। ফ্লাস্ক থেকে অল্প অল্প চা কাপে ঢালেন। কাপ শেষ হয়, আবারো নেন। তিনি হালকা গলায় বললেন, আমাদের বিয়ে কিন্তু প্রেমের বিয়ে নয়। আমাদের হচ্ছে এরেন্জ্ড ম্যারেজ। তবে এই এরেন্জ্মেন্টের ব্যাপারটি আমার করা। এরেন্জ্ড ম্যারেজে সাধারণত বর কনের কোনো ভূমিকা থাকে না। তাদের আত্মীয় স্বজনরাই সব ব্যবস্থা করেন। আমার বিয়ের বেলায় সব ব্যবস্থা আমিই করেছি। আমি বাবাকে গিয়ে বলেছি, বাবা মঈন নামের এই ছেলেটিকে আমি বিয়ে করতে চাই। বাবা তখন কফি খাচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি এতই চমকালেন যে তাঁর হাত থেকে কফির পেয়ালা পড়ে গেল। কার্পেটে কফির দাগ লেগে গেল। সেই দাগ এখনো আছে। তুমি যদি কখনো আমাদের বাড়িতে যাও তোমাকে দেখাব। গল্পের ভূমিকাটা কেমন?

'জি ভাল।'

'আমি যখন আমাদের ধানমণ্ডির বাড়িতে বেড়াতে যাই—তখন একবার হলেও বসার ঘরে যাই। কফির দাগ ভরা কার্পেটটার দিকে তাকিয়ে থাকি—আমার খুব মজা লাগে। আচ্ছা এখন গল্পটা শোন।'

'জি শুনছি।'

'মঈন তখন সবে মাত্র ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেছে। চাকরি বাকরির চেষ্টা করছে—পাচ্ছে না। খুবই দুরবস্থা। সব সময় দু'বেলা ভাত খাবার মতো টাকাও থাকে না। কোনো কাজে যখন কারো বাসায় যায়—দুপুর বেলায় ভাত খাবার সময়ে যায়। তারা যদি ভদ্রতা করেও একবার বলে—ভাত খেয়ে যাও, সে দেরি করে না, সঙ্গে সঙ্গে বলে—জি আচ্ছা। কোথায় হাত ধোব? এই হল তার অবস্থা।'

নীরা খিলখিল করে হাসছেন। সহজ সরল হাসি। গল্পটা বলতে পেরে তাঁর খুব ভাল লাগছে তা বুঝতে পারছি। তিনি যে তাঁর বিয়ের গল্প করবেন, এটিও কি তাঁর পরিকল্পনায় ছিল? গল্পটা হবে ঈশপের গল্পের মতো। গল্পের শেষে আমার জন্যে ছোট্ট উপদেশ থাকবে।

'রুমালী!'

'জি।'

'তারপর শোন—মঈনের অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে দেখে বোঝার কোনো উপায় কিন্তু ছিল না। কাপড়চোপড়ে সে সব সময় খুব ফিটফাট। নিজেকে মানুষের সামনে সুন্দর করে উপস্থিত করার একটা ব্যাপার তার মধ্যে সব সময় ছিল। এখনো আছে। কী আছে না?'

'জি আছে।'

'এক দিন সকালের কথা। ছুটির দিন—বাবা বাসায় আছেন। খুবই আশ্চর্যজনকভাবে তাঁর মেজাজ ভাল। বাসায় যখন থাকেন তাঁর মেজাজ ভাল থাকে না। অকারণে হৈচৈ করেন। সেই দিন তিনি হাসিমুখে আমার সঙ্গে গল্প করছেন। গল্পের বিষয়বস্তু হল জনৈক পীর সাহেবের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা। সেই পীর মানুষকে দেখা মাত্র তার ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব হড়হড় করে বলে দিতে পারে। সে বাবার অফিসে এসেছিল। বাবা তার ক্ষমতায় মুগ্ধ ও বিস্মিত। আমার কোথায় বিয়ে হবে, কবে হবে এইসব সে বাবাকে বলেছে। বাবা খুব আগ্রহ করে পীর সাহেবের কথা বলছেন—আমি খুব মুগ্ধ হয়ে শোনার অভিনয় করে যাচ্ছি এমন সময় দারোয়ান এসে বলল—একটা ছেলে দেখা করতে চায়। পাঁচ মিনিট কথা বলবে। নাম মঈন।

এইসব ক্ষেত্রে বাবার জবাব হচ্ছে—'না'। বাড়িতে তিনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে অফিসে দেখা করতে হবে। সেই দেখা হবার ব্যাপারপাও খুব সহজ না। বাবার পিএ প্রথম কথাটথা বলে দেখবে ঘটনা কী। সে যদি মনে করে এপয়েন্টমেন্ট দেয়া যায়—তাহলে হবে। সেটাও বেশ জটিল পদ্ধতি। ঐযে তোমাকে বললাম, বাবার মেজাজটা ছিল ভাল, ভাল মেজাজের কারণে তিনি বলে ফেললেন আসতে বল।

মঈন এসে ঢুকল। ঝকঝকে চেহারার যুবক। হাসি খুশি ভঙ্গি। জড়তা তেমন নেই। অপরিচিত একটা বাড়ির বিশাল ড্রয়িং রুমে সে ঢুকেছে তা নিয়ে তার সামান্যতম সংকোচও নেই। অপরিচিতা রূপবতী তরুণীর সামনে স্বাভাবিক কারণেই ছেলেদের কিছু সংকোচ থাকার কথা—তাও নেই। সে ঘরে ঢুকেই আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে। সেই হাসির মানে হচ্ছে —কী ভাল আছেন?

বাবা গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, কী ব্যাপার?

মঈন বলল, স্যার আমি আপনার দশ মিনিট সময় নেব। ঘড়ি দেখে দশ মিনিট। এর বেশি এক সেকেন্ডও না।

বাবা বললেন, তুমি দারোয়ানকে বলেছ পাঁচ মিনিট। এখন দশ মিনিট বলছ কেন?

'স্যার—আমি আপনাকে একটা গল্প বলব। গল্পটা বলতে সাত মিনিট লাগবে। গল্পের শেষে তিন মিনিট আমার বক্তব্য বলব। আমি আপনার কাছে কোনো চাকরির জন্যে আসিনি। বা ভিক্ষা করতেও আসিনি। দয়া করে দশটা মিনিট সময় দিন।'

বাবা বললেন, বোসো। দশ মিনিট অনেক দীর্ঘ সময়। তোমার যা বলার পাঁচ মিনিটে বলে শেষ কর। আমি জরুরি কিছু কাজ করছি।

মঈন তার গল্প শুরু করল। কোন গল্প জান? তার বিখ্যাত যখের গল্প। বাবা ভুরু কুঁচকে গল্প শুনছেন। বাবা পীর ফকির ছাড়া কোনো কিছুতেই বিস্মিত হন না। গল্প শুনে বিস্মিত হচ্ছেন না। এমন উদ্ভট গল্প ছেলেটি কেন বলছে তা বের করার চেষ্টা করছেন। আমি অবাক হয়েই গল্প শুনছি। গল্প শেষ হল। বাবা ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, তুমি এই গল্প আমাকে কেন বলছ?

মঈন বলল, গল্পটি নিয়ে আমি একটা ছবি বানাতে চাই। থার্টি ফাইভ মিলিমিটারের ফুল লেংথ ফিচার ফিল্ম্। আপনি কি আমাকে সাহায্য করবেন?

বাবা দীর্ঘ সময় মঈনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জীবনে এমন অদ্ভুত প্রস্তাবের মুখোমুখি তিনি সম্ভবত হননি। মঈন বলল, আপনারতো নানান ধরনের ব্যবসা আছে। ব্যবসায় টাকা খাটাচ্ছেন—ছবির ব্যবসা করে দেখুন। আপনি চাইলে আমি চিত্রনাট্য দিয়ে যাব। আপনি পড়লেই বুঝতে পারবেন—খুব সুন্দর গল্প। ভাল মতো বানাতে পারলে অপূর্ব হবে। এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আমি ছবিটা খুব ভাল বানাব। ছবির ব্যবসায় আপনার হয়ত লাভ হবে না। ক্ষতিই হবে। তবে দেশ একটা ভাল জিনিস পাবে। সামান্য আর্থিক ক্ষতি আপনার গায়ে লাগবে না।

বাবা বললেন—এই অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে তুমি কি শুধু আমার কাছে এসেছ না আরো অনেকের কাছে গিয়েছ?

'অনেকের কাছে যাইনি। কয়েকজনের কাছে গিয়েছি। বিত্তবানদের বাড়িতে চট করে ঢোকা যায় না। আর যদিও বা ঢোকা যায় তাঁরা কিছু শুনতে চান না।'

বাবা বললেন, আমি শুনলাম। তুমি দশ মিনিট সময় চেয়েছিলে—আমি এগারো মিনিট দিলাম। এখন তুমি যেতে পার।

'চলে যাব?'

'অবশ্যই চলে যাবে।'

'জি আচ্ছা।'

'তোমার প্রফেশন কি ছবি বানানো?'

'জি না—এখন পর্যন্ত কোনো ছবি বানাইনি। তবে ছবি বানানোর খুব শখ।'

'পড়াশোনা কী?'

'আমি দু'বছর আগে ফিলসফিতে এমএ পাস করেছি।'

'চাকরি–বাকরি করছ?'

'জি না। কোথাও কিছু পাচ্ছি না।'

'বিয়ে করেছ?'

'জি না।'

'আমার একটা উপদেশ শোন। ছবির চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল। চাকরি জোগাড়ের চেষ্টা কর। রেফারেন্সের প্রয়োজন হলে আমি রেফারেন্স দিতে পারি। এখন তুমি যেতে পার।'

মঈন উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, চা খেয়ে যান।

মঈন সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল। যেন এই কথাটার জন্যেই সে অপেক্ষা করছিল। আমি চা এনে দিলাম। উটকো গেস্টদের জন্য চায়ের সঙ্গে বাসি চানাচুর দেয়া হয়। তাই দেয়া হল।

বেচারা খুব আগ্রহ করে পিরিচের সব চানাচুর খেয়ে ফেলল। তার খাওয়া দেখে মনে হল সে খুবই ক্ষুধার্ত। আমার এত মায়া লাগল যে বলার না। আমি বললাম, আপনি কি আর কিছু খাবেন? কেক আছে? কেক দেব? মঈন বলল, জি আচ্ছা দিন।

আমি কেক এনে দিলাম। এবং সেদিন বিকেলেই বাবাকে বললাম—বাবা তুমিতো আমাকে কোথায় বিয়ে দেবে এই নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করছ। এমনকি পীর ফকির পর্যন্ত ধরছ। তোমাকে একটা কথা বলি—মঈন নামের এই মানুষটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। বাবার হাত থেকে কফির কাপ পড়ে গেল। এই হল গল্প। গল্প কেমন লাগল?

'ভাল।'

'তোমার কাছে কি গল্পটা সিনেমেটিক মনে হয়নি?'

'জি না।'

নীরা হাসতে হাসতে বললেন, সিনেমেটিকতো বটেই। একদিকে সহায় সম্বলহীন যুবক। অন্যদিকে বড়লোকের আদরের দুলালি। হিন্দি সিনেমার সঙ্গে খুব মিল। তবে একটা অমিল ছিল—হিন্দি সিনেমায় এইসব ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা মা বেঁকে বসেন। বাবা রেগে আগুন হয়ে নিজ খান্দান নিয়ে অনেক কথা বলেন। মেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে করুণ গান শুরু করে। আমার বেলায় সে সব কিছু হয়নি। বাবা কয়েকদিন খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। মঈনের বাড়ি ঘরের খোঁজ নিলেন, তারপর যথাসময়ে বিয়ে হয়ে গেল। নো ক্লাইমেক্স, নো এন্টি ক্লাইমেক্স। মঈন তার মেস ছেড়ে আমাদের বাড়িতে থাকতে এল। এবং প্রবল উৎসাহে ছবি বানাতে শুরু করল। যখের ছবি না, অন্য ছবি।

'ছবি বানাবার টাকা কে দিলেন—আপনার বাবা?'

'না, আমি দিলাম। তার সমস্ত ছবির আমিই প্রযোজক। এখন যে ছবি বানাচ্ছে তার টাকাও আমার দেয়া। টাকা দেয়া বন্ধ করলেই ছবি বন্ধ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীরা খুব হাসছেন। কেন হাসছেন? একজন মানুষকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন সেই আনন্দে হাসছেন? নীরা হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—

'আমি কি খুব বেশি হাসছি?'

'জি না।'

'আমারতো মনে হয় বেশি হাসছি। মেয়েরা বেশি হাসলে খুব অস্বাভাবিক লাগে। কাঁদলে স্বাভাবিক লাগে। আমার সমস্যা হচ্ছে আমি কাঁদতে পারি না। তুমি কাঁদ কেমন?'

'আমিও কম কাঁদি।'

'দ্যাটস গুড। কম কাঁদাই ভাল। চল ওঠা যাক।'

নীরা উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, ক্যাম্পে যাবেন? নীরা বললেন, না। ক্যাম্পে যাব না। তুমি চলে যাও—আমি একা খানিকক্ষণ হাঁটব।

'জি আচ্ছা।'

'রুমালী দাঁড়াও তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। মঈন কী তোমাকে তার শৈশবের গল্প করেছে? কীভাবে সে এতিমখানায় মানুষ হয়েছে এইসব?'

'জি না।'

'ও—তুমি তাহলে এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছ। তার পছন্দের বিশেষ বিশেষ মেয়েদের সে তার শৈশবের গল্প করে। সহানুভূতি পাওয়ার জন্যে এটা করে। তোমার সঙ্গেও করবে। এমনভাবে করবে যে শুনতে শুনতে তোমার চোখে পানি এসে যাবে। বাসর রাতে সে তার ভয়াবহ শৈশবের গল্প আমার সঙ্গে করেছে। আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল।'

নীরা আবারো হাসছেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মঈন তোমাদের সঙ্গে এক ধরনের খেলা খেলছে। অসুস্থ মানুষের অসুস্থ খেলা। সে যে অসুস্থ তা কি তুমি টের পেয়েছ?'

'জি না।'

আমিও বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম করুণায় মন ভরে গেল। করুণাও এক ধরনের ভালবাসা। তবে ক্ষতিকারক ভালবাসা। এই ভালবাসা মানুষকে অসুস্থ করে দেয়। আমাকে যেমন করে দিয়েছে। অসুস্থ মানুষের মতো তোমার সঙ্গে গল্প করছি। অকারণে হাসছি। এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি তার প্রেমে পড়েছ, পড়তেই পার। আমিওতো প্রেমে পড়েছিলাম। জানি না শুনি না একজনকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি যদি হও তাতে দোষ কী? ভাল কথা—তুমি কি তাকে বিয়ে করতে চাও?'

'আপনি এসব কী বলছেন?'

'আকাশ থেকে পড়ার অভিনয় করবে না রুমালী। অভিনয় ভাল হচ্ছে না। আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় অভিনেত্রী। তুমি মাঝেমধ্যে অভিনয় করছ আমি সারাক্ষণই করছি। এখন আমি এমন হয়েছি যে আমি কখন অভিনয় করছি কখন করছি না, তা নিজেই জানি না। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

'জি না।'

'মঈনের মধ্যে প্রায়ই সুইসাইডের টেনডেনসি দেখা যায়। সে একা একা ছাদে উঠে যায়। ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়বে। এই রকম একটা পরিকল্পনা থাকে। আমি তাকে কী বলি জান? আমি বলি—প্লিজ ডু দ্যাট। একটু সাহস করে লাফ দিয়ে পড়। এটা তোমার জন্যে পরম শান্তির ব্যাপার হবে। আমি ধাক্কা দিয়ে তোমাকে ফেলে দিতে পারলে ভাল হত। আমি তা করব না। এই ব্যাপারটা তোমাকেই করতে হবে।'

নীরা নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামলেন। আমি বললাম, এখন যাই?

'আচ্ছা যাও। ও, জাস্ট এ মিনিট, তোমাদের এখানে নাকি একজন মহিলা পীর আছেন। মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দেন। তিনি নাকি বলেছেন চণ্ডিগড়ে কোনো ছবি হবে না। একজন মানুষ

মারা যাবে। আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করব। যে মানুষটা মারা যাবে সে মঈন কি-না জিজ্ঞেস করব। তুমি কি তার বাড়ি চেন?'

'জি চিনি।'

'আমাকে তুমি তার বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে যাও।'

'চলুন।'

'তুমি মহিলা পীরের কাছে গিয়েছিলে?'

'জি।'

'তোমাকে কী বলেছিল?'

'আমাকে কিছু বলেননি।'

'সেকী, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জানতে চাওনি?'

'জি না।'

'ভবিষ্যৎ জেনে নেবার এমন সুযোগ হাতছাড়া করলে, এটা ঠিক না। নেক্সট টাইম তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও ডিরেক্টর মঈন সাহেব তোমাকে বিয়ে করবেন কি করবেন না।'

আমি নিঃশব্দে হাঁটছি। নীরা আমার পেছনে পেছনে আসছেন। আমি তাঁর দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারছি—তার মুখ হাসি হাসি। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

'রুমালী!'

'জি।'

'আমার উপর খুব রাগ লাগছে?'

'জি না।'

'আমার ধারণা খুব রাগ লাগছে। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। আমি যা বললাম তোমার ভালর জন্যে বললাম। মন্দের জন্যে যে সব কথা বলা হয় সে সব শুনতে খুব ভাল লাগে। ভালর জন্যে বলা কথা শুনতে অসহ্য বোধ হয়।'

'আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে না। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে আপনার কথা শুনছি।'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। হাত উঁচিয়ে মহিলা পীরের বাড়ি দেখিয়ে দিলাম। নীরা বললেন, থ্যাংক য়্যু—এখন তুমি চলে যাও। তোমাদের ডিরেক্টর সাহেবকে বলবে যে আমার ফিরতে সামান্য দেরি হতে পারে। সে যেন অস্থির না হয়। আমি যখন তার আশপাশে থাকি তখন সে আমার সামান্য অদর্শনে অস্থির হয়ে পড়ে। ডিরেক্টর সাহেবকে আমার খবরটা দিও?

'জি আচ্ছা।'

'তুমি তাকে আপনি করে বল, না তুমি করে বল?'

'আপনি করে বলি।'

'সেকী, এখনো তুমির লেভেলে নামতে পারনি। তোমার মতো অবস্থা যাদের তাদের সবাইতো তাকে তুমি করে বলে। সেটাইতো শোভন। আপনি আপনি করেতো আর প্রেম করা যায় না। প্রেমের জন্যে একই সমতলে নেমে আসতে হয়। তাই না?'

আমি দাঁড়িয়ে আছি, নীরা জাহেদার বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। কত সহজ ভঙ্গিতেই না যাচ্ছেন, যেন কিছুই হয়নি। নিশ্চয়ই তিনি জাহেদার সঙ্গে অনেক মজার মজার গল্প করবেন। আমার ক্যাম্পে ফিরতে ইচ্ছা করছে না। সোমেশ্বরী নদীটাকে কি একবার দেখে আসব? ভয়ংকর স্রোত কি একটু কমেছে, না বেড়েছে? এই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে ডুবে যাবার কথাতো না। স্রোত নিশ্চয়ই অনেক দূর পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। নদীর পানিতে চিৎ হয়ে শুয়ে থেকে—আকাশ দেখতে দেখতে সমুদ্রের দিকে যাত্রা। কেন জানি খুব ঘুম পাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি অনেক দিনের অঘুমো। শান্তিময় ঘুমের তৃষ্ণায় শরীর কাতর হয়ে আছে। ক্যাম্পে গিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেই আমি গাঢ় ঘুমে তলিয়ে যাব। কে জানে সেই ঘুম হয়তো কোনোদিনও ভাঙবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

ডাকবাংলোর সামনে পাপিয়া ম্যাডামের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাহলে চলে এসেছেন। জালালের মা'কে দেখতে পাচ্ছি। সেও এসেছে। সোহরাব চাচাকে দেখছি। তিনি বক্তৃতার ভঙ্গিতে কী যেন বলছেন। তাঁকে ঘিরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। মন দিয়ে বক্তৃতা শুনছে। তাদের মধ্যে একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক। তাঁকে আগে দেখিনি। তিনিও বোধহয় আজই এলেন। শুটিংয়ের দ্বিতীয় পর্যায় তাহলে শুরু হতে যাচ্ছে। শুরু হোক—প্রবল কাজের মধ্যে ডুবে যাওয়াই ভাল। ইউনিটের লোকজন ঝিমিয়ে পড়েছিল। পাপিয়া ম্যাডামকে দেখে ঝিম ভাব কাটবে।

আমি সবার চোখ এড়িয়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বিছানায় শোয়ামাত্রই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ছি না অন্য কিছু। খুব শীত লাগছে, গা কাঁপছে। আমার ঘরের পাশেই কারা যেন হাসাহাসি করছে। কারা হাসছে? জালালের মা?

ঘুমের মধ্যেই শুনলাম ঘুঘু ডাকছে। এখন সকাল না, দুপুর? সব এলোমেলো লাগছে। কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে সকাল। কেমন নরম আলো। আচ্ছা, সকাল বেলা ঘুঘু ডাকছে কেন? ঘুঘু ডাকবে দুপুরে। উল্টাপাল্টা ডাকছে কেন? আমার গানের স্যার মোসাদ্দেক সাহেব বলতেন—পাখিদের গলায় রাগরাগিণী আছে। কোনো কোনো পাখির গলায় আছে ভৈরবী। তারা ডাকে সকালে, আবার কারো গলায় দরবারি কানাড়া—এরা ডাকবে দুপুরে যেমন ঘুঘু। যাদের গলায় বেহাগ তারা ডাকবে নিশি রাত্রে যেমন শ্মশান-কোকিল। মোসাদ্দেক স্যার খুব সুন্দর করে কথা বলতেন। গান শেখাতেনও চমৎকার। আমি প্রথম দিন স্যারকে বললাম, স্যার আমার কি গান হবে? তিনি আমার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বললেন, মাগো, তোমার গলা দিয়ে কি শব্দ বের হয়?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি মুখ ভর্তি পান নিয়ে বললেন, শব্দ বের হলে গান হবে। গাধা যে প্রাণী সেও গান গায় আর মানুষ গাইবে না সে কেমন কথা?

'স্যার, গাধা কি গান গায়?'

'অবশ্যই গায়। গাধার নিজস্ব রাগিনীও আছে—গর্ধভ রাগিনী। হা হা হা।'

মোসাদ্দেক স্যার শিক্ষক হিসেবে চমৎকার ছিলেন, মানুষ হিসেবেও চমৎকার ছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি তাঁর মমতার সীমা ছিল না। তিনি প্রায়ই বলতেন, গানের শিক্ষকরা কী করে জানিস? তারা জায়গায় জায়গায় গানের চারাগাছ পুঁতে। বেশিরভাগ চারাই গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলে। কোনোটায় অল্প বয়সে পোকা ধরে। আবার কিছু চারাগাছ মহীরুহ হয়ে যায়। ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড। সে এক দেখার মতো দৃশ্য।

এই মোসাদ্দেক স্যার আমার চোখের সামনে তাঁর এক ছাত্রীর প্রেমে পড়ে গেলেন। মেয়েটার নাম আভা। তের চৌদ্দ বছরের বেশি বয়স হবে না। খুবই সাধারণ টাইপ মেয়ে। এই সাধারণের ভেতর স্যার অসাধারণ কী দেখলেন কে জানে। তিনি সবার চোখের সামনে বদলে যেতে শুরু করলেন। নিজের ঘরসংসার ছেলেমেয়ে সব তুচ্ছ হয়ে গেল। কী ভয়ংকর অবস্থা। আভা গান শেখা ছেড়ে দিল। স্যার আভাদের বাসার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা শুরু করলেন। পাড়ার ছেলেরা তাকে একবার খুব মারল। তাতেও লাভ হল না। তাঁর মধ্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। সারাক্ষণ বিড়বিড় করতেন। গান সেখানো বন্ধ করে দিলেন। সংসারে চরম অভাব নেমে এল। স্যারের স্ত্রী, পুরানো ছাত্রছাত্রীদের বাসায় বাসায় গিয়ে ভিক্ষা করা শুরু করলেন।

তারপর একদিন খবর পেলাম সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি পেঁচিয়ে স্যার ঝুলে পড়েছেন। মানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ কষ্ট থেকে চিরমুক্তি। কী আশ্চর্য মোসাদ্দেক স্যারের কথা হঠাৎ মনে আসছে কেন? আমি কিছু মনে করতে চাই না। আমি দীর্ঘ সময় শান্তিতে ঘুমুতে চাই। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ।

মোসাদ্দেক স্যারকে কাল রাতে হঠাৎ স্বপ্নে দেখেছি। না না কাল না, পরশু রাতে। বেশ হাসি খুশি চেহারা। মুখ ভর্তি পান। পানের রস গড়িয়ে পাঞ্জাবিতে পড়েছে। স্যারের কোনো খেয়াল নেই। আমি বললাম, কেমন আছেন স্যার? স্যার হাসতে হাসতে বললেন, খুব ভাল আছি। তুই কেমন আছিস?

'আমি ভাল আছি।'

আমি পানি নিয়ে এসে দেখি স্যার নেই। ঘর ফাঁকা। আমার ঘুম ভেঙে গেল। জেগে দেখি মা'কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছি। ঘর ভর্তি সিগারেটের গন্ধ। পানের জর্দার গন্ধ। মোসাদ্দেক স্যার সিগারেট খেতেন, জর্দা দিয়ে পান খেতেন। তিনি চলে গেছেন—সিগারেট এবং জর্দার গন্ধ ফেলে রেখে গেছেন। ভয়ে আমার শরীর কেমন করতে লাগল। আমি গুটিসুটি মেরে মা'র বুকের কাছে চলে গেলাম—তবু আমার ভয় কাটল না। আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, বাবা বাবা।

খুব ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড ভয় পেলে আমি বাবাকে ডাকি। বাবা যদি একবার বলেন, কী হয়েছে রে? সঙ্গে সঙ্গে ভয় কেটে যায়। অভ্যাস মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যায়। বাবার কাছ থেকে আমি কতদূরে চলে এসেছি—তারপরেও ভয় পেয়ে তাঁকেই ডাকলাম। তিনি সাড়া দিলেন না। কিন্তু আমার ভয় কেটে গেল।

আজ আবারো ভয় পাচ্ছি। আমি জানি না এই ভয়ের উৎস কী? আমি জানি না কেন ভয় পাচ্ছি। আমার ঘুম কেটে গেছে। চোখ বন্ধ করে বিছানায় পড়ে আছি। ক্যাম্পের হৈচৈ কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। ঠিক বুঝতে পারছি না। বুঝতে চেষ্টাও করছি না। নিজেকে খুব আলাদা মনে হচ্ছে।

দরজা খুলে মা ঢুকলেন। আমাকে দেখে হতভম্ব গলায় বললেন, তুই এখানে শুয়ে আছিস? কী আশ্চর্য!

মা'কে দেখে আমার ভাল লাগছে—আমি আদুরে গলায় বললাম, আশ্চর্য কেন মা।

'তোকে দেখলাম, নীরা ভাবীর সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিস। তুই কোন ফাঁকে চলে এলি?'

'কোন ফাঁকে চলে এসেছি আমি নিজেও জানি না মা।'

'পাপিয়া ম্যাডাম চলে এসেছে জানিস?'

'জানি।'

'মেয়েটাকে নিয়ে এসেছে। পাতিলের তলার মতো কালো। মানুষ এত কালো হয় এই প্রথম দেখলাম।'

'মা আমার পাশে একটু বসতো।'

'তোর কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি—আমি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শুয়ে থাকব।'

'শরীর খারাপ?'

'হুঁ।'

মা উদ্বিগ্ন মুখে বিছানায় উঠে এলেন। আমার কপালে হাত রাখলেন। আমি তাঁর কোলে মাথা রেখে তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। মা কোমল গলায় বললেন, কই জ্বরতো নেই। শরীর নদীর তলার মতো ঠাণ্ডা।

'জ্বর না থাকলেও শরীর ভয়ংকর খারাপ করেছে। তুমি মজার কোনো গল্প বলে আমাকে হাসিয়ে দাও।'

'কী মজার গল্প?'

'ক্যাম্পে মজার কিছু ঘটেনি?'

'ও আচ্ছা ঘটেছে—।'

মা ধাক্কা দিয়ে আমাকে বসিয়ে দিলেন। মজার গল্প মা'র কোলে মাথা রেখে শোনা যাবে না। বসে বসে শুনতে হবে।

সেলিম গাধাটার ঘরে একটা সাপ ঢুকেছে। গাধাটা সাপটা মেরেছে। সাপ ফেলে দিতে যাচ্ছে—কে যেন বলল, ফেলবেন না। গারোদের দিয়ে দিন ওরা সাপ খায়। তখন সেলিম বলল, ওরা খেলে আমরাও খেতে পারি। সাপটা আমাকে খেতে এসেছিল। এখন আমি সাপটাকে খাব। বাবুর্চিকে বলব ঝাল ঝাল করে রান্না করতে।

'সাপ রান্না হয়েছে?'

'বাবুর্চির কাজ নেই সাপ রান্না করবে। তবে ঐ সেলিম গাধাটার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মিজানুর রহমান—মাতালটা। সে বলেছে সেই তোলা উনুনে রান্না করবে। তারপর দু'জনে মিলে আজ দুপুরে খাবে।'

'ভালতো।'

মা বিস্মিত গলায় বললেন, সেলিম গাধাটা সরল বোকা-সোকা টাইপের ছিল। সে সাপ খাওয়া ধরল কেন? আর কিছু না ফিল্মী লাইনের বাতাস লেগেছে। তুই এই গাধাটার কাছ থেকে পাঁচশ হাত দূরে থাকবি।

'আচ্ছা থাকব।'

মা উঠে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, যাচ্ছ কোথায়? মা বললেন, সাপ সত্যি সত্যি রান্না হচ্ছে কি-না দেখতে যাচ্ছি। তুই যাবি? আমি বললাম, আমাকে না তুমি পাঁচশ হাত দূরে থাকতে বলেছ।

মা একাই সাপ রান্না দেখতে গেলেন।

১২

AMARBOI.COM

অনেকদিন পর ডাইরি লিখতে বসেছি। দোতলার বারান্দায় বসেছিলাম। মা কিছুক্ষণ ঘ্যান ঘ্যান করলেন তাঁর সঙ্গে যাবার জন্যে। কঠিন গলায় তাকে বললাম—আমি যাব না। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, শুধু শুধু বারান্দায় বসে থেকে কী করবি? আমি বললাম, প্রকৃতির শোভা দেখব।

'আমার সঙ্গে চল হাঁটতে হাঁটতে প্রকৃতির শোভা দেখবি।'

'তোমার পায়ে ধরছি মা, আমাকে বাদ দাও।'

'এরকম করছিস কেন, আমি অস্পৃশ্য?'

'না, তুমি খুবই সস্পৃশ্য তবে এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে যাব না। আমার কোমরে চেইন বেঁধেও তুমি আমাকে নড়াতে পারবে না।'

মা মন খারাপ করে জালালের মা'কে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। ইউনিটের মালামাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়ার জন্যে মাসওয়ারি টেম্পো ভাড়া করা আছে। শুটিং যেহেতু হচ্ছে না টেম্পো পড়ে আছে। যার ইচ্ছা টেম্পো নিয়ে ঘুরতে যেতে পারে।

আমি দোতলা থেকে দেখলাম, মা, জালালের মা এবং মওলানা সাহেব টেম্পো নিয়ে বের হয়েছেন। তিনজনই খুব হাসিখুশি। মওলানা সাহেবকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। উনি কি নিজ থেকেই যাচ্ছেন, না মা তাঁকে সেধে সঙ্গে নিয়েছেন?

উঠোনে নীরা ম্যাডামের মেয়েটা একা একা খেলছে। মেয়েটা অসম্ভব রোগা। রোদে দাঁড়ালে ছায়া পড়বে না এমন অবস্থা।

আমি ডাইরি নিয়ে বসেছি এবং মাঝে মাঝে মেয়েটাকে দেখছি। মেয়েটা একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না। আমি ঠিক করে রেখেছি যেই সে আমার দিকে তাকাবে—আমি ঠিকই ভেংচি কাটব। সে নিশ্চয় কেঁদে তাঁর মা'কে ডেকে এনে আমাকে দেখাবে। নীরা ম্যাডাম তখন কী করেন আমার দেখার ইচ্ছা। আমি দ্রুত লিখে যাচ্ছি—।

সর্প বিষয়ক জটিলতা

সেলিম ভাই এবং মিজানুর রহমান সাহেবের যৌথ প্রযোজনায় আজ 'সর্প রন্ধন' হয়েছে। আমার ধারণা ছিল রান্না পর্যন্তই হবে, কেউ খাবে না। আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করে মিজান সাহেব বেশ আয়েশ করে খাওয়া শুরু করেন। তিনি সারাক্ষণই নেশার ঘোরে থাকেন—কাজেই তাঁর সাপ খাওয়াটা তেমন বড় কিছু না। সেলিম ভাই যে খাবেন তা ভাবিনি। আমার ধারণা তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে খেয়েছেন। সবাই তাদের খাওয়া দেখার জন্যে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন আয়েশ করে খেয়ে যাচ্ছে—এইসব দেখে তিনি এক টুকরা মুখে দিলেন। আমি বললাম, সেলিম ভাই খেতে কেমন?

তিনি বললেন, খারাপ না। টেস্ট অনেকটা বাইন মাছের মতো।

'কাঁটা নেই?'

'না, শুধু মাঝের কাঁটা।'

আমি বললাম, নিজেকে জাহির করার জন্যে জোর করে খাবেন না। শরীর খারাপ করবে। সেলিম ভাই বললেন, নিজেকে জাহির করার কী আছে। ইচ্ছা করলেই সাপ ব্যাঙ সবই খাওয়া যায়। বলেই এক সঙ্গে দু'টুকরা মুখে দিয়ে দিলেন। আমার বমি আসছিল বলে আমি দ্রুত চলে এলাম। নিজের ঘরে আসার কিছুক্ষণ পরেই শুনি সেলিম ভাই ক্রমাগত বমি করছেন। তাঁর বমি বন্ধ হচ্ছে না। সেলিম ভাইকে বর্তমানে মিশনারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। তাঁর বমি বন্ধ হয়েছে তবে এখন হিক্কা উঠছে। পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তাররা তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন। ঘুমের মধ্যেও তাঁর হিক্কা উঠছে।

এই পর্যন্ত লিখে আমি থামলাম। সেলিম ভাই সাপের মাংস খাবার মতো একটা উদ্ভট কাণ্ড কেন করলেন সে সম্পর্কে আমার নিজের থিওরিটা লিখব কি-না ভাবছি। লিখতে ইচ্ছে করছে না। আমি প্রায় নিশ্চিত কাণ্ডটা তিনি করেছেন আমাকে অভিভূত করার জন্যে।

এন্টেনা আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমি ভেংচি কাটলাম। মেয়েটা তাকিয়ে আছে। মা'র কাছে ছুটে যাচ্ছে না। কেঁদে ফেলার উপক্রমও করছে না। আমি ডাইরিতে মন দিলাম। আর কী লিখব? লেখার কিছু পাচ্ছি না। ভুল বললাম, লেখার অনেক কিছুই আছে লিখতে ইচ্ছে করছে না। নীরা ম্যাডাম প্রসঙ্গে লিখব? লেখা থাকার অনেক সুবিধা, পরে মিলিয়ে দেখা যায়। স্মৃতির লেখা ঠিক থাকে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখাগুলিও আপনা আপনি বদলাতে থাকে।

নীরা ম্যাডাম

আমার জীবন কেটেছে কম বুদ্ধির একজন মহিলার সঙ্গে। তিনি আমার মা। সেই কারণেই মা'র চেয়ে সামান্য বেশি বুদ্ধির যে কোনো মহিলাকে আমার অনেক বেশি বুদ্ধির মহিলা মনে হয়। আমি তাদের বুদ্ধি দেখে অভিভূত হই। আমার একটু বয়স হবার পর অভিভূত হবার প্রবণতা কমে গেল। তবে নীরা ম্যাডাম আমাকে অভিভূত করেছেন। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা এবং নাটকীয় মুহূর্ত তৈরি করার দক্ষতা সবই অভিভূত করার মতো। ভদ্রমহিলার নিজের ক্ষমতার উপর আস্থাও প্রবল। এই ব্যাপারটাও তুচ্ছ করার মতো নয়। অসম্ভব বুদ্ধিমতীদের নিজেদের উপর আস্থা থাকে না—কারণ তারা জানে—মানুষ খুব বিচিত্র প্রাণী সে সব সময় হিসেব মেনে চলে না। যে কোনো মুহূর্তে অতি বড় মহাপুরুষও অতি নোংরা পাপ করতে পারেন এবং অতি বড় পাপীও অসাধারণ কোনো মহৎ কর্ম করে ফেলতে পারে। শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে সব নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই কারণেই নিজের উপর অতিরিক্ত আস্থাও বোধ হয় এক ধরনের বোকামি। যাই হোক মূল অংশে চলে আসি।

আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙেছিল। আমি উঠোনে হাঁটছি। নীরা ম্যাডাম বের হয়ে হলেন। সহজ সরল গলায় বললেন—এসো চা খেয়ে যাও।

আমি বিস্মিত হলাম। গতকাল যে সব কথাবার্তা তিনি বলেছেন তারপর এইভাবে নিজের ঘরে চা খেতে ডাকতে কিছুটা সংকোচ হবার কথা। আমি বললাম, চা খাব না আমি খালি পেটে চা খেতে পারি না।

'খালি পেটে খাবে কেন? বিসকিট খেয়ে তারপর চা খাবে। এসো। তোমাদের ডিরেক্টর সাহেব জ্বরে কাতর। তাকে একবার দেখবে না? সবাই কয়েকবার করে দেখে যাচ্ছে, শুধু তুমি বাদ। চলে এসো।'

আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। ডিরেক্টর সাহেব বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে মেয়েটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। নীরা বললেন, এই যে মহান পরিচালক—রুমালী তোমাকে দেখতে এসেছে। মুখের উপর থেকে চাদরটা সরাও। ও তোমার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখবে।

ডিরেক্টর সাহেব মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন। আমার ইচ্ছে করল তাঁর বিছানায় বসি এবং সত্যি সত্যি কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখি। নীরা ম্যাডাম সামান্য বাড়াবাড়ি করছেন। এই বাড়াবাড়ির প্রয়োজন ছিল না।

টেবিলে চায়ের পট। চায়ের কাপ। নীরা ম্যাডাম কাপে চা ঢালছেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। নীরা বললেন, মহান পরিচালক সাহেব—তোমাদের এই কিশোরী নায়িকা খুব ভাল গান করে। তোমাকে এখন পর্যন্ত শুনাতে পারেনি কারণ তুমি শুনতে চাওনি। জ্বরের মধ্যে গান শুনতে ভাল লাগবে না। যখন জ্বর ছাড়বে তখন মনে করে রুমালীকে ডেকে তার গান শুনবে।

ডিরেক্টর সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন—ক্লান্ত গলায় বললেন, এক কাপ চা দাও।

নীরা ম্যাডাম কাপে চা ঢেলে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, চা-টা দিয়ে এসো। বলেই অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমি সেই হাসি দেখেও দেখলাম না। সবকিছু দেখতে নেই। নীরা বললেন, ডিরেক্টর সাহেব আপনি এমন চুপ মেরে গেলেন কেন? বেচারি রোগী দেখতে এসেছে—তার সঙ্গে একটু গল্প গুজব করেন।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, নীরা একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে। সিগারেট কি খাব?

'খেতে ইচ্ছে করলে অবশ্যই খাবে। তোমার কোনো ইচ্ছাতে আমি না বলিনি। তুমি যখন আত্মহত্যা করতে চেয়েছ তখন বলেছি—কর। করলে তোমার মঙ্গল হবে। বলিনি?'

উনি সিগারেট ধরালেন। শান্ত ভঙ্গিতে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন। আমার উনার জন্যে অসম্ভব মায়া লাগছে। নীরা ম্যাডাম বললেন, বেচারি রোগী দেখতে এসেছে, তার সঙ্গে একটু গল্পটল্প কর। মুখ ভোতা করে চা খাচ্ছ কেন?

'কী গল্প করব?'

'নতুন একটা ছবির আইডিয়া যে মাথায় এসেছে সেই গল্প কর। রুমালী অভিনয় জগতের মানুষ। তার ভাল লাগবে।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম উনি সত্যি সত্যি গল্প শুরু করেছেন। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন যে সত্যি গল্প শুরু করতে পারে আমার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে ক্যাসেট প্লেয়ারে গল্প ক্যাসেট করা। নীরা ম্যাডাম বোতাম টিপে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে গল্প শুরু হল—।

উনি গল্প করছেন আমার দিকে তাকিয়ে। আমাকেই গল্পটা শুনাচ্ছেন। নীরা ম্যাডামের দিকে তাকাচ্ছেন না। এই ব্যাপারটাও বিস্ময়কর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রুমালী, সিনেমার এই আইডিয়াটা আমি অসুস্থ হবার পর পেয়েছি। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে মনে হল—এমন একটা গল্প দাঁড়া করালে কেমন হয়। পক্ষাঘাতগ্রস্থ একজন মানুষ—সে শুধু যে নড়াচড়া করতে পারে না তাই না, কথাও বলতে পারে না। শুধু তার চোখ দু'টা বেঁচে আছে—আর সবই মারা গেছে। সে কামুনিকেট করে চোখের ইশারায়। একবার চোখের পাতা ফেলা মানে 'হ্যাঁ' দু'বার চোখের পাতা ফেলা মানে 'না'। তার স্ত্রী আছে, একটা কাজের লোক আছে, তিন জনের সংসার। এক সকালের গল্প। স্ত্রী এসে জিজ্ঞেস করল, আজ কেমন আছ? ভাল? সে একবার চোখের পাতা ফেলল—তার মানে 'হ্যাঁ'।

'পানি খাবে?'

দু'বার চোখের পাতা ফেলল—'না'। তারপর চোখের ইশারায় টেবিলের দিকে দেখাল। টেবিলে সিগারেটের পেকেট।

'সিগারেট খাবে?'

'একবার চোখের পাতা—অর্থাৎ 'হ্যাঁ'।'

স্ত্রী সিগারেট ঠোঁটে দিয়ে দেয়াশলাই দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। কারণ বসার ঘরে এই তরুণীর অনেক দিন আগের পরিচিত একজন মানুষ এসেছেন। কিশোরী বয়সে তার সঙ্গে ভালোবাসাবাসি ছিল। যে কোনো কারণেই হোক বিয়ে হয়নি। ভদ্রলোক এসেছেন মেয়েটির অসুস্থ স্বামীকে দেখতে। পুরানো দিনের কিছু কথা আপনাতে উঠে আসছে। দু'জনেরই পুরানো কথা বলতে ভাল লাগছে। মেয়েটি ভুলেই গেছে যে সে তার স্বামীর ঠোঁটে সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে এসেছে, সিগারেটটা সরিয়ে দেয়া দরকার।

সিগারেটের শেষ অংশ নিতে কেউ আসছে না। ঠোঁট থেকে গড়িয়ে সেই সিগারেট পড়ল—বিছানার চাদরে। সেই চাদরে আগুন ধরল—আগুন তার দিকে এগিয়ে আসছে। আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ভদ্রলোক আগুন দেখছেন—তিনি কিছু করতে পারছেন না। কাউকে ডাকতে পারছেন না। তাকিয়ে আছেন তার নিয়তির দিকে। পাশের ঘর থেকে হালকা হাসির শব্দ ভেসে আসছে। এই হল গল্প। রুমালী তোমার কেমন লাগছে?

'গল্পের শেষটা কী?'

'এটার কোনো শেষ নেই। সব গল্পেরই শেষ থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই। গল্পটা তোমার কাছে কেমন লাগল?'

'খুব সুন্দর।'

'এই গল্পটা বেশি ভাল, না যখের গল্প?'

'দু'টা গল্পই সমান সুন্দর।'

'এই ছবির কাজ শেষ হলেই চিত্রনাট্য তৈরি করে ফেলব। নীরা, তোমার কাছে দু'টা গল্পের মধ্যে কোনটা বেশি ভাল লাগল।'

নীরা বললেন—দু'টাতো আসলে একই গল্প। অমোঘ নিয়তির গল্প। নিয়তির গল্প তোমার চেয়ে ভাল কে বলবে? তোমার চেয়ে ভাল কেউ বলতে পারবে না। বলতে পারা উচিতও নয়।

উনি চুপ করে গেলেন। আমার চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমি নীরার দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি উঠি?

নীরা বললেন, আচ্ছা যাও। আমি ঢাকায় চলে যাব—তোমাদের ছবির শেষ পর্যায়ে আবার দেখা হবে।

'জি আচ্ছা।'

'তুমি কি সর্পভুককে দেখতে গিয়েছিলে?'

'জি না।'

'আমি আজ একবার দেখতে যাব। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পার।'

'আমার ইচ্ছা করছে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ইচ্ছা করছে না কেন?'

'উনাকে দেখলেই সাপ খাবার দৃশ্যটা মনে পড়বে, তখন আমার নিজেরই বমি আসবে। পরে দেখা যাবে আমকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হচ্ছে।

'তাহলে না যাওয়াই ভাল।'

এই পর্যন্ত লিখে ডাইরি বন্ধ করলাম। এন্টেনা এখনো আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বোধ হয় অপেক্ষা করছে আমার দ্বিতীয়বার ভেংচি কাটার দৃশ্য দেখার জন্যে। ভেংচি কাটতে ইচ্ছা করছে না, ঘুম পাচ্ছে।

মা ফিরলেন বিকেলে। আমি ঘুমুচ্ছিলাম। আমাকে ডেকে তুললেন। তাঁর মুখ থমথম করছে। তিনি সহজভাবে কথাও বলতে পারছে না। আমি ঘুমজড়ানো গলাম বললাম, কী হয়েছে? মা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, তোর নামে এইসব কী শুনছি?

'কী শুনছ?'

'ঝড়ের সময় তুই আর মঈন ভাই না–কী একটা ঘরে একা ছিলি?'

'একা কোথায়? আমি আর উনি—আমরা দু'জন।'

'তোরা কী করছিলি?'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমরা কী করছিলাম বলে তোমার ধারণা?

'আমার ধারণা খুবই ভয়ংকর?'

'তোমার ধারণা ঠিকই আছে মা। এর বেশি আর কিছু জানতে চেয়ো না। কষ্ট পাবে।'

'তার মানে কী? তুই কী বলতে চাচ্ছিস?'

আমি জবাব দিলাম না। মা'র সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। মা ধরা গলায় বললেন, জালালের মা যা বলেছে তাহলে সেটা ঠিক? আমি এই কথায়ও জবাব দিলাম না। মা ছুটে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। তিনি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদছেন। ছোট বাচ্চাদের মতো হাউমাউ করে কান্না। তাঁর সেই কান্না আমাকে স্পর্শ করছে না।

আমি এবং মা পাশাপাশি শুয়ে আছি। রাত কত জানি না। ইচ্ছা করলে জানা যায়। টেবিলে আমার হাতঘড়ি পড়ে আছে। হাত বাড়ালেই ঘড়ি। হাত বাড়াতে ইচ্ছা করছে না। বাথরুমের দরজা খোলা। সেখানে বাতি জ্বলছে। খানিকটা আলো তেড়ছাভাবে আমার পায়ে পড়েছে! সন্ধ্যাবেলায় আলোর তেজ থাকে না, রাত যত বাড়তে থাকে আলোর তেজও বাড়তে থাকে। আলোর তেজ দেখে মনে হচ্ছে অনেক রাত। অঘুমো অবস্থায় চুপচাপ শুয়ে থাকা যায় না। কিছু না কিছু করতে ইচ্ছা করে—পাশ ফেরা, মাথার নিচের বালিশটা উল্টে দেয়া, একবার গুটিসুটি মেরে শোয়া, একবার লম্বা হয়ে যাওয়া। আমি তার কিছুই করছি না, পাথরের মূর্তির মতো পড়ে আছি। মা খুব নড়া–চাড়া করছেন। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করছেন। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছেন। মা একসময় বিছানায় উঠে বসে বললেন, চাপা গলায় বললেন, বকু ঘুমাচ্ছিস? আমি বললাম, না। মা আবারো শুয়ে পড়লেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি কিছু বলবেন। কিছু বললেন না। হয়ত বুঝতে পারছেন না, কী বলবেন। তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। কোনো বড় সমস্যায় মানুষের মাথা যখন এলোমেলো হয়ে যায় তখন সে আর সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারে না। সমস্যার বাইরের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। তার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে কিন্তু সে কথা খুঁজে পায় না।

মা আবারো উঠে বসলেন। আবারো আগের মতো জিজ্ঞেস করলেন, বকু ঘুমুচ্ছিস? এবারে আমি বললাম, হ্যাঁ ঘুমুচ্ছি। মা শুয়ে পড়লেন। তার মানে আমি কী বলছি না বলছি তাও তাঁর মাথায় ঢুকছে না। মা'র জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে—তাঁর নিজের জগৎ ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে। তিনি এখন ঘোরের মধ্যে চলে গেছেন। এই ঘোর সহজে কাটার না।

'বকু?'

'হুঁ।'

'কাল থেকে শুটিং পুরোপুরি শুরু হবে?'

'হুঁ।'

'রাতের কাজের জন্যে জেনারেটার এনেছে। রাতের কাজ হবে।'

'হুঁ।'

'পাপিয়ার মেয়েটাকে দেখেছিস—সামনের দু'টা দাঁত বড় বড়। মিকি মাউসের মতো লাগে।'

'দেখেছি ।'

'নীরাকে তোর কেমন লাগল?'

'ভাল।'

'শুরুতে তাকে যত অহংকারী মনে হয়েছিল—তত অহংকারী কিন্তু সে না।'

'হুঁ।'

'তবে কাউকে কিছু না বলে হুট করে চলে গেল। তোকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'উনার মেয়েটা দেখতে কেমন ফকিরনীর মেয়ের মতো না?'

'হুঁ, ফকিরনীর মেয়ের মতো।'

'হয়ত কোনো ফকিরনীর কাছ থেকেই নিয়েছে। এটা তাঁর নিজের মেয়ে না। পালক মেয়ে। জালালের মা বলল।'

'ও আচ্ছা।'

'মানুষ কেন যে পালক নেয়। পালা পাখির জ্বালা বেশি। তারপরেও পুষ্যি নেয়। উচিত না।'

আমি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললাম। মা তুচ্ছ সব কথা বলে যাচ্ছেন। লক্ষণ ভাল না। একবার এ রকম শুরু হলে চলতেই থাকবে। মা সারা রাত নিজের মনে কথা বলতে থাকবেন। আমাকে হুঁ দিয়ে যেতে হবে। বাবা আমাদের ছেড়ে যাবার পরও এরকম হল। মা'র কথা বলা রোগ হল। সারা রাত কথা বলতেন। অর্থহীন সব কথা। আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে ঘুম থেকে জাগাতেন। আবার শুরু হত কথা।

'বকু!'

'কী মা?'

'গরম লাগছে। গরমে শরীর জ্বলে যাচ্ছে।'

'বাথরুমে যাও, হাত মুখ ধুয়ে আস।'

মা বাধ্য বালিকার মতো উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুলেন। বাথরুম থেকে বের হয়ে গেলেন বারান্দায়। তিনি বারান্দায় হাঁটাহাটি করছেন। স্যান্ডেল পায়ে হাঁটছেন—স্যান্ডেলের শব্দ হচ্ছে। মা এত শব্দ করে হাঁটেন না। আজ কি ইচ্ছা করে শব্দ করছেন? অনিদ্রা রোগ হলে মানুষ শব্দ না করে থাকতে পারে না। মা আবারো বাথরুমে ঢুকলেন। মনে হয় এখন গোসল করছেন। মাথায় মগে করে পানি ঢালা হচ্ছে। ঢালা হচ্ছেতো ঢালাই হচ্ছে। বাথরুমে পানি থাকে না বলে ড্রাম ভর্তি পানি রাখা হয়। তিনি কি পুরো ড্রাম শেষ করবেন? তাঁর গোসল শেষ হল। তিনি ঘরে ঢুকে কাপড় বাদলালেন। চুল আঁচড়ালেন। তারপর টেবিল থেকে আমার হাতঘড়িটা নিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাত থেকে ঘড়ি নামিয়ে রাখার পর আমি বললাম, ক'টা বাজে মা? মা আবোরো ঘড়ি দেখে বললেন—আড়াইটা। তার মানে আগের বার হাতে ঘড়ি নিয়ে তাকিয়েছেন, সময় দেখেননি। মা'র জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছা করছে কোনো একটা মন্ত্র পড়ে তাঁর অস্থিরতা দূর করে দি। সে রকম মন্ত্র আমার অবশ্যি জানা আছে। মন্ত্র পড়ে মা'কে সামলে ফেলতে পারব। আমি উঠে বসলাম। শান্ত গলায় বললাম, মা শোন তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা নিচু গলায় বললেন, অস্থির হবার মতো কিছু হয়নি?

আমি বললাম, না।

তিনি হতাশ মুখে তাকিয়ে আছেন। যেন নিতান্ত বাচ্চা একটা মেয়ে যে আমার কাছ থেকে আশা ও আনন্দের কোনো কথা শুনতে চায়। কারোর চিন্তা শক্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে এই অবস্থা হয়। মা আমার সামনে চেয়ারে বসলেন। আমি সহজ গলায় বললাম—মা শোন। আমার যে সমস্যা নিয়ে ভেবে ভেবে তুমি অস্থির হয়েছ সে সমস্যা আমিই দূর করব। তোমাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না।

'তোর সমস্যা তুই কীভাবে দূর করবি?'

'সব আমি ভেবে ঠিকঠাক করে রেখেছি।'

'সেটা কী?'

'যেদিন শুটিং শেষ হবে সেদিন আমি সোমেশ্বরী নদীর পারে বেড়াতে যাব। তারপর ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে যাব। যেহেতু সাঁতার জানি না, মবিলের মতো টুক করে চলে যাব নদীর তলায়। সব সমস্যার সমাধান।'

কথাগুলি আমি বললাম হেসে হেসে, কাজেই মা আরো এলোমেলো হয়ে গেলেন। তিনি তাকিয়ে আছেন—এখন আর তাঁর চোখে পলক পড়ছে না।

'মা।'

'হুঁ।'

'তুমি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতো।'

'হাসব কেন?'

'হাসবে কারণ—আমি তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছি। তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে ভয়ংকর কিছু কথা বলেছি। এই জাতীয় কিছুই হয়নি।'

'কিছুই হয়নি?'

'না।'

'তুই ঝড়ের সময় উনাকে নিয়ে স্কুল ঘরে যাসনি? মওলানা সাহেবতো বললেন গিয়েছিলি।'

'গিয়েছি। তাতে কী হয়েছে? প্রচণ্ড ঝড়ের সময় আমরা কি বাইরে থাকব? বাইরে থাকলে মরে যেতাম।'

'তাতো ঠিকই।'

'আমরা দৌড়ে স্কুল ঘরে ঢুকলাম আর তখনই মওলানা সাহেব ঢুকলেন।'

'হ্যাঁ তাইতো!'

'নিজের মেয়ের সম্পর্কে তোমার যে কী ধারণা মা। ছিঃ। নিজের মেয়ের উপর তোমার বিশ্বাস নেই?'

মা এখনো অপলকে তাকিয়ে আছেন। তবে এখন তাঁর চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। মনে হচ্ছে তিনি কাঁদতে শুরু করবেন।

'আমার সম্পর্কে তোমার কী ধারণা সেটা টেস্ট করার জন্যেই গল্পটা তোমাকে বানিয়ে বলেছি। আশ্চর্য, তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করে ফেলেছ। করনি?'

'হুঁ করেছিলাম।'

আমি মা'কে জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমার মনটা খুব বেশি খারাপ হয়েছিল মা?

'হুঁ।'

'এখন মন ঠিক হয়েছে?'

মা ধরা গলায় বললেন—হ্যাঁ। মন ঠিক হয়েছে।

'এসো শুয়ে পড়ি।'

'না, শোব না—আয় গল্প করি।'

'এসো শুয়ে শুয়ে গল্প করি। এসো।'

আমি মা'কে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মা কেঁদেই যাচ্ছেন। তবে তিনি যে কাঁদছেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না। বুঝতে পারলে আঁচলে চোখের পানি মুছতেন। তা মুছছেন না। আমি মা'কে জড়িয়ে ধরে খুশি খুশি গলায় বললাম, ঘটনা সত্যি হলে তুমি কী করতে মা?

'জানি না।'

'আমার মনে হয় তুমি পাগল হয়ে যেতে।'

'বকু!'

'হুঁ।'

'সিনেমা করার দরকার নেই বকুল, চল কাল ভোরে ঢাকায় চলে যাই।'

'চল যাই।'

'সত্যি যাবি।'

'তুমি বললে অবশ্যই যাব।'

'কিন্তু এরা খুব বিপদে পড়বে।'

'তাতো পড়বেই। আমার মতো একটা মেয়ে জোগাড় করা। তাকে দিয়ে পুরো জিনিসটা রিশুট করা।'

'এটা ঠিক হবে না বকুল।'

'তাহলে থাক।'

'বকু!'

'হুঁ।'

'এবার ঢাকায় গিয়ে তোর বাবাকে বলব, ভাল একটা ছেলে দেখে তোর বিয়ে দিয়ে দিতে।'

'বাবাকে বলতে হবে কেন?'

'মেয়ের বিয়েতো বাবারাই দেয়।'

'আমার বিয়ে তুমি দেবে মা—আর কেউ না।'

'তোর বিয়ের জন্যে আমি টাকা আলাদা করে রেখেছি।'

'কত টাকা?'

'চল্লিশ হাজারের মতো।'

'ঢাকায় ফিরলে সেখান থেকে আমাকে দশ হাজার টাকা দিওতো মা।'

'কী করবি?'

'কাজ আছে। আমি একটা সিডিপ্লেয়ার কিনব। আমার খুব শখ।'

'তোর বাবাকে বললেই কিনে দেবে। তোর বিয়ের টাকায় আমি হাত দেব না। অসম্ভব।'

'বাবাকে আমি কিছু বলতে পারব না।'

'তোর বলতে হবে না। আমি বলব।'

'ঠিক আছে মা। তুমি বল। এখন একটু ঘুমাও, অনেকক্ষণ গল্প করা হয়েছে।

'বকু!'

'কী মা?'

'তুই কি উনাকে খুব পছন্দ করিস?'

'কাকে?'

'ডিরেক্টর সাহেবকে?'

'না।'

'না কেন?'

'উনার মধ্যে প্রচুর ভান আছে মা। আমার ভান পছন্দ না। মানুষ হবে সহজ সরল। যা ভাববে তাই বলবে, তাই করবে। উনি কখনো তা করেন না। উনি যা ভাবেন কখনো তা বলেন না।'

'সেলিমকে কি তোর পছন্দ?'

'এই প্রশ্নের উত্তর দেব না। উত্তর দিলেই তুমি রেগে যাবে।'

'না রাগব না। বল সেলিমকে তোর পছন্দ কি-না।'

'পছন্দ।'

'গাধা টাইপ ছেলেতো। কথা নেই বার্তা নেই সাপ খেয়ে ফেলল।'

'সাপ খেয়েছে বলেই পছন্দ। কেঁচো খেলে আরো পছন্দ হত।'

'ফালতু কথা বলবি না। আমি তোর বিয়ে দেব একজন ডাক্তার ছেলের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে দিও।'

'ফ্যামিলিতে একজন ডাক্তার থাকা ভাল। অসুখ বিসুখে তখন অস্থির হতে হবে না।'

'মা ঘুমানোর চেষ্টা কর।'

'বিয়ের পর আমি কিন্তু তোদের সঙ্গে থাকব।'

'অসম্ভব। তুমি হলে শাশুড়ি, তুমি জামাইয়ের সঙ্গে থাকবে এটা কেমন কথা! তুমি আমাদের ভালবাসা-বাসি দেখবে, ঝগড়াঝাঁটি দেখবে তা হবে না।'

'আমি তাহলে যাব কোথায়?'

'সেটাও অবশ্যি একটা কথা। তোমারতো আবার যাবার জায়গা নেই।'

'বকু!'

'কী মা?'

'আমার যেন কেমন লাগছে?'

'কী রকম লাগছে?'

'বুঝতে পারছি না। আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না রে বকু।'

'তুমি কথা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে থাক। একটা কথাও বলবে না। আমি তোমার মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি।'

'মনে হয় জ্বর আসছে।'

'আসলে আসুক। তুমি ঘুমাও।

মা চুপ করলেন। আমি তাঁর মাথায় বিলি কেটে দিচ্ছি। মা ঘুমুচ্ছেন। তবে ঘুমের মধ্যেও তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। একজন মা তাঁর সন্তানের জন্যে এত ভালবাসা ধরে রাখেন? আশ্চর্যতো! আমার কোলে যদি কখনো কোনো বাবু আসে আমিও কি তাকে এত ভালবাসব? এত ভালবাসা কি ঠিক? না, ঠিক না। সব ভালবাসাই পরিমিতির মধ্যে থাকা দরকার। এই যে আমি মা'র মাথার পাশে বসে আছি, তাঁর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি। মা ঘুমের মধ্যেই কাঁদছেন। তারপরেও যদি এই মুহূর্তে উনি এসে বলেন—"রুমালী! চল ঘুরে আসি।" আমি সঙ্গে সঙ্গে মা'কে ফেলে উঠে আসব। মা'র দিকে দ্বিতীয়বার ফিরে তাকাব না। মানুষ কেন এমন বদলে যায়? কাউকে পেলে জিজ্ঞেস করতাম। এই বিশেষ ঘটনাটা কি সব মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে না শুধু আমার ক্ষেত্রে ঘটছে? আমি কি আর দশজনের চেয়ে আলাদা, না-কি আমি আর দশজনের মতো? এটা কাকে জিজ্ঞেস করব? কে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে?

ছেলেরা কি মেয়েদের মতো ভালবাসতে পারে? রাধা শ্রীকৃষ্ণকে যেমন ভালবেসেছিলেন— কৃষ্ণ কি কখনো রাধাকে সেইভাবে ভালবেসেছেন? ভালবেসে থাকলে তিনি রাধাকে ফেলে চলে যেতে পারতেন না। আর রাধা বাকি জীবন "কৃষ্ণ কোথা? কৃষ্ণ কোথা?" বলে দেশ দেশান্তরে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে পারত না। অবশ্যি এইসব গল্পগাথা। গল্পে অনেক কিছু হয় যা বাস্তবে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় না। আবার বাস্তবেও অনেক কিছু ঘটে যা গল্পে লেখা হয় না। এই যে মোসাদ্দেক স্যার সিলিং ফ্যানের সঙ্গে শাড়ি পেঁচিয়ে মরে গেলেন। যে আভার জন্যে এই কাণ্ডটা করলেন সেই ঘটনায় আভার কিছুই হয়নি। তার জীবন সুন্দর মতোই এগুচ্ছে। আভার মতো কোনো কাণ্ড যদি আমি করে ফেলি তাতেও কারো কিছু হবে না। আমাদের ডিরেক্টর সাহেব আবারো ছবি করতে আসবেন। যখের ছবি, পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর ছবি। আমার মতো আরেকটি মেয়ে চোখ বড় বড় করে তাঁর গল্প শুনবে। তিনি মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলবেন, তারপর খুকি, তোমার নাম যেন কী? মেয়েটি লজ্জিত ভঙ্গিতে বলবে, আমার নাম কংকা।

'ও আচ্ছা কংকা। খুব সুন্দর নাম। তবে নামটা কিন্তু পেত্নীর।'

'পেত্নীর নাম?'

'হ্যাঁ, পেত্নীর নাম। ত্রৈলক্যনাথের একটা বই আছে—বইটা কংকাবতীকে নিয়ে লেখা। সেই কংকাবতী হল একটা পেত্নী।'

'ও আচ্ছা (মেয়েটি অভিভূত হতে শুরু করেছে)।'

'কংকা, তোমার বুদ্ধি কেমন?'

'আমার বুদ্ধি খুব কম।'

'আচ্ছা তোমার আই কিউ টেস্ট করা যাক—তিনটা পিপড়া নিয়ে একটা ধাঁধা বলছি দেখি পার কি না।'

'আমি পারব না। আমার মোটেই বুদ্ধি নেই।'

'আমার ধারণা তোমার অনেক বুদ্ধি।'

'এ রকম ধারণা কেন হল?'

'যাদের বুদ্ধি বেশি তারা তাকানোর সময় খুব সামান্য হলেও ভুরু কুঁচকে তাকায়। কপালে সূক্ষ্ম দাগ পড়ে।'

'আশ্চর্য, জানতাম নাতো। ভুরু কুঁচকে তাকায় কেন?'

'বুদ্ধিমানরা যে কোনো দৃশ্য খুব ভালভাবে দেখতে চায়। তা করতে গিয়ে তার ভুরু কুঁচকে যায়। যারা সহজ সরল মানুষ—কিংবা বোকা মানুষ তারা সরলভাবে তাকায়। তাদের ভুরু কখনো কুঁচকায় না, বা কপালেও কখনো দাগ পড়ে না। যেমন আমাকে দেখ। আমার কপালে দাগ পড়ে না। আমি তাকানোর সময় ভুরু কুঁচকাই না।'

'আপনি যদি বোকা হন তাহলে পৃথিবীর সবাই বোকা। আইনস্টাইনও বোকা।'

'আইনস্টাইনের স্ত্রীর নাম কী বলতো?'

'জানি না।'

'কী আশ্চর্য এমন বিখ্যাত একজন মানুষ, তুমি তাঁর স্ত্রীর নাম জান না?'

'জি না।'

'এই জন্যে তোমার কি লজ্জিত বোধ করা উচিত না?'

'জি উচিত। উনার স্ত্রীর নাম কী?'

'আমি নিজেও জানি না।'

'আপনি জানেন না?'

'না।'

'সত্যি জানেন না?'

'না, সত্যি জানি না।'

কংকা নামের মেয়েটা তখন অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকবে। তার কাছে এই মানুষটাকে তখন খুব কাছের মানুষ বলে মনে হতে থাকবে। আইনস্টাইনের স্ত্রীর নাম তিনি জানেন না বলে নিজেকে চট করে মেয়েটির স্তরে নামিয়ে আনলেন। এই কাজটা তিনি করলেন খুব সূক্ষ্মভাবে। শুধু তাই না, আরো কিছু খেলা তিনি খেলবেন—নিজেকে মাঝেমধ্যে মেয়েটির চেয়েও নিচের

স্তরে নিয়ে যাবেন। মেয়েটিকে আনন্দিত হবার সুযোগ দেবেন। মেয়েটির যখন দিশেহারা অবস্থা হবে তখন আবার নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে ফেলবেন।

'বকু!'

আমি চমকে উঠলাম। আশ্চর্য মা ঘুমাননি! জেগে আছেন।

'ঘুমাওনি মা?'

'ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।'

'আবার ঘুমিয়ে পড়।'

'খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি বকু।'

'বাজে স্বপ্নটা কী?'

'স্বপ্নে দেখলাম তোর বাবাকে সাপে কেটেছে। বিষে তার শরীর নীল হয়ে গেছে।'

'দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছুই নেই মা। বাবাকে সাপে কাটেনি। সাপ খোপ নিয়ে অনেক কাণ্ড হয়েছে বলেই এমন স্বপ্ন দেখেছ।'

'এরকম একটা বাজে স্বপ্ন কেন দেখলাম।'

'আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ বলে এ রকম স্বপ্ন দেখেছ। আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিচ্ছু নেই।'

'মা, সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'স্কুল ঘরে কিচ্ছু হয়নি, তাই না?'

'শুধু উনার ডান পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম। অন্ধকারে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিলাম না—তাই। পা মাড়িয়ে দেয়া নিশ্চয়ই ভয়ংকর কিছু না। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরি বলেছি।'

'বকু!'

'কী মা?'

'আমার খুব অস্থির লাগছে।'

'অস্থির লাগছে কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।'

'ভয়ংকর কিছুই ঘটতে যাচ্ছে না। সকাল হোক—দেখবে তোমার কাছে সব স্বাভাবিক লাগতে শুরু করবে। রাতের বেলা সবকিছুই একটু অস্বাভাবিক লাগে।'

'তোর বাবাকে খবর দিয়ে নিয়ে এলে কেমন হয়?'

'বাবাকে খবর দিয়ে নিয়ে আসবে?'

'হুঁ। তোর শুটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেও থাকল। সোহরাব ভাইকে বললে উনি তোর বাবাকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।'

'তোমার ধারণা খবর পেলেই উনি ছুটে আসবেন?'

'তোর কোনো সমস্যা হয়েছে শুনলে সে থাকতে পারবে না। ছুটে চলে আসবে।'

'আমারতো কোনো সমস্যা হয় নি মা।'

মা উঠে বসে শান্ত গলায় বললেন, হয়েছে। আমার মন বলছে তুই যে ভয়ংকর ঘটনার কথা বলছিস, সেই ঘটনা ঘটেছে।

আমি খিলখিল করে হেসে উঠলাম। হাসির শব্দে মা'র অস্থিরতা একটু যেন কমল। তিনিও হাসলেন। আমি বললাম, দেখছ মা, আমি কত ভাল অভিনয় জানি। একটা ঘটনা তোমাকে কেমন বিশ্বাস করিয়ে ফেলেছি। অভিনয় ভাল জানি না মা?

মা বললেন, হ্যাঁ।

আমি বললাম, মা আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। এতক্ষণ আমি তোমার সেবা করেছি, এখন তুমি আমার সেবা করবে। আমি ঘুমুব তুমি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।

'আচ্ছা ঘুমো।'

আমি শুয়ে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম। একটা স্বপ্ন দেখলাম ঘুমের মধ্যে। আমি একটা ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে আছি। ডিরেক্টর সাহেব আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাচ্ছি না। আমি তাকিয়ে আছি অন্যদিকে। সেখানে গোলগাল মুখের কোকড়ানো চুলের একটা বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কোলে একটা ফুটবল। ফুটবলটা সে ডলের মতো বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আছে। তিনি বললেন, রুমালী তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখেছ? ফুটবল কিনে দিয়েছি—একবারও সে ফুটবলটা মাটিতে নামিয়ে কিক দেয়নি। পুতুলের মতো কোলে কোলে নিয়ে ঘুরছে। সে মেয়ে বলেই এই কাণ্ডটা করছে। ছেলে হলে এতক্ষণে সে ফুটবল খেলা শুরু করত।

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ। তাই। মেয়েদের মধ্যে মাতৃভাব প্রবল বলেই সব খেলনাই তাদের কাছে সন্তানের মতো। যে কোনো খেলনা মেয়েদের হাতে দাও দেখবে খেলনা কোলে নিয়ে তারা ঘুরবে। আমি ভেবেছিলাম তোমার মেয়েটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে। এটা দেখার জন্যেই তাকে ফুটবল কিনে দিয়েছিলাম।'

'তোমার মেয়ে তোমার মেয়ে করছ কেন? এই মেয়েটাতো শুধু আমার একার না। তোমারও।'

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন—না তো—ও আমার হবে কেন? এই মেয়ের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?

তখনই আমার ঘুম ভাঙল। বাইরে সকাল হচ্ছে। পাখি ডাকছে।

মা হাত পা এলিয়ে আমার পাশেই শুয়ে ঘুমুচ্ছেন। আমি মা'র মাথায় হাত রাখলাম। জ্বরে তাঁর গা পুড়ে যাচ্ছে। আজ শুটিং শুরু হচ্ছে। হাতমুখ ধুয়েই আমাকে মেকাপে বসতে হবে। মা'কে ফেলে রেখে শুটিং এ চলে যাব। মা একা একা বিছানায় ছটফট করবেন।

AMARBOI.COM

১৩

আমি মেকাপ নিচ্ছি। সুবীরদা যন্ত্রের মতো হাত চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে চাপা টেনশান। আগের মেকাপের সঙ্গে আজকের মেকাপের মিল থাকতে হবে। মেকাপ কনটিনিউটি অনেক বড় ব্যাপার। মওলানা সাহেব আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আগ্রহ নিয়ে তিনি দৃশ্যটা দেখছেন। মেকাপ নেবার সময় অন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে খুব অস্বস্তি লাগে। এখন অবশ্যি লাগছে না। মওলানা সাহেবের বিস্ময় দেখতে ভাল লাগছে। যে কোনো মানুষের বিস্ময় ও আনন্দ দেখতে ভাল লাগে। আমি মওলানা সাহেবের সঙ্গে টুকটাক গল্পও করছি।

মা জ্বরে প্রায় অচেতন হয়ে আছেন। তাঁর কথা এখন আর সেভাবে মনে পড়ছে না। মেকাপম্যান সুবীরদা ক্রমেই আমাকে দিলু বানিয়ে দিচ্ছেন। আমি যতই দিলু হচ্ছি ততই চারপাশের জগৎ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। পুরোপুরি যখন দিলু হয়ে যাব তখন আর রুমালীর জগৎ নিয়ে ভাবব না। আমার জগৎটা চলবে দিলুর মতো। দিলু খুব হাসিখুশি। সে সবার সঙ্গেই কথা বলে। অকারণে কথা বলে।

'মওলানা সাহেব'

'জি আম্মাজী।'

'আপনি দেখি মেকাপ দেয়ার সব কৌশল শিখে ফেলছেন।'

মওলানা সাহেব হাসলেন। তাঁর হাসি সুন্দর। হাসির মধ্যে শিশু শিশু ভাব আছে। দিলুর সঙ্গে খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁর কিছু মিল আছে। তাঁর কৌতূহল বেশি। তিনি কথা বলতে পছন্দ করেন।

আমি বললাম, মওলানা সাহেব! মেকাপ নেয়া কি গুনাহ্‌র কাজ?

'গুনাহ্‌ হবে কেন?'

'আল্লাহ্‌ যে চেহারা দিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই চেহারা বদলে ফেলা হচ্ছে এটা গুনাহ্‌ না?'

'আমি এত কিছু জানি না মা। আমার জ্ঞান বুদ্ধি খুবই কম। তবে মেকাপ দিয়ে চেহারা সুন্দর করা হয়—এর মধ্যে দোষের কী? আল্লাহ্‌ পাক সুন্দর পছন্দ করেন।'

'সুন্দর পছন্দ করেন কেন?'

'কারণ তিনি সুন্দর।'

'তিনি সুন্দর আপনাকে কে বলল?'

'কেউ বলে নাই। আমার অনুমান।'

সুবীরদা বিরক্ত মুখে বললেন, মওলানা সাহেব এখান থেকে যান। আমার অসুবিধা হচ্ছে। মেকাপ নিতে নিতে আর্টিস্ট যখন কথা বলে তখন চামড়ায় ভাঁজ পড়ে। সেই ভাঁজ উঠতে চায় না।

মওলানা সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জি আচ্ছা জনাব, যাচ্ছি। তিনি লজ্জিত মুখে চলে যাচ্ছেন। আমার মায়া লাগছে। সুবীরদা এমন কঠিন আচরণ কখনো করেন না। আজ করছেন, কারণ আজ তাঁর মন খারাপ। আমার আগে তিনি পাপিয়া ম্যাডামকে মেকাপ দিয়েছেন। ম্যাডাম তার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। মেকাপ শেষ হবার পর ম্যাডামের হাতে আয়না দেয়া হল। তিনি আয়নায় কিছুক্ষণ নিজেকে দেখে বললেন, এটা কী মেকাপ দিয়েছ? আমি কি সার্কাসের সঙ? এই বলে তিনি থেমে থাকেননি—আয়না ছুঁড়ে ফেলেছেন। আয়নাটা ঘাসের উপর পড়েছে বলে ভাঙেনি। পাপিয়া ম্যাডাম বলেছেন, মেকাপ তুলে আবার দাও। মন বসিয়ে কাজ কর। কাজ করবে বাংলাদেশে মন পড়ে থাকবে কোলকাতায় তাতো হবে না।

সুবীরদা পাপিয়া ম্যাডামের মেকাপ তুলে আবার মেকাপ দিলেন। এরপরেও যে তিনি শান্ত ভঙ্গিতে আমার মেকাপ দিতে পারছেন তাই যথেষ্ট। সুবীরদা না হয়ে অন্য কেউ হলে পারত না।

'সুবীরদা!'

'কী মা?'

'আপনার মন খারাপ ভাব কি কমেছে?'

'পাপিয়া ম্যাডামের ব্যাপারটার কথা বলছ?'

'জি।'

'দূর, কোনো মন খারাপ না। ছোট কাজ যারা করে তাদের এইসব অপমান গা সহা। যখন অপমানটা করে তখন কষ্ট হয়। তারপর আর কষ্ট থাকে না।'

'এখন নেই?'

'একটু একটু আছে।'

'একটু একটু আছে কেন?'

'ঐ যে ম্যাডাম বললেন, কাজ কর বাংলাদেশে মন থাকে কোলকাতায় এই জন্যে। আমাদের স্বজাতির অনেকেই ভারতে চলে গেছে এটা যেমন ঠিক আবার অনেকেই মাটি কামড়ে এখানে পড়ে আছে এটাও ঠিক। কেউ যখন বলে তোমার মন পড়ে আছে কোলকাতায় তখন তারাই মনে করিয়ে দেয় যে বাংলাদেশটা পুরোপুরি আমার না।'

'সুবীরদা, মানুষ রাগ করে যে কথা বলে সে কথা ধরতে নেই।'

'মাগো রাগের সময়ই মানুষ সত্য কথাগুলি বলে। মনের ভেতর চাপা পড়ে থাকা কথা তখন বের হয়ে আসে।'

'আপনি ঠিক বলেননি। রাগের সময় আমরা সব সময় উল্টা পাল্টা কথা বলি। মা খুব রেগে গেলে আমাকে বলেন—"তুই মর। তুই মরলে আমার শান্তি হয়।" আপনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন না যে মা আমার মৃত্যু চান।'

'না, বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে কি আপনি স্বীকার করলেন যে রাগের সময়ই মানুষ ভুল কথাগুলি বলে?'

সুবীরদা হেসে ফেলে বললেন, হ্যাঁ স্বীকার করলাম। তোমার বুদ্ধি খুব ভাল। ধারালো বুদ্ধি।

'ধারালো বুদ্ধিটা কী?'

'যে বুদ্ধি কেটে কেটে যায়—সেটাই ধারালো বুদ্ধি।'

'বুদ্ধি তাহলে অনেক প্রকার?'

'অবশ্যই। শান্তি–বুদ্ধি যেমন আছে অশান্তি–বুদ্ধিও আছে। শান্তি–বুদ্ধির কেউ তোমার আশেপাশে থাকলে তোমার শান্তি শান্তি লাগবে। অশান্তি–বুদ্ধির কেউ তোমার আশেপাশে থাকলে তোমার অশান্তি লাগবে।'

'আমার কোন ধরনের বুদ্ধি?'

'ঐ যে বললাম, ধারালো বুদ্ধি।'

'শান্তি–বুদ্ধি, না অশান্তি–বুদ্ধি?'

'অশান্তি–বুদ্ধি!'

আমি হেসে ফেললাম। সুবীরদাও হাসছেন। কী আশ্চর্য ব্যাপার আমি কত সহজভাবে হাসছি। গল্প করছি। অথচ আমার মা জ্বরে ছট্‌ফট্ করছেন। এতক্ষণে তাঁর কথা একবার মনেও পড়েনি। আমি দিলু হয়ে যেতে শুরু করেছি। মেকাপ শেষ হবার পর দিলুর পোশাকটা পরব। দিলু হবার দিকে আরেকটু এগুব।

সোহরাব চাচা গম্ভীর মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি একই সঙ্গে গম্ভীর এবং বিরক্ত অথচ তাঁরই এখন সবচে হাসিখুশি থাকার কথা। লোকজন সব চলে এসেছে। ডিরেক্টর সাহেব সুস্থ। পুরোপুরি শুটিং শুরু হতে যাচ্ছে। জেনারেটারের অভাবে রাতের কাজ আগে কিছু হয়নি। জেনারেটার চলে এসেছে। এখন রাতেও কাজ হবে। শুটিং বন্ধ থাকায় যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে।

AMARBOI.COM

'রুমালী।'

'জি চাচা।'

'স্যার তোমাকে ডাকছেন।'

'জি আচ্ছা।'

'তোমার মা'র যে এত জ্বর সেটাতো তুমি আমাকে বলনি। অসুখ বিসুখ হলে আমাকে জানাবে না?'

'আপনি এত ব্যস্ত। আপনাকে বিরক্ত করতে ইচ্ছা করছিল না।'

'এটাতো বিরক্ত হবার কিছু না। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। যাই হোক, আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ডাক্তার চলে আসবেন। জালালের মা'কে বলে এসেছি মাথায় পানি ঢালতে।'

'থ্যাংক য়্যু চাচা।'

'স্যার কী বলেন শুনে মা'র কাছে গিয়ে বোসো। সব রেডি হলে আমি তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।'

সোহরাব চাচা চলে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলাম, চাচা একটা কথা শুনে যান। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। আমি বললাম, আজ আপনি আমার সঙ্গে এমন রেগে রেগে কথা বলছেন কেন? প্লিজ, রেগে থাকবেন না। আপনি রেগে থাকলে আমার অভিনয় খারাপ হবে।

সোহরাব চাচা আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, রুমালী তোমার অভিনয় খারাপ হবে না। আমার দেখা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের মধ্যে তুমি একজন। যে কোনো অবস্থায় তোমার অভিনয় ভাল হবে।

সুবীরদা একটা ভেজা কাপড় আমার মুখের উপর দিয়ে দিলেন। আমি চোখ বন্ধ করে পড়ে আছি। আমি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদের একজন, সোহরাব চাচা এই কথা কেন বললেন, তা বের করার চেষ্টা করছি। তিনি কি কিছু জানেন? না কিছু অনুমান করেছেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিরেক্টর সাহেবকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে তাঁর বয়স দশ বছর কমে গেছে। তিনি ধবধবে শাদা প্যান্টের উপর লাল-নীল স্ট্রাইপ দেয়া হাফ শার্ট পরেছেন। আজ কি তিনি চুল অন্যরকম করে আঁচড়েছেন? তাঁকে একটু যেন অচেনা লাগছে। তাঁর চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। এই ভদ্রলোকের চশমাপ্রীতি আছে। তাঁর অনেকগুলি চশমা। তিনি একেক সময় একেক চশমা পরেন। তিনি আমাকে দেখে হাসিমুখে বললেন, রুমালী তোমার খবর কী?

ঝড় বৃষ্টির রাতে স্কুল ঘরের কথা তাঁর কি কিছু মনে নেই?

আমিও তাঁর মতোই সহজ এবং স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছি। পারছি না। আমার হাত পা ভারী হয়ে আসছে। গলার স্বর বসে যাচ্ছে। সোহরাব চাচার কথামতো আমি যদি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েও থাকি—এই মানুষটার সামনে সহজ হবার সাধারণ অভিনয় করতে পারছি না। কিংবা কে জানে সহজ হবার অভিনয়ই হয়তো সবচে কঠিন।

'তোমাকে একটা জরুরি কথা বলার জন্যে ডেকেছি।'

'বলুন।'

'বোসো। জরুরি কথাটা এমন না যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হবে।'

আমি বসলাম। তিনি চেয়ার টেনে আমার সামনে বসলেন। হাসিমুখে বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, জরুরি কথার আগে জরুরি না এমন একটা জিনিস দেখ। আমার হাতে এটা কী দেখ? নাও হাতে নিয়ে দেখ। এটা হচ্ছে একটা বুনো ফল। ফলটার নাম হল—মন-ফল। ইংরেজি করলে হবে Mind-Fruit.

'মন-ফল?'

'হ্যাঁ মন-ফল। পাহাড়ি অঞ্চলের গাছে হয়। কাঁটায় ভর্তি গাছ। ঢল যখন নামে তখন পানিতে ভেসে আসে।'

কাগজি লেবুর সাইজের ফলটা আমি হাতে নিলাম। পচা টাইপ গন্ধ আসছে। বুনো ফলের বুনো গন্ধ। আমি বললাম, ফলটার বিশেষত্ব কী?

'কাঁচা অবস্থায় ফলটা বিষাক্ত। যখন পাকে তখন অল্পবয়েসী মেয়েরা ফলটা খুব আগ্রহ করে খায়। তখন তাদের 'মন' না-কি অন্য রকম হয়ে যায়। এই জন্যেই নাম মন-ফল Mind-Fruit. মেয়েরা এই ফল লুকিয়ে চুরিয়ে খায়।'

'শুধু মেয়েরাই খায়? ছেলেরা খায় না।'

'শুনেছি ছেলেরা খায় না। তাদের উপর ফলের তেমন প্রভাবও নেই। ফলটা অবিবাহিত কুমারী মেয়েদেরই প্রিয়। তোমার কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে না?'

'জি লাগছে।'

'আমার ধারণা এই ফলে কোনো হেলুসিনেটিং ড্রাগ-ট্রাগ আছে। মাইন্ড অলটারিং ড্রাগ, ধুতরায় যেমন আছে তেমন। ঠিক করেছি ফলের কার্যকারিতা আমি পরীক্ষা করে দেখব।'

'খাবেন?'

'হ্যাঁ, খাব।'

'আপনিতো বললেন, ছেলেদের উপর কোনো প্রভাব পড়ে না।'

'এই জন্যেই বেশি করে খাব। আমি গোটা চারেক ফল জোগাড় করতে বলেছি। সহজে পাওয়া যায় না।'

'এই ফলটা কি পাকা?'

'বাইরের খোসা সবুজ হলেও ফলটা না-কি পাকা।'

'আপনার খেয়ে দরকার নেই। আমাকে দিন—আমি খেয়ে কী হয় আপনাকে বলব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে না। তুমি কী খাবে! আমি আগে পরীক্ষা করে নেই। ইন্টারেস্টিং কিছু পেলে তখন তোমাকে বলব। এই সব পরীক্ষা মাঝে মাঝে খুব ফ্যাটালও হয়। সিদ্ধির শরবত খেয়ে একবার প্রায় মরতে বসেছিলাম। গল্পটা শুনবে?

আমি গল্পটা শুনতে চাচ্ছি না। কারণ আমি দ্রুত দিলু হয়ে যাচ্ছি। দিলু অন্যের গল্প শুনতে তেমন আগ্রহী না। সে নিজের গল্প করতে চায়। আমার অনেক গল্প আছে যা আমি উনাকে শুনাতে চাই। মুখে সাবানের ফেনা নিয়ে ফুঁ দিয়ে আমি খুব সুন্দর বাবল বানাতে পারি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে মুখ থেকে একের পর এক বেলুন বের হচ্ছে। কিন্তু উনি নিজেই এখন গল্প করবেন। সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরানো মানে লম্বা গল্পের প্রস্তুতি।

'সে এক মজার গল্প। না, মজার না, টেনশানের গল্প। এখনো মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। এই দেখ গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

তিনি হাত এগিয়ে দিলেন। হাতের লোম সত্যি খাড়া হয়ে আছে।

আমি হাসলাম, তিনি গল্প শুরু করলেন। খুব আগ্রহ করে যে গল্পই বলা হোক শুনতে ভাল লাগে। অসাধারণ গল্পও অনাগ্রহের সঙ্গে বললে শুনতে ভাল লাগে না। ডিরেক্টর সাহেব সব গল্পই আগ্রহের সঙ্গে করেন। তবে আমার সমস্যা হচ্ছে—আমি উনার কোনো গল্পই মন দিয়ে শুনতে পারি না। গল্পের মাঝামাঝি জায়গায় সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মনে হয় তিনি অনেক দূর থেকে কথা বলছেন। তাঁর চেহারা অস্পষ্ট হয়ে আসে। কেন এ রকম হয়?

'রুমালী শোন, সিদ্ধির শরবতের ব্যাপারটা। তোমাকে বলি—শাক্ত হিন্দুরা কালীপূজার রাতে এই শরবত তৈরি করে। মহাদেব শিব তাঁর সঙ্গী নন্দি ভৃঙ্গিকে নিয়ে এই শরবত খেতেন বলে শিবের অনুসারিরাও পূজার অঙ্গ হিসেবে খায়। পেস্তা বাদাম পিশে, দুধ চিনি মিশিয়ে এই শরবত তৈরি করা হয়। ঘটিতে করে বরফ কুচি মিশিয়ে পরিবেশন করে। খেতে অতি স্বাদু। তবে শরবতের আসল ইনগ্রেডিয়েন্ট ধুতরো পাতার রস। ধুতরো পাতা কচলে সেই রস শরবতে মিশিয়ে দেয়া হয়। ফল ভয়াবহ। ধুতরো পাতার রসে আছে—পাওয়ারফুল মাইন্ড অলটারিং হেলুসিনেটিং ড্রাগ। যে খায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তার জগৎটা যায় পাল্টে। সে ভয়ংকর ভয়ংকর সব জিনিস দেখতে থাকে।'

'কী রকম ভয়ংকর?'

'নির্ভর করে শরবতটা কে খেয়েছে তার মানসিকতার উপর। কেউ ভূত-প্রেত দেখে, কেউ দেখে তার আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে।'

'আপনি কী দেখেছিলেন?'

'আমি দেখলাম আমার দু'টা হাত লম্বা হতে শুরু করেছে। হাতটা যেন রবারের। কেউ টানছে আর লম্বা হচ্ছে। গল্পে জীনের হাতের কথা পড় না? জীন খেতে বসেছে। কাগজি লেবু দরকার। লম্বা হাত বাড়িয়ে বাড়ির উঠোনের কোনার কাগজি লেবু গাছ থেকে লেবু ছিড়ে নিয়ে এল। সেই রকম।'

'অদ্ভুত তো!'

'অদ্ভুততো বটেই।'

'সিদ্ধির শরবত খাবার পরই গাছগাছড়ার ব্যাপারে আমার খুব কৌতূহল হয়। এই বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করি। বোটানির ছাত্র না হয়েও—গাছগাছড়া সম্পর্কে আমি অনেক জানি। প্রমাণ দেব?'

'না, প্রমাণ দিতে হবে না। প্রমাণ দেবেন কেন? আপনি যা বলবেন, আমি তাই বিশ্বাস করব।'

'যে যা বলে তুমি কি তাই বিশ্বাস কর?'

'না।'

'সিদ্ধির শরবতের গল্পটা তোমার মনে হয় ভাল লাগেনি।'

'আপনার এ রকম মনে হচ্ছে কেন?'

'যাদেরকেই আমি সিদ্ধির শরবত খাবার গল্পটা বলেছি তারাই গল্পের এক পর্যায়ে বলেছে—আমি একটু খেয়ে দেখতে চাই। কোথায় পাওয়া যায়? তুমি কিছু বলনি।'

'আপনি কি একই গল্প সবাইকে করেন?'

'আমি একা কেন, সবাইতো তাই করে। সব মানুষেরই তার নিজের কিছু গল্প থাকে। এই গল্পগুলিই সে সবাইকে করে।'

'ও।'

'আচ্ছা দেখি তোমার জ্ঞান। বল কত রকমের শাক আমাদের দেশে পাওয়া যায়?'

'জানি না।'

'অবশ্যই জান। অন্তত কিছু কিছুতো জান—পুঁই শাক, লাল শাক, কলমী শাক, পালং শাক...এর বাইরে কী জান?'

'এর বাইরে কিছু জানি না।'

'আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে কিছু শাকের নাম শুনিয়ে দেই...সরিষা শাক, জয়ন্তি শাক, গুলঞ্চ শাক, হিঞ্চ শাক, ঘেঁটু শাক, সুষনি শাক, কালকাসুন্দে শাক, বেতো শাক, লাউ শাক, শেভেঞ্জে শাক...। এদের মধ্যে একটা শাক আছে যা খেলে পাগল ভাল হয়। মনোবিকারগ্রস্তদের বিকার কমে। শাকটার নাম হল সুষনি শাক। বোটানিক্যাল নাম হল—Marsiles quadrifolia. তোমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে কি-না বল?'

'লাগছে।'

'ভেরি গুড। আচ্ছা এখন যাও—আমাদের ক্যামেরা ওপেন করার সময় হয়ে এসেছে।'

'আপনি কী জরুরি কথা যেন বলবেন বলেছিলেন।'

'জরুরি কথা? ও—হ্যাঁ, জরুরি কথা। আচ্ছা এখন থাক—পরে বলব। অনেক অপ্রয়োজনীয় কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা প্রয়োজনীয় কথা, শুনতেও ভাল লাগে না। বলতেও ভাল লাগে না।'

আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। না অস্বস্তি না, অস্থিরতা। মনে হচ্ছে তিনি কোনো কিছুতে মন বসাতে পারছেন না। চেয়ারে বসেছিলেন, চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসলেন। ড্রয়ার খুলে সোনালি ফ্রেমের চশমা বের করে পরলেন। আয়নায় নিজেকে দেখলেন। এই চশমাটাও তাঁর পছন্দ হল না। তিনি ড্রয়ার হাতড়াচ্ছেন। ড্রয়ারের জিনিসপত্র নামাচ্ছেন। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন—রুমালী, তোমার সঙ্গে কি নীরার কথা হয়েছে?

'জি হয়েছে।'

'কী ধরনের কথা?'

'সাধারণ কথা।'

'সাধারণ কথার ফাঁকে সে কি বলেনি—আমি অসুস্থ?'

'জি বলেছেন।'

'কী ধরনের অসুস্থ তা বলেনি?'

'জি না।'

'তুমি জানতে চাওনি?'

'জি না।'

'তোমার কাছে কি আমাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে?'

'জি না।'

'অনেক অসুখ আছে বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আমি আসলেই অসুস্থ।'

তিনি আবার আগের জায়গায় এসে বসেছেন। এখন তাঁকে শান্ত মনে হচ্ছে। অস্থিরতা কেটে গেছে। তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে একটু ক্লান্ত গলায় বললেন—নীরা যুক্তি-তর্ক খুব ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। সে তার যুক্তি দিয়ে নিমিষের মধ্যে প্রমাণ করে দিতে পারে যে আমি সুস্থ আবার প্রমাণ করতে পারে আমি অসুস্থ। ও অনেকটা গার্গীর মতো।

'গার্গী কে?'

'প্রাচীন ভারতের এক মেয়ে। যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক মহাজ্ঞানী পণ্ডিতকে যুক্তিতে হারিয়ে সে লেজেগোবরে করে দিয়েছিল। তর্কে হেরে ভূত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য শেষ পর্যন্ত বললেন—গার্গী, তুমি প্রশ্নের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি যদি না থাম তাহলে তোমার মাথা খসে পড়বে। পৌরাণিক গল্প।'

আমার ইচ্ছা করছিল বলি, তর্কে হেরে আপনিও কি যাজ্ঞবল্ক্যের মতো বলেন—তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি থাম, নয়তো তোমার মাথা খসে পড়বে। তা বললাম না। কুণ্ঠিত গলায় জানতে চাইলাম, আজ আমার কোন অংশটা হবে?

'সবাইকে তো সবারটা বলেছি। তোমাকে বলা হয়নি?'

'জি না।'

'আচ্ছা পরে বলব।'

'পরে কেন। এখনি বলুন। আমি নিজের মনে একটু ভাবব।'

তিনি চিন্তিত মুখে আরেকটা সিগারেট হাতে নিলেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সিগারেটে আগুন ধরালেন। সিগারেটে টান দিয়ে খুব কাশতে লাগলেন। জীবনের প্রথম সিগারেটে টান দিলে মানুষ যে ভাবে কাশে তিনি সেইভাবে কাশছেন। মনে হচ্ছে তাঁর জগৎটা আবারো এলোমেলো হয়ে গেছে। তিনি এ রকম করছেন কেন?

'দিলুর যে অংশটা আজ শুট করা হবে সেটা হচ্ছে সিক্যোয়েন্স ওয়ান হানড্রেড থার্টি টু। দিলুর এক কাল্পনিক বান্ধবী আছে—Imaginary friend. তার নাম তৃণা। দিলু যখন কোনো ব্যাপারে খুব আপসেট হয় তখন সে কোনো এক নির্জন জায়গায় চলে যায় আর কল্পনার বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলে। ঐ অংশটা।'

'কল্পনার বান্ধবীকে কি সত্যি সত্যি দেখানো হবে?'

'না, দেখানো হবে না। দিলুর এই কাল্পনিক বান্ধবী কখনো দিনে আসে না। আসে রাতে। কাজেই আমি কী করব শোন—দিলুকে রাতে আধো আলো, আধো অন্ধকারে বসিয়ে দেব। লাইট সোর্স এমন রাখা হবে যেন দেয়ালে দিলুর দু'টা ছায়া পড়ে। দিলু তার একটা ছায়ার সঙ্গে কথা বলবে। দিলু এবং তার দু'টা ছায়াকে নিয়ে থ্রি শটে শুট করা হবে। থ্রি শট থেকে টু শট। দিলু এবং দিলুর একটা ছায়া। টু শট থেকে—সিঙ্গেল শট। ক্লোজ আপ। দিলুর ক্লোজ আপ, ছায়ার ক্লোজ আপ।

'বাহ্ সুন্দর তো।'

'সুন্দরতো বটেই। মানুষ এবং তার ছায়া নিয়ে টু শট বানানো—কনসেপ্ট হিসেবে ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা তুমি এখন যাও।'

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'না, শরীর খারাপ না। I am just fine.'

আমি তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। ঘরের বাইরেই সোহরাব চাচা। দেখে মনে হল তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তাঁর মুখ আগের মতোই বিরক্ত ও বিষণ্ন। মনে হচ্ছে তিনি রেগেও আছেন। কার উপর রেগে আছেন? আমার উপর? সোহরাব চাচা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। আমি বললাম, চাচা আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন? সোহরাব চাচা নিচু গলায় বললেন, হ্যাঁ বলব। স্যারের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'কী কথা হয়েছে?'

'শাক নিয়ে কথা হয়েছে। বাংলাদেশে কত রকম শাক পাওয়া যায় এইসব।'

'আর কোনো কথা হয়নি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না।'

'শাকসবজির বাইরে কোনো কথা হয়নি?'

'জি না। কী কথা হবে?'

সোহরাব চাচা জবাব দিলেন না। তিনি হন হন করে উল্টো দিকে যাচ্ছেন। খুব সম্ভব ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে যাচ্ছেন। কোনো সমস্যা কি হয়েছে? আমাকে নিয়ে কোনো সমস্যা? হোক সমস্যা। আমি মা'র ঘরের দিকে রওনা দিলাম।

আশ্চর্য, মা'র ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাকবাংলোর সামনে একটা জিপ গাড়ি এসে থেমেছে। জিপ থেকে বেশ কিছু অচেনা মানুষজন নামছে। এদের মধ্যে একটা মেয়ে আমার বয়েসী। খুব মিষ্টি চেহারা। মাথাভর্তি কোকড়ানো চুল। মেয়েটি অভিভূতের মতো চারদিকে তাকাচ্ছে। একবার তাকাল আমার দিকে। আমি হাসলাম। এত দূর থেকে সে নিশ্চয়ই আমার হাসি দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পেলে তার ভাল লাগতো। সে দ্বিতীয়বার আমার দিকে তাকাতেই আমি হাত নাড়লাম। দিলু হলে তাই করতো। মেয়েটি এখন অবাক হয়ে আমাকে দেখছে। সোহরাব চাচা ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। জিপের ড্রাইভার বড় বড় সুটকেস টেনে নামাচ্ছেন। এরা মনে হয় আমাদের সঙ্গে থাকবে।

পাপিয়া ম্যাডামের মেয়েটা উঠোনে একা একা হাঁটছে। এর সঙ্গে আমার এখনো কথা হয়নি। আজ কোনো এক ফাঁকে তার সঙ্গে ভাব করব। একী মেয়েটা বিড়বিড় করে কথা বলছে নাকি? কা'র সঙ্গে কথা বলছে? কল্পনার কোনো বন্ধবী। দিলুর মতো তারও কি কোনো ইমাজিনারি ফ্রেন্ড আছে?

আমি মা'র ঘরে ঢুকলাম। ঘরে মা একা। তাঁর মাথায় পানি দেয়া হয়েছে। চুল ভেজা। মা চাদর গায়ে অসহায় ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই চোখ মেললেন। তাঁর চোখ টকটকে লাল। তিনি আগ্রহ নিয়ে বললেন, বকু একটা গাড়ি এসে থেমেছে না? শব্দ শুনালাম। আমি বললাম, হ্যাঁ।

'কে এসেছে, তোর বাবা?'

'বাবা আসবে কীভাবে? বাবার কি আসার কথা?'

'সোহরাব ভাইকেতো বলেছি উনাকে খবর দিতে।'

'উনি খবর পাঠালেও বাবার আসতে আসতে দু'তিন দিন লাগবে।'

'দু'তিনদিন লাগবে কেন? ঢাকা থেকে এখানে আসতে পাঁচ ছ'ঘণ্টা লাগে। পাগলের মতো কথা বলিস কেন?'

'মা তোমার জ্বর মনে হয় খুবই বেশি। তুমিতো কথাই বলতে পারছ না। তোমার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।'

আমি মা'র কপালে হাত রেখে চমকে উঠলাম—জ্বর আসলেই বেশি। পানি ঢেলে কোনো লাভ হয়নি। জ্বর কমেনি। মা'র শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। কেমন টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছেন।

'জিপে করে কে এসেছে বকুল?'

'জানি না মা।'

'জিপের শব্দ শুনে মনে হল তোর বাবা এসেছে।'

'একবারতো বলেছি মা, বাবা আসেনি।'

'তোর বাবা এলে থাকবে কোথায়?'

'এই ঘরেই থাকবে, আর থাকবে কোথায়?'

'আরে না। তা কী করে হয়! তোর বাবার সঙ্গে আমি কি আর এক ঘরে থাকতে পারি? তুই আর তোর বাবা এইখানে থাকিস। আমি অন্য কোথাও চলে যাব।'

'বাবা এসে কোথায় থাকবে সেটা নিয়ে তোমাকে এখন মাথা গরম করতে হবে না। বাবা আসুক তারপর দেখা যাবে। আমার মেকাপ কেমন হয়েছে মা?'

মা আমার দিকে না তাকিয়েই অনাগ্রহের সুরে বললেন, ভাল।

'তুমি কী ভাবছ মা?'

'কিছু ভাবছি না। আচ্ছা শোন, তোর বাবা আবার সঙ্গে করে ঐ ধুমসি মাগিটাকে আনবে নাতো?'

'আনতেও পারে। মা শোন—"ধুমসি মাগি" টাইপ কথা বলোনাতো, শুনতে খারাপ লাগে।'

'ধুমসি মাগিকে কী বলব—শুকনো মাগি বলব?'

'আচ্ছা ঠিক আছে—যা বলতে ইচ্ছে করে বলো।'

মা শক্ত করে আমার হাত চেপে ধরে আছেন। যেন হাত ছেড়ে দিলেই আমি কোথাও চলে যাব। আমাকে আটকে রাখতে হবে।

'মা তোমার কি খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

'পানি খাবে?'

'খাব।'

আমি মা'কে পানি এনে দিলাম। মা খেতে পারলেন না। একটু মুখে দিয়েই রেখে দিলেন। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, বকু পানিটা ভয়ংকর তিতা লাগছে। পানি তিতা লাগা খুব অলক্ষণ। মৃত্যুর আগে আগে আল্লাহ্ পাক পানি থেকে স্বাদ উঠিয়ে নেন। পানি তিতা বানিয়ে দেন।

'কত অদ্ভুত কুসংস্কারের মধ্যে যে তুমি বাস কর না মা। রাগ লাগে। জ্বর-জ্বারি হলে পানি তিতা লাগে। পানি কেন সব খাবারই তিতা লাগে।'

'এই তিতা সেই তিতা না-রে মা। অন্য রকম তিতা।'

'মা চুপ কর। তোমার কথাবার্তা অসহ্য লাগছে। সামান্য জ্বর হয়েছে—আর তুমি কী শুরু করেছ!'

মা অনেক কষ্টে পাশ ফিরলেন, একটা হাত আমার কোলে দিলেন। মা'কে দেখে আমার এখন ভয়ংকর মায়া লাগছে। ইচ্ছে করছে আমিও মা'র সঙ্গে চাদরের নিচে চলে যাই। মা'কে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকি। দিলুতো তাই করবে। সে মা'কে এই অবস্থায় ফেলে কোথাও যাবে না।

'বকু!'

'কী মা?'

'তোর বাবার খুব ভাল একটা গুণ কী জানিস? অসুখ বিসুখে সে খুব সেবা করতে পারে। আমাদের একটা কাজের ছেলে ছিল রুসমত নাম। তার একবার টাইফয়েড হল। উঠে বসতে পারে না, নড়তেচড়তে পারে না এমন অবস্থা। তোর বাবা তাকে মুখে তুলে ভাত খাইয়ে দিত। সেই ছেলে এমনই হারামজাদা তোর বাবার পকেট থেকে একদিন মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেল।'

'মা তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে তুমি চুপ করে শুয়ে থাক।'

'আমার কোনো অসুখ বিসুখে তোর বাবা খুবই অস্থির হয়ে পড়ত। অফিস কামাই দিয়ে ঘরে বসে থাকত।'

'ভাল। বাবার পত্নী প্রেমের কথা শুনে আমি মুগ্ধ।'

'আমি মাঝে মাঝে অসুখের ভান করতাম। অসুখ বিসুখ কিচ্ছু না। সকালবেলা তোর বাবার অফিসে যাবার সময় শুয়ে পড়ে উহ্ আহ্।'

'এইসব ন্যাকামির কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগছে না মা। চুপ কর।'

'আচ্ছা যা—চুপ করলাম।'

'তুমি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতো মা। আমি সোহরাব চাচাকে ডাক্তারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আসি।'

আমি মা'র ঘর থেকে বের হয়েই দেখি সোহরাব চাচা ডাক্তার নিয়ে এদিকেই আসছেন। অল্পবয়সের একজন ডাক্তার। দেখে মনে হয় কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। সোহরাব চাচা বললেন, রুমালী তুমি আমার ঘরে গিয়ে একটু বোসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমি ডাক্তারকে রুগি দেখিয়ে আসি।

'রুগি দেখার সময় আমিও সঙ্গে থাকি।'

'তোমার সঙ্গে থাকার কোনো দরকার নেই। তোমাকে যা করতে বলছি কর।'

আমি সোহরাব চাচার ঘরের দিকে রওনা হলাম। চারদিক কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হচ্ছে ক্যাম্প খালি—কেউ নেই। একজন লাইটবয় ইলেকট্রিক তার নিয়ে কী যেন করছে। তাকে বললাম, লোকজন সব কোথায়?

সে বলল, শুটিং স্পটে চলে গেছে আপা।

'কখন গেছে?'

'দশ পনেরো মিনিট আগে।'

আমাকে ফেলে রেখে সবাই চলে গেল কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সোহরাব চাচা গম্ভীর ভঙ্গিতে চৌকির উপর বসে আছেন। আমি তাঁর সামনে চেয়ারে বসে আছি। সোহরাব চাচার হাতে মগভর্তি চা। তিনি ঘন ঘন চায়ের মগে চুমুক দিচ্ছেন। চা তাঁর অপছন্দের পানীয় বলে জানতাম। আজ দেখি তিনি আগ্রহ করেই চা খাচ্ছেন।

আমি বললাম, ডাক্তার কী বলেছে সোহরাব চাচা?

'বলেছে—প্রেশার খুব হাই। জ্বর কমার অষুধ দিয়েছে। আশঙ্কা করছে নিউমোনিয়া। এরা নতুন ডাক্তার, কেঁচো দেখলে ভাবে সাপ। আমার ধারণা সন্ধ্যার মধ্যে জ্বর কমবে। তুমি থাক তোমার মা'র পাশে—তাঁর সেবা যত্ন কর। রোগের আসল চিকিৎসা সেবা যত্ন। অষুধ রোগের কোনো চিকিৎসা না।'

'আমি থাকব কী করে? আজ আমার শুটিং হবে!'

সোহরাব চাচা কথা না বলে চায়ের কাপে ঘন ঘন কয়েক বার চুমুক দিলেন। কেশে গলা পরিষ্কার করে হুট করে বললেন, বকুল শোন—আসল ব্যাপারটা তোমাকে বলি। তোমাকে ছবি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

আমার উচিত ছিল প্রচণ্ড ধাক্কা খাওয়া। কেন জানি ধাক্কা খেলাম না। হয়ত আমার অবচেতন মন ব্যাপারটা আগেই বুঝে ফেলেছিল। কিংবা আমি হয়ত অসাধারণ অভিনেত্রী। বড় বিপর্যয়েও শান্ত থাকার অভিনয় করছি। আমি শান্ত গলায় বললাম, আমাকে বাদ দেয়া হয়েছে?

'হ্যাঁ।'

'যেসব অংশ শুট করা হয়েছে সেগুলি কী হবে?'

'রিশুট হবে।'

'নতুন যে মেয়েটা এসেছে সেই আমার অংশ করবে?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েটার নাম কী?'

'ওর নাম তিথি। তিথিকণা।'

'ও।'

'তুমি বাদ পড়লে কেন জানতে চাও না?'

'জি না। বাদ পড়েছি এইটাই বড় কথা। কেন বাদ পড়েছি এটা বড় কথা না।'

সোহরাব চাচা চায়ের মগ নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বললেন, নীরা ম্যাডাম তোমাকে বাদ দেবার কথা বলে দিয়ে গেছেন। তাঁর কথার বাইরে যাবার সাধ্য স্যারের নেই। নীরা ম্যাডাম এই ছবির প্রযোজক।

'বুঝতে পারছি। ডিরেক্টর সাহেব যে জরুরি কথাটা বলতে চাচ্ছিলেন সেটা কি এটাই যে আমি বাদ পড়েছি?'

'হুঁ। স্যার বলতে পারেননি বলেই আমাকে বলতে হল।'

'আমরা কি এখন ঢাকায় চলে যাব?'

'তোমার মা'র শরীরটা একটু ভাল হোক—তারপর যাও। আমি গাড়ি দিয়ে দেব।'

'গাড়ি লাগবে না। বাসে তুলে দিলেই আমরা চলে যেতে পারব। চাচা শুনুন—আমি যে বাদ পড়েছি এটা এখন মা'কে শুনানোর দরকার নেই। মা'কে বললেই হবে যে আমার অংশ শেষ। অসুস্থ অবস্থায় মা যদি শোনেন আমি বাদ পড়েছি খুব কষ্ট পাবেন।'

'ঠিক আছে তাকে কিছু বলার দরকার নেই। সবাইকে বলে দেব তাঁকে কিছু না জানাতে।'

'আমি যে বাদ পড়েছি এটা সবাই জানে?'

'হ্যাঁ জানে।'

'কী কারণে বাদ পড়েছি এটা জানে?'

'স্যার বলেছেন—তুমি অভিনয় খুব ভাল করলেও চরিত্রটার গেটাপের সঙ্গে তোমার গেটাপ মিশছে না। দিলু খুব হাসি খুশি লাইভলী একটা মেয়ে। আর তুমি হলে বিষণ্ন প্রকৃতির।'

'ঠিকই বলেছেন।'

'বকুল শোন—পরে তোমাকে সুযোগ দেয়া হবে। তুমি মন খারাপ করো না।'

'বাদ পড়েছি বলে মন খারাপ করছি না। আমি মন খারাপ করছি সম্পূর্ণ অন্য করণে।'

'অন্য কারণটা কী?'

'আগে আপনি কথায় কথায় আমাকে মা ডাকতেন। বাদ পড়ার পর একবারও মা ডাকেননি। তার মানে হচ্ছে—আগে যে আপনি মা ডাকতেন ভালবেসে ডাকতেন না। হিসেব নিকেশ করে ডাকতেন।'

সোহরাব চাচা চুপ করে আছেন। আমি সহজ গলায় বললাম, চাচা শুনুন—আমি শুটিং স্পটে যাব। কাউকে বিরক্ত করব না। দূর থেকে শুটিং দেখব। এখন মা'র কাছে গিয়ে বসে থাকলেই মা সন্দেহ করবেন।

'ঠিক আছে। যাও শুটিং স্পটে যাও। তবে বাদ পড়া নিয়ে স্যারের সঙ্গে কথা বলবে না। স্যারের কনসানট্রেশন নষ্ট হবে।'

'আপনি মোটেই চিন্তিত হবেন না চাচা। আমি কাউকেই বিরক্ত করব না। আমি অত্যন্ত লক্ষ্মী টাইপ মেয়ে এবং ভাল অভিনেত্রী।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম।

দিলু সেজে থাকলে আমি এখন আর দিলু না, আমি রুমালী। শুটিং স্পটে চলে যাব। রুমালী হয়ে চুপচাপ বসে থাকব। শুটিং দেখব। ক্যামেরাম্যান বলবেন, অল লাইটস। সব বাতি জ্বলে উঠবে। খুলে যাবে অন্য ভুবনের দরজা। যে ভুবনে আমার জায়গা নেই।

শুটিং স্পটে যাবার আগে মেকাপ তুলে ফেলব? না যেভাবে আছে সেভাবে যাব? বুঝতে পারছি না। মেকাপ নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। মুখে মেকাপ থাকলে মনে হবে আমি সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে আছি—সবাইকে বলতে চেষ্টা করছি—তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমি তৈরি হয়ে এসেছিলাম তারপর ওরা আমাকে বাদ দিল। তার কোনো দরকার নেই। এখন আমি মা'র কাছ যাব। মা'কে বলব, শুটিং-এ যাচ্ছি, দোয়া করোতো মা। এই বলে বিদায় নিয়ে নিচে এসে মেকাপ তুলব। তারপর এক কোনায় চুপচাপ বসে শুটিং দেখব। শুটিং এর ফাঁকে ফাঁকে আশেপাশের মানুষের সঙ্গে টুকটুক করে গল্প করব। হাসব। পাপিয়া ম্যাডামের গম্ভীর মেয়েটার সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করব।

মা জেগেই ছিলেন। আমাকে দেখে বললেন, এখনো যাসনি।

আমি বললাম, না। ডাক্তার তোমাকে কী বলল?

মা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ডাক্তার ছেলেটাকে দেখেছিস? কী রকম রাজপুত্রের মতো চেহারা। কী অসম্ভব ভদ্র। এখনো বিয়ে করেনি।

'এর মধ্যে সব জিজ্ঞেস করে ফেলেছ?'

'জিজ্ঞেস করতে অসুবিধা কী? ছেলের বাড়ি কোথায় বলতো?'

'সুন্দরবন?'

'সুন্দরবন বাড়ি হবে কেন? ওদের দেশের বাড়ি নেত্রকোনা। কী রকম যোগাযোগ লক্ষ্য করেছিস? তোর বাবার দেশের বাড়িও নেত্রকোনা।'

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে আছি। এতো পাগলের প্রলাপ! মা আনন্দিত গলায় বললেন—ছেলেটার ভাল নাম শাহেদুর রহমান। ডাকনাম—মিঠু।

'তোমাকে সে ডাকনামও বলে ফেলল?'

'নিজ থেকেতো বলেনি। জিজ্ঞেস করেছি বলেই বলেছে। তোকে সে দেখেছে। একদিন শুটিং এর সময় ছিল।'

'আমাকে পছন্দ করেছে?'

'তোকে অপছন্দ করবে কে? তোকে যেই দেখবে তারই মাথা ঘুরে যাবে।'

'মা শোন, তুমি মিঠু বাবাজীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসোনিতো?'

'বাবাজী বলছিস কেন? এইসব আবার কী রকম ঢং? মিঠু বলেছে আমাদেরকে নিয়ে এখান থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় দেখতে যাবে। পাহাড় ভর্তি সুন্দর সুন্দর পাথর। মিঠুর ধারণা দামি পাথর।'

'মা তোমার বকবকানি অসহ্য লাগছে। আমি শুটিং-এ গেলাম। তুমি শুয়ে শুয়ে ডাক্তার ছেলেকে বঁড়শি দিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলার নানা ফন্দি ফিকির বের করার চেষ্টা করতে থাক।'

ঘর থেকে বের হয়েই আকাশে দিকে তাকালাম। আকাশে মেঘ জমছে। বৃষ্টি হলে শুটিং বন্ধ হয়ে যাবে। আমি মনে মনে প্রার্থনা করলাম—বৃষ্টি যেন না হয়। চারদিকে যেন ঝলমল করে সূর্যের আলো। শুটিং যেন ঠিকমতো হয়। মঈন নামের মানুষটা যেন কাজ সুন্দরমতো গুছিয়ে শেষ করতে পারেন।

১৪

সেলিম ভাইয়ের একটা দৃশ্য দিয়ে শুটিং শুরু হবে।

গাছের নিচে বসে তিনি ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করবেন। গ্রামের একটা ছেলে কৌতূহলী হয়ে দৃশ্যটা দেখবে। ছেলেটির দিকে না তাকিয়ে তিনি বলবেন—ছবি তুলবি? ছেলেটা না সূচক মাথা নাড়বে। তখন দূর থেকে দিলুর গলা শোনা যাবে। দিলু চেঁচিয়ে বলবে—"আমার একটা ছবি তুলে দিন। আমার ছবি"। সেলিম ভাই দিলুর দিকে তাকিয়ে হাসবেন। দিলু এসে দাঁড়াবে। তার ছবি তোলা হবে। তখন দিলু বলবে—"এখন এই পিচ্চিটার পাশে একটা ছবি তুলব।" বলেই সে ছেলেটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি তুলবে। তারপর তার স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে ছুটে যাবে পুকুর ঘাটের দিকে। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে তখন জামিল বসে আছেন। তাঁর হাতে একটা বই। পেঙ্গুইন পেপার ব্যাক। দিলু এসে জামিলের পাশে বসবে এবং বলবে, জামিল ভাই আমি আপনার সঙ্গে একটা ছবি তুলব। সেলিম ভাই ছবি তুলে দেবেন। জামিল বলবেন—"যা ভাগ।" দিলু আহত চোখে তাকিয়ে থাকবে জামিলের দিকে। জামিল তার আহত অভিমানী দৃষ্টি বুঝতে পারবেন না—কারণ তিনি বই থেকে একবারও চোখ তোলেননি। জামিল তখন বলবেন—দিলু

যা তো কাউকে বল, আমাকে যেন কড়া করে এক কাপ চা দেয়। চিনি হাফ চামচ। দিলু উঠে দাঁড়াবে, তারপর একটা কাণ্ড করবে—জামিলের হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারবে পুকুরের দিকে। বই ছুঁড়ে ফেলেই দিলু ছুটে চলে যাচ্ছে। জামিল হতভম্ব। বইটা পুকুরের পানিতে ভাসছে। জামিল একবার তাকাচ্ছেন বইটার দিকে, একবার দিলুর দিকে। দিলুর ছুটে যাবার ব্যাপারটা সেলিমও দেখছেন। তিনি ক্যামেরা তুলে দিলুর ছুটে যাবার দৃশ্য নিয়ে নিলেন। শাটার টিপতেই ফ্রেমে বন্দি হল দিলু। সিকোয়েন্সের এইখানেই সমাপ্তি।

কাজ শুরু হচ্ছে না। তিথিকণার মেকাপ শেষ হয়নি। সে এসে পৌছায়নি। সর্পভুক সেলিম ভাই এসেছেন। তাঁর গাল টাল ভেঙে একাকার। শরীর মনে হয় পুরোপুরি সারেনি। কেমন উদভ্রান্ত দৃষ্টি। আমার দিকে যতবার চোখ পড়ছে চোখ ঝট করে ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ বোঝা যাচ্ছে না। ডিরেক্টর সাহেব জাম গাছের নিচে বসে আছেন। তাঁর পায়ের কাছে টুল। টুলে পা তোলা। বসার ভঙ্গি বেশ আয়েশি। সিগারেট টানছেন। সিগারেট টানতে টানতে গল্প করছেন। শ্রোতা মওলানা সাহেব। মওলানা গভীর আগ্রহে কথা শুনছেন। নিশ্চয়ই ধর্ম সংক্রান্ত কোনো কথা।

সেলিম ভাই যে জায়গায় তাঁর কাজ হবে ঠিক সেই জায়গাতেই বসা। তার পাশেই পিচ্চি ছেলেটা বসে আছে। ছেলেটাকে এখান থেকে নেয়া হয়েছে। গারো ছেলে। নাক চ্যাপ্টা বলে অন্য রকম সুন্দর। গায়ের রং ধবধবে শাদা। গারোদের মধ্যে কালো কম। সেলিম ভাই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলছেন। ছেলেটা কথা বলছে না, শুধু শুনে যাচ্ছে। তাদের কারো কথাই আমি শুনতে পাচ্ছি না। আমার কান খুব পরিষ্কার। অন্য সময় হলে তাদের কথা শুনতে পেতাম—আজ পাচ্ছি না। আজ আমার মন অন্য রকম হয়ে আছে। সেই অন্য রকমটা কী নিজেও বুঝতে পারছি না।

পাপিয়া ম্যাডাম তাঁর মেয়ের সঙ্গে কী একটা খেলা খেলছেন। কোনো ইলেকট্রনিক গেম হবে। লুডু বোর্ডের মতো বোর্ড। সাপ এবং মইয়ের ছবি আছে। তবে কৌটায় ছক্কা নিয়ে চালতে হয় না। চালার বদলে বোতাম টিপতে হয়। বোতাম টিপলেই শুরুতে মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্বের বাজনা বাজে তারপর এক থেকে ছয়ের ভেতর একটা সংখ্যা ভেসে ওঠে।

বোতাম টেপার ফাঁকে ফাঁকে পাপিয়া ম্যাডাম আমার সঙ্গে কথা বলছেন। খুব সাধারণ কথা। কথা বলতে হয় বলেই বলা। মেয়ে সঙ্গে আছে বলে তিনি অন্য সবার প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন এ রকম হতে পারে।

'শুনলাম তোমার মা'র শরীর ভাল না?'

'জি।'

'সমস্যাটা কী?'

'জ্বর।'

'ডাক্তার দেখিয়েছ?'

'জি।'

পাপিয়া ম্যাডামের মেয়েও চায় না তার মা কারো সঙ্গে কথা বলুক। পাপিয়া ম্যাডাম আমার সঙ্গে কথা শুরু করলেই মেয়ে তার মায়ের হাত ধরে টানে।

আমি তাদের খেলাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। তাতেও মেয়েটির আপত্তি। আমার দিকে তাকিয়ে সে কঠিন গলায় বলল, Don't look at the board. ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখে চমৎকার ইংরেজি শুনলে ভাল লাগে। তাদের কথা শুনতে ইচ্ছে করে। এই মেয়েটা স্বল্পভাষী। তার মা দশটা কথা বললে সে দু'টা কথা বলছে। ছোটবেলাতেই যে মেয়ে এত কম কথা বলে—বড় হলে তার অবস্থা কী হবে? খুব বেশি বকবক করবে? না পুরোপুরি চুপ হয়ে যাবে?

আমাকে কেউ তেমন লক্ষ্য করছে না। শুটিং-এর সময় সবার সঙ্গে বসে থাকতে যতটা অস্বস্তিকর হবে বলে ভেবেছিলাম ততটা লাগছে না। সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ক্যামেরাম্যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজিজ আংকেল বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। আকাশে বড় বড় মেঘের খণ্ড। মেঘ ভেসে যাচ্ছে। সূর্য ঢাকা পড়ছে। আজিজ আংকেল নিশ্চয়ই মনে মনে হিসেব করছেন—কতক্ষণ 'সান' পাওয়া যাবে। দিনে শুটিং-এর সময় সব ক্যামেরাম্যান সূর্য উপাসক হয়ে যান।

আজ শুটিং খুব কষ্টকর হবে। একটু পরপর 'সান' না পাওয়ার কারণে শট কাট হবে। আর্টিস্টদের উপর খুব চাপ পড়বে। অভিনয়ে ডিসকনটিনিউটি চলে আসবে।

ইউনিটের একটা ছেলে ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এসেছে। সবাইকে চা দিচ্ছে। লাল টকটকে ফ্লাস্কে চা। চারদিক সবুজ বলেই ফ্লাস্কের লাল রঙ খুব সুন্দর ফুটেছে। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে।

অন্য সময় হলে আমি চা খেতাম না। আজ নিজ থেকে চা চেয়ে নিলাম। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা। চা খাচ্ছি—তাকিয়ে আছি ডিরেক্টর সাহেবের দিকে। আমার তাকিয়ে থাকা তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দেখতে পারছেন না বলেই আমি তাকিয়ে থাকতে পারছি।

আমি ভেবে পাচ্ছি না মানুষটা এত সহজ স্বাভাবিক আচরণ কী করে করছেন। সামান্য অন্যায় করলেও অপরাধ বোধ হয়। যার উপর অন্যায়টি করা হয়েছে তার সামনে সহজ হওয়া যায় না। উনার সহজ ভঙ্গিটা কি অভিনয়? অভিনয় হলে বলতেই হবে তিনি ভাল অভিনেতা।

ডিরেক্টর সাহেব উঠে আসছেন। আমাদের দিকেই আসছেন। আমার কাছে নিশ্চয়ই না। হয়ত পাপিয়া ম্যাডামকে কিছু বলার জন্যে আসছেন। যেহেতু আমি পাশে আছি—আমাকেও হয়ত কিছু বলবেন—'কেমন আছ রুমালী' ধরনের কোনো কথা। আমাকে খুব সহজভাবে জবাব দিতে হবে। ডিরেক্টর সাহেব পাপিয়া ম্যাডামের সামনে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, দু'টার আগে তোমার কোনো কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তুমি ইচ্ছা করলে রেস্ট নিতে পার।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, রেস্টইতো নিচ্ছি। ঘরের ভেতর রেস্ট নেবার চেয়ে বাইরে নেয়া কি ভাল না?

'বোতাম টিপে কী খেলা খেলছ?'

'লুডু খেলা। ইলেকট্রনিক লুডু। কৌটার ভেতর ছক্কা নিয়ে চালতে হয় না। বোতাম টিপলেই ডিসপ্লেতে এক থেকে ছয়ের ভেতর একটা সংখ্যা ভেসে ওঠে।'

'কই, গুটি চেলে দেখাওতো।'

'এখন দেখানো যাবে না। আমার মেয়ে রাগ করবে। আমার দু'জন যখন এক সঙ্গে থাকি তখন সে তৃতীয় কাউকে সহ্য করতে পারে না। এখনি সে কেমন করে তাকাচ্ছে।'

ডিরেক্টর সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—রুমালী আমার সঙ্গে এসোতো।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তিনি কী বলবেন আমি জানি। কেন আমাকে বাদ দিতে হল তা ব্যাখ্যা করবেন। ব্যাখ্যাটা কীভাবে করা হবে তা হচ্ছে কথা। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর করে বলবেন।

একই কথা একেকজন একেক ভাবে বলে। শুধুমাত্র বলার ভঙ্গির কারণে কথার অর্থ পর্যন্ত বদলে যায়। ডিরেক্টর সাহেব আমাকে বলবেন—রুমালী! আমি খুব দুঃখিত যে তুমি বাদ পড়ে গেলে। ঘটনাটার উপর আমার হাত ছিল না। তোমার যত না খারাপ লাগছে, আমার তার চেয়েও বেশি খারাপ লাগছে। অভিনয় ভাল না হবার কারণে তুমি যদি বাদ পড়তে আমার মোটেও খারাপ লাগত না। অভিনয় তুমি যে শুধু ভাল কর তা না, খুবই ভাল কর। শোন রুমালী, কিছু কিছু ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটে যায় উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই ব্যাপারটা বুদ্ধিমতী মেয়ে হিসেবে অবশ্যই তুমি জান। আমার অবস্থা তুমি সেই দিক থেকে বিচার করবে। কেমন? বি এ গুড গার্ল। এইবার সুন্দর করে একটু হাসোতো।

ডিরেক্টর সাহেব এর বাইরে কিছু বলবেন না। এইটিই তিনি হয়ত আরো গুছিয়ে বলবেন। আমার কাছে মনে হবে আরে তাইতো। মানুষটার উপর তখন আমার আর রাগ থাকবে না। মানুষটার জন্যে করুণা ও মমতায় হৃদয় দ্রবীভূত হবে।

উনি কীভাবে কথাগুলি বলেন তা শোনার জন্যে আগ্রহ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি। উনি কিছু বলছেন না। উনি মানুষজন যে দিকে বসে আছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছেন। মাঠের দিকে যাচ্ছেন। সবাই নিশ্চয়ই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। সবাই ভাবছে—'ব্যাপারটা কী?'

'রুমালী'

'জি।'

'তুমি আমাকে ছোট্ট একটা কাজ করে দাও তো।'

'কী কাজ বলুন—করে দিচ্ছি।'

'এই মাঠে কিছু ফড়িং ঘুরছে, তুমি আমাকে বড়সড় দেখে একটা ফড়িং ধরে দাও। ফড়িং ধরতে পার না?'

'কখনো ধরিনি। তবে নিশ্চয়ই ধরতে পারব।'

'ফড়িং দিয়ে কী করব বলতো?'

'দিলুর যখন শট নেয়া হবে তখন ফড়িংটা আপনি ব্যবহার করবেন। দিলুর হাতে থাকবে ফড়িংটা।'

'ঠিক ধরেছ। ক্যামেরা দিলুকে পেছন থেকে ধরবে। দেখা যাবে সে মাঠে ছোটাছুটি করছে। একটা হাতে তখন কিন্তু ফড়িংটা আছে। ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে না। আমরা ক্যামেরায় যা দেখছি তা হচ্ছে একটা মেয়ে মাঠে ছোটাছুটি করছে। মেয়েটা যখন ক্যামেরার দিকে ফিরে তাকাল তখন দেখা গেল তার হাতে ফড়িংটা ধরা। ফড়িংটা ছটফট করছে—মেয়েটা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে ফড়িংয়ের দিকে। দৃশ্যটা সুন্দর হবে না?'

'খুব সুন্দর হবে।'

'তুমি একটা ফড়িং ধরে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

'জি আচ্ছা।'

উনি চলে গেলেন উনার জায়গায়, আমি গেলাম ফড়িং ধরতে। ফড়িং ধরার জন্যে ইউনিটে অনেক লোক আছে। যে কোনো প্রোডাকশন বয়কে ফড়িং ধরতে বললে সে মুহূর্তের মধ্যে পঞ্চাশটা ফড়িং ধরে নিয়ে আসবে। তা না করে তিনি আমাকে ফড়িং ধরতে বললেন। কাজটার পেছনে তাঁর একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটা কী? আমাকে এবং সবাইকে দেখানো যে সব স্বাভাবিক আছে? আমাকে সহজ করা? তার প্রয়োজন ছিল না, আমি সহজ স্বাভাবিক হয়েই আছি।

তিথিকণার মেকাপ শেষ হয়েছে। মেয়েটা খুব সুন্দর। মেকাপের পর তাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো। শট দেবার জন্যে সে তৈরি। ভীত এবং লজ্জিত ভঙ্গিতে সে হাসছে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে—অভিনয় সে ভাল পারবে। এ রকম কেন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। বরং উল্টোটা হবার কথা, কারণ ডিরেক্টর সাহেব তাকে কী বলছেন তা সে মন দিয়ে শুনছে না, বারবারই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। ডিরেক্টর সাহেবের কথার মাঝখানেই একবার সে তার মা'র দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াল। ডিরেক্টর সাহেব বললেন—তিথি, আমি কী বলছি মন দিয়ে শোন। তুমি তোমার জীবনের একটা ট্রানজিশন পয়েন্টে আছ। এই তুমি কিশোরী—এই তুমি তরুণী এমন অবস্থা। বুঝতে পারছ কী বলছি?

'হুঁ।'

মেয়েটির মা বললেন—হুঁ বলছ কেন? বল—'জি'।

'জি।'

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, এই ফড়িংটা হাতে নাও। দু'আঙুলে পাখা দু'টা ধর।

তিথি বলল, অসম্ভব আমি মরে গেলেও ফড়িং ধরব না, ঘেন্না লাগে।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, ঘেন্না লাগার কী আছে, ফড়িং কী সুন্দর একটা পতঙ্গ।

তিথি কণা বলল, সুন্দর পতঙ্গ হলে আপনি ধরে বসে থাকুন। আমি ধরব না।

তিথির মা বললেন, এইসব কী বেয়াদবের মতো কথা। কার সঙ্গে কথা বলছ খেয়াল থাকে না? সরি বল।

তিথি বলল, সরি সরি সরি।

'এইবার আংকেল যা বলছেন কর—ফড়িংটা ধর।'

'বললাম না মা, আমার ঘেন্না লাগে। তোমাকে যদি একটা পেট মোটা মাকড়সা ধরতে বলা হয় তুমি ধরবে? তুমিতো মাকড়সা দেখেই ফিট হয়ে পড়ে যাবে।'

'ফড়িংতো আর মাকড়সা না।'

'ফড়িং মাকড়সার চেয়েও খারাপ। যা যা করতে বলা হবে আমি করব, কিন্তু ফড়িং ধরব না। আর যদি ধরতে হয় হাতে গ্লাভস্ পরে নেব। আমার জন্যে গ্লাভস্ আনাতে হবে।'

তিথি শেষ পর্যন্ত ফড়িং হাতে নিয়ে দৃশ্যটা করল। এত সুন্দর করল যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পাপিয়া ম্যাডাম বললেন—বাহ্ চমৎকারতো। মেয়েটাতো দারুণ।

জামিল ভাইয়ের সঙ্গে তার দৃশ্যটা আরো সুন্দর হল। বই ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দেয়া। রাগ করে দৌড়ে ছুটে যাওয়া। ক্যামেরায় ছবি তোলার সময় চমকে তাকানো।

আমার কাছে সবচে ভাল লাগল—তার ক্যামেরায় ছবি তোলার অংশটা। সেলিম ভাই ছবি তুলছেন। তিথির হাতে ফড়িং। সেলিম ভাই (চিত্রনাট্যের সাব্বির) বললেন—রেডি ওয়ান-টু...থ্রি বলার ঠিক আগে আগে তিথি ফাজলামি করে ঠোঁট দু'টো গোল করে ফেলল। অপূর্ব দৃশ্য। তাদের বয়েসী মেয়েরা ছবি তোলার সময় এ রকম কাণ্ড কারখানা করে। আমি কি এরকম করতাম? না, করতাম না। তিথি করছে কারণ একটা সিনেমা তৈরি হচ্ছে এ ব্যাপারটা তার মাথার মধ্যে নেই। সে ঘরে যা করে এখানেও তাই করছে। পুরো ব্যাপারটা সে নিয়েছে খেলার মতো।

লাঞ্চ ব্রেকের সময় আমি ক্যাম্পে ফিরে গেলাম। তিথিও আমার সঙ্গে আসছে। সে গোসল না করে দুপুরের খাবার না-কি খেতে পারে না। ভালমতো সাবান ডলে গোসল করবে। তারপর খাবে। খাবার পর আবার মেকাপ নিয়ে অভিনয়ের জন্যে তৈরি হবে। শুধু আজ গোসল না করে খেয়ে ফেলার ব্যাপারে তাকে অনেক বলেও রাজি করানো যায়নি। তিথির মা তার সঙ্গে আসতে চাচ্ছিলেন। তিথি বলেছে—মা তোমাকে আসতে হবে না। তুমি লাঞ্চ কর। আমি সোহরাব চাচার সঙ্গে যাচ্ছি, উনার সঙ্গে ফিরে আসব।

আমরা তিনজন ক্যাম্পের দিকে ফিরছি। সবার আগে সোহরাব চাচা—তাঁর একটু পেছনে আমরা দু'জন। আমি বললাম—তিথিকণা তোমার অভিনয় খুব ভাল হয়েছে। তিথি বলল, তুমি আমার নাম জান কীভাবে?

'জিজ্ঞেস করে জেনেছি।'

'আমাকে দেখে তুমি দোতলার বারান্দা থেকে হাত নাড়াচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'এম্নি।'

'তোমার নাম আমি জানি না—তোমার নাম কী?'

'রুমালী।'

'বাহ্ কী অদ্ভুত! রুমাল থেকে রুমালী। চাদর থেকে চাদরি। হি হি হি।'

তিথি হঠাৎ শুরু করা হাসি হঠাৎই থামিয়ে বলল, চাদরি বলায় রাগ করনিতো?

'না।'

'আমি যে চরিত্রটা করছি, সেই চরিত্রটা তোমার করার কথা ছিল—তাই না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হুঁ।'

'তারপর তোমাকে বাদ দেয়া হয়েছে?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'অভিনয় ভাল হচ্ছিল না।'

'অভিনয় ভাল হবে কি-না সেটা ওরা আগে দেখে নেবে না? ডেকে এনে অভিনয় করিয়ে তারপর বাদ দিয়ে লজ্জা দেবে কেন?'

আমি চুপ করে রইলাম। তিথিকে আমার ভাল লাগতে শুরু করেছে। প্রথমেই যাদের ভাল লাগতে শুরু করে তাদের কখনো খারাপ লাগে না। ভাল লাগার পরিমাণ দ্রুত বাড়তে থাকে। তিথি বলল, তোমাকে অভিনয় করার একটা কৌশল শিখিয়ে দেই—কৌশলটা শিখলে দেখবে ভাল অভিনয় করবে।

'কৌশলটা কার কাছে শিখেছ?'

'নিজে নিজেই বার করেছি। কারো কাছ থেকে শিখিনি। আমি বেশিরভাগ জিনিসই নিজে নিজে বার করি। কারো কাছ থেকে শিখি না।'

'এটাতো ভাল। নিজেই নিজের শিক্ষক।'

'কৌশলটা হল—অভিনয়ের আগে নিজের মধ্যে একটা রাগ তৈরি করবে। কোনো একটা ব্যাপারে হুট করে রেগে যাবে। তারপর রাগটা চাপা দিয়ে অভিনয় করবে। দেখবে অভিনয় ভাল হবে।'

'কারণটা কী?'

'রাগ ছাড়া অভিনয় করতে গেলে লজ্জা লাগবে। সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে, দেখছে। লজ্জা লাগবে না? অভিনয় কেমন হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে সব সময় ভয় থাকবে। মনের ভেতর রাগ থাকলে এইসব কোনো কিছুই মাথায় থাকবে না।'

'তোমার কথা সত্যি হলে যাদের রাগ বেশি তাদের খুব ভাল অভিনেতা হবার কথা।'

'তা জানি না। আমার যা মনে এসেছে আমি তোমাকে বললাম। আমিতো আর বেশি কিছু জানি না। আমি এ বছর এসএসসি দেব। তাছাড়া আমি ছাত্রীও খুব খারাপ। স্কুলে সায়েন্স পাইনি আর্টস পেয়েছি।'

'সায়েন্স পড়তে ইচ্ছে করে?'

'সায়েন্স আর্টস কোনটাই আমার পড়তে ইচ্ছা করে না। আমার কী ইচ্ছা করে জান?'

'কী ইচ্ছা করে?'

'দিন রাত কম্পিউটার নিয়ে খেলতে ইচ্ছা করে।'

'ভিডিও গেম?'

'আরে না, ভিডিও গেম কেন খেলব? ভিডিও গেম খেলে বাচ্চারা। আমিতো বাচ্চা না—আমি কম্পিউটার ফটোশপ নিয়ে কাজ করি। ফটোশপ হল একটা কম্পিউটার প্রোগাম Adobe photoshop. এই প্রোগ্রাম দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। উদাহরণ দিয়ে বুঝাই—মনে কর প্রথম তুমি রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি কম্পিউটারে ঢুকালে। তারপর তোমার নিজের একটা ছবি ঢুকালে। তারপর দু'টা ছবিকে একসঙ্গে জোড়া লাগালে। কিছু কারেকশন করলে। তারপর ছবিটা প্রিন্ট করলে, তখন দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের পাশে তুমি বসে আছ। একটুও মেকি মনে হবে না। মনে হবে সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ছবি তোলা হয়েছিল। তুমি রবীন্দ্রনাথের নাতনী। কিংবা রবীন্দ্রনাথের নাতনীর কোনো বান্ধবী।'

'তোমার কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছবি আছে?'

'অনেকগুলি আছে। আইনস্টাইনের সঙ্গে আছে। শেখ হাসিনার সঙ্গে আছে, বেগম জিয়ার সঙ্গে আছে, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আছে। লতা মুঙ্গেশকরের সঙ্গে আছে।'

'বল কী?'

'আমি ছবিগুলি নিয়ে এসেছি—তোমাকে দেখাব। অবশ্যি তুমি যদি দেখতে চাও।'

'আমি দেখতে চাই।'

'আচ্ছা দেখাব। শুটিং শেষ হোক তারপর। শুটিং শেষ হবার পর, গোসল করে ফ্রেশ হয়ে দেখাব।'

'তুমি কি ঘন ঘন গোসল কর?'

'হুঁ করি। আমি আগের জন্মে মাছ ছিলামতো, এই জন্যে বেশি বেশি গোসল করি। রুমালী শোন, তুমি আমার উপর রাগ করো না।'

'রাগ করব কেন?'

'এই যে আমি হঠাৎ এসে তোমার জায়গাটা নিয়ে নিয়েছি এই জন্যে।'

'কেউ কারো জায়গা নিতে পারে না। এই জায়গাটা গোড়া থেকেই তোমার ছিল। আমি ভুল করে মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্যে চলে এসেছিলাম।'

'বাহ্ তুমি দেখি একেবারে আমার বাবার মতো কথা বল। বাবা এত সুন্দর করে কথা বলে যে তাঁর মিথ্যা কথাগুলিও সত্যি মনে হয়। ধর কোনো একটা বিষয় নিয়ে তোমার মন খারাপ। তুমি বাবার কাছে গিয়ে যদি বিষয়টা বল—বাবা পানির মতো বুঝিয়ে দেবেন যে মন খারাপ করার মতো কিছু হয়নি, তুমি মন ভাল করে ফিরে আসবে।'

'তোমার বাবা কি তোমার সঙ্গে এসেছেন?'

'হুঁ এসেছেন। বাবা আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আমি যেখানে যাব বাবা যাবে। একবার আমরা স্কুল থেকে এক্সকারশানে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। বাসে করে গিয়েছিলাম। কক্সবাজার পৌঁছে দেখি—বাবা তার আগের দিন প্লেনে করে কক্সবাজারে চলে এসেছেন। হোটেল শৈবালে থাকেন। আমরা সব মেয়েরা সি বিচে হৈচৈ করি উনি একা একা হাঁটেন। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প করলাম। দেরি হয়ে গেছে। সবার কাছ থেকে বকা খাব। ভালই হয়েছে বকা খেলে রাগ উঠে যাবে। রাগ উঠে গেলে অভিনয় ভাল হবে।'

আমি মা'র ঘরে ঢুকে একটু হকচকিয়ে গেলাম। ঘর অন্ধকার। দরজা জানালা বন্ধ। মা ঘুমুচ্ছেন না, জেগে আছেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছেন। চোখ মুখ ফোলা। চুল এলোমেলো। বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। যাবার সময় হাসিখুশি দেখে গিয়েছিলাম—অল্প সময়ে আবার কী হয়ে গেল। আমি বললাম, জ্বর কি আরো বেড়েছে? মা জবাব দিলেন না। মনে হল আমি যা বলছি তা তাঁর কানে ঢুকছে না। আমি মা'র কপালে হাত রাখলাম—জ্বর আছে, এবং বেশ ভালই আছে। থার্মোমিটারে মাপলে একশ দুই টুই হয়ে যাবে।

'জানালা বন্ধ করে ঘরটাকে গুদাম বানিয়ে রেখেছ কেন?'

মা ক্লান্ত গলায় বললেন, বকুল তুই আমার সামনে বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

আমি মা'র সামনে বসলাম। মা'র ভাবভঙ্গি কেমন কেমন যেন লাগছে। গলার স্বর পর্যন্ত পাল্টে গেছে।

'তোর কাজ শেষ হয়েছে?'

'হুঁ।'

'শুটিং কেমন হল?'

'ভাল।'

'কোন অংশটা হল?'

'ছবি তোলার অংশ। সাব্বির সাহেব ক্যামেরায় ছবি তুলছেন—ঐ অংশ। সর্পভুক সেলিম ভাই এবং আমি।'

'আজকের মতো কি কাজ শেষ?'

'কিছু বাকি আছে বিকেলে হবে।'

'মেকাপ তুলে ফেলেছিস কেন?'

'মেকাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে তুলে ফেলেছি। বিকেলে শুটিং এর আগে আবার নেব। মা, জানালাগুলি খুলে দি?'

'না, জানালা খুলবি না। আলো চোখে লাগে। বকুল তুই এত সহজে মিথ্যা কথা বলছিস কীভাবে?'

'মিথ্যা কথা বলছি?'

'হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলছিস। তোকে বাদ দেয়া হয়েছে। তোর জায়গায় আরেকটা মেয়ে অভিনয় করছে। মেয়েটার নাম তিথিকণা। তোকে বলেছে আমাকে নিয়ে বিদেয় হতে। বলেনি?'

আমি খিচুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, হ্যাঁ বলেছে। তবে এত খারাপ ভাবে বলেনি ভদ্রভাবে বলেছে।

'তার পরেও তুই মাটি কামড়ে পড়ে আছিস?'

'তোমার শরীর ভাল না, এই অবস্থায় যাব কীভাবে?'

'আমার কোনো সমস্যা হবে না। আমি যেতে পারব।'

'যেতে পারলে চল যাই।'

মা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি ব্যাগ গুছিয়ে রেখেছি। তুই ইউনিটের কোনো একটা ছেলেকে রিকশা ডাকতে বল। আমাদের বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেবে। বাসে করে আমরা চলে যাব।

'কাউকে কিছু না বলে চলে যাব?'

'যারা আমার মেয়ের গায়ে থুথু দিয়েছে—তাদের বলাবলির কী আছে?'

'ওরা ভুল করেছে বলে আমরা কেন ভুল করব মা? আমরা ভুল করব না। আজ রাতে শুটিং এর শেষে আমি সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদেয় নেব, পরদিন সকালে চলে যাব।'

'না, আমি এখনি যাব।'

'তুমি এখনি যেতে চাইলে যাও। আমি তোমাকে বাসে তুলে দিয়ে আসব। কিন্তু আমি চোরের মতো পালিয়ে যাব না। আমি কোনো চুরি করিনি যে আমাকে চোরের মতো পালিয়ে যেতে হবে।'

মা শব্দ করে কাঁদছেন। গোঙানির মতো শব্দ হচ্ছে। মা'র কান্না দেখে আমার কেন যেন মায়া লাগছে না। রাগ লাগছে। কান্নার শব্দ শুনে লোকজন জড় হবে। জানতে চাইবে কী ব্যাপার। কী বিশ্রী!

'বকুল।'

'মা বল, আমি শুনছি।'

'তুই আমার সামনে থেকে যা। তোকে আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'কোথায় যাব?'

'যেখানে ইচ্ছা যা—তোর দেবতার সামনে হাঁ করে বসে থাক। দেবতাকে পূজা কর গিয়ে। দেবতা তোর গায়ে যে থুথু দেবে সেই থুথু চেটে চেটে খা...'

'এইসব কী বলছ?'

'আমি কী বলছি আমি জানি। তোকে আমি গর্ভে ধরেছি। আমি তোর গর্ভে জন্মাইনি। আমি বোকা সেজে থাকি বলেই তুই আমাকে বোকা ভাবিস—শোন বুদ্ধিমতী, যে রাতে তুই ঘটনা ঘটিয়েছিস আমি সেই রাতেই টের পেয়েছি। তুই মরার মতো ঘুমুচ্ছিলি, আমি সারা রাত তোর পাশে জেগে বসেছিলাম। সারা রাত নিজের মনে কী বলেছি শুনতে চাস?'

'না শুনতে চাই না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সারা রাত আমি আল্লাহ্‌কে বলেছি—আমি এত কী পাপ করেছি যে তুমি আমাকে এত শাস্তি দিচ্ছ? যে মেয়েকে বুকে নিয়ে জীবন কাটাব ভেবেছিলাম এখন দেখি সেই মেয়ে বাজারের একটা নষ্ট মেয়ে।'

'তুমি কি দয়া করে চুপ করবে মা?'

'তোর দেবতা কি তোকে বিয়ে করবে? করবে না, পূজা নেবে কিন্তু বিয়ে করবে না। দেবতারা বোকা হন না। তারা দেবী বিয়ে করেন—তারা বাজারের নষ্ট মেয়ে বিয়ে করেন না। বড়জোড় কিছুক্ষণ কচলাকচলি করেন। তারপর ঘেন্নায় থুথু দেন। তোর জীবন কাটবে দেবতার থুথু গায়ে মেখে।'

'মা হাতজোড় করছি চুপ কর।'

'চুপতো করবই। চুপ করা ছাড়া আমার গতি কী? আমি চুপ করব—আর কথা বলব না। শুধু তোর ভবিষ্যৎটা কী হবে বলে চুপ করি। আমি চোখের সামনে তোর ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি।'

'আমার ভবিষ্যৎটা তুমি রাতে বলো মা। রাতে খুব মন দিয়ে শুনব।'

'না রাতে না। এখনই শোন। আমি ঢাকায় যাব—তারপর তোকে নিয়ে আমি ক্লিনিকে ক্লিনিকে ঘুরব। তোর পেট খালাস করতে হবে...'

'মা ছিঃ।'

'খবরদার তুই ছিঃ বলবি না। খবরদার। ছিঃ বলতে হলে আমি বলব। তুই বলবি না। বেশ্যা মেয়ের মুখে ছিঃ মানায় না। যা আমার সামনে থেকে যা। তোর মুখের দিকে তাকালেও পাপ হয়।'

আমি ঘর থেকে বের হলাম। মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি শুনতে পাচ্ছি মা চেঁচিয়ে বলছেন—বেশ্যা। আমার মেয়ে বেশ্যা।

জালালের মা কোত্থেকে উদয় হয়েছে। তার মুখ ভর্তি পান। সে পানের পিক ফেলে আরেকটু এগিয়ে এল। মা কী বলছেন ভাল মতো শুনতে হবে। আমি হাঁটছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। একবার কি পেছনে ফিরে দেখব মা'র দরজার সামনে আরো লোক জড় হয়েছে কি না? না, থাক।

দু'টার মতো বাজে। এখন কোথায় যাব? গ্রামের পথে একা একা হাঁটব? সোমেশ্বরী নদীর পানি দেখতে যাব? নাকি কোনো গারো বাড়িতে উপস্থিত হয়ে বলব, আপনারা কেমন আছেন? আমি আপনাদের দেখতে এসেছি। আমার খুব পানির তৃষ্ণা, আপনারা আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দিন না।

পানির তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি যদি আমাকে কেউ দিত। ক্ষিধেও পেয়েছে। সকালে বড় মগ ভর্তি এক মগ চা খেয়েছি—এরপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। ও না খেয়েছি, শুটিং চলার সময় আর একবার চা খেয়েছি। ক্ষিধেয় এখন নাড়ি কামড়াচ্ছে। ক্ষিধের দোষ নেই। ক্ষিধের কাছে মানুষ পরাজিত হবেই। ক্ষিধের কাছে পরাজয় মানে শরীরের কাছে পরাজয়। মানুষ বারবার শরীরের কাছে পরাজিত হয়েছে। মনের কী প্রবল ক্ষমতা, কিন্তু তার পরেও শরীরের কাছে সে কত অসহায়।

আচ্ছা, জাহেদার কাছে গেলে কেমন হয়? জাহেদাকে জিজ্ঞেস করতে পারি—জাহেদা তোমার কাছে পাকা মন-ফল আছে? থাকলে কয়েকটা মন-ফল দাওতো খেয়ে দেখি। মন-ফল কি মনের জোর বাড়ায়? দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে দেয়?

আমি রোদে নেমে পড়লাম। ভয়ংকর কোনো কাণ্ড করতে ইচ্ছে হচ্ছে। কেউ এখন আমার দিকে তাকাচ্ছে না। এমন কোনো কাণ্ড কি করা যায় যেন সবাই চমকে তাকায় আমার দিকে? ডিরেক্টর সাহেব হতভম্ব গলায় বলেন—"কী হল?"

সিনেমার গল্পে দিলু এমন একটা কাণ্ড করেছিল। বেচারির দিকে কেউ তাকাচ্ছিল না। শেষটায় এমন এক কাণ্ড সে করল যে সবাই বাধ্য হল তাকাতে। সে নিজে কিন্তু তা জানতে পারল না। দিলু তখন দিঘির নীল জলে টকটকে লাল রঙের স্কার্ট পরে ভাসছিল। আমার লাল স্কার্ট নেই, কিন্তু লাল শাড়িতো আছে। দিঘির নীল জলে লাল শাড়ি খুব মানাবে।

মেঘ কেটে রোদ উঠেছে। প্রচণ্ড রোদ। আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে। প্রচণ্ড রোদের সময় চারদিক কি একটু ঘোলাটে লাগে? আমার লাগছে। মনে হচ্ছে হালকা করে কুয়াশা হয়েছে।

রাস্তার দু'পাশে পানিতে নাক ডুবিয়ে মহিষের দল শুয়ে আছে। পানির উপর শুধু নাক ভেসে আছে আর কিচ্ছু নেই। মহিষের নাক ভাসিয়ে ডুবে থাকার দৃশ্যটা কি ডিরেক্টর সাহেব নিয়ে রেখেছেন? না নিয়ে রাখলেও তিনি নেবেন। কোনো সুন্দর দৃশ্যই তাঁর চোখ এড়াবে না। যা কিছু সুন্দর তিনি বন্দি করে ফেলবেন সেলুলয়েডে। সেলুলয়েডে যা বন্দি করা যায় না তার প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। মানুষের মন বন্দি করা যায় না বলেই কি মানুষের মনের প্রতি তাঁর এত অনাগ্রহ?

জাহেদার উঠোনে বকটা গম্ভীর ভঙ্গিতে হাঁটছে। এর নাম ধলামিয়া। ধলামিয়া বলে ডাক দিলে বৃদ্ধ মানুষের মতো টুকটুক করে হেঁটে আমার কাছে আসার কথা। আমি ডাকলাম, ধলামিয়া ধলামিয়া। বকটা ঘাড় ঘুড়িয়ে আমাকে দেখল তারপর ছোট ছোট পা ফেলে আমার দিকে আসতে শুরু করল। কী অদ্ভুত দৃশ্য। ডিরেক্টর সাহেবকে এই ব্যাপারটা বলা দরকার, এবং দৃশ্যটাও তাঁকে দেখানো দরকার। আমার ধারণা দৃশ্যটা দেখা মাত্র তিনি তাঁর ছবিতে ঢুকিয়ে দেবেন। নতুন একটা সিকোয়েন্স তৈরি করবেন। যেমন দিলু নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক বাড়িতে ঢুকে শোনে এই বাড়িতে একটা পোষা বক আছে। যার নাম ধলামিয়া। নাম ধরে ডাকলেই যে গুট গুট করে হেঁটে কাছে আসে! দিলু অল্পতেই মুগ্ধ হয়। এই ঘটনা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হল। দৃশ্যটা জামিল ভাইকে সে দেখাবেই। জামিল তার কথা পাত্তাই দিলেন না। বক আবার মানুষের কথা শুনে কাছে আসে না-কি?

আচ্ছা আল্লাহ্তালা কী করেন? তিনিও কি নতুন নতুন দৃশ্য তৈরি করে মূল দৃশ্যমালায় ঢুকিয়ে দেন। নতুন দৃশ্যগুলি তাঁর আদি পরিকল্পনায় ছিল না, হঠাৎ মাথায় এসেছে।

'ভইনডি কেমুন আছেন গো?'

আমি চমকে পেছনে ফিরলাম। খলুই হতে জাহেদা ঠিক আমার পেছনে। তার খলুই ভর্তি গোবর। তার হাতও গোবরে মাখামাখি। কাউকে গোবর নিয়ে মাখামাখি করতে দেখলে অন্য সময় আমার গা ঘিন ঘিন করে উঠত। এখন করছে না। এখন মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক। জাহেদার হাত গোবরে মাখামাখি না থাকলে মানাতো না।

'জাহেদা আপনি কেমন আছেন?'

জাহেদা হাসতে হাসতে বলল, আমি ভাল আছি গো ভইনডি। তয় আমার লোকটা নিরুদ্দেশ হইছে।

'নিরুদ্দেশ হইছে মানে কী?'

'দুইদিন আগে হাটে যাইব বইলা বাইর হইছে আর ফিরে নাই।'

'সে কী।'

জাহেদা হাসছে। শরীর দুলিয়ে হাসছে। স্বামীর নিরুদ্দেশ হওয়াটা যেন বড়ই আনন্দময় সংবাদ।

'চিন্তার কিছু নেই। আবার ফির্‌রা আসব। আর না আসলে নাই। পশু পাখিও শিকল দিয়া বান্দন যায় না। আর মানুষ বইল্যা কথা।'

'উনি কি প্রায়ই নিরুদ্দেশ হয়ে যান?'

'হুঁ। তার বাতাস রোগ আছে।'

'বাতাস রোগটা কী?'
'বাতাস রোগটা যার থাকে হে বাতাস পাইলে উইড়্যা যায়। হে খুঁজে রঙ্গিলা বাতাস।'
'ও আচ্ছা। বাতাস রোগের কথা এই প্রথম শুনলাম।'
'ভইনডি, আফনে কি কোনো কামে আসছেন?'
'না। আমি আপনার সঙ্গে গল্প করতে এসেছি।'
'আসেন গফ করি। খাড়ান হাত ধুইয়া আসি।'
জাহেদা আমাকে পাটি পেতে দিল। পাখা এনে দিল। ফুল তোলা ওয়ারের বালিশ এনে দিল। পান সুপারি এনে দিল। খালি পেটে পান খেতে কেমন লাগে দেখার জন্যে আমি পান খাচ্ছি। একটা আয়না থাকলে দেখতাম আমার ঠোঁট লাল হয়েছে কি না। ঠোঁট যদি টকটকে লাল হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার স্বামী আমাকে পাগলের মতো ভালবাসবে।
'জাহেদা!'
'বলেন ভইনডি।'
'দেখুনতো আমার ঠোঁট লাল হয়েছে কি না।'
'হইছে ভইনডি। খুব লাল হইছে।'
'থ্যাংক য়্যু।'
'আপনের মনডা কি খারাপ?'
'হ্যাঁ, আমার মন খুব খারাপ।'
জাহেদা কুটকুট করে হাসছে। মুখে আঁচল চেপেও হাসি থামাতে পারছে না। আমার মন খারাপ শুনে তার হাসি পাচ্ছে কেন? মেয়েটা কি পাগল?
'হাসছেন কেন?'
'আপনের মন ভাল হইয়া যাইব। খুব ভাল হইব।'
'কখন মন ভাল হবে?'
'এক দুই দিনের মইধ্যে।'
'আপনার কথাতো একটাও ঠিক হয় না। আপনি বলেছিলেন চণ্ডিগড়ে কোনো শুটিং হবে না। একজন মানুষ মারা যাবে। কই, কেউতো মারা যায়নি। শুটিংও ঠিকমতোই হচ্ছে।'
'ভইনডি আমার কথা মাঝে মাঝে লাগে। মাঝে মাঝে লাগে না।'
'সবার বেলাতেই তো এমন হয়। সবার কথাই মাঝে মাঝে লাগে। মাঝে মাঝে লাগে না।'
'তাও ঠিক।'
আকাশে কি মেঘ জমতে শুরু করেছে? আলো কেমন মরে আসছে। আমি মেঘ দেখার জন্যে আকাশের দিকে তাকালাম। মেঘ নেই, কিন্তু রোদ মরে যাচ্ছে, আশ্চর্য তো! জাহেদা বলল, আইজ রাইত ঝুম তুফান হইব।
'তাই বুঝি?'
'হুঁ, ঝুম তুফান হইব। সোমেশ্বরী নদীর বান ডাকব। হাতি ভাসাইন্যা বান।'
'আপনার মন এইসব খবর আপনাকে দিচ্ছে, না-কি আকাশের অবস্থা দেখে বলছেন।'
'মন বলতাছে।'
'আপনের স্বামী কবে ফিরবে?'
'তাতো ভইনডি বলতে পারব না।'
'স্বামীর ব্যাপারে মন কিছু বলছে না?'
'জে না।'
বকটাকে ডাকা হয়নি। তারপরেও সে নিজের মনে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। আমার দিকেই আসছে। বকটা বড় হয়েছে মানুষের সঙ্গে, কিন্তু সে মনে হয় একজন মানুষকে অন্য একজনের কাছ থেকে আলাদা করতে পারে না। আমরা যেমন একটা বককে অন্য একটা বক থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com ~

আলাদা করতে পারি না, তারাও আমাদের পারে না। সে আমাকে জাহেদা ভেবেই আমার কাছে আসছে।

জাহেদা পেছন থেকে ডাকল ধলামিয়া। ধলামিয়া। বকটা দাঁড়িয়ে গেল। সে একবার দেখছে জাহেদাকে, একবার আমাকে। মনস্থির করতে পাচ্ছে না কার কাছে যাবে। কী করে দেখার জন্যে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, এবং আমিও ডাকলাম ধলামিয়া। পাখিটা আমার কাছেও এল না, জাহেদার কাছেও গেল না—স্থির হয়ে রইল।

জাহেদা শান্ত গলায় বলল, ভইনডি ধলামিয়া আন্ধা। চউক্ষে দেখে না।

আমি হতভম্ব গলায় বললাম, সে কী।

ছোট বয়সে এরে যখন ধইরা আনে তখন চউক্ষে হাত লাইগা চউখ নষ্ট হইছে। বকটা আন্ধাগো ভইনডি। হে মানুষ চিনে না।

আমার বুকে ধাক্কার মতো লাগল। পাখি অন্ধ হতে পারে? এর কেউ নেই। কোনো সঙ্গিনী এর পাশে বসে না। এ উড়ে আকাশে যেতে পারে না। সারা দিন নিজের অন্ধকার ভুবনে আপন মনে হাঁটে। আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরেই কাঁদতে চাচ্ছিলাম—কাঁদতে পারছিলাম না। অন্ধ পাখিটা আমাকে কাঁদিয়ে দিল। আমি ডাকলাম—ধলামিয়া আয় আয়। আয়রে লক্ষ্মী আয়।

ধলামিয়া আসছে। ছোট ছোট পা ফেলে কী অদ্ভুত ভাবেই না আসছে। আমার চোখ ভর্তি পানি। চোখের পানিতে পাখিটা ঝাপসা দেখছি।

জাহেদা বলল, ভইনডি কাইন্দেন না। আফনের কান্দনে ধলামিয়ার লাভ-লোসকান কিছুই নাই। কাইন্দা কী হইব? ভইনডি আফনের মনে হয় শইলডা খারাপ। বালিশে মাথা দিয়া শুইয়া থাকেন।

আমি বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছি। ধলামিয়া আবারো উঠোনে চলে গেছে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। বাড়ির পেছনে বাঁশবনে বাতাস লেগে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। জাহেদা আমার মাথার কাছেই কাঁথা নিয়ে বসেছে। কোনো নকশি কাঁথা তৈরি হচ্ছে না। কাব্যময় কোনো দৃশ্য নয়, অতি সাধারণ দৃশ্য। ছেঁড়া কাঁথা রিপু করা হচ্ছে।

'ভইনডি!'

'হুঁ।'

'ঘুমান, আরাম কইরা ঘুমান।'

জাহেদা কাঁথা সেলাই করতে করতে বিড়বিড় করে নিজের মনেই কথা বলছে। কথাগুলি আমার কানে আসছে গানের মতো। ঘুম ঘুম পাচ্ছে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। গাঢ় শান্তিময় ঘুম।

ঘুম ভেঙে দেখি রাত হয়ে গেছে। জাহেদা ঘরে বাতি জ্বালায়নি। চারদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। কী অদ্ভুত কাণ্ড, কতক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছি? ঘরের পেছনের বাঁশবনে বাতাস লেগে ভূতুড়ে শব্দ হচ্ছে। আমি ভয় পেয়ে ডাকলাম, জাহেদা জাহেদা।

জাহেদা ঘর থেকে বের হল। তার হাতে কুপি। সে কুপি জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, লম্বা একটা ঘুম দিছেনগো ভইনডি। সইন্ধ্যাক্যালে দুইবার ডাকছি। সাড়া দেন নাই। মরা ঘুম ঘুমাইছেন গো ভইনডি। মরা ঘুম। আফনের খুঁজে মানুষ আসছে।

'কে এসেছে?'

'মওলানা আসছে। বাইরের বাড়িত বইস্যা আছে। আমারে বলছে, ঘুম ভাঙ্গানির দরকার নাই। আরাম কইরা ঘুমাইতাছে ঘুমাউক। মানুষের নিদ্রাও ইবাদৎ। আফনেরার এই মওলানা লোক ভাল।'

আমি বাইরে এসে দেখি মওলানা সাহেব বাংলা ঘরের উঠানে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর গা দিয়ে ভুর ভুর করে আতরের গন্ধ আসছে। আজ মনে হয় প্রাণ ভরে গায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতর মেখেছেন। তাঁর হাতে লম্বা টর্চ। এরকম লম্বা টর্চ এর আগে আমি দেখিনি। মওলানা বললেন, ঘুম কেমন হয়েছেগো আম্মাজী?

'ঘুম খুব ভাল হয়েছে।'

'পাঁচটা মিনিট আম্মা। এশার আযান হয়েছে। নামাজটা পড়ে রওনা দিব। অজু আছে দিরং হবে না।'

'গায়ে এত আতর দিয়েছেন কেন? গন্ধে মাথা ঘুরছে।'

'মনটা খুব খারাপ হয়েছে—এই জন্যে আতর দিয়েছি। চোখে সুরমাও দিয়েছি। রাত্রি বিধায় দেখতে পাচ্ছেন না। মন খারাপ হলে সুগন্ধ মাখলে ভাল লাগে।'

'মন খারাপ কেন?'

'শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে এই জন্যে মন খারাপ। তিথিকণা আম্মা হঠাৎ বলল, অভিনয় করব না। এই মেয়ে বড় শক্ত। 'না' মানে না।'

'কী নিয়ে রাগ করেছে?'

'সঠিক বলতে পারব না। বয়স অল্প। অল্প বয়সের রাগের জন্য কারণ লাগে না। বয়সটাই রাগের। আম্মাজী জাহেদারে নামাজের জন্যে পাটি টাটি কিছু দিতে বলেন। একটু কষ্ট দেই আম্মাজীরে। মনে কিছু নিয়েন না।

আমি নিজেই পাটি এনে দিলাম। মওলানা পাটিতে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, আম্মাজী আপনার একটা পত্র আছে আমার কাছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমার চিঠি? কে দিয়েছে?

'স্যারের স্ত্রী। নীরা ম্যাডাম দিয়ে গেছেন। বলেছেন সময় সুযোগ মতো আপনার হাতে দিতে। সময় সুযোগ পাচ্ছিলাম না। দিতে পারি নাই।'

আমি হাত বাড়িয়ে খাম বন্ধ চিঠি নিলাম। মওলানা বললেন, ম্যাডাম বলে গেছেন, চিঠি পড়া শেষ হলে আমি যেন আপনার কাছ থেকে নিয়ে নষ্ট করে ফেলি। আম্মাজী এক কাজ করেন। চিঠি এইখানেই পড়েন। এই ফাঁকে নামাজ আদায় করে ফেলি। আছরের নামাজ কাজা হয়েছিল। আর নামাজ কাজা করব না।

'নীরা ম্যাডাম যাবার সময় আপনাকে এই চিঠি দিয়ে গেছেন?'

'জি। আর হাতের এই টর্চ লাইটটাও দিয়ে গেছেন। বড় ভাল মেয়ে। আমাকে অত্যন্ত পেয়ার করেন। আগে আমাকে আপনি করে বলতেন। এখন তুমি করে বলেন।'

আমি মওলানা সাহেবের হাত থেকে চিঠি নিয়ে কুপির আলোয় পড়তে বসলাম। জাহেদা তার কাজকর্ম করে যাচ্ছে। আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না। বকটা আমার খুব কাছাকাছি। বকের একটা বিরাট ছায়া পড়েছে দেয়ালে।

রুমালী,

কিছু কিছু জিনিস আমি ভয়ংকর অপছন্দ করি। চিঠি লেখা তার মধ্যে একটি। অনেককেই তার অপছন্দের কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয়। জীবনের অনেক 'আয়রনি'র একটি হচ্ছে অপছন্দের কাজটি বেশি বেশি করা। যে চিঠি লিখতে অপছন্দ করে দেখা যায় তার জীবিকাই হয় চিঠি লেখা। পোস্টাপিসের সামনে সে টুল পেতে বসে থাকে। একটাকা দু'টাকার বিনিময়ে চিঠি লিখে দেয়। আমি সে রকম না। অপছন্দের কাজ আমি করি না। চিঠি লেখা আমার জীবিকা নয়। আমার যা বলার তোমাকে সরাসরিও বলতে পারতাম। বলতে ইচ্ছে করল না। বলতে গ্লানিবোধ হল।

চিঠি লিখতেও গ্লানিবোধ করছি—তবে চিঠির সুবিধাটা হচ্ছে আমার গ্লানিবোধ তোমাকে দেখতে হচ্ছে না। কেউ চায় না তার লজ্জা অন্যের সামনে তুলে ধরতে। শরীরের লজ্জা আমরা কাপড় দিয়ে ঢাকি। মনের লজ্জা কী দিয়ে ঢাকব?

আমি ঢাকায় রওনা হবার আগে আগে মঈনকে বলে এসেছি—তুমি অবশ্যই রুমালীকে তোমার ছবি থেকে বাদ দেবে। এবং কেন বাদ দেয়া হল তা গুছিয়ে বলবে। সেই গুছিয়ে বলার মধ্যে যেন কোনোরকম অস্পষ্টতা না থাকে। সে বলেছে, আচ্ছা।

আমি জানি সে কিছুই বলবে না। সত্য আগুনের মতো। সবাই সেই আগুনের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আমার মতো শক্ত মেয়েই পারে না, আর ও নিতান্তই দুর্বল একজন মানুষ। কাজেই আমি বাধ্য হয়ে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। এবং মওলানা সাহেবকে দিলাম তিনি যেন যথাসময়ে চিঠিটা তোমার হাতে দেন। মওলানাকে আমার পছন্দ হয়েছে। মঈনের অনেক গুণের মধ্যে একটি গুণ হচ্ছে পাথরের গাদার ভেতর থেকে সে মানিক খুঁজে নিতে পারে। যাদেরকে সে খুঁজে নেয় তারা তাকে ভালবাসে অন্ধের মতো। তারা তাকে ঘিরে রাখে কঠিন দেয়ালে। যেন দেয়াল ভেঙে কেউ তার ক্ষতি করতে না পারে। পৃথিবীর কোনো যুক্তির ক্ষমতা নেই সেই দেয়ালে ফাটল ধরাবে।

রুমালী, আমার চিঠি খুব সম্ভব খানিকটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—আমি প্রসঙ্গ ছেড়ে বাইরে চলে এসেছি। ভয় নেই আবারো প্রসঙ্গ ফিরে যাব। চিঠির এলোমেলো ভাব ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবে—কারণ চিঠিটা লিখতে গিয়ে প্রবল মানসিক চাপ অনুভব করছি।

মঈনের দুর্বলতার কথা তোমার কাছে কিছু কিছু বলেছি। তার চরিত্রের সবল অংশের কথা বলা হয়নি। আমি নিজেও কিন্তু জানি না। একজন দুর্বল মানুষ আশেপাশের সবাইকে মোহাবিষ্ট করে রাখতে পারে না। সে কিন্তু পারছে। কী করে পারছে আমার তা জানা নেই। এক সময় জানতে চেষ্টা করেছি—এখন চেষ্টা করি না। ধরে নিয়েছি এটি ব্যাখ্যাতীত কোনো প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে। এই মানুষটির প্রতি তোমার প্রবল আকর্ষণের কারণ তুমি নিজে কি ব্যাখ্যা করতে পারবে? পারবে না। মঈনের কাছে যে থাকে তার মনের 'Retional' অংশ কাজ করে না। মনে করা যাক তুমি তার পাশে গিয়ে বসলে। সে তোমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তারপর রুমালী তোমার কী খবর?" তাতেই তোমার পৃথিবী দুলে উঠবে। তোমার কাছে মনে হবে এই মানুষটির মুখ থেকে এই অপূর্ব বাক্যটি শোনার জন্যে তুমি জন্ম জন্ম ধরে অপেক্ষা করছিলে।

AMARBOI.COM

তোমার কি মনে আছে—

আমি তোমাকে বলেছিলাম তাকে প্রথম দিন দেখেই আমার মনে প্রবল ঘোর তৈরি হয়েছিল, মনে হয়েছিল, এই মানুষটিকে আমার দরকার। মঈন নামের মানুষটি অতি সহজেই অন্যের ভেতর স্বপ্ন তৈরি করে দিতে পারে। সে তার নিজের স্বপ্নে অন্যদের টেনেও নিতে পারে। স্বপ্নহীন মানুষদের জন্য এটা অনেক বড় ব্যাপার। তারা স্বপ্ন খুঁজে বেড়ায়। প্রথমবার তাকে দেখেই আমি বাবাকে হতভম্ব করে দিয়ে বলেছিলাম, এই মানুষটিকে আমি বিয়ে করতে চাই! ছেলে সম্পর্কে খোঁজ খবর করতে গিয়ে বাবা হতভম্ব—সে মানুষ হয়েছে এতিমখানায়—পূর্ব পরিচয় বলতে তার তেমন কিছু নেই। আমি তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাইনি—রবীন্দ্রনাথের ঐ বিখ্যাত গান—"ন্যায় অন্যায় জানিনে জানিনে।" কিংবা, "আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।" ভাল কথা এই গান দু'টি কি তুমি গাইতে পার?

এখন তোমাকে লাবণ্যের কথা বলি।

আমার যখন বিয়ে হয় আমার ছোটবোন লাবণ্য তখন দেশের বাইরে শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করছে—ছুটি পায়নি বলে আসতে পারেনি। চিঠিতে আমাকে সাহস এবং উৎসাহ দিয়েছে। চমৎকার সব চিঠি। লাবণ্য আমার মতো নয়—সে সুন্দর চিঠি লিখতে পারে। তার চিঠি পড়লে মনে হয় সে সামনে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করছে। তার গানের গলাও অপূর্ব। এই দিক দিয়ে তোমার সঙ্গে তার কিছুটা মিল আছে। সেও তোমার মতোই চাপা স্বভাবের। গরমের ছুটিতে সে দেশে এল। মঈনের সঙ্গে তার প্রথম দেখা। মঈন তাকে বলল, "তারপর লাবণ্য তুমি কেমন আছ?" এই বাক্যটিতেই লাবণ্য অভিভূত হল বলে আমার

ধারণা। তার চিন্তা চেতনার জগৎটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। চাপা স্বভাবের মেয়ে বলে কাউকে সে তা বুঝতে দিল না। নিজেকে প্রবলভাবে আড়াল করে রাখল। মঈনের সঙ্গে সে একা কখনো কথা বলেনি। আমরা দু'জন যখন গল্প করতাম তখনই সে উপস্থিত হয়ে হাসিমুখে বলত—আমি কি তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি? তোমাদের খানিকক্ষণ বিরক্ত করতে পারি?

তার ছুটি শেষ হয়ে গেল, কিন্তু সে ফিরে যেতে চাইল না। সে বলল, শান্তিনিকেতন তার ভাল লাগছে না। তারপরেও সে গেল। দিন দশেক থেকে হুট করে ফিরে এল। তার দিকে তখন তাকানো যায় না। স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। মাথার চুল উঠে যাচ্ছে। আমি তাকে বলাম, তোর কী হয়েছে? সে বলল, বুঝতে পারছি না কী হয়েছে। ব্লাড ক্যানসার ফ্যানসার হয়েছে মনে হয়। চিকিৎসা করাতে এসেছি। শরীরের সব রক্ত ফেলে দিয়ে আমি নতুন রক্ত নেব। কোনো পবিত্র মানুষের রক্ত। তোমার সন্ধানে কোনো পবিত্র মানুষ আছে?

'তোর সমস্যা কী?'

'আমার সমস্যা—রাতে ঘুম হয় না। এমন কোনো ঘুমের অষুধ নেই, খাইনি। কোনো লাভ হয়নি।'

'দিনে ঘুম হয়?'

'দিনে হয় তবে খুব সামান্য। আপা তুমি কোনো ভাল ডাক্তার দেখিয়ে আমাকে শান্তিমতো ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা কর। এ রকম আর কিছু দিন চললে আমি মরে যাব।'

তাকে ডাক্তার দেখান হল। ডাক্তাররা কোনো রোগ ধরতে পারলেন না। তার শরীর আরো খারাপ করল। পুরোপুরি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। জীবনের শয্যাশায়ী অংশটা হয়ত তার ভাল কেটেছে কারণ এই সময় মঈন তাকে বই পড়ে পড়ে শুনাতো। নিজের লেখা চিত্রনাট্য শুনাত। এখন তুমি যে ছবিটা করছ সেই ছবির চিত্রনাট্য তখনি করা। চিত্রনাট্যটা লাবণ্যের খুব পছন্দ ছিল। লাবণ্য বলতো—আমি অভিনয়ের কিছু জানি না, কিন্তু আমি দিলুর ভূমিকায় অভিনয় করব। আপনি কিন্তু আর কাউকে দিলু হিসেবে নিতে পারবেন না। আমি করব দিলু আর আপা করবে নিশাত। আসুন আমরা রিহার্সেল করি। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন কী করে অভিনয় করতে হয়।

তার শরীর একটু সুস্থ হল। সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবার জন্যে। আমি এবং বাবা দু'জনই চেষ্টা করলাম তাকে আটকে রাখতে। সে থাকবে না। তাকে না-কি যেতেই হবে। সে চলে গেল। সাত দিনের মাথায় আবার ফিরে এল।

সে মারা যায় ছাদ থেকে পড়ে। পুলিশের কাছে আমরা সে রকমই বলেছি। ঘুম হত না বলে সে ছাদে হাঁটত। ছাদের রেলিং-এ পা তুলে বসে থাকত। খুব সম্ভব সেখান থেকেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

ব্যাপার তা ছিল না। সে খুব সুস্থ মাথায় ছাদ থেকে লাফ দেয়। যে তীব্র আবেগ সে মঈনের জন্যে জমা করে রেখেছিল—সেই আবেগ সে কখনো প্রকাশ করেনি। আমাকে কিছু বুঝতে দেয়নি। তার মৃত্যুর পর তার ডাইরি পড়ে আমি সব জানতে পারি। ডাইরির একটি অংশ আমি এত অসংখ্যবার পড়েছি যে মুখস্থ হয়ে আছে। আমি স্মৃতি থেকে আবারো লিখছি। দেখবে এখানেও তোমার সঙ্গে লাবণ্যের খানিকটা মিল আছে—

মঈন ভাইকে আমার দুলাভাই ডাকা উচিত, কেন জানি ডাকতে পারি না। দুলাভাই মানেই কিছু ফাজলামি, কিছু রসিকতা। দুলাভাই মানেই আশেপাশে শালিকারা ঘুরঘুর করছে। না, এটা আমার ভাল লাগে না।

আজ সকাল থেকেই ভেবে রেখেছি মঈন ভাইকে ভড়কে দেব। কীভাবে কাজটা করব ভেবে পাচ্ছি না। আপার সঙ্গে উনার বোধ হয় মন কষাকষি হয়েছে। উনি আলাদা ঘরে শুচ্ছেন। আমি তাঁর মন ভাল করার প্ল্যান করছি। শুরুতে ভড়কে দিয়ে তারপর মন ভাল করে দেব।

প্ল্যানটা হচ্ছে বিকট একটা মুখোশ পরে গভীর রাতে উনার পাশে গিয়ে দাঁড়াব। ভয় দেখিয়ে আক্কেলগুড়ুম করে দেব।

শেষ পর্যন্ত সেই প্ল্যানমতো কাজ করা হয়নি। গভীর রাতে মুখোশ পরে জানালার পাশে না দাঁড়িয়ে আমি দরজায় টোকা দিলাম। উনি দরজা খুলে দিয়ে একটুও না চমকে বললেন— লাবণ্য এসো। তোমার সঙ্গে গল্প করি। সকাল থেকে মাথা ধরে আছে। গল্প করলে মাথা ধরাটা কমবে। আর শোন, মুখ থেকে মুখোশটা খোল।

আমি মুখোশ খুললাম। উনি বললেন, আলো চোখে লাগছে। আলো নিভিয়ে দিলে তোমার অসুবিধা আছে?

আমি কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি বাতি নিভিয়ে দিন। মঈন ভাই বাতি নিভিয়ে দিলেন। আমার কাছে মনে হল এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখি মেয়ে কোনো দিন জন্মায়নি, ভবিষ্যতেও জন্মাবে না।

লাবণ্য আমাকে যদি ব্যাপারটা বলতো—তার সমস্যা সমাধান করা আমার পক্ষে কোনো ব্যাপারই ছিল না। আমার প্রধান ত্রুটি, লাবণ্যকে চোখের সামনে দেখেও তার সমস্যা সম্পর্কে কোনো রকম আঁচ করতে পারিনি।

লাবণ্যের ছায়া আমি পুরোপুরি তোমার উপর দেখছি। আমার আত্মা কেঁপে উঠেছে।

রুমালী, ভালবাসা ব্যাপারটা কি তুমি জান? আমার ধারণা তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবেছ। তুমি কি কিছু বের করতে পেরেছ? পেরেছ বলে আমি মনে করি না। অনেক গুণীজন এই ব্যাপার নিয়ে ভেবেছেন। হিসেব নিকেষ করেছেন—থিওরি বের করেছেন, হাইপোথিসিস দাঁড়া করিয়েছেন। ফলাফল শূন্য। কেউ কেউ বলেছেন ভালবাসার বাস মনে। মন যেহেতু আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, ভালবাসাও তাই। বৈজ্ঞানিকদের কোনো যন্ত্রে ভালবাসাকে ধরা ছোঁয়া যাবে না।

একদল বললেন—মন আবার কী? মস্তিষ্কই মন। মানুষের যাবতীয় আবেগের একমাত্র নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়—কাজেই ভালবাসাও ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। ব্রেইনের টেম্পোরাল লোবে ভালবাসা বাস করে। টেম্পোরাল লোবে অসংখ্য নিওরোনের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিক ইম্পালসের বিশেষ ধরনের আদান প্রদানই ভালবাস।

আরেকদল বললেন, কিছুই হয়নি। মানুষের আবেগ, ভয়, ভীতি সবকিছুর মূল নিয়ন্ত্রক পিটুইটারি গ্লান্ড। একটা মেয়ে যখন একটি ছেলের প্রেমে পড়ে তখন ছেলেটিকে দেখা মাত্র পিটুইটারি গ্লান্ড থেকে বিশেষ এক ধরনের এনজাইম বের হয়। সেই এনজাইমের কারণে ছেলেটি তখন যা করে তাই ভাল লাগে। তা দেখেই হৃদয়ে দোলা লাগে। ছেলেটি যদি ফোঁৎ শব্দ করে হাতের মধ্যে নাক ঝেড়ে সিকনিতে হাত ভর্তি করে ফেলে তখনও মনে হয়—"আহারে কী সুন্দর করেই না নাক ঝাড়ছে। পৃথিবীতে তার মতো সুন্দর করে কেউ নাক ঝড়তে পারে না।"

ভালবাসার সর্বশেষ থিওরিটি তোমাকে বলি। সর্বশেষ থিওরিতে বিজ্ঞানীরা বলেছেন— প্রকৃতির প্রধান ইচ্ছা তাঁর সৃষ্ঠ জীবজগৎ যেন টিকে থাকে। জীব জগতের কোনো বিশেষ ধারা যেন বিলুপ্ত না হয়। জীব জগতের একটা প্রধান ধারা হচ্ছে হোমোসেপিয়ানস—মানব জাতি। মানবজাতিকে টিকে থাকতে হলে তাদের সন্তান হতে হবে, এবং উৎকৃষ্ট সন্তান হতে হবে। সন্তান হবার জন্যে মানব-মানবীকে খুব কাছাকাছি আসতে হবে। কাজেই তাদের ভেতর একের জন্যে অন্যের একটা প্রবল শারীরিক আকর্ষণ তৈরি করতে হবে। সেই শারীরিক আকর্ষণের একটা রূপ হচ্ছে ভালবাসা। সেই ভালবাসার তীব্রতারও হের ফের হয়। প্রকৃতি যখন দেখে দু'টি বিশেষ মানব-মানবীর মিলনে উৎকৃষ্ট সন্তান তৈরির সম্ভাবনা তখন তাদের ভালবাসাকে অতি তীব্র করে দেয়। যেন তারা একে অন্যকে ছেড়ে যেতে না পারে। কোনো বাধাই তাদের কাছে তখন বাধা বলে মনে হয় না। ছেলেরা রূপবতী মেয়েদের প্রেমে পড়ে—কারণ প্রকৃতি চায় পরবর্তী প্রজন্ম যেন সুন্দর হয়। গুণী মানুষদের প্রেমে মেয়েরা যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগে পাগল হয়েছে। কারণ প্রকৃতির সেই পুরানো খেলা, প্রকৃতি চাচ্ছে পুরুষদের গুণ যেন পরবর্তী প্রজন্মে ডি এন এ'র মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। প্রকৃতি প্রাণপণে চাচ্ছে মানব সম্প্রদায়ের গুণগুলি যেন নষ্ট না হয়ে যায়। যেন প্রবাহিত হতে হতে একসময় পূর্ণ বিকশিত হয়। তৈরি হয় একটা অসাধারণ মানব সম্প্রদায়।

হাইপোথিসিস হিসেবে খুব আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে না-কি? যত আকর্ষণীয়ই মনে হোক আমার নিজের ধারণা হাইপোথিসিস ঠিক নয়। আমি মঈন নামের মানুষটির প্রতি প্রবলভাবেই আকর্ষিত হয়ে প্রায় ঘোরের মধ্যেই তাকে বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পরপরই আমার নিজের জগৎ ভেঙে খান খান হয়ে গেল। কারণ মঈন একজন অসম্পূর্ণ মানুষ। আমি কী বলার চেষ্টা করছি তুমি বুঝতে পারছ? এন্টেনা নামের আমাদের একটি মেয়ে আছে। সে আমাদের ভালবাসার ফসল নয়। তাকে দত্তক নেয়া হয়েছে।

পশু কাঁদতে পারে না, হাসতেও পারে না, তারপরেও তীব্র যন্ত্রণায় পশু মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ শব্দ করে। পশুর যন্ত্রণার এই প্রকাশ একবার যদি তুমি দেখ—তোমার মাথায় তা সারা জীবনের মতো গেঁথে যাবে। আমি প্রায়ই পশুর কান্নার এই দৃশ্য দেখি। মঈন গভীর রাতে অবিকল পশুর মতোই কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে সে আমাকে কী বলে জান? সে বলে—প্লিজ ডোন্ট থ্রো মি অন দ্যা স্ট্রিট। আমাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেল না। আমি তোমাকে মুক্তি দেব। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ব বা ঘুমের অষুধ খাব। আমাকে অল্প কিছু দিন সম্মান নিয়ে বাঁচতে দাও।

সে তার এই অসম্পূর্ণতা জন্মসূত্রে নিয়ে এসেছে—আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কিছুই করার নেই।

আমি তাকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলিনি। আমি তাকে বাস করতে দিয়েছি। সম্ভবত একজন অসুস্থ মানুষের সঙ্গে থেকে থেকে আমি নিজেও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়েছি। তার কষ্ট অবশ্যই অসহনীয়, আমার নিজের কষ্টও কিন্তু অসহনীয়। সে নিজে যেমন পশুর মতো কাঁদে আমি নিজেও পশুর মতো কাঁদি। মাঝে মাঝে গভীর রাতে সে ছাদে চলে যায়। রেলিং এর উপর উঠে বসে—আমি পেছনে পেছনে গিয়ে বলি, কী করছ? সে বলে, নিচে লাফিয়ে পড়ব। সাহস সঞ্চয় করছি। আমি বলি—প্লিজ ডু দ্যাট। তোমার জন্যে ভাল হবে। আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে নয়। নিজেকে মুক্তি দেবার জন্যেই এই কাজটা তোমার করা দরকার।

রুমালী! একজন মানুষ কোন পর্যায়ে এ ধরনের কথা বলতে পারে?

তোমাদের চণ্ডিগড়ে জাহেদা নামের একটা মেয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করে। সে বলেছে—চণ্ডিগড়ে শুটিং হবে না। একটা মানুষ মারা যাবে। শোনামাত্রই আমার মনে হয়েছে—আচ্ছা এই মানুষটা কি মঈন হতে পারে না? ভয়ংকর একটা খেলা কি শেষ হবে না?

প্রকৃতি অসুন্দর পছন্দ করে না। অপূর্ণতা পছন্দ করে না। তারপরেও সে অসুন্দর এবং অপূর্ণতা তৈরি করে তাদের নিয়ে বিচিত্র খেলা খেলে। কেন খেলে বলতো?

আমার যা লেখার আমি লিখলাম। তোমার সঙ্গে কি আবারো আমার দেখা হবে? দেখা না হওয়াই ভাল। আর যদি দেখা হয়েও যায়—আমি ভাব করব তোমাকে চিনতে পারিনি। তুমি তাতে রাগ করো না। আরেকটা ছোট্ট অনুরোধ। চিঠিটা তুমি নষ্ট করে ফেলো।

—নীরা

১৫

মওলানা সাহেব আগে আগে যাচ্ছেন। আমি তাঁর পেছনে। মওলানা সাহেবের হাতের টর্চে কী যেন সমস্যা হয়েছে—কিছুতেই জ্বলছে না। আমরা পথ চলছি অন্ধকারে। মাঝে মাঝে মওলানা সাহেব থামছেন—হাতের টর্চ ঝাঁকাঝাঁকি করছেন, কোনো লাভ হচ্ছে না।

'আম্মাজী!'

'জি।'

'নক্ষত্রের আলোয় নদীপথে যাওয়া যায়—কিন্তু স্থলপথে যাওয়া যায় না। টর্চটা নষ্ট হয়ে বিপদে পড়লাম। চলেন বড় রাস্তা দিয়ে যাই। একটু ঘোর হবে, উপায় কী।'

'চলুন যাই।'

আমরা বড় রাস্তায় উঠলাম। আমার হাঁটতে ভাল লাগছে। লক্ষ লক্ষ ঝিঁঝি ডাকছে। বাতাসে মাটির এবং কাঠ পোড়ানো ধোঁয়ার গন্ধ। পোড়া কাঠের গন্ধ কোথেকে আসছে? হাঁটার সময় মানুষ নাকি খুব ভাল চিন্তা করতে পারে। আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছি না। মাথা পুরোপুরি খালি হয়ে আছে। মোসাদ্দেক স্যার বলতেন, খুকিরা মন যখন খুব অস্থির হবে তখন মনে মনে গান করবে। মন শান্ত হবে, মন শান্ত করার এর চেয়ে ভাল অষুধ নাই। মন শান্ত করার এটা হল কোরামিন ইনজেকশন। আশ্চর্য কোনো গানের কথা, কোনো গানের সুর আমার মনে আসছে না।

'আম্মাজী'

'জি মওলানা সাহেব।'

'মনটা কি অত্যধিক খারাপ হয়েছে?'

'নাতো, মন খারাপ হবে কেন?'

'নীরা ম্যাডাম বলেছিলেন, চিঠি পড়ার পর রুমালীর মনটা হয়ত খুব খারাপ হবে। মওলানা তুমি তার দিকে লক্ষ্য রেখো। ম্যাডাম আমাকে অত্যধিক স্নেহ করেন। আমাকে তুমি করে বলেন। আম্মাজী, মনটা কি বেশি খারাপ?'

'আমার মন খারাপ না।'

'হাঁটতে কষ্ট লাগছে?'

'হাঁটতে মোটেও কষ্ট হচ্ছে না। হাঁটতে ভাল লাগছে।'

'শুক্লা পক্ষ হলে হেঁটে মজা পেতেন। কৃষ্ণ পক্ষ শুরু হয়েছেতো হেঁটে মজা নাই। আম্মাজী একটা টেম্পো নিয়ে নেই।'

'এসেইতো পড়েছি টেম্পো নিতে হবে কেন?'

মওলানা সাহেব প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, মিশনারি হাসপাতাল হয়ে যাই। মানে ব্যাপার হয়েছে কী আপনার মাতা'র শরীরটা সামান্য খারাপ করেছে। ডাক্তার বললেন হাসপাতালে থাকাই ভাল। তেমন কিছু অবশ্য না। হাসপাতালে না নিলেও চলত। বিদেশ জায়গা। হাসপাতালটা ভাল। মিশনারিরা হাসপাতাল, স্কুল এইসব ভাল করে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। মওলানা এইসব কী বলছেন? হাসপাতালে নেবার মতো কী ঘটল!

'মা'কে হাসপাতালে কখন নেয়া হয়েছে?'

'বিকেলে। তাঁর শরীরটা হঠাৎ খারাপ করল—নিঃশ্বাস নিতে পারেন না। হাসপাতালে আবার অক্সিজেনের ব্যবস্থা আছে। বিসমিল্লাহ বলে নলটা নাকে ঢুকায়ে দিলেই হয়।'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, মা'কে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে এমন অবস্থা আর খবরটা আপনি এতক্ষণে দিলেন?'

'আম্মাজী আপনিতো ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে ডেকে তুলে দুঃসংবাদ দিতে নাই। নিষেধ আছে। ঘুম ভাঙারও ঘণ্টা খানিক পরে দুঃসংবাদ দিতে হয়।'

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মওলানা সাহেব বারবার দুঃসংবাদ দুঃসংবাদ করছেন কেন? মা কি মারা গেছেন? সুস্থ সবল মানুষ চোখের পলকে ধড়ফড় করে মারা যায়। মা কোনো সুস্থ মানুষ না।

'মা'র শরীর এখন কেমন? ঠিক করে বলুনতো?'

'আম্মাজী উনি ভাল আছেন। ডাক্তার ঘুমের অষুধ দিয়েছেন। আমি যখন আসি তখন দেখে এসেছি শান্তিমতো ঘুমাচ্ছেন। যে কোনো অসুখে ঘুম অষুধের মতো কাজ করে। অস্থির হবার মতো কিছু হয় নাই। অস্থিরতা আল্লাহপাক নিজেও পছন্দ করেন না। কোরআন মজিদে এই জন্যে বলা হয়েছে—হে মানব সন্তান, তোমাদের বড়ই তাড়াহুড়া।'

আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই। আমি অস্থির না। আমি স্থির। আমি সব সময়ই এ রকম। মা'র মৃত্যু সংবাদ পেলেও হয়ত স্থিরই থাকতাম। ইউনিটের লোকজন বলত মেয়েটা মানুষ না পাথর? প্রকৃতি কাউকে পাথর বানিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়, হাজারো দুঃখ কষ্টেও তাদের কিছু হয় না। আবার কাউকে কাউকে বরফ বানিয়ে পাঠায়—সামান্য উত্তাপে বরফ গলে পানি।

মা'র মৃত্যুর পর আমার কী হবে? জীবন যাত্রায় তেমন কোনো পরিবর্তন কী হবে? মা'র সঙ্গে আগে যে ঘরে থাকতাম পরেও নিশ্চয়ই সেই ঘরেই থাকব। বজ্রপাতের শব্দে মা'র বুকের কাছে লুকানোর সুযোগ হবে না। আশ্বিন মাসে শেষ রাতের দিকে যখন শীত পড়বে তখন ঘুম ঘুম চোখে মা'কে বলব না—মা গায়ে কাঁথা দিয়ে দাও।

মৃত্যু শোক ভোলা যায় না বলে একটা ভুল কথা প্রচলিত আছে। সবচে সহজে যে শোক ভোলা যায় তার নাম মৃত্যু শোক। সবচে তীব্র শোক হচ্ছে—জীবিত মানুষ হারিয়ে যাবার শোক। হারিয়ে যাওয়া মানুষটি যতদিন জীবিত থাকে ততদিন এই শোক ভোলা যায় না। বাবা যদি মা'কে ছেড়ে না গিয়ে মারা যেতেন মা বাবাকে ভুলে যেতেন এক বছরের মাথায়। তার ভালবাসার কম্বল উইপোকায় কেটে ফেলত। বাবা বেঁচে আছেন কিন্তু হারিয়ে গেছেন বলেই মা'র এই তীব্র কষ্ট।

পাশাপাশি থেকেওতো একজন মানুষ হারিয়ে যেতে পারে। মঈন সাহেব তাঁর স্ত্রীর পাশেই বাস করছেন—কিন্তু হারিয়ে গেছেন। নীরা ম্যাডামের শোক এবং যন্ত্রণার এইটাই কারণ। নীরা ম্যাডাম কি এই তথ্য জানেন?

'আম্মাজী আমরা এসে পড়েছি—এইটা মিশনারি হাসপাতাল।'

হাসপাতাল কোথায়, ছিমছিম ছোট্ট লাল ইটের বাড়ি। সামনে কী সুন্দর বাগান। বাগানের ঠিক মাঝখানে মাদার মেরীর পাথরের মূর্তি। মেরীর কোলে শিশু জেসাস খ্রাইস্ট। হাসপাতালের কাছাকাছি এলেই ফিনাইলের গন্ধ পাওয়া যায়—আমি পাচ্ছি ফুলের ঘ্রাণ। বেলি ফুলের ঝাড় থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে। কী আশ্চর্য!

'মিশনারিদের হাসপাতালতো আম্মাজী—বড় সুন্দর। এই হাসপাতালে মৃত্যু হলেও আরাম। একটা ভাল জায়গার মৃত্যু হল। হাসপাতাল যিনি চালান—ফাদার পিয়ারে উনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক, বিশিষ্ট ডাক্তার। আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বড়দিনের দিন আমাকে এক ঝুড়ি ফল পাঠায়েছেন। একটা নতুন সুয়েটার পাঠায়েছেন। নীল রঙ। আসল ভেড়ার লোমের সুয়েটার। মাঘ মাসের শীতে এই সুয়েটার পরলে গরমে গায়ে ঘামাচি হয়ে যায়। সুয়েটারটা চুরি হয়ে গেছে। থাকলে দেখাতাম।'

'আপনাকে সবাই পছন্দ করে কেন?'

'এটাতো আম্মাজী বলতে পারব না। এটা আল্লাহপাকের একটা মহিমা।'

বাগান পার হয়ে হাসপাতালের সামনে দাঁড়ালাম। আমাদের পায়ের শব্দে যিনি বের হয়ে এলেন তিনিই ফাদার পিয়ারে। তালগাছের মতো লম্বা একজন মানুষ। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। তারপরেও মনে হচ্ছে শক্ত শরীর। খেটে খাওয়া মানুষদের মতো পেশীবহুল হাত। পরনে বাঙালিদের মতো লুঙ্গি এবং লুঙ্গির উপর হাতাকাটা পাঞ্জাবি। সুন্দর বাংলা বলেন। মাঝে মধ্যে দু'একটা নিতান্ত গ্রাম্য শব্দ তাঁর বাংলায় ঢুকে পড়ে। তাতে তাঁর বাংলা ভাষা আরো সুন্দর হয়ে কানে বাজে। যেমন আমার মা সম্পর্কে বললেন—তোমার মা ভাল আছে। শ্বাস কষ্ট ছিল এখন নাই। এখন শান্তিমতো 'ঘুমাইছে''। 'ঘুমাইছে' শব্দটা কী সুন্দর করেই না কানে বাজল।

'খুকি তুমি মা'কে দেখে চলে যাও। আমাদের এখানে রুগির সঙ্গে থাকার নিয়ম নাই। মা ঘুমাইচ্ছে—ডোন্ট ওয়েক হার আপ। ঘুমের অষুধ দিয়েছি।'

আমি মা'র বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মা হাত পা এলিয়ে পড়ে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল। হাতে স্যালাইন দেয়া হচ্ছে। খুব ধীর লয়ে তাঁর বুক ওঠা নামা করছে। একজন নার্স মা'র পাশেই ঠুল পেতে বসে আছেন। ফাদার পিয়ারে বলেছিলেন মা শান্তিমতো ঘুমুচ্ছেন। এই কি শান্তিমতো ঘুমের নমুনা? দেখেতো মনে হচ্ছে মা মৃত্যুর হাত ধরে শুয়ে আছেন। আমি নার্সকে বললাম, সিস্টার আমি কি মায়ের গায়ে হাত রেখে পাশে বসতে পারি? সিস্টার ঘাড় কাত করলেন।

মা'র হাতে হাত রাখতেই তিনি ঘুমের মধ্যেই হাত সরিয়ে নিলেন। তার পরপরই চোখ মেললেন। আমি বললাম, কেমন আছ মা?

মা হাসলেন। এবং আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

'শরীরটা কি খুব খারাপ লাগছে?'

'সন্ধ্যার সময় খুব খারাপ লাগছিল। এখন লাগছে না।'

'তোমার অবস্থা দেখে আমার খুব ভয় লাগছে।'

'ভয়ের কিছু নেই আমি মরব না। আমি মরলে তোকে কে দেখবে?'

আমি মা'র হাত আমার কোলে রাখলাম। নার্স বললেন, আপনি চলে যান। আপনি এখানে থাকলেই আপনার মা কথা বলতে থাকবেন। ঘুম হবে না। তাঁর ঘুম দরকার। ফাদার জানতে পারলে খুব রাগ করবেন। উনি ভয়ংকর রাগী।

আমি মা'র দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললাম, মা যাই।

মা চোখ বন্ধ রেখেই বললেন—তোর বাবা বোধ হয় রাতেই আসবে। যদি আসে হাসপাতালে পাঠানোর দরকার নাই। এই হাসপাতালে বাইরের কাউকে থাকতে দেয় না।

'মা আমার উপর তোমার রাগটা কি একটু কমেছে?'

'কোনো রাগ নেই।'

'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'মা আমি যাই?'

'আচ্ছা। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করিস।'

'আচ্ছা।'

'তোর বাবা যদি আসে তাহলে তার খাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখিস। খাওয়ার সময় সামনে থাকিস। কেউ সামনে না থাকলে সে খেতে পারে না।'

'মা তুমি নিশ্চিত থাক। বাবা যদি আসে আমি অবশ্যই তাকে সামনে বসিয়ে খাওয়াব।'

মা'র জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। বাবা যে আসবে না, এই সহজ সত্যটা তিনি বুঝতে পারছেন না। যে চলে যায় সে ফিরে আসার জন্যে যায় না। তার জন্যে ভালবাসার স্বর্ণ সিংহাসন সাজিয়ে রাখলেও লাভ হবে না। আর যে আসে সে সিংহাসনের জন্যে অপেক্ষা করে না।

আমি মওলানা সাহেবকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছি। মওলানা সাহেবের টর্চ ঠিক হয়েছে। আলো দিচ্ছে। এর আগে কি তিনি মিথ্যা মিথ্যি টর্চ নষ্ট করে রেখেছিলেন? যাতে আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে আসতে পারেন। সেখান থেকে মিশনারি হাসপাতালে।

'মওলানা সাহেব!'

'জি আম্মাজী।'

'আপনি কি আমার মা'র জন্যে একটু দোয়া করবেন?'

‘এটাতো আম্মাজী আপনাকে বলতে হবে না। উনি হাসপাতালে ভর্তি হবার পর থেকে খতমে ইউনুস পড়তেছি। খুব শক্ত দোয়া। ইউনুস নবী এই দোয়া পড়ে মাছের পেট থেকে নাজাত পেয়েছিলেন।’

ক্যাম্প কেমন নিষ্প্রাণ। লোকজন নেই। রাত এমন কিছু হয়নি অথচ মনে হচ্ছে সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে। আমি নিজের ঘরে চলে গেলাম। ঘরে ঢুকে বড় ধরনের চমক খেলাম। বাবা খাটে বসে আছেন। তাঁর পাশে কালো রঙের হ্যান্ড ব্যাগ।

টেবিলে কলা, আনারস। তাঁকে খুবই বয়স্ক দেখাচ্ছে। মাথার চুল প্রায় সবই পড়ে গেছে। শেষবার যখন দেখেছি তখনো তাঁর মাথায় অনেক চুল ছিল। মনে হচ্ছে অল্পদিনেই তাঁর বয়স বেড়ে গেছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসলেন। আমার মনে হল তিনি অকূল সমুদ্রে পড়েছিলেন। আমাকে দেখে খানিকটা ভরসা পেলেন। আমার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলি—“বাবা তুমি আজ আসায় আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি।” কিন্তু সে রকম কিছুই করতে পারলাম না। শুধু বাবার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বাবা বিড়বিড় করে বললেন, আমি খবর পেয়েই রওনা হয়েছি, তারপর গাড়ি নষ্ট, ফেরি নাই—বিরাট ঝামেলা। এসে শুনি তোর মা হাসপাতালে...।

‘তুমি যে সত্যি এসেছ বিশ্বাস হচ্ছে না।’

বাবা অবাক হয়ে বললেন, তোরা বিপদে পড়বি আমি আসব না?

‘মা তোমাকে দেখে কী যে খুশি হবে।’

বাবা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর চোখ কেমন যেন ভেজা ভেজা মনে হচ্ছে। কেঁদে ফেলবেন নাতো? আমি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্যে বললাম, ওরা কেমন আছে বাবা? আমার দুই ভাই বোন?

বাবা নিচু ভঙ্গিতে বললেন, ভাল।

‘ওদের নাম আমি জানি না। ওদের নাম কী?’

বাবা বিব্রত গলায় বললেন, মেয়েটার নাম ‘রূপা’ ছেলের নাম তার মা রেখেছে ‘সাকিব’।

নিজের ছেলেমেয়েদের নাম বলছেন এতে এত বিব্রত হবার কী আছে? আমি বললাম, রূপা নাম তুমি রেখেছ?

‘হুঁ।’

‘ওরা কি জানে রুমালী নামে তাদের একটা বোন আছে?’

‘জানবে না কেন। জানে।’

‘তুমি কি রূপাকে স্কুলে দিয়ে আসো, নিয়ে আসো?’

‘তার মা দিয়ে আসে। আমি নিয়ে আসি।’

‘ফেরার পথে তুমি কি তোমার মেয়েকে আইসক্রিম কিনে খাওয়াও? আমাকে যেমন খাওয়াতে?’

বাবা জবাব দিলেন না। বাবা খুবই অস্বস্তি নিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। বাবার কি এখন উচিত না তাঁর মেয়েকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয়া? নাকি মেয়ে অচেনা হয়ে গেছে? অচেনা মেয়েকে আদর করতে সংকোচ লাগছে?

‘তোমার শরীরটা এত খারাপ হয়েছে কেন বাবা। বুড়ো হয়ে গেছ।’

‘বয়স হয়েছেতোরে মা।’

‘কেন বয়স হচ্ছে?’

বাবা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন। হাসি থামিয়ে বিষণ্ন গলায় বললেন, তোর মা’র শরীর কি বেশি খারাপ?

'হ্যাঁ। তবে তুমি পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই মা'র শরীর ভাল হয়ে যাবে।'

'আমি এখনই যাচ্ছি। রাতে হাসপাতালেই থাকব।'

'মিশনারি হাসপাতাল, তোমাকে থাকতে দেবে না।'

'অসুবিধা নেই। বারান্দায় বসে থাকব। না–কি বারান্দাতেও বসতে দেবে না?'

'বারান্দায় বসতে দেবে। বাবা শোন, বিয়ের পরপর তুমি মা'কে চমকে দেয়ার জন্যে অনেক উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করতে। এ রকম কোনো উদ্ভট কিছু কি করতে পারবে?'

বাবা অবাক হয়ে বললেন—কী করতে বলছিস?

'জোনাকি পোকার একটা মালা মা'র গলায় পরিয়ে দেবে?'

'জোনাকি পোকার মালা পাব কোথায়?'

'আমি জোগাড় করে দেব। বাবা তুমিতো জান না—তুমি মা'কে একটা কম্বল কিনে দিয়েছিলে—সেই কম্বলটা মা চৈত্র মাসের গরমেও গায়ে দিয়ে রাখে। তুমিতো হাসপাতালে যাচ্ছ মায়ের পায়ের কাছে কম্বলটা দেখবে।'

'এইসব কথা কেন বলছিস!'

'আমার মনটা খুব খারাপতো। এই জন্যে বলছি। যখন আমার মন খারাপ হয় তখন ইচ্ছে করে আশেপাশের সবার মন খারাপ করে দেই।'

বাবা পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, তুই একটু কাছে আয়তো মা। তোর মাথায় হাত বুলিয়ে তোকে একটু আদর করি।

আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছি। আমি কাঁদছি না, বাবা খুব কাঁদছেন।

আমি বাবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি যেন তিনি বয়স্ক কোনো মানুষ নন। অল্প বয়েসী শিশু। খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কাঁদছেন।

বাবা মওলানা সাহেবকে নিয়ে মা'কে দেখতে গেছেন। আমি গোসল করে কাপড় বদলে ডাইনিং হলে খেতে গিয়েছি। ডাইনিং হলে তিথি বসে আছে। একপাশে তিথি, এক পাশে তার মা এবং এক পাশে বাবা। তিথি মুখের সামনে একটা বই ধরে আছে। তিথির মা ভাত মাখিয়ে তার মুখে তুলে দিচ্ছেন। আমাকে দেখে তিনি লজ্জা পেলেন। এত বড় মেয়েকে মুখে ভাত তুলে খাইয়ে দিতে হচ্ছে এই জন্যেই হয়ত লজ্জা। আমার কাছে দৃশ্যটা খুব সুন্দর লাগল। তিথি মুখের উপর থেকে বই নামিয়ে বলল, তুমি কোথায় ছিলে? বিকেল থেকে তোমাকে খুঁজছি। কেউ বলতে পারছে না তুমি কোথায়। এদিকে তোমার মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। মেয়েকে খোঁজা হচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি দেখি আমার চেয়েও অদ্ভুত।

'খুঁজছিলে কেন?'

'বলেছিলাম না তোমাকে ছবি দেখাব? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছবি। ছবি খুঁজে পাইনি। মনে হচ্ছে আনা হয়নি। সোহরাব আংকেলের কাছ থেকে তোমার ঠিকানা নিয়েছি। ঢাকায় পৌঁছেই তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কি শুনেছ যে আমি অভিনয় করছি না। ঢাকা চলে যাচ্ছি।'

'শুনেছি।'

'কী জন্যে অভিনয় করব না, সেটা শুনেছ?'

তিথির মা বললেন, চুপ করতো মা। এত সব বলার দরকার কী!

তিথির বলল, আমার বলতে ইচ্ছা করছে। তুমি দয়া করে ইন্টারফেয়ার করবে না। ভাত যা খাবার খেয়েছি। আর খাব না। আমার মুখ ধুইয়ে চলে যাও। কাল ঢাকা চলে যাচ্ছি—রুমালীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। আজ তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করব।

তিথির মা বললেন, গল্প সকালে করলে হবে না?

'না, সকালে করলে হবে না। এখনি করতে হবে। প্লিজ তোমরা দু'জন এখন যাও।'

আমি ভাত খাচ্ছি। তিথি আমার সামনে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গল্প করছে। খুব ভাল লাগছে তিথির গল্প শুনতে।

'পাপিয়া ম্যাডামের সঙ্গে আমার লেগে গেল। একটা সিকোয়েন্স নেয়া হবে। দিলু আর নিশাত বসে আছে। দিলু বলবে—আপা, তুমি কথা বলার সময় আমার দিকে তাকাচ্ছ না কেন?

নিশাত বলবে, কথা বলার সময় তোর দিকে তাকাতে হবে কেন?

'আমার সঙ্গে কথা বললে—আমার দিকে তাকিয়ে বলতে হবে।'

'কেন তুই এত বিরক্ত করিস দিলু।'

'এই কথাটা তুমি আমার দিকে তাকিয়ে বল।'

নিশাত তখন বিরক্ত হয়ে উঠে যাবে। এই দৃশ্যটা হবার সময় ঝামেলা হল। পাপিয়া ম্যাডাম অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলছেন আমি হাত দিয়ে তার মুখ ধরে আমার দিকে ফিরিয়ে বললাম—"আমার সঙ্গে কথা বললে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে হবে।"

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, তিথি শোন, আমার গায়ে হাত দিও না। আমাকে টাচ না করে ডায়ালগ বল।

আমি বললাম, সেটা ভাল হবে না।

পাপিয়া ম্যাডাম বললেন, ভাল হোক বা না হোক। তুমি আমার গায়ে হাত দেবে না।

আমি বললাম—গায়ে হাত দেব না কেন? আপনার কি কোনো ছোঁয়াছে অসুখ আছে যে গায়ে হাত দিলে আমার সেই অসুখ হয়ে যাবে?

পাপিয়া ম্যাডাম রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন—এ রকম বেয়াদবি কার কাছ থেকে শিখেছ? আমি বললাম, আমি কারো কাছ থেকে কিছু শিখি না। আমি যা করি নিজে নিজে করি।

তিথিকণা খুব হাসতে লাগল।

আমি বললাম, তোমাদের এই ঝগড়াঝাঁটির সময় ডিরেক্টর সাহেব কী করলেন? চুপ করে রইলেন?

'ঝগড়া যখন শুরু হল তখন উনি ছিলেন না। হঠাৎ উনার শরীর খারাপ করল। তিনি শট ডিভিশন তাঁর এসিসটেন্টকে বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলেন। আমি যখন বললাম—আমি অভিনয় করব না। তখন সোহরাব চাচা ডিরেক্টর সাহেবকে আনতে গেলেন। উনি এলেন না। বলে পাঠালেন, "শুটিং প্যাক আপ।"

'উনার সঙ্গে পরে তোমার দেখা হয়নি?'

'দেখা হয়েছে। শুটিং স্পট থেকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। উনি দরজা জানালা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে বসেছিলেন। আমি যখন বললাম, আংকেল আমি অভিনয় করব না। কাল ঢাকা চলে যাচ্ছি। উনি বললেন, আচ্ছা। আমি বললাম, আংকেল আপনি রাগ করছেন নাতো? উনি বললেন, আমি তোমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করব। যদি ধাঁধার জবাব দিতে পার তাহলে রাগ করব না। তিনটা পিঁপড়া নিয়ে একটা ধাঁধা।'

'তুমি জবাব দিতে পেরেছ?'

'হ্যাঁ পেরেছি।'

'কাল সকালে তুমি চলে যাচ্ছ?'

'আমি একা না। সবাই চলে যাচ্ছ।'

'সে কী!'

'সোহরাব চাচা বলেছেন—শুটিং শিডিউল নতুন করে করা হবে। এখন সব কাজ বন্ধ। বাকি যা কাজ শীতের সময় করা হবে। তারা যে জেনারেটার নিয়ে এসেছিল সেটাও ঠিকমতো

কাজ করছে না। আমার কী মনে হয় জান? আমার মনে হয় এই ছবিটা আর হবে না। না হলেই ভাল।'

'না হলে ভাল কেন?'

'গল্পটা বাজে। দিলু মরে গেল। দিলু মরবে কেন? মারার মতো কী হয়েছে? দুঃখ কষ্ট পেলেই মরে যেতে হবে?'

'তিথি!'

'বল।'

'তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'দূর থেকে দেখেছতো এই জন্যে পছন্দ হয়েছে। কাছ থেকে দেখলে পছন্দ হত না। দূর থেকে যে জিনিস যত সুন্দর কাছ থেকে সেই জিনিস তত অসুন্দর।'

'তাই বুঝি?'

'অবশ্যই তাই। দূর থেকে চাঁদ কত সুন্দর। কাছে গেলে পাথরের পাহাড়—এবড়োখেবড়ো, খানা, খন্দ, গর্ত।'

জাহেদা বলেছিল রাতে ঝড় হবে। সোমেশ্বরী নদীতে বান ডাকবে। হাতি ডোবা বান। জাহেদার কোনো কথাই ঠিক হয় না। এই কথাটা কি মিলে যাবে? আকাশে কোনো তারা দেখা যাচ্ছে না। মেঘ জমেছে। বিজলী চমকাচ্ছে। বিজলী চমকালেই বজ্রের শব্দ শোনা উচিত। বজ্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। ঝড় দেখার জন্যে অপেক্ষা করছি। বারান্দায় বেতের চেয়ারে পা তুলে বেশ আরাম করে বসে আছি। ঝিঁঝি ডাকছে না। বড় ধরনের বৃষ্টি বা ঝড়ের আগে আগে ঝিঁঝি পোকারা চুপ করে যায়।

ক্যাম্প নীরব হয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগেও উঠোনে কয়েকজন লাইটবয় ঝগড়া করছিল। এখন তারা নেই। জোনাকি আছে। প্রচুর পরিমাণে আছে। জোনাকি ধরার কোনো জাল থাকলে এক খেপে অনেক জোনাকি ধরে ফেলা যেত। একটা লম্বা সুতায় মৌমাছির মোম মাখিয়ে জোনাকিগুলি বসিয়ে দিলেই জোনাকির মালা।

মা'কে নিয়ে আমি এখন আর দুঃশ্চিন্তা করছি না। বাবা চলে এসেছেন দুঃশ্চিন্তা যা করার তিনিই করবেন। জোনাকি পোকার একটা মালা বানিয়ে বাবাকে দিয়ে এলে চমৎকার হত। দেয়া গেল না। একদিকে ভালই হয়েছে। মালা বানান হলে হয়ত দেখা যেত বাস্তবের মালা কল্পনার মালার মতো সুন্দর হয়নি।

অস্পষ্টভাবে বৃষ্টির ফোঁটা কি পড়তে শুরু করেছে? বোধ হয় না। পাহাড়ি বৃষ্টি ঝম করে চলে আসে। ধীরে সুস্থে আসে না। যত বৃষ্টি নামুক, ঝড় আসুক আমি এই জায়গা থেকে নড়ব না। বৃষ্টিতে কাক ভেজা হলেও খবরদারীর জন্যে আজ মা আসবেন না। টেনে হিঁচড়ে ঘরে ঢোকানোর চেষ্টা করবেন না। আজকের রাতটা পুরোপুরি আমার। রাতটা আমি গল্প করে করে কাটাব। কার সঙ্গে গল্প করব? দিলুর যেমন কল্পনার বান্ধবী আছে এমন কোনো কল্পনার বান্ধবীকে নিয়ে আসব। ঝুম বৃষ্টি নামলে দু'জনে মিলে ভিজব। সোমেশ্বরী নদীতে সত্যি যদি হাতি ডোবা বান ডাকে তাহলে তাকে নিয়ে নদী দেখতে যাব। মানুষ একা কোথাও যেতে পারে না। যখন কেউ থাকে না তখন কল্পনার একজনকে পাশে থাকতে হয়। কল্পনার বন্ধু থাকা খুব চমৎকার ব্যাপার। তাকে নিজের মতো করে তৈরি করা যায়। পছন্দ না হলে ঢেলে সাজানো যায়। তাকে রূপ দেয়া যায়। তার কাছ থেকে রূপ কেড়ে নেয়া যায়।

নীরা ম্যাডামের মতো একজন কাউকে এনে কি পাশে বসাব? তাঁর সঙ্গে গল্প করব? না থাক। বরং তাঁর চিঠিটার একটা জবাব মনে মনে লিখে ফেলি। এই চিঠি তিনি পড়বেন না। তাতে কী? অন্তত আমি নিজেতো জানব তাঁর চিঠির একটা জবাব আমার কাছে আছে। সম্বোধন কী হবে? নীরা ম্যাডাম লিখব? না-কি ভাবী? সুজনেষু? সুহৃদয়েষু? কোনোটাইতো মানাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদি শুধু নীরা লেখা যেত তাহলে মানাতো। সেটা সম্ভব না। উনি অনেক বড় মানুষ—আমি কে? আমি কেউ না।

"আপনার চিঠিটা আজ রাতে পড়েছি। যে কোনো চিঠি আমি দু'বার তিনবার করে পড়ি। আপনারটা একবারই পড়েছি। এত সুন্দর চিঠি কিন্তু দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছে করল না। আপনি চিঠিটা নষ্ট করে ফেলতে বলেছেন—আমি নষ্ট করে ফেলেছি। ছিঁড়ে কুচিকুচি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি। তারপরেও চিঠিটা পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। আপনার মাথায় রয়ে গেছে। আমার মাথায়ও রয়ে গেছে। যেদিন আমরা দু'জন পৃথিবীতে থাকব না শুধুমাত্র সেদিনই চিঠিটা নষ্ট হবে।

চিঠিতে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও আপনি জানতে চাচ্ছিলেন—কেন আমি উনাকে এত পছন্দ করলাম। বা আমার মতো অন্যরা কেন করছে। আপনি এই প্রশ্নের জবাব জানেন না দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। আপনার মতো বুদ্ধিমতী মেয়ের এই প্রশ্নের জবাব পেতে এত দেরি হল কেন? কী করে আপনি ভাবলেন—উনার ছেলে ভুলানো পিঁপড়ের ধাঁধা জাতীয় কথায় বিভ্রান্ত হয়ে পাগলের মতো সবাই উনার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে। কিংবা উনার দুঃখময় শৈশবের গল্প শুনে আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে প্রবল করুণা। করুণা থেকে জন্ম নিচ্ছে প্রেম। আপনি এমনও ধারণা করছেন যেন উনি নানান ধরনের কৌশল করে করে আমাকে বা লাবণ্যকে বা আমাদের মতো কাউকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছেন? আপনি নিজে মেয়ে—আপনারতো জানা উচিত মেয়েরা সবার আগে যা ধরতে পারে তা হল পুরুষদের কৌশল। পুরুষদের ছ্যাবলামিও সহ্য করা যায় কিন্তু কৌশল না।

প্রবল আবেগ নিয়ে উনার কাছে ছুটে যাওয়ার কারণটি এখন আমি ব্যাখ্যা করি? আমার মা একবার টবে পুঁই শাকের একটা চারা পুঁতলেন। চারাটায় যেন ঠিকমতো রোদের আলো পড়ে সে জন্যে মা টবটাকে বারান্দার মাঝামাঝি এনে রাখলেন। তারপর আমি একদিন কী কারণে যেন বারান্দায় গিয়েছি হঠাৎ দেখি পুঁই শাকটা বড় হয়েছে। ডাল বের করে দিয়েছে। কিন্তু কোনো কিছু ধরতে পারছে না। সে যেন তার অনেকগুলি হাত বের করে দিয়েছে, কিন্তু সেই হাত দিয়ে সে কাউকে ছুঁতে পারছে না। কী ভয়ংকর অসহায় যে লাগছে গাছটাকে।

ডিরেক্টর সাহেব অবিকল এ রকম একটা লতানো গাছ। যে গাছটা অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু শক্ত করে ধরার মতো কিছু পাচ্ছে না—সে আতঙ্কে অস্থির। সে কি এই জীবনে ধরার মতো কিছু পাবে না?

এ ধরনের মানুষের পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে। পাশে দাঁড়ানোর ইচ্ছার নামই ভালবাসা। আমার ভালবাসার শুরুটা সেখানেই, সম্ভবত আপনার বোন লাবণ্যের ব্যাপারেও এ রকম হয়েছে।

মানুষটার পাশে আগ্রহ নিয়ে দাঁড়ানোর পর অবাক হয়ে দেখলাম তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা। সৌন্দর্য দেখার ক্ষমতা। সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা। সৃষ্টিশীল মানুষের যে ব্যাপারটা থাকে। প্রকৃতি হয়ত খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ক্ষমতা দিয়ে দেয়। যারা এই ক্ষমতাটা পায় তারাও খুব স্বাভাবিকভবেই নেয়। ক্ষমতার মাত্রা সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকে না। কিন্তু আমার মতো মানুষ—যারা সৃষ্টিশীল না তারা অভিভূত হয়। অভিভূত হয়ে ভাবে সাধারণ একজন মানুষের এত ক্ষমতা? আপনি নিজেও কি অভিভূত হননি? তাঁকে দেখামাত্রই কি আপনার সমস্ত চেতনা কেঁপে ওঠেনি?

কোনো মেয়ে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে তার চোখে প্রেমিকের সৎ গুণগুলিই পড়ে। ত্রুটিগুলি চোখে পড়ে না। আপনি লিখেছেন—প্রেমিক যখন নাক ঝেড়ে হাত সিকনিতে ভর্তি করে ফেলে—তখন মনে হয়—আহা কী সুন্দর করেই না নাক ঝাড়ছে।

আমি মেয়েটা একটু বোধ হয় আলাদা। আমি শুধু তাঁর ত্রুটিগুলি বের করতে চেষ্টা করেছি। তার কারণও আছে, তাঁর ত্রুটিগুলি চোখে পড়লে তাঁর প্রতি আমার মুগ্ধতা কমতে থাকবে। আমি ধাক্কা খাব। ফিরে যেতে পারব নিজের জগতে। সেলিম ভাইকে তিনি ছবিতে নিলেন। সুপারস্টার ফরহাদ সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তখন আমি মনে প্রাণে চাচ্ছিলাম যেন সেলিম ভাইকে বাদ দিয়ে দেন। যেন আমি তাঁর এই ব্যাপারে মস্ত একটা আঘাত পাই। যেন আমি তাঁর কাছ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারি।

সে রকম হয়নি। উল্টোটাই হয়েছে। ফরহাদ সাহেবের মতো নামী দামি অভিনেতাকে তিনি পাত্তাই দেননি। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের ত্রুটিগুলিই গুণ হিসেবে দেখা দেয়। উনি তেমন একজন। মানুষের মস্ত বড় ত্রুটি তার অহংকার। কিন্তু উনার অহংকারইতো উনার গুণ। আপনি জানেন না তাঁর ত্রুটিগুলি দেখে আমি যতই দূরে সরতে গিয়েছি ততই তাঁর কাছে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়েছি। ততবারই মনে হয়েছে এইসব ত্রুটি আমার নেই কেন? আপনার মতো একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে কী করে ধারণা করল মেয়ে ভুলানোর জন্যে তিনি তাঁর মজার মজার গল্পের ঝুড়ি খুলে বসেন? আপনি কি দেখেননি—এই একই গল্প তিনি কত আগ্রহের সঙ্গে মওলানা সাহেবের সঙ্গে করছেন, বা ইউনিটের একটা ছেলের সঙ্গে করছেন। তাঁর সম্পর্কে আমি এমন অনেক কিছুই বলতে পারব যা আপনি দীর্ঘদিন বিবাহিত জীবন যাপন করেও লক্ষ্য করেননি।

আপনি কি তাঁর মুগ্ধ হবার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন? তাঁর মুগ্ধতার ভিন্ন একটা মাত্রাও আছে—তিনি তাঁর নিজস্ব মুগ্ধতা ছড়িয়ে দিতে চান, যাতে তাঁর আনন্দের ভাগ অন্যরাও পায়। মুগ্ধ অনেকেই হয়। আনন্দ অনেকেই পায়। কিন্তু ক'জন তা ছড়িয়ে দিতে চায়?

অবশ্যই আপনি তাঁর সম্পর্কে এমন এক তথ্য জানেন—যা আমি জানি না। আমার জানার কথা নয়। সেই তথ্য জানিয়ে আপনি আমাকে যে ধাক্কাটি দিতে চেয়েছিলেন তা দিতে পেরেছেন। কী তীব্র কষ্ট যে আমি পেয়েছি তা আপনি কোনোদিন জানবেন না। আপনি যদি ভেবে থাকেন—আমি কষ্ট পেয়েছি এই ভেবে যে আমি মানুষটিকে নিয়ে কখনো সংসার করতে পারব না, আমাদের ঘরে ছোট্ট বাবু আসবে না, তাহলে আপনি ভুল করেছেন। আপনি যদি ভেবে থাকেন—কোনো একদিন আমি মানুষটাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব, তাহলে আপনি খুব বড় ভুল করেছেন। আমার বাবাকে একজন মা'র কাছ থেকে নিয়ে গেছে—মা'র কষ্ট আমি জানি। এই কষ্টের কোনো সীমা নেই। আমি কি করে অন্যকে এই কষ্ট দেব? তা ছাড়া উনার মতো মানুষকে ভুলানোর ক্ষমতা কি আমার মতো বাচ্চা একটি মেয়েকে দেয়া হয়েছে?

আমার কষ্ট পাবার কারণ হল, যে মানুষ তাঁর আনন্দ তাঁর মুগ্ধতা চারদিকে ছড়িয়ে দেয় সে তাঁর কষ্টটা কাউকেই বলতে পারে না। আমারতো মনে হয় নিজেকেও না। তাঁকে তাঁর নিজের কষ্টও নিজের কাছ থেকে গোপন রাখতে হয়। মানসিকভাবে সম্পূর্ণ একজন মানুষ শারীরিক অসম্পূর্ণতার জন্যে অসম্পূর্ণ। শরীর কি এতই বড়?

হ্যাঁ বড়। অবশ্যই বড়। শরীরের কাছে আমরা বারবার পরাজিত হই তারপরেও কিন্তু বলার চেষ্টা করি—শরীর কিছুই না। মনকে ধারণ করার সামান্য পাত্র মাত্র। মুখের বলায় কী যায় আসে। শরীর হচ্ছে শরীর। তার ক্ষমতাও মনের ক্ষমতার মতোই অসীম।

আপনি উনাকে অসম্পূর্ণ শরীরের কারাগার থেকে মুক্তি দিতে চাচ্ছেন। উনি মুক্ত হতে চান—সাহসের অভাবে পারছেন না। সেই সাহস আপনি উনাকে দিতে পারেননি। আমি কিন্তু পারি। আপনি কি চান সেই সাহস আমি তাঁকে দেই?

'রুমালী!'

আমি চমকে তাকালাম। চিঠি তৈরিতে বাধা পড়ল। সোহরাব চাচা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বললাম, কী ব্যাপার চাচা?

সোহরাব চাচা নিচু গলায় বললেন—স্যার তোমাকে একটু ডাকছেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সোহরাব চাচা প্রায় কান্না কান্না গলায় বললেন, স্যারের শরীরটা খুব খারাপ করেছে। মন খারাপ। শরীরও খারাপ।

'শুটিং বন্ধ হয়ে গেল সেই জন্যে মন খারাপ?'

'হ্যাঁ। কী কষ্ট যে স্যার করেন ছবির জন্যে। সেই ছবি যখন হয় না...'

'সোহরাব চাচা?'

'জি মা।'

'লক্ষ্য করেছেন, বেশ অনেকদিন পর আপনি আমাকে মা বললেন।'

সোহরাব চাচা চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, আচ্ছা ঐ প্রসঙ্গ থাক। একটা জরুরি কথা বলি। আপনি আপনার স্যারকে এত পছন্দ করেন কেন?

'জানি না মা।'

'সত্যি জানেন না?'

'না।'

'উনার কি জ্বর?'

'হ্যাঁ খুব জ্বর। তার উপর হাবিজাবি খেয়েছেন।'

'হাবিজাবিটা কী—মদ?'

'না মদ না—মন-ফল। চার পাঁচটা কোত্থেকে জোগাড় করে খেয়েছেন। মওলানা এনে দিয়েছে। শুনেছি এইসব খেলে পাগল হয়ে যায়।'

'আপনার কি ধারণা উনি পাগল হয়ে গেছেন?'

'আরে না। তবে চোখ লাল টকটকে হয়ে আছে—দেখলে ভয় লাগে।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি ভয় পাব না। আমি খুব সাহসী মেয়ে। শুধু যে সাহসী তাই না—অন্যকে সাহস দেয়ার ব্যাপারেও এক্সপার্ট।

আমি খুব হাসছি। সোহরাব চাচা অবাক হয়ে তাকাচ্ছেন। আমিও নিজের কাণ্ড দেখে অবাক হচ্ছি—এত হাসছি কেন? আমি কি জাহেদা হয়ে যাচ্ছি?

উনার দরজার সামনে দাঁড়াতেই উনি বললেন—রুমালী এসো।

আমি পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। সোহরাব চাচা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি উনি যাবেন না। দাঁড়িয়ে থাকবেন। তাঁর স্যারের শরীর খারাপ, মন খারাপ। তিনি তাঁকে ছেড়ে এক পাও যাবেন না। প্রয়োজনে সারা রাত দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

আমি ভেবেছিলাম উনাকে দেখব চাদর গায়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তা না। উনি চেয়ারে বসে আছেন। মনে হচ্ছে এখনই কোথাও বেরুবেন। ইলেকট্রিসিটি আছে। তারপরেও তাঁর সামনের টেবিলে মোমবাতি। ফুলদানি ভর্তি জবা ফুল। জবাফুল কেউ ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে না। তাঁর ঘরে যতবার এসেছি জবা ফুল দেখেছি। জবা মনে হয় তাঁর পছন্দের ফুল।

'আপনি কি কোথাও যাচ্ছেন?'

'এখন যাচ্ছি না। যদি বৃষ্টি হয়—নদীতে পানি আসে তাহলে পানি দেখতে যাব। শুটিং শেষ। সবাই চলে যাবে। এখন যদি নদী না দেখা হয় আর দেখা হবে না। শেষ সুযোগ। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে না?'

'জি পড়ছে। ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে।'

'তুমি বোসো। দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

আমি বসলাম। তিনি সিগারেট ধরালেন। ড্রয়ার খুলে রুমাল নিয়ে পকেটে ভরলেন। চুল আঁচড়াতে লাগলেন। আশ্চর্য, তাঁকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। চোখ ঝকমক করছে। মানুষের সৌন্দর্যের পুরোটাইতো তার চোখে। মন-ফল খেলে চোখ কি হীরের মতো জ্বলে? আমি বললাম, আপনি দেখি একেবারে ফিটফাট বাবু হয়ে নদী দেখতে যাচ্ছেন।

তিনি বললেন, আমি যেমন নদী দেখব, নদীওতো আমাকে দেখবে। নদীও দেখুক যে আমি ফরম্যালি তার কাছে এসেছি। এলেবেলেভাবে আসিনি। যাই হোক তোমাকে ডাকার কারণ হচ্ছে তোমাকে একটা কথা বলা। কথাটা না বললে আমার খারাপ লাগবে।

'আপনি এমন ভাব করেছেন—যেন আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।'

'তোমার ধারণা দেখা হবে?'

'হ্যাঁ হবে। কারণ আপনি আবারো এই ছবি শুরু করবেন। তখন চরিত্র করার জন্যে আমাকে ডাকবেন।'

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, না, আমি আর ছবি করব না। ভাল লাগছে না। যে কথাটা তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম সেই কথাটা শোন—তোমাকে আমি খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছি। তুমি যেমন আমাকে লক্ষ্য করেছ আমিও করেছি। তুমি বড় হয়ে ছবির লাইনে পড়াশোনা করো। কোনো ফিল্ম ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়ো। ছবির ব্যাপারে তোমার আগ্রহ আছে। জগৎটাকে তুমি ভালবাস। অভিনয় আছে তোমার রক্তের ভেতর। তুমি পারবে।

'থ্যাংক য়্যু।'

'শোন রুমালী একটা উপদেশ দেই—চোখ সব সময় খোলা রাখবে। অতি তুচ্ছ দৃশ্যও যেন চোখ এড়িয়ে না যায়। চণ্ডিগড় গ্রামে জাহেদা নামের একটা মেয়ে আছে। মেয়েটা ভবিষ্যৎ বলে—তার বাড়িতে একদিন গিয়ে দেখি—একটা পোষা বক। নাম ধলামিয়া। বুড়ো মানুষদের মতো টুকটুক করে হাঁটে। মজার ব্যাপার কি জান? বকটা অন্ধ।'

'আপনাকে কে বলেছে? জাহেদা।'

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিষণ্ন গলায় বললেন, না কেউ বলেনি। কিছুক্ষণ বকটার দিকে তাকিয়েই বুঝলাম সে অন্ধ। তোমাকে এটা বললাম কেন জান—যাতে তুমি তোমার দেখার চোখ তীক্ষ্ণ করতে পার। এইটা বলার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম—এখন তুমি যেতে পার।

'একটু বসি?'

'আচ্ছা বোসো। বৃষ্টি বেশ ভালই নেমেছে, তাই না?'

'জি।'

তিনি উঠে জানালার পাশে গেলেন। জানালার পর্দা সরালেন। বৃষ্টির ছাট তাঁর গায়ে লাগল। তিনি চট করে সরে গেলেন। যেন বৃষ্টিতে তাঁর কাপড় না ভেজে। অথচ আমি নিশ্চিত জানি—ঝুম বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই তিনি নদী দেখতে যাবেন। তাঁর মাথার উপর ছাতা থাকবে না।

'রুমালী! মোমবাতির আলোটা কেন জানি চোখে লাগছে। কিছুক্ষণের জন্যে বাতি নিভিয়ে দি?'

'দিন।'

তিনি বেশ কয়েকবার ফুঁ দিলেন, বাতি নিভল না। তিনি ক্লান্ত এবং হতাশ চোখে মোমবাতির শিখায় দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখের তারায় মোমবাতির শিখার ছায়া।

'নীরা বলছিল তুমি খুব সুন্দর গান কর। শোনাও একটা গান। আচ্ছা তুমি কি ঐ গানটা জান—? Where have all the flowers gone?'

'জি না।'

তিনি নিজের মনে গুন গুন করলেন—Where have all the flowers gone? Young grils pick them every one...তারপর চুপ করে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত গলায় বললেন—আমার পছন্দের গান। কথাগুলি সুন্দর। গানটা শেষ হয় প্রশ্ন দিয়ে। When will they ever learn? তারা কবে শিখবে?

'আমি আপনাকে অন্য একটা গান শুনাই?'

'না—কেন জানি এই গানটা ছাড়া অন্য কোনো গান এখন শুনতে ইচ্ছে করছে না। আমার একটা সমস্যা আছে, যখন যে গানটা শুনতে ইচ্ছে তখন সেই গানের বদলে অন্য গান অসহ্য লাগে।'

'আমি এই গানটা শিখে রাখব যদি পরে কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হয় আপনাকে শুনাব।'

'থ্যাংক য়্যু ইয়াং লেডি। মনে হচ্ছে আর দেখা হবে না। চল ওঠা যাক। আমি এখন নদী দেখতে যাব।'

'আমি কি আসব আপনার সঙ্গে?'

'না। আমি একা যেতে চাই।'

তিনি বৃষ্টির মধ্যেই উঠোনে নামলেন। সোহরাব চাচা ছাতা নিয়ে ছুটে গেলেন। তিনি ইশারায় বললেন—না। তারপর শান্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

বৃষ্টি পড়ছে। ঝড় শুরু হয়েছে।

সোমেশ্বরী নদী গর্জাচ্ছে। নদী তার অলৌকিক গলায় ডাকছে—এসো। এসো। সেই আহ্বান সবাই শুনতে পায় না। কেউ কেউ পায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~